সম্পাদকীয়

শ প থ

দশম বর্ষে পদার্পণ করিলাম.....

দেশের মুক্তি সংগ্রামে যাহারা নিজেদের জীবন বলি দিয়া গিয়াছে, স্বাধীনতার পরে তাহাদের অমরত্বের দাবী অস্বীকার করিবার যেন একটা সুকৌশলিত অভিযান সুরু হইয়াছিল। আমরা এই প্রতিক্রিয়া-পন্থী অভিযানের বিরুদ্ধে আপোষহীন ও বিরামহীন প্রতিরোধ ঘোষণা করিয়া যাত্রা সুরু করিয়াছিলাম।

এই সংগ্রামে আজ আমরা জয়ী। বাঙ্গালীর অতান্দ্রিয় চেতনার দ্বারে আমরা প্রবেশ লাভ করিয়াছি। শুধু বাঙ্গালী নয়, সারা ভারতবর্ষে আজ ভারতের বিপ্লব আন্দোলনের শহীদ-গণের জীবনী, জীবনাদর্শ ও বৈপ্লবীক কর্ম প্রচেষ্টা জানিবার ও বুঝিবার একটা আগ্রহ সৃষ্টি হইয়াছে। আধুনিক রাজনীতির নির্লজ্জ সুবিধাবাদী ও আধুনিক সামাজিক নেতৃত্বের নির্লজ্জ আত্মকেন্দ্রিক স্বার্থলুব্ধতার পরিপ্রেক্ষিতে অতীত দিনের বৈপ্লবিক ঐতিহ্যে স্বার্থহীন ত্যাগ, সেবা ও আত্মোৎসর্গের আদর্শে আজ আমরা দেশবাসীর সশ্রদ্ধ আগ্রহ ও মনোযোগ আকর্ষণ করিতে পারিয়াছি।

বিপ্লবী বাংলা এই সুস্পষ্ট আদর্শ ও উদ্দেশ্য লইয়া জন্মলাভ করিয়াছিল এবং নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রাম চালাইয়া যাইতেছে। আজ নূতন বর্ষে পদার্পণ করিয়া এই সঙ্কল্পই পুনরায় ঘোষণা করিতেছে—যদি মরিতে হয় তবে এই আদর্শ লইয়া মরিবে, যদি বাঁচে যতদিন বাচিয়া থাকিবে কোন কারণেই আদর্শ হইতে বিচ্যুত হইবে না। এই সঙ্কল্প পুনরায় ঘোষণা করিয়া বিপ্লবী বাংলা নতুন বৎসরে যাত্রা সুরু করিল। অতীতের ঐতিহ্যের নিকট আদর্শের ঋণই আমাদের ঋণ, সেই ঋণ পরিশোধের ব্রতই আমাদের ব্রত। সেই ব্রত উদ্‌যাপন করিবার পবিত্র প্রচেষ্টায় কোন দুঃখকে দুঃখ বলিয়া মনে করি না, কোন ত্যাগকেই অতিবড় বলিয়া মনে করি না। চির বিপ্লবী বাঙ্গালীর শুভেচ্ছা সঙ্গে আছে এবং থাকিবে এই বিশ্বাস ও ভরসায় আমরা আবার যাত্রা শুরু করিলাম।

পুরাতন পঞ্জিকা

—শ্রীসতীভূষণ সেন

স্বাধীন হয়েছি, সেও আজ তেত্রিশ [redacted]তে যত সহজ, আসলে তত সহজ নয়। পরাধী
এখনো মুখ দিয়ে বেরিয়ে পড়ে, 'সুরেন বাঁড়ু[redacted]শ, সমস্যার তো অন্ত ছিল না আমাদের, তার মধ্যে
গাড়ি টেনে নিয়ে যাওয়ার কথা, মনে আছে? সব চেয়ে জরুরী ছিল দারিদ্র্য ও নিরক্ষরতা। এ
কিম্বা বলে বসি, 'ক্ষুদিরামের গানটা একবার শোনা- দুটিকে কব্জা করতে গিয়ে দেখা গেল, আর দশ
বেন?' আপনারা কে যে কবে দেখা দিয়েছেন, সমস্যা এসে পথ জুড়ে দাঁড়িয়েছে, আগে যেতে চায়
সেটা সব সময় খেয়াল থাকেনা, তাই ভুল করে কাকে সামনেই ভাঙা হাতে কৃষক, তার দাবি লাঙ্গল যা
কি বলে ফেলি! কে আবার কি ভাবেন কে জমি তার। এমনি এক দাবি, যে সমাধান করা
জানে?

তখনকার দিনে, আমরা চাইতাম স্বাধীনতা। গেলে ভীমফলের গোটা চাকটাই ক্ষেপে উঠে ত
নরম ও গরম, দুটো দল ছিল, সে ঐ নামেই। সমস্যা করবে। নইলে কি এই তেত্রিশ বছরেও
ছিল একটিই—কি করে সাহেবদের তাড়ানো যায়। সমাধান হত না?—শেষটা নেহেরু বললেন, 'পৃ
যার যেমন সাধ্য ও রুচি, তিনি সেই পথ ধরে চল- দুনিয়া এগিয়ে গেছে শিল্প বিস্তরের পথে, সেই প
তেন। আপনার বয়স পনেরো থেকে পঁচিশের আমাদের আসল পথ। কৃষিতেও বিপ্লব আসা
মধ্যে, আপনি কোমরে পিস্তল বেঁধে, পকেটে বোমা আসবে ট্রাকটারের রথে চড়ে, আসবে সমবায়ে
পুরে চুপসে বেরিয়ে পড়তেন। আমার বয়স বেশী, হাত ধরে। আসবে যথাসময়ে। তার জন্য দুটো
তাই বলে কিছু ঘরে বসে থাকতেম না। গাঁদা ফুলের দিন সবুর করতে হবে।
মালা গলায় জড়িয়ে; গান গাইতে গাইতে চলে
যেতাম লবণ আন দিতে। পথ বিভিন্ন হলেও লক্ষ্য তখন নেহেরুর উপরে গভীর নির্ভরতা ছিল
ছিল অভিন্ন। আপনার তর সই ছিল না, জলদি দেশের। নেহেরু যা বলতেন, আমরা তাই বিশ্বাস
স্বাধীনতা আনতে চাইছিলেন। আমার অতোটা করতাম। যখন যা করতেন, আমরা পেছনে
তাড়া ছিল না। থাকতাম। বিশাল কর্মযজ্ঞ শুরু হল, জল দৈত্যকে
বেঁধে জুড়ে দেওয়া হল বিজলি উৎপাদনের কাজে।
অবস্থাটা বদলে গেল, স্বাধীনতা লাভের পরে। চাষীর ভিটে খুঁড়ে তোলা হতে লাগল খনিজ,
আপনারা সব বেকার হয়ে পড়লেন, আমরা একটা ক্ষেতের মাঝ দিয়ে ছুটল পিচ মোড়া সড়ক। দুহুটো
কাজ হাতে পেলাম। ঘর গোছাবার কাজ। কথাটা পাঁচ শালা প্ল্যানের চিমনীর ধোঁয়ায় ধোঁয়া
আঁধার হয়ে গেল দেশ—আর সেই সময় এক

নর পল্টন, সীমান্ত ডিঙ্গিয়ে, কয়েকটা ঘায়ে, যাদের সামরিক মর্যাদা একেবারে ধুলোয় ফেলে ।। তারপর অকস্মাৎ দেশে ফিরে গেল, যেন ছুই হয় নি।

প্রতিবেশীর অতর্কিত আক্রমণ, আমাদের উপরে প্রথম নয়। জন্মলগ্নেই সেটি সহ্য করতে হয়েছে, ন্তু চীনের আক্রমণ ছিল অতীব গুরুত্বপূর্ণ। এর ল আমাদের শত্রু মিত্রের সংজ্ঞা বদলে গেল, বিশ্বাস বিশ্বাস নতুন করে সাজাতে হল। এবং যেহেতু রিবর্তন বা সূচিত হল, তার পরিণাম হল সুদূর ারি। আত্মরক্ষা ব্যয় বেড়ে গেল আড়াইগুণ, দেশ নর বাজেট সেই পরিমাণ ছাঁটতে হল। টাকা াইল, তা দিয়ে মোটা ভাত আর মোটা কাপড়ও টানো মুস্কিল। প্রথম ছুটো পাঁচ শালা প্ল্যানে যন্ত্র বিজ্ঞানীদের কাজ চাষীর কিছু করণীয় া না। তাই দেশের শস্য উৎপাদন দিন দিন কম ।, [বাড়ছিল শিশু উৎপাদন]। জনতার যে ঐক্যবিত সম্মতিটা এতদিন আমাদের রাষ্ট্রের রথকে লে নিয়ে চলছিল, এখন ক্ষিদের জ্বালায় সেটা গেল বেঁকে। পথ নিয়ে দেখা দিল সন্দেহ, বেধে উঠল দ্বন্দ। এবং সবচেয়ে বড় ক্ষতি হল, যে নেহেরু আর তাঁর রাজনৈতিক উদ্যম ফিরে পেলেন না। ভাগনের একটি চড়ে যেন নিভে গেলেন একেবারে।

বেচারা নেহেরু! ১৯৫১ সালে যেদিন 'মাও' চীনদেশ অধিকার করে চেয়ারম্যান হয়ে বসলেন, আমেরিকান সাহায্য পুষ্ট 'চিয়াং'কে ছুড়ে ফেলে দিলেন প্রশান্ত মহিয়ার, সেদিন এই বিশাল বিশ্বের রাষ্ট্র নায়কদের মধ্যে নেহেরুই প্রথম বন্ধুত্বের হাত বাড়িয়ে তাকে স্বীকৃতি জানিয়েছিলেন, আমেরিকার ক্ষা করেন নি। প্রতিদানে, চেয়ারম্যান মাও ক্ষা পাঠিয়েছিলেন, নিষিদ্ধ ভারতীয় কমিউনিষ্ট পার্টির উদ্দেশ্যে। আশা প্রকাশ করেছিলেন, যে অচিরেই তারা কংগ্রেসী দুশাসনের হাত থেকে দেশকে মুক্ত করতে সক্ষম হবে। তবু, তারপরেও সেই লাল চীনকেই সারাজীবন তোয়াজ করেছেন নেহেরু, আগ্ বাড়িয়ে মিত্রতার পরশীল পাতিয়েছেন। শুধু এই কারণে যে প্রতিবেশী ঐ ড্রাগনটার সঙ্গে অস্ত্রের প্রতিযোগিতায় নামতে গেলে, দেশ গঠনের কাজ আর হয়ে উঠবে না। মারা পড়বে আমার দেশের গরীবরা।

স্বাধীনতা আন্দোলনের মধ্য দিয়ে আমরা মোটামুটি একটা জাতীয় একতার সম্মতি বা consensus গঠন করেছিলাম, যার শক্তিতে চীনের আক্রমণের পরেও আমরা টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙ্গে পড়িনি। যুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ, দাঙ্গা, দেশবিভাগ, চড়চাপড় তো কম খেতে হয়নি স্বাধীনতা লাভের প্রাক্কালে। আঘাতে আঘাতে জাতীয়তার ভিত ক্রমশঃ মজবুত হয়েছিল। তখন আকাশ ছিল নীল, ধরণী ছিল শ্যামল। নীচে নবজীবনের আশার তরঙ্গ, পেছনে হাল ধরে জনতার চোখের মণি, নেহেরু। মনে বিশ্বাস, এক পুরুষেই আমরা পশ্চিমী দুনিয়াকে ধরে ফেলব। সেই আশা মিলিয়ে গেল ৬২ সালের আক্রমণের পরে। তারপর থেকে একটা না একটা সঙ্কট লেগেই আছে।

নেহেরু পরলোকগমন করলেন ১৯৬৪ সালে। দেড় বছর পরে ইন্দিরা প্রধানমন্ত্রী হলেন। এই দেড়টা বছর সম্বন্ধে কিছু না বলাই ভাল। লালবাহাদুর ছিলেন একজন সাধু, সজ্জন ভালো মানুষ। কিন্তু ৬২ সালের যুদ্ধে যখন জাতির নৈতিক মূল্যবোধ বিপর্যস্ত হয়ে গেছে, সেই দুর্দিনে হাল ধরবার শক্তি তাঁর ছিল না। এই সময়টার আবার পাকিস্তান করল আক্রমণ। গোটা কাশ্মীর উপত্যকাটাই প্রায় বেদখল করে ফেলেছিল। যুদ্ধান্তে

তাসখন্দ লালবাহাদুরের মৃত্যু রহস্যে, আজও আলোকপাত হওয়া বাকি।

সে সময়টায় প্রধানমন্ত্রী নির্বাচন ছিল কামরাজের পোর্টফোলিও। প্রার্থীদের 'সার্ভিস রেকর্ড' ও কনফিডেন্সাল রিপোর্ট তাঁর নখদর্পণে। উত্তর দক্ষিণ পূর্ব পশ্চিমে, সুবেদার বৃন্দ উদ্বিগ্ন নয়নে চেয়ে আছেন। কামরাজের চোখের সামনে এক হতাশা ব্যঞ্জক দৃশ্য। তিরিশ দশকের পরে কংগ্রেসে কোন নূতন নেতার আবির্ভাব হয়নি। স্বাধীনতার পরে, নেতৃত্বের যে দৃষ্টান্ত, সাধারণের কাছে প্রকাশ পেয়েছিল, তাতে ধান্ধাবাজ দুচার জন তরুণ কংগ্রেসে যোগ দিয়ে থাকলেও, আদর্শের টানে কেউ আসেন নি। বিরোধীদলের অবস্থাও সেই একই রকম। আদর্শবাদী তরুণ আসতেন, দলে যোগও দিতেন কিন্তু পড়ে থাকতেন সাইডিংএ। পলিটবুরো জুড়ে বসেছিলেন শুভ্রকেশ বীরবাহুর দল। সবদিক বিবেচনা করে কামরাজ, তুলনায় তরুণ ইন্দিরাকেই এই উচ্চ পদের জন্য মনোনীত করলেন।

ইন্দিরা যখন ক্ষমতা হাতে নিলেন, তখনো দেশ পাকিস্তানী প্যাটন ট্যাঙ্কের কাপটা সামলে উঠতে পারে নি। তখনো জুলফিকার আলি ভুট্টো রাষ্ট্রসঙ্ঘে অভিনয় করছেন ও অভিনন্দন কুড়োচ্ছেন। ভারতের কথায় কেউ কান দেয় না। তখনো সারা ভারত খরায় জ্বলছে। সেই সময়টায় নাটকীয় ভাবে ধরা পড়ল যে আমাদের জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের কর্মসূচী উন্নয়নের আর পাঁচটা কাজের মতই, প্রশাসনিক ব্যর্থতায় একেবারে নষ্ট হয়ে গেছে।

এই অবস্থার মধ্যে যথাসময়ে নির্বাচন হল পরের বছর ১৯৬৭ সালে। ভোটদাতাদের পেটে দানা নেই, চোখে স্বপ্নের মোহ কেটে গেছে। বাইরে শত্রুর আসকালন, অন্দরে দুর্ভিক্ষের পদধ্বনি। সেই দুর্দিনে, সমগ্র উত্তর ভারত, কংগ্রেসকে বর্জন করে, বরণ করে নিল সংযুক্ত বিধায়ক দলকে। ৬২ র পরে জাতীয় কংগ্রেস যে ভেঙ্গে পড়েছে তারই সুস্পষ্ট প্রমাণ এটা। রাজ্যে রাজ্যে সংযুক্ত বিধায়ক দলের কাঁচা রঙ, দুচার ঠোকর মেরে চটে যেতে শুরু করল, একে একে, বেরিয়ে পড়তে লাগল ভেতরের পুরানো কংগ্রেসী মাল। কংগ্রেসী প্রবীণেরা ইন্দিরাকে হটিয়ে কেন্দ্রে ক্ষমতা হস্তগত করবার আয়োজনে মেতে উঠলেন। সেই ডামাডোলের বাজারে তাদের সঙ্গ বর্জন করলেন ইন্দিরা। এই ভাঙ্গনের পরে জাতীয় কংগ্রেস খানিকটা মেরামত হল। পুরোপুরি মেরামত হতে লাগল আরও দুবছর। ১৯৭১ সালের বা লাদেশ যুদ্ধে। পাকিস্তানকে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করার পরে, ইন্দিরার ভাবমূর্তি পুরোপুরি ফুটে উঠল।

বাংলাদেশ যুদ্ধের পরে ইন্দিরার যা 'ইমেজ' হল, তাঁকে সামনা সামনি আক্রমণ করবার সাহস কারও ছিল না। এ দেশেতো নয়ই, বিদেশেও নয়। আপনাদের মনে আছে নিশ্চয়ই, যে এই সময়টায় একদল লোক সঞ্জয়কে নিয়ে পড়লেন। তাঁরা আমাদের দেশেরই মানুষ, কিন্তু প্রেরণা ও রুধির এসেছিল আমেরিকা থেকে। সঞ্জয়ের সমালোচনা শুরু হল মারুতি কারখানা নিয়ে। কত রকম অবৈধ সুযোগ যে তিনি পাচ্ছেন ও নিচ্ছেন, সেইসব গালগল্প, লোকের মুখেমুখে, ছেঁড়া কাগজের টুকরোর মত উড়ে বেড়াতে লাগল। আক্রমণের আসল লক্ষ্য যে ইন্দিরা, সেটা বুঝতে কারও অসুবিধা হল না। সেই আক্রমণ আরও জোরদার হয়ে উঠল 'পোক্করাণ' বিস্ফোরণের পরে। তখন আর শুধুমাত্র

আমেরিকা নয়, সমগ্র পশ্চিম দুনিয়াই, তারতে একটা অস্থিরতা সৃষ্টির জন্য উঠে পড়ে লাগল। একবার বলতে লাগল মাতৃস্নেহে অন্ধ ইন্দিরা, কোলের ছেলেটিকে সিংহাসনের জন্য তালিম দিচ্ছেন। আবার বলতে লাগল বুড়ো হয়ে ইন্দিরার ভীমরতি হয়েছে, সঞ্জয়ই এখন তাঁকে ওঠাচ্ছে আর বসাচ্ছে। ....

১৯৭৩ সালে আরব শেখরা একগাট্টা হয়ে খনিজ তেলের দাম দিল চড়িয়ে। একেবারে চারগুন করে দিল। এ যুগের ইনডাস্ট্রি তেল ছাড়া চলে না। দুনিয়াময় চেচামেচি শুরু হয়ে গেল। শিল্প সমৃদ্ধ পশ্চিমী দেশেরই তেলের খাটতি বেশী। তারা কিন্তু মুদ্রাস্ফীতির গাঁড়াকলে আমাদের ফেলে দিয়ে হাসতে হাসতে বেরিয়ে গেল। মারা পড়লাম আমরা, উন্নতিকামী দেশরা। সেই এক ধাক্কায় আমাদের রাষ্ট্রের জাহাজখানা ছিটকে পড়ল গিয়ে আবার সেই আগের দিনের আর্থিক ও রাজনৈতিক অচল বিলের ঘাটে। জট ছাড়িয়ে আসবার একমাত্র উপায় ছিল 'জরুরী' পাল তুলে, শক্ত হাতে হাল ধরে থাকা। জাতির সেই সন্ধিক্ষণে, প্রমাণিত হয়েছে যে সঙ্কটকালে ইন্দিরার আর বিকল্প নেই। আমাদের কাঁচামিঠে ঐতিহাসিকের দল যাই বলুন, যে ভাষাই এখন প্রচার করুন, এলাহাবাদ হাইকোর্টের সেই ছিদ্রান্বেষী রায়ের সঙ্গে, জরুরী অবস্থা ঘোষণার কোন সম্পর্ক ছিল না।

তেলের দাম চতুর্গুন উঠেও থেমে থাকে নি, মাস দুমাস পরপরই লাফিয়ে লাফিয়ে চড়ছিল। এই সময়টায় আবার আমরা পড়লাম খরার কবলে। পরপর দুবছর দারুন খরা। আকাশে দেবতার দয়া নেই। ধানের ক্ষেত ফুটি ফাটা, ফসল শুকিয়ে খড়। সামনে দুর্ভিক্ষ, পেছনে শত্রুর অট্টহাসি ইন্দিরা দেখলেন, আর উপায় নেই। উৎপাদন বাড়াতে হবে, যে কোন উপায়েই হোক। জনসংখ্যা কমাতেই হবে, যে কোন মূল্য দিয়েই হোক। রোগী যদি ওষুধ খেতে না চায়, তাকে জোর করে নাক টিপে, ওষুধ গেলাতে হবে। নিয়মানুবর্তিতা ফিরিয়ে আনতে হবে মহাকরণে।— এই হল জরুরী অবস্থা ঘোষণার আসল ইতিহাস।

যে একুশ মাস দেশে জরুরী অবস্থা চালু ছিল, সেই সময়ে নানান দিকে উল্লেখযোগ্য উন্নতি দেখা গেছিল। কর্মচারীরা সময়মত হাজিরা দিচ্ছিলেন, মন দিয়ে কাজও করছিলেন। সরকারী বেসরকারী উভয় সংস্থারই উৎপাদন বেড়েছিল। রাজস্ব ও বাজনা, আদায় ও পুনরুদ্ধার আশাতীত বৃদ্ধি পেয়েছিল। যদিও করের হার বাড়ানো হয় নি, বরং কমানোই হয়েছিল কোন কোন ক্ষেত্রে। জিনিষপত্রের দামও কিছুটা কমেছিল। যেখানে কমেনি, সেখানেও লাফিয়ে লাফিয়ে চড়ে যাওয়া থেমে গিয়েছিল। বোনাস ও ওভারটাইম বন্ধ হয়ে যাওয়ায়, চেঁচামেচি তেমন কিছু হয় নি। বরং কাঁচা টাকার খেলা থেমে যাওয়ায়, জিনিষপত্র সস্তা হয়েছিল বলে, ওভারটাইমের অভাব কারো গায়ে লাগেনি। জরুরি অবস্থা তুলে নেওয়ার পরেও তার "পাইপ লাইন এফেক্ট" বর্তমান ছিল বেশ কিছুদিন। জনতা সরকারও প্রথম দিকে তার সুবিধা ভোগ করেছিলেন। পরে অবশ্য অফিস কাছারী আবার সেই হরি ঘোষের গোয়াল হয়ে ওঠে।

সেই হরি ঘোষের গোয়াল নিয়েই কাজ শুরু করতে হয়েছিল ইন্দিরাকে। এ বছরের গোড়ায় যখন ক্ষমতায় ফিরে এলেন। মহাকরণে শিথিলা, বাজারে টাকার ক্রয়ক্ষমতা কমে গেছে। উৎপাদন কম, জিনিষপত্র অগ্নিমূল্য। জাতীয় সম্পদ বৃদ্ধি হয়

নি, কমেছে। বিজলী আসছে না, কয়লা উঠছে না, রেলের ইঞ্জিন আর পারছে না টানতে। ট্রাম বাসে জায়গা নেই, পথে নামলে নিরাপত্তা নেই। আসামে ঘূর্ণিঝড়, উত্তরপূর্বে ঘনঘটা। দেশের ভেতর আইন শৃঙ্খলার ভয়দশা। বাইরে বাড়ীর পাশে, সোভিয়েট আমেরিকায় ঠোকাঠুকি।—একমাত্র আশার কথা, পার্লামেন্টে আরামদায়ক সংখ্যাগরিষ্ঠতা। তাও তো একেবারে নিষ্কণ্টক নয়। ডাইনে সদা চঞ্চল চন্দ্রশেখর ও অটলবিহারী, বামে স্থির চক্ষু ভূপেশ ও জ্যোতির্ময়।

ইন্দিরা আজ অতীতের যত তিক্ততা ভুলে গেছেন। মোরারজি, চৌধুরী আর রাজনারায়ণের মত, প্রতিহিংসার পথে পা বাড়ান নি। সবাইকে ক্ষমা করেছেন। সবাইকে ডেকে বলেছেন, আমাদের দেশ এতদিন অনেক আঘাত সয়েছে, এখন সে নিরাময়ের পরশ চায়। আজ আমাদের সামনে অনেক সামনে অনেক কাজ। আসুন আমরা মিলেমিশে, কাজে লেগে যাই। গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতা, এগুলি রক্ষায় আমরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ, অথচ রক্ষা কি করে উঠতে পেরেছি? বিভেদকামী শক্তিগুলিকে আমরা বুঝিয়ে সুঝিয়ে শান্ত করতে চাই, আপনারাও তাই চান। দেশের সবচেয়ে বড় শত্রু সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবিচার ও অসাম্য। সেগুলি দূর করবার জন্য আপনাদের সকলের সহযোগীতা চাই। বুঝতে ভুল হয় না, যে এ সবই তাঁর অন্তরের কথা। এই উদ্দেশ্য নিয়ে, জাতীয় সম্মতির একটা ভিত্তি গড়ে তুলবার আশায়, এবার তিনি সঞ্জয়ের সঙ্গে একদল যুবনেতাকে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতার মাধ্যমে, লোকসভায় নিয়ে এসেছেন।

আমাদের দেশের স্বার্থসর্বস্ব রাজনীতির বন্ধ জলায়, যুবশক্তির প্রাণবন্যা কয়েকবারই দেখবার সৌভাগ্য হয়েছে। প্রথমেই দেখেছি সেই অগ্নিযুগে। —তার পরেও এসেছে কয়েকবার, কিন্তু কোনবারই তার স্ফুলিঙ্গগুলি তেমন করে জ্বলে উঠতে পারল না। দাবানল হয়ে ছড়িয়ে পড়ল না দেশময়। এবার সেই যুবশক্তিকে সংসদীয় রাজনীতিতে দীক্ষিত করবার আয়োজন করেছেন ইন্দিরা। সঞ্জয়ের অকালমৃত্যুর ফলে সেই সম্ভাবনা যদি শুকিয়ে যায়, সে হবে দেশের দুর্ভাগ্য।

"ভারতবর্ষের প্রধান সার্থকতা কী—এই কথার স্পষ্ট উত্তর যদি কেহ জিজ্ঞাসা করেন, সে উত্তর আছে। ভারতবর্ষের ইতিহাস সেই উত্তরকেই সমর্থন করিবে। ভারতবর্ষের চিরদিনই একমাত্র চেষ্টা দেখিতেছি, প্রভেদের মধ্যে ঐক্য স্থাপন করা, নানা পথকে একই লক্ষ্যে অভিমুখীন করিয়া দেওয়া এবং বহুর মধ্যে একেকে নিঃসংশয়রূপে, অন্তরতররূপে উপলব্ধি করা—বাহিরে যে সকল পার্থক্য প্রতীয়মান হয়, সেগুলিকে নষ্ট না করিয়া তাহার ভিতরকার নিগূঢ় যোগকে আবিষ্কার করা।"

—স্বামী বিবেকানন্দ

বিপ্লবী নায়ক যতীন্দ্রনাথ

●

প্রায় দুইশত বছরের ইংরেজ রাজত্বকালে ভারতবর্ষের মানুষ বিশ্বসভার সামনে দাসত্বের কালিমা মুখে মেখে মাথা নীচু ক'রে দাঁড়িয়েছিল। তারা অতীত গৌরব ভুলেছিল, ভবিষ্যতও ভুলেছিল।

গভীর এই অন্ধকারের মধ্যেও ঘুমন্ত জাতিকে তুলবার জন্য কয়েকটি অগ্নিকণা এদিক ওদিক জ্বলে উঠেছিল। তাঁরা মোহগ্রস্থ জাতিকে উদ্বুদ্ধ ক'রে তুলতে চেয়েছিলেন, তাঁরা আত্মাহুতি দিয়ে জাতিকে মরতে শেখাচ্ছিলেন। অমনই একজন বীর ছিলেন যতীন্দ্রনাথ মুখার্জি।

যতীন্দ্রনাথ ১৮৭৯ সালের ৮ই ডিসেম্বর কুষ্টিয়ার কয়া গ্রামে মামাবাড়ীতে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা উমেশচন্দ্র মুখার্জির মৃত্যুর পর পাঁচ বছর বয়সের যতীন্দ্রনাথ মামাবাড়ীতেই মানুষ হন।

১৯০৬ সালে তাঁদের কয়া গ্রামের কাছে একবার বাঘের উপদ্রব হয়। যতীন্দ্রনাথ একখানা ভোজালী হাতে চললেন। জঙ্গল পিটিয়ে বাঘ বার করা হ'ল। উত্তেজিত বাঘ লাফিয়ে এসে যতীন্দ্রনাথের উপর পড়ল। যতীন্দ্রনাথ বিপদের সময় ভয় কি বস্তু তা জানতেন না। তিনি বাঘের গলাটা বাম বগলে চেপে ধ'রে তার মাথায় ভোজালী বসিয়ে দিতে লাগলেন। বাঘের সঙ্গে তুমুল লড়াই চললো। বাঘ তাঁর হাঁটু দারুণভাবে জখম করে। তিনি তবু বাঘকে মাটিতে চেপে ধ'রে ভোজালীর আঘাতে শেষ করে দেন।

অস্ত্রোপচারের প্রয়োজন হয়। অপরিসীম কষ্টদায়ক এই অস্ত্রোপচার। বিখ্যাত সার্জেন ডাঃ সুরেশ সর্বাধিকারীকে তিনি বলেন—অজ্ঞান করার প্রয়োজন নেই। চোখ বুজে নীরবে সব সহ্য করেন। সার্জেন বিস্ময়ে হতবাক। ইংলিশম্যান পত্রিকা এই আশ্চার্য রোগীর কাহিনী প্রকাশ করে।

তারপর থেকে তাঁকে লোকে বলতো, "বাঘা যতীন"।

কিছুদিন পরে যতীন্দ্রনাথ কলকাতা থেকে দার্জিলিং যাচ্ছিলেন। যতীন্দ্রনাথের কামরায় একজন অসুস্থ মহিলা জলের জন্য কাতর ছিলেন। ট্রেন শিলিগুড়ি স্টেশনে থামলে তিনি নেমে গিয়ে যখন জল নিয়ে আসছেন একজন গোরা সৈন্য ধাক্কা দিয়ে জলের গ্লাসটা ভেঙে ফেলে। যতীন্দ্রনাথ প্রতিবাদ করতেই গোরা সৈন্যেরা চারজনই তাঁকে আক্রমণ করে। তৎক্ষণাৎ প্রচণ্ড ঘুষিতে যতীন্দ্রনাথ চারজনকেই মাটিতে ফেলে দেন। কারো কারো দাঁত ভেঙে যায়। তারা চেঁচাতে লাগলো—পুলিস, পুলিস।

এ নিয়ে মোকদ্দমা চলাকালে ইংলিশম্যান পত্রিকা লিখেছিল—একজন সাধারণ ভারতীয় চারজন গোরাকে মেরেছে তার জন্য মোকদ্দমা? যেন বৃটিশের মুখে ছাই পড়েছে। ওরা মামলা তুলে নেয়।

ইংরেজ সরকারের সেক্রেটারী হুইলার-এর অফিসে যতীন্দ্রনাথ চাকরী করতেন। তাঁর কিন্তু যতীন্দ্রনাথের প্রতি শ্রদ্ধা বেড়ে যায়। জিজ্ঞেস করলেন, "একা চারটে সৈন্যকে কি ক'রে মারলে করলেন?" যতীন্দ্রনাথ জবাব দেন, "স্যার, সবই

কি গায়ের জোরে হয় অর্থাৎ সঙ্গে থাকা চাই জাতীয় আত্মমর্যাদাবোধ এবং নৈতিক শক্তি।

যতীন্দ্রনাথ মনে করতেন প্রবল প্রতাপ ইংরেজের বিরুদ্ধে লড়াই করবার জন্য মোহগ্রস্ত দেশটাকে আগে জাগাতে হবে।

বিংশ শতাব্দীর বিপ্লবী আন্দোলনের মূলে আছে স্বামী বিবেকানন্দের প্রেরণা। সঙ্গে সঙ্গে নর্ভাক পদে এগিয়ে এসে যাঁরা হাল ধরেন তাঁদের মধ্যে পুরোধা ছিলেন অরবিন্দ, যতীন্দ্রনাথ প্রভৃতি। যতীন্দ্রনাথ বলতেন, "তোরা শুধু মানুষ হ"। বলতেন, "আমরা মরব জাতি জাগবে"।

আজকের জাগ্রত জাতি কি সেদিনের মোহনিদ্রা কল্পনা করতে পারবে?

বিংশ শতাব্দীর শুরু থেকে নানা জায়গায় কতকগুলি সমিতি গড়ে ওঠে। তাদের ছিল শরীরচর্চার আখড়া, ছিল মানুষ তৈরী করার সংগঠন।

১৯০৮ সালের ডিসেম্বর প্রথম 'ঢাকা অনুশীলন সমিতি', বরিশালের 'স্বদেশ বান্ধব সমিতি', ময়মনসিংহের 'সুহৃৎ সমিতি' ও 'সাধনা সমাজ' এবং পরে 'কলকাতা অনুশীলন সমিতি'কে বেআইনী ঘোষণা করা হয়। ফলে এইসব সমিতির প্রায় সব অংশ গুপ্ত সমিতিতে পরিণত হয়। ইতিমধ্যে বরোদা থেকে বারীন ঘোষ এসে বিপ্লবীদলের মুখপত্র হিসাবে সাপ্তাহিক 'যুগান্তর' পত্রিকা বার করেন ১৯০৬ সালে। এই পত্রিকার নাম থেকে সমস্ত দলের নাম হয় 'যুগান্তর দল'। কেবল 'ঢাকা অনুশীলন সমিতি' পৃথক নামে চলে।

যে কয়জন তরুণ পূজারী প্রথমেই বিপ্লবীদলের সংস্পর্শে আসেন যতীন্দ্রনাথ তাঁদের অন্যতম। যতীন্দ্রনাথকে দেখে অরবিন্দ আকৃষ্ট হন।

১৯০৭ সালের ২৬শে আগষ্ট কলকাতায় কিংসফোর্ডের আদালতে ১৪ বছরের সুশীল সেন 'বন্দেমাতরম্' ধ্বনি দেয় কিংসফোর্ড সুশীলকে ১৫ ঘা বেত মারার হুকুম দেয়। বেতের প্রতি ঘায়ের সঙ্গে সুশীল আরো জোরে বন্দেমাতরম্ ধ্বনি দিতে থাকে। দেশের লোকে গাইল—বেত মেরে কি মা ভোলাবে আমি কি মায়ের সেই ছেলে!

ম্যাজিস্ট্রেট কিংসফোর্ডকে শেষ করে' দিতে ছুটলেন। অগ্নিশিশু ক্ষুদিরাম ও প্রফুল্ল চাকী। তাঁদের আত্মবলি জাতির মর্মস্থলে স্পর্শ করল। গ্রামের বাউল গেয়ে উঠলেন—বিদায় দে মা ঘুরে আসি।

তার দু'দিন পরেই ১৯০৮ সালের ২রা মে মুরারীপুকুর বাগান তল্লাসী ক'রে অরবিন্দ প্রভৃতি বহু বিপ্লবীকে গ্রেপ্তার করা হয়। 'আলিপুর বোমা মামলা' নামে মামলায় তাঁদের বিচার চলেছিল কোর্টে। নরেন গোঁসাই রাজসাক্ষী হয়ে সরকার পক্ষের প্রমাণের ব্যবস্থা করেছিলেন। জেলের মধ্যে বন্দী কানাইলাল দত্ত এবং সত্যেন বোস নিশ্চিত ফাঁসি জেনেও বিশ্বাসঘাতক নরেন গোঁসাইকে গুলী ক'রে মেরে হাসতে হাসতে ফাঁসির মঞ্চে উঠলেন। তাঁরা জাতির জীবনে সাহস সঞ্চার ক'রে চলেছিলেন।

আলিপুরের সরকার পক্ষের উকিল ছিলেন আশুতোষ বিশ্বাস। যতীন্দ্রনাথের ব্যবস্থাপনায় তাঁকে আলিপুর পুলিস কোর্টে গুলী ক'রে হত্যা করেন চারু বোস ১৯০৯ সালের ১০ই ফেব্রুয়ারী। তাঁর ডান হাত ছিল পক্ষাঘাতগ্রস্ত। তাতে স্লিঙ্গ-ভার বেঁধে দেওয়া হয়। বিচারের জন্য যখন তাঁকে আদালতে নেওয়া হয় তিনি বলেন, বিচার আবার

কিসের? বলেছি তো ওকে আমি মেরেছি। ফাঁসি দিয়ে দিন। বীরের মতোই তিনি ফাঁসিমঞ্চে ওঠেন। বাংলার সে এক গৌরবময় দিন।

আলিপুর বোমার মামলার তদন্ত করার ভার ছিল গোয়েন্দা পুলিস সামসুল আলমের উপর। যতীন্দ্রনাথের নির্দেশে বীরেন দত্তগুপ্ত সামসুল আলমকে হাইকোর্টে গুলী ক'রে মারেন ১৯১০ সালের ২৪শে জানুয়ারী এবং নিজে হাসি মুখে ফাঁসির দড়িতে মৃত্যু বরণ করেন।

যতীন্দ্রনাথ নিজের ছোট পুত্রের নাম রাখেন বীরেন।

যতীন্দ্রনাথ হাওড়া ষড়যন্ত্র মামলায় গ্রেপ্তার হবার হয়ে মুক্তি পান সোয়া একবছর পরে ১৯১১ সালের এপ্রিলে। গ্রেপ্তার হবার ফলে তাঁর চাকরী যায়। ওদিকে অরবিন্দ জেলের মধ্যে আধ্যাত্মসাধনায় সিদ্ধিলাভ ক'রে ফিরে এলেন সন্ন্যাসী শ্রীঅরবিন্দ হয়ে। বীরেন দত্তগুপ্তের ঘটনার পর তিনি পণ্ডিচেরীতে আশ্রয় নেন।

তারপর সামনে এসে দাঁড়ালেন যতীন্দ্রনাথ তাঁর প্রখর ব্যক্তিত্ব ও নেতৃত্ব নিয়ে। ১৯১৪ সালে বেধেছিলি জার্মানীর সঙ্গে ইংরেজের প্রথম বিশ্বযুদ্ধ। বিপ্লবীরা দেখলেন এই সময়ে ভারতে ইংরেজকে আঘাত হানা সুবিধা, যদিও সুপ্তজাতির সেই আঘাতে ইংরেজ তখনই বিতাড়িত হবে সেকথা তাঁরা মনে করতেন না। যতীন্দ্রনাথ বলতেন, আত্মাহুতি দিয়ে তাঁরা দেশবাসীকে ঝাঁকে ঝাঁকে মরতে শেখাবেন।

১৯১৫ সালে বিশ্বযুদ্ধের সময় জার্মানীর ভারতীয় বিপ্লবীরা বার্লিন কমিটি গঠন করেন এবং ভারতে বিদ্রোহ করবার জন্য জার্মানীর সাহায্যে এখানে অস্ত্রশস্ত্র পাঠাবার ব্যবস্থা করেছিলেন। জার্মানী শত্রুদেশ, সেখান থেকে সোজা অস্ত্র পাওয়া সম্ভব নয়। আমেরিকা তখনো যুদ্ধে নিরপেক্ষ। ব্যবস্থা হয় আমেরিকায় যে জার্মান দূতাবাস ছিল তারা সেই দেশে অস্ত্র কিনবে এবং জাহাজ ভাড়া ক'রে অস্ত্র এদেশে পাঠাবে। তাই নিয়ে ভারতব্যাপী একটা বিদ্রোহ ঘটাবার পরিকল্পনা হয়। সর্বাধিনায়ক যতীন্দ্রনাথ।

অরবিন্দের নেতৃত্বে ১৯০৬-৬ সালে যখন বিপ্লবী দল গড়ে ওঠে তখন থেকে রাসবিহারী বোস যতীন্দ্রনাথের সহকর্মী। তাঁদের শেষ সাক্ষাৎ হয় কাশীতে। সমগ্র উত্তর ভারতে সৈনিক বিদ্রোহের সম্ভাবনার কথা আগেই সিদ্ধান্ত ছিল, এখন আলোচনায় বিপ্লবোত্থানের দিন স্থির হয় ১৯১৫ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারী। সারা উত্তর ভারতব্যাপী সশস্ত্র সেনাবিদ্রোহের ব্যবস্থা এবং বাংলায় একটা বিপ্লবী অভ্যুত্থান হবে একই সঙ্গে। তার আগে জার্মানীর অস্ত্র সাহায্য পৌঁছে যাবার কথা। এটি একটি তাৎপর্যপূর্ণ বিপ্লবী পরিকল্পনা।

কিন্তু ২১শে ফেব্রুয়ারী তারিখটা এক বিশ্বাসঘাতক পুলিশকে জানিয়ে দেয়। ফলে সমস্ত উত্তর ভারতের সৈনিক বিদ্রোহের আয়োজন ব্যর্থ হয়ে যায়। বহু কর্মীকে ফাঁসি ও দীর্ঘমেয়াদী কারাদণ্ড দেওয়া হয়। অনেক সৈনিকের সামরিক আদালতের বিচারে চরম শাস্তি হয়। রাসবিহারী গোপনে ভারত ছেড়ে ১২ইমে জাপান চলে যান। আমাদের দেশে মির্জাফর উমিচাঁদের আমল থেকে স্বাধীনতা লাভের অনেক চেষ্টা অনেকবার ব্যাহত হয়েছে বিশ্বাসঘাতকদের দ্বারা।

২৪শে ফেব্রুয়ারী পাথুরিয়াঘাটায় একটা বাসায় যতীন্দ্রনাথ, চিত্তপ্রিয় রায়চৌধুরী, অতুল ঘোষ, নরেন ভট্টাচার্য (এম, এন, রায়) প্রভৃতি বসে পরামর্শ করছিলেন এই ব্যর্থতার পর কি করা যায়। এমন

সময় গোয়েন্দা নীরোদ হালদার গিয়ে হাজির। সে বলে,—যতীনবাবু আপনি এখানে। সঙ্গে সঙ্গে চিত্তপ্রিয় তাকে গুলী করেন। মৃত্যুর আগে নীরোদ হালদার বলে, যতীন্দ্রনাথ তাকে গুলী করেছেন।

যতীন্দ্রনাথকে ধরবার জন্য পুরস্কার ঘোষণা করা হয়।

২৮শে ফেব্রুয়ারী তাঁর নির্দেশে গোয়েন্দা সুরেশ মুখার্জিকে হত্যা করা হয়।

জার্মান অস্ত্রের সাহায্যে বিপ্লবে নেতৃত্ব করার প্রয়োজনে যতীন্দ্রনাথকে তখন কলকাতার বাইরে পাঠিয়ে দেওয়া জরুরী প্রয়োজন। যতীন্দ্রনাথ রাজী হলেন।

মণীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী উড়িষ্যার কপ্তিপদার অধীনে তাঁর মহুলডিহা মৌজাতে যতীন্দ্রনাথকে আশ্রয় দিতে প্রস্তুত হন। মার্চ মাসে যতীন্দ্রনাথ ও চিত্তপ্রিয় সেখানে যান, পরে নীরেন দাশগুপ্ত, মনোরঞ্জন সেনগুপ্ত এবং আরো পরে যতীশ পাল যান

যোগাযোগের কেন্দ্র খোলা হয় বালেশ্বর শহরে একটা দোকান ক'রে, নাম ইউনিভার্সেল এম্পোরিয়াম—ভার নেন শৈলেশ্বর বোস। আর একটা ছিল কলকাতায় হরী এণ্ড সন্স এটার ভার ছিল হরিকুমার চক্রবর্তীর উপর।

১৯১৪ সালেই বীরেন চট্টোপাধ্যায় ভারতীয় বিপ্লবীদের তরফ থেকে জার্মানীর সঙ্গে এক চুক্তি সম্পন্ন করেন। তার শর্ত ছিল—(১) ভারতীয় বিপ্লবীরা জাতীয় ঋণ হিসাবে জার্মানীর কাছ থেকে অর্থ গ্রহণ করবেন, (২) জার্মানী অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে সাহায্য করবে। জার্মান সামরিক অফিসারগণ শ্যামদেশে এসে ভারতীয় বিপ্লবীদের সামরিক শিক্ষা দেবেন। কিন্তু কোন জার্মান সৈন্য ভারতের দিকে আসবে না।

ব্যবস্থা হয় 'মাভেরিক' জাহাজ জার্মান অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে ভারতে আসবে। তিনটি জায়গায় অস্ত্র নামানো হবে। সুন্দরবনের রায়মঙ্গলে হরিকুমার চক্রবর্তী, উড়িষ্যার বালেশ্বরে যতীন্দ্রনাথ এবং গোয়াতে ভোলানাথ চ্যাটার্জী অস্ত্র গ্রহণের ব্যবস্থা করবেন।

স্থির হয়েছিল বাংলার বাইরে থেকে যাতে ইংরেজ দ্রুত সৈন্য আমদানী করতে না পারে সেজন্য বিপ্লবীরা মাদ্রাজ রেলপথ, পূর্ব রেলপথ এবং বম্বে লাইন উড়িয়ে দেবেন। কলকাতার অস্ত্রাগারগুলি দখল ক'রে ফোর্ট উইলিয়াম দখল করবেন। ফোর্ট উইলিয়ামের ভারতীয় সৈন্যগণ তখন বিপ্লববাহিনীর সঙ্গে যোগ দেবেন কথা দিয়েছিলেন।

মাভেরিকের অস্ত্রশস্ত্র কিন্তু আর পৌঁছাল না। এর পশ্চাতে ছিল বিদেশীদের বিশ্বাসঘাতকতা। আমেরিকাতে চেকোস্লোভাক বিপ্লবীরা ইংরেজ এবং ফরাসীকে খুশী করতে চেয়েছিলেন। তাঁরা ভারতীয় বিপ্লবীদের ভারত-জার্মান ষড়যন্ত্রের খবর জানতেন এবং তাঁরা ইংরেজ দের কাছে সে কথা প্রকাশ ক'রে দিলেন।

ফলে জার্মানীর দেওয়া অস্ত্রশস্ত্র মাভেরিক এসে আর পৌঁছাল না। ওদিকে ভারতে বিপ্লবীদের কেন্দ্রগুলি ইংরেজ একে একে ধ্বংস করে।

তখন কপ্তিপদার মহুলডিহাতে ইংরেজের সঙ্গে একত্রে যুদ্ধ করবার উদ্দেশে যতীন্দ্রনাথ, চিত্তপ্রিয়, নীরেন, মনোরঞ্জন, যতীশ ও নলিনী কর সর্বদা এক সঙ্গে প্রস্তুত থাকতেন। কিছুদিন কোনো খবর না পেয়ে যতীন্দ্রনাথ নলিনী করকে কলকাতা পাঠিয়ে দেন। সেখানে নগেন ভট্টাচার্য ব্যাটাভিয়া থেকে জার্মানদের পাঠানো একটা কাগজের কাটিং নলিনীকে দেন যতীন্দ্রনাথকে দেবার জন্য। কাটিং-এ লেখা

ছিল,—জার্মান অস্ত্রবাহী জাহাজ ধরা পড়ে গেছে। নরেন বললেন যতীন্দ্রনাথ যেন ব্যস্ত না হন, নরেন স্থলপথে পস্ত্রশস্ত্র আনতে চেষ্টা করতে যাচ্ছেন।

যতীন্দ্রনাথ তখন পল গুণে গুণে দিন কাটাচ্ছিলেন অস্ত্রপ্রাপ্তির আশায়। তাই এই মন্দ খবরটা দিতে তাঁরা খুব সঙ্কুচিত বোধ করলেন। নলিনী মহলডিহা ফিরে গিয়ে অত্যন্ত দ্বিধার সঙ্গে যতীন্দ্রনাথকে খবর বলে কাটিংটা দিলেন। যতীন্দ্রনাথ সহজভাবে সমস্ত শুনলেন। তারপর শান্ত চিত্তে বললেন, 'আমরা একটা মস্ত ভুল করতে বসেছিলাম। ভগবান শুধরে দিলেন। আমরা বিদেশের সাহায্যে ভারত স্বাধীন করতে চেয়েছিলাম। দেশ তো নিজের জোরে দাঁড়াবে। অপরের সাহায্যে নয়।' তিনি ভবিষ্যৎ বাণী করলেন। ভবিষ্যতের ছবিটা যেন তাঁর চোখে স্পষ্ট হয়ে ফুটেউঠেছিল। তাই যতীন্দ্রনাথের ব্যস্ত হবার কথা নয়।

নরেন ভট্টাচার্য অস্ত্রের সন্ধানে সেই যে বের হলেন আর ফিরতে পারলেন না। বহু বছর পরে বহু দেশ ঘুরে যখন ফিরলেন তখন তিনি এম, এন, রায়।

ওদিকে কলকাতার হ্যারি এ্যাণ্ড সন্স এবং তারপর বালেশ্বর ইউনিভার্সেল এম্পোরিয়াম তল্লাসি হয় ফলে পুলিশ কল্পিপদার সন্ধান পায়। হরিকুমার চক্রবর্তী ও শৈলেশ্বর বোস গ্রেপ্তার হন। যতীন্দ্রনাথ বুঝলেন এবার আসছে তাঁদের পালা। তিনি বললেন, 'আমরা যুদ্ধ করব এবং মরব'।

তাঁদের টাকা ফুরিয়ে গিয়েছিল। তিনি নলিনীকে ১লা সেপ্‌টেম্বর কলকাতা পাঠালেন টাকা নিয়ে যেতে। নিজেরা অনেক লোক একত্রে আছেন মনে ক'রে নীরেন ও যতীশকে তিনি ৯ মাইল দূরে তালডিহাতে পাঠিয়ে দেন।

ওদিকে দিল্লীর কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা বিভাগের বড় কর্তা ডেনহাম কল্পিপদার দিকে এগোচ্ছে। সঙ্গে বালেশ্বরের ম্যাজিষ্ট্রেট কিন্‌বি বার্ড, টেগার্ট ও সশস্ত্র বাহিনী। সন্ধ্যার আগে তারা কল্পিপদার ডাকবাংলোতে গিয়ে পৌঁছায়। স্থানীয় একটি লোক যতীন্দ্রনাথকে খবর দেয় ডাকবাংলোয় কয়েকটা সাহেব এসেছে। যতীন্দ্রনাথ বুঝলেন ওরা কি উদ্দেশ্যে ওখানে গেছে। তিনি একলা নদী পার হয়ে কল্পিপদার ডাকবাংলোতে গিয়ে নিজের চোখে সাহেবদের দেখে এলেন। দ্রুত ফিরে এসে মণীন্দ্র চক্রবর্তীকে সাবধান ক'রে দিয়ে তিনি তালডিহা চলে গেলেন নীরেন ও যতীশকে আনতে। তাঁদের ফেলে রেখে চলে গেলে তিনি নিরাপদ হতেন। কিন্তু তবু কেবল নিজের নিরাপত্তাকে যতীন্দ্রনাথ ঘৃণা করতেন।

তাঁরা কল্পিপদায় থাকতেন সাধুর বেশে, আশ্রম ক'রে। গ্রামবাসীদের বিপদে তাঁরা ছিলেন বন্ধু, রোগের চিকিৎসক, নিরক্ষরের শিক্ষাদাতা।

ডেনহামরা ৭ই সেপ্‌টেম্বর যতীন্দ্রনাথদের আশ্রমের কাছে যায়। আশ্রম শূন্য। তারা আশ্রয়দাতা মণীন্দ্রনাথের বাড়ীতে গিয়ে তাঁকে প্রশ্ন করতে থাকে —কিন্তু কিছু হদিশ পায় না।

আশ্রমে তল্লাসী চলে। তাতে পেল সেই কাটিংটা এবং যতীন্দ্রনাথের হাতে লেখা একখানি খাতা। এই খাতার লেখা পড়ে সাহেবরা পরে বলেছিল—যে ব্যক্তি এত উচ্চ চিন্তা করতে পারে সে একজন জগৎ নেতা হবার যোগ্য। কিন্‌বি ছাড়া অন্য সাহেবরা বালেশ্বর চলে গেল।

মণীন্দ্রনাথ সারাদিনের হাঙ্গামার পর রাতে একটু খেয়ে শুয়েছেন। রাত প্রায় একটায় পিছনের জানালা দিয়ে যতীন্দ্রনাথ ডাকছেন—দাদা, দাদা।

—কার গলা? কি সর্বনাশ! যদি চলে গেলে তবে আবার ফিরে এলে কেন?

মণীন্দ্রনাথ সারা দিনের খবর বললেন। যতীন্দ্রনাথ একটা বন্দুক এবং পঞ্চাশটা টাকা চাইলেন। মণীন্দ্রনাথ বুঝলেন যতীন্দ্রনাথ একটা লড়াইয়ের জন্য তৈরী হচ্ছেন। মণীন্দ্রনাথ অনুনয় করলেন তাঁরা যেন মেঘাসনী পাহাড়ের আশে পাশে চলে যান, তাহলে বিপদ স্পর্শ করবে না। যতীন্দ্রনাথ দৃঢ়কণ্ঠে বলে উঠলেন, 'শুধু নিজের প্রাণটুকু বাঁচিয়ে রাখার জন্য লুকিয়ে বেড়াব? আজ আমরা নিজেদের পরিচয় দিয়ে যাব'।

যতীন্দ্রনাথ পালাবার পথ খুঁজলেন না। ইংরেজ-শক্তির পিছনে চললেন বালেশ্বরেরই দিকে।

ইংরেজ সরকার এদিকে গ্রামে গ্রামে প্রচার করে দিয়েছে, জার্মান ডাকাত, বাঙ্গালী ডাকাত এসেছে, ধরিয়ে দিতে পারলেই পুরস্কার।

৮ই সেপ্‌টেম্বর বিপ্লবীরা বালেশ্বর পৌঁছে শহর থেকে দূরে গ্রামের ধার দিয়ে মাঠের পথে চললেন। পৌঁছলেন বুড়ী বালাম নদীর তীরে একটা গ্রামে।

ভাদ্রমাসের ভরা নদী। এক মাঝি নদী পার করে দিল। এঁদের জঙ্গলের দিকে যেতে দেখে লোকের সন্দেহ হয়। রব উঠলো—ডাকাত এসেছে। পুরস্কারের লোভে দলে দলে দরিদ্র মানুষ তাঁদের পিছু নিল। মাঝে মাঝে ওঁদের হাঁকা আওয়াজ করতে হয়। অনেকে পালায়, অনেকে দূরে দূরে পেছনে চলে।

৯ই সেপ্‌টেম্বর তাঁরা জামুরা গ্রামে পৌঁছলেন। মাতব্বর রাজমহান্তি এবং সুদানি গিরি লোকজন নিয়ে পথ আটকে দাঁড়াল। মনোরঞ্জন গুলী করেন। রাজমহান্তি মারা যায়, সুদানি আহত হয়। কয়েকজন পুলিশে খবর দিতে গেল।

শেষ রাত্রের শেষ দু'তিন দিন তাঁদের খাওয়া হয় নি, ঘুম ছিল না, বিশ্রাম ছিল না। একটা গ্রাম্য দোকান থেকে টাকা ছেড়কের মতো খেয়ে পাঁচ টাকার নোট দিয়েই দ্রুত চলে গেলেন। টাকা ফেরৎ নেবার সময় কোথায়? আজ যে ভাগ্য পরীক্ষার দিন

চাষখণ্ডের কাছাকাছি গিয়ে একটা তীব্র স্রোতের ছোট নদী পড়লো, হলহলিয়া। যতীন্দ্রনাথরা পাঁচজন সাঁতরে পার হলেন, অস্ত্র এবং গুলী মাথায় পাগড়ীর মতো করে বাঁধা। ছেঁড়া কাপড়পরা একটা গ্রামবাসীও আর এক জায়গা দিয়ে নদী পার হয় একই সময়ে। বিপ্লবীরা তা জানতেও পারলেন না। তাঁরা এগিয়ে গিয়ে একটা প্রকাণ্ড উই ঢিপির পিছনে বসলেন। ওদিকে সেই গরীব লোকটা চুপ করে একটা গাছে উঠে এক টুকরো ছেঁড়া ময়লা কাপড় নেড়ে সংকেত করতে লাগলো। লোকটি হচ্ছে দারোগা চিন্তামণি সাউ।

বেলা প্রায় দু'টোয় খবর পেয়ে বালেশ্বরের ম্যাজিষ্ট্রেট সশস্ত্র পুলিশবাহিনী নিয়ে অগ্রসর হয়। সঙ্গে ছিল চাঁদিপুর প্রুফরেঞ্জের সামরিক অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট গাদারকোর্ড ও তার সৈন্যসামন্ত।

যতীন্দ্রনাথ উই ঢিপির আড়ালে থেকে ওটাকেই ট্রেঞ্চের মতো ব্যবহার করেন। একদিকে পাঁচজন বিপ্লবী অপর দিকে শত শত শত্রু। শত্রুপক্ষ সাঁড়াশির মতো ঘিরে আসছিল অবিরাম গুলী করতে করতে।

শত্রুপক্ষ মশার পিস্তলের সীমানার ভিতরে এসে যাবার পরই যতীন্দ্রনাথরা ট্রেঞ্চের ভিতর থেকে বুকে বুকে গুলী চালান। ইংরেজের সিপাহীরা হতাহত হতে লাগলো। তারপর বৃটিশবাহিনী কাদা মাটিতে শুয়ে পড়লো। মাথা তুললেই গুলী।

বহুক্ষণ খণ্ডযুদ্ধ চলে। এবার টোটা ফুরিয়ে এসেছে। ইংরেজ পক্ষের এক সুবেদার গাছের ডালে উঠে গিয়ে চিত্তপ্রিয়র মাথায় গুলী করে। চিত্তপ্রিয় বীরশয্যা গ্রহণ করলেন।

যতীন্দ্রনাথ বাঁ হাতে চিত্তপ্রিয়কে কোলে নিয়ে ডান হাতে গুলী চালাচ্ছেন। এবার সব টোটা ফুরিয়ে গেছে। এমন সময় যতীন্দ্রনাথ পেটে গুলী বিদ্ধ হয়, তাঁর ডান কনুইতে আগেই গুলী লাগে। যতীশও ভীষণভাবে আহত হন। নীরেন ও মনোরঞ্জন যখন আহতদের নিয়ে ব্যস্ত সেই সময় শত্রু সৈন্য পিছন থেকে গিয়ে তাঁদের ঘিরে ফেলে এবং সবাইকে গ্রেপ্তার করে।

যতীন্দ্রনাথকে বালেশ্বরের হাসপাতালে নিয়ে যায়, তাঁর পেটে অস্ত্রোপচার হয়। কিন্তু পরদিন প্রত্যূষে তিনি দেহত্যাগ করেন।

বিশ্বাসঘাতকতার জন্য যতীন্দ্রনাথদের বিপ্লব প্রচেষ্টা সফল হওয়া সম্ভব হয় নি! কিন্তু পরবর্তী যুগে চট্টগ্রামের বিপ্লবী অভ্যুত্থান ও তখনকার যুগের বিপ্লবী আন্দোলন এবং নেতাজী সুভাষের আই, এন, এ-র সুপরিকল্পিত বিদ্রোহ যতীন্দ্রনাথদের এই বিপ্লব বহ্নি থেকে প্রেরণা লাভ করেছে।

যতীন্দ্রনাথের মৃত্যুতে দেশ যে সেদিন কি ধন হারাল তা কেউ জানতেও পেল না। তাঁর কাছে গেলে সবাই বীর হয়ে উঠতো,—ভয় দুর্বলতা মনে স্থান পেতো না, তড়িৎ গতিতে অসীম সাহস সঞ্চার হ'ত।

বিপ্লবীর এই শোণিতধারায় সিক্তিত হয়ে পরাধীন ভারতের জমি উর্বরা হয়ে উঠেছিল। গান্ধীজী এসে সেই উর্বর জমিতে বপন করা বীজের সন্ধান পেয়েছিলেন। সমস্ত ভারত জুড়ে অহিংসোদ্যম দেখা দিয়েছিল।

ইতিহাসের যাত্রাপথে যাঁদের নিঃশেষে আত্মদান আমাদের এগিয়ে দিয়ে নিজেরা মুছে গেছেন তাঁদের যেন আমরা ভুলে না যাই।

"বীরের এ রক্ত স্রোত, মাতার এ অশ্রু ধারা
এর যত মূল্য সে কি ধরার ধূলায় হবে হারা?
স্বর্গ কি হবে না কেনা?
বিশ্বের ভাণ্ডারী শুধিবে না এত ঋণ?
রাত্রির তপস্যা সে কি আনিবে না দিন?"

We speak of many things parrot-like, but never do them; speaking and not doing has become a habit with us. What is the cause of that? Physical weakness. This sort of weak-brain is not able to do anything. We must strengthen it. First of all, our youngmen must be strong.

—Swami Vivekananda.

॥ মহাবাণী ॥

চিত্র—উড়িষ্যার জঙ্গলে বুড়িবালাম নদীর নির্জন তীর। অদূরে কাপ্তিবাদ পাহাড়। তাহারি শীর্ষে যুদ্ধবন্দী যতীন মুখার্জী মনোরঞ্জন সহচর চিত্তপ্রিয়কে কোলে আশ্রয় দিয়া নীরেন্দ্র, মনোরঞ্জন ও জ্যোতিষ পালের প্রহরায় অপেক্ষমান। শত্রুর গুলীর আঘাতে আপন অঙ্গের উষ্ণ রক্ত ছিটকাইয়া বাহির হইতেছে। বিজয়ী রাজপুরুষ চার্লস্ টেগার্ট জিজ্ঞাসা করিলেন —আপনার কিছু বক্তব্য আছে?

বাংলার বিপ্লব নেতা বাঘা যতীন উত্তর দিলেন —Tell the people of Bengole that I and Chittapriya die in vindicating the honour of Bengal. বাঙ্গালীদের বলুন আমি আর চিত্তপ্রিয় বাংলার সম্মান সমুজ্জ্বল রাখিতে প্রাণ দান করিলাম।

ঘটনা রোমাঞ্চকর। কাহিনী বাংলার বিপ্লবী প্রচেষ্টার একটি খণ্ড ইতিহাসে। কিন্তু, এখানেই কি ইহার শেষ! ঘটনা শেষ হইয়াছে, কাল অনেক পথ অতিক্রম করিয়া সে ঘটনাকে ভুলাইয়াও আনিয়াছে। তবুও জাগ্রত রহিয়াছে বাণী। বাংলার মানস মঞ্চে মহিমান্বিত এই বাণীর প্রবাহ, কি অর্থ বহন করিতেছে তাহাই ভাবিয়া দেখা যাউক।

১৯১৪—১৮ সনের প্রথম বিশ্ব সংগ্রামে বাংলার বিপ্লবী দল বিদ্রোহের যে সুযোগ গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহার অসন্দিগ্ধ উদ্দেশ্য ছিল ভারতবর্ষের স্বাধীনতা, এই বিদ্রোহের আয়োজন ও পরিচালনা অবিসংবাদিত নেতা ছিলেন যতীন মুখোপাধ্যায়।

মৃত্যুর নিশ্চিন্ত দুয়ারে বসিয়া অকম্পিত কণ্ঠে তিনি ঘোষণা করিলেন—বাঙ্গালীকে বল আমি এবং আমার সহযাত্রীরা বাংলার সম্মান প্রতিষ্ঠায় প্রাণ আহুতি দিলাম। কি সর্বনাশা বাণী! বিশাল ভারতবর্ষের স্বাধীনতার পুরোহিত ভারতবর্ষের নাম উচ্চারণ করিলেন না, ভারতবাসীদের ডাকিয়া শুনাইলেন না তিনি স্বাধীনতার যুদ্ধে প্রাণ দিলেন, তিনি বলিলেন না ভারতবাসীদের তাঁহার অসমাপ্ত কার্য স্কন্ধে লইয়া অগ্রসর হইতে! তিনি বলিলেন বাংলার সম্মান প্রতিষ্ঠার কথা, বলিলেন কেবল বাঙ্গালীকেই এবং দেখাইয়া গেলেন প্রাণদানই তাহার একমাত্র পথ।

অহঙ্কার দিয়া এই দর্পিত বাক্য স্পর্শ করিতে চাহিলে সংঘর্ষের জ্বালা, ঈর্ষার অনল আপনি জ্বলিয়া উঠিবে। শ্রদ্ধার মন দিয়া, বিনীত প্রশ্ন দিয়া এই সত্য ভাষণের অর্থ খুঁজিলে মিলিবে এক অপচিত রহস্য। ভাবী ভারতের রঙ্গ মঞ্চে বাংলা প্রাণ কেন্দ্র, বাঙ্গালী কর্মনায়ক এবং সর্বাত্মক বাংলার সম্মান মহামানবসভ্যতার নব রূপ প্রকাশের পরিপূর্ণ উৎস। একটি সামান্য বাক্যের অন্তরালে ভবিষ্যতের বিপুল এক সম্ভাবনা নিহিত রহিয়াছে। ইহার উদ্ঘাটন বিলম্বিত হইলেও ইহা অবশ্যম্ভাবী এবং অনিবার্য। এই হেতু ইহা শুধু বাণীই নয়, ইহা মহাবাণী।

পরিচয়—ভারতবর্ষের বিশাল ভূখণ্ডে মুসলমান আমলের শেষের দিকে খণ্ড খণ্ড রাজ্যের রাজনীতি

এবং সমাজ চেতনা যে পর্যায়ে পৌঁছাইয়া ছিল তাহাতে আজ স্বীকার করিতে দ্বিধা নাই যে ইংরেজ অধিকার ভাবী ভারতের পক্ষে এক কল্যাণকর সার্থকতার ইঙ্গিৎ বহন করিয়াছিল। ইংরেজ আসিল বাংলায়, আসন স্থাপন করিল বাংলায় এবং অতি অল্প কালের মধ্যেই সখ্য করিল বাঙ্গালীর সঙ্গে। ইংরেজের সান্নিধ্যে এবং সাহচর্য্যে বাঙ্গালী এক নতুন জগতের বার্ত্তা আবিষ্কার করিল। দেশ এক, জাতি এক, রাষ্ট্র এক এবং তাহার মুক্তি স্বাধীনতায়। সচেতন সত্তায় ইহার পরিপূর্ণ প্রকাশ না হইলেও অবচেতনের আহ্বানে বাঙ্গালী ইহাই গ্রহণ ও পালন করিতে আরম্ভ করিয়া দিল। শুধু তাহাই নয়, যে সামাজিক অধিকার ও স্বাধীনতার স্বাদ ইংরেজ আপন ভূমিতে ভোগ করে বাঙ্গালী তাহাও উপলব্ধি করিয়া আপন সত্তায় ও আপন পরিবেশে তাহা বিকশিত করিয়া তুলিতে উদ্বুদ্ধ হইল। ইহাই বাংলা ও বাঙালীর মৌলিক গুরুত্ব। ইংরেজ একথা বুঝিয়াছিল এবং বুঝিয়াছিল বলিয়াই বঙ্গ-ভঙ্গের পরিকল্পনা করিয়াছিল। বাঙ্গালী বিভক্ত বাংলা যুক্ত করার সংঘর্ষের মধ্য দিয়া তাহার অন্তিত সাধনার অভিব্যক্তি দিল সর্বভারতের সম্মুখে। বাংলা মুক্ত হইল। পরম বিস্ময়ে সর্ব্বভারত তাহাই অবলোকন করিল। পরম শ্রদ্ধায় সর্ব্বভারত বাঙ্গালীকেই নেতৃত্বের পুরোভাগে বরণ করিয়া লইল। ভারতের মনিষীর মুখে সেদিনই উদ্ভাসিত হইল—বাঙ্গালী আজ যাহা ভাবে সারা ভারত তাহাই অনুমনন ও অনুসরণ করে পরের দিন।

বঙ্গ-ভঙ্গের পরিকল্পনার আঘাত বাঙ্গালী বুক পাতিয়া লইয়াছিল আপন অঙ্গে এবং আপন তপস্যায় অভীপ্সিত লাভ করিয়াছিল আপন সীমা-রেখায়। কিন্তু সেদিনের আন্দোলনের তরঙ্গ সর্ব-ভারতের রক্তে নাচন লাগাইয়া দিল। নিদ্রা ভাঙ্গিল মহাভারতের। প্রকাশিত হইল একটি অজ্ঞাত রহস্য, বাংলার নিদ্রা, ভারতের নিদ্রা, বাংলার জাগরণ ভারতের জাগ্রতি। বাংলা ভৌগো-লিক পরিমাপে অবশ্যই একটি বিশেষ স্থান। কিন্তু তবুও ইহাই ভারতের একটি অজ্ঞেয় অব্যক্ত বিশেষ অন্তরঙ্গ, ভূগোলে যাহার নির্দেশ নাই। বাঙালী একটি জাতি যাহার ঐতিহাসিক একটি পরিচয় আছে তবুও তাহা ভারতীয় জাতির একটি অভাজ্য এবং গূঢ় মানস অংশ, ইতিহাসে আজও যাহার সন্ধান দিতে অক্ষম। ভারতবর্ষের আর্থিক পটভূমিতে ইহাই বাংলার এবং বাঙালীর রহস্যময় পরিচয়।

এই সূত্র অবলম্বন করিয়া অগ্রসর হইলে আরও একটি রহস্য উদ্ঘাটিত হইবে যে বাংলায় বাঙালীর হৃদয় যে অনুভূতি গ্রহণ ও বহন করে তাহা দেশগত কালগত বা ব্যক্তিগত গণ্ডীর অবর্তে বর্ণায়মান নয়। বাংলার হৃদয় সর্বদেশ, সর্বকাল এবং সর্বব্যক্তির ব্যাপক স্পন্দন গ্রহণের এক অপূর্ব প্রসারতা অর্জন করিয়াছে। বাংলার অনুভূতি, ভারতের অনুভূতি। ভারত বাংলার বহিরংগ। মননশীলতা তাহার আর এক অধ্যায়। বাংলার মন অনুসন্ধানের আলোকে ভাবী পরিণতির যে পথ অনায়াসে অবলোকন করে তাহাও সর্বাত্মক কল্যাণের অনাবিল পন্থা। ধ্যানী বাংলার দ্রষ্টা মন দর্শন করে, সর্বভারত তাহাই অংগীকার করিয়া লয়। বাংলার এ অধিকার আকস্মিক নয়। ভারত আত্মার আত্মবিকাশের ইহাই অনুক্রমিক পরিণতি।

ইংরেজ রাজত্ব অপসারণের বীজ প্রথম বপন করা হয় বাংলায় ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে। সেদিনের আশায়

ভাবায়, কল্পনায় ও কর্মে যে প্রতিশ্রুতি জাগাইয়া তুলিয়াছিল ১৯৫৫ সনের ভারতবর্ষ কি তাহা সফল করিয়াছে? উত্তর—না। ইংরেজ চলিয়া গিয়াছে। ভারতবর্ষ স্বাধীন রাজশক্তি পরিচালনার অধিকার লাভ করিয়াছে। তাহার খ্যাতি দেশ-দেশান্তরে বিস্তৃত হইয়াছে। কিন্তু তথাপি ভারতবর্ষ ১৯০৫ সনের পশ্চাতেই পড়িয়া রহিয়াছে। দেশ এক না হইয়া, হইয়াছে বিভক্ত জাতি এক না হইয়া হইয়াছে শতধা, রাষ্ট্র এক না হইয়া, হইয়াছে একাধিক। বিভক্ত হইয়াই স্বাধীনতা আসিয়াছে, মুক্তি এখনও দৃষ্টি সীমার অনেক দূরে আবৃত। এই পরাজয়ের আড়ালে নিহিত রহিয়াছে শেষ রহস্য। বাংলার মর্য্যাদার সার্বজনীন স্বীকৃতিই এই রহস্য। বাংলার সর্বব্যাপক অনুভূতি ভারতবর্ষ স্বীকার করিয়াছে! বাংলার সর্বগ্রাহী চিন্তাও ভারতবর্ষ অংগীকার করিয়াছে। বরণ করিয়া লয় নাই কেবল বাংলার সর্বাত্মক সম্মান। এই মহৎ সম্মানকে স্বপ্রতিষ্ঠ করিয়া তুলিবার দায়িত্ব একমাত্র বাংগালীই বহন করিতে পারে। নির্ভয় আত্মদানই তাহার পথ—একমাত্র পথ। লোভ সে পথে সন্দেহ জন্মাইতে পারে না, মোহ পারে না সে পথে প্রাপ্তি আনিতে; মদ সে পথে ঔদ্ধত্য জাগাইতে অপারগ; মাৎসর্য এ পথে বিভেদ সৃষ্টি করিতে অক্ষম। বাক্তির সমস্ত পশ্চাৎ নিশ্চিন্তে মুছিয়া ফেলিয়া জাতির সম্মান প্রতিষ্ঠার এমনই এক অপরিচিত পথে, নির্জন নদীতীরে শক্র পরিবেষ্টিত; অজ্ঞাত পর্বত শৃঙ্গে জাতির মুক্তি নায়ক বলিতেছেন—বাংগালীকে বল বাংলার সম্মান প্রতিষ্ঠা করিতে বাঙালী আমরা প্রাণ আহুতি দিলাম।

মানব সভ্যতার ক্রম বিকাশ পর্য্যবেক্ষণ করিলে ইতিহাস সাক্ষ্য দেবে যে, কোন এক বিশেষ স্থান, কোন এক বিশেষ কাল কিম্বা কোন এক বিশেষ জাতি ইহার নিয়ামক নয়। বিভিন্ন কালে বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন জাতির বিশেষ চেতনার মধ্য দিয়াই এক অব্যাহত উন্মেষের ধারা আত্মপ্রকাশ করিয়া যাইতেছে। ভারতীয় সভ্যতার পরিণতি ও এই পদ্ধতিই অনুসরণ করিতেছে। ভবিষ্যৎদর্শীরা বলেন, পূর্ব হইতেই সুনির্দিষ্ট এক পরিকল্পনা স্থানে, কালে ও পাত্রে প্রকাশিত হইতেছে। ভারতীয় সভ্যতার পরিপূর্ণ প্রকাশের সেই চিহ্নিত স্থান বাংলা, কাল অদূর ভবিষ্যৎ এবং পাত্র জাতীয়তা অভিমানী বাঙালী। আমাদের নিত্য পরিচয়ে বাংলাকে আমরা এ চোখে দেখি না। দেখিতে জানি না। যাঁহারা বাংলার এই ভাবী মূর্তি নিরীক্ষণ করিয়াছেন তাঁহাদের বন্দনা এবং অভিনন্দন দৃঢ় প্রত্যয় দ্বারা ঘোষণা করিতেছে এ সত্য ধ্রুব। শ্রীঅরবিন্দ বাংলার বিপ্লব মন্ত্রের প্রথম উদ্গাতা—দেহান্তরের অব্যবহিত পূর্বে প্রচার করিয়াছেন—সর্ব ভারতের ভার স্কন্ধে লইয়া বংগ জননী জাগিতেছেন। ঋষির ভাষা এবং নেতার ভাষা বাক্য যোজনায় বিভিন্ন হইলেও অর্থ উপলব্ধিতে উহা এক এবং অভিন্ন।

১৯১৫ সালের ৯ই সেপ্‌টেম্বর একটি মহাক্ষণ। বাঘা যতীনের বিদায় বাণী এক মহাবাণী। পরিপূর্ণ শ্রদ্ধায় আমরা প্রার্থনা করি আমাদের জীবন লীলার এই বাংলার পবিত্র অংগ জুড়িয়া মহাবাক্যের পূর্ণ অভিব্যক্তি। তরঙ্গে তরঙ্গে ইহাই উদ্বেলিত হইয়া প্লাবিত করুক সর্বভারত। মানুষের মুক্তি সাধনার অমোঘ মন্ত্রের জয় হোক।

স্বাধীনতা আন্দোলনে বর্ষপঞ্জী

১৭৫৭—পলাশীর যুদ্ধ। বৃটিশ শাসনের গোড়া পত্তন। ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ।

১৭৫৯—জুলাই : গভর্নর হলওয়েলকে লিখছেন মেজর ওয়াট্‌স্ বর্ধমান থেকে, এখানকার ৫০০০ প্রজা বিদ্রোহ করেছে। তারা কোম্পানীর কোষাগার দখলের চেষ্টা করেছিল।

১৭৬০—বীরভূমের জমিদার আসাদ জামানখান বিদ্রোহ করেন। বর্ধমানের রাজার সঙ্গে মিলিত হয়ে বিদ্রোহীবাহিনী মুর্শিদাবাদের দিকে অগ্রসর হয়।

১৭৬১—জানুয়ারী, মেজর ওয়াট্‌স্ এবং হোয়াটারের নিকট আসাদ পরাজিত।

১৭৬৪—কোম্পানীর ডিরেক্টরদের নিকট গভর্নর ভ্যান্সিটার্টের পত্র 'খাজনা আদায়ের ব্যাপারে মেদিনীপুরের জমিদারগণ আমাদের বাধা দিচ্ছে। আমাদের শত্রুদের সঙ্গে মিলে তাঁরা বিদ্রোহ করছে। স্থানীয় অধিবাসীরা তাদের পক্ষে।

১৭৬৫—নদীয়ার রাজা কর দেওয়া বন্ধ করেন। কোম্পানীর এজেন্ট মিঃ লিউক প্রস্তাব করেন, রাজার জাতি নাশ করে কর আদায় করা হউক।

১৭৬৫—ঘাটশীলার রাজার বিদ্রোহ। ঝাড়গ্রামের রাজারা তার সঙ্গে যোগ দিয়েছেন। বিদ্রোহ দমনে লেফটেনাণ্ট এাণ্ডর্সন প্রেরিত। ঘাটশীলার রাজা বললেন, 'আমার রাজ্যে আমি ফিরিঙ্গিদের প্রবেশ করতে দেব না।'

১৭৬৭—২রা মার্চ, প্রবল বাধাদানের পরে ঘাটশীলার পতন।

১৭৬৮—ঘাটশীলার সঙ্গে ইংরেজদের সন্ধি। পূর্ব রাজার ভ্রাতুষ্পুত্র জগন্নাথ ধল নূতন রাজা। তিনি কর দেওয়া বন্ধ করলেন।

১৭৬৮—জুন, জেনারেল কক এবং ক্যাপ্টেন মর্গাণ ঘাটশীলা আক্রমণ করেন। প্রজারা সকলে রাজার পক্ষে যুদ্ধ করে। ইংরেজ বিপন্ন। 'জেনারেলগণ' কলকাতায় লিখছেন 'শত্রুসৈন্য ভীমকলের ঝাঁকের মত হানা দিয়েছে।'

১৭৭৪—শেষ পর্যন্ত ইংরেজ কর্তৃপক্ষ জগন্নাথকেই রাজা স্বীকার করতে বাধ্য হন।

১৭৭১-১৭৮৪—মানভূমে চুয়াড় বিদ্রোহ বিদ্রোহী নেতা শুবল সিংহকে দমনের জন্য ক্যাপ্টেন কার্টমির, লেফটেনাণ্ট 'গণ' ও লেফটেনাণ্ট ইয়ঃ এবং মেজর এফোর্ডের চেষ্টা। ১৭৮৪ সাল পর্যন্ত বিদ্রোহ চলে।

১৭৮৩—১৮ই জানুয়ারী রংপুর বিদ্রোহ। কোম্পানীর ডিরেক্টরদের নিকট মিঃ হ্লাণ্ডের পত্র—'বিভিন্ন অঞ্চলের প্রজাগণ সমবেত হয়ে তেপা নামক স্থানে দীর্জেনারায়ণকে বিপুল জয়ধ্বনির মধ্যে আপনাদের রাজা বলে নির্বাচিত করেছে।

১৭৮৪—২রা এপ্রিল, বড়লাট ওয়ারেন হেষ্টিংসে কোম্পানীর নিকট লিখলেন 'বক্সার থেকে বারানসী পর্যন্ত আমি শুধু জনসাধারণের অসন্তোষের গুঞ্জনই শুনেছি। পরিপূর্ণ ধ্বংসের ছবি ছাড়া আর কিছুই দেখছি না।'

১৭৮৪—কোম্পানীর ডিরেক্টরদের নিকট হেষ্টিংসের কাউন্সিলরদের পত্র 'দেশের সত্যিকার অবস্থা আর গোপন করা চলে না। কোম্পানীর কর্মচারীদের অসদাচরণের জন্য এই সমৃদ্ধ ও ঐশ্বর্য্যপূর্ণ রাজ্য ধ্বংস ও ভিক্ষাবৃত্তির দ্বারে এসে দাঁড়িয়েছে।'

১৭৮৭—শ্রীহট্টের রাজা রাধা রাণের বিদ্রোহ।

১৭৮৯—বিষ্ণুপুরের রাজা ও প্রজার মিলিত বিদ্রোহ।

১৭৯৯—অযোধ্যার নবাব ওয়াজীর আলির বিদ্রোহ। ঢাকার নবাব এবং মুর্শিদাবাদের নবাব বিদ্রোহের সামিল। বিদ্রোহে সাহায্য করার অপরাধে সারনাথের জগৎ সিংহ এবং বারানসীর শিবদেবের ফাঁসী।

১৮০৮—১২—বুন্দেল খণ্ডে বিদ্রোহ।

১৮১০—১১—বারানসীতে কর বৃদ্ধির বিরুদ্ধে আন্দোলন।

১৮১৭—১৮—উড়িষ্যায় পাই বিদ্রোহ।

১৮২৯—৩৩—আসামে খাসিয়া বিদ্রোহ।

১৮৩২—মানভূমে বিদ্রোহ।

১৭৮০—১৮২০—বিক্ষিপ্ত গণবিদ্রোহ, বৃটিশ শক্তির বিরুদ্ধে বিক্ষিপ্ত ও খণ্ড খণ্ড বিদ্রোহ-রাড়গ্রাম, বিষ্ণুপুর, কর্ণগড়, সন্ন্যাসী বিদ্রোহ, চুয়াড় বিদ্রোহ, বরকন্দাজ বিদ্রোহ, পিণ্ডারী যুদ্ধ, ভিজুমীরের বিদ্রোহ, নীলকর বিদ্রোহ এবং সাঁওতাল বিদ্রোহ।

১৮২৭—বৃটিশ শাসনের বিরুদ্ধে শিক্ষিত যুবক শ্রেণীর আত্মপ্রকাশ। জুরী আইন পাশ—বিধান খ্রীষ্টান জুরী হিন্দু-মুসলমান অপরাধী সম্পর্কে অভিমত জ্ঞাপন করতে পারবে কিন্তু খ্রীষ্টান অপরাধী সম্পর্কে হিন্দু-মুসলমান জুরী অভিমত জানাতে পারবে না।

আইনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানালেন রামমোহন। তিনি বললেন, 'রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে এ বৈষম্য মেনে নেওয়া হিন্দু মুসলমানের পক্ষে অসম্ভব। বৈষম্য যদি চলতে থাকে, তবে ইউরোপীয় জ্ঞান লাভের ফলে শতবর্ষ পরে হলেও এমন একদিন আসবে, যখন ভারতবাসী একযোগে এই অন্যায়ের ও গর্হিত আইনগুলির বিরুদ্ধে লড়বে, এবং সে লড়াইএ তারা জয়যুক্ত হবে। ভারতবর্ষ আয়ার্ল্যাণ্ড নয় যে দুই চারখানা রণতরীতে সৈন্য পাঠিয়েই তাদের সায়েস্তা করা যাবে।' ডিরোজিও কর্তৃক নব্য ভাবধারা প্রচার। ফরাসী বিপ্লবের সাম্য, মৈত্রী এবং স্বাধীনতার আদর্শে উৎসাহদান। 'ফকির অব 'জাঙ্গিরা' ইংরেজী কাব্য প্রকাশ।

স্বদেশ আমার কিবা জ্যোতির মণ্ডলী
ভূষিত ললাট তব। অস্তে গেছে চলি
সেদিন তোমার হায়, সেই দিন যবে
দেবতা সমান পূজ্য ছিলে এই ভবে।

ইংরেজী থেকে বাংলা অনুবাদ করেন দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর। ডিরোজিও শিষ্যবৃন্দ, রামগোপাল ঘোষ, রাধানাথ সিকদার, রামতনু লাহিড়ী, প্যারীচাঁদ মিত্র, শিবচন্দ্র দেব, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, রসিককৃষ্ণ মল্লিক, হরচন্দ্র ঘোষ—সত্যানুসন্ধিৎসা ও পাপের প্রতি ঘৃণার আদর্শ প্রচার।

পরবর্ত্তীকালে বঙ্কিমচন্দ্র বলেন, বাঙ্গালীকে যাহারা স্বদেশ প্রেম শিখাইয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে রামগোপাল ঘোষ অন্যতম।

১৮৩০—রামমোহনের বিলাতযাত্রা। যাত্রাপথে উত্তমাশা অন্তরীপ পৌঁছেই ফরাসী জাহাজে দেখলেন ফরাসী বিপ্লবের ত্রিবর্ণ রঞ্জিত পতাকা। ভাঙ্গা পা নিয়ে গিয়ে অভিবাদন করলেন।

কলিকাতায় মনুমেন্টের পাদদেশে রামমোহনের উদ্যোগে ত্রিবর্ণ রঞ্জিত ফরাসী বিপ্লবের পতাকা উত্তোলন। বাস্তিল দিবস উদযাপন। এই আদর্শেই জাতীয় কংগ্রেসের পতাকা এবং স্বাধীন ভারতের পতাকা পরিকল্পনা করা হয়।

১৮৩৩—ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর নূতন সনদ। কোম্পানীর ঋণ ভারতের স্কন্ধে চাপানো হল। সভ্যতা বিস্তারের নামে খৃষ্টান মিশনারীদের হাতে ভারতীয় রাজস্ব থেকে ধর্মপ্রচারের জন্য অর্থ অর্জন করার ব্যবস্থা হল।

১৮৩৫—৫ই জানুয়ারী কলকাতায় টাউন হলে প্রথম প্রতিবাদ সভা। রসিককৃষ্ণ মল্লিক বললেন, এই আইন ভারতবাসীর উপকারের জন্য বিধিবদ্ধ হয় নি, কোম্পানীর অংশীদার এবং ইংরেজ জাতীর উপকারের জন্যই এরূপ আইন করা হয়েছে। কোম্পানীর ব্যবসাগত ঋণের বোঝা ভারতীয় রাজস্বের উপর চাপানোকে আমি সম্পূর্ণ অসঙ্গত মনে করি। আইনে এই মর্মে বলা হয়েছে যে, বড়লাট ইচ্ছা করলে, বিলাতের কর্তাদের অনুমতি নিয়ে চার্চ অব ইংলণ্ড এণ্ড আয়ারল্যাণ্ড ও চার্চ অব স্কটল্যাণ্ড ব্যতিরেকে অন্যান্য যাজক সম্প্রদায়কেও এ দেশীয়দের খৃষ্টতত্ত্ব শেখাবার জন্য এবং গির্জাদি নির্মাণের জন্য অর্থ সাহায্য করতে পারবেন। এর দ্বারা কি এই কথাই স্পষ্ট বুঝায় না যে, ভারতবাসীদের কাছ থেকে টাকা নিয়ে তা এমন একটি মর্মে তাদের দীক্ষা দানে ব্যয়িত হবে যে ধর্মকে তারা মোক্ষলাভের পক্ষে সম্পূর্ণ অভিকর বলে মনে করেন। একি ন্যায্য? একি সঙ্গত? বড়লাটের অবাধ ক্ষমতার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। মিঃ ডিকেন্স আপনাদের বুঝিয়ে দিয়েছেন, ইংল্যাণ্ডের আগেকার দিনের সর্বাপেক্ষা স্বেচ্ছাচারী রাজার চেয়েও ইনি ক্ষমতাশালী। তাঁর ক্ষমতা সংযত করার উপায় কি?

১৮৩৫—১৫ই সেপ্টেম্বর বড়লাট স্যার মেটকাফ্ মুদ্রাযন্ত্র আইন জারী করে মুদ্রাযন্ত্রকে স্বাধীনতা দেন।

১৮৩৬—প্রসন্নকুমার ঠাকুর, দ্বারকানাথ ঠাকুর, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত প্রভৃতির উদ্যোগে প্রথম রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান 'বঙ্গভাষা প্রকাশিকা সভা' প্রতিষ্ঠা। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের সংবাদ প্রভাকর প্রত্রিকা এই সময়ে প্রকাশিত হয়। বাংলাদেশে দেশাত্মবোধের উন্মেষে সংবাদ প্রভাকরের দান অসামান্য।

ভ্রাতৃভাব ভাবি মনে দেখ দেশবাসিগণে
প্রেমপূর্ণ নয়ন মেলিয়া
কতরূপ স্নেহ করি দেশের কুকুর ধরি
বিদেশের ঠাকুর ফেলিয়া।

১৯৩৮—তারাচাঁদ চক্রবর্তী, প্যারীচাঁদ মিত্র, রামগোপাল ঘোষ প্রভৃতির উদ্যোগে শিক্ষা ও সংস্কৃতি মূলক প্রতিষ্ঠান জ্ঞানোপার্জিকা সভা প্রতিষ্ঠিত।

১৮৪২—এপ্রিল 'বেঙ্গল স্পেক্টেটর' মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত। সংবাদপত্র দ্বারা নিঃস্বার্থ দেশ সেবার প্রথম প্রচেষ্টা।

১৮৪৩—৮ই ফেব্রুয়ারী: জ্ঞানোপার্জিকা সভার অধিবেশনে দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় কর্তৃক বঙ্গদেশে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ফৌজদারী আদালত এবং পুলিশ সম্পর্কে প্রবন্ধ পাঠ। প্রবন্ধ পাঠ কালেই হিন্দু কলেজের অধ্যক্ষ রিচার্ডসন মন্তব্য করলেন কলেজ ভবনকে আমি রাজদ্রোহের আস্তানায় পরিণত হতে দিব না। ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া পড়ে States-man পত্রিকা লিখল এরূপ রাজদ্রোহমূলক বক্তৃতা

বাটাভিয়া বা ম্যরীশাসে দিলে বক্তাকে নির্বাসন দণ্ডে দণ্ডিত করা হত।

১৮৪৩—২০শে এপ্রিল 'বেঙ্গল বৃটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটি' প্রতিষ্ঠিত। ইংরেজ ও ভারতীয়দের যৌথ প্রতিষ্ঠান।

১৮৪৯—বড়লাটের আইন সচিব জন ড্রিঙ্ক ওয়াটার বীটন (বেথুন সাহেব) কর্তৃক মফঃস্বলে ইউরোপীয়দিগকে আইন ও শৃঙ্খলার মধ্যে আনয়নের জন্য নূতন আইন প্রণয়ন, উদ্দেশ্য—ইউরোপীয়দের অধিকারের সীমানা নির্দেশ এবং সরকারী কর্মচারী-সংরক্ষণ। অধিকার সংকোচের আভাসে এদেশীয় ইউরোপীয় সমাজ ক্ষিপ্তপ্রায়, তারা নূতন আইনের নাম দিল ব্ল্যাক এ্যাক্ট (Black Act)বা কালো আইন। প্রতিবাদের ফলে আইন বিধিবদ্ধ হইল না।

নীলকর আন্দোলন অক্ষয়কুমার দত্ত, হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রভৃতি।

১৮৫৬—যশোহরের বিষ্ণুচরণ বিশ্বাস এবং দিগম্বর বিশ্বাস দুই ভাই-এর নেতৃত্বে ৫০ লক্ষ চাষী একযোগে নীল চাষ বন্ধ করল। হরিশ্চন্দ্র নীলকরদের দুঃখ দুর্দশার কথা জনসমক্ষে প্রচার করেন। অক্ষয় কুমার দত্ত তত্ত্ববোধনী পত্রিকায় নীলকরদের অত্যাচার সম্পর্কে প্রচার করতে থাকেন। ফলে নীল কমিশন বসল এবং নীলচাষ বন্ধ হল।

১৮৫০—৬০—নীলকর আন্দোলনের সময়। ১৮৬০ সালে হরিশ্চন্দ্রের মৃত্যুতে বাঙ্গালী কবিতায় তারা দুঃখ প্রকাশ করল।

নীলকরে সোনার বাংলা করল এবার ছারখার।
অদমনে হরিশ মরল লঙ এর হল কারাগার।

১৮৫৭—সিপাহী বিদ্রোহ। ব্যারাকপুরে মঙ্গল পাণ্ডের ফাঁসী, দুই বৎসর ধরে ইংরেজের সঙ্গে সংগ্রাম।

১৮৫৮—রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের পদ্মিনী কাব্য প্রকাশ।

স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায় হে কে
বাঁচিতে চায়
দাসত্ব শৃঙ্খল বল কে পরিবে পায় হে কে
পরিবে পায়।

১৮৬০—দীনবন্ধু মিত্রের নীলদর্পণ প্রকাশ। মেঘনাদ বধ প্রকাশ।

১৮৬১—জাতীয় গৌরব সম্পাদনী সভা। সুপ্রভাত, সুরজনী প্রভৃতি দ্বারা সম্ভাষণ আরম্ভ। নব্যদলে বাংলা কথনকালে ইংরেজী কথা উচ্চারণ নিষিদ্ধ হল। অমান্যে ১ পয়সা অর্থদণ্ড। স্বদেশী শিল্পের উন্নতি। সাহিত্যের বিকাশ। সঙ্গীত অনুশীলন, দেশীয় কুস্তী প্রভৃতির পুনর্বিকাশ।

১৮৬২—১৮ই জানুয়ারী বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদ গঠিত।

১৮৬৪—বঙ্কিম সাহিত্যের আবির্ভাব।

১৮৬৭—হিন্দুমেলা ঠাকুর বাড়ীর উদ্যোগে। কলিকাতায় বেলগাছিয়া পাতিপুকুরে প্রথম অধিবেশন। সত্যেন্দ্রনাথ কর্তৃক প্রথম জাতীয় সঙ্গীতের পরিকল্পনা—'মিলে সব ভারত সন্তান এক তান এক প্রাণ গাও ভারতের যশো গান'। হিন্দু জাতিকে এক করা এবং ভারতীয়দের সর্বতোভাবে আত্মনির্ভর করা ছিল হিন্দু মেলার উদ্দেশ্য। মেলার দ্বিতীয় অধিবেশনে গনেন্দ্রনাথ ঠাকুর এর উদ্দেশ্য প্রসঙ্গে বলেন 'আমাদের এই মিলন সাধারণ ধর্মকর্মের জন্য নহে। কোন বিষয় সুখের জন্য নহে। কোন আমোদ-প্রমোদের জন্য নহে, ইহা স্বদেশের জন্য ইহা

ভারতভূমির জন্য।' এই অধিবেশনেই নাট্যকার মনমোহন বসু বলেন, ভারতবাসীর মধ্যে ঐক্যবোধ বৃদ্ধি। তাঁদের সামাজিক উন্নতি, শিক্ষা, সাহিত্য, শিল্প, সঙ্গীত, স্বাস্থ্য প্রভৃতির, উন্নতি মেলার লক্ষ্য। আর এ সকলের লক্ষ্য রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভ।

১৮৭০—হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভারত সঙ্গীত প্রথম প্রকাশিত ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের এডুকেশন গেজেট পত্রিকায়।

বাজরে শিঙ্গা বাজ এই রবে
শুনিয়া ভারতে জাগুক সবে
সবাই স্বাধীন এই বিপুল ভবে,
সবাই জাগ্রত মানের গৌরবে
ভারত শুধুই ঘুমায়ে রয়।

কবি এই কবিতায় ভারতের পরাধীনতার মুক্তির উপায়ও বলে দিলেন।

দেব আরাধনে ভারত উদ্ধার
হবে না হবে না, খোল তরবার।
এই সব দৈত্য নহে তেমন
তূনীর কৃপানে করগে পূজা।

১৮৭২—সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সিভিল সার্ভিস থেকে বিতাড়িত।

১৮৭৬—ভারতের স্বাধীনতা অর্জনের উদ্দেশ্যে প্রথম গুপ্ত সমিতি। সঞ্জীবনী সভা প্রতিষ্ঠিত। গুপ্ত সাংকেতিক ভাষায় নাম হাফু পামু হাফ, সভাপতি রাজনারায়ণ বসু। সভ্য জ্যোতিরিন্দ্র নাথ, রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি।

সুরেন্দ্রনাথের উদ্যোগে যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ কর্তৃক ম্যাটসিনি ও গ্যারিবল্ডীর জীবনী প্রকাশিত। I am a vowed discipline of magazine সুরেন্দ্রনাথ।

১৮৭৭—অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষা—দীক্ষাদাতা শিবনাথ শাস্ত্রী। দীক্ষিত—বিপিনচন্দ্র পাল, সুন্দরী মোহন দাস, তারা কিশোর রায় প্রভৃতি।

অগ্নিকুণ্ড প্রদক্ষিণ করে বক্ষরক্তে স্বাক্ষর করে আজীবন স্বাধীনতার ব্রত পালনের অঙ্গীকার। লোকশিক্ষা প্রচারের ব্রত গ্রহণ। সরকারী চাকুরী গ্রহণ না করার প্রতিজ্ঞা গ্রহণ। ব্যক্তিগত সম্পত্তি অর্জন বা রক্ষা না করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ। বৃটিশ বিরোধী প্রকাশ্যে আন্দোলন। নূতন সিভিল সার্ভিস আইনের বিরোধীতা। সুরেন্দ্রনাথ সমগ্র উত্তর ভারত ভ্রমণ করে আইনের বিরুদ্ধে জনমত গঠন করেন। এরপর সুরেন্দ্রনাথের উদ্যোগে কলকাতায় সর্ব-ভারতীয় জাতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার সূচনা।

১৮৭০-৮০—ভারতীয় জীবনে এক কর্মচাঞ্চল্যের যুগ। হেমচন্দ্রকে অনুসরণ করে বহু বঙ্গকবি ও নাট্যকার ভারতমাতার দুর্দশার কাহিনী ছন্দে এবং কথায় গ্রথিত করেন।

১৮৭৪—মনমোহন বসু লিখেছেন—

দিনের দিন সবে দীন, ভারত হয়ে পরাধীন।
অন্নাভাবে শীর্ণ, চিন্তা জ্বরে জীর্ণ, অনশনে তনুক্ষীণ।

এলাহাবাদ প্রবাসী কবি গোবিন্দচন্দ্র রায় গাইলেন—

কতকাল পরে বল ভারতরে
দুঃখসাগর সাঁতারী পার হবে?

১৮৭৪—'অবলাবান্ধব' দ্বারকা নাথ গঙ্গোপাধ্যায় বীর নারী প্রকাশিত হয়।

কবি গাইলেন—

সোনার ভারত আজি যবনাধিকারে
ভারত সন্তান বক্ষ ভাসে অশ্রুধারে।

উপেন্দ্রনাথ দাস বিরচিত সুরেন্দ্র বিনোদিনী নাটকও প্রকাশিত হয়।

কবি গাইলেন—

হায় কি তামসী নিশি ভারত মুখ ঢাকিল
সোনার ভারত আহা ঘোর বিষাদে ডুবিল।

১৮৭১—ওয়াহাবী নেতা আবদুল আমীর খাঁ তিন আইনে যাবজ্জীবন নির্বাসিত।

১৮৭২—বঙ্কিমচন্দ্রের বঙ্গদর্শন প্রকাশিত। বাঙ্গালীর মোহনিদ্রা ভঙ্গ বঙ্কিমচন্দ্র লিখলেন 'যতদিন দেশী বিদেশীতে বিজিত-জেতৃ সম্বন্ধ থাকবেতদিন আমরা পূর্ব গৌরব মনে রাখিব। ততদিন জাতিবৈর সমতার সম্ভাবনা নাই। চিনিলাম এই আমার জননী জন্মভূমি। এই মৃন্ময়ী মূর্তিকারূপিনী, অনন্ত রত্ন-ভূষিকা এক্ষণে কালগর্ভে নিহিতা। রত্নমণ্ডিত দশভূজার দশভূজ দশদিকে প্রসারিত। এস ভাই সকল। আমরা এই অন্ধকার কালস্রোতে ঝাঁপ দেই। এস আমরা দ্বাদশ-কোটী ভুজে ঐ প্রতিমা তুলিয়া, ছয় কোটী মাথায় বহিয়া ঘরে আনি।

১৮৭৪—সে যুগের প্রসিদ্ধ লেখক শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের 'মুখার্জীস ম্যাগাজিন' বিলাতী দ্রব্য বর্জনের প্রস্তাব করেন। 'আসুন, বিলাতী দ্রব্য ক্রয় করব না। এই সঙ্কল্প আমরা সকলে গ্রহণ করি। সর্বদা স্মরণ রাখা উচিত যে, ভারতবর্ষের উন্নতি ভারতবাসীরই সাধ্য।'

১৮৭২—গিরিশচন্দ্র ঘোষ, অমৃতলাল বসু, অর্ধেন্দুশেখর মুস্তাফী প্রভৃতির উদ্যোগে ন্যাশনাল থিয়েটার প্রতিষ্ঠিত।

১৮৭৮—কাছুকের বিদ্রোহ। বাসুদেও বলবন্ত কাছুকে শিবাজীর অনুকরণে পার্বত্য জাতিদের সঙ্ঘবদ্ধ করে ইংরেজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন।

১৮৮২—বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠ' প্রকাশিত। 'আমরা অন্য মা মানি না, দেশই আমাদের মা।

১৮৮৫—জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠা। প্রথম সভাপতি উমেশ বন্দ্যোপাধ্যায়।

১৮৮৬—কলকাতায় কংগ্রেসের দ্বিতীয় অধিবেশন। সভাপতি দাদাভাই নৈরজী, রবীন্দ্রনাথ স্বরচিত গান গাইলেন—

আমরা মিলেছি আজ মায়ের ডাকে।

ঘরের হয়ে পরের মতন
ভাই ছেড়ে ভাই কদিন থাকে।

১৮৮৬-১৬ই আষাঢ় রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের মহাপ্রয়াণ।

১৮৮৬-৯৩—স্বামী বিবেকানন্দের ভারত ভ্রমণ।

১৮৯৩—সেপ্‌টেম্বর : স্বামীজী শিকাগোতে বিশ্ব ধর্ম সভায় বক্তৃতা করেন।

১৮৯৬—স্বামীজীর কলকাতা প্রত্যাবর্তন।

১৮৯৩-৯৬—পাশ্চাত্য জগতে স্বামীজী কর্তৃক ভারত, ভারতীয়তা এবং হিন্দুধর্মের বিষয় ঘোষণা।

১৮৯২—মহারাষ্ট্রে সার্বজনীন গণপতি উৎসব।

১৮৯৫—শিবাজী উৎসব। চাপেকার সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠা।

১৮৯৭—র‍্যাণ্ড এবং আয়ার্স্ট হত্যা। কলকাতায় আত্মোন্নতি সমিতি প্রতিষ্ঠা। চাপেকার ভ্রাতাদের ফাঁসী।

১৯০১—ডিসেম্বর : জাপানী মনীষী ও কারুরা কলকাতায় আসেন। বৃটিশ বিরোধী সক্রিয় আন্দোলনকে উৎসাহ দান।

১৯০২—অনুশীলন সমিতি প্রতিষ্ঠা, সভাপতি পি, মিত্র। উদ্যোক্তা ভগিনী নিবেদিতা, চিত্তরঞ্জন দাস, সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর। স্বামীজীর দেহত্যাগ।

রবীন্দ্রনাথ লিখলেন—প্রতিকূলতার দ্বারাই আমাদের শক্তির উদ্বোধন করতে হবে। বিধাতার রুদ্রমূর্তিই আজ আমাদের পরিত্রাণ।

১৯০৩—সরলা দেবী কর্তৃক বীরাষ্টমী ব্রত প্রবর্তন।

ডিসেম্বর কলকাতা গেজেটে বাংলাদেশকে দ্বিখণ্ডিত করার প্রস্তাব।

১৯০৪—এই সালের প্রথম থেকে জল্পনা-কল্পনা। বঙ্গভঙ্গের প্রস্তাব এবং কার্জনের ইউনির্ভাসিটি বিল নিয়ে আন্দোলন শুরু। রবীন্দ্রনাথ বললেন, বিচ্ছেদের চেষ্টাতেই আমাদের ঐক্যানুভূতি বিগুণ করিয়া তুলিবে।

১৯০৫—২০—জুলাই : সরকারী ঘোষণা বঙ্গভঙ্গ স্থির সিদ্ধান্ত। ১৬ই অক্টোবর বাংলার অঙ্গচ্ছেদ হবে। ঐ দিনই রাখীবন্ধনের সঙ্গীতে বাঙ্গালীর দুর্জয় সংকল্প প্রকাশিত হয়।

'ওদের বাঁধন যত শক্ত হবে
মোদের বাঁধন টুটবে।'
'বাংলার মাটি বাংলার জল
পুণ্য হউক পুণ্য হউক হে ভগবান!'

'ও ভোর মরা গাঙ্গে বান এসেছে
জয় মা বলে ভাসা তরী।'

১৯০৫—জুলাই : ব্রহ্ম বান্ধব উপাধ্যায় সম্পাদনায় 'সন্ধ্যা' পত্রিকার আত্মপ্রকাশ—

ফুলার করলে হুকুম জারি
মা বলে যে ডাকবে তার
শাস্তি হবে ভারী।

১৯০৬—মার্চ : 'যুগান্তর' কাগজের মাধ্যমে বাংলার বিপ্লবীদের আত্মপ্রকাশ।

এপ্রিল বরিশালে প্রাদেশিক সম্মেলনে বঙ্গভঙ্গ। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় গ্রেপ্তার। মুকুন্দ দাসের স্বদেশী যাত্রার দল।

১৯০৭—'সন্ধ্যার' রাজদ্রোহ মামলায় ব্রহ্মবান্ধবের বিবৃতি 'স্বরাজ আন্দোলন বিধাতৃ নির্দিষ্ট। 'বিদেশী গভর্নমেন্টের কাছে জবাবদিহি করতে বাধ্য নই।' কংগ্রেস নরমপন্থী চরমপন্থী সংঘর্ষ। রাজদ্রোহ মূলক প্রবন্ধ প্রকাশের জন্য যুগান্তর সম্পাদক ভূপেন্দ্রনাথ দত্তদণ্ডিত। চন্দননগরে ২ বার বাংলার ছোট লাট এণ্ড্রু ফ্রেজার ট্রেন লাইনচ্যুত করার চেষ্টা। ঢাকার ম্যাজিষ্ট্রেট এলেনকে গুলি।

১৯০৮—৩০শে এপ্রিল : মজফরপুরে বিপ্লবীদের বোমা বিস্ফোরণ। ১লা মে ক্ষুদিরাম গ্রেপ্তার। প্রফুল্ল চাকীর আত্মহত্যা। ২রা মে অরবিন্দ, বারীন্দ্র প্রমুখ গ্রেপ্তার। আলিপুর ষড়যন্ত্র মামলা আরম্ভ।

১৯০৯—আশুতোষ বিশ্বাস হত্যা। লণ্ডনে কার্জন ওয়াইলী হত্যা।

১৯১০—শামসুল আলম হত্যা। ঢাকা ষড়যন্ত্র মামলা।

১৯১১—রাজকুমার রায় হত্যা, ময়মনসিংহ। মনমোহন ঘোষ হত্যা, বরিশাল।

১৯১২—রতীলাল হত্যা। বড়লাট হার্ডিঞ্জ হত্যাপ্রচেষ্টা দিল্লীর চাঁদনীচকে করপরেশন প্রসেসনে হার্ডিঞ্জের উপর বোমা নিক্ষেপ।

১৯১৩—মৌলভী বাজারে গভর্ণর হত্যাপ্রচেষ্টা। কলিকাতা কলেজ স্কোয়ারে হরিপদ ঘোষ নিহত। ইন্সপেক্টর বঙ্কিম চৌধুরী নিহত, ময়মনসিংহ। বরিশাল ষড়যন্ত্র মামলা। বরিশাল অতিরিক্ত ষড়যন্ত্র মামলা।

১৯১৪—বসন্ত চ্যাটার্জী হত্যার চেষ্টা। গোবেন্দা রামদাস নিহত। বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ। জার্মানীর সঙ্গে ভারতীয় বিপ্লবীদের চুক্তি। বার্লিনে বিপ্লবী সংস্থা গঠিত। বজবজে কামাগাটা মারু সংঘর্ষ। বহু শিখ নিহত। দিল্লী ষড়যন্ত্র মামলা। রাজাবাজার ষড়যন্ত্র মামলা।

১৯১৫—রাসবিহারী বসুর নেতৃত্বে ভারতব্যাপী সশস্ত্র অভ্যুত্থান প্রচেষ্টা। বালেশ্বর সংগ্রাম।

১৯১৬—বসন্ত চ্যাটার্জীকে হত্যার চেষ্টা, হরিশ পার্কে। বসন্ত চ্যাটার্জী নিহত।

১৯১৮—জানুয়ারী : গৌহাটী সংঘর্ষ। ১৫ই জুন ঢাকা কলতাবাজার সংগ্রাম। বিপ্লবী তারিণী মজুমদার এবং নলিনী বাগচী নিহত।

১৯১৯—বিপ্লব আন্দোলন দমনের জন্য রাউলাট আইন পাশ। জন সাধারণের প্রতিবাদ। ১৪ই এপ্রিল জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ড। খিলাফত ও জালিয়ানওয়ালাবাগের অন্যায়ের প্রতিবাদে গান্ধীজীর আবির্ভাব এবং অসহযোগ আন্দোলনের প্রস্তাব।

১৯২০—গান্ধীজীর নেতৃত্বে কংগ্রেস কর্তৃক আন্দোলনের প্রস্তাব গৃহীত। দেশে বিপুল গণজাগরণ।

১৯২১—সমগ্র দেশে সহস্র সহস্র লোকের কারাবরণ।

১৯২২-২৩—দেশবন্ধুর নেতৃত্বে স্বরাজ্য পার্টি গঠিত।

১৯২৪—গোপীনাথ সাহা কর্তৃক টেগার্ট হত্যার চেষ্টা, সুভাষচন্দ্র এবং অন্যান্য বিপ্লবীদের গ্রেপ্তার ও বিনাবিচারে আটক।

১৯২৭—জেলে ভূপেন চ্যাটার্জীকে হত্যার অপরাধে অনন্তহরি মিত্র এবং প্রমোদরঞ্জন চৌধুরীর ফাঁসী। কাকোরী ষড়যন্ত্র মামলার রাজেন লাহিড়ী, আসফাকুল্লা, রামপ্রসাদ বিসমিল এবং রৌশন সিংহের ফাঁসী।

১৯২৮—কলিকাতায় কংগ্রেসের অধিবেশন।

১৯২৯—লাহোর জেলে ৬৩ দিন অনশনে যতীন দাসের মৃত্যু। লাহোর কংগ্রেস অধিবেশনে পূর্ণ স্বাধীনতার শপথ গ্রহণ।

১৯৩০—এপ্রিল : চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন। গান্ধীজী কর্তৃক লবণ আইন অমান্য।

২২শে এপ্রিল জালালাবাদ সংগ্রামে বহু বিপ্লবী নিহত। বিনা বিচারে বিপ্লবীদের আটক আরম্ভ। কলকাতায় টেগার্ট হত্যা প্রচেষ্টায় বোমাবিস্ফোরণে অনুজা সেন নিহত।

১৯৩১—দীনেশ গুপ্তের ফাঁসী, হিজলী বন্দী শিবিরে পুলিশের গুলিতে সন্তোষ মিত্র ও তারকেশ্বর সেন নিহত। জজ গালিককে হত্যা করে কানাই ভট্টাচার্য্য স্বেচ্ছায় মৃত্যুবরণ করেন। মেদিনীপুরের ম্যাজিষ্ট্রেট পেডিকে হত্যা।

১৯৩২—আইন অমান্য আন্দোলনে সহস্র সহস্র ব্যক্তির কারাবরণ। চট্টগ্রামে ধলঘাট সংঘর্ষ। নির্মল সেন ও অপূর্ব সেন নিহত। ঢাকায় পুলিশের নির্মম প্রহারে অনিলদাস নিহত। কলকাতায় ওয়াটসন্ হত্যা প্রচেষ্টা—অতুল সেনের ইচ্ছামৃত্যু। চট্টগ্রামে পাহাড়তলী বিপ্লবী প্রচেষ্টায় ইচ্ছামৃত্যু বরণ করেন প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার।

১৯৩৩—মেদিনীপুরের ম্যাজিষ্ট্রেট ডগলাস নিহত। প্রদ্যোৎ ভট্টাচার্য্যের ফাঁসী। মুন্সীগঞ্জে

(শেষাংশ ২৬ পাতায় দেখুন)

॥ শহীদ স্মরণে ॥

—সোনিয়া চট্টোপাধ্যায়

শহীদ-কথা জানতে হ'লে
জানতে হবে নিজের দেশ
শতেক কৃতীর জন্ম যেথায়
সে আমাদের বাংলাদেশ ॥
ফুলে ফলে শস্যে ধানে
হরেক রকম কাব্যে গানে
আনন্দেরই ঢেউ তুলে যায়
সাড়া জাগায় মনে প্রাণে ॥
যতীন, সত্যপ্রিয়, নীরেন
মনোরঞ্জন স্বদেশ-প্রাণ
এই দেশেতে জন্ম নিয়ে
গড়ল জাতি সুমহান ॥
তাইতো আজি পুণ্যদিনে
তাঁদের স্মরি নমস্কার
শহীদ যত এই ভারতের
প্রণাম জানাই বারংবার ॥

বালেশ্বর আত্মোৎসর্গ স্মারক সমিতি

পঞ্চষষ্টিতম স্মারক দিবস

সবিনয় নিবেদন,

বিগত ৯ সেপ্টেম্বর ১৯১৫ ঐতিহাসিক বালেশ্বর চাষখণ্ড প্রান্তরে বৃটিশ শক্তির বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ সংঘর্ষে মহান্ বিপ্লবী নেতা যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও বীর বিপ্লবীচতুষ্টয়ের আত্মনিবেদনের পঞ্চষষ্টিতম পবিত্র স্মারক দিবস উদ্‌যাপিত হইবে আগামী ৯ সেপ্টেম্বর ১৯৮০ সকাল ৯ ঘটিকায় কলিকাতার আজাদ হিন্দ্ বাগে যতীন্দ্রনাথের মর্মর মূর্তির সম্মুখে। উক্ত অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করিবেন প্রখ্যাত বর্ষীয়ান বিপ্লবী নায়ক শ্রীপঞ্চানন চক্রবর্তী মহাশয়।

আপনার উপস্থিতি প্রার্থনা করি।

নিবেদক

১৫ আগষ্ট ১৯৮০

শ্রীজগদীশ চট্টোপাধ্যায়

৪, বল্লভ দাশ স্ট্রীট

শ্রীপুষ্পরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়

কলিকাতা-৭

শ্রীপ্রভাংশু ধর চৌধুরী

বিঃ দ্রঃ—১০ সেপ্টেম্বর বালেশ্বর অনুষ্ঠানে যোগদানের জন্য রক্ততীর্থ যাত্রিগণ ৯ সেপ্টেম্বর রাত্রি ৯ ঘটিকায় হাওড়া হইতে যাত্রা করিবেন। যাতায়াতের ভাড়া পঁচিশ টাকা মাত্র।

(২৪ পাতার শেষাংশ)

কালীপদ মুখার্জীর ফাঁসী। আন্দামানে অনশনে মৃত্যু মহাবীর সিং মানকৃষ্ণ দাস এবং মোহিত মৈত্র। কলিকাতায় দীনেশ মজুমদারের ফাঁসী, জামালপুরে পুলিশের প্রহারে নিহত ধীরেন দে। মেদিনীপুরে পুলিশের গুলিতে নিহত অনাথ পাঁজা, মৃগেন দত্ত, মেজিষ্ট্রেট বার্জ নিহত—ব্রজকিশোর চক্রবর্তী, নির্মল, জীবন ঘোষ এবং রামকৃষ্ণ রায়ের ফাঁসী।

১৯৩৪—চট্টগ্রামে বিপ্লবী নেতা সূর্য্য সেন ও তারকেশ্বর দস্তিদারের ফাঁসী। কুমিল্লায় অনিল ভট্টাচার্য্যের ফাঁসী। ফরিদপুরের মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্যের ফাঁসী। আন্ত প্রাদেশিক ষড়যন্ত্র মামলা। বাংলার লাট এণ্ডারসনকে হত্যার প্রচেষ্টায় ভবানী ভট্টাচার্য্যের ফাঁসী।

১৯৩৫—দেউলী বন্দী শিবিরে হরিপদ বাগচী ও সন্তোষ গাঙ্গুলীর মৃত্যু।

১৯৩৬ - ফরিদপুরে পুলিশের প্রহারে নবজীবন ঘোষের মৃত্যু। টিটাগড় ষড়যন্ত্র মামলা।

১৯৩৭—মেদিনীপুর জেলে ধনেশ ভট্টাচার্য্যের মৃত্যু।

১৯৩৮ ঢাকা জেলে অনশনে হরেন মুন্সীর মৃত্যু।

১৯৩৯—দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ।

১৯৪২—ভারত ছাড়ো আন্দোলন। বিভিন্ন থানা অভিযানে মেদিনীপুর, ঢাকা ও বালুরঘাটে বহু লোক নিহত।

১৯৪৩—মাদ্রাজ উপকূলে রক্ষী বাহিনীর বিদ্রোহ। মানকুমার বসু ঠাকুর, চিত্তরঞ্জন মুখোপাধ্যায়, দুর্গাদাস চৌধুরী প্রভৃতি ন'জনের ফাঁসী।

১৯৪৬-৪৭—কলিকাতায় সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামার সময় শান্তিকামী প্রচারকালে নিহত ননী সেনগুপ্ত, শচীন মিত্র, সুশীল দাশগুপ্ত, সুতিশ ব্যানার্জী, বীরেশ্বর ঘোষ।

১৯৪৭—১৫ই আগষ্ট—ভারতের স্বাধীনতা।

জীবন মৃত্যু পায়ের ভৃত্য, চিত্ত ভাবনাহীন

: কালীপদ সরকার

আজ সেই ৯ই সেপ্‌টেম্বর। পঁয়ষট্টি বছর পূর্বে এই দিনটিতে ইতিহাস রচিত হয়েছিল রক্তের অক্ষরে বালেশ্বর জেলার বুড়ীবালাম নদী তীরে। শৌর্য, তেজ, দেশপ্রেম এবং আত্মদানের গৌরবোজ্জ্বল সেই ইতিহাস পরবর্তীকালের স্বাধীনতা সংগ্রামীদের অনুপ্রাণিত করেছে, বাঙ্গালী জাতির ভীরুতার অপবাদ মুছে দিয়েছিল এবং অনবদ্য স্মৃতি মহিমায় ভাস্বর কোটি কোটি দেশবাসীর অন্তরে। দুঃসাধ্য জীবন সাধনা মৃত্যুর মাঝে যে বিজয়ী প্রাণের জয়বার্তা সেদিন ঘোষণা করেছিল অমর হয়ে রবে তা অন্তহীন কালপ্রবাহে।

প্রণাম জানাই সেই কীর্তিকাহিনীর মহানায়ক যতীন্দ্রনাথের উদ্দেশ্যে, প্রণাম জানাই তাঁর বীর সতীর্থ চিত্তপ্রিয়, নীরেন, মনোরঞ্জন এবং যতীশের উদ্দেশ্যে।

বুড়ীবালামের তীর মুক্তিতীর্থ ধরনীর
বুঝিল যেথায় ইংরাজের সনে।
পঞ্চ বিপ্লবী বীর।
অসম সে রণে ভয় নাহি জাগে মনে
সন্তান দিল লহুর অর্ঘ্য
শৃঙ্খল মোচনে জননীর॥

প্রথম বিশ্বযুদ্ধকাল। একদিকে ইংলণ্ড, ফরাসী ও রাশিয়া অন্যদিকে জার্মানী, অষ্ট্রীয়া ও তুরস্ক। পরাধীন ভারতবর্ষ ইংলণ্ডের পক্ষেযু দ্ধরত। যুদ্ধ চলছে ইউরোপ ও এশিয়ায়, জলে ও স্থলে।

১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গরদ আন্দোলনকে কেন্দ্র করে যে সর্বভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটেছিল, ১৯১১ সালে বঙ্গবিভাগ রহিত হলেও তা বন্ধ হয় নি। আন্দোলনের প্রকাশ্য কর্মসূচী সাময়িক ভাবে চাপা পড়লেও, অরবিন্দ—তিলক—লাজপত—বিপিন প্রমুখ নেতৃবৃন্দ, মন্ত্রণালে যে বিপ্লববাদের মন্ত্র প্রচার করেছিলেন তা শুধু অক্ষুণ্ণই ছিল না, প্রাণশক্তিতে সতেজ ও বিস্তৃত হয়েছিল।

যুদ্ধের শুরুতেই বিপ্লববাদীরা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে স্থির করেন, মহাযুদ্ধের সুযোগে ভারতে সশস্ত্র অভ্যুত্থান ঘটিয়ে, ব্রিটিশ শাসন উচ্ছেদ করতে হবে। অনুশীলন, যুগান্তর এবং অপর ছোট দলগুলি এ সম্বন্ধে একমত হন। প্রয়োজনে দলমত নির্বিশেষে সকল বিপ্লবী গোষ্ঠী যে ঐক্যবদ্ধ হতে পারেন এটি ছিল তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। পরিকল্পিত অভ্যুত্থানের অধিনায়ক মনোনীত হন রাসবিহারী বসু এবং যতীন্দ্রনাথ মুখার্জি।

পাঞ্জাব সহ উত্তর ভারতের বিপ্লবীদের সংগঠন এবং ব্রিটিশের দেশীয় সৈনিকদের মধ্যে বিদ্রোহ ঘটানোর ভার নেন বহুভাষাবিশারদ কৌশলী নায়ক রাসবিহারী বসু। অন্যদিকে বিপ্লববাদের পীঠস্থল বাংলা, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া ও ইউরোপে প্রবাসী

বিপ্লবীদের সংঘবদ্ধ করা এবং জার্মানী থেকে অস্ত্র সংগ্রহের ভার নেন যতীন্দ্রনাথ মুখার্জি। গুপ্ত সংগঠনে সুনির্দিষ্ট লিখিত কর্মবিভাগের রেকর্ড থাকা সম্ভব নয়, তবুও যা বলা হল মোটামুটিভাবে তাই ছিল পরিকল্পিত ব্যবস্থা।

উভয় নায়কই ছিলেন আত্মগোপনকারী, উভয়ের বিরুদ্ধেই একাধিক গ্রেপ্তারী পরোয়ানা ও মাথার জন্য হুলিয়া জারী হয়েছিল এবং ঘাতকের খড়্গ উদ্যত ছিল।

উদ্যোগের প্রথম পর্বেই বিপ্লবীরা কাজ চালাবার উদ্দেশ্যে কিছু অর্থ ও অস্ত্র সংগ্রহে মনোযোগী হন। ১৯১৪ সালের আগষ্ট মাসের শেষভাগে কলিকাতা বন্দর থেকে দোকানে নেবার সময় রডা কোম্পানীর কয়েক পেটি পিস্তল ও গুলী বিস্ময়করভাবে হস্তগত হল এবং সংঘটিত হল কলিকাতায় দুটি দুঃসাহসিক ডাকাতি। যতীন্দ্রনাথ কালবিলম্ব না করে অস্ত্রগুলি বিপ্লবীদলগুলির মধ্যে বিতরণের ব্যবস্থা করলেন। পুলিশ কিছু গুলী উদ্ধার করতে পারলেও লুণ্ঠিত অর্থ ও পিস্তলের কোন হদিস খুঁজে পেল না। প্রয়োজনের তুলনায় অস্ত্র সংগ্রহ অকিঞ্চিৎকর হলেও রডা কোম্পানীর মউজার পিস্তলগুলি ছিল উন্নত ধরনের এবং সেগুলিকে দূরপাল্লার রাইফেলের মত ব্যবহার করা যেত।

শীঘ্রই জার্মানীতে প্রবাসী ভারতীয় বিপ্লবীদের সহিত কলিকাতার সংযোগ স্থাপিত হল। এঁদের মধ্যে ছিলেন স্বামী বিবেকানন্দের ভ্রাতা ডঃ ভূপেন্দ্র নাথ দত্ত। প্রবাসী বিপ্লবীদের অনুরোধ মত জার্মান সরকার ভারতীয় বিপ্লবীদের অস্ত্র ও অর্থ সাহায্য দিতে সম্মত হলেন।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধে হল্যাণ্ড ছিল নিরপেক্ষ রাষ্ট্র। পূর্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ যার বর্তমান নাম ইন্দোনেশিয়া, হল্যাণ্ডের সাম্রাজ্যভুক্ত ছিল। তার রাজধানী ব্যাটাভিয়াকে (বর্তমান জাকার্তা) বেছে নেওয়া হল ভারত-জার্মান যোগাযোগ কেন্দ্ররূপে। ব্যাটাভিয়াস্থ জার্মান রাষ্ট্রদূতের উপর ভার পড়ল বিপ্লবীদের জন্য অর্থ ও অস্ত্রসরবরাহের বিপ্লবীদের প্রতিনিধি করে পাঠানো হল নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য ওরফে মিঃ মার্টিনকে। ইনিই পরবর্তী কালে এম, এন, রায় নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। নরেন্দ্র ভট্টাচার্য আত্মপরিচয় গোপন করে যথা সময়ে ব্যাটাভিয়ায় গিয়ে পৌঁছলেন এবং সেখানকার জার্মান রাষ্ট্রদূতের সহিত মিলিত হলেন।

যতীন্দ্র নাথের নির্দেশে হরিকুমার চক্রবর্তী কলিকাতায় মেসার্স হ্যারি এণ্ড সন্স নামে একটি ব্যবসা সংস্থা খুললেন, যা হল কলিকাতাস্থ বিপ্লবীদের সহিত ব্যাটাভিয়ার জার্মান রাষ্ট্রদূত এবং মার্টিনের সংযোগ কেন্দ্র। ব্যবসা সংক্রান্ত টাকার ড্রাফটরূপে জার্মানীর অর্থ সাহায্য মেসার্স হ্যারি এণ্ড সন্সে আসতে লাগল। অল্পদিনের মধ্যে নেতৃবর্গ জানলেন, ম্যাভেরিক নামক একটি জাহাজে প্রচুর জার্মান অস্ত্র আসছে। জাহাজ ভিড়বে সুন্দরবন অঞ্চলে বায়মঙ্গল তটে। মাল খালাসের দায়িত্ব নিয়ে বাদুগোপাল মুখার্জি এবং অতুল কৃষ্ণ ঘোষ নৌকা ও সহকর্মীসহ সেখানে গিয়ে প্রতীক্ষায় রইলেন। জানা যায়, অপর দুটি জাহাজেও হাতিয়া ও বালেশ্বর সমুদ্র উপকূলে অস্ত্র আমদানীর ব্যবস্থা হয়েছিল।

মেসার্স হ্যারি এণ্ড সন্সের একটি ব্রাঞ্চ অফিস খোলা হয়েছিল বালেশ্বরে, তার নাম ছিল ইউনিভারসল এমপোরিয়াম। যতীন্দ্রনাথ স্বয়ং অবস্থান করছিলেন সেখানে। বালেশ্বর শহর থেকে

মাইল কুড়ি দূরে কল্পিপদা গ্রামে বিপ্লবীদের আর একটি গোপন আশ্রয় শিবির ছিল।

স্থির হয়েছিল, অস্ত্র খালাসের পর সেগুলিকে দ্রুত তুলে দেওয়া হবে বিপ্লবী দেশকর্মীদের হাতে। তারজন্য বাংলার প্রতিটি জেলায় কর্মীদলকে প্রস্তুত রাখা হয়েছিল। তারপর চলবে সীমিত অস্ত্রব্যবহার শিক্ষা এবং রণপ্রস্তুতি। এই সময় কলিকাতায় গোরা সৈন্যসংখ্যা ছিল নগণ্য। অন্যত্রও তাই। ফোর্ট উইলিয়াম এবং জেলা শহরগুলি ছিল অরক্ষিত অবস্থায়। নেতারা হিসাব করে দেখেছিলেন যে, অস্ত্র চালনায় সুদক্ষ না হলেও, সংখ্যার জোরে তাঁরা জেলা সদরগুলি এবং ফোর্ট উইলিয়াম দখল করতে পারবেন। কলিকাতার সহিত সংযোগকারী রেল-পথগুলিকে অকেজো করে দেবার পরিকল্পনাও করা হয়েছিল। রেলসেতু ধ্বংস ও রেলপথ উড়িয়ে দেবার জন্য কর্মীরা যথাস্থানে প্রতীক্ষারত ছিলেন। ফোর্ট উইলিয়াম আক্রমণ ও কলিকাতা অধিকারের ভার ছিল বিপিন বিহারী গাঙ্গুলির উপর।

বাংলায় প্রস্তুতি পর্ব যখন এইভাবে সমাপ্তির পথে এগিয়ে গিয়েছিল, রাসবিহারী বসু তখন কর্তার সিং, হরনাম সিং, পিংলে প্রমুখ বিশ্বস্ত সহকর্মীদের নিয়ে ছদ্মবেশে সেনা ব্যারাকগুলিতে ঘুরে ঘুরে বিদ্রোহের আয়োজনে ব্যস্ত ছিলেন। বিদ্রোহী রাজা মহেন্দ্র প্রতাপ তখন কাবুলে, সেখানে একটি অস্থায়ী স্বাধীন ভারত সরকার গঠনের চেষ্টা চলেছিল। রাসবিহারী রাজা মহেন্দ্র প্রতাপের সহিত সংযোগ স্থাপনে সচেষ্ট হলেন। ভারতের বাইরে গদর পার্টির সঙ্গেও যোগাযোগ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। অভ্যুত্থানে যোগ দেবার জন্য গদর পার্টির বহু সদস্য স্বদেশ অভিমুখে যাত্রা করেন। ১৯১৫ সালের জুলাই মাসের মধ্যে সকল বিপ্লবী কর্মীর হাতে অস্ত্র তুলে দেওয়া সম্ভব হবে বলে আশা করা হল। অভ্যুত্থানের দিন স্থির হল ১৯১৬ সালের ২১ ফেব্রুয়ারী। ভারতীয় সেনাবাহিনীর বেশ বড় একটা অংশ বিদ্রোহ ঘোষণা করে নির্দিষ্ট তারিখে অভ্যুত্থানে যোগ দিতে সম্মত হল।

লোক চক্ষুর অন্তরালে যখন এই বিরাট কর্মযজ্ঞ অনুষ্ঠিত হচ্ছিল, তখন দেশের রাজনৈতিক ও সামাজিক চেহারাটা কেমন ছিল এক পলকে দেখে নেওয়া মন্দ নয়। ১৯১৪ সালের আগষ্টে মহাযুদ্ধ আরম্ভ হলে বিপ্লববাদীরা যে নতুনভাবে কর্মচঞ্চল হয়েছিলেন সে খবর ব্রিটিশ সরকার পেয়েছিল। তাই, ১৯১৫ সালের মার্চে সন্দেহভাজনদের বিনা বিচারে অনির্দিষ্ট কালের জন্য কারারুদ্ধ করার উদ্দেশ্যে সরকার ভারত রক্ষা আইন পাশ করে। এই বে-আইনী আইনের বিরুদ্ধে কোন প্রতিবাদ উঠে না।

১৯১৪ সালের মাদ্রাজ অধিবেশনে কংগ্রেস সভাপতি ভূপেন্দ্র নাথ বসু তাঁর ভাষণে বলেন, "সাম্রাজ্যের এই বিপদের দিনে ভরেতবর্ষ তার সন্তানদের সাম্রাজ্য রক্ষাকল্পে শোণিতদানের দ্বারা নিষ্কৃতি পূর্ণ করতে বলছে।" প্রাদেশিক গভর্নর সভায় উপস্থিত হলে প্রতিনিধিবর্গ রাজভক্তিতে উচ্ছ্বাসিত হয়ে গভর্নরের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন।

১৯১৫ সালে কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশন বসে বোম্বাইয়ে। সভাপতি ছিলেন স্যার (পরে লর্ড) সত্যেন্দ্র প্রসন্ন সিংহ। তিনি সভাপতির অভিভাষণে বললেন, "স্বায়ত্ত শাসন লাভই ভারতের লক্ষ্য, কিন্তু ভারতবাসী এখনো স্বরাজ পাবার মত যোগ্যতা অর্জন করে নি।"

কংগ্রেসে চরমপন্থী বলে যাঁরা পরিচিত ছিলেন, সুরাট অধিবেশনে প্রবীণদের সহিত মতভেদের কারণে তাঁরা ১৯১৬ সাল পর্যন্ত কোন অধিবেশনে যোগ দেন নি। তিলক মান্দালয় জেলে নির্বাসন দণ্ডভোগের পর, ১৯১৪ সালে দেশে ফিরে এসেছিলেন কিন্তু তিনি তখন ভগ্নস্বাস্থ্য।

শ্রীঅরবিন্দ ফরাসী আশ্রয়ে পণ্ডীচেরিতে আধ্যাত্মিক সাধনায় মগ্ন। গান্ধীজী ১৯১৪ সালে দক্ষিণ আফ্রিকা ত্যাগ করে সবেমাত্র দেশে ফিরছেন। ব্রিটিশের প্রতি সহযোগিতার মনোভাব প্রকাশ করা ছাড়া, অপর ইতিকর্তব্য তখনো তিনি স্থির করেন নি। একমাত্র এক বিদেশিনী মিসেস অ্যানি বেসাণ্ট ভারতবর্ষে হোমরুল প্রতিষ্ঠার দাবিতে আন্দোলন করছিলেন, যার ফলে তাঁকে জেলে যেতে হয়।

যুদ্ধে ব্রিটিশ সরকারকে সর্বপ্রকারে সাহায্য করার নীতি গ্রহণ করেছিল কংগ্রেস, মুসলিম লীগ, মডারেট সম্প্রদায় ও দেশীয় রাজন্যবর্গ। দৃষ্টিভঙ্গিতে তাদের মধ্যে পার্থক্য ছিল সামান্যই। ভারতবাসীর রাজভক্তি ছিল অটুট, ব্রিটিশের ভারতীয় বাহিনী ও পুলিশ ছিল একান্ত অনুগত যুদ্ধে সকল রণক্ষেত্রেই ভারতীয় সৈন্য বিশ্বস্ততার সঙ্গে ইংরাজ পক্ষে লড়াই করে। তাদের হতাহতের সংখ্যা ছিল ১,০৬,৫৯৮। ইংরাজের যুদ্ধ তহবিলে ভারতবাসীর অর্থদানের পরিমাণ ছিল ১০,৫০,০০,০০০ পাউণ্ড। রসদ ও খাদ্য গিয়েছিল অবিরামিত স্রোতে।

অথচ তখন ভারতবর্ষ গুরুতর সঙ্কটের মধ্যে দিন কাটাচ্ছিল। বস্ত্র, ঔষধ এবং নিত্য প্রয়োজনীয় ভোগ্য পণ্যের অভাব চরমে উঠেছিল। দেশনেতারা ছিলেন নীরব দর্শক।

রডা কোম্পানীর অস্ত্র লুঠ, ডাকাতি এবং গোয়েন্দাপুলিশ হত্যায় কলিকাতার ইংরাজ রাজপুরুষগণ তখন রীতিমত সন্ত্রস্ত ভয়ে তাঁরা রাস্তায় বের হতেন না। কলিকাতার প্রবেশ পথগুলিতে সশস্ত্র সান্ত্রীদল মোতায়েন হয়েছিল, ছদ্মবেশী গোয়েন্দা দল ঘুরে ঘুরে সারা বাংলা ঘুরে বেড়াত। স্বদেশী ডাকাতদের ধরে দেবার জন্য শহরে, গ্রামে গঞ্জে ইস্তাহার ছড়ানো হয়েছিল। ঢোল সহরতের দ্বারা জনসাধারণকে সর্বদা সজাগ করা হচ্ছিল।

স্বদেশী ডাকাত কারা, কি তাদের পরিচয়, কেন তারা এসব কাজ করছে, তার কিছুই জানত না দেশের মানুষ।

নিদারুণ প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে, প্রতিপদক্ষেপে বিপদের ঝুঁকি নিয়ে, নিঃশব্দে, বিপ্লবীরা যেভাবে তাঁদের নির্দিষ্ট কর্তব্য সম্পাদন করে চলেছিলেন, তা ভাবলে বিস্মিত না হয়ে পারা যায় না। বাইরে কোন প্রচার নেই, অথচ ভিতরে ভিতরে সমধর্মী, উৎসাহদাতা এবং অনুগামীরা সর্বত্রই আশা নিয়ে প্রতীক্ষিত দিনের জন্য উদগ্রীব হয়ে ছিলেন। বস্তুতঃ তখন বাংলায় এমন একজন দেশপ্রেমিক ছিলেন না, যিনি কোনভাবে না কোনভাবে, পরিকল্পিত অভ্যুত্থানের সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করেন নি। একটা ক্ষুদ্র ঘটনার কথা এই প্রসঙ্গে বলছি, আমার বাবাকে রাজভক্ত বলেই সবাই জানত। এ সময় তিনি জেলা সৈন্য সংগ্রহ কমিটির সদস্য, দাদাকে যুদ্ধে পাঠিয়েছেন, দাদা মধ্যপ্রাচ্যের রণাঙ্গনে। আমাদের বাড়ীর মণ্ডপের চূড়ায় লায়ন-ইনিকর্ণ-ক্রশ-লাঞ্ছিত ফলক শোভিত ছিল, সেখানে মাঝে মাঝে ইউনিয়ান জ্যাক

ওড়ানো হত। অথচ যাবা বাড়ীতে আশ্রয় দিয়েছিলেন একজন বিপ্লবীকে, তাঁকে চাকুরি দিয়েছিলেন গ্রামের স্কুলে এবং নিযুক্ত করেছিলেন আমার শৈশবের গৃহশিক্ষক। মাষ্টার মশাই-এর বাড়ী ছিল নোয়াখালি জেলার খিলপাড়ায়, আমাদের যশোহর জেলায়।

বৈপ্লবিক অভ্যুত্থানের সব প্রস্তুতি সমাপ্ত, কেবল অস্ত্র এলেই হয়, এমন সময় জনৈক সিপাহী কৃপাল সিং বিদ্রোহ সম্পর্কিত তথ্য সরকারের নিকট ফাঁস করে দেয়। ২১শে ফেব্রুয়ারী যে অভ্যুত্থানের নির্দ্ধারিত তারিখ সে সংবাদও সরকার জানতে পারে। রাসবিহারী বসু সঙ্গে সঙ্গে তারিখ পরিবর্তন করে ১৯শে ফেব্রুয়ারী ধার্য করলেন এবং তা জানিয়ে দিলেন বিপ্লবী নেতাদের।

কর্তার সিং ও হরনাম সিং কাবুলের দিকে যাবার পথে সীমান্ত অতিক্রমের আগেই ধরা পড়লেন এবং ১৯১৫ সালের ২৩শে মার্চ ডিনামাইটের বাক্সসহ পিংলে গ্রেপ্তার হলেন মীরাট ক্যানটনমেণ্টে। পুলিশ বহু বিপ্লবীকে গ্রেপ্তার করল। খাড়া করা হল লাহোর ষড়যন্ত্র মামলা। তাতে অভিযুক্ত হলেন রাসবিহারী।

রাসবিহারী বসুকে গ্রেপ্তার করার জন্য সরকারের চেষ্টার শেষ ছিল না। জাল ফেলা হয়েছিল দেশের অভ্যন্তরে, পশ্চিম সীমান্তে এবং প্রতিটি বন্দরে, সিঙ্গাপুর অবধি। কিন্তু তাঁকে ধরা গেল না। রাসবিহারী বসু উত্তর ভারত থেকে কলিকাতায় এলেন এবং বিপ্লবী নেতাদের সঙ্গে গোপনে দেখা সাক্ষাৎ করলেন। তারপর, ১৯১৫ সালের ১২ই মে তিনি পি, এন, ঠাকুর ছদ্ম পরিচয়ে কলিকাতা থেকে জাপান গামী এক জাহাজে জাপানে চলে গেলেন।

এদিকে বিপ্লবী নেতাদের নিকট সংবাদ এল জাভার নিকট অস্ত্র-জাহাজ 'ম্যাভারিক' ব্রিটিশের হাতে ধরা পড়েছে। নগেন ভট্টাচার্য তখন কলিকাতায়। ১৫ই আগষ্ট তিনি রওনা হলেন ব্যাটাভিয়া অভিমুখে, উদ্দেশ্য জার্মান রাষ্ট্রদূতের সহিত সাক্ষাৎ করে পরবর্তী কর্তব্য স্থির করা। অস্ত্রপ্রেরণ সম্পর্কে বিশদ সন্ধান নেবার জন্য যতীন্দ্রনাথ মুখার্জি তখন ভূপতি মজুমদারকে পাঠালেন ব্যাটাভিয়ায়। ভূপতি মজুমদার ব্যাটাভিয়া পৌঁছতে পারলেন না। সিঙ্গাপুর বন্দরে জাহাজেই পুলিশ তাঁকে গ্রেপ্তার করল। বৈপ্লবিক ষড়যন্ত্রের খবর তখন ব্রিটিশ সরকার জেনে ফেলেছিল।

১৯১৫ সালের ৭ই আগষ্ট পুলিশ হ্যারি এণ্ড সন্সের অফিসে তল্লাসি চালাল। গ্রেপ্তার করল হরিকুমার চক্রবর্তী এবং তাঁর পুত্রকে। তল্লাসির সময় পুলিস যে সব কাগজ পত্র পেল তা থেকে সন্ধান পেল বালেশ্বর ইউনিভারসল এমপোরিয়াম শাখা অফিসের। ১৯১৫ সালের ৪ঠা সেপ্টেম্বর পুলিস হানাদিল ইউনিভারসল এমপোরিয়ামের অফিসে এবং কপ্তিপদা গ্রামের গোপন আস্তানায়। পুলিসী অভিযানের সংবাদ পেয়ে যতীন্দ্রনাথ সহকর্মীদের সঙ্গে পূর্বেই ঘাঁটি ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন। পুলিস কাউকে গ্রেপ্তার করতে পারল না।

কপ্তিপদা আস্তানায় তল্লাসিকালে পুলিস পেল সুন্দরবন অঞ্চলের একখানা ম্যাপ এবং পেনাং-এর একটি সংবাদপত্রের কাটিং যাতে ম্যাভারিক জাহাজের খবর ছিল।

কলিকাতাস্থ হ্যারি এণ্ড সন্স অফিস তল্লাসির সংবাদ যতীন্দ্রনাথের না জানার কথা নয়, তবু কেন তিনি এতদিন বালেশ্বরে থাকলেন বুঝা যায় না।

বহির্যোগ শূন্য গ্রাম অঞ্চল নিরাপত্তার দিক দিয়ে যে অনুপযোগী, তা তো তিনি জানতেন।

সে যাই হোক, নায়ক যতীন্দ্রনাথ মুখার্জি তাঁর চার সতীর্থ চিত্তপ্রিয় রায় চৌধুরি, নীরেন্দ্র দাশগুপ্ত, মনোরঞ্জন সেনগুপ্ত এবং যতীশ পালকে সঙ্গে নিয়ে বুড়ীবালামের তীর বরাবর এগিয়ে চললেন। পুলিস বাহিনী মিঃ টেগার্টের নেতৃত্বে তাঁদের অনুসরণ করে চলল। বিপ্লবী নায়কের গন্তব্যস্থল কোথায় ছিল তা অজ্ঞাত রয়ে গিয়েছে। তবে তিনি যে পুলিসের হাতে ধরা দিতে চান নি সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নেই।

নির্বিঘ্নে দূরে সরে পড়ার ক্ষেত্রে তাঁদের প্রধান অন্তরায় হয়ে দাঁড়াল অশিক্ষিত গ্রাম্য জনতা। তাদের মনে সন্দেহ হল যে, এঁরা সরকার কর্তৃক বহু প্রচারিত সেই ভয়ংকর স্বদেশী ডাকাত ছাড়া আর কেউ নন। জনতা বিপ্লবীদের পিছু নিল।

চারদিন ধরে অবিশ্রান্ত পথ হাঁটার পর বিপ্লবীরা এসে পৌঁছলেন চাষবন্দ গ্রামের কাছে। সাঁতরে বুড়ীবালাম পার হয়ে, নদী তীরে ছোট একটা মাটির ঢিবির পিছনে এসে তাঁরা পজিশন নিলেন। বিপ্লবীরা তখন খুবই ক্লান্ত, ক্ষুধা তৃষ্ণায় কাতর। অন্যদিকে পুলিসদল ও জনতা দুদিক দিয়ে তাদের ঘিরে ফেলেছে। তারিখ ১৯১৫ সালের ৯ই সেপ্‌টেম্বর। পুলিসবাহিনী বিপ্লবীদের লক্ষ্য করে গুলি ছুড়তেই, বিপ্লবীদের হাতের পিস্তল গর্জে উঠল। শুরু হল সম্মুখ সমর। কিন্তু বিশাল পুলিসবাহিনীর সহিত পাঁচটি তরুণের যুদ্ধ কতক্ষণ চলতে পারে। যুদ্ধরত অবস্থায় চিত্তপ্রিয় মৃত্যুবরণ করলেন, নায়ক যতীন্দ্রনাথ মারাত্মকভাবে আহত হলেন। রণক্লান্ত অবশিষ্ট তিন বিপ্লবী সাদা নিশান উড়িয়ে দিয়ে যুদ্ধ সমাপ্তি ঘোষণা করলেন।

পরদিন বালেশ্বর হাসপাতালে মহানায়ক যতীন্দ্রনাথের মৃত্যু হল। নীরেন ও মনোরঞ্জন ফাঁসীতে প্রাণ দিলেন। যতীশের হল ১৪ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড। তিনি জেল থেকে আর বের হতে পারেন নি, ১৯২৪ সালে জেলেই তাঁর মৃত্যু হয়।

বিপ্লব আয়োজন কিন্তু তখনো একেবারে স্তব্ধ হল না। রাসবিহারী বসু জাপানে গিয়ে নিশ্চেষ্ট হন নি। তিনি অস্ত্র সংগ্রহের চেষ্টা চালিয়ে গিয়েছিলেন। সাংহাই থেকে অস্ত্র প্রেরণের একটা ব্যবস্থাও তিনি করেছিলেন। রাসবিহারী সেই উদ্দেশ্যে অবনী মুখার্জীকে সাংহাইয়ে পাঠান কিন্তু অবনী মুখার্জী পথিমধ্যে সিঙ্গাপুরে ধরা পড়েন এবং অস্ত্র প্রেরণের শেষ চেষ্টা ব্যর্থ হয়।

জার্মানীর অস্ত্র সাহায্যে বৈপ্লবিক অভ্যুত্থানের এইপ্রয়াস কেন ব্যর্থ হল, কিভাবে ব্রিটিশ সরকারের হাতে বিপ্লব প্রচেষ্টার তথ্য পৌঁছল, কে বিশ্বাসঘাতকতা করল, সে সব দুর্ভাগ্যজনক ঘটনার ময়নাতদন্ত এখন নিরর্থক। এ কথা মনে করলেই যথেষ্ট যে, গুপ্ত সংগঠনের পক্ষে ব্যাপক কর্মকাণ্ড ও দীর্ঘ প্রস্তুতির ক্ষেত্রে গোপনীয়তা রক্ষা সহজ নয়। দেশব্যাপী আয়োজনের পক্ষে তা উপযোগীও নয়।

বিপ্লব সংগ্রাম ব্যর্থ হয় না। বিপ্লবীর জীবনে পরাজয় নেই। যতীন্দ্রনাথ ভবিষ্যতের কথা ভেবেই সম্মুখ যুদ্ধে স্থির মৃত্যুর পথ বেছে নিয়েছিলেন। বর্তমানের চিন্তা তাঁকে স্পর্শ করে নি। যতীন্দ্রনাথ ও তাঁর সতীর্থদের নির্ভীক আত্মদান বৃথা হয়নি, বিপ্লবী সংগ্রামের পরবর্তী ইতিহাস তার সাক্ষ্য দেয়। তিনি যে বিপুল সাহস ও আদর্শ নিষ্ঠার দৃষ্টান্ত

(শেষাংশ ৩৫ পাতায় দেখুন)

স্মরণীয় যাঁরা, বরণীয় যাঁরা—

মহারাজ ত্রৈলক্যনাথ চক্রবর্ত্তী

নববর্ষে "বিপ্লবী বাংলার" নিকট দাবী

—ব্রজেন্দ্রচন্দ্র দাস

৯ই সেপ্টেম্বর বিপ্লবী বাংলা দশম বৎসরে পদার্পন করল। এই দশ বৎসরের সাধনা ও প্রচেষ্টায় স্বাধীনতা সংগ্রামে বিপ্লবী আন্দোলনের অবদান কেবলমাত্র স্বীকৃতি লাভেই সমর্থ হয় নাই; স্বাধীনতা সংগ্রামীদের ন্যায্য সম্মানও আদায় করেছে। গত ১লা আগষ্ট হ'তে স্বাধীনতা সংগ্রামী-দের ভাতার পরিমান বৃদ্ধি হল, ভাতাকে 'Swan-tantrrata Sainik Samman pension' আখ্যা দেওয়া হল। ইন্দিরা সরকারের এই সিদ্ধান্ত সরকার চরিত্রের বৈপ্লবিক পরিবর্তনের সূচনা বলা যায়। স্বাধীনতা সংগ্রামীদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন তাঁদের আদর্শ ও দৃষ্টিভঙ্গির প্রতি শ্রদ্ধা জানান, কিন্তু কেবল শ্রদ্ধাপ্রদর্শনই যথেষ্ট নয়, বাস্তব রূপায়নে ব্রতী হওয়া ও প্রচেষ্টা চালানই প্রকৃত শ্রদ্ধা। আগামীতে বিপ্লবী বাংলার সাধনা হবে বিপ্লবীদের আত্মবিচার করে এঁদের সাধনার মর্মবানী তুলে ধরা এবং জাতির অগ্রগতির পাথেয়র দিশারী দিয়ে সরকারকে নাড়া-চাড়া দেওয়ার প্রচেষ্টায় ব্রতী হওয়া।

বিপ্লবীরা বিশ্বাস করত ভারত এক, অবিভাজ্য। বিপ্লবীদের ধ্যানের ভারত খণ্ডিত হল। খণ্ডনের পাপকার্যে বাঁধা দেওয়ার জন্য বিপ্লবীরা মৃত্যুপন করে দাঁড়াতে পারে নাই। যখন বাঁধা দেওয়া, সংগ্রাম করা অপরিহার্য্য ছিল, তখন বিপ্লবীরা সাধনার আদর্শ অম্লান রাখার বীরত্বতা দেখাতে পারে নাই; বিপ্লবীরা যেন 'বিদ্রোহী রণ-ক্লান্ত' হয়েছিল। আজ কোন্ কোন্ রাজনৈতিক নেতার ভুলভ্রান্তিতে অদূরদর্শিতায় ভারত খণ্ডনের মত মিথ্যাচার অনুষ্ঠিত হল, এর ফলে ভারতের সংহতি আজ বিপন্ন সেই দোষ কীর্ত্তন করার উৎসাহ না থাকাই উচিত। বিপ্লবীরা যথাসময়ে মৃত্যুপন করে সত্যের ধ্রুবপথ গ্রহণ করে ভারত আত্মার মর্মবাণীর প্রতি নিষ্ঠা দেখাতে পারে নাই, এই আত্মসমালোচনা তুলে ধরলে বর্ত্তমান নেতাদের আত্মবিচার ফিরে আসার সম্ভাবনা। সতীর্থ শহীদ-দের স্মরণকালে বিপ্লবীরা বর্ত্তমান যুগের যুবকদের সঙ্গে শ্রদ্ধা জানাবে নিশ্চয়ই, সঙ্গে সঙ্গে বিপ্লবী হিসাবে কর্ত্তব্য পালন করা হয় নাই এই গ্লানি বোধকেও স্বীকার করা দরকার।

বাংলার বিপ্লবী কর্মিদের যে দিনের প্রেরণা, সেদিনের অমোঘ বাণীর অপরিমেয় অপ্রতিহত আবেদনের কথা স্মরণ করতে হবে। জীবন মৃত্যু পায়ের ভৃত্য করে তরুণের দল সেই অমোঘ-বাণীর আহ্বানে সাড়া দিয়েছিল। পরবর্ত্তীকালের ধ্রুব মৃত্যু জেনে নিজেকে বিসর্জন দিয়েছে যুবকরা নকসাল আন্দোলনে। কিন্তু বিপথগামী হয়ে ভারত মাতার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেছে! ফলে সামাজিক অংক্ষয় দূর হয় নাই, ধাপে ধাপে নীচের দিকেই চলেছে। ইহার জন্য ক্ষোভ প্রকাশ না করে ঐতি-হাসিক কারণ নির্ণয় করতে হবে এবং প্রতিকারের পন্থা তুলে ধরতে হবে।

বিপ্লবীযুগের চেতনা ও আবেদন এখনও কেবলমাত্র স্মৃতি নয়, উহার প্রভাব এখনও রয়েছে বিপ্লবীদের চিন্তায় ও মানসিকতায়। মাঝে মাঝে ব্যতিক্রমের লক্ষণ দেখা দেয়, ইহাকে কশাঘাত করতে হবে। দেশের বর্ত্তমান অকল্যাণকর পরিস্থিতিকে নিয়তির

বিধান বলে বিপ্লবীরা মানিয়া লয় নাই। আবার প্রতিকারের কার্য্যকর সামর্থও পায় না। দুঃখ আছে, বেদনা আছে, কিন্তু বিপ্লবী হিসাবে আজ সমাধানের পথ পরিক্রমায় অক্ষম। স্বাধীন ভারতে বিপ্লবীগণ ভিন্ন ভিন্ন রাজনৈতিক দলভুক্ত, মত ও পথ আলাদা. একেবারে বিপরীত মতিগতিতে বিভক্ত। বিপ্লবী-যুগেও ভিন্ন ভিন্ন দল ছিল, কিন্তু দেশের প্রতি অকৃত্রিম ভালবাসাই তাঁদের ইংরেজের বিরুদ্ধে লড়ায়ে একত্রে টেনে এনেছে। জাতীয় সংহতি রক্ষার্থ ও দেশের অগ্রগতির জন্য বিপ্লবী বাংলাকে এই সহযোগিতার আবেগে ফিরিয়ে আনার চেষ্টায় ব্রতী হতে হবে।

বিপ্লবীযুগে স্বাধীনতা সংগ্রামের মূলমন্ত্র ছিল এক জাতি, একপ্রাণ, একতা। আজ গণতান্ত্রিক স্বাধীন ভারতে সেই সংহতি নাশের ও ভাঙনের তাণ্ডব। গণতন্ত্র আজ দুর্বল, বিধাগ্রস্ত, জাতীয় চরিত্র আদর্শ ভ্রষ্টতায়, দুর্নীতিতে ও মিথ্যাচারে কলুষিত। জ্ঞান ও ত্যাগের ভারত ভূমিতে অজ্ঞান ও স্বার্থলিপ্সার প্রাদুর্ভাব। বিকৃত প্রচার ও প্রেরণায় আজকের তরুণরা দেশ ও জাতির মহত্তর সাধনার প্রতি শ্রদ্ধাহীন। ভারতীয় সংস্কৃতির মূল্যবোধ বিড়ম্বিত। আচার ব্যবহারে, শালীনতায় কিছুই না মানার স্বাধীনতায় স্বাধীনতা ব্যভিচারে পর্য্যবসিত। এই অশ্রদ্ধা ও না মানার দম্ভ অবরদস্তি ও বলদর্পীয় হিংস্রতায় আত্মপ্রকাশ করছে। সমাজ জীবনে সৌভ্রাত্র, শিক্ষা সংস্কৃতি, শুচিতা বিকল, চিন্তা ও কর্মে অরাজকতা। দেশের এই পরিস্থিতিতে বিপ্লবীরা শুধু দ্রষ্টামাত্র হয়ে থাকতে পারে না। তার সে দিনের চেতনা তাকে প্রেরণা দেয়। তার দেশপ্রেম ও স্বার্থলেশহীন বিপ্লব চরিত্র কিভাবে দেশের কল্যাণে সার্থক হবে সেই নিশানা তুলে ধরাই বিপ্লবী বাংলার আগামী দিনে দায়িত্ব। সার্থক হউক বিপ্লবী বাংলার অভিযান।

জয়তু বিপ্লবী বাংলা—

(৩১ পাতার পর)

রেখেছিলেন তা বাংলার বিপ্লবীদের পরম শত্রু মিঃ টেগার্টের চিত্তকেও মুগ্ধ না করে পারেনি। তাঁকেও তাই বলতে হয়েছিল—'The greatest revolutionaries I have ever met is the Bengal Brand. In sheer excellence of character, they surpass their Counterparts in any other Country.' সেই বিপ্লবী বাংলা বেঁচে আছে, বেঁচে থাকবে। বিপ্লবী বাংলা জিন্দাবাদ। জয় হিন্দ্।

"পরের উপকার করিয়া কিছু প্রত্যাশা করিবেনা, প্রশংসারও আশা রাখিবেনা। নিঃস্বার্থভাবে নিজেকে বিলাইয়া দিবে।"

—ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর।

নব ভারতের হলদীঘাট—বুড়ি বালাম

—সমীর পাল

১৯১৫ সাল।

উড়িষ্যার নীলগেরি পাহাড়ের দেশে বুড়ি বালাম নদীর তীরে দুর্গম ময়ূরভঞ্জ জঙ্গলবেরা একটি জায়গা-নাম কাপ্তিপোদা, বালেশ্বর শহর থেকে দূরত্ব কুড়ি মাইল। এই কাপ্তিপোদার মঙ্গলদিহা গ্রামে আত্ম-গোপন করে আছেন বিপ্লবী বাঘাযতীন। সঙ্গে তাঁর দুই বিশ্বস্ত সহকর্মী—চিত্তপ্রিয় রায়চৌধুরী মনোরঞ্জন সেনগুপ্ত। ছ'সাত মাইল দূরের তালদিহা গ্রামে আরো দু'জন—নীরেন দাশগুপ্ত, জ্যোতিষ পাল। অস্ত্র বোঝাই জার্মান জাহাজ 'মাভেরিকে'র আসার কথা বঙ্গোপসাগরের পারের এই কাপ্তি-পোদায়। বিকল্পে সুন্দরবনের রায়মঙ্গলে। ওখানে আছেন আরেক সহকর্মী যাদুগোপাল। এই অস্ত্র এলেই সুরু হবে বাংলার মুক্তিযুদ্ধ।

৮ই সেপ্‌টেম্বর ১৯১৫।

না, জার্মান যুদ্ধজাহাজ নয়, অসতর্ক মুহূর্তে ফেলে দেওয়া চিরকুটের সূত্র ধরে বালেশ্বরে উপস্থিত হল কোলকাতার কুখ্যাত পুলিশ-কমিশনার চার্লস টেগার্ট, ডি, আই, বির কর্তাব্যক্তি ডেনহাম। গ্রামবাসী মারফত খবর এল বাঘাযতীনের কাছে, হাতে সময় ছিল। তখনও রওনা হলে হয়তো নিরাপদে সরে পড়া যেত। কিন্তু না, বাঘাযতীন অন্য দুই সহকর্মীকে সঙ্গে না নিয়ে যাবেন না। তিনি যে ওদের নেতা। তালদিহা গ্রাম থেকে অন্য দু'জনকে সঙ্গে নিয়ে যখন রওনা দিলেন সমুদ্রের দিকে, তখন অনেকটা সময় পেরিয়ে গেছে। ইতিমধ্যে অনেকটা ব্যবধানও কমিয়ে এনেছে হাতির পীঠে সওয়ার ওই দুই কুখ্যাত পুলিশ অফিসার। তত্ক্ষণে ওইসব অঞ্চলে ঘোষণা করা হয়েছে জার্মান গুপ্তচর বাঙ্গালী ডাকাতদের ধরিয়ে দিলে মাথাপিছু দু'শ টাকা পুরস্কার দেওয়া হবে। ততক্ষণে ওই অঞ্চলের গ্রামবাসীরা অনেকেই ইনামের লোভ এবং সতর্ক চোখ নিয়ে ডাকাত ধরার কাজে নেমেও পড়েছে। বিপ্লবীরা এসে পড়লেন গোবিন্দপুর গ্রামে, এখানে একটা ছোট নদী পেরোতে হবে। খান চার পাঁচেক নৌকা, ঘাটে বাধা ছিল। মাঝিদের একজন সন্দিহান হয়ে নিঃশব্দে সরে পড়ল এবং খবর দিল গ্রামের দফাদারকে। বিপ্লবীদের সঠিক অবস্থান পৌঁছে গেল পুলিশের কাছে। নদী পেরিয়ে বিপ্লবীরা ইতিমধ্যে পৌঁছে গেছেন চাষখণ্ড গ্রামে। গ্রামের মোড়ল রাজু মহান্তি দলবল নিয়ে ওদের পিছু নিল। বুঝিয়ে সুঝিয়ে ওদের নিবৃত্ত করার চেষ্টা ব্যর্থ হলে মনোরঞ্জনের গুলি রাজু মহান্তিকে ফুঁড়ে ফেলল। পরবর্তীকালে বৃটিশ সাহেবরা ওখানে রাজু মহান্তির মূর্তি বসিয়ে তাকে শহীদের মর্যাদা দিয়েছিল। শোনা যায় দেশীয় সাহেবরাও তাতে মালা চড়িয়েছিল বেশ কিছুদিন। পরে অবশ্য বালেশ্বর জেলা বাঘা-যতীন স্মৃতিরক্ষা সমিতির প্রচেষ্টায় মূর্তিটিকে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে।

৯ই সেপ্‌টেম্বর।

দুপুর নাগাদ বিপ্লবীরা এসে পৌঁছলেন চাষখণ্ড গ্রামে। না, আর যাওয়া গেলনা। চাঁদিপুরী ছাউনী থেকে গোরা সৈন্য বালেশ্বর থেকে পুলিশ ফৌজ তত্ক্ষণে পৌঁছে গেছে সেখানে। পৌঁছে গেছে টেগার্ট এবং ডেনহাম। বিপ্লবীরা দেওয়ান নামে একটা ছোট্ট, শুকনো পুকুর পাড়ে আশ্রয় নিলেন। পুকুরের চারপাশে উঁচু মাটির ঢিবির আড়াল থেকে সুরু হল ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের

পথম পরিক্ষা যুদ্ধ। অসম লড়াই একদিকে ক্ষুধায়, তৃষ্ণায়, পথশ্রমে কাতর বিপ্লবী যুবকের দল, অন্যদিকে সুসজ্জিত সৈন্য এবং পুলিশ বাহিনী। বিপদ একা আসেনা। বাঘাযতীনের সঙ্গে গুলি ভর্তি চামড়ার ব্যাগ ছিল। তার চাবিটি পাওয়া গেলনা, ফলে, ব্যাগভর্তি গুলি রইল সঙ্গে ; একটাও ব্যবহার করা গেলনা। বেশ কিছুক্ষণ যুদ্ধের পর অকস্মাৎ পুলিশের গুলীতে চিত্তপ্রিয় গড়িয়ে পড়লেন পুকুরের শুকনো মাটিতে। তাকে দু'হাতে ধরে তুলতে গিয়ে বাঘাযতীন গুলিতে আহত হলেন। গুলী এসে লাগল প্রথমে বাঁহাতে, পরে তলপেটে, না আর যুদ্ধ নয়, বাঘাযতীনের নির্দেশে সহকর্মীরা আত্মসমর্পন করলেন। বাঘাযতীনকে আনা হল বালেশ্বর সামরিক হাসপাতালে। পরের দিন তিনি মারা গেলেন। মারা যাওয়ার আগে সমস্ত কিছুর দায়-দায়িত্ব নিজের কাধে তুলে নিয়ে বন্দী সহকর্মীদের প্রতি উদার আচরণের অনুরোধ জানিয়েছিলেন। বৃটিশ রাজশক্তি উদারতার অনন্য নজির রেখেছিল মনোরঞ্জন, নীরেনকে ফাঁসী দিয়ে, জ্যোতীষ পালকে আন্দামানে পাঠিয়ে।

এই হল সংক্ষেপে বুড়ি বালামের লড়াই, কাজি নজরুল ইসলামের ভাষায়—'নব ভারতের হলদীঘাট' বালেশ্বর যুদ্ধের কাহিনী।

বালেশ্বর যুদ্ধের তাৎপর্য কি ? এতদিন ছিল বৃটিশ রাজশক্তির বিরুদ্ধে একক আত্মদানের বলিষ্ঠ উজ্জ্বল সাক্ষ্য রাখা বালেশ্বর যুদ্ধ প্রথম দলবদ্ধ সংগ্রামের অনন্য নজির। বিদেশী শক্তির সাহায্যে দেশোদ্ধার পরিকল্পনাও এই যোধহয় প্রথম উত্তর পর্বে যা নেতাজীকে অনুপ্রাণিত করেছিল। এছাড়াও সবচেয়ে যেটা বড় তাহল-১৯১৫ ২১শে ফেব্রুয়ারী রাসবিহারী বসুর নেতৃত্বে 'ইণ্ডিয়ান রিপাব্লিকান আর্মি' সারা দেশে বিপ্লবী অভ্যুত্থানের পরিকল্পনা নিয়েছিলেন। ইউরোপে তখন প্রথম বিশ্বযুদ্ধের রণদামামা বেজে উঠেছিল। এই সুযোগে যুদ্ধে ব্যস্ত বৃটিশ সিংহকে আঘাত হানার দেশব্যাপী প্রয়াসে 'আর্মি'র বিপ্লবীরা এবং গদর পার্টি সামরিক ছাউনীতে ঘুরে ঘুরে এই পরিকল্পনা ছড়িয়ে দিয়েছিলেন ভারতীয় সেনাদের মধ্যে। পরিকল্পনার চূড়ান্ত পর্বে কৃপালসিং সমস্ত ফাঁস করে দিল। অসাবধানতা এবং বিশ্বাসঘাতকতার ফুটো দিয়ে বৃটিশ রাজশক্তি বার বার ভারতীয় বিপ্লবীদের স্বপ্ন এবং সাধনার 'লোহার বাসর ঘরে' হানা দিয়ে গেছে। এবারও তার অভাব ঘটলনা. প্রচণ্ড ধরপাকড় শুরু হল। ফাঁসী এবং যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরে পরিকল্পনার রচয়িতারা আত্মাহুতি দিলেন এক অর্থপিশাচ দলীয় কর্মীর ক্ষমাহীন বিশ্বাসঘাতকতায়। রাসবিহারী বসু গা ঢাকা দিয়ে চলে এলেন কোলকাতায়। এক বিপুল সম্ভাবনার বিরাট বিপর্যয় তাকে সামরিক হতাশাগ্রস্থ করে তুলল। বাঘাযতীন দেখা করলেন তাঁর সঙ্গে। বললেন—ভারত অভ্যুত্থান ব্যর্থ হল। আমরা বাংলা দেশেই সুরু করব মুক্তি যুদ্ধ। একদা এই বাংলাদেশেই দেশের স্বাধীনতার সূর্য্য অস্ত গেছে। এই বাংলাদেশেই তার নবোদয় আমরা সম্ভব করব। জার্মান-যুদ্ধজাহাজ 'মাভেরিক' অস্ত্র এবং অর্থ আনবে। সেই অস্ত্রে এবং অর্থেই সুরু হবে মুক্তিযুদ্ধ, না, এই আয়োজন সার্থক হয়ে ওঠেনি ঠিকই কিন্তু পাঁচজন বিপ্লবী বুড়ি বালামের তীরে সারাভারতের ভেঙে পড়া বিপ্লবী-মানসিকতার মরা গাঙে জোয়ার তুলে দিয়ে গেছেন। বৃটিশ রাজশক্তি

(শেষাংশ ৪০ পাতায় দেখুন)

॥ এই দেশ—এই আমি ॥

—মলয় ঘোষ

স্বপ্ন দেখেছিলাম একদিন আমরা। দেশকে স্বাধীন করার স্বপ্ন। শরীরের ঘাম রক্ত আর চোখের জলের বিনিময়ে চেয়েছিলাম মা মাটি মানুষের বন্ধন-মুক্তি। অসংখ্য শহীদের রক্তদানের মূল্যে বিদেশী শাসনের নাগপাশ থেকে মুক্ত ক'রে গড়ে তুলতে চেয়েছিলাম আমাদের সাধের ভারতবর্ষকে। আজ প্রশ্ন করার দিন এসেছে। স্বাধীনতার তেত্রিশ বছর পরে জমা খরচের হিসাব নিকাশ করতে বসে আজ আত্মসমীক্ষার সময় এসেছে—আমরা কি সফল হতে পেরেছি?

যদি পারতাম তবে সাম্প্রদায়িকতা, প্রাদেশিকতা আর আঞ্চলিকতার বিষবাষ্প এইভাবে আমাদের বা কিছু শুভবুদ্ধিকে ঢেকে রাখতে পারতোনা, মানুষ হরিজন বস্তিতে আগুন জ্বালিয়ে রক্তের হোলিখেলায় মেতে উঠতোনা আমার দেশবাসী। এ আমাদের ব্যর্থতা, আমাদের পরাজয়। দেশকে আমরা মাতৃ-ভূমি ব'লে মেনে নিতে পারিনি, তার মর্য্যাদার যথাযথ মূল্যায়ন করতে শিখিনি।

দেশ কি শুধুই মাটি? কিছু গাছপালা, পাহাড় পর্বত আর নদীনালার সমষ্টি এক ভূখণ্ড মাত্র! দেশ মানুষের। ভালবাসা আর সমতার। এক পবিত্র স্বপ্নের। মানুষ আর মানুষের জীবন নিয়েই দেশের আক্ষরিক ভূগোল। দেশবাসী, সাধারণ মানুষ যদি নির্যাতিত হয়, বঞ্চিত হয়, অপমানিত হয়—দেশ সেখানে বাঁচতে পারেনা। আজ যেখানে যত অন্যায় হচ্ছে, বৈষম্য ঘটছে, লাঞ্ছনা আর অপমানের ফুল-ডোজার চালিয়ে দেশের মাটিকে ও মাটির সন্তানকে ক্ষতবিক্ষত করা হচ্ছে—আসামে, ত্রিপুরায়,—সমগ্র উত্তর পূর্বাঞ্চলে, মোরাদাবাদে—ততোই মাতৃভূমির অবমাননা ঘটছে—তিলে তিলে মৃত্যুবরণ করছে দেশমাতৃকা।

আসামের ঘটনা একটি নিদর্শনমাত্র। ব্রহ্মপুত্রের দুই তীরে, গ্রামে গ্রামে পোড়া অন্ধকারের স্তূপ, অর্ধভুক্ত নরদেহ, অস্থির পাহাড় সমগ্র দেশের অবক্ষয় ও ধ্বংসমুখীনতারই এক ইমেজারি—এক অতিবাস্তব রূপকল্প।

একই দেশের মানুষ দেশের যে কোন স্থানে নিরাপদে, সুরক্ষিত, নিশ্চয়তায় কেন বসবাস করতে পারবে না, কেন বংশপরম্পরায় জীবন অতিবাহিত করার পরেও তাকে 'বিদেশী' আখ্যা গ্রহণ করতেও সেই কারণে বিতাড়িত হতে হবে, এ প্রশ্নের সমাধান স্বাধীন ভারতবর্ষ তার তেত্রিশ বছরের জীবন পঞ্জীতে গড়ে তুলতে সক্ষম হয়নি। সম্প্রদায়গত বৈষম্য যেখানে বিচার্য নয়, অবস্থাগত সাম্যহীনতা সেখানে অন্ধ অসন্তোষের ইন্ধন জোগায়। আবার স্বাচ্ছন্দ্যের মাপকাঠির পরিবর্তে সংখ্যাগত তারতম্যও কোথাও পৃথক রাষ্ট্রের দাবী জানায়! প্রকৃতপক্ষে এ সবই এক অপরিণত মানসিকতায় স্বাধীনতাপ্রাপ্ত ভূখণ্ডের অনিবার্য ব্যাধির প্রকাশ—যা দেশকালের কথা চিন্তা করেনা, জাতীয় স্বার্থের দিকে ফিরে তাকায় না।

বাঙ্গালীর সঙ্গে অসমীয়াদের সম্পর্ক দীর্ঘদিনের, ঠিক যেমন ত্রিপুরায় পার্বত্য উপজাতি সম্প্রদায়ের সঙ্গে সমতলবাসীদের সামাজিক ও সংস্কৃতিক আদান-প্রদান্ ঐতিহাসিক তথ্যে সুপ্রতিষ্ঠিত। আসামবাসী বাঙালী বংশপরম্পরায় অসমীয়া সংস্কৃতিকে বাঙালী কৃষ্টির সঙ্গে মিলিয়ে নিয়েছেন—আসামীরাও বঙ্গভাষা ও সংস্কৃতির রসাস্বাদন করেছেন আগ্রহের সঙ্গে। আসামের কামাক্ষা বাঙালীর তন্ত্রসাধনার পীঠস্থান

হয়ে উঠেছে—অসমীয়ার বৈষ্ণব কালচার উৎসসন্ধান করেছে বাংলার নবদ্বীপে। অসমীয়া 'চিলু' আর বাঙালী 'টুসু', 'ছৌ' নাচ মিলে মিশে একাকার হয়েছে। ভূপেন হাজারিকার গান বাঙালীমনকে উদ্দীপ্ত করেছে, রবিসংকরের সেতার আসামবাসীর প্রাণে ঝড়ের মাতন তুলেছে। বাংলার রবিঠাকুর, নজরুল আর আসামের অজিত বরুয়া, হোসেন বরগোহাই, অথবা রজনীকান্ত বরদলৈর লেখনী বার বার একই সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করেছে, তা হল মানবতার সত্য, ভারতবর্ষের সমস্ত জাতের, সমস্ত সংস্কৃতির অখণ্ডতার সত্য। এই সত্যকে ভিত্তি করেই বিশাল ভারতবর্ষ দাঁড়িয়ে আছে। দাঁড়িয়ে আছে তার 'সেকুলারিজমের' সুপ্রাচীন ঐতিহ্য ও আদর্শ নিয়ে।

'এই ভারতের মহামানবের সাগরতীরে' যে অসংখ্য জাতি বর্ণ ও ধর্মের সমাবেশ, যা এই বিশাল ভূখণ্ডকে এক আশ্চর্য্য বৈচিত্র দান করেছে, এদের সম্মিলিত শক্তিই ভারতরাষ্ট্রের সাংবিধানিক কাঠামোকে সুদৃঢ় করে তুলেছে। এই ধর্ম ও সম্প্রদায় নিরপেক্ষতার আদর্শই অখণ্ড ভারতবর্ষের আদর্শ।

ভারতবর্ষের যে কোন প্রান্তে যে কোন প্রদেশের মানুষ তাঁর নিজস্ব ধর্ম, কালচার এবং ঐতিহ্যকে অনুসরণ ক'রে জীবন কাটাতে পারেন। এই কারণেই পশ্চিমবাংলার সর্দারজীদের ধুতি পাঞ্জাবী পরতে হয় না; বিহারী-মুসলমানদের করতে হয় না দুর্গাপূজা আর আসামের বাঙালীরাও তাঁদের দেবীপ্রতিমাকে 'মেখলা'র আবরণে ঢাকেন না। বিদেশে প্রবাসী বাঙালী যদি দুর্গাপূজাকে ভুলে ১লা জানুয়ারীকে নিজেদের জাতীয় উৎসব করে তোলেন, অসমীয়া ভাদু গান রূপান্তরিত হয় 'পপ সঙে,' অথবা বড়ুয়া, বরদলৈ পদবী পালটে আসামবাসী বাটলার, উইলসন পদবী গ্রহণ করেন। তবে স্বভাবতঃই জাতীয় সংস্কৃতির অপমৃত্যু হয়। বস্তুতঃ পক্ষে, সমগ্র ভারতবর্ষ জুড়ে একটিই সাংস্কৃতিক ধারা প্রবাহিত—ভারতবাসী সেই অখণ্ড সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যেরই উত্তরাধিকারী। এর মধ্যে যেমন কেরালার কথাকলি আছে, আছে পাঞ্জাবের 'ভাংড়া' তেমনি আসামের 'টুসু-ভাদু' এবং বাংলার রবীন্দ্রসংগীতও আছে। রবীন্দ্রনাথ, নজরুলের জন্য আমরা যেমন গর্বিত, ঠিক তেমনিই গর্বিত সচ্চিদানন্দ রাউতরায়, ফনীশ্বরনাথ রেণু··· কৃষণবন্দর অথবা অমৃতা প্রীতমের জন্য। এই অখণ্ড ঐক্যই আমাদের গর্ব, আমাদের বৈশিষ্ট্য এবং এর ভিত্তিতেই ভারতবর্ষ একদিন 'জগৎ-সভায় শ্রেষ্ঠ আসন লবে'।

উত্তর-পূর্বাঞ্চলের সাম্প্রতিক আন্দোলন ভারতবর্ষের এই অবিভাজ্য সত্তাকেই কুঠারাঘাত করেছে। আসাম আন্দোলনের পেছনে সত্যকারের কোন যুক্তি-নিষ্ঠতা নেই, যা' আছে তা হল মুষ্টিমেয় অবাঙালী অসমীয়ার এক অদ্ভুত আত্ম-স্বাতন্ত্র্যবোধ। আসামের কিছু মানুষ এক অদ্ভুত 'ইনফিরিয়রিটি কমপ্লেক্সে' ভুগছেন—যার জন্য প্রতিবেশী বাঙালীকে তাঁরা শত্রু ও বিদেশী বলে মনে করছেন এবং স্বপক্ষে জনমত গড়ে তুলতে চাইছেন। ত্রিপুরার পার্বত্য উপজাতিদের স্বশাসিত রাষ্ট্রের দাবিও প্রকৃতপক্ষে এই 'ইনফিরিয়রিটি কমপ্লেক্স' জাত—যদিও ত্রিপুরার সমস্যা রাজনৈতিকভাবে কিছুটা ভিন্ন। মণিপুর, মিজোরাম, নাগাল্যাণ্ডে এবং অতিসম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গে উত্তরখণ্ড ও ঝাড়খণ্ডের দাবিতে যে আন্দোলনের প্রস্তুতি নেওয়া হচ্ছে—এসবের পেছনেই সেই একই

সম্প্রদায়গত, ভাষাগত অথবা ধর্মগত বিভেদবুদ্ধি কাজ করছে—যার পরিকল্পনায় সংগঠিত হয়েছে বহুদিন আগেই—মোটামুটিভাবে ভারতবর্ষ স্বাধীন হওয়ার পুণ্য লগ্ন থেকেই। ব্রিটিশ-প্রোথিত যে সাম্প্রদায়িকতার বীজ একদিন দেশবিভাগ ঘটিয়েছিল, জন্ম দিয়েছিল হিন্দুস্থান ও পাকিস্থানের, তাই আজ বিষবৃক্ষ হয়ে স্বাধীন ভারতবর্ষের আশা আকাংখাময় ভবিষ্যতকে গ্রাস করতে এগিয়ে বসেছে। সাম্প্রতিককালের এই সব আন্দোলন ও সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামার পেছনে বিদেশী অশুভ শক্তির যে সুস্পষ্ট নির্দেশ কাজ করছে—যা অর্থের প্রাচুর্যে ও ক্ষমতার মোহে এদেশেরই কিছু মানুষকে বিচার-বুদ্ধিহীন দেশদ্রোহীতে পরিণত করেছে—এদের সক্রিয় অন্তর্ঘাতমূলক কার্যকলাপে ভারতবর্ষের সংহতি আজ বিশেষভাবে বিপন্ন, ভারতবাসীর নিরাপত্তা অনিশ্চয়তার সম্মুখীন। আসমুদ্র হিমাচল এক মহান দেশ আজ মুষ্টিমেয় স্বার্থান্বেষীর অমোঘ চক্রান্তে সামগ্রিক স্থিতিশীলতা হারাতে বসেছে।

যে কোন মূল্যে ষাট কোটি ভারতবাসীকে এই চক্রান্ত রুখতে হবে। আমার দেশের মানুষের রক্তে যে মাটি সিক্ত হয়েছে, সেখান থেকে বিভেদ আর বৈষম্যের শেকড়কে সমূলে উপড়ে ফেলে রোপণ করতে হবে ভ্রাতৃত্ব আর সংহতির বীজ। তাহলেই হবে আমাদের স্বদেশভাবনার প্রকৃত বোধন। মিথ্যার বিরুদ্ধে, দেশদ্রোহীতার বিরুদ্ধে, জাতি আর মানুষের ক্ষতিসাধনে তৎপর চক্রান্তকারীদের বিরুদ্ধে আমাদের প্রতিবাদের কণ্ঠ গর্জে উঠুক—প্রতিরোধের আগুনে ছাই হয়ে যাক বিভেদপন্থী স্বদেশী ও বিদেশী শত্রুরা। ভারতবর্ষের প্রতিটি মানুষের শপথ হোক—আমরা এক, অবিভাজ্য, সংহত। দধীচির মতো নিজস্ব অস্থিতে বজ্র তৈরী করে আমরা রক্ষা করবো আমাদের সাধের দেশকে—নেতাজী, ক্ষুদিরাম মাষ্টারদা, বিনয়-বাদল-দীনেশের স্বপ্ন আর কল্পনার অখণ্ড ভারতবর্ষকে। আমাদের জীবন দিয়ে অর্জন করে যাবো প্রতিটি দেশবাসীর নিরাপত্তা—তার খাদ্য, বস্ত্র আর আশ্রয়ের মৌলিক অধিকার, জীবন আর জীবিকার নিরন্তর সংগ্রাম।

(৩৭ পাতার শেষাংশ)

বুঝতে পেরেছিল স্বাধীনতার স্বপ্ন এদেশের মাটির নীচে অনেকদূর পর্যন্ত শিকড় ছড়িয়েছে। তাকে সাময়িক থামিয়ে দেওয়া হয়তো যাবে, পুরোপুরি কখনই নয়।

আজ ভারতবর্ষের যুবসমাজ-নীতি এবং আদর্শ-হীনতার শিকার হয়ে প্রাদেশিকতার বিচ্ছিন্নতাবাদের অন্ধ বিষবাষ্পে আচ্ছন্ন। তারা দ্রুত অবক্ষয়ের পথে এগিয়ে চলেছে আর এই সুযোগে কিছু ক্ষমতালোভী সুবিধাভোগীর দল-যারা এই সেদিন পর্যন্তও ইউনিয়ন জ্যাকের নিরাপদ আশ্রয়ে গা-ঢাকা দিয়ে ছিল, অগণিত শহীদের আত্মত্যাগের ফসল ভোগ করে চলেছে চরম নির্লজ্জতায়। বাঘাযতীন প্রমুখেরা আজ শুধু অনাদৃত মর্মর মূর্তি। তাদের শরীরের রক্তের ফোঁটায় তৈরী ইতিহাস মুছে ফেলার প্রানান্তকর প্রয়াসে অহিংস আন্দোলনের সুপরিকল্পিত জয়গানে আকাশ বাতাস মুখরিত। না, বৃটিশ রাজশক্তি যা পারেনি, আর কেউ তা পারবে না। অগণিত মানুষের মনের মণি কোঠায় এইসব বিপ্লবীদের মূর্তি উজ্জ্বল এবং স্পষ্ট হয়ে আছে এবং থাকবে। থাকবেই।

জাতীয় সংহতির জন্য প্রয়োজন রাজ্যের হাতে অধিক ক্ষমতা

বৈচিত্রই আমাদের শক্তির উৎস। ভারতের জাতীয় সংগীতে মূর্ত হয়েছে ভারতীয় সংস্কৃতিরই সুসমৃদ্ধ বৈচিত্র। আমাদের সংবিধান প্রণেতারা উপলব্ধি করেছিলেন যে শক্তিশালী ও ঐক্যবদ্ধ ভারত গড়তে হলে বিভিন্ন রাজ্যের মানুষের গণতান্ত্রিক আশা-আকাংখাকে মর্যাদা দিতেই হবে। তাই সংবিধানে ভারতকে চিহ্নিত করা হয় যুক্তরাষ্ট্রীয় গণতন্ত্র হিসাবে।

রচনার প্রাক্কালে সংবিধানের যুক্ত রাষ্ট্রীয় কাঠামো সম্পর্কে যে ধ্যান-ধারণা ছিল সেদিকে একটু ফিরে তাকান যাক। ১৯৪৭ সালে জানুয়ারীতে গণপরিষদের সামনে পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু ঘোষণা করেছিলেন : "এই প্রস্তাবে পরিষ্কার ভাবে বলা হয়েছে যে, রাজ্যগুলির আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে আমরা হস্তক্ষেপ করব না....আমরা এই কথাই বলতে চাই যে রাজ্যগুলি হবে স্বশাসিত সংস্থা। এদের থাকবে ব্যাপক স্বাধীনতা। তারা নিজেদের সুবিধামত কাজ করতে পারবে।"

কিন্তু আজ রাজ্যগুলি কেন্দ্রের অনুদানের উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল। অর্থ-নৈতিক ও অন্যান্য দাবীদাওয়া অগ্রাহ্য করে কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্যসরকারগুলির উপর পরোক্ষভাবে চাপ সৃষ্টি করে যাচ্ছে। স্বাধীনতার পর থেকে বিভিন্ন অনগ্রসর অঞ্চলের অর্থ-নৈতিক বিকাশ পুরোপুরিই অবহেলিত হচ্ছে।

এখন প্রশ্ন হল, ভারতীয় সংবিধানের যুক্তরাষ্ট্রীয় চরিত্র কি অক্ষুণ্ণ আছে?

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

আই, সি, এ, ১৩৫৭৮.... ।৮০

RegdNo. R. N. 24511/71 | Biplabi Bangla | Regd. WB/NC 77
Phone : 34-1795
বার্ষিক :—সডাক ১৫.০০ টাকা | বাষ্মাষিক ৮.০০ টাকা | মূল্য—৩০ পয়সা

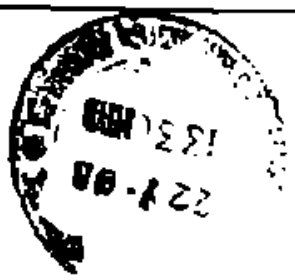

24 SEP 1980

বিপ্লবী পুস্তকমালা

অনুশীলন সমিতির বিপ্লব প্রয়াস—ব্রজেন্দ্রচন্দ্র দাশগুপ্ত—৩.০০

বিপ্লবী মহানায়ক রাসবিহারী—সুধীর মজুমদার—২.০০

ক্ষীরোদ কুমার দত্তের—

১। বাংলার অগ্নিযুগ—১.৫০

২। অনুশীলন সমিতির পি, মিত্তির—২.০০

৩। কাকোরী ষড়যন্ত্র—১.২৫

৪। রাসবিহারী ও অনুশীলন সমিতি—.৬০

৫। বিবেকানন্দ ও সমাজবাদ—.৬০

৬। মহাবোধি ও সুভাষচন্দ্র—.৪০

দেশ থাকে তেলেনি (১)—১.০০

১৩। শহীদ চট্টোপাধ্যায় আবার—.৫০

১৪। হাতিয়ে হত্যা প্রচেষ্টা—.৭৫

১৫। ভারতের জাতীয় পতাকার ইতিহাস—.৪০

১৬। ভারতের বিপ্লবী সংগ্রাম—১.০০

১৭। বহির্ভারতে ভারতীয় বিপ্লব প্রচেষ্টা—২.০০

১৮। সোভাটী সংগ্রাম কাহিনী—১.৫০

১৯। কলকাতা বাজার সংগ্রাম কাহিনী—.৪০

২০। স্বাধীনতার শহীদ মা ও মেয়ে—.৪০

২১। বিপ্লবী বিবেকানন্দ—.৫০

২২। ভারতের নবজাগরণ ও ভগিনী নিবেদিতা—.৭৫

২৩। দেশ থাকে তোলেনি (২)—২.০০

২৪। ৬৩ এপ্রিল জাতীয় শহীদ দিবস—১.০০

২৫। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও অনুশীলন সমিতি—৪.০০

২৬। লাট হত্যা প্রচেষ্টা—১.৫০

প্রাপ্তিস্থান :—৬নং বঙ্কিম ঘোষ ষ্ট্রীট কলিকাতা-৭০০০০৭

বৈপ্লবিক—১/১/১/A বঙ্কিম চ্যাটার্জী ষ্ট্রীট কলিকাতা-৭৩

— সম্পাদক মণ্ডলী —

[illegible] চট্টোপাধ্যায় (সভাপতি) শ্রীবীরেন্দ্রনাথ নন্দী, শ্রীপুলিন চ্যাটার্জী

সম্পাদক—শ্রীসুধীর রঞ্জন রায়চৌধুরী

বিশেষ বিশেষ প্রতিনিধি—শ্রীবারীন ঘোষ। বেতালা—শ্রীমনমোহন পাল।

প্রকাশক ও মুদ্রক :—শ্রীঅনিল সেনগুপ্ত। প্রচার সচিব—শ্রীসুরেন্দু সোম।

বিপ্লবী বাংলা কার্যালয় :—৬নং বঙ্কিম ঘোষ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০০৭

[illegible]—[illegible] সোসাইটি, ১১৭ নং কেশব সেন ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৭০০০০৯

বিপ্লবী বাংলা

বিপ্লবী পরিষদের সাপ্তাহিক মুখপত্র
স্থাপিত—১৯৫৬, 'বিপ্লবী বাঙ্গালী' নবকলেবরে—১৯৭১

দশম বর্ষ	শনিবার ৩রা আশ্বিন ১৩৮৭ ২০শে সেপ্টেম্বর ১৯৮০	২য় সংখ্যা

ভারতের কোটী কোটী মানুষ কেবল অন্ন চাইতেছে। তোমরা কেবল শুষ্ক কথা শুনাইতেছ। নিরন্ন, ক্ষুধার্ত মানুষদের ধর্মকথা দর্শন শাস্ত্র, শোনানো ঘোরতর অন্যায়।

—স্বামী বিবেকানন্দ

সম্পাদকীয়

— স মী ক্ষা —

পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক পরিবেশ ও প্রশাসনিক ব্যবস্থার যে শোচনীয় অবনতি ঘটছে দিনের পর দিন, তাতে দেশের মানুষ অতি সঙ্গত কারণেই উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ছেন। শুধু তাই নয়, নানাবিধ সমস্যা-পীড়িত রাজ্যটির নিকট ভবিষ্যতে উন্নতি বিধানের কোন লক্ষণও দেখা যাচ্ছে না। ফলে, জনমানসে বর্তমান অব্যবস্থার জন্য শুধু ক্ষোভই সঞ্চিত হচ্ছে না। একটা নিদারুণ হতাশাও মানুষের মনকে আচ্ছন্ন করে ফেলছে। দৈনন্দিন জীবনের অত্যাবশ্যক জিনিস পত্রের দারুণ অভাব এবং আকাশ ছোয়া ঊর্দ্ধমুখী মূল্য স্তর মানুষকে বিপর্যস্ত এবং প্রায় একটা অচল অবস্থার মধ্যে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। বিদ্যুতের অভাব ত লেগেই আছে। উৎপাদন ও সরবরাহের হার প্রতিদিন কমতির দিকে অগ্রসর হচ্ছে এবং নিকট ভবিষ্যতে এর কোন সুরাহা হবার সম্ভাবনা নেই বলেই বিদ্যুৎ মন্ত্রী প্রায় সুস্পষ্টভাবেই জানিয়ে দিচ্ছেন। অথচ কেন এই শোচনীয় অবস্থা ঘটেছে, তার মৌল কারণ নির্ণয় করতে দীর্ঘ তিন বছরের মধ্যেও সক্ষম হন নি। রোগ নির্ণয় না করতে পারলে তার সুচিকিৎসার ব্যবস্থারও কোন সম্ভাবনা থাকতে পারেনা। বিদ্যুৎ-এর অভাব শুধু প্রতিদিনের আলো পাখাই বন্ধ করেনা। এতে রীতিমত বিঘ্নিত হচ্ছে শিল্পোৎপাদন। কৃষিকর্ম, জল সরবরাহ এবং অন্যান্য অত্যাবশ্যকীয় বিভাগের কাজকর্ম। অথচ দেখে আশ্চর্য হতে হয় যে এই হীন অক্ষমতার জন্য কোন অনুশোচনা বা লজ্জাবোধের স্বীকৃতি নেই। এখনও অন্যের উপর দোষ চাপিয়ে একটা হাস্যকর কৈফিয়ৎ তৈরী করতে এরা ব্যস্ত। দলীয় বা সাংগঠনিকস্তরে এই সর্বনাশের গুরুত্ব ও গভীরতা সম্বন্ধে কোন চেতনার বিকাশ দেখা যায় না। অধিকন্তু, 'শাসকদলের কাজকর্মের ফলে দেশে একটা সাড়া পড়েছে' বলছেন মুখ্যমন্ত্রী। সাড়া পড়েছে ঠিকই, কিন্তু সেটা আনন্দের না সর্বনাশের অশনি সংকেত, এ সম্বন্ধে মতভেদ আছে। আলু, মাছ, কেরোসিন, কয়লা, চিনির মত নিতান্ত প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র সরবরাহের ক্ষেত্রে প্রায় একটা নৈরাজ্য সৃষ্টি হয়েছে। মানুষ এই অবস্থার পরিবর্তন ঘটাবার কোন পথ খুঁজে পাচ্ছে না। কিন্তু ধুমায়িত অসন্তোষ, নৈরাশ্য ও হতাশা দীর্ঘদিন চাপা থাকে না। তার প্রতিক্রিয়া হবেই একদিন, এবং সেটা সব সময় সোজা পথ ধরতে নাও পারে। রাজনৈতিক দলগুলির কেউ কেউ যদি এই

অন্ধকারের মধ্যে আলো দেখতে না পারেন। তবে সকলেই জনগণের আস্থা জানাবেন। সেটা প্রত্যেক দলেরই ভবিষ্যৎ অন্ধকারাচ্ছন্ন করে তুলবে।

ক্ষমতায় যারা আছেন, তারা সমস্যাগুলির মোকাবিলা করতে পারছেন না। তাদের কোন পরিচ্ছন্ন কার্যক্রম আছে কিনা, তাও বলতে পারছেন না। তবে স্বাভাবিকভাবেই মানুষ প্রশ্ন করতে পারে, কেন তারা গদী আঁকড়ে আছেন। গণতান্ত্রিক জমানাতে সংখ্যাগরিষ্ঠতা ও সংখ্যালঘিষ্ঠতার পরিণত হয় অকর্মণ্যতা ও অপদার্থতার দোষে। এর সাক্ষ্য ইতিহাসে ভূরিভূরি পাওয়া যায়। কাজেই বর্তমান সংখ্যা-গরিষ্ঠতা চিরদিনই কায়েমী করায়ত্ত থাকবে, কার্যক্ষেত্রে শোচনীয় ব্যর্থতার পরিচয় দিলেও, একমাত্র চরম নির্বোধ ভিন্ন এমন ভরসা কেউ করবে না।

মুখ্যমন্ত্রী জনগণকে হুঁসিয়ার করে দিয়েছেন, যে কংগ্রেস ক্ষমতায় এলে আবার মানুষের উপর আক্রমণ চালাবে। এই কি তার সরকারের ব্যর্থতার কৈফিয়ৎ? এমন প্রগলভ উক্তি দুর্ভাগ্যজনক। তা ভিন্ন মানুষ ত জীবনের প্রায় সর্বস্তরেই আক্রান্ত এবং আহত। আর নতুন করে আক্রমন চালাবার সুযোগ কোথায়? এখনত লোকে মনে করে একমাত্র অন্ত্যেষ্টিক্রিয়াটাই বা বাকী।

ব্যাপারটা যখন গোটা পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যটির, তাদের মধ্যে কেউ কি এগিয়ে এসে দেশের এই দুর্দিনে নেতৃত্ব দিতে পারবেন? সভাসমিতি, যানবাহন বন্ধ, ভাঙচুর, লম্বা চওড়া প্রস্তাব গ্রহণ প্রভৃতি কাজকর্ম মানুষ অনেক দেখেছে, দেখে দেখে বীতশ্রদ্ধ ও হয়ে পড়েছে। যারা গোটা রাজ্যের নিজেদের অস্তিত্ব প্রমাণ করতে পারে না, অথচ ফাঁকা আওয়াজের তোড়ে দেশের মধ্যে বিপ্লবীদের বন্যা বইয়ে দেবার আস্ফালন করে, তাদের কথা বাদই দিলাম। যে সমস্ত দল সর্বভারতীয় দল বলে খ্যাত, যারা বিকল্প নেতৃত্ব দিয়ে দেশকে সঠিক পথে পরিচালনা করার প্রতিশ্রুতি হামেশাই দিয়ে চলেছেন সম্প্রতি গদীচ্যুত হবার পর। তারা কি জীবিত না মৃত তার কোন পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে না। অথচ এই দুর্ভাগ্য দেশে এটাই রেওয়াজ হয়ে দাঁড়িয়েছে। জনমিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা নেই বলে, অহরহ দল উপদল সৃষ্টি হচ্ছে দেশ সেবা নয়, আত্মসেবা। এটা আজ বেশ পরিস্ফুট। কাজেই ঘোলা জলে মৎস শীকার করার একটা ক্ষীণ প্রচেষ্টা ভিন্ন, তাদের অন্য কোন ক্ষেত্রে কোন অস্তিত্ব অনুভব করা যায় না।

ছাড়া, এটাই অনেকের ধারণা।

কিন্তু একটি দল সম্বন্ধে সে কথা বলা চলে না। এই দলটি সর্বভারতে কেন্দ্রে এবং অধিকাংশ রাজ্যে ক্ষমতাসীন আছেন এবং জনকল্যাণ সাধন করতে তারা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। অন্যান্য প্রদেশের কথা বাদ দিয়ে। এই দলের পশ্চিমবঙ্গের ভূমিকা সম্বন্ধে কিছু আলোচনা অপ্রাসঙ্গিক হবে না। এই দল এখানে কি কাজে ব্যস্ত আছেন? বহুদিন পরে যদিও বা একটি অ্যাড হক কমিটি গঠিত হল তৎক্ষণাৎ তার পেছনে লেগে গিয়ে, সেই কমিটিকে দুর্বল এবং অকেজো করে দেবার লজ্জাস্কর প্রচেষ্টার অন্ত নেই। নেতৃত্বে যখন নিজেদের মধ্যে কলহে লিপ্ত, তখন সর্বজন-গ্রাহ্য কোন কমিটি কেউ কোন দিনই

করতে পারবে না। তা ভিন্ন, রাজনীতিকে যারা একটা ব্যবসায় হিসাবে গ্রহণ করে, নিজেদের আখের গুছিয়ে নিতে অশোভনভাবে আগ্রহী, তাদের সংখ্যা ক্রমবর্দ্ধমান। এরা মানুষের সমস্যার সমাধানের কাজে নিজেদের নিযুক্ত রাখার চাইতে, এম, এল, এ মন্ত্রী হবার জন্যই সমস্ত শক্তি নিয়োগ করছে। মানুষের এই দুর্দিনের সময় তাদের পাশে দাঁড়াবার মানসিকতার এত অভাব কেন? কেন সংগঠনকে নিচুতলা থেকে উপর পর্যান্ত জোরদার করার কাজে অনীহা? কেন তারা সেবার মধ্যদিয়ে, মানুষের সমর্থন পাবার প্রচেষ্টা করছেন না? সব কিছু একটি মাত্র লোক, তাঁর জনপ্রিয়তা, তাঁর নৈরাশ্য-বিজয়ী নিষ্ঠা। প্রচ্ছন্নস্থ দেশপ্রেম, অকুণ্ঠ জনসমর্থনের মাধ্যমে, এদের এক একজনকে সব কিছু করে দেবেন, এরা শুধু সুবিধামত নিজেদের যোগ্যতার অধিক অনেক কিছু ঘরে বসে উপভোগ করবেন। এ ধারা আর কতদিন চলবে চলতে পারে না বেশীদিন, এই সত্য হৃদয়ঙ্গম করলেই মঙ্গল। অন্যথায় ভরাডুবি হবে নিশ্চয়ই।

এই দলের মানুষের পশ্চিমবঙ্গে ক্ষমতার আসনে বসবার জন্য ভীষণ আগ্রহী। প্রধানমন্ত্রীর নিকট এজন্য আবেদন নিবেদন করতেও এরা সতত ব্যস্ত। কিন্তু সেটা তারা নিজেদের সংঘশক্তির জোরে নয়, নিষ্ঠা ও কর্মক্ষমতার পরিচয় দিয়ে জনগণের আস্থা লাভ করে নয়, ইন্দিরাজীর অনুগ্রহের উপর নির্ভর করেই উদ্দেশ্য লাভ করতে চাইছেন। পশ্চিমবঙ্গের মত সমস্যা পীড়িত রাজ্যে একটা এলোমেলো, সংগঠনহীন দলের হাতে ক্ষমতা অর্পণ করবেন, ইন্দিরাজী রাজনৈতিক দিক দিয়ে এত নির্বোধ নন। নিজেদের যোগ্যতার প্রমাণ রাখুন, তবেই ইন্দিরাজী ও দেশের মানুষ তাদের উপর আস্থা রাখতে পারবেন। অন্যথায় কিছুই লাভ হবে না, এটা বুঝে সুঝে কাজ করুন।

আনন্দময়ীর শুভাগমনে আমাদের প্রতিষ্ঠান
ধন্য হয়ে উঠুক

মহামায়া জুয়েলারী এণ্ড কোং

সততা, নিষ্ঠা, সুনিপুণ ও সূক্ষ্মতম অলঙ্কারাদি নির্মাণ করাই আমাদের বৈশিষ্ট

"সকলের তরে সকলে আমরা
প্রত্যেকে আমরা পরের তরে"

১০৭ বি, বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০১২

ফোন : ৩৩-২৮৫৮

সে যুগ—এ যুগ

—ভবেশচন্দ্র নন্দী

"দাদু, তোমাদের পুলিশে ধরে নিত কেন?" জিজ্ঞাসা করল আমার এক আট নয় বছরের নাতী। তারই দু'এক বছরের বড় অপর একটি ছেলে বলে উঠল—'জানিস না! দাদুরা ছিল তখনকার দিনে পাড়ার দস্যি। লোকজনকে মারত ধরত—লুঠ লোপাট করত—এই জন্যইত পুলিশে ধরে নিয়ে গিয়ে জেলের মধ্যে আটকে রাখত। দাদুও তাই জেল খেটেছে। পুলিশে ধরে নিয়ে গিয়েছিল শুধু দাদুকে নয়, অনেক লোককে।'

আমি এই খালবিলাদের মন্তব্য শুনছিলাম আর মনে মনে হাসছিলাম এই ভেবে, এই শিশুরা তাদের চারপাশে যে বাস্তব অবস্থা দেখে তারই নিরীখে বিচার করে সে যুগের স্বদেশী জেল খাটা লোকগুলিকেও। ছোট হলেও তাদের মনেও জিজ্ঞাসা জাগে—এরা জেল খাটত কেন? পুলিশ এসে এদেরকে ধরে বেঁধে নিয়ে যেত কেন? পারিপার্শ্বিক পরিবেশে, পরিবারের লোকেদের আলাপ আলোচনায়, শিক্ষার মাধ্যমে বা কোন বই পুস্তকে তারা তাদের জিজ্ঞাসার আর কোন সদুত্তর পায় না। তাই পাড়ার দস্যিদের পুলিশ বেঁধে নিয়ে যায় দেখে এবং তারই নিরীখে বিচার করে, ওদের দাদুদেরকেও পুলিশ ধরে নিয়ে আটকে রাখত কেন এই জিজ্ঞাসার। উত্তরও সহজ হয়ে যায়।

শুধু এই শিশুর দল কেন আমি বিভিন্ন আড্ডার বৈঠকে প্রবীণদেরকেও কখনো কখনো বলতে শুনেছি—"এরা এমন কি করেছিলেন—দু'চার দিন লাফালাফি করা ছাড়াত আর কিছু নয়—তারজন্য জীবনভর তাদেরকে পেনশন দিতে হবে কেন? সরকারের এ সব সিদ্ধান্ত শুধু নিজেদের দল বাড়ানোর চেষ্টা ছাড়া আর কিছু নয়। এদেরকে খুশী করে দলে ভিড়াতে পারলে দলে মস্তানের সংখ্যা বাড়বে। এইত সোজা কথা! আর একজন হয়ত টিপ্পনি করলেন, 'এতেও তারা খুশী না। আন্দোলন করে পেনশন আরো অনেকে বাড়িয়ে নিয়েছে! হ্যাঃ, সরকার এত তোষামোদী হলে সে দেশের উন্নতি হতে পারে?

আজকাল হর হামেশা এই জাতীয় মন্তব্য ও টিপ্পনি শুনে মনে সত্যই অত্যন্ত ব্যথা জাগে। কেবে আশ্চর্য্য লাগে, সেদিনকার চূড়ান্ত সংঘর্ষ ও সংগ্রামের দিনের ছবিটা মানুষের মন থেকে এত দ্রুত মুছে গেল। চোখের সম্মুখে স্পষ্ট হয়ে ওঠে এই অপরিচিত আত্মভোলা ত্যাগী কর্মচারীদের কার্যকলাপ, তাদের মূল্যায়ণ সাধনা ও আদর্শ, বর্তমান স্বাধীনতা পরের যুগের মানুষের মন থেকে কত দূরে সরে গেছে কত নিচে নেমে গেছে। শুধু এই সব টিপ্পনী থেকে কেন—আমরা যখন শ্রদ্ধাভরে মাষ্টারদা সূর্যসেন, মহারাজ ত্রৈলোক্য চক্রবর্তী, বিনয় বাদল দীনেশ প্রভৃতির পুণ্য স্মৃতিতে শ্রদ্ধা জানাতে সমবেত হই, তখন দেখি দাঁত পড়া, চুলপাকা, লোলচর্ম কিছু করেক বৃদ্ধ ছাড়া বিশেষ অন্য লোকের সমাগম হয় না। যদি বা দু'চার জন তরুণ বা মধ্যবয়সী উপস্থিত হ'ল, তারা হয়ত পরিবারগত বা দলগত হিসাবে এই মহান বীর কর্মীদের সহিত লতাপাতার কোনভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন তাই না এসে পারেন না।

আজ তাই মনে হয় এই নিষ্ঠুর সত্যকে উপেক্ষা করার উপায় নাই। সঠিক ও অভ্রান্ত পথে দেশের

মুক্তি সাধনায় নিবেদিত প্রাণ দেশের অগণিত কর্মীর যে স্বপ্ন, দেশকে মুক্ত ও সর্বাঙ্গ-সুন্দর করে গড়ে তোলার যে পরিকল্পনা, তার সঙ্গে বর্তমান যুগের মানুষের চিন্তার একটা বিরাট দূরত্ব ও বিচ্ছিন্নতা এসে জুটেছে। এই ত্রিশ পঁয়ত্রিশ বছরে এই পরিণতির কারণ কি?

সহিংস পন্থায় বিপ্লবের পরিকল্পনা নিয়ে স্বাধীনতা সংগ্রামে যারা অবতীর্ণ হয়েছিল, বিদেশী ব্রিটিশ সরকার ছাড়াও দেশের বিভিন্ন মতাবলম্বী রাজনৈতিক দলের পক্ষ থেকে ব্যাপকভাবে তাদের বিরুদ্ধে প্রতিকূল প্রচারণা হয়েছে। এ ছাড়া, বর্তমান সমাজ নানা কারণে জাতীয় আদর্শ, জাতীয় কৃষ্টি ও মানবিক নৈতিক আদর্শ ও মূল্যমান হতে অনেক নিচে চলে গেছে। পরের জন্য ত্যাগস্বীকার করা, দুঃখ ভোগ করা এমনকি প্রাণবিসর্জন দেওয়ার দৃষ্টান্ত তাদের মনে বিশেষ কোন আবেদন সৃষ্টি করে না। স্বার্থে অন্ধ মানুষ নিজের স্বার্থের বাইরে কিছু ভাবতে বা করতে কোন আগ্রহ অনুভব করে না। সেদিন গত এপ্রিলমাসে প্রবীন ভাষাবিদ ডাঃ সুকুমার সেন দেশে সাংস্কৃতিক অবক্ষয় সম্পর্কে বক্তৃতা দিতে গিয়ে বলেছেন—'সমাজ ভেঙে দল হচ্ছে। সংস্কৃতির লতাগুলি মটমট করে ভেঙে যাচ্ছে। ভদ্রতা সমবেদনার উপড় গড়ে ওঠে সে মনের বন্ধন তা হারিয়ে যাচ্ছে। এটা খুবই আক্ষেপের কথা।'

দেশের জন্য সমর্পিত প্রাণ বহুকর্মী ও নেতারও যথেষ্ট পদস্খলন ঘটেছে সত্য। স্বাধীনতা প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে তারা জীবনের আদর্শকেও তাদের অসমাপ্ত কাজের সমাপ্তির সাধনার কথা ভুলে গিয়ে স্বাধীনতার সুযোগে দেশকে গড়ে তোলার দায়িত্ব নেওয়ার পরিবর্তে, স্বাধীনতার ফল যখন সাধারণ মানুষ ভোগ করেন। ফলে তাদের জীবনে ঘটে আদর্শচ্যুতি। কিন্তু তারা আর কয়জন!

বিপুল সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিবর্তনের ফলে আজ সে যুগের কর্মপদ্ধতির অনেক পরিবর্তন হয়েছে সত্য, কিন্তু মূল লক্ষ্য ও পরিকল্পনার কোন পরিবর্তন হয় নাই। হতে পারে না। দেশকে সর্বাঙ্গসুন্দর করে গড়ে তোলার, দরিদ্রতম ব্যক্তির ঘরেও শিক্ষার আলো পৌঁছে দেওয়া, সকলের দু'বেলা পেটভরে খাওয়ার সংস্থান করা ইত্যাদিভাবে সুখী সমৃদ্ধ ভারতভূমি সৃষ্টির আদর্শ ই ছিল আমাদের মূল লক্ষ্য। পরাধীনতা ছিল এ পথের বিরাট অন্তরায়, তাই পরাধীনতা মোচনের সংগ্রাম চলে প্রথমে। সকল কর্মী শিক্ষা পায় পূর্ণ মানবত্বের সাধনায় সুন্দর হয়ে ওঠার। তারা ছিল সনাতন ভারতের ঐতিহ্যে সম্পূর্ণভাবে আস্থাবান।

যত প্রতিকূল পরিস্থিতি ঘনিয়ে আসুক না কেন স্বাধীনতা যুগের অসমা [illegible]'কার যাগে প্রাণ কে করিবে দান', স্বাদেশিকতার আদর্শে পরিপূর্ণ গৌরববোধ ও দেশের ঐতিহ্য ও কৃষ্টির পরিপন্থী বিদেশী আদর্শ ও চিন্তাধারার বন্ধনমুক্তি সংগ্রামের সেই মহান ঐতিহ্যকে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে হবে। সংকীর্ণ স্বার্থান্ধ মনোভাব দূর হবে। ব্যক্তি ও দলের উর্ধ্বে হবে জাতির স্থান। ব্যষ্টির মঙ্গলের উর্ধ্বে হবে সমষ্টির মঙ্গল। নরনারায়ন জ্ঞানে মানুষ মানুষকে শ্রদ্ধা করবে, ভালবাসবে। শ্রেণী সংগ্রাম, সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ, উঁচু নিচুর ঝগড়া, উদারতার দৃষ্টির আলোকে মহা সাম্যের গানে, মহা মিলনের সংগীতে মুখরিত হবে। দূর হবে অশিক্ষা, দারিদ্র ও স্বার্থপরতা। এই স্বপ্ন আমরা দেখেছিলাম। আজও

(বাকী অংশ পরবর্তী পৃষ্ঠায়)

বৈষম্যই সংহতির অন্তরায়

শ্রীবংশীধর বন্দ্যোপাধ্যায়

ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের বিগত বৎসরাধিক ধরে যে বিচ্ছিন্নতাবাদের ও বিচ্ছিন্নতাবোধের ঢেউ এসেছে তা ঐক্য ও সংহতির বিরুদ্ধে এক বিরাট চালেঞ্জ স্বরূপ, কারণ জাতীয় জীবনের মূল ধরে তা প্রবলভাবে নাড়া দিচ্ছে। উত্তর ভারতে যে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হালে শুরু হল তা সত্যই মর্মন্তুদ, হৃদয় বিদারক ও লজ্জাজনক ঘটনা সমষ্টি এবং ঐক্য সংহতির পক্ষে বিঘ্নস্বরূপ এক বিপদজনক অবস্থা। তেত্রিশ বছর আগে দেশ স্বাধীন হয়েছে, অথচ আজো ভারতীয়রা একটা অখণ্ড জাতি বলে নিজেদের ভাবতে শিখলো না কেন? এর মূলে প্রকৃত কারণ কি কি?

মনে হয় সীমাহীন বৈষম্য মানুষে মানুষে মিলনের পথকে জটিল করে তুলেছে, কারণ কেউ কাউকে বিশ্বাস করতে পারছে না। ধন বৈষম্য, আঞ্চলিক বৈষম্য, শ্রেণীগত বৈষম্য, সম্প্রদায়গত বৈষম্য, সামাজিক বৈষম্য, রাষ্ট্রীয় বৈষম্য প্রভৃতি যা ভারতে আজো বর্তমান তা মানুষে মানুষে প্রীতির বন্ধন না গড়ে মানুষে মানুষে বিভেদ ও বিদ্বেষের সৃষ্টি করে তুলেছে। আমরা পরস্পরকে যেন সহ্য করতে আর পারছি না।

বিভেদ ও বিদ্বেষ আমাদের মধ্যে ক্রমশই যেন মাত্রাতিরিক্ত হারে ক্রমবর্দ্ধমান। সত্যিকার একটা বলিষ্ঠ জাতি আজ অবধি বোধহয় ভূমিষ্ঠই হয় নি। তা যদি হতো, তবে এত হানাহানি, এত বাদ-বিসংবাদ, এত অযথা অকারণ হত্যাকাণ্ড নিশ্চয় যত্র তত্র যখন তখন সংঘটিত হতো না। আসলে আমরা মোটেই সহনশীল ও পরমত সহিষ্ণু নই, তাই পদে পদে [illegible] হয়।

পরস্পরের ওপর অবিচার অত্যাচার ইত্যাদি সংঘটিত হয়ে চলেছে বৈচিত্রের মধ্যে ঐক্যের স্বপ্ন দেখি, কিন্তু বাস্তবে কি তাই?

সংহতির প্রয়োজন প্রথম বোধ করি আমরা মহাচীন কর্তৃক আক্রান্ত হবে সেই বাষট্টি (১৯৬২) সালে, কিন্তু তারপর আর সে নিয়ে কেউ কি মাথা ঘামিয়েছে, না সংহতি গড়ার চেষ্টা করেছে? সংহতির যে একান্ত প্রয়োজন একটা জাতির জীবনে, তা জেনেও রাষ্ট্র নায়করা কেউ কি এ বিষয়ে কোন চিন্তা ভাবনা করেছে?

কেবল যখনই বিপর্যয় নেমে আসে তখনই ঐক্য ও সংহতির কথা বলে নেতারা তারস্বরে চিৎকার জুড়ে দেন। মরণকালে আর হরিবোল দিলে কি হবে? ভারতে বিচ্ছিন্নতাবাদের প্রথম ধূয়া তোলে দাক্ষিণাত্য। গণতন্ত্রীতে ভোটের মাধ্যমে ভিন্ন পথে চলার ঝোঁক এরা দাক্ষিণাত্যই দেখিয়েছে এতকাল। এখন উত্তর পূর্বাঞ্চলে সেই অশুভ মেঘ ঝড়ের সংকেত দিতে বার বার দেখা যায়। কি দুর্ভাগ্য অচ্ছ্যুৎজনের নামের আগে একটি 'হরি' শব্দ যোগ করলেই কি আর হরিজনেরা অচ্ছ্যুৎ থাকবে না! অতীতদিনের অবিচার, অত্যাচার ও পাপের প্রায়শ্চিত্ত কি শুধু মিষ্টি নাম দিলেই পূরণ হবে, না তাদের সঙ্গে সামাজিক বৈষয়িক ও অন্যান্য ক্ষেত্রে সমদৃষ্টি ও সমব্যবহার নিয়ে মেলামেশার আয়োজন তবে কিছুটা একাত্মবোধ জন্মাবে? কোনটা ঠিক। হরিজনরা আজো বহু ক্ষেত্রেই অনাচার ও অত্যাচারের বলি হচ্ছে অকারণ।

তাছাড়া অর্থ-নৈতিক ক্ষেত্রে তারা আজও অনগ্রসর। দুঃখ সকলকে এক করা যত সহজ কাজে

সকলকে এক করা তত সহজ নয়, কারণ বৈষম্যই সেখানে চরম বাধা।

বৈষম্যই পরস্পরকে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছে—এই সহজ ও সরল কথাটা কি আজো বোঝার কিছু অসুবিধা আছে নাকি? বৈষম্যই সবচেয়ে বড় বাধা যা আমাদের পরস্পরকে দূরে দূরে সর্বক্ষেত্রেই সরিয়ে রেখেছে। মিলনের পথে সে বাধা দুস্তর ও অনতিক্রম, তাই বৈষম্য দূরীকরণ সর্বাগ্রে প্রয়োজন সংহতির একান্ত আবশ্যকতায়। সে উদ্যোগে আয়োজন তো কৈ এখনও পরিদৃশ্যমান নয় এবং রাষ্ট্র নায়করাই এর জন্য দায়ী।

মানুষে মানুষে প্রতি স্তরে ও প্রতি ক্ষেত্রে যে সীমাহীন বৈষম্য ভারতে বিরাজমান তা একদিন না একদিন বিস্ফোরণ ঘটাবেই এবং সেদিন বেশী দূরে নয়। বৈষম্যের চোরাবালিতেই বহুদেশী চক্রান্তকারীরা ও ভারত শত্রুরা এদেশে বিচ্ছিন্নতাবোধের ও বিচ্ছিন্নতাবাদের সৃষ্টিতে সফল হয়েছে। দিকে দিকে তাই মারাত্মক বিপদ ঘনায়মান, ব্যক্তি জীবনে, সমাজ জীবনে ও রাষ্ট্র জীবনে।

দেশ নেতারা ক্ষমতা দখলের নেশায় সদা ব্যস্ত, তাই বৈষম্য দূরীকরণের ন্যায় একটা গুরুত্ব কাজে তাঁরা সময় দিতে অপারগ; বরং ভোটের বাজারে সুবিধা পাবার আশায় তাঁরাই বৈষম্যকে মূলধন হিসাবে কাজে লাগাতে বদ্ধপরিকর। এর ফলে সমগ্র দেশটা যে টুকরো টুকরো ও খণ্ড বিখণ্ড হয়ে যেতে পারে—এ কথাটাও তাঁরা ভেবে দেখার বা আলোচনা করার সময় পান না, এমনই দুর্ভাগ্য দেশবাসীর। জাতপাতের লড়াই, প্রাদেশিকতা দুষ্ট হীন মনোবৃত্তির প্রকাশ সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে রেষারেষী ও পরিণামে অযথা মারদাঙ্গা ফলে অনর্থক হত্যালীলা প্রায়শই এদেশে ঘটছে কেন?

এর মূলে সর্বত্র অস্থিরতা এবং অস্থিরতার জন্য ঐ বৈষম্য থেকেই। জীবনের প্রতিক্ষেত্রে আজো যে অস্থিরতার ঘন ঘন প্রকাশ ঘটছে এবং অনর্থক অনাসৃষ্টির পুনঃ পুনঃ সংঘটন পরিলক্ষিত হয় তা নিঃসন্দেহে বহু কষ্টার্জিত স্বাধীনতাকে ম্লান করে দিতে পারে। ভারতীয় রাজনীতিতে একটা কিছু অভাব বোধ সমগ্র জাতিকে বেশ ভারাক্রান্ত করে আচ্ছন্ন করে রেখেছে।

ফলে আমাদের অর্থ-নৈতিক-সামাজিক ও রাষ্ট্রিক ব্যবস্থা থেকে ক্রমবর্দ্ধমান বিচ্ছিন্নতাবোধ জনমনে স্বতঃই চাগাড় দিচ্ছে এবং তাও উক্ত বৈষম্যের কারণেই মূলতঃ সংঘটিত হতে দেখা যায়। আজো আমরা উপজাতি, তপশিলভুক্ত, বর্ণহিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান, শিখ, জৈন, বৌদ্ধ, সাঁওতাল, গারো, নাগা, বাসিয়া, মিয়া-মুসলমান, মণিপুরী, মারাঠি, ওড়িয়া, অসমীয়া, গুজরাটি, মধ্যপ্রদেশী প্রভৃতি নানাভাবে পরস্পরের কাছ থেকে কার্যক্ষেত্রে প্রকৃতই বিচ্ছিন্ন হয়ে আছি। পরস্পরের মধ্যে মমত্ববোধ প্রায় নেই বললেই সত্যভাষণ হয়। এই বাস্তব অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে কি ভাবে জাতীয় একাত্মবোধ ও সংহতি সত্যই বড়ো উঠবে তা ভাববার কথা। তার ওপর প্রায় প্রতিক্ষেত্রেই পরস্পরের মধ্যে যে সামাজিক অর্থ-নৈতিক ও ধর্ম বা লোকাচার গত বিরাট বৈষম্য বিদ্যমান তাতে সংহতি রক্ষা করা সত্যই দুরূহ ব্যাপার। ভাষা, ধর্ম, জীবনচর্য্যা, সবই পৃথক, সারাদেশ ছেয়ে স্বাতন্ত্র্যের তীক্ষ্ণ কুশাঙ্কুর, তবুও আমরা একটি যুক্ত রাষ্ট্রীয় প্রশাসনের মুখ চেয়ে চোখ বুজে সংহতির মরীচিকা স্বপ্নে বুঁদ হয়ে পড়ে আছি।

কিন্তু বৈষম্যের অবসান [illegible] এদেশে প্রকৃত

সংহতি গড়ে ওঠা সহজই অসম্ভব, কারণ মানুষে মানুষে সমমর্মী, সমধর্মী যতক্ষণ না বাস্তবে রূপায়িত হয় ততক্ষণ প্রকৃত ভেদবুদ্ধির বা বিদ্বেষের অবসান ঘটে না। ভাষা, ধর্ম, চারিত্র এক মূল্যবোধ সম্বন্ধে যতক্ষণ না এক সম্প্রদায়ের বা এক প্রদেশের বা একশ্রেণীর মানুষের সঙ্গে অন্য আর এক সম্প্রদায়ের, অন্য আর এক প্রদেশের বা অন্য আর এক শ্রেণীর মানুষের মনোরাজ্যে সহনশীলতা, সহমর্মবোধ ও ভালবাসা জন্ম নেয় ততক্ষণ শুধু প্রচেষ্টা চলতে পারে, কিন্তু সত্য সত্য সংহতি গড়ে ওঠে না। জীবনের প্রতিক্ষেত্রে বৈষম্য থাকবে, অথচ আমরা একজাতি, একপ্রাণ ও একতাবদ্ধ হয়ে থাকবো চিরদিন—এটা সম্পূর্ণ একটা অসম্ভব চিন্তা ও অসম্ভব ব্যাপার। বৈষম্যের অবসান ব্যতিত সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে শ্রেণীতে শ্রেণীতে বিভেদ ও বিদ্বেষের শেষ কোন দিনই কার্যকরী হবে না। মানুষ যতক্ষণ না পরস্পরকে একই অবস্থায় উপনীত হতে দেখতে পায় ততক্ষণ তাদের মধ্যে সখ্য ও ভ্রাতৃত্ববোধ জেগে উঠবে না।

কাজেই রাষ্ট্র কর্ণধার গণের সর্ব্ব প্রথম দায়িত্ব হবে এই বৈষম্যের অবসান কিভাবে সম্ভব হয় তা দেখা ও সেই ব্যবস্থাকে যত শীঘ্র সম্ভব কার্যকরী করা। অর্থনৈতিক স্বাচ্ছন্দ্য ও মুক্তি রাষ্ট্রীক মুক্তির মতই অত্যন্ত জরুরী ও আবশ্যকীয়। অর্থ নৈতিক স্বাধীনতা আনার জন্যই রাষ্ট্রীক স্বাধীনতার প্রয়োজন সর্বাগ্রে। রাষ্ট্রীক স্বাধীনতা তেত্রিশ বছর আগে এলেও অর্থ নৈতিক স্বাধীনতার অমৃত আস্বাদ এদেশের আপামর জনসাধারণ আজো পায়নি। এদেশে ধন বৈষম্য এত প্রকট যে সাধারণ মানুষ স্বাধীনতার প্রকৃত মূল্যবোধই হারিয়ে ফেলেছে, কারণ দেশ স্বাধীন হবার পর অর্থ নৈতিক পরিসংখ্যান দৃষ্টে দেখা যায় যে এদেশীয় ধনীরা আরো ধনী হয়েছে ফলে দেশের শতকরা চল্লিশভাগ মানুষ দারিদ্র সীমার নিচে বাস করতে বাধ্য হচ্ছে। অসম ধন বণ্টন হয়েছে পরিকল্পনার ত্রুটির ফলে। ধনীরাই স্বাধীনতার সুফল ভোগ করেছে আর গরীবরা অবহেলিত, শোষিত ও চরম নিষ্পেষিত হয়েছে। বঞ্চিতের দল আজো বঞ্চনার বলি, তাদের জন্য প্রকৃত দরদী মানুষের দেখা আজো পাওয়া সম্ভব হয়নি। তাই ধনীদের প্রাসাদ চূড়ায় বসে গরীবদের জন্য কোন ফতোয়াই বাস্তবে কার্যকরী করা যায় না।

ধন বৈষম্যের, শ্রেণী বৈষম্যের, সাম্প্রদায়িক বৈষম্যের আশু অবসান ছাড়া প্রকৃত সংহতি গড়া কিছুতেই যাবে না। অশান্ত আসাম, মণিপুর, ত্রিপুরা, নাগাল্যাণ্ড প্রভৃতি এলাকায় ও ছোটনাগপুর, পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, বীরভূম ও সাঁওতাল পরগণা প্রভৃতি এলাকায় প্রকৃত শান্তি ও স্বস্তি স্থাপনের জন্য চাই দরদীয়া মানুষের তথায় উপস্থিতি যাঁরা সর্ব্ব-প্রকার বৈষম্যের উচ্ছেদ সাধন করে প্রকৃত সেবার মাধ্যমে তথাকার দুঃস্থ ও নিঃসম্বল দরিদ্র মানুষের জন্য প্রাণপাত পরিশ্রমের দ্বারা ও চারিত্রিক বৈষম্যের দ্বারা সেই সব মানবমনে একাত্মবোধ জাগাতে সক্ষম হবেন। তবেই সংহতি বাস্তবায়িত হবে, নচেৎ বর্ত্তমান বৈষম্যই আমাদের মধ্যে ভেদ বুদ্ধির প্রসার ঘটিয়ে দেশকে ধ্বংস করবে।

(৫ম পাতার পর)

দেখি। দুরন্তভাবে আশাকরি এই স্বপ্ন অনিবার্য্যরূপে সফল হবে একদিন।

"হবে জয়, হবে জয়, হবে জয় রে,
ওহে বীর, হে নির্ভয়।"

'বিপ্লবী বাংলা' দীর্ঘদিন ধরে বিপ্লবীদের ইতিহাস তাদের আদর্শ, তাদের জীবন-দর্শন প্রভৃতি নিয়ে বহুমুখী আলোচনার দ্বারা যে ভাবে এই সংগ্রামী আদর্শ ও দৃষ্টিভঙ্গিকে বাঁচিয়ে রেখেছে, তাতে দেশবাসীর আন্তরিক শ্রদ্ধা ও সহযোগিতা তাদের প্রাপ্য।

'জয় হিন্দ'

ভারত বিপ্লব আন্দোলনের ইতিহাস

॥ ক্ষীরোদ দত্ত ॥

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

যোগেশচন্দ্র সতীশ সিংহের নিকট থেকে কার্য্যভার গ্রহণ করেন এবং সতীশবাবু এর পরে বাংলা দেশে চলে আসেন। যোগেশ বাবু উত্তর প্রদেশে, কাশীতে এবং অন্যত্র বিশিষ্ট কর্মীদের মধ্যে শচীন্দ্র বক্সী, মন্মথ গুপ্ত, মনোমোহন গুপ্ত, প্রবেশ চ্যাটার্জী, সুদর্শন গাঙ্গুলী, জীতেন্দ্র ভট্টাচার্য্য, অম্বিকা মৈত্র প্রভৃতিকে পান। প্রবেশ চ্যাটার্জী পরে চন্দ্রশেখর আজাদকে দলভুক্ত করেন। অন্য একজন একনিষ্ঠ কর্মী ছিলেন রাজেন্দ্রনাথ লাহিড়ী।

১৯১৩ খৃষ্টাব্দের শেষ দিকে পণ্ডিত মদনমোহন মালবা কাশিতে হিন্দু মহাসভার এক অধিবেশন আহ্বান করেন। এ সময় অনুশীলন সমিতির নেতৃস্থানীয় কর্মী রমেশ চৌধুরী এবং নলিনী কিশোর গুহ কাশীতে আসেন। রমেশ বাবুর সঙ্গে শচীন্দ্রনাথের দলীয় সংগঠন নিয়ে আলোচনা হয়। কিন্তু এ আলোচনায় শচীন্দ্রনাথ সন্তুষ্ট হতে পারেন নি। শচীন্দ্রনাথ যুক্তপ্রদেশ সংগঠনের জন্য যে স্বাধীনতা চেয়েছিলেন তাঁকে তা দিতে রমেশবাবু প্রস্তুত ছিলেন না। এর অল্প দিন পরেই দিল্লীতে এ, আই, সি, সি-র এক বিশেষ অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশের এক দল অনুশীলন বিরোধী প্রতিনিধি রূপে অধিবেশনে যোগ দিয়েছিলেন। অধিবেশনের পরে তাঁরা মথুরা বৃন্দাবন কাশী, আগ্রা প্রভৃতি অঞ্চল ভ্রমণ করেন। এই সময় বাংলা দেশে প্রায় পঁচিশজন বিশিষ্ট বিপ্লবীকে ১৯১৮ সালে ভিন আইনে গ্রেপ্তার করা হয়। উত্তর প্রদেশে যাঁরা ভ্রমণ করছিলেন তাঁদেরও অনেকের নামে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা ছিল। আপাতত তাঁরা রক্ষা পান। উত্তর প্রদেশ থেকেই তাঁরা গা ঢাকা দেন।

শচীন্দ্রনাথ ও যোগেশচন্দ্রের মাধ্যমে এলাহাবাদেই প্রথম আলোচনার পরে যোগেশচন্দ্র প্রায়ই এলাহাবাদ গিয়ে শচীন্দ্রনাথের সংগে দেখাসাক্ষাৎ করে আসতেন। এর ফলে উভয়ের মধ্যে হৃদ্যতা বৃদ্ধি পায় এবং এক সংগে কাজ করার পক্ষে শচীন্দ্রনাথের মনোভাবও বৃদ্ধি পায়। শচীন্দ্রনাথ এই সময় বড়লাট লর্ড বিভিংকে হত্যা করার এক প্রস্তাব করেন। হেদ্দালাল মিশ্র নামে জনৈক কর্মীকে এই উদ্দেশ্যে সিমলা পাঠানো হয়। হেদ্দালালের বাড়ী ছিল হরিদ্বার জেলায় সে উত্তর প্রদেশের ফরাকাবাদ সংগঠনের কর্মী ছিল। এই কাজের জন্য শচীন্দ্রনাথ নিজে কলকাতা গিয়ে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের কাছে এই পরিকল্পনার কথা বলে কিছু অর্থ সাহায্য নিয়ে আসেন। কিন্তু হেদ্দালাল দৃঢ়চেতা কর্মী ছিলেন না বলে বড়লাট হত্যা প্রচেষ্টার কাজ বেশী দূর অগ্রসর হয় নাই।

যোগেশচন্দ্র যুক্তপ্রদেশ বিপ্লবী সংগঠনের কার্য্যভার গ্রহণ করে প্রথমে কাশী কেন্দ্রকে কিছুটা সুসংহত করে অন্যান্য জেলা সংগঠনের কাজে মনোনিবেশ করলেন। কাশী থেকে আসার সময় প্রফুল্ল বাবু, যোগেশ বাবুর হাতে যুক্তপ্রদেশের নেতৃস্থানীয় কংগ্রেস কর্মী [illegible]

নামে এক পত্র দিয়েছিলেন। যোগেশবাবু লক্ষ্ণৌ সংগঠন গড়ে তুলবার উদ্দেশ্যে লক্ষ্ণৌ গিয়ে খালিকুজ্জামানের সংগে সাক্ষাৎ করলেন। খালিকুজ্জামান এই সময় লক্ষ্ণৌ মিউনিসিপালিটির চেয়ারম্যান ছিলেন। তিনি যোগেশ বাবুকে এই কার্যে সর্বপ্রকার সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দেন। এ ছাড়া এ জন্য কিছু আর্থিক সাহায্যের ভারও গ্রহণ করেন। লক্ষ্ণৌ যুক্তপ্রদেশের রাজধানী হলেও এখানে তখনও পর্যন্ত কোন বিপ্লবী সংগঠন গড়ে তুলবার চেষ্টা হয় নি যোগেশচন্দ্র শচীন বক্সীকে লক্ষ্ণৌয়ের ভার প্রাপ্ত কর্মী করলেন। শচীন বক্সী লক্ষ্ণৌ গিয়ে বাস করতে লাগলেন।

প্রথমে কাশী কেন্দ্রকে কিছুটা সুসংহত করে অন্যান্য জেলা সংগঠনের কাজে মনোনিবেশ করলেন। ঢাকা থেকে আসার সময় প্রতুলবাবু যোগেশবাবুর হাতে যুক্তপ্রদেশের নেতৃস্থানীয় কংগ্রেস কর্মী খালিকুজ্জামানের নামে এক পত্র দিয়েছিলেন। যোগেশবাবু লক্ষ্ণৌ সংগঠন গড়ে তুলবার উদ্দেশ্যে লক্ষ্ণৌ গিয়ে খালিকুজ্জামানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন। খালিকুজ্জামানের এই সময় লক্ষ্ণৌ মিউনিসিপালিটির চেয়ারম্যান ছিলেন। তিনি যোগেশবাবুকে এই কার্যে সর্বপ্রকার সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দেন। এ ছাড়া এজন্য কিছু আর্থিক সাহায্যের ভারও গ্রহণ করেন। লক্ষ্ণৌ যুক্তপ্রদেশের রাজধানী হলেও এখানে তখনও পর্যন্ত কোন বিপ্লবী সংগঠন গড়ে তুলবার চেষ্টা হয়নি। যোগেশচন্দ্র শচীন বক্সীকে লক্ষ্ণৌয়ের ভারপ্রাপ্ত কর্মী করলেন। শচীনবক্সী লক্ষ্ণৌ গিয়ে বাস করতে লাগলেন।

এই সময় কাশীতে যোগেশচন্দ্রের উপরে গোয়েন্দার উপদ্রবও বিশেষভাবে বৃদ্ধি পায়। এর ফলে তিনি কাশী ছেড়ে যুক্তপ্রদেশের অন্য কোন অঞ্চলে গিয়ে বাস করবার সিদ্ধান্ত করলেন। এই সময় কলকাতায় প্রতুল গাঙ্গুলীর সঙ্গে শচীন্দ্রনাথের দ্বিতীয় এক দফা আলোচনা হয়। প্রতুলবাবুর নিকটও শচীন্দ্রনাথ দাবী করলেন যে বাঙলাদেশের অনুশীলন সমিতি সাংগঠনিকভাবে যুক্ত থাকবে, কিন্তু সম্পূর্ণ এক হয়ে যাবে না। ডাকাতি প্রভৃতি বাঙলাদেশ সংগঠনে নিষিদ্ধ হলেও যুক্তপ্রদেশ সংগঠনে তা নিষিদ্ধ হবে না।

একদল অনুশীলন বিপ্লবী প্রতিনিধিরূপে অধিবেশনে যোগ দিয়েছিলেন। অধিবেশনের পর তারা মথুরা, বৃন্দাবন, কাশী, আগ্রা প্রভৃতি অঞ্চল ভ্রমণ করেন। এই সময় বাঙলাদেশে প্রায় পঁচিশ জন বিশিষ্ট বিপ্লবীকে ১৮১৮ সালের তিন আইনে গ্রেপ্তার করা হয়। উত্তরপ্রদেশে যারা ভ্রমণ করছিলেন তাদেরও অনেকের নামে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা ছিল। আপাতত তারা রক্ষা পান। উত্তরপ্রদেশ থেকেই তারা গা ঢাকা দেন।

(ক্রমশঃ)

রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্র নাথের স্মৃতি কথা

["A Nation In Making" গ্রন্থ থেকে অনুবাদ]

অনুবাদক—অধ্যাপক নলিনীমোহন দাশগুপ্ত

আমার ভারতে প্রত্যাবর্তন ও মন্ত্রী পদে নিয়োগ।

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

১৯১৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে আমি ভারতে প্রত্যাবর্তন করি। চার মাসের অধিক কাল আমি বাইরে কাটাই। যে কাজের দায়িত্বভার আমার উপর ন্যস্ত করা হয়েছিল, এই সময়ের মধ্যে সে দায়িত্ব পালনে আমি কোনরূপ ত্রুটি করিনি বলে দাবী করতে পারি। এটা ছিল একটা দুর্দান্ত শ্রমসাধ্য, ভির-জমাট কাজের সময়। সে কাজ আমাদের সকলেই নিজ নিজ সাধ্যমত সমাধা করেছেন। সময় সময় আমাদের নৈরাশ্য জনক ঘটনারও সম্মুখীন হতে হয়েছে। তার মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা হল এই যে আমাদের মধ্যে একজন আমাদের দলের কোন সম্মতি না নিয়েই ভিন্ন পথে গিয়ে নতুন সংবিধানের মধ্যে একটি দ্বিতীয় কক্ষ বা পরিষদের ব্যবস্থা করার জন্য যুক্তির অবতারণা করে বসলেন বোম্বাইতে। আমাদের কাছে বিস্ময়কর লেগেছিল এবং আমাদের মধ্যে এ রকম একটা মনোভাব গড়ে উঠেছিল যে আমাদের দলের পক্ষ থেকে প্রকাশ্যেই এই মতকে অস্বীকার করতে হবে। তবে পরে আমরা আমাদের সে চিন্তা ত্যাগ করলাম। তাতে আমাদের কোন ক্ষতি হয়নি। কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষেত্রে আমাদের কাউন্সিল অব স্টেট রূপে একটি দ্বিতীয় কক্ষ বা পরিষদ (সেকেণ্ড চেম্বার) রয়েছে ; আর ঘটনার ধারা যে ভাবে এগিয়ে চলেছে তাতে প্রাদেশিক সরকারের ক্ষেত্রে একটি উচ্চতর কক্ষের প্রভাব সৃষ্টির প্রয়োজন না হয়ে পারে কিনা সে প্রশ্নটি হবে [illegible] এসে যেতে পারে। উচ্চতর কক্ষ যে প্রভাব বিস্তার করে তাহল শাসনকার্য্য পরিচালনার গতিকে সংযত করা এবং সময় সময় হয়ত বা কোন কিছু করতে বা না করতে বাধ্য করা। এ প্রশ্নটি ভারত সরকার গঠন বিধি সম্পর্কীয় আইন প্রণয়ন বিষয়ে রিপোর্ট দেওয়ার জন্য যে পলিয়ামেন্টারী কমিটি প্রেরণ করা হবে, সেই কমিটিরই বিবেচনা করতে হতে পারে।

১৯১৯ সালে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করার পরে আমি যে সম্বর্ধনা পেয়েছি তা অনুভূতির দিক থেকে পূর্বে বিভিন্ন সময়ে এ রকম ক্ষেত্রে যে সম্বর্ধনা পেয়েছি তার তুলনায় কম আন্তরিকতা পূর্ণ। হয়ত এবারে যে কাজের জন্য গিয়েছিলাম তা হয়ত পূর্বে যে সমস্ত কাজের জন্য ইংলণ্ডে গিয়েছিলাম তার তুলনায় অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ একদিক দিয়ে বিবেচনা করলে এবারের কাজ আংশিক ভাবে আমাদের পূর্ব পূর্ব কয় প্রয়াসেরই ফল পরিণতি। কিন্তু তা সত্ত্বেও এবারের কাজ আগের দিন গুলির কাজের মত মনে রেখাপাত করেনি। এর কারণ খুঁজতে বেশী দূরে যেতে হয়না। নন-কো অপারেশনই এই অবস্থার সৃষ্টি করেছে। নন-কো-অপারেশন ব্রিটিশ প্রতিশ্রুতিও অঙ্গীকারের প্রতি আমাদের জনগণের এক অংশের মধ্যে গভীর অবিশ্বাস সৃষ্টি করার কাজ চলিয়ে গিয়েছে। সেই সন্দেহ ও অবিশ্বাস দূর করার জন্য আন্তরিক প্রয়াসের প্রমাণ থাকা সত্ত্বেও [illegible] এবং

এক পরিস্থিতির মধ্যেই নতুন শাসন সংস্কার পরিকল্পনাকে বাস্তবে রূপায়িত করার কাজ শুরু হয়। এই রকম পরিবেশ ও প্রতিকূল পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যেই নতুন আইন অনুযায়ী প্রথম সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নন-কো-অপারেশনের লোকেরা নির্বাচক মণ্ডলীর কাছে ভোট না দেওয়ার জন্য ও নির্বাচনে প্রার্থীরূপে দাঁড়াবার জন্য আবেদন জানান। ধর্মের নামও এ ব্যাপারে ভাঙ্গান হয়। মুসলমান ভোটদাতা ও নির্বাচন প্রার্থীদের নিকট তাদের ধর্মীয় প্রধানগন ফরমান দিয়ে জানিয়ে দিলেন যে এই নির্বাচনে যে কোন ভাবেই যোগদান করা পাপ ও তাদের পবিত্র শাস্ত্রগ্রন্থের অনুশাসনের বিরোধী। কাজেই এতে বিস্ময়ের কিছু নেই যে তাদের মধ্যে কোন কোন যোগ্যতম ব্যক্তি এর ফলে দ্বিধাগ্রস্থ হয়ে পড়লেন। একজন মুসলমান নেতা যিনি কিছুদিন আগে পর্য্যন্ত এক উচ্চ সরকারী কাজে নিযুক্ত ছিলেন আমাকে অনুরোধ করলেন, আমি যেন লর্ড রোনাল্ডসের কাছে মুসলমান নির্বাচন প্রার্থীদের মনোনয়ন পত্র দাখিল করার শেষ তারিখ বাড়িয়ে দেওয়ার জন্য আবেদন জানাই।

আমি লর্ড রোনাল্ডসকে সে অনুরোধ জানিয়েছিলাম। আমার সে অনুরোধ রক্ষা করা হয়েছিল। এইভাবে কয়েকজন মুসলমান নেতার পক্ষে কাউন্সিলে যোগদান করা সম্ভব হয়েছিল। অন্যথায় তাদের বাইরেই পড়ে থাকতে হত। এই সময়টাই নন কো-অপারেশন আন্দোলন কাউন্সিল বর্জন সমেত এক ত্রিমুখী বয়কটের সূত্র আকড়ে ধরে চলছিল। কাউন্সিলকে এক অপবিত্র বস্তু বলে পরিহার করা হয়, তবে হিন্দু সম্প্রদায়ের কথা বলতে গেলে কাউন্সিলে প্রবেশের বিরোধ মনোভাব কেবলমাত্র নীতিগতভাবে অসহযোগে বিশ্বাসী একটা গোষ্ঠীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। শিক্ষিত ও নেতৃস্থানীয় হিন্দুদের একটা মোটা অংশকে এই মনোভাব স্পর্শ করতে পারেনি। তাই গত নির্বাচনে গঠিত কাউন্সিল বেশ ভালভাবেই এই শ্রেণীর হিন্দুদের প্রতিনিধিমূলক হয়েছিল।

অসহযোগীদের মধ্যে যে কাউন্সিলে প্রবেশ করার প্রস্তাটি দেখা দেয় তাহল পরবর্ত্তীকালের ঘটনা। এটা হয়েছে প্রধানতঃ অসহযোগনীতির ব্যর্থতার জন্য। এমনকি অসহযোগে বিশ্বাসী বড় বড় তাত্ত্বিকদের কাছেও যখন এটা পরিষ্কার হয়ে গেল যে তারা অসহযোগের দ্বারা গঠন-মূলক কোন কিছুই লাভ করতে পারেন নি বরং তাদের রাজনৈতিক জীবনটাই অশান্তি ও হতাশাব্যঞ্জক দ্বারা চিহ্নিত হয়ে গেছে যা সময় সময় রক্তপাত ঘটিয়েছে এবং নেতাদের চোখে অনুশোচনার অশ্রু বইয়ে দিয়েছে তখন নন কো-অপারেশনের নামে পরিবর্ত্তিত পথে চলা শুরু হয়। এই পথ পরিবর্তনের ধরণটাও একটা কূটকৌশল মাত্র। ওষুধের বড়িটাকে সোনালী রংয়ের ছোপ দিয়ে নেওয়া হল। কিন্তু পুরনো লেভেলটা ঠিকই রাখা হল। এখনও এটার নাম নন কো-অপারেশনই রইল; কিন্তু তার স্বরূপ এমন হল যে দলের একটি শক্তিশালী উপদলের বিবেচনায় এই নতুন ধরনের নন কো-অপারেশন আসল নন কো-অপারেশন মতবাদের একেবারে মূলোচ্ছেদ করে দিয়েছে, কাউন্সিলে প্রবেশ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হল; কিন্তু তাহল কাউন্সিলের কাজে বাধা সৃষ্টির জন্য এবং তাকে ধ্বংস করার জন্য। এর স্বরূপ হল, শুরুতে সহযোগ, কাজের বেলায় অসহযোগ এবং পরিশেষে শাসন সংস্কারের ধ্বংস সাধন।

(ক্রমশঃ)

Freedom fighters whose pension has been sanctioned

Name	Address	Amount	Date
	August—1980	Rs.	
	Dist—CALCUTTA		
Das Km Krishna	12C, South Sinthi Road	100	12 9 77
d/o Late Gour Mohan Das	Calcutta—50		
Dutta Mazumdar Smt Suruchibala	11, Netai Babu Lane	100	23 2 79
& Km Manidwipa	Calcutta—12	50	1 8 80
& Km Gopa		50	(Rs. 200)
w/o Late Nirmal Ch.			
Das Sharma Kali Prosad	46, Bachaspatipara Rd Cal—76	200	1 4 80
Ghosh Smt Sabita Rani	6, Satchasipara Road	200	25 12 70
w/o Late Amal Kumar	Calcutta—2		
Tewari Barmeswar	71, Canning Street Calcutta—1	200	3 7 74
	Dist—MIDNAPUR		
Bhunia Prankrishna	Vill Kalikapur P O Marikpur	200	27 2 74
Giri Smt Kamala & Km Krishna	Manikpur (Jalapara)	100 & 50	16 1 79
w/o Late Bibhuti Bhusan	P O. & Dt. Midnapur		
Kamila Benin Behari	Vill Nachhipur P.O. Naba Anantapur	200	30 1 75
Nag Smt Ganga Rani	Bara Bazar P.O & Dt. Midnapur	100	8 6 80
& Km Mala & Km Sukla		Rs. 50 & Rs. 50	
w/o Late Lakshmi Kanta			
Mahato Smt Urmila & Km. Bharati.	Vill Katrimare	100	22 10 79
w/o Late Sripati Charan	P. O, Nischinta	50	
Maity Subal Chandra	Vill Kota P. O, Sirsa	200	15 8 72
	Dist—HOOGHLY		
Chakraborty Smt Prava Rani	1199, Arabindapally	100	1 10 75
w/o Late Dhiren Chakraborty	P, O. Konnagar		
Sasmal Usha Rani	P O. Bandar	100	19 1 76
w/o Late Madhab Sasmal Dhamya			
	Dist—NADIA		
Neogi Usha Rani & Km Sipra	Vill & P. O. Berachandghar	100	31 10 79
& Km Mona		50	
w/o Late Dharani Kanta		50	
	Dist —MURSHIDABAD		
Dey Aswini Kumar	Vill Kathmari P. S, Ramnagar	200	15 8 72
	Dist—JALPAIGURI		
Baishya Parbati Charan	Vill & P. O, Debnagar	200	22 2 77
Dey Smt Sushila Sundari	Vill West Jitpur	100	4 4 80
w/o Late Jamini Kumar	P. O. Bholardhabrit		
	Dist —BURDWAN		
Tah Smt Sibani	Vill Jagatpur	100	17 4 74
& Km Subha	P. O, Moral	50	
w/o Late Bisweswar			

RegdNo. R. N. 24511/71 | Biplabi Bangla | Regd. WB/NC 77
Phone : 34-1795
বার্ষিক :—সডাক ১৫.০০ টাকা | ষাণ্মাসিক :—৮.০০ টাকা | মূল্য—৩০ পয়সা

15 SEP 1980
C/30

বিপ্লবী পুস্তকমালা

অনুশীলন সমিতির বিপ্লব প্রয়াস—ব্রজেন্দ্রচন্দ্র ঘোষের—৩.০০

বিপ্লবী মহানায়ক রাসবিহারী—প্রবোধ বন্দ্যোপাধ্যায়ের—৫.৫০

ক্ষীরোদ কুমার দত্তের—

১। বাংলার অগ্নিযুগ—১.৫০
২। বহির্ভারতে ভারতীয় বিপ্লব প্রচেষ্টা—৮.৫০
৩। অনুশীলন সমিতির পি. মিত্তির—২.০০
৪। মৌয়াসী সংগ্রাম কাহিনী—১.০০
৫। কাকোরী ষড়যন্ত্র—১.২৫
৬। কলকাতা বাজার সংগ্রাম কাহিনী—.৪০
৭। রাসবিহারী ও অনুশীলন সমিতি—.৬০
৮। স্বাধীনতার শঙ্খ ঘণ্টা ও বেয়নেট—.৪০
৯। বিবেকানন্দ ও সমাজবাদ—.৬০
১০। বিপ্লবী বিবেকানন্দ—.৫০
১১। মহাবাহু ও শুভাষচন্দ্র—.৪০
১২। ভারতের নবজাগরণ ও ভগিনী নিবেদিতা—.৭৫
১৩। দেশ বন্ধুর ডোমেলি (১)—১.০০
১৪। দেশ বন্ধুর ডোমেলি (২)—১.০০
১৫। শহীদ চন্দ্রশেখর আজাদ—.৫০
১৬। ১৩ই এপ্রিল জাতীয় শহীদ দিবস—১.০০
১৭। হাজির হত্যা প্রচেষ্টা—.৭৫
১৮। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও অনুশীলন সমিতি—.৫০
১৯। ভারতের জাতীয় পতাকার ইতিহাস—.৪০
২০। লাট হত্যা প্রচেষ্টা—১.৫০

প্রাপ্তিস্থান :—৪নং বঙ্কিম ঘোষ ষ্ট্রীট কলিকাতা-৭০০০০৭

শৈলশ্রী—১/১/১/A বঙ্কিম চ্যাটার্জী ষ্ট্রীট কলিকাতা-৭৩

— সম্পাদক মণ্ডলী —

শ্রীসতীন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (সভাপতি) শ্রীব্রজেন্দ্রচন্দ্র মন্ত্রী, শ্রীপুষ্প চ্যাটার্জী

সম্পাদক—শ্রীঅনিল পাল চৌধুরী

বিপ্লবী বিশেষ প্রতিনিধি—শ্রীনারায়ণ ঘোষ। বেতারা—শ্রীমনোরঞ্জন পাল।

প্রকাশক ও মুদ্রক :—শ্রীঅনিল মোদক। প্রচার সচিব—শ্রীসুধেন্দু সোম।

বিপ্লবী বাংলা কার্যালয় :—৪নং বঙ্কিম ঘোষ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০০৭

মুদ্রণে:—প্রিন্টিং সাপ্লাইসিটি, ১১৭ নং কেশব সেন ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৭০০০০৯

বিপ্লবী বাংলা

বিপ্লবী পরিষদের সাপ্তাহিক মুখপত্র
স্থাপিত—১৯৫৬, 'বিপ্লবী বাঙ্গালী' নবকলেবরে—১৯৭১

CALCUTTA UNIVERSITY INSTITUTE OF EDUCATION FOR WOMEN

১০ম বর্ষ / ৪র্থ সংখ্যা
শনিবার, ২৪শে আশ্বিন, ১৩৮৭
১১ই অক্টোবর, ১৯৮০

আমার জীবনই আমার বাণী—

—গান্ধীজী

সম্পাদকীয়

মাতৃপূজা

বৎসরান্তে দেশের মানুষ, বিশেষ করে বাঙ্গালীরা, দেবী দুর্গার পূজার আয়োজন করেন মহাসমারোহে। বস্তুত পক্ষে এই পূজাটি এখন একটী জাতীয় পূজার রূপ গ্রহণ করেছে।

রামায়ণে কথিত আছে অশুভশক্তির মূর্ত্তিমান প্রতীক অত্যাচারী রাবণকে বধ করে শুভশক্তির প্রতিষ্ঠার জন্য শ্রীরামচন্দ্র অকালে দেবীর বোধন করেছিলেন। পুরাণে কথিত আছে মহারাজ সুরথ রাজ্যহারা হয়ে এবং বৈশ্য সমাধি বিষয় সম্পত্তি হারা হয়ে মহামুনি মেধার নির্দেশে মহামায়া চণ্ডীদেবীর পূজা করেন। বলা বাহুল্য, অসুরের শক্তি বিনাশ করতে হলে সুর-শক্তির কৃপা ব্যতীত সেটা সম্ভব হয়না। এটাই ছিল বহুদিন ব্যাপী প্রচলিত বিশ্বাস। পূজার উদ্যোক্তাদের ভক্তি ও আন্তরিকতাই ছিল পূজার শ্রেষ্ঠ উপকরণ। আজকের দিন অসংখ্য পূজার আয়োজন হয় বটে, কিন্তু মানসিকার বিরাট পরিবর্তন ঘটেছে।

অতীতদিনে নিপীড়নকারী রাবণ ছিল, ছিল মধুকৈটভ মহিষাসুর, শুম্ভনিশুম্ভের মত অসুরেরা, যারা শুধু সাধারণ মানুষকেই নয়, দেবতাদের পর্যন্ত অতিষ্ঠ করে তুলেছিল। এরা আজ নেই, কিন্তু ভিন্নরূপে এদের উত্তরসুরীরা আছে যাদের আধুনিক পরিচিতি হল চোরাকারবারী, মুনাফা-শিকারী, বিচ্ছিন্নতাকামী, সাম্প্রদায়িকতাবাদী, আঞ্চলিকতাবাদী অসুরের দল। এরা দেবতাদের অতিষ্ঠ করে তুলেছে কিনা জানা যায় না। তবে গোটা দেশকে যে সর্বনাশের পথে ঠেলে দিচ্ছে, এটা ধ্রুবসত্য।

একদিকে দেশের মানুষের রক্ত শোষণ করে শুধু দেশের বর্ত্তমানকেই নষ্ট করছে না, এরা দেশের ভবিষ্যৎটাকেও অন্ধকারাচ্ছন্ন করে তুলেছে। এদের দেশ থেকে সমূলে ধ্বংস করতে না পারলে, দেশের সর্বনাশ অনিবার্য্য। মানুষ যখন সর্ববিষয়ে দুর্বল হয়ে পড়ে, অশুভশক্তির দাপট তখনই চরমে ওঠে। ভারতবর্ষের ঐতিহ্য হচ্ছে শক্তি সঞ্চয় করার জন্য শক্তিদাত্রীর পূজা করতে হয়, নিজেকে দোষমুক্ত করে, মহৎ আদর্শকে জীবনে গ্রহণ করে, সততা, চরিত্রবল, আদর্শনিষ্ঠাকে মূলধন করে। কিন্তু দেশের মধ্যে এই

প্রকারের মানুষ পূজার উদ্যোক্তা এবং বৃহত্তর সমাজের মধ্যে খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। ফলে পূজার বাহ্যিক আড়ম্বরই শুধু বেড়ে যাচ্ছে না, দেবতা বা দেবী পূজার নামে, অপদেবতাকেই যেন আবাহন করা হচ্ছে। ফলে নতুনরূপে দস্যুর নিপীড়কদের সংখ্যা বেড়েই চলেছে। এর ফলশ্রুতি দাঁড়াচ্ছে সমাজের অধঃপতন ও মানুষের দুঃখ দুর্দশার ক্রমবর্দ্ধমান অগ্রগতি।

তাই এবারকার মাতৃপূজার সময় দেশের মানুষকে ভেবে দেখতে হবে কি ভাবে সত্যিকার পূজা করা যায়। দেবীর নিকট বললাভের প্রার্থনা করতে হবে সমাজশত্রুদের মোকাবিলা করবার জন্য এবং বলতে হবে—

প্রচণ্ড দৈত্যদর্পঘ্নি, চণ্ডিকে প্রণতায় মে।
রূপং দেহি, জয়ং দেহি, যশো দেহি, দ্বিষো জহি॥

প্রাণের সব আবর্জনায় আগুন জ্বালিয়ে দিয়ে, জনসেবার মন্ত্রে নতুন করে দীক্ষা গ্রহণ করে মায়ের বন্দনা করতে হবেএই সুরে।

নমস্তে শরণ্যেশিবে সানুকম্পে, নমস্তে জগদ্ব্যাপিকে বিশ্বরূপে
নমস্তে জগদ্বন্দ্য পাদারবিন্দে, নমস্তে জগত্তারিণি ত্রাহি দুর্গে॥

এই কাজ দুরূহ হলেও, অসম্ভব নয়, সেটা প্রমাণিত করে গিয়েছেন আমাদের পূর্বসূরী অনেকেই। দেশমাতাকে তাঁরা জগন্মাতার প্রতীক রূপে গ্রহণ করেছিলেন এবং জগন্মাতার আশীর্বাদলাভের জন্য অকাতরে খরচ করেছিলেন, ধর্ম, শ্রম, অশ্রু ও রক্ত। হাসিমুখে ফাঁসি কাঠে ঝুলেছেন, অমানুষিক অত্যাচার নিপীড়ন সহ্য করেছিলেন দেশের মঙ্গল সাধনের জন্য। দেশ আজ নানাদিক দিয়ে বহু বিপর্যয়ের সম্মুখীন। তাই আজ প্রয়োজন সেই সর্বত্যাগী, আদর্শনিষ্ঠ, দেশপ্রেমিক সন্তানদের, যারা ঘুচাবে জন্মভূমির দুঃখ দুর্দশা আজকের দিনে মাতৃপূজা সার্থক হবে এই ব্রত উদযাপনের মাধ্যমে। অন্যথায় সবই বিফলে যাবে। মাকে প্রশ্ন করতে হবে 'আর কতকাল রহিবি মাটির ঢেলার মূর্ত্তির আড়াল'? প্রার্থনা করতেহবে শান্তি-লাভের জন্য, যার ফলে আমরা পৃথিবীতে অসুরদের নিপাত করে, সুর-দের প্রভাব প্রতিষ্ঠিত করতে পারব। আজ পূজামণ্ডপে নিজের লোভ, স্বার্থপরতা, লালসা, নীচতা, মনের সব মলিনতা ও অন্যান্য রিপুদের বলিদান করে, শুদ্ধ, মুক্ত, পবিত্র হয়ে দেশমাতৃকার সেবায় আত্মনিয়োগ করতে পারব। প্রার্থনা করব

প্রণতানাং প্রসীদ ত্বং দেবী বিশ্বার্তিহারিনী
ত্রৈলোক্যবাসীনামীড্যো লোকানাং বরদা ভব॥

●

॥ বন্দেমাতরম্ ॥

॥ অনিলকুমার ভট্টাচার্য ॥

মাটি, মাটি নয়—মাটি মা—টি। মাটি আমাদের মা—স্বর্গাদপি গরীয়সী। এই মাকে বন্দনা করিয়াছেন ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র প্রণামমন্ত্রে—'বন্দে-মাতরম্'। দুইটি মাত্র ধ্বনি, কিন্তু কী তাহার অমোঘ শক্তি! এক হাতে গীতা এবং কণ্ঠে এই ধ্বনিমন্ত্র ধারণ করিয়া স্বর্গাদপি গরীয়সী বন্দিনী দেশজননীর বন্ধন-শৃঙ্খল মোচন করিতে কত শহীদ হাসিতে হাসিতে ফাঁসির দড়ি গলায় পরিয়াছে—মৃত্যু তাহাদের জীবনকে অমরত্ব দান করিয়াছে।

মাতৃনামের এই মহামন্ত্র ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের ধ্যানলব্ধ অনুভূতি। আনন্দমঠে বঙ্কিমচন্দ্র ধ্যান দৃষ্টিতে দেখিয়াছেন, মায়ের অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ রূপ। দুঃখ-দৈন্য-ক্লিষ্ট দুর্ভিক্ষ-পীড়িত বাংলার বুকে যখন মৃত্যুর তাণ্ডব-লীলা চলিয়াছে, তখন দেশমাতৃকার মধ্যে কালিকার আবির্ভাব প্রত্যক্ষ করিয়াই তিনি বলিয়াছিলেন—'কালী অন্ধকার সমাচ্ছন্ন কালিমাময়ী। হৃত সর্বস্ব—এই জন্য নগ্নিকা। আজ দেশের সর্বত্রই শ্মশান—তাই মা করালমালিনী!'

'কমলাকান্তের দুর্গোৎসবে' তিনি ওজস্বিনী ভাষায় ব্যক্ত করিয়াছেন—'যদি দশভুজা দশ-প্রহরণধারিণী জননীকে আবার স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত করিতে হয়, তাহা হইলে আলস্য ও ইন্দ্রিয়াসক্তি বিসর্জন দিতে হইবে এবং সকল ভেদবুদ্ধি পরিহার করিয়া ভ্রাতৃভাবে মিলিত হইতে হইবে।' এই মাতৃভাবে মহামিলনের মন্ত্রপূত মাতৃ প্রণামই—বন্দে-মাতরম্।

১২৮১ হইতে ১২৮৩ একশ বছর ধরিয়া 'বন্দে-মাতরম্' আমাদের জাতীয়-জীবনে কি অপরিসীম প্রভাব বিস্তার করিয়া আছে, আমাদের দেহে মনে আত্মায় কি জাগরণের স্পন্দন জাগাইয়াছে—তাহা সবিস্তারে বলিতে গেলে এক মহাভারতের ইতিহাসের কথাই বলিতে হয়। পরাধীন দেশে সন্ন্যাসী-বিদ্রোহ হইতে জাতীয় কংগ্রেসের স্বাধীনতা আন্দোলন, বাংলার অগ্নিযুগের বিপ্লবীদের অগ্নিময় সংগ্রাম—দেশের আবাল-বৃদ্ধ জনতাকে উদ্বুদ্ধ করিয়াছে—বন্দে-মাতরমের মন্ত্রধ্বনিতে। মাঠের কৃষক হাতের কাস্তে লইয়া সংগ্রাম করিয়াছে, কিশোর প্রাণের রক্ত চঞ্চল হইয়াছে, যুবক আপন রক্ত তিলক কপালে পরিয়াছে। মা, বোন—সন্তান এবং ভাইকে এই মন্ত্রে দীক্ষা দিয়াছেন। বৃদ্ধ জরা ভুলিয়াছে—কণ্ঠে শুধু অভয় মন্ত্র 'বন্দে-মাতরম্।' 'বন্দে-মাতরম্' সঙ্গীতটি কবে রচিত হইয়াছিল তাহা লইয়া কত গবেষণা। সালে ঋষি অরবিন্দ লিখিয়াছেন,—"It was thrity two years ago that Bankim wrote his great song and few listened; but in a sudden moment of awakening from long delusions the people of Bengal looked round for the truth and in a fated moment somebody sang Bande mataram." ১৯০৭ হইতে ৩২ বৎসর পূর্বে অর্থাৎ ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে এই মহা সঙ্গীত রচিত হয়।

অল্প কয়েকজন যে মহাসঙ্গীত শুনিয়াছিল তাহা জন্মকাল অতিক্রম করিয়া সপ্তকোটী কণ্ঠ নিনাদ হইতে আজ কোটী কোটী কণ্ঠে নিনাদিত। ভবিষ্যৎ-দ্রষ্টা ঋষি তাই বঙ্গ দর্শনের প্রেসের পণ্ডিত মহাশয়কে বলিয়াছিলেন, 'ভালো কি মন্দ, এখন তুমি বুঝিতে পারিবে না, কিছুকাল পরে উহা বুঝিবে।' কালের

নিয়মে বঙ্গদর্শন উঠিয়া গিয়াছে—প্রেসের পণ্ডিতও আর ইহলোকে নাই, কিন্তু বঙ্কিমবাণী সত্য হইয়াছে—'বন্দেমাতরম্' পরাধীন হইতে স্বাধীন ভারতে আত্মার জাগরণে মহামন্ত্র স্বরূপ আজও বাঁচিয়া আছে এবং বাঁচিয়া থাকিবে যুগ হইতে যুগে। বন্দেমাতরম্—আমাদের জাতির দেশ জননীর প্রণাম মন্ত্র—বন্দেমাতরম্ আমাদের জাতীয় সঙ্গীত। 'আনন্দমঠে' এই গানটি প্রকাশ হইবার মাত্র ইহা মন্ত্রধ্বনির ন্যায় দিকে দিকে প্রচারিত এবং প্রসারিত হইতে লাগিল।

বঙ্কিমচন্দ্র নিজেই এই গান তন্ময় হইয়া শুনিতেন। রবীন্দ্রনাথই সর্বপ্রথম 'বন্দেমাতরম্' সঙ্গীতে সুর দিয়াছিলেন। রবীন্দ্রনাথের দেওয়া সুরের দুইটি পদ—তারপর রবীন্দ্র সুরের সহিত সামঞ্জস্য বজায় রাখিয়া কবির ভাগিনেয়ী সরলা দেবী চৌধুরাণী 'সপ্তকোটি কণ্ঠ কল কল নিনাদ করালে' হইতে সমগ্র গানটিকে সুরশ্রীমণ্ডিত করিয়া তোলেন। ১৮৯৬ সালে উত্তর কলিকাতার বিডন-স্কোয়ারে কংগ্রেসের অধিবেশনে কবি স্বয়ং গাহিলেন নিজস্ব সুরে 'বন্দেমাতরম্ গানটি'। আর সেদিনই প্রকৃতপক্ষে এই মন্ত্র গান জাতীয় সঙ্গীতের রূপ নেয়।

তারপর এই গান লইয়া বিদেশী শাসকের কত শাসন আর অত্যাচার, কিন্তু জাতি তাহার মন্ত্রধ্বনি ত্যাগ করে নাই—কোন ভয়ই বন্দে-মাতরম্‌কে সন্ত্রস্ত করিতে পারে নাই।

১৯০৫ সালে ৭ই আগষ্ট বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে টাউন হলে যে বয়কট সভা হইয়াছিল তাহার উদ্বোধন হয় 'বন্দেমাতরম্'—মন্ত্রধ্বনির সুরে। সে সুর আকাশ-বাতাস প্রকম্পিত করিল,—শহর থেকে গ্রামে অসংখ্য কলকণ্ঠের কল কল নিনাদে দিন হইতে দিনে প্রসার লাভ করিতে লাগিল। বন্ধনকে যে মন্ত্র মুক্ত করিয়াছে, ভাঙনকে যাহা গড়িয়াছে, নৈরাশ্যকে যাহা আশার সূর্যালোকে প্রদীপ্ত করিয়াছে ঋষি বঙ্কিমের সেই ধ্যানলব্ধ-বাণী আজও আমাদের মাতৃ-প্রণাম মন্ত্র। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর ভাষায়—এই ধ্যানের মন্ত্র হইতেছে, 'জন্ম-ভূমিকে মা বলা—জন্মভূমিকে ভালবাসা—জন্ম-ভূমিকে ভক্তি করা। তিনি (বঙ্কিমচন্দ্র) এই যে কার্য করিয়াছেন, ইহা ভারতবর্ষে আর কেহ নাই। সুতরাং তিনি আমাদের পূজ্য, তিনি আমাদের নমস্য, তিনি আমাদের আচার্য, তিনি আমাদের ঋষি, তিনি আমাদের মন্ত্রকৃৎ, তিনি আমাদের মন্ত্রদ্রষ্টা। সে মন্ত্র—'বন্দেমাতরম্।'

বঙ্কিমবাবু ১৮৭০-৮০ সালে চুঁচুড়ায় জোড়া-ঘাটে বাস করেন এবং এখানে থাকাকালীন তিনি 'বন্দে-মাতরম্' সঙ্গীত রচনা করেন এবং পরে তিনি এই সঙ্গীতটি আনন্দমঠে সংযোজিত করেন।

মাটি আমাদের মা। আমরা দেশ-জননীর সন্তান। সন্তানদলের ভবানন্দ সন্ন্যাসী গুরুর নিকট হইতে চেতনা লাভ করিয়াছেন, 'আমরা অন্য মা মানিনা—জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী। আমরা বলি, জন্মভূমিই জননী, আমাদের মা নাই, বাপ নাই, ভাই নাই, বন্ধু নাই,—স্ত্রী নাই, পুত্র নাই, ঘর নাই, বাড়ী নাই, আমাদের আছে কেবল সেই সুজলা, সুফলা মলয়জ সমীরণ শীতলা, শস্যশ্যামলা'—, সুরদাং বরদাং মাতরম্।

বন্দেমাতরম্ সঙ্গীতকে কণ্ঠে ধারণ করিয়া আজিকার জাতীয় চেতনার আমৃত্যুর ক্ষণে সেই পরম চেতনাকে আবার আমরা অনুধ্যান করি—'পণ আমার জীবন সর্বস্ব', পণ আমার 'ভক্তি।'

●

ব্রিটিশের ভেদনীতি কতদিন চলবে ?

—ব্রজেন্দ্রচন্দ্র দাস

●

ব্রিটিশ শাসনের ঔপনিবেশিক নীতির মূল মন্ত্র ছিল বিভেদ সৃষ্টি কর এবং শাসন কর (Divide and rule.) এই নীতি চালু করার জন্য ভারতের জনসাধারণকে বিভিন্ন খণ্ডে ভাগ করে। মুসলমান, হরিজন, উপজাতি এই তিনটী খণ্ডকে সংখ্যালঘু সম্প্রদায় করে রেখেছিল। স্বাধীন ভারতে কংগ্রেস নেতারা যে নীতি অনুসরণ করলেন তাতে সাম্প্রদায়িকতা ও বিচ্ছিন্নতাকে পুষ্ট রাখাই হল। জাতীয় ঐক্য রক্ষা করে সংখ্যালঘুনীতি অনুসরণ করেজাতীয় ঐক্য বার্থ ই হল।

এই সমস্যা নিয়ে আমরা প্রথম থেকেই ভুল দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে চলেছি। মহাত্মাগান্ধী খিলাফৎ আন্দোলনের মধ্য দিয়ে মুসলমান সমাজকে জাতীয়তার আলোকে আনতে চেয়েছিলেন। মৌলভী মোল্লাদের আবদার রক্ষা করতে কংগ্রেস যেভাবে মদত জুগিয়েছে সেকুলার (Secular) রাজনীতির পক্ষে তা অমার্জনীয় অপরাধ। মৌলভী মোল্লাদের নির্ভরশীল মুসলিম জাতীয়তাবাদ অনিবার্য্য কারণে শেষ পর্য্যন্ত পাকিস্তানী জাতীয়তাবাদে রূপান্তরিত হল। তখনও কংগ্রেস নেতারা মুসলিম লিগের শৃঙ্খলে আটকা পড়ে রইলেন। মুসলমান জনসাধারণকে জাতীয়তাবাদের জাগৃহীর আলোকে নিয়ে আসার পথ স্বাধীন ভারতের কংগ্রেসী সরকারের আয়ত্তের বাইরেই রয়ে গেল। গত ত্রিশ বৎসরে মুসলমান জনসাধারণের জাতীয়করণ হয়েছে সামান্য, দেশব্যাপি সর্বত্র আঞ্চলিকী করণের উগ্রতা বেড়ে গেছে, অনেক, বেড়েই চলেছে, বর্তমানে বিচ্ছিন্নতার পৌঁছে গেছে।

অধ্যাপক বশিরউদ্দিন খান জোরের সঙ্গে বলেছেন মুসলমান সমস্যাটা মাইনরটী বা কমিউন্যাল সমস্যা নয়। এটা জাতীয় সমস্যা, যেমন হরিজনের সমস্যা, শ্রমিক, খেতমজুরের সমস্যা। ধর্ম ব্যাপারটা মূল নয়, আমরা ইচ্ছা করে মুখ্য করে রেখেছি। আমরা ইচ্ছা করেই জাতীকে পরস্পর সংঘাতী বিভিন্ন সম্প্রদায়ে ভাগ করে রেখেছি। এটা যে ইংরেজের উপনিবেশিক উত্তরাধিকার আমরা বুঝতে চাই না। সেইজন্য মুসলমান সমস্যার প্রকৃত চেহারাটা এখনও দেখতে পারছি না। বর্তমান ভারতবর্ষে আট কোটি মুসলমান বাস করে, এই জনসমাজ বিভিন্ন ভাষা ও সংস্কৃতিক অবস্থায় বহুলীকৃত। মুসলমানদের মধ্যে মাত্র ৫'১৮ শতাংশের মাতৃভাষা উর্দু প্রায় ৯৪ শতাংশ অন্য ভাষাভাষী। ভারতবর্ষকে ৫৮টী সামাজিক অর্থ নৈতিক অঞ্চলে চিহ্নিত করা হয়। এই বিভিন্ন অঞ্চলের মুসলমানদের মিল কতটুকু, কাশ্মিরী ও বাঙ্গালী মুসলমানদের মধ্যে কি কোন মিল আছে।

সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাহাঙ্গামার প্রাদুর্ভাব বর্তমানে হিন্দি অঞ্চলে, বিশেষ করে বিহার, উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, দিল্লি এলাকায় এবং দাঙ্গা বাঁধে প্রধানতঃ সহরে, গ্রামগুলি সাধারণতঃ দাঙ্গার আগুনে জ্বলেনা। কারণ হিন্দুদের তুলনায় মুসলমানরা বেশী সহরবাসী মুসলমান জনসংখ্যার ২৭ শতাংশ সহরে বাস করে, হিন্দু জনসংখ্যার ২০ শতাংশে। সহরের মুসলমানরা অধিকাংশে গরিব এবং বাস করে বস্তিতে।

মৌলনা-মৌলভীদের প্রভাবে এবং দারিদ্র্যের পীড়নে মুসলমানদের মধ্যে অশিক্ষা ও মানসিক অনগ্রসরতা আজও বেশী। যারা লেখাপড়া শিখেছে তারাও চাকরীর বাজারে প্রতিযোগিতায় সুবিধা করতে পারছে না। ১৯৭৮ সালে ৩৩২৮ জন আই, এ, এস অফিসারের মধ্যে মাত্র ১০৭ জন ছিলেন মুসলমান, ১৬৬১ জন আই, পি, এস, অফিসারের মধ্যে মাত্র ৫৩ জন। সরকারী নিয়োগে মুসলমানের বিরুদ্ধে গোড়ামি আছে এমন কোন প্রমান পাওয়া যায় না সুতরাং মুসলমানরা অর্থনৈতিক জোর নিয়ে কম ক্ষেত্রেই দাড়াতে পারছেন, ব্যতিক্রম বোম্বাই ও গুজরাটের মুসলমান ব্যবসায়ীরা। একাধিক অনুসন্ধানে দেখা যায় দাঙ্গা যে সব সহরে ঘটে সেখানে হাজার হাজার মুসলমান তরুণ বেকার। গত কয়েক বৎসরের রাজনৈতিক পালাবদলের ফলে এমন কোন রাজনৈতিক দল নেই যারা মুসলমান সাম্প্রদায়িকতাকে পুষ্ট করে নাই। মুসলমান ভোট পাওয়ার জন্য দলগুলি আশ্রয় নিয়েছে মৌলানা মৌলভীদের পক্ষপুটে, ফলে ধর্মান্ধতার ইন্ধন যোগান হয়েছে সামাজিক আর্থিক উত্তাপে জর্জরিত মানুষের মানসিকতা। বর্তমান দাঙ্গায় মুসলমান জনতার সঙ্গে পুলিশের সংঘাতটাই বেশী, যেমন চলছে আঞ্চলিক বিচ্ছিন্নতাবাদীদের সঙ্গে।

ব্রিটিশের ঔপনিবেশিক শাসনের নীতি সমূলে উচ্ছেদ না করে আমাদের নেতারা বিভেদের সূত্র আরও সম্প্রসারিত করেছেন। স্বাধীন জাতীয় জীবনে ও সাম্প্রদায়িকতার মূলে আঘাত না করে অনগ্রসরতা দূরীকরণের ভাওতায় তপশীলভুক্তদের সংরক্ষণের আওতায় এনে একটী ক্ষুদ্র সুবিধাবাদী শ্রেণী (Privileged class) তৈরী করা হয়েছে, দরিদ্র হরিজনদের দারিদ্র্য বেড়েই চলেছে। এই ক্ষুদ্র সুবিধাবাদী শ্রেণী রিজার্ভেশনকে একটী জাতীয় শ্লোগানে পরিণত করেছে। সাম্প্রদায়িক ও তপশীলিদের সংরক্ষণ দাবীর তীব্রতায় নিজেদের কাছেই মানুষ হিসাবে আমরা হীন হয়ে পড়েছি। অথচ আমাদের রাজনৈতিক মানসিকতা এমন অবস্থায় পৌঁচেছে যে এই সমস্ত বিভেদমূলক পন্থা হঠান দূরের কথা, ক্রমাগত পুষ্টতর করে চলেছি। ফলে সারা ভারতে অনগ্রসরতার নামে বিভিন্ন সম্প্রদায় গজিয়ে উঠছে, জাতীয় একা ও সংহতি জাতীয়জীবনে বিলীন হতে চলেছে। বিবাহ পদ্ধতি ও অন্যান্য সামাজিক নিয়মকানুন বিষয়ে এখনও আইনের চোখে সকলকে এক পংক্তিতে আনতে আমরা সঙ্কোচিত।

মানবধর্মকে (Secularism) চড়িয়ে দিতে হবে জনসাধারণের মধ্যে। অশিক্ষা, কুসংস্কার, দৈন্য মানুষে মানুষে বিভেদ সৃষ্টির উপাদান কেড়ে ফেলতে হবে। সংরক্ষণ, রিজার্ভেশন দিয়ে বিভেদের বীজ রোপন করা চলবে না। যোগ্যতাই একমাত্র মাপকাঠি যে কোন ব্যবস্থায় এই নীতি চালু করতে হবে। সকলকেই যোগ্যতা অর্জনের জন্য সুযোগ দিতে হবে, অনটনের জন্য, দারিদ্র্যের জন্য যোগ্যতা অর্জনে যেন কোন বিঘ্ন না ঘটে। এই নীতি চালু না করলে দেশ দিন দিনই খণ্ডবিখণ্ডের পথে এগিয়ে যাবে। সারা ভারত এক জাতী, এক প্রাণ কবির ভাষায়ই থাকবে, মানুষের বাস্তব জীবনে এই মহাবাণীর কোন পরশ লাগবে না।

●

ইরাক-ইরানের যুদ্ধ বন্ধ হোক

কালীপদ সরকার

●

ইরাক-ইরানের যুদ্ধ দ্বিতীয় সপ্তাহে পড়ল। যুদ্ধ বন্ধের জন্য জাতিপুঞ্জ থেকে শুরু করে বিশ্ব রাষ্ট্র প্রধানগণ ও ইসলামিক সম্মেলন আবেদন জানিয়েছেন কিন্তু যুদ্ধ থামে নি। জাতিপুঞ্জের আবেদনে সাড়া দিয়ে ইরাক অগ্র সংবরণে সম্মতি জানিয়েছে, এমন কি ৫ই থেকে ৮ই অক্টোবর পর্যন্ত একতরফা যুদ্ধ বিরতি পালনের কথাও নাকি ঘোষণা করেছে। অন্যদিকে ইরান যুদ্ধ বিরতিতে রাজী নয়, না হবারই কথা। কারণ, ইরাকী সৈন্য ইরানের অভ্যন্তরে অনেকটা ঢুকে আছে, সেজন্য ইরান বলেছে যে, ইরানের ভূ-খণ্ড থেকে ইরাক আগে তার সৈন্য সরিয়ে নিক, তারপর ইরান অগ্র সংবরণের বিষয় বিবেচনা করবে।

ইরাক ও ইরানের বিরোধ দীর্ঘকালীন, এর মূলে আছে সিয়া সুন্নী মতবিভেদ, সেমিটিক আরব ও আর্য পারসিক বংশগত বিভিন্নতা এবং সাংস্কৃতিক পার্থক্যবোধ। উভয় রাষ্ট্রই মুসলমান ধর্মাবলম্বী কিন্তু রক্তের বন্ধন, ভাষার বন্ধন এবং ভৌগলিক ও ঐতিহাসিক প্রভাব যে ধর্মের বন্ধন থেকে দৃঢ়তর ও কালজয়ী ইরাক-ইরানের বিরোধে সেই সত্যই প্রতীয়মান। শত চেংগিস, জার আইভান এবং স্তালিনের বজ্রকঠোর শাসন এই প্রভাবকে শিথিল করতে অক্ষম। মুসা, যীশু, বুদ্ধ এবং মার্কসের শিক্ষাও সেখানে ব্যর্থ।

রণাঙ্গনের সংবাদ দুই পক্ষের দাবি ও প্রতিদাবির দ্বারা আচ্ছন্ন, যুদ্ধের অবস্থা কোন পক্ষের অনুকূলে সে কথা সঠিক ভাবে বলা শক্ত। তবে ইরাক যে কিছুটা এগিয়ে আছে তা বুঝতে অসুবিধা হয় না।

ইরানের আয়তন ৬,৩৬,৩৬০ বর্গমাইল, লোক সংখ্যা ৩,১৯,৬০,০০০ এবং ইরানের আয়তন ১,৬৭,৫৬৭ বর্গমাইল, লোকসংখ্যা ১,০৭,৭০,০০০। দেশের আয়তন ও লোকসংখ্যার বিচারে ইরাক প্রায় ইরানের অর্ধাংশ তুল্য। তবে যুদ্ধের ব্যাপারে সংখ্যা সব সময় শক্তি সামর্থ্যের মাপকাঠি হয় না।

বর্তমান সংঘর্ষের কারণ হল, সীমান্ত সংলগ্ন ২০০ বর্গমাইল ইরাকী ভূ-খণ্ড এবং শাত-এল-আরব নদী পথের উপর যে অধিকার ১৯৭৫ সালে ইরাক চাপে পড়ে মেনে নিতে বাধ্য হয়েছিল, ইরাক কর্তৃক তার খণ্ডন প্রয়াস। ইরাকী প্রেসিডেন্ট সাদাম হোসেন ইতিপূর্বে ১৯৭৫ সালে সম্পাদিত ইরান-ইরাক চুক্তিটি একতরফাভাবে বাতিল করে দিয়েছেন। ইরানের আভ্যন্তরীণ অস্থিরতার সুযোগ নিয়ে তিনি ইরাকের হৃত অধিকার পুনরুদ্ধার করতে চান। আপসে যখন তা সম্ভব নয়, যুদ্ধ ছাড়া তখন মিঃ সাদাম হোসেনের সামনে অন্য পথ ছিল না। জাতিপুঞ্জ পরিষদে যে

কোন বিতর্কিত বিষয়েরই মীমাংসা হয় না সে তো এখন সকলেই জেনে ফেলেছে।

শাত-এল-আরব ইরাকের নদী। ইরাকের দুই ইতিহাস বিশ্রুত নদী ইউফ্রেতিস ও তাইগ্রিসের সমুদ্রগামী মিলিত জলধারাই শাত-এল আরব নামে পরিচিত, যার পশ্চিম তীরে অবস্থিত ইরাকের বন্দর নগরী বসরা এবং পূর্ব তীরে ইরানের বন্দর নগরী আবাদান। উভয় নগরীতেই আছে পোতাশ্রয়, তৈল শোধনাগার এবং পেট্রোকেমিকেল শিল্পশালা। শাত-এল-আরব নদীপথ উভয় রাষ্ট্রের বাণিজ্যিক প্রয়োজনে ব্যবহৃত হলেও, ইরাকের ক্ষেত্রে এই নদী পথ পারস্য উপসাগর হয়ে বহির্সমুদ্রে যাবার একমাত্র অবলম্বন।

ইরাক ও ইরান উভয়ই ভারতের মিত্র রাষ্ট্র, উভয়ই জোট নিরপেক্ষ সম্মেলনের সদস্য এবং তৈল সমৃদ্ধ। দুটি দেশই ভারতকে তৈল জোগায়। ইরাক ও ইরানের সহিত ভারতের সম্পর্ক সুপ্রাচীন কালের এবং বর্তমানে দুই দেশের উন্নয়ন প্রকল্প-গুলিতে বহু ভারতীয় ইঞ্জিনিয়ার, ডাক্তার, প্রযুক্তি-বিদ ও শ্রমিক কর্মরত আছেন। সুতরাং সাম্প্রতিক ইরাক ইরান যুদ্ধ ভারতের নিকট উদ্বেগজনক এবং বেদনাদায়ক।

অবাঞ্ছিত হলেও যুদ্ধ থেকে মুনাফা শিকারে আগ্রহী পশ্চিমী দুনিয়া, বিশেষ করে মার্কিন যুক্ত-রাষ্ট্র। তারা এই সুযোগে ইরান ও ইরাকের তৈল সম্পদের উপর লাভজনক নতুন শর্ত আদায়ের ফিকিরে আছে এবং মার্কিন বন্দী কূটনীতিকদের মুক্তির চেষ্টা করছে।

প্রেসিডেন্ট সাদ্দাম হোসেন ইরাক সোভিয়েত মৈত্রীচুক্তি নাকচ না করলেও কিছুটা পশ্চিমী ঘেঁষা রাজনীতিক। তাঁর দৃষ্টিতে কমিউনিজম হল—পচা, নিরীশ্বরবাদী, পীত বটিকা। (Rottn, atheistic, yellow storm). ইরাক সোভিয়েত রাশিয়া থেকে যেমন বিপুল সমরাস্ত্র পেয়েছে, তেমনি ফ্রান্স থেকে কিনেছে বিমান ও ট্যাংক। ইরাকের সৈন্য বাহিনী সুগঠিত ও যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত।

পক্ষান্তরে ১৯৭৯ সালে আয়াতুল্লা খোমেনির নেতৃত্বে ইরানে যে ইসলামিক বিপ্লব ঘটে, এখনো তা সম্পূর্ণ হয়নি। বিপ্লবের নেতাদের হাতে প্রাণ দিয়েছেন ইরানের বহু রণদক্ষ সেনানী। ইরানের সম্রাট মহম্মদ রেজা শাহের সুশিক্ষিত সৈন্যবাহিনী আর আগের মত শক্তিশালী নেই। তাদের মনোবলও ভঙ্গুর। একমাত্র শাহের নৌবাহিনী অনাহত অবস্থায় আছে, কিন্তু নৌবাহিনী দিয়ে তো স্থলযুদ্ধ চলে না। প্রেসিডেন্ট বাণিসদর বিচক্ষণ ব্যক্তি, কিন্তু ইরান রাষ্ট্রের ক্ষমতার চাবিকাঠি আশি বছরের বৃদ্ধ আয়াতুল্লা খোমেনির হাতে। তিনি কখন কি ফতোয়া জারী করবেন তা শুধু আল্লাহ-ই জানেন।

অন্যদিকে ইরানের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শাপুর বক্তিয়ার বিদেশে একটি অস্থায়ী ইরান সরকার গঠন করেছেন এবং যুবরাজ রেজা শহলবী তাঁর নির্বাসন আশ্রয় থেকে ঘোষণা করেছেন, তিনি ইরানের হয়ে ইরাকের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নামতে প্রস্তুত। ইরানে শাহতন্ত্রের সমর্থকদের সংখ্যা নগণ্য নয়। যুদ্ধ দীর্ঘ-স্থায়ী হলে ইরানে পুনরায় শাসনতান্ত্রিক বিভ্রাট ঘটাও সম্ভব। ইরানে খোমেনির সিয়া প্রতিপত্তি, সুন্নী ইরাক ভাল চোখে দেখে না। ইরাকেও সিয়া

সম্প্রদায়ভুক্ত অনেক আছে, তাদের উপর এই প্রতিপত্তি প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে পারে ইরাকের সে আশংকা অমূলক নয়।

ইরাকের নেতারা আয়াতুল্লা খোমেনি সম্পর্কে বলেছে—"বৃদ্ধটি এক ঈশ্বর অবিশ্বাসী, কোরান বিরোধী, ধর্মহীন, স্বৈরাচারী।" খোমেনির জন্য দুঃখ হয় যে, ইসলামের জন্য এত করেও স্বধর্মীদের দৃষ্টিতে তিনি হলেন কোরান বিরোধী অধার্মিক। সে যাই হোক, দেশরক্ষার জন্য খোমেনি এখন কোন দিকে হাত বাড়াবেন? সোভিয়েত রাশিয়া না মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র? এই দুই প্রধানের কারো সঙ্গেই তাঁর সদ্ভাব নেই; তবে ঠেলায় পড়ে তাঁকে হয়ত শেষ পেশ যুক্তরাষ্ট্রের দিকেই হাত বাড়াতে হবে। ইরানের বিমান, ট্যাংক, বন্দুক, গুলীগোলা সবই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে আমদানী কামান বিমানের যন্ত্রাংশ পেতে হলে তাকে তাই যুক্তরাষ্ট্রের কাছেই যেতে হবে।

যুদ্ধ যদি তাড়াতাড়ি মিটে যায় তো ভাল, নতুবা তৈল সংকটে পড়তে হবে পশ্চিম ইউরোপের দেশগুলি, জাপান ও ভারতকে। রুশিরা অবশ্য ভারতকে যুদ্ধজনিত তৈল ঘাটতি মেটাবার আশ্বাস দিয়েছে, তবে তাতে যে অসুবিধা নেই এমন নয়, একজনের উপর অত্যাধিক নির্ভরতার প্রশ্ন তো আছেই।

যুদ্ধে যাতে অন্য কোন রাষ্ট্র নাক গলাতে না পারে তার জন্য বিশ্বের বৃহৎ শক্তিগুলি সাবধান বাণী আওড়ালেও, কার মনে কি আছে কেউ জানে না। ইজরাইল ইতিমধ্যে ইরানকে সামরিক সাহায্যের প্রস্তাব দিয়েছে। অপর পক্ষে, আরব রাষ্ট্রগুলি যে ইরাকের প্রতি সহানুভূতিশীল সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। যুদ্ধ চলতে থাকলে দ্বিপক্ষ সংগ্রাম যে বহুরথী সংগ্রামে পরিণত হবে না সে কথা বলা শক্ত।

শান্তিপূতকল্পে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট এবং ইসলামিক সম্মেলনের সভাপতি মিঃ জিয়াউল হক পালেস্তাইন উদ্বাস্তু আরব নেতা মিঃ ইয়াসার আরাভত ইরান ও ইরাক ঘুরে গিয়েছেন। তাঁদের দৌত্য সফল হয়নি। মিঃ জিয়া বলেছেন যে অবস্থা দেখে মনে হয়, যুদ্ধ দীর্ঘস্থায়ী হবে।

তাঁর কথা নিঃসন্দেহে আশঙ্কাজনক। তবুও আমরা আশা করবো যে, যুদ্ধরত দুটি প্রতিবেশী রাষ্ট্রের নায়কদের অন্তরে শুভবুদ্ধির উদয় হবে এবং তাঁরা যুদ্ধ বন্ধ করে আপাপ আলোচনার মাধ্যমে বিরোধীয় বিষয়ের নিষ্পত্তি করতে সম্মত হবেন।

যুদ্ধের দ্বারা যে কোন সমস্যারই সমাধান হয় না, বিরোধের কারণ থেকেই যায়, এই সত্যের প্রতি এই শতাব্দীর পঞ্চাশ ও ষাট দশকে লোকের মনে যতটা আস্থা ছিল, আজ যেন তা আর নেই। সম্প্রতি কামপুচিয়া এবং আফগানিস্থানে যা ঘটল তাতে এই অনুমানকে দৃঢ়তর না করে পারে না। সকলেই যুদ্ধ পরিহারের কথা বলে, কিন্তু তলে তলে সামর্থ্য অনুযায়ী সমর প্রস্তুতি চালিয়ে যাচ্ছে। সভ্য জগত যেন সেই আদিম বচন Might is right-র দিকেই ঝুঁকে চলেছে।

মধ্য প্রাচ্যের অবস্থা এমনিতেই অশান্ত, যুদ্ধ বাধলে তা উত্তপ্ত হয়ে ওঠা স্বাভাবিক। এই অশান্তির কারণ দুটি, একটি হল তৈল, তৈল নিয়ে বৃহৎ রাষ্ট্রগুলির প্রতিদ্বন্দ্বিতা তৈল উৎপাদনকারী দেশগুলিকে যেমন অস্থির করে রেখেছে, তেমনি

হঠাৎ পাওয়া অপরিমিত অর্থ তাদের মাথা গরম করছে। প্রকৃত প্রস্তাবে তৈলই এখন শক্তির উৎস। দুই নম্বর কারণ হল, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যা বিশ্বে যে চিন্তা বিপ্লব এনেছে তার সঙ্গে ইসলামীয় ধর্ম-বিশ্বাস ও সপ্তদশ যুগীয় ধারণাভিত্তিক মুসলমান সমাজের বিধি বিধানের সংঘর্ষ।

এই সংঘর্ষে রাজ্যহারা হয়ে মরেছেন ইরানের শাহ মহম্মদ রেজা শাহ পহ্লবী, ঘাতকের হাতে প্রাণ দিয়েছেন ইরাকের রাজা দ্বিতীয় ফৈজল এবং বিপ্লবী নায়ক প্রেসিডেন্ট কাসেম আলি।

এই প্রসঙ্গে কুর্দদের কথা উল্লেখ্য। কুর্দরা ধর্মে মুসলমান হলেও, বংশে আরব, পারসিক ও তুর্কদের থেকে স্বতন্ত্র। তাদের অধিকাংশ বাস করে ইরাকে, কিছুটা আছে ইরানে এবং কিছুটা তুর্কিতে। কুর্দরা চায় তাদের পৃথক বাসভূমি কুর্দিস্থান। এই দাবি বহুকালের। অনেকে মনে করেন, কুর্দরা প্রাচীন সুমার গোষ্ঠীর মানুষ এবং ইরাক অর্থাৎ মেসোপ-তেমিয়ার সুপ্রাচীন অধিবাসী।

সুযোগ পেলেই কুর্দরা বিদ্রোহ করে এসেছে। বর্তমান ইরাক-ইরান যুদ্ধের সুযোগে তারা যে আর একবার মাথা তুলে দাঁড়াবে না তাই বা কে জানে?

আমরা চাই, অচিরে লড়াই বন্ধ হোক এবং বিরোধের মীমাংসা হোক আলোচনার টেবিলে। বিশ্বশান্তি নির্বিঘ্ন হোক।

●

স্বাধীনতা সংগ্রামীর লোকান্তর

বরিশাল জিলার রহমৎপুর গ্রামের কৃষ্ণকান্ত মুখার্জি দীর্ঘ রোগ ভোগের পর কিছুদিন হয় শেঠ সুখলাল কারনানী হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। কিশোর বয়সেই কৃষ্ণকান্তবাবু অনুশীলন সমিতির সংস্পর্শে আসেন। পরবর্তীকালে তিনি আর. এস. পিতে যোগদান করেন—এবং '৪২ সনের 'ভারত ছাড়' আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করে তিনি বহুদিন বিনা বিচারে আটক ছিলেন।

লোকায়ত শিক্ষা দর্শন

—ফণিভূষণ দাশ

●

বিশ্বতত্ত্ব, সৃষ্টিতত্ত্ব, জ্ঞানতত্ত্ব ও নীতিতত্ত্ব যে দিক হতেই বিচার করা হোক না কেন, মানুষ মাত্রেই মুক্তি পিয়াসী। প্রমিথিউসের স্তায় বন্ধন মুক্তির অদম্য উৎসাহ ও প্রয়াস তার মজ্জাগত। যে সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবহার তার বৌদ্ধিক, নৈতিক, সাংস্কৃতিক, আর্থিক ও রাজনৈতিক সৃজনী শক্তির বন্ধন ঘুচেনা সে তাকে স্বীকার করে নিতে পারে না।

জীবনই বিকাশ। বিকাশ মানে অগ্রগতি। চরৈবেতি। যে বা যারা তার অগ্রগতির পথরোধ করে সে তার বিরুদ্ধে একদিন না একদিন বিদ্রোহ করবে এবং শেষ পর্যন্ত সামগ্রিক বিপ্লবের মাধ্যমে অগ্রগতির পথের বাধা রোধ করবে। ইহাই মানব প্রকৃতি। প্রচলিত শোষণ ভিত্তিক সমাজে মানুষের এই প্রকৃতিকে জড় ও অন্ধ করে রাখে। কিন্তু মুক্তি পিপাসা মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি। শিক্ষার কাজ মানুষকে সেই জড়ত্ব ও অন্ধত্ব থেকে মুক্তি দিয়ে 'মুক্তি পিপাসায়' উদ্বুদ্ধ ও অগ্রণী করে তোলা। প্রাচীন মুনি-ঋষিদেরও প্রার্থনা—'তমসো মা জ্যোতির্গময়' এই মুক্তি প্রয়াস বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন-রূপে মানব মনে ও সমাজ জীবনে উদ্ভাসিত।

মানব জাতির ক্রম-বিকাশের এক বিশেষ স্তর হতে সমাজে চলে আসছে আর্থিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক শোষণ। শোষিতগণ ভুলেই যায় যে তারা শোষিত। আচার ব্যবহারের সহস্র বিধান, পুরোহিতের সংহিতা ও শাসকতন্ত্রের লাঠি পুলিস বিচারালয় ও কারাগারের ভয়ে তারা ভুলে যায় যে তারাও মানুষ। তারা মনে করে এ তাদের ভাগ্যলিপি। কিন্তু ব্যক্তি মানুষ কেবল প্রতিক্রিয়ারই শিকার নন, ক্রিয়া করার শক্তি তার আছে। মুক্তির আকাঙ্খা ও সত্যানুসন্ধিৎসা তার মজ্জাগত আত্মরক্ষা ও জীবন-সংগ্রামের সহজাত প্রেরণাতেই আদিম মানুষ সংঘবদ্ধ ও পরে সমাজবদ্ধ হয়েছিল। মুক্তি পিপাসাও মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি। তাই শত শত বৎসর পরাধীনতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ থেকে বা দাস জীবনযাপন করেও মানবের মুক্তি পিপাসা লোপ পায় না। সুপ্ত থাকে সাময়িক। সময় সবচেয়ে বড় শিক্ষক। কালের পরিবর্তনে, পরিবেশের প্রভাবে তার মধ্যে পরিবর্তন আসে, উপলব্ধি করে সেও মানুষ, সমাজের আর্থিক সামাজিক, সাংস্কৃতিক সমস্ত কাজে স্বাধীনভাবে অংশ গ্রহণের বাসনা জাগে। সমাজের আভ্যন্তরীণ সংঘাত ও সংগ্রাম তাদের সচেতন হতে সাহায্য করে। কারণ সে সংঘাত ও সংগ্রামেরই যে কখনো প্রত্যক্ষ কখনো পরোক্ষভাবে সে অংশীদার। এই অভিজ্ঞতা হতে যে সমাজ তাকে অবদমিত করে রেখেছে সে সমাজকে সে ভেঙ্গে নতুন করে গড়ে তোলার স্বপ্ন দেখে। এদের অধিকাংশই নিরক্ষর, অজ্ঞতা ও ক্ষুধার অভিশাপে জর্জরিত। মানবিক অধিকার হতে বঞ্চিত। নিরক্ষরতা সবচেয়ে বড়

অভিশাপ। এরা চলে গুজব, গালগল্প রূপকথা ও কুসংস্কার নিয়ে। এরাই সত্যিকার তৃতীয় দুনিয়া। উন্নত, অনুন্নত ও উন্নয়নশীল সব দেশেই এদের দেখা যায়। এদের শিক্ষা সমস্যাই লোকায়ত শিক্ষার আশু সমস্যা।

ভারতে আজও মানুষ ক্ষুধার শিকার, অন্নদাস। 'ক্ষুধার্তের একমাত্র স্বাধীনতা মরিবার তরে।' ক্ষুধা মানুষকে পঙ্গু করে, কর্মে অক্ষম করে, মনুষ্যত্ব বর্জিত করে, স্বামীজী বলতেন খালি পেটে ধর্ম হয় না। এরা শিক্ষা হতেও বঞ্চিত। ১৯৭১ ইং লোক গণনা অনুসারে ভারতের লোকসংখ্যা ৫৪৮১,৫৯,৬১২ জন। ইহার মধ্যে শিক্ষিতের সংখ্যা ১৯.৪৫% মাত্র। সুতরাং জীবিকা ও শিক্ষা-সংস্কৃতি হতে যুগ যুগ ধরে বঞ্চিত ভারতবাসীর শিক্ষার নীতি ও পদ্ধতি নির্দ্ধারণই লোকায়ত শিক্ষার লক্ষ্য। ক্ষুধা মানুষকে অলস, নিষ্ক্রিয়, নির্বিরোধ, ভাগ্য নির্ভর ও মনুষ্যত্ব বর্জিত করে তোলে। ইহার ফলে তাদের সামাজিক, সাংস্কৃতিক আর্থিক, রাজনৈতিক ও মানবিক সত্তার অবক্ষয় ও বিপর্যয় ঘটে। বঞ্চনা তথা শোষণের শিকার হলেও বেশির ভাগ ক্ষেত্রে তারা তা বুঝতে পারে না। এ অবস্থায় তাদের সাংস্কৃতিক প্রবাহ স্তব্ধীভূত হয়। জনৈক শিক্ষা-ব্রতী ইহাকে Culture of Silence বলেছেন, দেশের বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থা বৃটিশ আমলে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদী প্রশাসন ও শোষণের স্বার্থে গড়ে উঠেছিল। আজকের দিনেও স্বদেশী শাসক ও শাসনের স্বার্থে সেই পুরাতন ব্যবস্থা হেরফের করে চালানো হচ্ছে শাসিত শোষিত গরীব মানুষ জীবনের বিকাশের দিক হতে বিচার করলে পূর্বের ন্যায় যে তিমিরে সেই তিমিরে। লোকায়ত শিক্ষা সার্থক-ভাবে প্রয়োগ করা হলে সে সচেতন হবে ও প্রতিকারের জন্য সক্রিয় হবে। ফলে তাদের সংস্কৃতির স্তব্ধভাব অর্থাৎ নীরব ভারবাহী সংস্কৃতির অবসান ঘটবে। জমিদারী ব্যবস্থা ভগবানের সৃষ্টি ঐ মনোভাব অপসারিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে চাষী জমির মালিক হওয়ার জন্য সংগ্রাম শুরু করে। ভূমিদাস প্রথার কালক্রমে অবসান ঘটে। ইহা ঐতিহাসিক সত্য। তাই লোকায়ত শিক্ষা সার্থকভাবে সম্পন্ন করা হলে মানুষ নির্বিরোধী না হয়ে সতর্ক সমালোচনা ও চেতনার (critical Criticism and Consciousness) অধিকারী হয়। ফলে তারা নিষ্ক্রিয় ও ভাগ্য নির্ভর না হয়ে যে ব্যবস্থা তাদের দুর্ভাগ্যের জন্য দায়ী তার অবসানের জন্য সংগ্রামে উদ্যোগী হয় ও নিজেদের উন্নতির অনুকূল সমাজ গঠনে উদ্যোগী হয়। তারা পৌরুষ নির্ভর হয়ে শাসন শোষণের অবসানের জন্য সংগ্রাম করবে—অপসারিত হবে অজ্ঞাত প্রসূত শাসন শোষণের পরিত সদৃশ বোঝা, সহ্য করার যুগসঞ্চিত সহিষ্ণুতা। তাদের ক্ষেত্রে এই সহিষ্ণুতা গুণ নহে, কাপুরুষতার নামান্তর মাত্র।

লোকায়তশিক্ষা এ বিবিধ ক্রিয়া সম্পন্ন করবে বলে ইহা সৃজনাত্মকও বটে। নতুন সৃষ্ট এই সমাজ স্বভাবতঃই বর্তমান ভারতের শতকরা ৭০ জনেরও অধিক লোককে শাসন শোষণ মুক্ত করে, নতুন নৈতিক ও সামাজিক মূল্যবোধ উদ্বুদ্ধ করবে। ইহারা পরশ্রম-জীবী হবে না। ব্যক্তিগত স্বার্থের পরিবর্তে সমষ্টিগত স্বার্থ পূরণের মধ্যে নিজের কল্যাণ চাইবে, শোষণ শাসন মুক্ত হবে বলে হিংসা-দ্বেষ মুক্ত হবে, ভ্রাতৃভাব হবে স্বাভাবিক ভ্রাতৃভাব ব্যতীত সাম্য সম্ভব নহে। তাই লোকায়ত শিক্ষাই হবে প্রকৃতপক্ষে নৈতিক। মানুষকে নৈতিক আচরণ

সম্পন্ন হওয়ার জন্য ধর্ম বা ভগবানের দোহাই দেওয়ার প্রয়োজন থাকবে না।

কর্তৃত্ববাদী সমাজের অবসান ও প্রত্যেক মানুষ স্বাধীন সচেতন ও প্রকৃত সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী হবে বলে তারা সমাজে পারস্পরিক সমান অধিকার এবং পারস্পরিক কল্যাণবোধে উদ্বুদ্ধ হয়ে আনন্দে কর্মে উদ্যোগী হবে। কর্ম ও চিন্তা জীবনে দাসত্ব ও নিয়ন্ত্রনাধীন হবে না সমষ্টীগত কল্যাণ তা লোকহিত ও ব্যক্তিগত মর্যাদা স্বীকৃত হবে বলেই স্বৈরতন্ত্র, বংশতন্ত্র, গোষ্ঠীতন্ত্র, একনায়কতন্ত্র বা দল-সমাজে দানাবেঁধে উঠতে পারবে না। মানুষ নিজের প্রয়োজন সাধন করার জন্য রাষ্ট্র ও সরকার গড়ে তুলেছিল কিন্তু সে রাষ্ট্রই আজ অধিকাংশ মানুষের উপর জগদ্দল পাথরের ন্যায় চেপে বসেছে। সাধারণ মানুষ সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকার হতে বঞ্চিত। সব রাজনৈতিক দলই জনগণের সার্বভৌমত্বের কথা বলে ক্ষমতা অধিকার করে কিন্তু ক্ষমতায় বসে জনগণের উপর ছড়ি ঘুরায়।

স্বাধীন-মানুষ আপন কর্তব্য ও অধিকার সম্পর্কে সচেতন হলে পুনরায় তার সার্বভৌমত্ব উদ্ধার করতে সমর্থ হবে। ইহা সম্ভব আলোচ্য শিক্ষা পদ্ধতির মাধ্যমে। স্বাধিকার ও সচেতন মানুষ নিজের প্রয়োজন অনুযায়ী সমাজ ও সংস্থা গড়ে তুলবে। এ সব সমাজ সংস্থার সমবায় হবে রাষ্ট্র। ঐ রাষ্ট্র উপর হতে জনগণকে নিয়ন্ত্রন করতে পারবে না, জনগণই হবে রাষ্ট্র ক্ষমতার নিয়ন্ত্রক, এরূপ রাষ্ট্রেই জনগণ তার সার্বভৌম ক্ষমতার প্রকৃত অধিকারী হয়। এ রাষ্ট্রক্ষমতাও হবে বিকেন্দ্রীভূত। লোকায়ত শিক্ষার কাজ, খাদ্যহীন, বস্ত্রহীন গৃহহীন ও শিক্ষা সংস্কৃতি বঞ্চিত মানুষকে লোকায়ত সার্বভৌমত্বের প্রকৃতি, তা অর্জন করার পথে বাধা, এবং অর্জন করার ও অর্জিত হলে রক্ষার উপায় সম্পর্কে সচেতন ও সক্রিয় করে তোলা। বস্তুত লোকায়ত শিক্ষা লোকায়ত সার্বভৌমত্বের বাহক, ভিত্তি পূর্বগামী।

শিক্ষা বা জ্ঞানার্জন বলতে আমরা সাধারণত স্কুল কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় নির্দ্ধারিত গ্রন্থ পাঠ, মুখস্থ করা ও তথ্য আহরণ মনে করি। সর্বশেষ পরীক্ষা পাশ করে ডিগ্রী বা মোক্ষ লাভ করি। এই শিক্ষার দ্বারা শিক্ষার্থীর চেতনের বিকাশ, পরিবেশ পরিচিতি ভবিষ্যত জীবনের জীবিকার প্রস্তুতি, সামাজিক ও বিশ্ববোধ লাভ ঘটে না। গড়ে উঠেনা সচেতন চেতনা যুক্তিবোধ বা নৈতিক মূল্যবোধ। আমরা গ্রামে, গঞ্জে, শহরে নগরে এমন লোককে দেখি, যারা স্কুল কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষিত না হয়েও নিজ নিজ কাজে পারদর্শী, বাস্তব জ্ঞানের অধিকারী, দেশ বিদেশের ঘটনাবলীর সঠিক মূল্যায়নে সমর্থ; সামাজিক কর্তব্যবোধে উদ্বুদ্ধ ও নৈতিক বলে বলীয়ান। ইহা হতে সিদ্ধান্ত করা যায় যে মানুষ পরস্পরের সংস্পর্শে এসে শিখে, দেখে, শোনে ও অভিজ্ঞতা হতে শিখে, শিখে জীবনের নানা প্রয়োজনের সম্মুখীন হয়ে অর্থাৎ জীবন মুখী কর্ম-উদ্যোগে অংশ গ্রহণ ও পারস্পরিক আলোচনা হতে শিক্ষালাভ শুধু সম্ভবই নহে, সহজও বটে। প্রাচীন ভারতীয় শিক্ষা ব্যবস্থায় ইহার বহু দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। কাজে সক্রিয় অংশ গ্রহণ, পর্যবেক্ষণ ও শ্রবণের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর অর্থাৎ কর্মী, দ্রষ্টা বা শ্রোতার বৌদ্ধিক ও আত্মিক বিকাশ হয়। আচার্যের নির্দেশে উপমন্যু আচারণ ও আরুণি জমির বাঁধে ছিদ্র পথে জল প্রবেশ বন্ধ করতে নিজেই চতুর্বেদ

সর্বশাস্ত্রে বুৎপত্তি লাভ করেছিলেন। বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থায় ইহা উপেক্ষিত। লোকায়ত শিক্ষা ব্যবস্থায় ইহা উত্তম মাধ্যমরূপে গ্রহণীয়। বিশেষ করে বয়স্কদের শিক্ষাক্ষেত্রে কর্মে অংশ গ্রহণ ও আলাপ আলোচনার মাধ্যমে শিক্ষা অত্যন্ত ফলপ্রসূ। নিরক্ষর হলেও আলাপ আলোচনার মাধ্যমে বর্তমান সমাজের ত্রুটি বিচ্যুতি বিরোধ নির্ণয়, সমাজ কাঠামোয় তার অবস্থান জানা, সামাজিক চেতনা অর্জন ও প্রচলিত ব্যবস্থার সতর্ক সমালোচক হওয়া সম্ভব। ইহার ফলে নিরক্ষরও বুঝতে পারে সে মানুষ। সে নিজেকে জানে, বোঝে তার সামাজিক মূল্য, ফলে তার জৈবিক মানব হতে পৌরুষ ও ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন আত্মসচেতন মানুষে উত্তরণ ঘটে। শিক্ষার উদ্দেশ্য সফল হয়। এই উত্তরণ লোকায়ত শিক্ষার দ্বারাই সম্ভব, অন্যাবধ অন্যকোন শিক্ষাব্যবস্থা মানবের এই রূপান্তর সম্ভব করতে পারেনি। কারন এতাবৎকাল শিক্ষার্থী (Object) শিক্ষকের (Subject) নিয়ন্ত্রনাধীন। এখানে শিক্ষার্থী নিয়ন্ত্রক (Subject), আবার নিজে শিক্ষকও (Object) বটে। যে দুনিয়া এতদিন তার কাছে অর্থহীন ছিল, সে শুধু ছিল ভাগ্যের বা অন্যের হাতে ক্রীড়নক, সমগ্র জীবন হতে শোষক ও শাসকদের বিধি ব্যবস্থা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, এখন সে সমাজও তার কাছে অর্থহীন নয়। সে নিজেকে এখন সে সমাজ রূপান্তরে সক্ষম, সমর্থ ও নতুন সংস্কৃতি সৃষ্টি করার ক্ষমতা সম্পন্ন ভাবে। কাজ করে সে আনন্দে, কাজের মধ্য দিয়ে সে নিজে রূপান্তরিত হয়, রূপান্তরিত করে সমাজও জগৎকে। উৎপাদন কারীদের ও ভোক্তাদের সমবায় সংগঠন ও পরিচালনা এরূপ কাজের প্রকৃষ্ট উদাহরণ। এরূপ শিক্ষাব্যবস্থা উন্নয়নশীল ও অনুন্নত দেশ সমূহে আর্থীক উন্নয়ন ও সামাজিক রূপান্তরের অনুকূল ও আবশ্যক। ইহার মাধ্যমে নতুন ব্যক্তিগত ও সামাজিক আচরণবিধি সৃষ্টি হবে। এই পদ্ধতি শিশু, কিশোর যুবক ও বয়স্ক যে কোন স্তরেই সমভাবে প্রয়োগযোগ্য। বর্তমান পুস্তক কো পদ্ধতিকে দাতা (শিক্ষক) গ্রহীতা (ছাত্র), পদ্ধতি বলা যেতে পারে। ইহার চেয়ে কর্মে অংশ গ্রহণ, পর্যবেক্ষণ, শ্রবণ ও পারস্পরিক আলোচনা (dialog) ভিত্তিক পদ্ধতি নিঃসন্দেহে শ্রেয়। অবশ্যই এখানে শ্রেণী শিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করা হচ্ছে না।

সমাজে প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থায় প্রযুক্তিবিদ্যার স্থান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রযুক্তিবিদ্যা বিশুদ্ধ বিজ্ঞান চর্চারই পরিনতি। প্রযুক্তি বিদ্যার সঠিক প্রয়োগদ্বারা সর্ব মানবের কল্যাণ ও সমৃদ্ধি সম্ভব কিন্তু কার্যক্ষেত্রে বিপরীত দেখা যায়। কারণ ধণতান্ত্রিক জনকল্যাণকর, তথাকথিত সাম্যবাদী বা সমাজবাদী রাষ্ট্র সমূহে প্রযুক্তিবিদ্যা শোষক শ্রেণী বা শাসকশ্রেণীর নিয়ন্ত্রনাধীন। শাসকগোষ্ঠী তাদের নিজেদের স্বার্থে প্রযুক্তিবিদ্যা প্রয়োগ করার ফলে মানুষ যন্ত্রে পরিণত হয়, কলকব্জির বা জী হুজুর বনে যায়। নিরক্ষর, দরিদ্র দেশের মানুষের ন্যায় উন্নত বা উন্নয়নশীল দেশ সমূহে মানুষ জীবনে সামাজিক মূল্যবোধ বঞ্চিত অসহায় নির্বিরোধ ভারবাহী সংস্কৃতির বাহকে পরিণত হচ্ছে। তরুণরা মনে করছে তারা ভালমন্দ বিচার ক্ষমতা ও সুযোগ হতে বঞ্চিত। তারা স্কুল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা ব্যবস্থাকেই এই জন্য দায়ী করে। লোকায়ত শিক্ষার মূলনীতি অনুশীলন করলে উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশ সমূহেও বর্তমান ত্রুটি দূরীভূত হবে।

কোন শিক্ষাই সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ হতে পারেনা। বস্তুত: শিক্ষা একটি সামাজিক সমস্যা। কোন দেশে

প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থা সে দেশের তরুণদের প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থা মেনে নিতে অভ্যস্ত করার জন্য শিক্ষা দেয়। ইহা নিয়ন্ত্রিত শিক্ষা। বর্তমান কর্তৃত্ব ব্যঞ্জক রাষ্ট্র সমূহে এই নিয়ন্ত্রিত শিক্ষাই চালু। শিক্ষার্থীর প্রবণতার স্বাধীনতার কোন মূল্য নেই। শিক্ষা রাষ্ট্রের ভৃত্য। রাষ্ট্রনায়করা তাদের অভিপ্রায় প্রথমেই শিক্ষা ও সংস্কৃতিতে প্রয়োগ করে। লোকায়ত সার্বভৌমত্ব কামীদের শিক্ষার লক্ষ্য হবে ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত। লোকায়ত শিক্ষার লক্ষ্য হবে শিক্ষার্থী বাস্তব অবস্থার সতর্ক (criticul) পরীক্ষা নিরীক্ষা, ও সচেতন মূল্যায়ণ করতে নিজেকে তৈরী করতে সাহায্য করা। এই লক্ষ্য ও পদ্ধতি অনুসরণ করা হলে সমাজে সাময়িক বিরোধ ও উত্তেজনা দেখা দিতে পারে। কিন্তু পরিণামে তা নতুন যুগের মানুষ সৃষ্টির সহায়ক হতে বাধ্য। এদিক হতে শিক্ষার দুটি লক্ষ্য একটি ধ্বংসাত্মক, অপরটি সৃজনাত্মক। স্থিতাবস্থা কামীরা লোকায়ত শিক্ষাকে ধ্বংসাত্মক বলে বিরূপ সমালোচনা করতে পারেন। কারণ এই শিক্ষা স্থিতাবস্থার অবসান কামী। কিন্তু সামগ্রিক ভাবে বিচার করলে দেখা যাবে এ শিক্ষার লক্ষ্য—ধ্বংস ও সৃষ্টি অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত ও যুগপৎ সক্রিয়। সুতরাং লোকায়ত শিক্ষা পরিকল্পনা বৈজ্ঞানিক ও বৈপ্লবিক। এই বিপ্লব-সাধনার পথই লোকায়ত শিক্ষা।

●

একটি ঘোষণা

পূজা উপলক্ষে আগামী তিন সপ্তাহ 'বিপ্লবী বাংলা' বন্ধ থাকবে। পত্রিকার পরবর্তী সংখ্যা প্রকাশিত হবে ৮ই নভেম্বর, ১৯৮০।

স, বি, বা,

পরলোকে প্রবীণ বিপ্লবী

গত ২৮শে সেপ্টেম্বর ১৯৮০ তারিখে বরিশাল মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে প্রবীণ বিপ্লবী রাম চ্যাটার্জীর দেহাবসান হয়। বিপ্লবী সতীন সেনের সহকারী হিসাবে তিনি একাধিকবার কারাবরণ করেন ও পরবর্তীকালে কলসকাটি গান্ধী আশ্রমের সহিত যুক্ত হন। আমরা তাঁর আত্মার শান্তি কামনা করি এবং বেদনার্ত আত্মীয়জনদের আন্তরিক সহানুভূতি জানাই।

গান্ধীজির শিক্ষা

—অন্নদাশঙ্কর রায়

জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত গান্ধীজী চরকা কেটে গেছেন। তাঁর কাছে এটা রীতিরক্ষা ছিল না। ছিল তাঁর মতবাদের প্রয়োগ। তিনি যা বিশ্বাস করতেন তা কাজে পরিণত করতেন।

কিন্তু কেন তিনি চরকায় বিশ্বাসকরতেন? এই বৈজ্ঞানিক যুগে এত রকম যন্ত্রপাতি থাকতে চরকায় সুতো কাটাতে হবে কেন? তাঁতেরই বা কী দরকার? মানুষকে সেকেলে ধরণে তাঁত চরকায় পেছনে সময় নষ্ট করতে হবে কেন? আরো কম সময়ে আরো বেশী উৎপাদন করা যখন সম্ভব তখন কেনই বা উৎপাদনের জন্য চরকাকে সম্বল করা।

গান্ধীজী এ প্রসঙ্গে বার বার বলেছেন, বার বার লিখেছেন। তাঁর কথা আমি কিশোর বয়সে মেনে নিয়েছি। কিন্তু যৌবনে মানতে অস্বীকার করেছি। আমার যুক্তিতর্ক শুনে আমার বাবা বলেন, "আমি খদ্দর পরি দেশের বেকারদের কাজ জোগাতে। তুমি যদি খদ্দর না পর তবে ওদের কাজ জোগাবে কী করে?"

সেদিন বাবাকে আমি যে উত্তর দিয়েছিলুম তা সে মামুলী উত্তর। দেশকে প্রথমে স্বাধীন করে তারপরে শিল্পায়িত করতে হবে। তা হলে সবাই কাজ পেয়ে যাবে। কেউ বেকার হবে না।

কিন্তু স্বাধীনতার বাইশ বছর বাদে কী দেখেছি? বাবা বেঁচে থাকলে জানতে চাইতেন দেশের বেকারদের কী কাজ জুগিয়েছি? ওদের সংখ্যা কি কমতির দিকে না বাড়তির দিকে? শিল্পায়ন কি ওদের দিক থেকে হিতকর হয়েছে, না অহিতকর? কলকারখানা কি ওদের মুখের গ্রাস কেড়ে নিচ্ছে, না ওদের মুখে অন্ন তুলে নিচ্ছে?

এসব প্রশ্নের উত্তর দেওয়া সহজ নয়। তাই গান্ধীজীর যুক্তি এখনো তেমনি জোরদার, যেমন ছিল পঞ্চাশ বছর আগে। যখন তিনি সবাইকে খদ্দর পরতে চরকা কাটতে বলেন তাঁর মতে দেশের বেকার জনগণকে কাজ জোগাতে হলে আবার ঘরে ঘরে কারুশিল্প প্রবর্তন করতে হবে। গ্রামে গ্রামে তার বাজার থাকবে। কারুশিল্পকে ধ্বংস করে, তার বাজার বেদখল করে যা হবে তাকে জনাকতক লোকের ধনসম্পদ বৃদ্ধি হলেও অগণিত নরনারীর দারিদ্র্য দূর হবে না। স্বরাজ কি তা হলে শুধু জনাকতক লোকের জন্যে, কোটি কোটি লোকের জন্যে নয়?

দেশের সমৃদ্ধি বলতে কি বোঝায়? সব মানুষের সমৃদ্ধি না কতক মানুষের সমৃদ্ধি? গান্ধীজী সব মানুষের জন্যে ভাবতেন বলেই ঘরে ঘরে কারু-শিল্পের স্বপ্ন দেখতেন। যার প্রতীক হলো চরকা। তাঁর স্বপ্নে তিনি আজীবন একাগ্র ছিলেন। আমরা তাঁর শিক্ষা অগ্রাহ্য করি তবে কর্মহীন জনগণের কাজ জোগানোর দায়িত্ব বহন করব কি করে?

●

সমাজবাদ কি এবং কেন

মহারাজ ত্রৈলোক্য চক্রবর্তী

মহারাজ ত্রৈলোক্য চক্রবর্তী ভারতে সশস্ত্র বিপ্লববাদী তথা স্বাধীনতা সংগ্রামীদের নিকট একটি অমরনাম। অর্ধ শতাব্দীর অধিককাল তিনি ভারতীয় ইতিহাসের উত্থান-পতন-অভ্যুদয়ের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। ভারতে অনুশীলনদলের তিনি অন্যতম মহান নায়ক ছিলেন। স্বাধীনতা সংগ্রামের শেষের দিকে তিনি আচার্য নরেন্দ্র দেও, জয়প্রকাশ নারায়ণ, ডঃ লোহিয়া প্রমুখ সমাজবাদী নেতৃবৃন্দের সঙ্গে আলোচনান্তে সোস্যালিষ্ট পার্টিতে যোগদান করেন। দেশ বিভাগ হলে তিনি তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান বর্তমানের বাঙলাদেশকেই তাঁর কর্মস্থান হিসাবে গ্রহণ করেন। বর্তমান প্রবন্ধ ১৯৪৮ ইং ৫ই জুন বরিশালে পূর্বপাকিস্তান সোস্যালিষ্ট পার্টির প্রথম সম্মেলনে প্রদত্ত সভাপতির ভাষণ।

মৃত্যুর সময় পর্যন্ত মহারাজ সোস্যালিষ্ট পার্টির অন্যতম নেতা ও সর্বজনশ্রদ্ধেয় জননায়ক ছিলেন। বক্তৃতাটি বর্তমানে দুষ্প্রাপ্য কিন্তু মহারাজের বক্তব্য ২৭ বছর পরেও প্রণিধানযোগ্য বিবেচনা করে 'সমাজবাদ কি ও কেন' শিরোনামে ছাপা হল। ইহা ১৩৮১ বাংলায় পঞ্চায়েত পত্রিকার শারদীয় সংখ্যায় ছাপা হয়।

—সম্পাদক

ভদ্রমহোদয় ও ভদ্রমহোদয়াগণ,

বরিশালের সহিত আমার নূতন সম্বন্ধ নয়। প্রথম সম্বন্ধ ১৯০৯ সনে, বিপ্লব আন্দোলনের সময় পলাতক অবস্থায়। তাহার পর ১৯১৪।১৫ সনে বরিশাল ষড়যন্ত্র মামলায় আমি এক বৎসর বরিশাল জেলে ছিলাম এবং ঐ মামলায় আমার পনর বৎসর দ্বীপান্তর দণ্ডাজ্ঞা হয়।

দুই বৎসর পূর্বেও অশ্বিনী কুমারের বরিশাল আসিবার সুযোগ হইয়াছিল। দুই বৎসর সমাজ জীবনের প্রগতির পথে খুব অল্প সময় হইলেও ভারতবর্ষের সমাজ জীবনের পথে এই দুই বৎসর অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। দেশে এক ভালমন্দের বিরাট পরিবর্তন সংঘটিত হইয়াছে। তাই দু বছর পূর্বে ইংরেজ তাড়াবার যে সমস্যা লইয়া আলোচনা করিয়াছিলনে আজিকার সমস্যা তাহা হইতে সম্পূর্ণ পৃথক।

দেশ স্বাধীন হইয়াছে। আমরা স্বাধীন দেশে বাস করিতেছি। সকলেই আশা করিয়াছিল স্বাধীনতা লাভের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের সকল প্রকার দুঃখ দুর্দশার অবসান ঘটিবে। কিন্তু তাহা হয় নাই। বর্তমানে কি পাকিস্থান কি ভারত ইউনিয়ন সর্বত্রই এক অবস্থা। দেশ দুর্নীতিতে ভরপুর, চারিদিকে চোরাবাজারীর রাজত্ব চলিতেছে। দেশে সৎ লোক আছে বলিয়া মনে হয় না। আমরা যেন জাতি হিসাবে দুর্নীতি পরায়ণ হইয়া উঠিতেছি। সরকারী বিভাগে দুর্নীতি, ব্যবসা ক্ষেত্রে দুর্নীতি, এমন কি তথাকথিত সংসার ত্যাগী সাধু সন্ন্যাসীদের মধ্যেও

দুর্নীতি দেখা যাইতেছে। ব্যবসা ক্ষেত্রে ব্যবসায়ীদের দৃষ্টি থাকে কি করিয়া রাতারাতি বড়লোক হওয়া যায় কি করিয়া ক্রেতাদিগকে ঠকান যায়। যাহারা যৌথ কারবার করে তাহাদের দৃষ্টি রহিয়াছে কি করিয়া অপর অংশীদারকে ফাঁকি দেয়া যায়। ছাত্রদের দৃষ্টি থাকে কি ভাবে নকল করিয়া পরীক্ষায় পাশ করা যায়। শিক্ষকরাও অর্থনৈতিক কারণে ফাঁকি দিতে বাধ্য হন। রাষ্ট্র নায়কদের সদা জাগ্রত মন সব সময়ে সুবিধা খুঁজিয়া বেড়ায় কি করিয়া বড়বড় ভাড়াটিয়া কথার ধুম্র জালে স্বার্থসিদ্ধি করিবেন। চাকুরীতে ঘুষ, সরকারী বিভাগে ঘুষ, জিনিস ক্রয় করিতে ঘুষ, সর্বত্রই ঘুষের রাজত্ব চলিতেছে। স্বার্থসিদ্ধিই বড় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। তাহাদের কেহ চায় দেশের নামে চাকুরী ও ব্যবসায় সুবিধা করিতে কাহারও দৃষ্টি কাউন্সিল কর্পোরেশনের দিকে কেহ চায় নেতৃত্ব করিতে, মন্ত্রীত্ব করিতে। সকলেই চায় সস্তায় নাম কিনিতে, জাতি গঠনের চিন্তা কাহারও আছে বলিয়া মনে হয় না।

তাই আমাদের মধ্য দিয়া আমাদের জাতীয় চরিত্রই ফুটিয়া বাহির হইতেছে। আমাদের জাতির মধ্যে নিয়মানুবর্তিতার অভাব এবং উচ্ছৃঙ্খলতার প্রভাব রহিয়াছে। আমরা কোনও বিধি নিষেধ মানিব না, কাহারও কথা শুনিব না, কোনও অন্যায় করিলে যদি কেহ তিরস্কার করে তবে তাহার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিব, গালি দিব—ইহাই আমাদের স্বভাব হইয়া উঠিতেছে। আমরা নিজেরা কিছু করিব না, নিজের দোষ ত্রুটি দেখিব না, অপরের সমালোচনা করিব, নেতাদের নিন্দা করিব। আমাদের কাহারও উপর বিশ্বাস নাই, কোন কিছু গড়িয়া তুলিবার ক্ষমতা নাই—ঝগড়া বিবাদ দলাদলি করিয়া কাজ পণ্ড করার উৎসাহই আমাদের অধিক। এরূপ ভাবে কোনও জাতি বড় হইতে পারে না, টিকিতেই পারে না।

আমরা স্বাধীনতা পাইয়াছি, তবুও আমাদের দুরবস্থা ঘুচিল না কেন? ইহার কারণ, যে স্বাধীনতা পাইয়াছি তাহা স্বাধীনতা অর্জনের সংগ্রামের অমোঘ শক্তিতে অর্জিত স্বাধীনতা নয়। যে স্বাধীনতার বনিয়াদ সমগ্র জাতির আত্মদানের মহিমার উপর দুঃখ কষ্ট ও ত্যাগ-নিষ্ঠার বীর্যবত্তার উপর গড়িয়া উঠিয়া নূতন স্বাধীনতা দেখা দেয়, ইহা সেই স্বাধীনতা নহে। ইহা রফামূলক স্বাধীনতা। জাতীয় দাবীর ভিত্তিতে স্বাধীনতা রূপ গ্রহণ করে নাই। পরদেশীয় শাসক চলিয়া গিয়াছে মাত্র দুঃশাসনের কাঠামে রাখিয়া গিয়াছে। পরবশ্যতার কালে যাহারা জাতির দুর্বল্য লইয়া ব্যবসায় করিয়াছে, তাহারা স্বপদে ও স্বস্থানে থাকিয়াই গিয়াছে। রাতারাতি স্বাধীনতা আসিলেও রাতারাতি আমাদের দৃষ্টিভঙ্গী বদলায় নাই—দায়িত্ব-বোধ জাগে নাই—স্বাধীন দেশের স্বাধীন জাতির চেতনায় জাতি ও জাতীয় গভর্ণমেণ্ট উদ্বুদ্ধ হয় নাই। জাতির প্রতি অঙ্গের জন্য প্রতি অঙ্গের বেদনাবোধ জাগে নাই। তাই দুর্নীতি, চোরাকারবার, স্বজন প্রতিপালন পক্ষপাতিত্ব। অযোগ্যতা দূর হওয়া দূরে থাকুক, স্বাধীনতার সুযোগ আসিয়া উহাকেই আরো বৃদ্ধি করিয়া দিয়াছে। বিপ্লবের দ্বারা যখন একটা দেশ স্বাধীন হয়, তখন দুঃখ কষ্ট রক্তপাত ক্ষয়ক্ষতি হয় বটে—কিন্তু ঐ সূত্রেই জাতির চরিত্র গড়িয়া উঠে বলিয়া ক্ষয়ক্ষতি জাতির জীবন ক্ষেত্রকে উর্বর করিয়া তোলে। তখন পঞ্চ-বার্ষিকী জাতি নির্মাণের প্লান সাফল্যমণ্ডিত হয়, ধনধান্যে শিল্পে সংগঠনে জাতি সহস্র শীর্ষ হইয়া ধন্য হইয়া উঠে। আজিকার

এই স্বাধীনতা যেন অযোগ্যের সুযোগ করিয়া দিয়াছে —পরভুক শ্রেণীর নিকট মাহেন্দ্রক্ষণ উপস্থিত করিয়া দিয়াছে। ঘুষ দিবার ও ঘুষ লইবার অনাচার জাতির মর্যাদাবোধের মেরুদণ্ডকে ক্ষতবিক্ষত করিয়া দিতে বাধা পাইতেছে না। দুর্নীতি ও অসংযম স্বাধীনতার হাত ধরিয়া দেখা দিয়াছে। পরশাসনের কাঠিন্য ও মর্যাদা গিয়াছে. কিন্তু স্বশাসনের মাধুর্য ও মহিমা সেই স্থলে প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। স্বাধীনতাকে সমগ্র জাতির জাতি ধর্ম-বর্ণ সম্প্রদায় নির্বিশেষে সকলকার স্বাধীনতা বলিয়া উপলব্ধি হয় নাই। কিন্তু এই উপলব্ধি চাই, এই উপলব্ধি আনিয়া দিতে হইবে। জনগণের মধ্যে অসাম্প্রদায়িক গণচেতনা আনিয়া দেওয়াই হইবে আমাদের প্রধান কর্তব্য।

স্বাধীনতার সঙ্গে সঙ্গে চোরাকারবারীদের মনের পরিবর্তন হয় নাই। সরকারী কর্মচারীগণও রাতারাতি স্বদেশপ্রেমিক হয় নাই। ইংরেজ রাজত্বে যাহা ছিল, বর্তমানে তাহাই আছে বরং ইংরেজ রাজত্বে চোরাকারবারীদের এবং দুর্নীতিপরায়ণ কর্মচারীদের মনে একটা ভয় ছিল, কারণ বিদেশী গভর্ণমেণ্ট হয়ত ইচ্ছা করিলে কঠোর দমননীতিও অবলম্বন করিতে পারে। কিন্তু এখন যেন ঘরের কথা, এই তথাকথিত স্বদেশী আমলে তাহাদের সে ভয়ও যেন নাই। ইহার ফল হইয়াছে যে দেশের জনসাধারণের মনে এই ধারণাই জন্মিতেছে যে ইংরেজ রাজত্বেই আমরা বরং ভাল ছিলাম, সুখে ছিলাম। যে কোন রাষ্ট্রের পক্ষেই জনসাধারণের এরূপ ধারণা ভাবী অমঙ্গলেরই সূচনা করে।

আমরা স্বাধীন হইয়াছি। স্বাধীন পাকিস্থানে কি স্বাধীন ভারতে চাউলের অভাব, কাপড়ের অভাব, তেল, কেরোসিন, চিনি কোন জিনিসই সহজে পাওয়া যায় না। প্রত্যেক জিনিসেরই অগ্নিমূল্য দাম। সেই অনুপাতে সর্বসাধারণের আয় বাড়ে নাই। শুধু মুষ্টিমেয় লোকের হাতে অর্থ সঞ্চিত হইয়া এক ঐশ্বর্যের মায়াজাল সৃষ্টি করিয়াছে। তাহার উপর আবার অনেকের বৃত্তি নষ্ট হইয়াছে। এমত অবস্থায় লোক কি ভাবে প্রাণ ধারণ করিবে? ক্রমশঃই লোকের মনে স্বাধীন ভারতে বা স্বাধীন পাকিস্তানে এই ধারণাই জন্মিতেছে-স্বাধীন ভারতে বা স্বাধীন পাকিস্তানে যদি না খাইয়াই মরিতে হয় তবে এ স্বাধীনতার মূল্য কি? লোকের সহ্যের একটা সীমা আছে। যখন সেই সীমা অতিক্রম হয় তখন লোক মরিয়া হইয়া উঠে, কোনও প্রকার বাধানিষেধ মানে না। লোক যদি অনবরত দুঃখ কষ্ট ভোগ করিতে থাকে তবে পাকিস্তান বা ভারতীয় ইউনিয়নের মোহ বেশীদিন থাকবে না। আজ পাকিস্তান ও ভারত ডোমনিয়নের নেতা, কর্মী-জনসাধারণও গভর্ণমেণ্টকে ইহা সমাকভাবে উপলব্ধি করিতে হইবে। সমাজ জীবনে অর্থনৈতিক বৈষম্য ব্যবস্থার গ্লানি আছে তাহার উপর আছে সাম্প্রদায়িক দুর্বুদ্ধিতা।

সমাজে হিন্দু মুসলমান চিরকাল পাশাপাশি শান্তিতে বাস করিয়াছে, পরস্পরের আপদে বিপদে সাহায্য করিয়াছে, কখনও হিন্দু-মুসলমান সম্প্রদায় হিসাবে বিবাদ করে নাই। পূর্বে রাজায় রাজায় যুদ্ধ হইয়াছে। সৈন্যদের মধ্যে উভয় সম্প্রদায়ের লোকই ছিল। বাংলার স্বাধীনতা হরণের জন্য ইংরেজের ষড়যন্ত্রে প্রধান সেনাপতি হইয়াও মিরজাফর যখন বিশ্বাসঘাতকতা করে তখন সিরাজের তথা বাংলার স্বাধীনতা রক্ষার জন্য মোহনলাল প্রাণ বিসর্জন দিয়াছে, সাম্প্রদায়িকতার প্রশ্ন স্বাধীনতার সেবকের

মনে স্থান পায় নাই। সিপাহী বিদ্রোহের সময় হিন্দু মুসলমান একসঙ্গে স্বাধীনতার জন্য লড়াই করিয়াছে, প্রাণ বিসর্জন দিয়াছে। সেদিনও বিপ্লবী নেতা রাসবিহারী বসু এবং নেতাজী সুভাষ চন্দ্রের নেতৃত্বে যে ফৌজ গড়িয়া উঠিয়াছিল, তাহার মধ্যে সাম্প্রদায়িকতা ছিল না। হিন্দু মুসলমান মিলিতভাবে স্বাধীনতার জন্য লড়াই করিয়াছে। আমাদের সমস্যার সমাধান সাম্প্রদায়িকতার দ্বারা হইবে না। সাম্প্রদায়িকতা আমাদিগকে ধ্বংসের দিকে লইয়া যাইবে। পাকিস্থানের হিন্দু যদি মনে করে তাহারা ভিন্ন সম্প্রদায়ের রাজ্যে বাস করিতেছে তবে তাহা কি দেশ কি জনসাধারণ কাহারও কল্যাণকর হইবে না। এইরূপ মনোভাবের ফলে অশান্তি চলিতে থাকিবে, শিল্প বাণিজ্যের প্রসার সম্ভব হইবে না। ফলে দুর্ভিক্ষ বস্ত্র সংকট চলিতেই থাকিবে। দেশের জনসাধারণ আরও দুরবস্থায় পতিত হইবে।

একদিকে দেখিতে পাই দেশের লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি লোক আর্থিক দুরবস্থায় আছে, তাহাদের পেটে অন্ন নাই, চিকিৎসার কোন ব্যবস্থা নাই, সর্বদা অভাবের মধ্যে কালাতিপাত করিতেছে। অন্যদিকে দেখিতে পাই, কতিপয় লোক ভোগ বিলাসিতার মধ্যে মত্ত আছে, তাহাদের কোন অভাব নাই।

এরূপ অবস্থা হয় কেন? ইহা বর্তমান সমাজ ব্যবস্থার রূপ। দরিদ্রের দারিদ্র ঈশ্বর প্রদত্ত নহে, ভগবান বা খোদা কাহাকেও ধনী বা কাহাকেও দরিদ্র করিয়া সৃষ্টি করেন নাই। ইহা বর্তমান ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার ফল। দেশে যতদিন পর্যন্ত বর্তমান ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা থাকিবে ততদিন গরীব আরও গরীব হবেই ধনী আরও ধনী হইবে।

যে সমাজ ব্যবস্থার ফলে লোক গরীব হয় সেই সমাজ ব্যবস্থার পরিবর্তন করিতে হইবে। এই সমস্যা পাকিস্তান ও ভারতীয় ইউনিয়নের সমস্যা, ইহা পৃথিবীর সমস্যা।

এই অস্বস্তিকর অবস্থার হাত হইতে মুক্তি লাভ করিতে হইলে চাই রাজনৈতিক আদর্শের ও লক্ষ্যের আমূল পরিবর্তন। আজ পৃথিবীর অন্যান্য দেশের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে রাশিয়া ভিন্ন প্রায় সকল দেশেই সমসামানীতি বিরোধী সমাজব্যবস্থার ফলে ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। গণতন্ত্রের নামে আজ সেখানে কতিপয়ের একনায়কত্ব চলিয়াছে। নাগরিক অধিকার আজ বড়বড় আদর্শের ভুয়া বুলির ভিতর মিথ্যা হইয়া উঠিয়াছে। বিশাল সমাজের ভিতর চলিয়াছে শাসনের নামে ব্যাপক শোষণ। প্রত্যেক দেশেই দেখা যায় যে বড় বড় মালিক ও ব্যবসায়িগণই রাষ্ট্রনায়ক বা নেপথ্য হইতে রাষ্ট্রের পরিচালক। এই সমস্ত লোকের কার্যক্রম কোন বিশেষ শ্রেণীর স্বার্থসাধারণের দিকেই লক্ষ্য রাখিয়া রচিত হয়। সমাজের বিরাট একটি অংশ বা কৃষক ও শ্রমিকে পরিপূর্ণ তাহারা সকল অধিকার হইতে বঞ্চিত। আজ আমাদের জাতীয় ঐশ্বর্য কে গড়িয়া তুলিয়াছে? যাহারা শাসনগদীতে বসিয়া অত্যাচার ও অনাচারের প্রবর্তক তাহারা না যাহারা পর্ণকুটিরে ক্ষুধার জ্বালায় ধুকিতেছে বা ফ্যাক্টরীর ও বস্তির অস্বাস্তকর আবহাওয়ার ভিতর ঘৃণ্য জীবন কাটাইতেছে তাহারা? এই প্রশ্নের সমাধানের উপরই নির্ভর করিতেছে আমাদের সমাজের রূপ কি হইবে।

এই ধনতান্ত্রিক উৎপাদন প্রণালীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে দেখা যায় যে যাহারা উৎপাদন প্রণালীতে

সক্রিয় অংশ গ্রহণ করে তাহাদের উৎপন্ন সম্পদে অহারাই সর্বপ্রকারে বঞ্চিত। কিন্তু যে স্বল্প সংখ্যক লোক পরগাছার ন্যায় এই সমাজদেহে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া সমাজের সমস্ত রস টানিয়া লইতেছে তাহাদের প্রভুত্বই পূর্ণ মাত্রায় বর্তমান। এই বৈষম্যমূলক ব্যবস্থায় যাহারা সমাজের সম্পদ উৎপাদন করে তাহাদের উৎপাদন প্রণালী বা রাষ্ট্র ব্যবস্থায় কোন অধিকার নাই, পক্ষান্তরে যাহারা উৎপাদন প্রণালীতে কোন সক্রিয় অংশ গ্রহণ করে না তাহাদের সমাজ ব্যবস্থায় পূর্ণ প্রভুত্ব। এই ব্যবস্থায় সমাজের ভিতর দেখা দিয়াছে স্বার্থের সংঘাত। এই শ্রেণীর সংঘাত কেহ সৃষ্টি করিতে পারে না কেহ উহাকে উস্কাইয়া দিতে পারে না। উহা সমাজের অন্তর্নিহিত ব্যাধি এবং উহাই সামাজিক অশান্তির মূল কারণ, দুর্নীতি, অত্যাচার ও অনাচারের দ্যোতক।

সমাজের এই যে বৈষম্য উহার সমাধানের জন্য পুরাকাল হইতে এ পর্যন্ত বহু মনীষী নানারূপ পন্থা অবলম্বন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু সমাজ জীবনের মূলেই যে অসাম্য বর্তমান থাকে তাহা দূর না হওয়ায় এ পর্যন্ত কোন সমাধান হয় নাই। সমাজ সমষ্টিগত ভাবে যেখানে জিনিস উৎপন্ন বস্তু ভোগ করার দাবি করিতেপারে, বিশেষ ব্যক্তির কোনও বিশেষ অধিকার থাকিতে পারে না। কিন্তু বর্তমান ধনতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা অন্যরূপ। সমাজের সমষ্টিগত চেষ্টার ফলে যাহা উৎপন্ন হয়, সমাজের কতিপয় ব্যক্তি তাহার ফল ভোগ করে, বাকী গোটা সমাজ তাহাদের ন্যায়সঙ্গত দাবী হইতে বঞ্চিত হয়। এই বৈষম্যের প্রতিকারের জন্যই সমাজতন্ত্রবাদের উৎপত্তি হইয়াছে। পুরাতন সমাজভিত্তির পরিবর্তে নূতন ভাবে সাম্যের উপর নূতন সমাজপ্রথা গড়িয়া তোলাই এই সমাজতন্ত্রবাদের উদ্দেশ্য। পুরাতনের ধ্বংসস্তূপের উপর নবসৃষ্টির প্রেরণার ফলেই সমাজতন্ত্রবাদের উৎপত্তি হইয়াছে।

সমাজের ভিতর বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটাইবার জন্য সমাজতন্ত্রীদল বদ্ধপরিকর। সমাজবিপ্লব যাহাতে সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন করা যায় সেজন্য সমাজতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে।

যে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার কল্পনা আমাদের আছে তাহা হইবে ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র। সেখানে প্রত্যেকটি লোক সে যে সম্প্রদায়ভুক্তই হউন না কেন, সে যে কোনও ধর্মাবলম্বী হউন না কেন সেখানে থাকিবে তাহার স্বাধীন নাগরিকের অবাধ অধিকার।

এখানে আরও একটি কথা মনে রাখা প্রয়োজন। কোনও সম্প্রদায় বা কোনও দলের উপর কোনও রাষ্ট্র প্রথাকে গড়িয়া তুলিতে চেষ্টা করিলে সেখানে দেখা দিবে ফ্যাসীবাদ বা নাৎসীবাদ। মুসোলিনী প্রাচীন রোমান সম্প্রদায়ের বৈশিষ্ট্যের উপর তাহার ফ্যাসীবাদের ভিত্তি স্থাপন করিয়াছিলেন। হিটলার নরডিক (Nordic) জাতির শ্রেষ্ঠত্বের উপর জার্মান জাতির রাষ্ট্র ভিত্তি গড়িয়া তুলিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। এই ফ্যাসীবাদ ও নাৎসীবাদের পরিণাম কি তাহা আজ ইউরোপের মানচিত্রের উপর চোখ বুলাইলেই অনুধাবন করা যায়। ফ্যাসীবাদ ও নাৎসীবাদ জগতের উপর টানিয়া আনিয়াছে মৃত্যুর বিভিষীকা ধ্বংসের তাণ্ডব। তাই আজ এই দুনিয়াতে মুসোলিনী বা হিটলারের কোনও অস্তিত্ব নাই—তাহাদের নাম আজ দুনিয়াতে অভিশপ্ত। ইতিহাসের এই ইঙ্গিতের দিকে লক্ষ্য করিয়া পাকিস্তান ও ভারতীয় ইউনিয়নের উভয় রাষ্ট্র নায়কগণের আজ সাবধানতা অবলম্বন করা উচিত।

বিশেষতঃ সাম্প্রদায়িকতা মধ্যযুগীয় নীতি। মানুষের জীবনের ন্যায় প্রত্যেক জাতীয় জীবনেও নানারূপ জটিলতা দেখা দিয়াছে। আদিম সমাজ-ব্যবস্থায় আমরা আমাদের স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখিতে সমর্থ হইতাম। কিন্তু আজিকার যান্ত্রিক যুগের বিরাট বিশ্বসমাজে অন্য নিরপেক্ষ হইয়া কেহই থাকিতে পারে না। এই মানবসমাজ আজ একটা বিরাট যন্ত্রের ন্যায় অবস্থান করিতেছে। উহার যে কোনও স্থানে সামান্য একটু অঙ্গুলী স্পর্শে সমস্ত সমাজব্যবস্থায় তার প্রতিফলন হয়। মধ্যযুগীয় সাম্প্রদায়িকবাদ শুধু অচল নয় উহা মানব প্রগতির সম্পূর্ণ পরিপন্থী। তাই আজ রাষ্ট্রব্যবস্থা হইতে এই সাম্প্রদায়িকতাকে নিঃশেষে দূর করিতে হইবে। প্রথমে আমরা আমাদের দেশের সাধারণ নাগরিক, তৎপর আমরা হিন্দু বা মুসলমান বা খৃষ্টান। রাষ্ট্রের চোখে আমরা সবাই সমান :—সমান অধিকার, সমান দায়িত্ব।

দেশের ভিতরে ভবিষ্যতে যাহাতে কোন অবস্থা-তেই সাম্প্রদায়িকতা প্রবেশ করিতে না পারে, যাহাতে ধর্মের ভিত্তিতে রাষ্ট্রপথা গড়িয়া না উঠিয়া অর্থ নৈতিক সাম্যের ভিত্তিতে রাষ্ট্রপ্রথা গড়িয়া উঠে সেইজন্য চাই সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা।

সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রপ্রথার প্রকৃত গণতন্ত্রের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হইবে। প্রকৃতপক্ষে কৃষক ও শ্রমিকদের প্রতিনিধিরাই সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রপ্রথার কর্ণধার হইবেন। তাঁহারা নূতন দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া সমস্ত দুনিয়াকে বিচার করিবেন। এতদিন সমাজে যাহারা শোষিত ও অত্যাচারিত ছিল, নূতন রাষ্ট্র ব্যবস্থায় তাহারা সর্বপ্রকার শোষণ ও অত্যাচারের হাত হইতে মুক্তিলাভ করিবে। বর্তমান রাষ্ট্র প্রথায় কৃষক, শ্রমিক ও নিম্ন মধ্যবিত্ত জনতা তাহাদের স্বাধীন সত্তা অনুভব করিতে পারে না। কিন্তু সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে তাহারা হইবে আত্মসচেতন। নিজেদের ভালোমন্দ ও শিরোর বুনিয়াদ নিজেরাই গড়িয়া তুলিবে। যাহারা জমি চাষ করে জমির মালিক হইবে তাহারাই, পরোৎপন্নভুক জমিদার শ্রেণী নয়। শ্রমিক হইবে কলকারখানার মালিক, সমাজের পরগাছা ধনিক শ্রেণী নয়। যেহেতু সমাজের পরগাছা ধনিক শ্রেণী নয়। যেহেতু সমাজের বৃহত্তর অংশ গঠিত হইয়াছে কৃষক ও শ্রমিকদের লইয়া সেই হেতু এক রাষ্ট্র ব্যবস্থায় কৃষক ও শ্রমিকদের গণতান্ত্রিক নায়কত্ব প্রতিষ্ঠিত হইবে। কিন্তু উহা ধনিকতন্ত্র শাসিত রাষ্ট্রের মত ব্যক্তিগত বা কতিপয়ের একনায়কত্ব নয়, উহা হইবে প্রকৃত গণতান্ত্রিক লোকনায়কত্ব।

কৃষক শ্রমিক ও বঞ্চিত শ্রমশীল জনতার এই নায়কত্বের অধীনে রাষ্ট্র সম্পূর্ণ ভিন্নরূপ পরিগ্রহ করিবে। বর্তমান সমাজে প্রাচুর্যের ভিতর ফুটিয়া উঠিয়াছে সর্বহারাদের মর্মন্তুদ নিঃস্বতা। কিন্তু সমাজ-তান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রথায় সমাজের সর্বস্তরের লোকই প্রাচুর্যের ভিতর অবস্থান করিবে। কিন্তু এইখানে আর একটী কথা মনে রাখিতে হইবে—সামাজিক প্রাচুর্য বা সম্পদ আকাশ হইতে আপনা আপনিই নামিয়া আসে না। সামাজিক শ্রমের উপরই প্রাচুর্য নির্ভর করে। এই সামাজিক উৎপাদন প্রথায় যাহারা যোগদান করিবে সমাজের সম্পদ উপভোগ করিবার অধিকারী একমাত্র তাহারাই। যাহারা এই উৎপাদন কাজে যোগ দিবে না সমাজের সম্পদে তাহাদের কোন অধিকারই থাকিতে পারে না। সমাজের উৎপাদন, নিয়ন্ত্রণ ও বণ্টনের ভার গ্রহণ করিবে রাষ্ট্র। সমাজ-তান্ত্রিক ভিত্তিতে যে রাষ্ট্রপ্রথা গড়িয়া উঠিবে তাহার

ভিতর কোন দুর্নীতি প্রশ্রয় পাইতে পারে না, তাহার ভিতর থাকিতে পারে না কোনও শোষণ বা অত্যাচার।

সমাজতন্ত্রবাদী রাষ্ট্রের আদর্শে কাহারও কোনও অভাব থাকিবে না, দেশের লোক এরূপ শিক্ষা পাইবে যাহার ফলে কেহ কাহারও অনিষ্ট চিন্তা করিবে না। পৃথিবীতে যে সম্পদ আছে তাহার যদি সমবণ্টন হয় এক স্থানেই যদি পুঞ্জীভূত না হয়, তবে কাহারও কোনও অভাব হইবে না। প্রত্যেক মানুষের ভবিষ্যতের জন্য সঞ্চয় করার প্রবৃত্তি আছে, কিন্তু সে যদি ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে নিশ্চিত হইতে পারে তবে তার সঞ্চয়বৃত্তি থাকিবে না। সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে কাহারও ব্যক্তিগত ভবিষ্যতের জন্য সঞ্চয় করার প্রয়োজন হইবে না। সক্ষম নরনারী সকলেই কাজ করিবে, সকলেরই প্রয়োজনানুরূপ খাওয়া পরার ব্যবস্থা হইবে। শিশু, রুগ্ন ও বৃদ্ধদের ব্যবস্থা রাষ্ট্র করিবে। ছাত্রদের মানুষ করার দায়িত্ব লইবে রাষ্ট্র। কাজেই ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে সকলেই নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিবে। সমাজের প্রত্যেকেই মিলিতভাবে প্রকৃতির নব নব সম্পদকে মানুষের মঙ্গলকাজে নিয়োজিত করার চেষ্টা করিবে। সত্যিকারের প্রগতির পথে মানব সমাজের যাত্রা সুরু হইবে। পৃথিবীতে যে সম্পদ আছে বৈজ্ঞানিক উপায়ে তাহার সাহায্যেই মানবজাতির অভাব দূর করা সম্ভব হইবে।

এই সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করাই আমাদের কল্পনা। তাই চাই একটি সংহত ও সুগঠিত সমাজ-দল। ভারত বিভাগের পর সমাজতান্ত্রিক দলও আজ স্বতন্ত্র হইয়াছে ভারতীয় ইউনিয়নের দলের সহিত ইহার আর কোন সম্পর্ক থাকিবে না। বাহিরের কাহারও আদেশ, ইঙ্গিত বা নিয়ন্ত্রণে পাকিস্তান সোসালিষ্ট পার্টির কর্ম-পদ্ধতি নির্ধারিত হইবে না। ভারতীয় ইউনিয়নের সমস্যা তাহাদের নিজেদের। পাকিস্তানের সমস্যা, আমাদের নিজস্ব এখানকার অবস্থা, দৈনন্দিন, অর্থনৈতিক ও বিভিন্ন অবস্থার বিভিন্ন সমস্যাকে কেন্দ্র করিয়া এখানকার সোস্যালিষ্ট পার্টি স্বাধীন দল, ভারতীয় দলের সহিত ইহার আর কোনও যোগাযোগ থাকিবে না। ভারত ডোমিনিয়ন বা অপর কোনও স্থান হইতে ইহা পরিচালিত বা নিয়ন্ত্রিত হইবে না। এখানে সাম্প্রদায়িকতার কোনও স্থান নাই। এই দলে সকল সম্প্রদায়ের লোকেরই সভ্য হওয়ার অবাধ অধিকার আছে। এই দল শ্রমিক, কৃষক ও নিম্নমধ্যবিত্ত লোকের দল। এখানে সকলের স্বার্থ-ই এক। সকলেই গরীব, সকলেই শোষিত ও নির্যাতিত হইতেছে। এখানে সাম্প্রদায়িকতা প্রাদেশিকতার স্থান নাই। এখানে থাকিবে মানুষ এবং সকল মানুষেরই সমান অধিকার।

সমাজতন্ত্রী দলের ভবিষ্যৎ নির্ভর করে দলের কর্মীদের যোগ্যতার উপর। দলের প্রত্যেক সভ্যকে খাঁটি সমাজতন্ত্রী হইতে হইবে। তাহারা জাতিকে সমাজতান্ত্রিক ভাবধারায় ও আদর্শে গড়িয়া তুলিবে। সমাজসন্ত্রাদলের সভ্যরা যদি আদর্শ সমাজতন্ত্রী না হয় তাহারা যদি সুবিধাবাদী হয় তাহা হইলে তাহাদের আদর্শে কেহই অনুপ্রাণিত হইবে না। এবং তাহাদের হাতে যদি কখনও রাষ্ট্র পরিচালনার অধিকার আসে তবে তাহা সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র হইবে না, সুবিধা-বাদীদের রাষ্ট্র হইবে। তাহারা সমাজতন্ত্রের নামে নিজ স্বার্থ সিদ্ধি করিবে, দেশের জনসাধারণকে শোষণ করিবে।

পূর্ব পাকিস্তান সমাজতন্ত্রীদল সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের লোকদিগকে এবং দেশের শোষিত নির্যাতিত জনগণকে এই আশ্বাস দিতেছে যে তাহারা তাহাদের সর্ববিধ ন্যায়সঙ্গত স্বার্থরক্ষার চেষ্টা করিবে। সমাজতন্ত্রী আছে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থা প্রবর্তনের মধ্যে।

একমাত্র সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থার মধ্যেই মানবতার পূর্ণ বিকাশ সম্ভব। তাই আজ সঙ্কল্প গ্রহণ করিতে হইবে, শান্তিপূর্ণভাবে আমাদের এই আজাদ পাকিস্তানের অভাব, অভিযোগ, দুঃখ, দৈন্য দূর করিব, সমগ্র জনসাধারণের সমর্থন পুষ্ট গণতান্ত্রিক সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র গড়িয়া তুলিব। ধর্ম-নিরপেক্ষ সমাজতন্ত্রভাবাপন্ন অন্যান্য দলগুলিকে আহ্বান জানাই, সমস্ত দলাদলি সংকীর্ণতা ভুলিয়া আসুন আমরা হাতে হাত মিলাইয়া একত্রে কাজে ঝাঁপাইয়া পড়ি। উপস্থিত ভদ্রমণ্ডলী ও পূর্ববঙ্গের হিন্দু-মুসলমান জনতার কাছে আমার নিবেদন এই,—আমাদের যাত্রাপথে আপনাদের আশীর্বাদ ও সক্রিয় সহযোগিতা অপরিহার্য এবং অত্যাবশ্যক। এই সহযোগিতা কামনা করি। আপনারা আমার শ্রদ্ধা ও প্রণতি গ্রহণ করুন। ইনক্লাব জিন্দাবাদ।

বরিশাল, ৫ই জুন '৪৮

'পঞ্চায়েতের সৌজন্যে

"স্বাধীনতা বলতে শুধু রাজনৈতিক অধীনতা থেকে মুক্তি বোঝায় না, বোঝায় সম্পদের সুসম বণ্টন, জাতিভেদ প্রথা ও সামাজিক অন্যায়ের বিলোপ সাধন এবং সাম্প্রদায়িকতা ও ধর্মীয় গোঁড়ামী নির্মূল করা"

"সুভাষ চন্দ্র বসু"

Reg.No N 2511 71 Biplabi Read W.
Phone 34-1795
বার্ষিক :—সডাক ১৫.০০ টাকা ষাণ্মাসিক :—৮.০০ টাকা মূল্য—৩০ পয়সা

বিপ্লবী পুস্তকমালা

অনুশীলন সমিতির বিপ্লব প্রয়াস—ব্রজেন্দ্রচন্দ্র ঘোষের—৩.০০
বিপ্লবী মহানায়ক বাসবিহারী সুবোধ মজুমদারের—২.০০

ক্ষীরোদ কুমার দত্তের—

১। বাংলার অগ্নিযুগ—১.৫০
২। অনুশীলন সমিতির পি, মিত্রের—২.০০
৩। কাকোরী শতাব্দক্ষ—১.২৫
৪। বাসবিহারী ও অনুশীলন সমিতি—.৮০
৫। বিবেকানন্দ ও সমাজবাদ—.৯০
৬। মহাবোধি ও সুভাষচন্দ্র—.৪০
৭। দেশ বন্ধুর ডেথোনেমি (১)—১.০০
৮। শহীদ চন্দ্রশেখর আজাদ—.৫০
৯। হাজির হত্যা প্রচেষ্টা—.৭৫
১০। ভারতের জাতীয় পতাকার ইতিহাস—.৪০
১১। [illegible]
১২। বিপ্লবী বিবেকানন্দ—[illegible]
১৩। [illegible] ও ভগিনী নিবেদিতা—.৭৫
১৪। দেশ বন্ধুর ডেথোনেমি (২)—১.০০
১৫। ১৩৪ এপিল জাতীয় শহীদ দিবস—১.০০
১৬। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও অনুশীলন সমিতি—[illegible]
১৭। লাট হত্যা প্রচেষ্টা—১.৫০

প্রাপ্তিস্থান :—৪নং বঙ্কিম চাটার্জী ষ্ট্রীট কলিকাতা-৭০০০৭৩

নৈশলক্ষ্মী—১/১ ও ১/A বঙ্কিম চাটার্জী ষ্ট্রীট কলিকাতা-৭৩

2 OCT 1980

সম্পাদক মণ্ডলী —
শ্রীঅমলীশ চট্টোপাধ্যায় (সভাপতি) শ্রীঅরবিন্দচন্দ্র বক্সী, শ্রীপুলক চ্যাটার্জী
সম্পাদক—শ্রীশান্তি শরণ রায়চৌধুরী
বিপ্লবীর বিশেষ প্রতিনিধি—শ্রীবারীন ঘোষ। বেতালা—শ্রীঅমলগোপাল পাল।
প্রকাশক ও মুদ্রক :—শ্রীঅনিল সেনগুপ্ত প্রচার সচিব—শ্রীসুবেন্দু ঘোষ।
বিপ্লবী বাংলা কার্যালয় :—৪নং বঙ্কিম চাটার্জী ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০৭৩
মুদ্রণে:—ক্রিটি পাবলিসিটি, ১১২ নং কেশব সেন ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৭০০০০৯

বিপ্লবী বাংলা

বিপ্লবী পরিষদের সাপ্তাহিক মুখপত্র
স্থাপিত—১৯৫৬, 'বিপ্লবী বাঙ্গালী' নবকলেবরে—১৯৭১

দশম বর্ষ	শনিবার ২২শে কার্ত্তিক ১৩৮৭ ৮ই নভেম্বর ১৯৮০	৫ম সংখ্যা

"যৌবনে সর্ব্বকালে সর্ব্বদেশে সৃষ্টিছাড়া ও লক্ষ্যহারা অতৃপ্ত-আকাঙ্ক্ষার উন্মাদনায় আমরা ছুটিয়া চলি—বিজ্ঞের উপদেশ শুনিবার পর্য্যন্ত অবসর আমাদের নাই। ভুল করি, আছাড় খাই, কিন্তু কিছুতেই আমরা উৎসাহ হারাই না বা পশ্চাৎপদ হই না।"

—নেতাজী

CALCUTTA

পরলোকে

সর্বজন শ্রদ্ধেয় প্রবীণ বিপ্লবী নায়ক শ্রীহেমচন্দ্র ঘোষ গত ৩১শে অক্টোবর কিছুদিন রোগ ভোগের পর তাঁর কলিকাতাস্থ বাসভবনে দেহত্যাগ করেছেন। তাঁর পরলোকে গমনে আমরা গভীর শোকে মর্মাহত। হেমচন্দ্র ছিলেন বাংলার সশস্ত্র বৈপ্লবিক সংগ্রামের অন্যতম প্রধান সংগঠক ও পরিচালক। আজীবন এই অকৃতদার দেশনেতা বিপ্লব সাধনায় ব্রতী ছিলেন। সাহস, দীর্ঘ নির্যাতন ও কারা দুঃখ বরণ তাঁকে এক পুরাণ পুরুষের মর্যাদা দিয়েছে। আমরা তাঁর স্মৃতির প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধা জানাচ্ছি।

পরবর্তী সংখ্যায় হেমচন্দ্র ঘোষের জীবন ও কর্ম সাধনা সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা প্রকাশিত হবে।'

সম্পাদকীয়—

মা সরস্বতীর কমলবনে মত্তহস্তী

পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষাব্যবস্থা ও পাঠ্য-পুস্তক নির্বাচন ও প্রণয়ন নিয়ে রাজনৈতিক দল প্রভাব মুক্ত মননশীল মহল, আজীবন শিক্ষাব্রতী, জ্ঞানী, গুণী মানুষেরা কঠোর সমালোচনা ও তীব্র প্রতিবাদ মুখর হয়ে উঠেছেন। তাঁরা শুধুই সভাসমিতিতে প্রতিবাদ ও নিন্দাসূচক প্রস্তাব পাশ করেই ক্ষান্ত হননি। তাঁরা সঙ্ঘবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তুলতে সচেষ্ট হয়েছেন এবং জাতির ভবিষ্যৎ-নাশক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে জনগণকে আহ্বান করেছেন। সেটা অকারণে নয়। কারণ রাজনৈতিক দলবাজি বিদ্যায়তনগুলিকে পঙ্গু করে দেবার উপক্রম করেছে।

বর্তমান শাসক দল ক্ষমতায় এসেই দলীয় স্বার্থ সাধনের উদ্দেশ্যে সব রকম ন্যায়নীতি, যুক্তি, বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থার প্রতি শ্রদ্ধা বিসর্জন দিয়ে দলীয় প্রভাব বিস্তৃত ও প্রতিষ্ঠিত করার সমস্ত শক্তি নিয়োগ করেছেন। নির্বাচিত কমিটিগুলিকে ভেঙ্গে দিয়ে সেখানে দলীয় লোকদের বসান হচ্ছে। মুখে বলেছিলেন ছয় মাসের মধ্যে নতুন নির্বাচন করে বিশেষ মার্কামারা গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা চালু করা হবে। তিন বছর অতিক্রান্ত হয়ে গেল, কিন্তু নির্বাচন হয়নি। বশংবদ অধ্যক্ষ ও অধ্যাপক বসিয়ে সব কাজ শেষ করা হয়েছে। অনেক পদ খালি থাকা সত্ত্বেও তা পূরণ করার কোন সামগ্রিক চেষ্টা দেখা যাচ্ছে না। নতুন পদ পূরণ হয়েছে যা দু চারটি, সেগুলি বশংবদদের খুশী করার জন্য। ছাত্রদের পড়াশুনা বন্ধ, পরিচালন ব্যবস্থা পঙ্গু। ঘণায়মান অসন্তোষ উগ্র থেকে উগ্রতর, সুষ্ঠু ব্যবস্থা প্রবর্তনের জন্য জনগণের দাবী সোচ্চার, কিন্তু শিক্ষাবিভাগ কোন কিছুকেই গ্রাহ্য করছেন না। Brute majority-র ভরসাই কি এই সীমাহীন স্পর্দ্ধা দেখাবার কারণ? বস্তুপক্ষে মনে হয় ধাপে ধাপে শিক্ষা-সংহার কার্যের পথে চলেছেন। শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্যকে ত্যাগ করে দলীয় রাজনীতি বাহন হিসাবেই শিক্ষা ব্যবস্থাকে ব্যবহার করতে চাইছেন। তাই অতীত দিনের সব কিছুকেই নস্যাৎ করার ব্যবস্থা হচ্ছে। রবীন্দ্রনাথ আজ অপাংক্তেয়। এ কথা শুনতে হচ্ছে দল বিশেষের কট্টর সমর্থক রাম শ্যামের মুখ থেকে। এই ভাবে ক্রমান্বয়ে একটি মতলব হাসিল করার পরিকল্পনা দেখে, দেশের বুদ্ধিজীবি, চিন্তাশীল মানুষেরা উদ্বিগ্ন হয়ে এই প্রচেষ্টাকে প্রতিরোধ করতে এগিয়ে এসেছেন, এটা আনন্দের কথা, আশার কথা, ভরসার কথা। মা সরস্বতীর কমল বনে যদি মত্ত হস্তীর অনুপ্রবেশ ঘটে, এবং তাকে যদি তার দৌরাত্ম্য অবাধে এবং বিনা বাধায় চালিয়ে যেতে দেওয়া হয়, তবে জাতির পক্ষে, সেটা সমূহ বিপজ্জনক হবে, এতে সুস্থ মানুষের মনে কোন সন্দেহ নেই। একে সমর্থন করবে সেই শ্রেণীর জীব, যাদের কর্ণ আছে শুনিতে পায় না, চক্ষু আছে দেখিতে পায় না, মাথা আছে, অথচ তার মধ্যে ধূসর পদার্থের অস্তিত্ব নেই। ইংরেজ শাসকেরা একদিন শিক্ষা ব্যবস্থার মাধ্যমে এদেশের মানুষকে শেখাতে চেয়েছিল, (স্বামীজীর কথায় বলা যায়) "All that we have is bad, all that they have is good." এতে আমাদের কোন সংশয় নেই যে ইংরেজদের চক্রান্ত যেমন ব্যর্থ হয়েছিল, এই অপচেষ্টাও সেই রকম ব্যর্থ হবে। রোজ মেন ষ্টেশনের মধ্যেও স্বাধীন চিন্তানায়ক আবির্ভূত হন। এর দৃষ্টান্ত রাশিয়া ও অন্যান্য কমিউনিষ্ট রাষ্ট্রে এই লক্ষণ পরিস্ফুট। একমাত্র হস্তীমূর্খেরা এই ভেবে আশ্বস্ত হতে পারে যে দরজা বন্ধ করে অচলায়তন সৃষ্টি করলেই নতুন ভাবধারা পুরাণো ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি নষ্ট করে দিয়ে বিশেষ কোন মতবাদ মানুষের উপর চাপিয়ে দেওয়া সম্ভব হবে। দলীয় প্রভাব বিস্তারের জন্য একদল অতিউৎসাহী, অযোগ্য [illegible]

শিক্ষা ব্যবস্থায় বিনষ্টি সাধন করে, স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে দলের 'কাডার' তৈরী করার গোয়াবে দেখছেন, তাদের অপকর্মকে শুধু বাধা দিলেই চলবে না। জনমত জাগ্রত করে তাদের সমুচিত শিক্ষা দিতে হবে, যা দেখে ভবিষ্যতে কোন ক্ষমতাসীন দল জাতির ঐতিহ্য বিনষ্ট করতে সাহসী না হয়। ঘাসল সর্বস্ব, কুলিকিত, রাজনৈতিক-তকমা সম্বল পরিচয়হীনদের মগজে ঢুকিয়ে দিতে হবে ক্লাদিক বা ধ্রুপদী রচনার পরিবর্তন সংশোধন অমার্জনীয় অপরাধ। যে সৃষ্টি চিরদিনের তাকে গায়ের জোরে ধ্বংস করা যায় না। এ কাজ না করলে বাঙ্গালী জাতির ভবিষ্যৎ চিরদিনের মত অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে যাবে। বাঙ্গালী সর্বত্র আজ মার খাচ্ছে নানাভাবে। কিন্তু বাঙ্গালীকে এ কথা ভুললে চলবে না যে শিক্ষাক্ষেত্রে পিছিয়ে পড়লে, তারা আর কোনদিন ভারতবর্ষে তথা সমগ্র বিশ্বে মাথা তুলে দাঁড়াতে পারবে না। অথচ বাঙ্গালীর ঐতিহ্য হল, বিশ্বের জ্ঞান ভাণ্ডারে বাঙ্গালী মনীষীদের অবদান অসামান্য এবং সর্বজন স্বীকৃত। ঐতিহ্যকে বিনষ্ট করে দিতে উদ্যত হয়েছে যারা তাদের "কালোহাত ভেঙ্গে দিতে হবে সম্মিলিত প্রচেষ্টায়। স্বাধীনতার পূর্বে এই বাংলাদেশে সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে মুসলীম লীগের মন্ত্রীরা বাংলার শিক্ষা-ব্যবস্থাকে পঙ্গু করে দিয়ে, তার জায়গায় বিশেষ ধর্মীয় প্রাধান্য বিস্তার ও কায়েম করার জন্য উদ্যত হয়েছিল। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে তখনও বাংলার বহু পুরুষ-সিংহেরা জীবিত ছিলেন। তাদের প্রতিবাদ ও প্রতিরোধের ফলে শাসকদলীয় লোকেরা শৃগালের মত লেজ গুটিয়ে পলায়ন করতে বাধ্য হয়েছিল। আজ যারা ভিন্নরূপে বিদেশী মতবাদ চালু করার মতলবে নখদন্ত বের করে, বাংলার শিক্ষাক্ষেত্রে মানুষ তৈরী করার পরিবর্তে দলীয় অনুচরকে সৃষ্টি করতে চাইছে, তাদেরকেও রুখে দিতে হবে বাঙ্গালী আজো মরেনি।

বাংলা বিপ্লবের পীঠস্থান। দুর্ধর্ষ ইংরেজকে তারা বিতাড়ন করেছে বুকের রক্তদান করে, জীবন আহুতি দিয়ে। তাদের উত্তরসূরীরা কি একেবারেই নিঃশেষ হয়ে গিয়েছেন? বিদ্রোহী কবির ভাষায় প্রশ্ন করি।

সত্যকে হায় হত্যা করে অত্যাচারীর খাঁড়ায়
নেই কিরে কেউ সত্যসাধক বুক খুলে আজ দাঁড়ায়?

স্বামী বিবেকানন্দের বাংলা, শ্রীঅরবিন্দ, রাসবিহারী নেতাজী সুভাষের বাংলা, আচার্য্য জগদীশচন্দ্র, প্রফুল্লচন্দ্রের সাধনক্ষেত্র এই বাংলা, বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের বাংলাকে আজ ধ্বংস করতে উদ্যত হয়েছে যে, রাজনৈতিক দলভুক্ত বালখিল্যের দল, তাদের মোকাবিলা করতে এগিয়ে আসবেনা বাঙ্গালীরা? সহজ পাঠ নিষিদ্ধ করে শিশু বধ যজ্ঞের যারা আয়োজন করছে, দেশের ঐতিহ্য ভুলিয়ে দেশের বরণীয় ও স্মরণীয় নাম ও আজন্ম সাধনাকে ভুলিয়ে দিয়ে, আধুনিক ও পরিবর্তিত পরিবেশের সঙ্গে পরিচিত করার প্রচ্ছন্ন অপকৌশলে, তাদের কৈফিয়ৎ দাবী করবেননা বাংলা প্রধানদের উত্তর সূরীরা? 'পিতৃ দ্রোহিতা' করে পার পেয়ে যাবে এরা বিনা বিচারে এবং বিনা শাস্তি বিধানে বাঙ্গালী কি একটা আত্মবিস্মৃত ও আত্মঘাতী জাতি হিসাবেই তার পরিচয় রেখে যাবে? অসম্ভব। এ হতেই পারে না। তাই শিক্ষাবিদ্‌দের ও চিন্তাশীল মনীষীদের আহ্বানে সাড়া দিয়ে আজ সমগ্র বাঙ্গালী জাতিকে বুক খুলিয়ে দাঁড়াতে হবে একযোগে সর্বশক্তি নিয়োগ করে। মা সরস্বতীর কমলবনকে মত্তহস্তীর দাপাদাপি থেকে মুক্ত করতে হবে। রবীন্দ্রনাথের অমর বাণী স্মরণ করে, মনন করে কর্তব্য পথে অগ্রসর হবার সময় এসেছে।

দানবের মূঢ় অপব্যয়,
ইতিহাসে গ্রাহ্য পারে না কভু আদৌ অধ্যায়।

'ওয়াহ গুরু কি ফতে !'

—বীরেন দে

ইদানীং হোসেইনি—খোমেইনিদের কাণ্ড কারখানা দেখে মনে হয় শরীরে ওদের তেলের চেয়েও বহুৎ চর্বি জমেছে। বিশ্বের সকল প্রান্তে ওদের সেলুনগুলিতে কয়েক বছরের চার্ট দেখলে দেখা যাবে ওদের চার্বি কত বেড়েছে। একেবারে 'ডেপ্‌ চার্বি'। ওরা জানেনা ! দেহে প্রচুর পরিমাণে স্নেহ বেড়ে গেলে জীবনহানির সম্ভাবনা দেখা দেয়। বাংসাতো তখন 'পটোল—তোলা' ! মরুভূমির মরীচিকা ! যেন স্বয়ংক্রিয় স্পুটনিকের ন্যায় গতি পরিবর্তন !

ওদের যেন মুসলিম রাজনীতির ট্রেডিশনে পেয়েছে। কথাটা পেড়েছেন প্রখ্যাত সাহিত্যিক সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ সাহেব সেই ট্রেডিশনে করুণা, কৃতজ্ঞতা, দয়া মায়া, বাৎসল্য, প্রেম ও ক্ষমা বলে কোনও শব্দ নেই। মানবিক চিৎ-প্রকর্ষের শ্রেষ্ঠ শব্দ এগুলি। স্বয়ং প্রফেট্‌ হজরত মহম্মদের বার্তায় এইসব শব্দ ছিল। কিন্তু তাঁর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে রক্ত দিয়ে সব মুছে ফেলা হয়েছিল।

ইসলামের আবির্ভাব ঘটেছিল প্রকৃতির করুণ্য থেকে বঞ্চিত উষর মরুদেশে। আদি মুসলমানদের সংঘবদ্ধ করা হয়েছিল সামরিক শৃঙ্খলায়। সামরিক মানসিকতা তখন থেকেই জন্মলাভ করেছে। এবং সেই মানসিকতায় সচরাচর করুণা, কৃতজ্ঞতা ইত্যাদির ঠাঁই না হওয়াই স্বাভাবিক। মানুষ হিসেবে মুসলিম-দের মধ্যে এইসব মানবিক গুণাবলি অবশ্যই সহজাত এবং সুপ্রচুর। কিন্তু মুসলিম রাজনীতি অন্য জিনিস। সেখানে কোন ব্যক্তিগত ব্যাপার নেই। রাজনৈতিক স্তরে নির্মম রুক্ষতা আরবের মরু বালুকার মত উগ্র, খর ও কঠিন। অসহিষ্ণুতাই ওই স্তরে প্রবল।

এই সবের সঙ্গে পয়গম্বরের প্রচারিত ধর্মনীতি ও আদর্শের কোনও মিল নেই। মিল বলে যা প্রচারিত তা নিছক অপব্যাখ্যা। এই অপব্যাখ্যা প্রগতি-বিরোধী। ধর্মই মুসলিমের কাছে সব কিছুর চেয়ে শ্রেষ্ঠ। ধর্মই তার কালচার। ধর্মই তার জীবনের গণ্ডী। ইসলাম ধর্ম গণতন্ত্রবাদী। অথচ মুসলিম রাজনীতির ইতিহাস ধারাবাহিক গণতন্ত্র—হত্যা ও স্বৈরতন্ত্রের এপিসোডে (episode) পূর্ণ। (আঃ বাঃ ৫।৪।৭৯)

এই হোসেইনি—খোমেইনিরা আমাদের বর্তমান ঐতিহাসিক যুগের সমাজভুক্ত সাম্প্রদায়িক মানুষ। তাদের মধ্যে একাধিক সম্প্রদায়। অনেকটা আমাদের পুরোহিততন্ত্রের আওতাভুক্ত মানুষের ন্যায়। তারাও ইতিহাসের ফসল বিসমার্ক বলেছিলেন—'আমরা ইতিহাস তৈরি করতে পারিনা। ইতিহাস তৈরী হওয়া পর্যন্ত আমাদের প্রতীক্ষা করতে হয়। হেথানড্‌ প্রশ্ন করলেন—'কিন্তু কে ইতিহাস তৈরী করে ? —সামাজিক মানুষই এর স্রষ্টা সে-ই এর প্রধান এবং একমাত্র উপাদান।'

সামাজিক মানুষই তার নিজের অর্থাৎ সমাজের সম্পর্ক সৃষ্টি করে। সমাজ নিজের চেষ্টাতে চলেনা। সামাজিক ঘটনাবলী সর্বসময়েই সংঘটিত হওয়ার দিকে। কিন্তু এই বিবর্তন ধারাটি উপলব্ধি করাই ক্ষমতার প্রয়োজন। যিনি এই ধারা উপলব্ধি করতে পারেন তিনিই নবযুগ প্রবর্তক। তাই ইতিহাসে ব্যক্তির স্থান অবিসম্বাদী সত্য।

সমাজ অনড় সত্তা নয়। অর্থ নৈতিক অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে সমাজও উন্নতর সাংস্কৃতিক পর্যায়ে উন্নীত হয়। এই অবস্থায় মানুষের চিন্তাধারা পরিবর্তিত

হয়। স্বভাবতঃই তার নূতন দৃষ্টি গড়ে উঠে। এই মননশীলতার প্রেক্ষিতে পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বসম্পর্কেও তার দৃষ্টিভঙ্গি সংশোধিত হয়। ইহাই আজ বিজ্ঞান সম্মত অভিমত। সেজন্যই প্রায় শত বর্ষ পূর্বে স্বামীজী সমাজ থেকে সমস্ত অন্যায় অপসৃত করতে ধর্মকে দূরে রাখবার নির্দেশ প্রদান করেছিলেন।

তিনি মনে করতেন গণতান্ত্রিক এবং ঐক্যবদ্ধ চেতনার সঙ্গে সর্বোত্তম আধ্যাত্মিক আদর্শের সংযোগই সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ দূর করতে পারে। বস্তুতঃ স্বামীজী ইসলামের গণতান্ত্রিক এবং উগ্র মনোবলের প্রশংসা করতেন এবং হিন্দুধর্মে এই মনোবল সঞ্চার করতে চেয়েছিলেন জনৈক মুসলমান বন্ধুকে তিনি লিখেছিলেন..... আমাদের অভিজ্ঞতা এই যে, কোনো ধর্মমতাবলম্বীরা যদি দৈনন্দিন জীবনে এই সাম্য অনুসরণ করে থাকেন তাহলে একমাত্র ইসলামেই তা হয়েছে। তাই আমাদের বিশ্বাস, বাস্তব ইসলামের সহায়তা ব্যতীত বেদান্তের মতবাদ.....এই বিরাট মানবসমাজের কাছে অর্থহীন। আমরা মানব-সমাজকে সেই লক্ষ্যে নিয়ে যেতে চাই যে, সেখানে বেদ নেই, বাইবেল নেই, কোরাণও নেই। মানব-সমাজকে এই শিক্ষা দিতে হবে যে, ধর্মসমূহ হলো একই ধর্মের বহুবিধ প্রকাশ যা প্রত্যেকে স্ব স্ব ইচ্ছানুযায়ী ধর্মাচরণ করতে পারে। তিনি চেয়েছিলেন বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ধর্মীয় অভিজ্ঞতা সমন্বিত 'গতিশীল ধর্ম' যা এই NUCLEAR যুগে একান্তভাবে জ্ঞানবিজ্ঞান সম্মত।

তাই তিনি বললেন সম্প্রদায়ে বা সমাজে ধর্ম থাকতে পারেনা। ধর্ম আত্মার সহিত পরমাত্মার সম্বন্ধ নিয়ে। ধর্মভাবকে বিচারবুদ্ধি দ্বারা নিয়মিত করা উচিত। তবেই জীবন দর্শন গড়ে উঠবে। নতুবা ধর্ম কুসংস্কারে গিয়ে দাঁড়ায়। ধর্ম বর্জিত দর্শন নাস্তিকতায় পরিণত হয়। দুটোই হচ্ছে ধর্মের যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যা। ঐ ভাবের অবনতি ঘটলে ওটা ভাবুকতা মাত্রে পরিণত হতে পারে। যে চটুল ভাবুকতায় আমরা আজ আচ্ছন্ন।

স্বামীজী ছিলেন যুক্তিবাদী। তিনি বিশ্বাস করতেন, শুধু বিশ্বাসই বা কেন বলি—তিনি উপলব্ধি করেছিলেন 'কোন ব্যক্তিবিশেষের সহিত অচ্ছেদ্য-ভাবে জড়িত ধর্ম জগতের সমগ্র মানবজাতির পক্ষে গ্রহণযোগ্য হতে পারেনা।'

তাই তিনি বলছেন সম্প্রদায় থাক, সাম্প্রদায়িকতা দূর হউক। সাম্প্রদায়িকতায় জগতের কিছু উন্নতি হইবেনা, কিন্তু সম্প্রদায় না থাকিলে জগৎ চলিতে পারেনা। যতদিন বন্ধুত্ব থাকিবে, ততদিনই জগতের অস্তিত্ব। 'যে দেশে সকলকেই এক পথে পরিচালিত করিবার চেষ্টা হয়, সে দেশ ক্রমে ধর্মহীন হয়ে দাঁড়ায়।'

বিশ্বের স্বার্থান্বেষী ধর্মবিলাসী উচ্চবর্ণের প্রাধান্যকৃত মানবিক বিকাশের প্রতিবন্ধকতাকে স্বামীজী দশহাজার বছরের মমি আখ্যায়িত করে চলমান শ্মশান' বলে মন্তব্য করেছেন। তাই আজ যারা নিষ্পেষিত, পদদলিত, লাঞ্ছিত নিরন্নের শ্রমজীবি মানুষ তাদেরকেই ভবিষ্যৎ সভ্যতার স্রষ্টারূপে তিনি ভবিষ্যদ্বাণী করে গেছেন। তিনি ইউরোপীয় সোসালিষ্ট 'শ্রমিক কৃষ্টি'রও ইঙ্গিত দিয়ে গেছেন। তিনি বলেছেন বুর্জোয়া সভ্যতার অবসান ঘটবেই। বর্তমান বিশ্বে ধর্মকে প্রচ্ছন্ন মূলধনী ভাঁওতায় পরিণত করে বৈভবপ্রাবল্য ও কায়চাকল্য যত ভঙ্গিই অনুষ্ঠিত হোক্‌না কেন, আত্মদহন ও মোদনবিবর্জনরূপ প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা বিলীন হওয়াটাই আজ ঐতিহাসিক সত্য। কেননা,

> 'ক্ষীতকায় অপমান, অক্ষমের বক্ষ হতে রক্তশুষি পান লক্ষমুখ দিয়া! বেদনারে করিতেছে পরিহাস স্বার্থোদ্ধত অবিচার; সংকুচিত ভীত ক্রীতদাস লুকাইছে চরাচরে।'

সেটাইতো '—ওহ্যাঁ ঈশ্বর কি চান'—বিশ্ব বিধাতার নির্দেশ।

ব্যর্থ বামফ্রন্ট সরকার

শ্রীবংশীধর বন্দ্যোপাধ্যায়

হিমালয় প্রমাণ বিরাট ব্যর্থতার স্তূপের উপর দণ্ডায়মান মুখ্যমন্ত্রী বহু ঢক্কা নিনাদে বারংবার প্রচার করে চলেছেন যে, বামফ্রন্টের আমলে পশ্চিমবঙ্গ বাসী সুখী ও সমৃদ্ধ, যদিও এই মিথ্যা ও উদ্দেশ্য প্রণোদিত প্রচারে পশ্চিমবঙ্গের সাধারণ মানুষ মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে মোটেই একমত নয়; বরং সাধারণ মানুষ এখানে জীবনের প্রতিক্ষেত্রেই দারুণ হতাশ ও চরম বিপর্যস্ত। বামফ্রন্টের শিক্ষা সংকোচ ও প্রশাসনিক ব্যর্থতা, বিদ্যুৎ সংকট, শিল্প সংকট, পুলিসি নিষ্ক্রিয়তা, আইন শৃঙ্খলার মারাত্মক অবনতি নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের আকাশ ছোঁয়া মূল্য বৃদ্ধি, খেয়ার মাঠে অকারণ জীবনহানি, যানবাহনের অপ্রতুলতা, ট্রাম বাস চলাচলে প্রতিনিয়ত বিশৃঙ্খলা শ্রম বিরোধের সংখ্যা মাত্রাতিরিক্ত বৃদ্ধি, শিল্পে প্রায়শই অশান্তি, শিক্ষা সংকট বেকারী বৃদ্ধি, জীবিকা অর্জনের পথে সর্বত্র দলীয় প্রাধান্য, সরকারী অফিসে, শিক্ষা ক্ষেত্রে ও রাষ্ট্রায়ত্ত কল-কারখানায় সি, পি, এম কর্মীদের অবথা হস্তক্ষেপ ও অকারণ মাতব্বরি, প্রশাসনের সর্বক্ষেত্রে ও সর্বস্তরে সি, পি, এম দলের লেজুড় কো-অর্ডিনেশন কমিটির কর্তা ও কর্মীদের খপরদারী ও দাসানি প্রভৃতি নিত্যকার ব্যবস্থা ও ঘটনাবলি পশ্চিমবঙ্গ বাসীদের মনে এক দারুণ বিরক্তি ও বিতৃষ্ণার সৃষ্টি করেছে। তারা বামফ্রন্ট শাসনের হাত থেকে পরিত্রাণের আশায় কেন্দ্রীয় সরকারের দ্বারস্থ হতে মনস্থ করেছে।

এখনকার জনসাধারণ কংগ্রেস-(ই) দলের [illegible] ও সহানুভূতি পেয়ে বামফ্রন্টকে উৎখাত [illegible] ফলে [illegible]

কর্মীরা অনবরত তাদের নেত্রী শ্রীমতী গান্ধীর কাছে বামফ্রন্টকে বরখাস্ত করার বাসনায় আর্জি পেশ করে চলেছে। শ্রীমতী গান্ধী কিন্তু বামফ্রন্টকে কিছুতেই বরখাস্ত করতে রাজি নয়, কারণ তিনি জানেন যে, বামফ্রন্ট সরকারের প্রধান শরিক সি, পি, এম দল তাদের দলীয় চক্রান্তের ও নোংরা রাজনীতির ফলে জনগণের দ্বারা শীঘ্রই শাসন ক্ষমতাচ্যুত হবে। সেকারণ তিনি বামফ্রন্টকে বরখাস্ত করার কথা মোটেই আমল দিচ্ছেন না। যে নিজেই নিজ দোষে অচিরকাল মধ্যে জন রোষে পতিত হয়ে ক্ষমতাচ্যুত হতে বাধ্য হবে, তাকে ক্ষমতা থেকে জোর করে সরিয়ে লাভ কি? রাজনৈতিক ভুলের ফলেই ও দূরদর্শিতার অভাবেই সি, পি, এম নেতৃত্বে গড়া বামফ্রন্ট সরকারের পতন অবশ্যম্ভাবী—একথা শ্রীমতী গান্ধী ভাল রকমই জানেন। তাই তিনি এদের বিরুদ্ধে কেন্দ্রীয় সরকারের মাধ্যমে কোন ব্যবস্থাই নেবেন না, তাঁর দলীয় কর্মীরা যত অভিযোগই করুক না কেন। শ্রীমতী গান্ধী জানেন যে, সি, পি, এম তার নিজের দলীয় চক্রান্তের হীন প্রচেষ্টার ফলেই পশ্চিমবঙ্গবাসীর রোষাগ্নিতে দগ্ধ হবে ও পরিণামে অন্যান্য শরিকদলের কাছেও অপ্রিয় হবে ভীষণভাবে, যার ফলে বামফ্রন্ট বিপদ-গ্রস্ত হবে।

পশ্চিমবঙ্গে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি তুঙ্গে। যে আলু গত একমাস আগেও একটাকা আটআনা কিলো দরে বিক্রি হচ্ছিল, সেই আলু হঠাৎ এক সপ্তাহ আগে দু টাকা কুড়ি পয়সা কিলো দরে বিক্রি হয়। বামফ্রন্ট দর বাঁধে এক টাকা পঁচাত্তর পয়সা কিলো,

কল [illegible] সরকারে [illegible]

সি. পি, এম তার দলীয় ক্যাডারদের দিয়ে আলুর বাজারে জোর করে একটাকা পঁচাত্তর পয়সা কিলো দরে পচা আলু বিক্রির ব্যবস্থা করে। দু' চারদিনে পচা আলু বিক্রি হয়ে গেলে আবার আলু বাজারে উধাও হয়। সরকার আলুর মহাজনের ও হিম ঘরের পচা আলু একটাকা পঁচাত্তরে বিক্রি করিয়ে দেওয়ায় কে লাভবান হল? ক্রেতা সাধারণ না আলু ব্যবসায়ীরা? আলুর বাজারে বামফ্রন্টের জয়ধ্বনি দিল ক্রেতা সাধারণ কি বলে জানেন তারা বললো বামফ্রন্ট আলু দেখে দুষ্ট। বামফ্রন্ট আলুর বাজারে যে খেলা দেখাল বা এখনো দেখাতে বাকি, তাতে ক্রেতা-সাধারণের চেয়ে আলু ব্যবসায়ীরা বেশী খুসী, কারণ তাদের অধিকাংশ পচা ও নিম্ন-মানের আলু বেশ ভাল দামে সরকারী সহায়তায় বিক্রি হয়ে গেল নির্বিরোধে। আলু ব্যবসায়ীরা বামফ্রন্টের দয়ায় এ যাত্রা পচা আলু ফেলে না দিয়ে ভাল আলুর সঙ্গে তা মিশিয়ে একটাকা বার আনায় বেচে দিয়ে লাভবান হল। এই সরকারের আজব বুদ্ধিমত্তা ও প্রশাসনিক ব্যর্থতা দেখে ক্রেতা-সাধারণ সর্বত্র সরকারকে ধিক্কার দিচ্ছে। অপদার্থ সরকারের অপদার্থ আলু নীতি ক্রেতা সাধারণকে সত্যই বিশ্মিত করেছে। বাজারে বাজারে সবাই বলছে এ সরকার নিপাত যাক্। মন্ত্রীমশাইরা আলু, মাছ, চিনি, ডিজেল, সিমেন্ট, কেরোসিন, কয়লা, বিদ্যুৎ প্রভৃতি কোন্ জিনিষটার সংকট উদ্ধারের সক্ষম হয়েছে কোনটাই তাঁরা পারেন নি। কেবল গাল গল্প শুনাতে বামফ্রন্ট মন্ত্রীরা ওস্তাদ। কাজের কাজ কিছুই এঁরা আজো করতে পারেননি। অতএব বামফ্রন্ট সরকার এ রাজ্যে থেকে রাজ্যবাসীর কি লাভ? লাভ শুধুই সি. পি, এম, ক্যাডারদের, কারণ তারা হাজারে হাজারে রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদে চাকরী পেয়েছে, কলিকাতা করপোরেশনে ও অন্যান্য পৌরসভাগুলিতে এবং পঞ্চায়েতে ভাল মাহিনার চাকরী পেয়েছে। সি, পি, এম দলের শ্রীবৃদ্ধি ঘটেছে তাতে, কিন্তু বেল পাকলে কাকের কি? অন্য শরিক দলের কর্মীরা হয়তো বা ছিটে-ফোঁটা কিছু পেয়েছে, তবে ষোল আনার মধ্যে এক আনাও ষোলের তারা পায়নি কারণ বামফ্রন্টের প্রধান সি, পি, এম সব সময়ে সব ব্যাপারে সিংহভাগ নিজে নিয়ে তবে অপর শরিকদের যৎকিঞ্চিৎ দিয়েছে জনগণের ভাগ্যে অষ্টরম্ভা মিলেছে।

পশ্চিমবঙ্গের মোট জনসংখ্যার শতকরা কুড়ি ভাগ সি, পি, এম দলের কর্মী ও সমর্থক কিনা সন্দেহ, অথচ এরাই ষোল আনা মজা লুটছে বামফ্রন্ট সরকারের স্বেচ্ছাচারী নীতির ফলে। বাকী শতকরা আশী ভাগ মানুষ উক্ত কুড়ি ভাগের অত্যাচারে সদা সর্বদা বঞ্চিত হচ্ছে, সরকারের একদেশদর্শিতার হীন আচরণে। বেকারভাতা কারা পেয়েছে? তারা কি সি, পি, এম সমর্থক বা কর্মী নয়? এদেশে সাধারণ মানুষের কাছ থেকে প্রত্যক্ষ পরোক্ষকরের মাধ্যমে সরকার যে টাকা আয় করে, তার সিংহ ভাগই যদি সি. পি, এম দল খুবতে চলে যায় সরকারী খরচে, তবে এ রাজ্যের সাধারণের কল্যাণের কাজে সরকার ব্যয় করবে কত টাকা কি ভাবে? সি, পি, এম দলভুক্তরা যারা সরকারী কর্মচারী তারাই সব সুযোগ-সুবিধা ও আর্থিক আনুকূল্য পায় সর্বাধিক। কেন এই বিমাতৃসুলভ আচরণ সরকারের? কো-অর্ডিনেশন কমিটি যা বলে সরকার তাই শোনে কেন? সরকারের এই মনোভাব দাস সুলভ মনোভাব ছাড়া আর কিছুই নয়। এ রাজ্যের বেশীর ভাগ মানুষই আজ সব

দিক দিয়ে বঞ্চিত, শোষিত, অবহেলিত ও পরিত্যক্ত কেন ?

পশ্চিমবঙ্গের মানুষ যদি সি, পি, এম দলের সঙ্গে হাত না মেলায়, তবে তাকে সবদিক দিয়ে জলে পুড়ে মরতে হবে কেন ? এই ফ্যাসিষ্ট কায়দা এ রাজ্যের মানুষ আর কতদিন বরদাস্ত করবে ? মনে হয় মানুষের ধৈর্য্যের বাঁধ এবার ভাঙ্গবে এবং সব কিছু তারা ভেঙ্গে চুরে ফ্যাসিষ্টদের ভাসিয়ে নিয়ে যাবে গভীর অতলে। মৎস্যমন্ত্রী মাঝে মাঝে মাছের চেহারা কাগজে এঁকে সেই কাগুজে মাছ এ রাজ্যের মানুষকে আট টাকা দশ টাকা কিলো দরে খাবার পরামর্শ দেন। এঁরা কি মানুষকে পাগল ভাবেন না নিজেরাই মাঝে মাঝে পাগল সেজে মজা উপভোগ করতে ভালবাসেন ? সত্যই বড় বিচিত্র এ দেশ। খাদ্যমন্ত্রী চিনি নিয়ে ছিনিমিনি খেলছেন বর্তমানে। ইতিপূর্বে তিনি রেপ্‌সীড তেল নিয়ে মানুষজনকে তৈলসিক্ত করেছেন, কল্পনা বিলাসের হাঁড়িকে পড়ে। খাদ্যমন্ত্রী বেশ মজায় আছেন, কারণ তাঁকে কিছু বলার চেষ্টা করলেই তিনি তৎক্ষণাৎ বিদ্যুৎ সংকটের সত্য কথাটা ফাঁস করে দিয়ে কোল্ড ষ্টোরেজের ব্যর্থতার জন্য বিদ্যুৎ ব্যবস্থাকে দায়ী করবেন এবং সেটা বাস্তব সত্য, ফলে মুখ্যমন্ত্রীর মুখ খোলার উপায় থাকবে না। মুখ্যমন্ত্রীর নিজের দপ্তরগুলি সবচেয়ে বেশী ব্যর্থ। বিদ্যুৎ, পুলিস, খেলাধূলা ইত্যাদি সব দপ্তরই মুখ্যমন্ত্রীর নিজস্ব তত্ত্বাবধানে পরিচালিত এবং ঐগুলিই চরম ব্যর্থ ফলে অন্য মন্ত্রীদেরকে কিছু বলার তাঁর মুখ কোথায় ? বামফ্রন্টের সভায় প্রায়ই ফরওয়ার্ড ব্লকের মন্ত্রীদের সম্বন্ধে তিক্ত সমালোচনা হয়। মুখ্যমন্ত্রীর ব্যর্থতার কথা সে স্থলে কেউই বড় একটা তোলেন না কেন ?

কেন্দ্রের বিরুদ্ধে বিষোদ্গার ভুলে এ রাজ্যের অর্থমন্ত্রী পরিশ্রান্ত হয়ে পড়েছেন। ইনি আবার নূতন কম্যুনিষ্ট তো, ফলে এঁর কায়দা কানুন সবই নূতনত্বের দাবী রাখে। পশ্চিমবঙ্গের এখন ভাগ্য ভাল যে এমন একজন যোগ্য অর্থমন্ত্রী সে অনেক সাধ্য সাধনায় লাভ করে ধন্য হয়েছে। ইনি আর কিছু বুঝুন না বুঝুন আসল কমিউনিষ্ট বলতে কি বোঝায় তা জানেন, তাই মোরসেদ্ সাহেবের কথার জবাবে বলেছিলেন যে তিনি একজন কমিউনিষ্ট। সর্বহারার প্রতিনিধিরা যে প্রয়োজন বোধে সর্বমারার প্রতিনিধির কাজ করে বসে সজ্ঞানে তা আলু বিক্রির ব্যাপারে সবাই জেনে ফেলেছে। সি, পি, এম দল যে পুলিস প্রশাসনে নাক গলিয়ে ঐ বিভাগটিকেও দ্বিধা বিভক্ত করে সমগ্র পুলিস প্রশাসন ব্যবস্থাকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিয়েছে তা কি এ রাজ্যের মানুষের জানতে বাকী আছে এখনো ? পুলিস ও মিলিটারীতে রাজনীতি ঢোকালে যে দেশ অচল হয়ে যায়, একথা কি নেতারা জানতেন না বা জানেন না এখনো ? সি, পি, এম যে ফ্যাসিষ্ট কায়দায় রাজ্য শাসনব্যবস্থা চালু রাখতে চায় পুলিসকে নিষ্ক্রিয় রেখে, তা জনগণ অনেকদিন পূর্বেই জেনে ফেলেছে। এ রাজ্যে পুলিস যে শুধু নামে আছে কাজে নেই, তা সবাই জানে। সেজন্য পুলিসকে দোষারোপ করে লাভ নেই, কারণ পুলিসও এই ফ্যাসিষ্ট শাসকদের হাতে পড়ে যে তাদের বিবেক, বিবেচনা ও সৎ বুদ্ধিকে ঘুম পাড়িয়ে রাখতে বাধ্য হচ্ছে, তা যে কোন রাজনীতি সচেতন মানুষ মাত্রেই জানে। পুলিসও এই রাজ্যের ও এই সমাজেরই মানুষ, তাই সমগ্র পুলিস বিভাগ কখনই অমানুষ হতে পারে না। তার মহত্ত্ব, কঠিন জীবনের চারিত্রিক দৃঢ়তা, এই সবই দুর্বল হয়ে পড়ে

আইন শৃঙ্খলা বলতে পশ্চিমবাংলায় যা আছে তা জঙ্গলের ব্যবস্থার সঙ্গে তুলনীয়. কারণ এ রাজ্যে দৈনিক খুনের সংখ্যা প্রায় ছয় থেকে সাত জন করে, ডাকাতির সংখ্যা প্রতিদিন চার থেকে পাঁচ, রাহাজানির সংখ্যা চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ. ছুরি মারা ও দাঙ্গাহাঙ্গামার সংখ্যা দশ থেকে বার. নারী নির্যাতনের সংখ্যা দুই থেকে তিন, ওয়াগন ভাঙ্গার ও গাড়ী লুঠের সংখ্যা তিন থেকে সাত. এক কথায় আইন শৃঙ্খলার রক্ষক পুলিস বামফ্রন্ট সরকারের গোপন নিয়ন্ত্রণের ফলে নিষ্ক্রিয় থাকতে বাধ্য হচ্ছে। মুখ্য-মন্ত্রী সব জেনে শুনেও নির্বিকার ও নির্বিকল্প কাজেই এ রাজ্যে অরাজকতা রোজই বাড়তির পথে। অরাজক অবস্থাকে চলতে দিতে চায় বামফ্রন্ট সরকার, সি. পি. এম দল স্বার্থে. ফলে জনগণ হতাশ ও দারুণ ক্ষতিগ্রস্থ এবং ভীত ও সন্ত্রস্ত, তাই তারা মূক ও বধির।

গ্রামাঞ্চলে সি. পি. এম অধিকৃত পঞ্চায়েতগুলি এমন মারাত্মক দলবাজী শুরু করেছে যে, গ্রামে মানুষ পঞ্চায়েতের অবিচারে ও অত্যাচারে গ্রামে টিকতে পারছে না। কোন কোন গ্রামে প্রাণ ভয়ে মানুষ অন্যত্র পালাতে বাধ্য হচ্ছে, কারণ পুলিসী শাসন গ্রামে নেই, ঐ সব পঞ্চায়েতী সি, পি, এম চন্দুদের যথেচ্ছাচারী আচরণের ফলে। এক কথায় এ রাজ্যের গ্রামে ও শহরে সর্বত্রই সি. পি, এম দলের অমানবিক অত্যাচারের জ্বালায় সবাই আতঙ্ক গ্রস্থ। বামফ্রন্ট আমলে গ্রামের মানুষের নাভিশ্বাস উঠেছে। সি, পি, এম-এর দলবাজী ও নৃশংস অত্যাচারের ফলে পশ্চিমবঙ্গ বাসীরা চরম সংকটের সম্মুখীন। আজ তারা সি, পি, এম এর হাত থেকে যে কোন উপায়েই হোক বাঁচতে চায়। শাসক যে এমন নিষ্ঠুর নরঘাতক হবে তা তাদের ইতিপূর্বে জানা ছিল না. তাই তারা কংগ্রেসের বিকল্প ভেবে সি. পি, এমকে ইতিপূর্বে ভোট দিয়েছিল। এখন তাদের আক্কেল গুড়ুম। সি. পি, এম দলের আসল চেহারা দেখে তারা ভয়ে কাঁটা, তাই তারা এ সরকারের পতন চায় কায়মনোবাক্যে। ভুলের মাশুল দিতে দিতে এ রাজ্যের মানুষ ক্ষত-বিক্ষত আজ. পরিত্রাণের পথ খুঁজে তারা হায়রাণ। কংগ্রেস (ই) দলের মধ্যে ছাত্র ও যুব শক্তির এমন পরস্পরের উপর দোষারোপ ও দ্বিধা বিভক্ত অবস্থা তাদের মনে হতাশা আরো বাড়িয়েছে। এখনও কংগ্রেস (ই) দল পশ্চিমবঙ্গে একতাবদ্ধ হয়ে সি, পি, এম এর সঙ্গে রাজনৈতিক লড়াইয়ে নামতে অক্ষম দেখে তারা সবাই বাধাহত, অথচ কংগ্রেস (ই) দল ছাড়া আর কোন দলই সি, পি, এম দলের জন-বিরোধী কার্যক্রম বন্ধ করতে পারবে না বলে এ রাজ্যের জনগণের দৃঢ় বিশ্বাস।

সরকারী টাকায় অর্থাৎ জনসাধারণের টাকায় মুখ্যমন্ত্রী দান খয়রাত শুরু করে দিয়েছেন এ রাজ্যে, উদ্দেশ্য তাঁর দলবৃদ্ধি ও কেন্দ্র কর্তৃক বঞ্চিত হলে ঐসব দলীয় দানগ্রহিতাদের দিয়ে এরাজ্যে চরম অশান্তি সৃষ্টি। পরের ধনে পোদ্দারী একেই বলে। পশ্চিমবঙ্গের দল নিরপেক্ষ লোকেরাও বামফ্রন্ট তথা সি, পি, এম সরকারের দলীয় স্বার্থে রাজকোষের অর্থনাশের ঘোর বিরোধী। শিক্ষাক্ষেত্রে যে নির্লজ্জ দলবাজী চালাচ্ছে এই ক্যাসিষ্ট সরকার তাতে পশ্চিম-বঙ্গে সুশিক্ষিত জনমানস সি. পি, এম দলের উপর শুধু খড়্গ হস্তই নয়, তাঁরা এই দুর্বিনিত ও অহঙ্কারী সরকারের পদচ্যুতি দেখতে চান এ রাজ্যের শিক্ষা বিস্তারের স্বার্থে ও শিক্ষকদের নিরাপত্তার প্রয়োজনে। আজ কি বিদ্যালয়ে, কি মহাবিদ্যালয়ে সর্বত্র জোর জবরদস্তির মাধ্যমে তথাকার শিক্ষক ও শিক্ষিকাদের

চরম লাঞ্ছনার শিকারে পরিণত করছে সি, পি, এম ক্যাডাররা। এর থেকে শাসন ব্যবস্থার বর্তমান হাল এরাজ্যে কোন স্তরে নেমেছে, তা সহজেই অনুমেয়। সাধারণ প্রশাসন এরাজ্যে একেবারেই নড়বড়ে, কারণ তা চলে সি, পি, এম, ক্যাডারদের অঙ্গুলি হেলনে. আই, এ, এস ও অনুরূপ অফিসাররা সর্বদা হয় উপেক্ষিত আর না হয় জবর দস্তির কাছে নতি স্বীকারে বাধ্য।

প্রাণের মায়া আই, এ, এস অফিসারদেরও আছে, কারণ আছে তাদের ঘর সংসার। গুণ্ডা ও বদমাইসদের তাঁরা শাসন করেন পুলিসদের দ্বারা. সেই পুলিসও সরকারী নীতির জন্য ও সি. পি, এম দলের সীমাহীন দৌরাত্মে নিষ্ক্রীয় থাকতে বাধ্য আজ এরাজ্যে। উল্লিখিত বাস্তব ঘটনা গুলির সম্বন্ধে মুখ্যমন্ত্রী সম্যকভাবে সচেতন, তবুও তাঁর ও তাঁর দলের নীতি হিসাবেই এই নারকীয় কাণ্ডকারখানা বিগত তিন বৎসরাধিক কাল ধরে চলে আসছে। ফলে জনগণ আজপ্রায় ক্ষিপ্ত ও ধৈর্যহারা, তারা এরাজ্যে শান্তি, সুশাসন ও সুবিচার চায় যা সি, পি, এম এযাবৎকাল দিতে পারেনি এবং ভবিষ্যতেও দিতে পারবে না, কারণ তারাই তো অশান্তির, কুশাসনেরও বিচারহীনতার মূর্ত প্রতীক। সি, পি, এম অশান্তির আগুন জ্বালাতে ওস্তাদ এবং সেকথা এরাজ্যের শিশু নারী সবাই ভালমতে জানে। মুখ্যমন্ত্রী যে নীতিতে রাজ্য চালাচ্ছেন, তাতে যে এরাজ্যে দিনের পরদিন অপরাধ প্রবণতা ক্রমবৃদ্ধির পথে বীর বিক্রমে এগিয়ে চলেছে তা তিনি নিজেও জানেন, তবুও এর প্রতিকার করার কোন প্রতিশ্রুতি বা প্রচেষ্টা তাঁর দিক থেকে নেই কেন? মনে হয় এভাবে চললে তাঁর ও তাঁর দলের শ্রীবৃদ্ধি ঘটবে বলে তিনি বিশ্বাস করেন। মুস্কিল হয়েছে জ্যোতিষের মত বরখাস্ত অঙ্কের গভীর চিন্তা, যা মুখ্যমন্ত্রীকে পেয়ে বসেছে। নিজ অন্তার কৃতকর্মের ফলে মুখ্যমন্ত্রী যে কোনও দিন ও যে কোনও সময়ে হঠাৎ বরখাস্ত হতে পারেন এবং এরাজ্যের বাস্তব অবস্থাকে যে তিনি সেই পর্যায়ে এনে ফেলেছেন তা তিনি নিজেও ভালরকম জানেন।

পশ্চিমবঙ্গ যে সি, পি, এম দলের অত্যাচারে জর্জরিত ও এখানকার মানুষের শতকরা ষাট/সত্তোর ভাগ সাধারণ লোক ও শতকরা পঁচানব্বুই ভাগ শিক্ষিত ও মার্জিত রুচি সম্পন্ন ব্যক্তিবর্গ সি, পি, এম দলকে শাসন ক্ষমতায় আর দেখতে রাজিনয়, তা একটু তলিয়ে চিন্তা করলেই মুখ্যমন্ত্রী বুঝতে পারবেন। মুখ্যমন্ত্রী সম্যক অবগত আছেন যে, তিনি নিজেই সবচেয়ে বেশী ঘৃণ্য এরাজ্য পরিচালনে কারণ পশ্চিমবঙ্গের মঙ্গলামঙ্গলের সঙ্গে তাঁর কোন যোগ ছিল না, আর পশ্চিমবঙ্গের উন্নতির বদলে বা বিনিময়ে তিনি সি, পি, এম দলের উন্নতি, বৃদ্ধি ও কল্যাণ চেয়েছিলেন। তিনি তা পেয়েছিলেন, তাঁর স্বপ্ন সার্থক রূপ নিয়েছিল। ফলে এ সুখের গদী থেকে হটে যাবার ভয়ে সদাই সশংকিত তিনি, যদিও ইন্দিরাজীকে তিনি এখন স্তব স্তুতির মাধ্যমে তোয়াজ ও খুসী রাখতে সদা ব্যস্ত। যে ইন্দিরাজী এই সেদিন পর্যন্ত তাঁর কাছে স্বৈরাচারী বলে পরিত্যক্তা ছিলেন, নিজ স্বার্থের খাতিরে সেই ইন্দিরাজীর পাদ বন্দনায় মুখ্যমন্ত্রী সদা মুখর। বরখাস্তাতঙ্ক জ্যোতিবাবুদের জীবনের গতি ও বহু বিঘোষিত নীতিকে পাল্টেছে দেখে পশ্চিম বঙ্গবাসী আজ বিস্মিত।

সন্তোষ গাঙ্গুলী স্মরণে

(১৭-১০-৮০ ইং তারিখ লিখিত)

আজ ১৭ই অক্টোবর, ৪৭ বৎসর আগে ১৯৩৩ সালে এই দিন দুপুরে সন্তোষ বিপ্লবী বন্ধুদের ভিতর হতে চলে গেল।

দেউলী বন্দীশিবিরের পাঁচটী ক্যাম্পের বিপ্লবীরা প্রায় সকলেই মিলিত হয়েছে সংলগ্ন খেলার মাঠে। কয়েকদিন যাবৎই ক্রিকেটখেলা চলছে, সন্তোষও মাঠে বন্ধুদের সঙ্গে গল্প করে, খেলা দেখে,-এদিনও গিয়েছিল। কখন বন্ধুদের অলক্ষে খেলার মাঠ হতে ৪নং ক্যাম্পের ১নং রোমে নিজের থাকবার ঘরে চলে গেল কেহই লক্ষ্য করে নাই। খেলার বিরতির সময় অনেকেই পর পর ক্যাম্পে এসে বিশ্রাম নেয়। সন্তোষের ঘরে থাকতেন সন্তোষ ব্যতীত বিপ্লবী নেতা জ্ঞান মজুমদার, ক্ষিতীশ ব্যানার্জি, মনি লাহিড়ি, নরেন দাস অমূল্য মুখার্জি, মনীন্দ্র চক্রবর্ত্তী, যোগেশ চক্রবর্ত্তী, যতীন রায়, ব্রজেন দাস প্রমুখ। বিরতির সময় এঁরা অনেকে ঘরে ফিরে এসেছেন, সঙ্গে আরও অনেকে ছিলেন, তন্মধ্যে সন্তোষের বন্ধু সতীন্দ্র রায়, রবীন্দ্র মৌলিক ও জগদীশ চাটার্জিও ছিলেন। ঘরের সম্মুখে এসেই দেখা গেল ঘরের দরজা ভিতর হতে বন্ধ, এবং দরজার উপরের দিকে কাঁচ দিয়ে সন্তোষকে ঘরের মধ্যে ঝুলন্ত অবস্থায় দেখা গেল। দরজার কাঁচ ভেঙ্গে দরজা খোলার ব্যবস্থা করতে ব্রজেন বাবুর হাত কোট রক্তাক্ত হয়ে গেল। রবীন্দ্র মৌলিক ও সতীন্দ্র রায় সন্তোষের ঝুলন্ত দেহ ঝুলন্ত অবস্থা হতে মুক্ত করে শুইয়ে দিল সন্তোষের প্রাণের কোন স্পন্দন পাওয়া গেলনা। একটী বিরাট সম্ভাবনাপূর্ণ জীবন বন্দীশিবিরের কুঠরি হতে উড়ে গেল। এই খবর রটে গেল সমস্ত শিবিরে ও খেলার মাঠে। সন্তোষের বন্ধু ছিল অগণিত। সকলেই এসে ভিড় করল ৪নং ক্যাম্পের এক নম্বর রোমে সন্তোষকে শেষ দেখা দেখার জন্য। এসে গেল ডাক্তার, শিবিরের অফিসার। সন্তোষের দেহ অফিসারদের হেপাজতে নিয়ে গেল। বন্দী শিবিরের সমস্ত বন্দীদের প্রশ্ন কেন একটী ফুটন্ত কলি নিজেকে বিকশিত হতে দিল না।

সন্তোষের মত দলের কর্মিরাই দলের প্রাণ সঞ্চার করেছে। এদের কর্ম প্রচেষ্টায় দলপুর্ন হয়েছে এদের নিষ্কাম সাধনা দলের সামর্থ যুগায়েছে, এদের নাম পত্রিকায় প্রকাশ হয় না। কিন্তু এদের অসমাপ্ত কাজ এগিয়ে নেওয়ার জন্য যারা ব্রতী তাদের মনে চিরস্থায়ী হয়ে আছে ওরা : সেই হেতু সন্তোষের চলে যাওয়ার দিনে ওকে স্মরণ করতে হল।

সন্তোষ, সন্তোষ চন্দ্র গাঙ্গুলী ঢাকা গেণ্ডারিয়ার ছেলে। স্কুলজীবন, কলেজজীবন, বৈপ্লবিক জীবন প্রধানতঃ ঢাকাতেই কেটেছে। ধনেশ ভট্টাচার্য্য; অধির মুখার্জি, সতীন্দ্র রায়, ব্রজেন দাস, সুশীল সরকার, কৃষ্ণপদ চক্রবর্ত্তী, মাখন দত্ত, রাখাল ঘোষ প্রভৃতি ওর বৈপ্লবিক জীবনের সাথী। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মেধাবী ছাত্র সন্তোষ বি, এস সি, পড়াকালীন পদার্থ বিজ্ঞানের অধ্যাপক সত্যেন্দ্র নাথ বসু কর্তৃক আরোজিত বাংলার বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ প্রতিযোগিতায় পরমাণু শক্তি বিষয়ে প্রবন্ধ লিখে প্রশংসা অর্জন করেছিল। সন্তোষ বিজ্ঞানের ছাত্র হলেও সাহিত্য চর্চায় বিশেষ অনুরাগ ছিল, কবিতাও লিখত। বন্দীশিবিরেও কবিতা ও প্রবন্ধ লিখেছিল। ওর লেখা গল্প ও কবিতা বাইরে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল।

কোথায় কার কাছে জানা নেই, লেখাগুলি পাওয়া গেলে প্রকাশ করা যেত।

সন্তোষ ডানপিটে ছিল না। কিন্তু বৈপ্লবিক কাজে কোন রকম পিছপা হয় নাই। ঢাকা সহরে হিন্দু-মোসলমান দাঙ্গা চলছে, এই অবস্থায় মোসলমান মহল্লার ভিতর দিয়ে রওনা দিত ঢাকা হল হতে আরমানিটোলা হয়ে বাদামতলী ষ্টেশনের মধ্য দিয়ে বুড়িগঙ্গা নদীর পার দিয়ে লক্ষিবাজার পৌঁছতে হবে. জীবন বিপন্ন হতে পারে জেনেও পাঁচজনকে রওনা হতে হল, তন্মধ্যে সন্তোষ ছিল একজন। পথিমধ্যে বদামতলিতে মোসলমান গুণ্ডাদের আক্রমনে ব্রজেন দাস ছুরিকাহত হয়, বাকী চার জন সতীন্দ্র রায়, রবীন্দ্র মৌলিক, সুধীর মজুমদার, সন্তোষ গাঙ্গুলী গুণ্ডাদের পর্যুদস্ত করে ব্রজেন দাসকে উদ্ধার করে গন্তব্যস্থান পৌঁছে যায়। এই ধরণের ডানপিটে কাজে সাহিত্যিক শীর্ণদেহ সন্তোষ অংশগ্রহণ করতে সামান্যতম কুণ্ঠা বোধ করে নাই।

চট্টগ্রামে বিপ্লবীদের দ্বারা অস্ত্রাগার দখলের পরই সন্তোষ ১৯৩০ সালের এপ্রিলমাসে ঢাকা সহরে গ্রেপ্তার হয়। ঢাকা হতে সিউড়ি, সিউড়ি হতে বক্সা ক্যাম্প, বক্সা ক্যাম্প হতে দেউলী বন্দীশালায় স্থানান্তরিত হয়। দেউলী ক্যাম্পে প্রথম ১নং ক্যাম্পে ছিল, এই ক্যাম্পে একটী ছোট কুঠরিতে দলের নেতারা সন্তোষ ও জগদীশ চাটার্জিকে থাকার ব্যবস্থা করেন। একজন বিজ্ঞানী সাহিত্য চর্চায় মসগুল অন্যজন মেজর সামরিক কলা কৌশল আহরণে ব্যস্ত। সব কিছুরই উদ্দেশ্য পরাধীন দেশের মুক্তিকল্পে আহুতি দেওয়ার আয়োজন। বিপ্লবীদের মধ্যে চিন্তাধারার আলোচনা চলছে। দুইজনই আলোচনা ও পড়াশুনা দ্বারা সিদ্ধান্তে পৌঁচেছে 'মার্কসবাদ লেনিনবাদ'ই আমাদের দেশের মুক্তির পথ।

সন্তোষের রাজনৈতিক চিন্তাধারার সঙ্গে না মিললেও বিপ্লবীদের মধ্যে প্রাচীন ও নবীন সকলেই ওর স্বভাবসুলভ অমায়িকতা ও মননশীলতায় আকৃষ্ট হয়েছিল। পোষাক পরিচ্ছদ, খাওয়া দাওয়ার কোন পছন্দের বালাই ছিল না। একমাত্র নেশা বই কেনা, বই পড়া ও লেখা। বিপ্লবী নেতা পুলিন বিহারী দাসের সহকর্মি ঢাকা ষড়যন্ত্র মামলার আসামী দীনেশ গুহ (স্বামী তুরিয়ানন্দ) দেউলী ক্যাম্পে আবদ্ধ থাকাকালীন বলেছিলেন' সন্তোষ খুবই ভাল ছেলে, ওকে তোমরা বিক্ষিপ্ত কর না, ওর প্রতিভা বাড়তে দেও।

গুপ্ত প্রতিভা বিকাশে আনন্দের স্ফুরণ হয়। প্রতিভা বিকাশের পথ রুদ্ধ হলে প্রতিভাধরদের মন মুষড়ে পড়ে, নিজের অবদানের প্রতিবন্ধকতায় যন্ত্রণা বোধ করে, যন্ত্রণার তীব্রতায় নিজেকে খাপ খাওয়াতে না পেরে পরিবেশ হতে বিদায় নিতে চায়, সন্তোষ এই অবস্থারই শিকার হয়েছিল, তাই বিলিনহয়ে গেল ইংরেজের বলিশালায় ১৯৩৬ সালের ১৭ই অকটোবর। সন্তোষের মত আরও প্রতিভাধর বিপ্লবী এইভাবে আত্ম বিসর্জন দিয়েছে। আজ সন্তোষের সঙ্গে ওদের স্মরণ করি ও শ্রদ্ধা জানাই।

জয়তু বিপ্লবী বাংলা

কালীপদ সরকার :

উনবিংশ শতাব্দী ছিল বাঙ্গালীর জীবনে স্বর্ণযুগ। ছিল তার চিন্তা ও কর্মে প্রতিশ্রুতির উজ্জ্বল স্বাক্ষর। রামমোহন, বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র, বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ ছিলেন নব জাগরণের পথিকৃৎ। যে জাগরণ থেকে জন্ম নিয়েছিল সংস্কার-বন্ধন-মুক্তির তীব্র আকাঙ্খা, জ্ঞান স্পৃহা, ত্যাগব্রত এবং স্বাদেশিকতা। বাঙ্গালী তখন সমগ্র ভারতের চিন্তানায়ক, বঙ্গমনীষা সকল ভারতবাসীর প্রেরণাদাত্রী।

ইংরাজি শিক্ষা ও পাশ্চাত্যের প্রভাব বাঙ্গালী নব জাগরণের পিছনে শক্তি জোগালেও, উন্মেষের উৎসভূমি ছিল বাঙ্গালী মনের অন্তরালে, নতুবা বাঙ্গালীদের চেয়ে আগে এবং ব্যাপকতর ভাবে যেখানে ইংরাজির প্রচলন ঘটেছিল সেই মাদ্রাজ হত ভারতীয় জাতীয় জাগরণের উৎস তীর্থ। বাংলা নয়।

স্বীকার করুন আর নাই করুন, বাঙ্গালী জাতির একটি বৈশিষ্ট্য আছে। আকৃতগত মিল, ভাষা, সংস্কৃতি ও বিশেষ ভৌগলিক পরিবেশে এই বৈশিষ্ট্য গড়ে উঠেছে দীর্ঘ বিবর্তন পথে, যার পিছনে ছিল নানা রক্তের সংমিশ্রণ, প্রাক-আর্য সভ্যতার প্রভাব এবং উদার ধর্ম সমন্বয় ভাবনা। স্বাতন্ত্র্য-স্পৃহা ও বৈপ্লবিক চেতনা বাঙ্গালী বৈশিষ্ট্যের সহজাত ধর্ম। সেই অর্থে বিপ্লবী পরিষদের মুখপত্রের নাম 'বিপ্লবী বাংলা' দেওয়া খুবই তাৎপর্যপূর্ণ হয়েছে। সাপ্তাহিক 'বিপ্লবী বাংলা'র দশ বৎসর পূর্তিও প্রণিধানযোগ্য, যার জন্য বিপ্লবী পরিষদের সভাপতি ও সদস্যবৃন্দ

হার্দিক

সৃষ্টি উদ্দেশ্যহীন নয়। জাতি সৃষ্টির মূলে তার একটি বিশেষ ভূমিকার অস্তিত্ব অস্বীকার করা যায় না। জাগতিক বিবর্তন স্তরে এই ভূমিকা ক্রিয়াশীল। একে জাতির মিশন বলে মানতে হয়। যে জাতির এই মিশন নেই সে জাতি জীবন্মৃত। বিবেকানন্দ, বিদ্যাসাগর, রবীন্দ্রনাথ, অরবিন্দ, সুভাষচন্দ্রের ন্যায় মহামানবদের আবির্ভাব ও বাঙ্গালীর বিপ্লব-সাধনা আকস্মিক ঘটনা নয়, বাঙ্গালী জাতির গতিশীল ভবিষ্যতের অভিপ্রকাশ। যে ব্যক্তির ভবিষ্যৎ নেই, তার বর্তমানও নেই। ব্যক্তি জীবনে যা সত্য, জাতির জীবনেও তাই সত্য।

এ কথা অনস্বীকার্য যে, বাঙ্গালী জাতি বর্তমানে এক গভীর দুর্যোগময় সংকটের মাঝ দিয়ে চলেছে। বাঙ্গালী মার খাচ্ছে আসাম, মণিপুর মেঘালয় প্রভৃতি অ বাঙ্গালী রাজ্যে, দণ্ডকারণ্য উদ্বাস্তু পুনর্বাসন কেন্দ্রে, এমন কি খোদ পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যে। (মরিচ ঝাঁপি যার দৃষ্টান্ত) বাঙ্গালীর বিরুদ্ধে প্রতিকার হীন অবিচার চলেছে সর্বত্র। আমি প্রাদেশিকতা প্রচার করছি না। বাঙ্গালী জাতির সহিকার অবস্থা বাঙ্গালী ও অবাঙ্গালীদের সামনে শুধু তুলে ধরতে চাই। বাঙ্গালীর সমস্যা ভারতীয় সমস্যারই অঙ্গ।

বাংলাদেশের অবস্থা প্রত্যক্ষ গোচর নয়, বাংলা দেশ সার্বভৌম স্বাধীন রাষ্ট্র। নিকটে হলেও সে দেশ এখন দূরে। পশ্চিমবঙ্গে দেখছি বহু সমস্যা আবৃত এক শ্বাসরোধী পরিবেশ, আশা-নিরাশার দ্বন্দ্ব, দুঃসাধ্য জীবনযাত্রা [illegible] অমার্জনীয় অবক্ষয়। [illegible]

এই সংকটকে কালপ্রবাহ কিংবা বাঙ্গালী বাবু য়ানা বা বাবুসংস্কৃতির পরিণাম বলে লঘুচিত্তে আত্ম লাভ করা যেতে পারে, কিন্তু তা থেকে সংকটের কারণ উদ্ঘাটন ও প্রতিকারের পথ-সন্ধান পাওয়া যাবে না।

বাংলার বাইরে বাঙ্গালী নিগ্রহের কারণ হিসাবে বাবুসংস্কৃতির দোহাই পাড়া হল একটি মিথ্যা অজুহাত, যার ব্যাখ্যাতা হলেন সেই সব দল ও ব্যক্তি যারা বাংলার বাইরে প্রবাসী বাঙ্গালীদের অবদানের ইতিহাস জানেন না বঙ্গসংস্কৃতির মূল্যায়ণে অনাগ্রহী এবং বিদেশী মতবাদের অন্ধ অনুকরণ প্রয়াসী।

আসামে যে সব বাঙ্গালীকে বিদেশী আখ্যা দিয়ে বর্তমানে ভিটেছাড়া করার চেষ্টা চলেছে, অথবা যে হাজার দুয়েক বাঙ্গালীকে বিপ্লবের নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করা হল, তারা কি সব বাঙ্গালী বাবু?

বাবু শব্দটির অর্থ আদিতে যা ছিল তা হল—'Baboo, an appellation given to a native whom we wish to show respect'—লিখে গিয়েছেন স্যার এ, এফ টাইলর তাঁর political state of India গ্রন্থে, ১৯১৫ সালে। বিহার, উড়িষ্যা, আসামেও সেই অর্থে বাবু শব্দের প্রচলন আছে। বাবু শব্দের অর্থহীনতা ব্যাপক নয়। বাঙ্গালী জাতির সংকটের কারণ অর্থ-নৈতিক। অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ এবং নেতৃত্বের ব্যর্থতা তরুণ সম্প্রদায়কে যে কিছুটা অস্থির, বিক্ষুব্ধ এবং শৃঙ্খলাহীন করে তুলেছে তার কারণও তাই। প্রবীণ-দের মধ্যে আদর্শচ্যুতি ঘটায়, তাঁদের উপদেশবাণীর প্রতি যুবকদের অশ্রদ্ধা ও প্রবীণদের সভাসমিতি-গুলিতে যুবকদের অনুপস্থিতি এই প্রসঙ্গে

বাঙ্গালী জাতির অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের কারণ হল বিশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে বঙ্গভূমিকে তিনবার ভাগ করার ফল। শেষবারের বিভাগ দেশের পূর্বাংশকে সম্পূর্ণ পৃথক করে স্বতন্ত্র রাষ্ট্রে পরিণত করেছে। জাতি যে ভৌগলিক বেষ্টনী ও প্রাকৃতিক পরিবেশে একটি নিজস্ব সত্তা গড়ে তোলে তাকে ধ্বংস করে, বাঙ্গালী জাতির ঐতিহ্য, সংহতি এবং আর্থিক সামর্থ্যকে বিনষ্ট করার ব্রিটিশ ষড়যন্ত্র ছিল বার বার বঙ্গবিভাগের মূলে। ভূমি হল কোন ব্যক্তি বা সমষ্টির স্থিতিশীল সম্পদ, উন্নতি ও বিকাশের পাদপীঠ। বঙ্গভূমির খণ্ডিত করণ প্রক্রিয়া বাঙ্গালীকে শুধু বাস্তুহারা ভিখারী করেই ক্ষান্ত হয় নি, তার আত্মশক্তিকেও পঙ্গু করে দিয়েছে বেশ কিছুটা।

উত্তরে হিমালয়, দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর, পূর্বে শ্রীহট্ট কাছাড় ও গোয়ালপাড়া এবং পশ্চিমে পূর্ণিয়া মানভূম ও সাঁওতাল পরগণা নিয়ে গঠিত ভূ-ভাগ হল বঙ্গভাষা-ভাষীদের ইতিহাস সম্মত বাসভূমি। (History of Bengal, vol. I) ইহাই গৌড়-বঙ্গ দেশ। মুসলমান যুগে সুবা বাংলা এবং ব্রিটিশ আমলে বেঙ্গল প্রেসিডেন্সির অন্তর্গত এই অঞ্চল টিকেই বঙ্গদেশ বলে চিহ্নিত করা হত। নদনদী বিধৌত, উর্বর, শস্য শ্যামল, বনজ ও খনিজ সমৃদ্ধ এই এই হল সেই সোনার বাংলা, যার ঐশ্বর্যের খ্যাতি প্রাচীন রোম পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

বাংলা তুর্ক ও মুঘল অধিকারকে নীরবে মেনে নেয় নি। হিন্দু ও মুসলমান নেতারা সুযোগ পেলেই স্বাধীনতা লাভের জন্য তরবারি ধরেছেন। বাংলার নিরন্তর বিদ্রোহ দিল্লীর বাদশাহদের সুখ নিদ্রার ব্যাঘাত ঘটাতো, তাই তাঁরা বাংলাদেশের নাম দিয়েছিলেন 'বুলক্ক বাসা' অর্থাৎ বিদ্রোহীদের আড্ডা।

সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশকেও একদিন সেই ধারণা পেয়ে বসেছিল। ব্রিটিশ শাসকবর্গ বুঝেছিলেন, সাম্রাজ্য বিরোধী মুক্তি আন্দোলনের মূলে শিক্ষিত বাঙ্গালী হিন্দু সম্প্রদায়। তাঁদের দৃষ্টিতে প্রতিটি শিক্ষিত বাঙ্গালী হিন্দু যুবক হলেন সন্দেহভাজন ব্যক্তি। বাঙ্গালী হিন্দুদের প্রতিপত্তি নির্মূল করার উদ্দেশ্যে তাই ১৯০৫ সালে বাংলাকে দুই ভাগ করা হল।

ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজসাহী বিভাগ ও আসাম নিয়ে গড়া হল পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশ এবং প্রেসিডেন্সি, বর্ধমান বিভাগ, বিহার ও উড়িষ্যা নিয়ে গড়া হল বঙ্গপ্রদেশ। প্রথমটিকে করা হল মুসলমান সংখ্যা গরিষ্ঠ এবং দ্বিতীয়টি অ-বাঙ্গালী প্রধান। বাঙ্গালী হিন্দু যাতে নবগঠিত উভয় বঙ্গে কোণঠাসা হয় তার ব্যবস্থা পাকা হল। ১৯০৬ সালে সরকারী উদ্যোগে ঢাকায় গঠিত হল মুসলিম লীগ যার কাজ হল সাম্প্রদায়িকতা প্রচার এবং গত দেড়শো বছর ধরে বঙ্গ-মনীষা হিন্দু-মুসলমানের মিলনে যে ঐক্য-বদ্ধ ভারত গড়ার চেষ্টা করে এসেছিল তার বিনাশ সাধন। পূর্ববঙ্গে হিন্দুদের জীবন দুঃসহ করে তোলা হল সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা একটার পর একটা।

অন্যদিকে বাংলাপ্রদেশের অন্তর্ভুক্ত বিহারী ও উড়িয়াদের মধ্যে জাগিয়ে তোলা হল আঞ্চলিক স্বার্থের নামে বাঙ্গালী বিদ্বেষ। প্রতিশ্রুতিময় প্রগতিশীল একটি মানবগোষ্ঠীর সর্বনাশ সাধনের এতবড় হীন চক্রান্তের দৃষ্টান্ত ইতিহাসে বিরল।

সে দিন বাঙ্গালী সমাজে নেতৃত্বের অভাব ছিল না, দুর্লভ ছিল না ত্যাগব্রতী কর্মীদলের। বাঙ্গালী ব্রিটিশের চ্যালেঞ্জের সমুচিত জবাব দিতে দ্বিধাবোধ করে নি। যা থেকে জন্ম নিয়েছিল বাংলার বিপ্লব-বাদ, যার পরিণতি আজাদ হিন্দ ফৌজ গঠন এবং ইংরাজের ভারতত্যাগ।

১৯১১ বঙ্গভঙ্গরদের ছদ্ম আবরণে বাংলাকে তিন ভাগে ভাগ করেছিল ইংরাজ সরকার। বঙ্গভাষী হিন্দু প্রধান কয়েকটি জেলাকে বাংলা থেকে কেটে জুড়ে দেওয়া হয়েছিল বিহার ও আসাম প্রদেশের সঙ্গে এবং নবগঠিত বাংলা প্রদেশকে করা হয়েছিল মুসলমান সংখ্যা গরিষ্ঠ। যার অবশ্যম্ভাবী পরিণাম ১৯৪৭ সালের বঙ্গবিভাগ এবং পূর্ব পাকিস্থান সৃষ্টি।

বাঙ্গালী জাতির উপর যে ঘোর অবিচার ইংরাজ সরকার করেছিল তার কোন প্রতিকার অদ্যাবধি হয় নি। দেশ বিভাগের তেত্রিশ বছর পরেও লক্ষ লক্ষ বাঙ্গালী ভারতে অসহায় ও নিরাশ্রয়। পশ্চিম পাকিস্থানের উদ্বাস্তুদের ন্যায় পূর্বপাকিস্থানের উদ্বাস্তুরা তাদের পরিত্যক্ত সম্পত্তির জন্য ক্ষতিপূরণ পায় নি। স্বাধীন বাংলাদেশ গড়ার পরেও অবস্থার কোন পরিবর্তন ঘটে নি। এই হল বস্তুতঃ বাঙ্গালীর সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের কারণ। বাবু সংস্কৃতি নয়।

ব্যর্থতার জন্য দায়ী বাঙ্গালীদের মধ্যে যোগ্য নেতৃত্বের অভাব এবং বিভ্রান্তকারী চিন্তার বিস্তার। তবে বিপ্লবী বাংলার আত্মিক শক্তি মুছে যাবার নয়। জয়-পরাজয় আকীর্ণ বিবর্তন প্রবাহে তার চিরন্তন সৃজনশীল প্রকৃতি অলক্ষ্যে কাজ করে চলেছে। বিপ্লবী বাংলার নব অভ্যুদয় একদিন হবেই। আমরা যেন তাঁর প্রতি বিশ্বাস না হারাই।

রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্র নাথের স্মৃতি কথা

["A Nation In Making" গ্রন্থ থেকে অনুবাদ]

অনুবাদক—অধ্যাপক নলিনীমোহন দাশগুপ্ত

আমার ভারতে প্রত্যাবর্তন ও মন্ত্রী পদে নিয়োগ।

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

অনুষ্ঠানের আসরটি ছিল বেশ বড় এবং উৎসাহ উদ্দীপক এবং আমি যখন বক্তৃতা করতে উঠলাম, তখন মনে হয় যেন আমি কেবল মাত্র একজন চারণকবিই নই, যেন আমিও একজন বিশ্ববোধে অনুপ্রাণিত যোদ্ধা, চারিদিকে এমন সব বন্ধুগণ কর্তৃক পরিবৃত হয়ে আছি যারা আমার কথায় কোন ভুল ত্রুটি ঘটলেও তা উপেক্ষা করবেন। সেখানে আমি যে বক্তৃতা করেছিলাম তার একটি অংশ এখানে উদ্ধৃত করছি—:

"এই সাম্রাজ্য আপনাদের, তবে তা আমাদেরও। আপনাদের এই জন্য যে আপনারা একে গড়ে তুলেছেন, আর আমাদের এই জন্য যে আমরা একে নিজেদের বলে গ্রহণ করে নিয়েছি। আপনারা এই সাম্রাজ্যের স্বাভাবিক উত্তরাধিকারী, আর আমরা হচ্ছি এই সাম্রাজ্যের পোষ্য সন্তান। আপনাদের অধিকার ও আমাদের অধিকার, সমান অধিকার। এখানে আমি আমার নিজের এবং আমার দলের পক্ষ থেকে একটি কথা বলতে চাই। আমার মতোই পার্টির লোকেরা বিশ্বাস করি যে ভারতের সঙ্গে ইংল্যাণ্ডের যে সম্পর্ক তা বিধির বিধানে নিয়ন্ত্রিত, যে বিধান আমাদের এক পবিত্রতম ও সর্বোচ্চ অবস্থার পক্ষে পৌঁছে দেবে। তাই আমি আপনাদের কাছে, ইয়োরোপীয় সমাজের প্রতিনিধিবর্গের কাছে, সাম্রাজ্যের সদস্যগণের কাছে, মানব জাতির সত্যাধিকারের বন্ধুদের কাছে, এই আবেদন রাখছি যে, আপনারা এসে আমাদের পাশে দাঁড়ান এবং আমাদের সাথে সহযোগিতা করুন। যে মহান পরীক্ষা নিরীক্ষার সাফল্যের সঙ্গে ইংল্যাণ্ডের মান-সম্মানের প্রশ্ন জড়িত এবং যার উপর ভারতেরও ভবিষ্যৎ অনেকখানি নির্ভর করছে সেই মহান পরীক্ষায় আপনারা আমাদের সহযোগী হোন যাতে সে পরীক্ষায় নিশ্চিত সাফল্য লাভ করা যায়। আমার নিশ্চিত বিশ্বাস আমার এ আবেদন বৃথা যাবেনা। আপনারা আমাকে যেরূপ আন্তরিকতার সহিত গ্রহণ করেছেন। এবং যে অনুকম্পা ও সহানুভূতির সহিত আপনারা আমার কথাগুলি শুনলেন তাতে আমার প্রত্যাশা দৃঢ়ভাবে উজ্জিবিত হয়েছে আপনাদের কাছে সেজন্য বাস্তবিকই কৃতজ্ঞ "

আমার বক্তৃতায় সবে খুশী হন এবং সেই খুশীর নিদর্শন স্বরূপ তারা আমাকে তাদের ক্লাবের একজন সম্মানিত সদস্য করে নেন। আমি এখনও সেই সদস্যপদে রয়েছি। যদিও আমার পূর্ব নির্ধারিত নানা কাজের মধ্যে ক্লাবের সভায় বারে বারে যোগদানের সুযোগ করে উঠতে পারিনে, তথাপি আমি এরূপ একটি উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন অথচ ছোট্ট সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত থাকা গৌরবজনক বলে মনে করি। ভারত এবং সাম্রাজ্যের পক্ষে মঙ্গলজনক অনেক কাজের জন্য ইয়োরোপীয় ও ভারতীয়দের মধ্যে যে বন্ধুত্বের বন্ধন প্রয়োজন এই ক্লাব সেই প্রয়োজন সাধন করছে।

এবারে আবার আমার মূল বিষয়বস্তুর সূত্র ধরে এগিয়ে চলা যাক। বারাকপুর মহকুমার মিউনিসিপ্যালিটি সমূহের পক্ষ থেকে আমি বেঙ্গল লেজিসলেটিভ কাউন্সিলে নির্বাচন প্রার্থী হয়ে দাঁড়াই। বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আমি নির্বাচিত হলাম। আমার নির্বাচনের পরে গভর্নর লর্ড রোনাল্ডসের সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারের সময় আমাকে এক মন্ত্রীর পদ এবং যে দপ্তর আমি নিজে নেওয়া পছন্দ করি তা দিতে চাওয়া হল। আমাকে এ রকম একটা পদ দিতে চাওয়া হবে তা আমার কাছে অপ্রত্যাশিত ছিল না। তবে কিনা সেই সাক্ষাৎকারের সময়ই যে তা দিতে চাওয়া হবে সে কথা আগে ভাবিনি। আমাকে মন্ত্রীর দেওয়ার সম্ভাবনার কথা সাধারণ প্রকাশ পেয়েছিল এবং লোকের মধ্যে এই

একটা আলোড়নের সৃষ্টি করে দাঁড়াইল। আমি আহ্বানটি গ্রহণ করলাম এবং বললাম যে শিক্ষা ও স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন বিভাগদুটি আমি নেতে চাই। লর্ড রোনাল্ডশে বললেন যে সেক্রেটারিয়েটের কাজের জন্য ঘরগুলির যে ব্যবস্থা রয়েছে তাতে এই দুটি দপ্তরকে একত্রে একত্র রাখা সম্ভব নয়।

তিনি তাঁর প্রাইভেট সেক্রেটারী মিঃ গর্ডনকে ডাকলেন এবং তাঁর কাছ থেকে দপ্তর বণ্টনের একটি ফর্দ্দ বা তালিকা নিয়ে তা আমাকে দেখালেন এবং বললেন যে পরে তিনি তা একটা কপি আমাকে পাঠিয়ে দেবেন। আমি বললাম যে আপাতত আমি স্বায়ত্তশাসন দপ্তরেই গ্রহণ করতে রাজী আছি, তবে সেই সঙ্গে আমি গভর্নর বাহাদুরকে অনুরোধ করলাম যে তিনি যেন আমাকে আরও বিবেচনা করে দেখবার জন্য কয়েকটা দিনের সময় দেবার জন্য মনস্থ করেন। সঙ্গে সঙ্গেই সে অনুরোধ মেনে নেওয়া হয় এবং আমি স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন দপ্তর গ্রহণ করার জন্য পরদিন সকালে আমাকে আবার আসতে বললেন। কারণ তিনি নিজে স্বায়ত্ত-শাসনের ব্যাপারে বিশেষ আগ্রহী ছিলেন এবং ঐ কাজটি বহুল পরিমাণে তিনি নিজেই দেখাশুনা করতেন।

আবার সঙ্গে কথাবার্তার সময় গভর্নর একটা প্রশ্ন উত্থাপন করলেন। প্রশ্নটি এই-মন্ত্রীসভায় আর একজন কাকে নেওয়া যায়। কারণ, তিনি আগেই স্থির করে রেখেছেন যে তিনজন মন্ত্রী নেওয়া হবে দুজন হিন্দু, একজন মুসলমান। আমি নির্দ্বিধায় মিঃ পি, সি, মিটারের নাম বললাম। লর্ড রোনাল্ডশে এই প্রস্তাবে কেবলমাত্র এইজন্য একটু দ্বিধাবোধ করছিলেন যে মিঃ মিটার একজন শিক্ষা-ব্রতী ছিলেন। আমি তাঁকে বুঝিয়ে বললাম যে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্যেকটি গ্রাজুয়েটই অল্পাধিক পরিমাণে আমাদের শিক্ষা সমস্যার সঙ্গে পরিচিত, আর মিঃ মিটার বেশ কয়েক বছর ধরে কলকাতার একটি বৃহত্তম শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সাউথ সুবারবান স্কুলের সেক্রেটারী ছিলেন। তাছাড়া সে সময়ে তিনি ম্যাট্রিকুলেশন পর্যন্ত ছাত্রদের শিক্ষা ও দিয়েছেন। তার কথাবার্তার ভাবে বুঝেছিলাম যে শিক্ষা বিভাগে পারদর্শী কোন একজনকে মন্ত্রী নিয়োগ করার ইচ্ছা তাঁর মনে ছিল এবং এ ব্যাপারে কাউন্সিলে নির্বাচিত সদস্যগণের বাইরে অন্য লোকের কথাও তিনি ভেবেছিলেন। আমি তাকে স্পষ্ট করে জানালাম যে সে কাজটি স্ট্যাটিউটের অভিপ্রায় বিরোধী হবে। মনে হল যেন তিনি আমার কথা মেনে নিলেন।

মুসলমান মন্ত্রী কে হবেন, সে বিষয় তিনি কিছুই বললেন না। এর কিছুদিন আগে তাঁর সঙ্গে আমার আর একবার কথাবার্তার সময় তিনি ডাঃ আবদুল্লা সাহরাওয়ার্দির প্রসঙ্গে বলেছিলেন যে তিনি একজন উচ্চ কৃতীর অধিকারী বুদ্ধিজীবি মুসলমান। বাংলা সরকার ডাঃ সাহরাওয়ার্দিকে ফ্রাঞ্চাইজ কমিটিতে এবং কো-অপটিভে যেভাবেই নিয়োগ করেছিলেন। মিঃ পি, সি, মিটারও ফ্রাঞ্চাইজ কমিটিতে একজন একটি পদে ছিলেন। কিন্তু ইতিমধ্যে অসহযোগ মুসলমান নেতাগণ যখন খিলাফৎ আন্দোলনের প্রবল বাহ্যা স্রোতে চালিত হয়ে অসহযোগ আন্দোলনের আসল কোনটাকে ধরবেন ঠিক করতে পারছিলেন না। ঠিক সেই সময় নবাব নবাবালি চৌধুরী নিজ নামে অসহযোগের বিরুদ্ধে এক চমকপ্রদ প্রচারপত্র প্রকাশ করলেন। সেই প্রচারপত্রে তিনি অসহযোগের বিরুদ্ধে যেন একজন পাকা চিন্তাশীল ব্যক্তির মতই বিচার বুদ্ধির নৈপুণ্যসহ এক শক্তিশালী ওকালতী যুক্তি খাড়া করেন যে এই রকম এক মুহূর্তে তার মত একজন পদস্থ মুসলমান নেতার নামে প্রকাশিত হওয়ায় তা অবশ্যই বিরাট উৎপাদনে সক্ষম হল। লর্ড রোনাল্ডশে পূর্ববঙ্গের কোন প্রতিনিধিকে একজন মন্ত্রী করতে চেয়েছিলেন। ইনি হচ্ছেন সেদেশের সেই অঞ্চলের একজন উচ্চ শ্রেণীর সামাজিক মর্যাদার অধিকারী মুসলমান ভদ্রলোক যিনি সুস্পষ্টভাবেই মনো-ভাবকে কোনরূপ গোপন না রেখে সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা করে শাসন সংস্কারের কাজ করতে চান। রাজনীতিতে সাহস হচ্ছে একটা মূল্যবান গুণ সন্দেহ এবং নবাব সাহেব সে গুণ প্রদর্শন করেছেন। তাই আমি যখন সংবাদ পত্রে এই ঘোষণা বাণী পাঠ করলাম যে নবাব

নবাবালি চৌধুরীকে মন্ত্রীপদে নিয়োগ করা হয়েছে, তখন আমি তাতে বিস্মিত হইনি।

আমরা যারা তার হিন্দু সহযোগী ছিলাম তাদের সঙ্গে তার ব্যক্তিগত সম্পর্ক ছিল বন্ধুত্বপূর্ণ। শুধু তাই নয়। সে সম্পর্ক ছিল আন্তরিকতাপূর্ণ এবং মোটামুটি ভাবে সরকারী কাজকর্ম পরিচালনার ব্যাপারে আমাদের মধ্যে একটা সাধারণ ঐক্যমত ছিল। আমরা প্রায়ই এক সঙ্গে কাজ করেছি এবং একে অন্যকে সাহায্য করতে চেষ্টা করেছি। এজন্য আমাদের কোন চুক্তিতে আবদ্ধ হতে হয়নি যা আমাদের প্রতিবেশী প্রদেশে করতে হয়েছে। এখানে আমাদের ব্যক্তিগত সম্পর্ক এমন সন্তোষজনক ছিল যে ঐ রকম কোন চুক্তিতে আবদ্ধ হওয়ার প্রয়োজনই হয়নি। আমাদের পারস্পরিক বিশ্বাস ও নির্ভরশীলতা সরকারী কর্তব্য পালনে আমাদের এই মিলনকে সিমেন্টের মত মজবুত করে রেখেছিল। পারস্পরিক সহিষ্ণুতা ও বিবেচিত সহকারী উচ্চ কার্যা সম্পাদনের ক্ষেত্রে আমাদের এই মিলন ছিল স্বতঃস্ফূর্ত ও আন্তরিক। এই ঐক্য বিভেদ সৃষ্টিকারী সাম্প্রদায়িক শক্তিগুলির দুর্বলতার সাক্ষ্য বহন করছে।

কেবলমাত্র একটি ব্যাপারে আমাদের মধ্যে লক্ষ্য করার মত একটি মস্ত পার্থক্য ছিল এবং সে পার্থক্য মন্ত্রী হিসাবে আমরা যৌথভাবে কাজ করার মধ্য দিয়ে যে ব্যবহারিক জ্ঞান লাভ করেছি, তা সত্ত্বেও ছিল। সে পার্থক্যটি ছিল সাম্প্রদায়িক প্রতিনিধিত্বের প্রশ্নকে কেন্দ্র করে। নবাব সাহেব এবং এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলের সদস্য তার আবদুর রহিম—এরা দুজনেই ছিলেন সাম্প্রদায়িক প্রতিনিধিত্বের সক্রিয় এবং পূর্ণমাত্রার সমর্থক। আমরা হিন্দুমন্ত্রীরা ছিলাম মনে প্রাণে এর বিরোধী। এ ব্যাপারে মুসলমান সহকর্মিগণ আমাদের সঙ্গে কোনরূপ আলোচনায় রাজি ছিলেন না। অপরপক্ষে আমরা বংশগত প্রকৃতি সহ মানিয়ে চলার ঐতিহ্য বোধের দ্বারা চালিত হয়ে এ রকম একটা মৌলিক বিষয়েও আলোচনা করার মনোভাব প্রকাশ করেছি এই ভেবে যে তাতে সাম্প্রদায়িক প্রতিনিধিত্বের শেষ পর্যন্ত বিলুপ্ত সাধনের যে লক্ষ্য আমাদের আছে সেই লক্ষ্যে পৌঁছবার পথ আরও নিকটবর্তী হবে। অনতিকাল পূর্বে নবাব আলি চৌধুরী ও আমি দুই বিরোধী শিবিরে বিভক্ত হয়ে পড়েছিলাম। আমি ছিলাম বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের নেতা। আর তিনি ছিলেন বঙ্গভঙ্গের সমর্থনে একজন বিশেষ উৎসাহী ব্যক্তি। কয়েক বছর এইভাবে আমরা একের সঙ্গে অপরে লড়াই করেছি। কিন্তু মন্ত্রীরূপে কাজ করার সময় আমাদের সেই সংগ্রামের কোন রেশ আমরা টানিনি। আমরা দুজনেই সেই অতীতের কথা ভুলে যেতে ও একে অপরকে মার্জনা করে আমাদের সামনে যে একই ধরণের কাজ রয়েছে খুশী মন নিয়ে একত্রে তা সম্পাদন করে চলেছি। আমাদের উভয়েরই সাধারণ কাজ হল এমন এক চূড়ান্ত ফল স্বরূপে হিন্দু ও মুসলমান উভয়েরই সমান কল্যাণ সাধন করবে।

নবাব সাহেবকে মন্ত্রী নিযুক্ত করার কোন কোন মহলে যে অসন্তোষের সৃষ্টি হয়ে ছিল সে কথা গোপন করে যাওয়ার কোন প্রয়োজন নেই। এই নিয়োগে কিছু সংখ্যক মুসলমান নেতা ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন। তারা ভাবলেন যে এই রকম একজন লোক যিনি হয়ত বিচারকের যোগ্যতায় তাদের সমকক্ষ নন, তিনি কিন্তু তাদের ছাপিয়ে এই রকম একটা উচ্চ সম্মান ও বিশ্বাসের পদ পেয়ে গেলেন। তাদের এই মনোভাব স্বাভাবিক হলেও তাকে হয়ত সঙ্গত বলা যায় না। উচ্চস্তরের লেখাপড়া জানা থাকলেই—সে প্রাচ্যদেশেই হোক বা পাশ্চাত্য দেশেই হোক, কিংবা দু-অঞ্চলের শিক্ষাই হোক—তাকেই যে প্রশাসনিক কাজের যোগ্য অধিকার বলে ধরে নিতেই হবে, তা বলা যায় না। রাষ্ট্র পরিচালনার যোগ্যতা একটা বিশেষ প্রকৃতি সম্ভূত গুণ। সে গুণ কোন কোন সময়ে স্বাভাবিকভাবেই প্রকাশ পায়। তবে প্রায়শঃ তা সাধারণ জ্ঞান সব কিছুর পরিণাম দর্শিতার দ্বারা উপযুক্ত হয়ে ওঠে উদার দৃষ্টিকোণ থেকে সব কিছুকে দেখার মধ্য দিয়ে প্রশস্ত হয় এবং জ্ঞানের সর্বোচ্চ ধারার স্বীকৃতির দ্বারা প্রভাবিত হয়। ফ্রেডারিক দি গ্রেট সম্পর্কে একথা বলা হয়ে থাকে যে তিনি কখনও তাঁর মূল মন্ত্রীকে কোন প্রশাসনিক কাজে

মুক্ত করবেন না আর একটা কারণও আছে এবং তা আমি মহান ব্যক্তিদের কাছে শুনেছি। তিনি বলেছেন যে প্রথম দিকে বাংলায় যে সমস্ত লেপ্টেন্যান্ট গভর্নর কাজ করেছেন তাদের মধ্যে একজন ছিলেন তিনি কোন মূল ব্যাপারকে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের পদে নিযুক্ত করতে চাইতেন না। তবে সেই মহান পণ্ডিতের দাবীর চাপে পড়ে কেবল মাত্র একটি ক্ষেত্রে তার নীতির ব্যতিক্রম করতে রাজি হয়েছিলেন

এই প্রসঙ্গে একথাও ভুললে চলবে না যে এশিয়ার যেন কয়েকজন শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি নিরক্ষর ছিলেন মহম্মদ এবং আকবর, শিবাজি এবং রণজিৎ সিং, লোজং সিং এবং বাহাদুর—এরা যে উজ্জ্বল মানব জ্যোতিষ্ক মণ্ডল সৃষ্টি করেছেন পৃথিবীতে সবাপেক্ষা গৌরবান্বিত তাদের বিদ্বৎসোজীর মধ্যেও সে রকম দেখা যায় না। আমরা কৃষ্টিকে অবজ্ঞায়িত করে দেখতে চাই না। কিন্তু আমাদের দেখতে হবে যে কোন কৃষ্টির বহুখানি মূল্য আছে তার চেয়ে বেশী মূল্য যেন তাকে দিয়ে না ফেলি। একজন সহকর্মীর প্রশাসনিক যোগ্যতা সম্পর্কে কোন অভিমত ঘোষণা করার কাজ অবশ্য আমার নয় কিন্তু প্রদেশের সর্বোচ্চ অফিসার অর্থাৎ স্বয়ং গভর্নর সাহেব নিজেই তার সম্পর্কে মুচ্ছার সহিত প্রশংসা সূচক মন্তব্য লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন। ঠিক একই রকম অভিমত তিনি প্রকাশ করেছেন আমার হিন্দু সহকর্মী মিঃ (অধুনা স্যার) প্রভাস চন্দ্র মিটার সম্পর্কে। তবে তার যোগ্যতা, তার কর্ম দক্ষতা, এমন কি তার কৃষ্টি সম্পর্কেও অবশ্য কখনই কোন প্রশ্ন ওঠেনি। তথাপি কাউন্সিলের একজন মেম্বার এইরূপ মুক্তব্য করেন যে তাকে ফেলে কিনা মিঃ মিটারকে এই অত্যাবশ্যক সেবা দেওয়া হয়েছে এবং সেজন্য তিনি আমার উপর দোষারোপ করেন। আমি সেজন্য বিন্দুমাত্র বিচলিত না হয়ে তা মেনে নিয়েছি এবং কৌতুকের হাসি হেসে সে অভিযোগ গ্রহণ করেছি।

আমার বক্তব্য বিষয় নিয়ে আরও অগ্রসর হওয়ার আগে এখানে একটা সময়ের জন্য থেমে গিয়ে লর্ড রোনাল্ডসের সঙ্গে আমার সম্পর্ক নিয়ে দু'চার কথা বলে নেওয়া দরকার। তাঁর সঙ্গে আমার সম্পর্ক কি করে গড়ে উঠলো, তার খোঁড়ার কথাটুকু এখানে একটু প্রসঙ্গ টানতে চাই। একটু পিছিয়ে বলতে গেলে আমি বলতে পারি যে এই সম্পর্কের সূত্রপাত হয় বিরোধ ও বিতণ্ডার ধুম্র দিয়ে। তবে সুখের বিষয়, অন্ততঃ আমার দিক থেকে বলতে পারি, যে তা পরিবর্তিত হয়ে ক্রমে সেই প্রাক্তন বাংলার গভর্নরের প্রতি আমার ব্যক্তিগত শ্রদ্ধা ও সম্ভ্রমে পরিণতি লাভ করে। এ বিরোধটা আমাদের উপর চাপান হয়েছিল। আমরা নিজেরা কিন্তু এ জন্য দোষী নই। যা লিখে রাখা যায় তা থেকে যায়- এবং তা মনে থাকে। লর্ড রোনাল্ডসে তাঁর প্রাচ্য দেশ ভ্রমণের উপর একখানা বই লিখেছেন। সেই বইয়ে তিনি প্রাচ্য জাতি সমূহের মৈত্রিক আচরণ বিধি সম্পর্কে অপমান জনক ভাষায় উল্লেখ করেন। লর্ড কার্জন প্রাচ্য জাতি সমূহের চরিত্রকে অবমাননা করে যে উক্তি করেছিলেন এই নিন্দাবাদও ঠিক সেই ধরণেরই হয়েছিল লর্ড কার্জনের সেই উক্তি আমাদের দেশবাসীর সেই উক্তি আমাদের দেশবাসীর মনে অসন্তোষের সৃষ্টি করেছিল এবং তা নিয়ে স্বর্গীয় স্যার বাল বিহারী ঘোষের সভাপতিত্বে টাউন হলে এক বিক্ষোভ সভার অনুষ্ঠান হয়েছিল। সেই কার্জন শিক্ষা ও নীতির ধারক এক রাষ্ট্রনীতিবিদ ব্যক্তি আমাদের বাংলা প্রদেশের প্রধান কর্মকর্তা রূপে থাকবেন এটা কল্পনাতীত একটা আশঙ্কার বিষয় বলে মনে হল। সারা পত্র সমূহ এবং গণপ্রতিষ্ঠান গুলিও আতঙ্কিত হয়ে উঠলো। বিষয়টি ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসন গ্রহণ করল এবং তার পক্ষ থেকে আমি তৎকালীন ভারত সচিব মিঃ মর্লির চেয়ার লেবের নিকট টেলিগ্রাম করে তার নিয়োগ বাতিল করতে অনুরোধ জানালাম। এ এক নজির বিহীন অনন্য সাধারণ প্রস্তাব। ভারতের কোন গণ-প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে এই রকম প্রস্তাব এই প্রথম। কিন্তু দেশের লোকের মনে আশঙ্কার ভাব খুবই বেড়ে গিয়েছিল এবং আমরা আমার আমাদের অনুরোধ। ব্যাপারেও প্রাদেশিক জীবনে কার্জনী শাসন নতুন করে দেখা দেওয়ার সম্ভাবনায় খুবই উদ্বেগ বোধ করেছি। আমি স্যার উইলিয়াম ওয়েডার বার্নের কাছেও অনুরূপ এক টেলিগ্রাম করলাম। স্যার উইলিয়াম ওয়েডার বার্ন ছিলেন ভারতীয় রাজনীতির ক্ষেত্রে বিজ্ঞ নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি। তিনিই ছিলেন লণ্ডনে ভারতীয়

জাতীয় কংগ্রেসের ব্রিটিশ কমিটির চালক শক্তি। স্যার উইলিয়াম ভারত সচিবের সঙ্গে যোগাযোগ করলেন, এবং আমি যদি ঠিক ভাবে স্মরণ করে থাকি, লর্ড রোণাল্ডসের সঙ্গেও সংযোগ করেছিলেন এবং তার কাছে থেকে এক আশ্বাস বাণী লাভ করেন। আমার বিশ্বাস ইষ্টইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসনের এক সভায় তিনি তার ভাষণে এই আশ্বাস বাণীর পুনরাবৃত্তি করেন। বিষয়টা এখানেই শেষ হয়ে যেতে পারত। কিন্তু সব সিভিলেই মরিয়া প্রকৃতির কিছু লোক থাকে। তাই একবার যখন মনের বিক্ষুব্ধভাব মেটে উঠে তাকে সংযত করা বা নিয়ন্ত্রণে আনা বড় কঠিন ব্যাপার হয়ে পড়ে। এমন কি এ রকম একটা প্রস্তাবও এসেছিল যে আমারা এক প্রকাণ্ড বিক্ষোভ প্রদর্শনের ব্যবস্থা করব। তবে আমি জোর চাল সৃষ্টি করায় সে চিন্তা পরিহার করা হল এবং পরবর্তী কালে যা ঘটেছে তার পরিপ্রেক্ষিতে এই চিন্তা ত্যাগ করা যে বুদ্ধিমানের কাজ হয়েছিল তা যথেষ্ট পরিমানে প্রমানিত হয়েছে। আমার সামগ্রিক জন-কর্ম জীবনে আমি যে শিক্ষা লাভ করেছি তাতে একথা বলা যায় যে চরম পন্থা—তা তার যতই আকর্ষণ থাকুনা কেন, শেষ পর্যন্ত কোন ফল দেয় না, এবং রাজনীতিতে, এক্ষেত্রে যা কার্লহেমন বলেছেন, আগ-পাছ-বিবেচনা করে কাজ করা হচ্ছে সবচেয়ে বড় ধর্ম।

১৯১৯ সালের ৩১শে মার্চ লর্ড কারমাইকেলের শাসন কাল শেষ হয় এবং তার পরের মাসেই লর্ড রোণাল্ডসে বাংলার গভর্ণর হয়ে আসেন। ১৯১৭ সালের ২০শে আগষ্টের ঘোষণাবাণী তখনও এসে পৌছায় নি। কিন্তু তার লক্ষণ ও ভাবী অগ্রগতি সূচনা দেখে যাচ্ছিলাম।

একটা পরিবর্ত্তন আসন্ন। ভাবী ঘটনা আগেই তার ছায়াপাত করে এবং ১৯৬১ সালের ২৩শে ডিসেম্বর তারিখে আমারই প্রামুখ্যে গঠিত ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসনের এক ডেপুটেশন কর্তৃক প্রেরিত মান-পত্রের উত্তরে তৎকালীন ভাইসরয় লর্ড চেমসফোর্ড বলেছিলেন যে 'যে সমস্ত ক্ষমতা-প্রতিম জাতিগুলির দ্বারা ব্রিটিশ সাম্রাজ্য গড়ে উঠেছে সেই সমস্ত জাতিগুলির সঙ্গে ভারতকে সমান অধিকারী ভোগী রূপে একদিন আমি দেখবো বলে আশা করি। এ বিষয়ে আমি আগ্রহের সহিত আপনাদের সহযোগিতা আহ্বান করছি।' এই উক্তির মধ্যেই ১৯১৭ সালে কথিত সভায় যে ঘোষণা বাণী প্রচারিত হয়েছিল তার পূর্ণাভাস পাওয়া যাচ্ছে। বোঝা গেল যে প্রশাসনিক গতি-প্রকৃতির পরিবর্ত্তন ঘটছে এবং আমরা বড় রকমের সব ঘটনার দ্বার প্রান্তে এসে উপনীত হয়েছি।

এই রকম এক মুহূর্তেই লর্ড রোণাল্ডসে বাংলার গভর্ণর হয়ে এলেন। তিনি এলেন একজন জন-প্রিয় শাসন কর্ত্তার স্থলাভিষিক্ত হয়ে যার কার্যকালের মেয়াদ আরও বাড়িয়ে দিলে বাংলার লোক তাকে স্বাগত জানাত। প্রকৃত এ রকম একথা কথা বার্ত্তাও চলছিল যে তার কার্যকালের মেয়াদ আরও বাড়িয়ে দেওয়ার জন্য আবেদন করা হোক। সত্যিই এই রকম এক আবেদন করার পেছনে বেশ কিছু সংখ্যক লোকের মনোভাব গড়ে উঠেছিল। লর্ড কারমাইকেল ছিলেন। চিন্তা ভাবনার দিক থেকে একজন অগ্রবর্তী ধরণের রাজপুরুষ। ভারতীয়দের আশা আকাঙ্খার প্রতি তার বাস্তবিকই সহানুভূতি ছিল। তার সুস্পষ্ট প্রমানও তিনি দিয়েছেন রয়েল পার্লিয়ামেন্টারী কমিটির নিকট তিনি যে সাক্ষ্য দিয়েছেন তার মধ্যে। তিনি বলেছিলেন যে ভাইসরয় ও ভারত সচিব অনুমোদন করলে তিনি মণ্টেগু চেমসফোর্ড রিপোর্টে যা দিতে চাওয়া হয়েছে তার চেয়েও বেশী দূর এগিয়ে যেতে প্রস্তুত আছেন। শাসনকার্য্য পরিচালনার শক্তি প্রদর্শনের ক্ষেত্রে তিনি খুব উল্লেখযোগ্য কেউ ছিলেন না। এমন কি লেজিসলেটিভ কাউন্সিলে তিনি যখন সভাপতিত্ব করতেন তখন তিনি প্রায় সময়েই ঝিমিয়ে পড়তেন। তবে একথাও স্বীকার করতে হবে যে তখনকার দিনে কাউন্সিলে প্রদত্ত বক্তৃতা গুলির অধিকাংশই কাগজে টাইপ-করা লেখা থেকে পাঠ করা হত বলে শ্রোতাদের উপরে তা একটা গভীর নিদ্রাদায়ক ওষুধের মত কাজ করত। এ ব্যাপারটি বর্ত্তমান কালেও ঘটে থাকে।

আমার মনে আছে, ১৯১২ সালের এপ্রিল মাসে লর্ড কারমাইকেলের বাংলায় আগমনের অল্পকাল পরেই পার্লিমেন্টে কলকাতা মিউনিসিপ্যালটির বিষয় নিয়ে তার সঙ্গে

আলোচনা করি। আলোচনার বিষয় ছিল ওই মিউনিসি-পাল অ্যাক্টের সংশোধন করা। মিঃ পেমে ছিলেন তখন কলকাতা কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান। কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান হিসাবে তার বেশ পরিচিতি ছিল। বিশেষ কর্তব্য সাধনের জন্যই তাকে নিয়োগ করা হয়েছিল। কিন্তু লর্ড কারমাইকেলের কার্যকালে তার কোন কাজই করা হয়নি। ১৯১৭ সালে একটি বিল আনা হয়েছিল, কিন্তু তা প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়, এবং ১৯১৩ সালের আগে এই অ্যাক্টের কোন সংশোধনই হয়নি। যে যাই হোক, লর্ড কারমাইকেলের ব্যক্তিত্ব বাংলার রাজনীতির উপরে একটা গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিল এবং তা এমন সময় সম্ভব হয়েছিল যখন বাংলার রাজনৈতিক শান্তি অত্যন্ত বিঘ্নিত হয়ে পড়েছিল। বাংলার প্রায় প্রত্যেকটি খাতনামা ব্যক্তিই তিনি ব্যক্তিগত বন্ধু হয়ে উঠেছিলেন এবং তারা সকলেই তার সাহস, তার নিরপেক্ষ মনোভাব এবং ভারত-বাসীর উচ্চাভিলাষের প্রতি তার সহানুভূতি দেখে মুগ্ধ হয়েছিলেন। তার মধ্যে ছিল সহযোগের প্রথর কৌশলবুদ্ধি ও স্বাধীনতা প্রিয়তার মিলন ঘটে ছিল। আমার মনে পড়ে তিনি একজন বন্ধুকে বলেছিলেন যে 'আমি নিশ্চয় করে বলতে পারছি না যে আমি যদি একজন বাঙালী হতাম তাহলে এই সমস্ত চরমপন্থীদের মধ্যে কেউ কেউ যা করতে চেষ্টা করছে আমিও তা করতাম কিনা।' একজন কাউন্সিল গভর্নরের মুখে এই রকম সরল, খোলা প্রাণখোলা বিরোধী পক্ষকে নিরস্ত্র করে ফেলল, সাক্ষাৎকারীদের হৃদয় জয় করে নিল এবং বিশ্বাস আকর্ষণ করল। তার ব্যক্তিত্বের ছিল এই মোহিনী শক্তি এবং সেই শক্তি যে প্রভাব বিস্তার করেছে তাই হয়ত সরকারের পক্ষে সর্বাপেক্ষা মূল্যবান সহায় বলে তুলেছে।

এই রকম একজন শাসনকর্তার পদে কার্য ভার গ্রহণ করে জনপ্রিয়তা অর্জন করা খুব সহজ নয়। কিন্তু লর্ড রোনাল্ডসে প্রমাণ করলেন যে তিনি তা পেরেছেন। আশ্চর্যের বিষয়, তার কলকাতায় আগমনের অল্প কিছু কাল পরেই লর্ড রোনাল্ডসের সঙ্গে গভর্নমেন্ট হাউসে সাক্ষাৎ করার জন্য তার প্রাইভেট সেক্রেটারী মিঃ গৌরদের কাছ থেকে আমি এক আমন্ত্রণ লিপি পেলাম। এই আমন্ত্রণের ব্যাপারে কোন মামুলী নিয়ম-পদ্ধতির অনুসরণ করা হয়নি। মামুলী নিয়ম হল, যদি কেউ গভর্নরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চান, তা হলে তার প্রাইভেট সেক্রেটারীকে লিখে সাক্ষাৎকারের জন্য আবেদন করতে হবে। কিন্তু আমার ক্ষেত্রে মিঃ গৌরদে বা গভর্নর নিজেই উদ্যোগী হয়ে এই সাক্ষাৎকারের ব্যবস্থা করেন। এ রকম এক আহ্বান বার্তার মানেই হল আদেশ বার্তা, এবং আমি যথা নির্দিষ্ট দিনে এবং সময়ে গভর্নমেন্ট হাউসে উপস্থিত হলাম। আমাকে বেশ শুভ্রভাবে সৌজন্যের সহিত গ্রহণ করা হল এবং আমার এই সাক্ষাৎকারের পুরা সময়ের মধ্যে আমি তারত সচিব এবং তার উইলিয়াম প্রেস্টারম্যাপের নিকট যে তার বার্তা প্রেরণ করেছিলাম তার বিন্দুমাত্রও উল্লেখ করা হয়নি সরকারীর পরিস্থিতির উপর সাধারণ বিষয়গুলি নিয়ে আমাদের মধ্যে কথাবার্তা হয় এবং এই আলোচনার পর লর্ড রোনাল্ডসে সম্পর্কে আমি বাস্তবিকই এক পরিবর্তিত ধারণা নিয়ে ফিরে আসি। এটাই ছিল তার সঙ্গে আমার প্রথম সাক্ষাৎকার। তারপরে, আরও অনেকবার তার সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়েছিল এবং সে সমস্ত সাক্ষাৎকারই এই সাক্ষাৎকারের মতই আনন্দদায়ক হয়েছে।

(ক্রমশ)

Freedom fighters whose pension has been sanctioned

Name	Address	Amount p. m. Rs.	Date
	September—1980		
	Dist —C \LCUTTA		
Roy Rabindra Nath	Pan Bagan Lane	200	9 2 76
	Calcutta—14	& 300	& 1 8 80
	Dist—MIDNAPUR		
Sinha Smt Nagendra Bala	Vill Chenegarh	100	7 8 77
w/o Late Lakshmi Narayan	P. O. Haur	& 200	& 1 8 80
Senapati Smt Jyotsna & Km Aloka	Vill Bardhanu	100	14 11 79
w/o Late Kedar Nath	P.O. Routmani	200	1 8 80
		& 500	& 14 11 79
	Dist—HOWRAH		
Mukherjee Amar	15/2 Haldarpara Lane	200	3 3 79
	P O. Shibpur	& 300	& 1 8 80
Sarkar Radhika Mohan	S. E. Rly. Qr, No. B/43,	200	15 8 72
	Unit-4, Santragachi	&	&
	P. O, Jagachha	300	1 8 80
	Dist—BIRBHUM		
Bhattacharjee Smt Rekha	C/o Irrigation Colony, P.O. Suri	200	1 8 80
w/o Late Amiya			
	Dist—24 PARGANAS		
Chakraborty Narayan	338/1, Ashokenagar	200	14 1 80
		& 300	& 1 8 80
Mukherjee Anil Chandra	Chakdah Road	200	21 1 74
	Bongaon	& 300	& 1 8 80
	Dist—JALPAIGURI		
Maitra Smt Tultuli & Km Khuku	238, Pandapara Colony	100	18 2 80
w/o Late Sudhir Ch.	P. O. Jalpaiguri	200	1 8 80
		& 50	18 2 80

RegdNo. K. N. 24511 | Biplabi Bangla | Phone : 34-1795 | RegJ. W B/NC 77

সাধারণ :—সডাক ১৫.০০ টাকা | ষাণ্মাসিক :—৮.০০ টাকা | মূল্য—৩০ পয়সা

C/30

বিপ্লবী পুস্তকমালা

নেতাজীর সিক্রেট সার্ভিস — ডাঃ পবিত্রমোহন রায়—২০.০০

ক্ষীরোদ কুমার বসুর—

১। [illegible]
২। বহির্ভারতে ভারতীয় বিপ্লব প্রচেষ্টা—৮.০০
৩। [illegible]
৪। পৌষাটী সংগ্রাম কাহিনী—১.০০
৫। কাকোরী ষড়যন্ত্র—১.২৫
৬। কলকাতা বাজার সংগ্রাম কাহিনী—.৪০
৭। বাসবিহারী ও অভিনব সমিতি—.৬০
৮। স্বাধীনতার শহীদ মা ও মেয়ে—.৪০
৯। বিবেকানন্দ ও সমাজবাদ—.৬০
১০। বিপ্লবী বিবেকানন্দ—.৪০
১১। মহাবোধি ও সুভাষচন্দ্র—.৫০
১২। ভারতের নবজাগরণ ও ভগিনী নিবেদিতা—.৭৫
১৩। দেশ বন্ধুর চোলোর (১)—১.০০
১৪। দেশ বন্ধুর চোলোর (২)—১.০০
১৫। শহীদ চন্দ্রশেখর আজাদ—.৫০
১৬। ১৯৩ এপ্রিল আসীম শহীদ দিবস—১.০০
১৭। হাজির হত্যা প্রচেষ্টা—.১৫
১৮। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও অনুশীলন সমিতি—৪.০০
১৯। ভারতের জাতীয় পতাকার ইতিহাস—.৪০
২০। লাট হত্যা প্রচেষ্টা—১.৫০

প্রাপ্তিস্থান :—৩৩ বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০০৭

নৈশলক্ষ্মী—১/১/১/A বঙ্কিম চাটার্জী ষ্ট্রীট কলিকাতা-৭৩

— সম্পাদক মণ্ডলী —

শ্রীঅরবিন্দ চট্টোপাধ্যায় (সভাপতি) শ্রীঅমলেন্দু মন্ত্রী, শ্রীপুলিন চাটার্জী

সম্পাদক—শ্রীসতি পদ রায়চৌধুরী

বিপ্লবী বিশেষ প্রতিনিধি—শ্রীবাদল ঘোষ। বেতার—শ্রীমনগোপাল পাল।

প্রকাশক ও মুদ্রক :—শ্রীঅনিল সেনগুপ্ত। প্রচার সচিব—শ্রীসুরেন্দ্র সোম।

বিপ্লবী বাংলা কার্যালয় :—৩৩ বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০০৭

মুদ্রণে:—প্রিন্টিং সার্ভিসেস ১১৭ এ কেশব সেন ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৭০০০০৯

বিপ্লবী বাংলা

বিপ্লবী পরিষদের সাপ্তাহিক মুখপত্র
স্থাপিত—১৯৫৬, 'বিপ্লবী বাঙ্গালী' নবকলেবরে—১৯৭১

দশম বর্ষ	শনিবার ২৯শে কার্ত্তিক ১৩৮৭ ১৫ই নভেম্বর ১৯৮০	৬ষ্ঠ সংখ্যা

CALCUTTA UNIVERSITY CENTRAL LIBRARY

আমাদের রাজনৈতিক দর্শন কি? এই প্রশ্নের জবাব আমি দশ বৎসর আগে আমার লেখা বই 'দি ইণ্ডিয়ান ষ্ট্রাগল'-এ দিয়েছি। সেই বইতে আমি বলেছি যে, আমাদের ভারত-বাসীদের কর্ত্তব্য হবে এমন একটি রাজ-কায়েম করা যেখানে পৃথিবীর বিভিন্ন ভাবধারার সমন্বয় ঘটবে।

—নেতাজী

সম্পাদকীয়

"কাণ্ডারী হুসিয়ার"

সারা ভারতে বিভিন্ন স্থানে নানা প্রকার সমস্যা মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে অত্যন্ত উদ্বেগজনক ভাবে। কোথাও জাতপাত উপলক্ষ করে, কোথাও সাম্প্রদায়িকতার পুনরাবির্ভাব ঘটিয়ে, কোথাও বা সঙ্কীর্ণ আঞ্চলিকতা এবং প্রাদেশিকতার প্রশ্রয়তুলে, দেশের সংহতি ও ঐক্যকে বিপন্ন করা হচ্ছে। দেশের রাজনৈতিক, অর্থ-নৈতিক ও শিক্ষার ক্ষেত্রেও অগ্রগতির পথকে রুদ্ধ করা হচ্ছে। এক কথায়, দেশের সর্বাঙ্গীন উন্নতির প্রচেষ্টাকে ব্যাহত করে দেশের ভবিষ্যৎকে অন্ধকারাচ্ছন্ন করে তুলছে। দুঃখের কথা, লজ্জার কথা, ক্ষোভের কথা যে এই সর্বনাশা প্রচেষ্টার পেছনে মদত দিচ্ছে এ দেশেরই কোন কোন প্রতিষ্ঠান। পর্দার আড়ালে আছেন একদল মানুষ যারা এর ভেতর দিয়ে রাজনৈতিক ফয়দা তুলতে সচেষ্ট। অবশ্য বিদেশেরও অদৃশ্য হাত এর পেছনে কাজ করছে, একথা বলছেন সরকারী উচ্চমহলে অধিষ্ঠিত কেউ কেউ। কিন্তু খুব স্পষ্ট করে দেশের মানুষকে কেন জানিয়ে দেওয়া হচ্ছেনা এই সব দেশ বৈরী প্রতিষ্ঠান দলও তাদের নেতাদের নাম? মুখোস খুলে গিলেত তাদের পরিচয় লোকেরা জেনে যাবে এবং তাদের অশুভ প্রভাবও অনেকটা হ্রাস পাবে। তা ভিন্ন, আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নিতে কোন গড়িমসি করা উচিৎ হবে না। সাধারণ মানুষকে ভুল বুঝিয়ে যারা বিপথে চালিত করছে এবং দেশের সর্বনাশ করছে ব্যক্তিগত সুখসুবিধা লাভের জন্য, তারা ত ক্ষমার অযোগ্য। কঠোর শাস্তিই তাদের একমাত্র প্রাপ্য। এর মধ্যে দীর্ঘসূত্রতার কোন স্থান নেই। শুধু কয়েকজন কর্মচারীকে দায়ী করে, তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিলেই দেশ থেকে এই সর্বনাশা বীজকে ধ্বংস করা যাবে না। মৌলনীতির পরিপ্রেক্ষিতে আমূল সংস্কারের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। গোজামিল দিয়ে কোন কাজই হবে না।

অতীত ইতিহাস আলোচনা করলে এই সত্য প্রমাণিত হবে যে সাম্প্রদায়িকতা, জাতিভেদ, আঞ্চলিকতা প্রভৃতির মত সমস্যাগুলির মোকাবিলা যথাযথভাবে করা হয় নি। নীতিকে বাদ দিয়ে সম্প্রদায় বিশেষকে তোষণ করার ফলে, দেশ বিভাগকেই বাধ্য হয়ে স্বীকার করে নিতে হয়েছে। তার পরেও নেতাদের চৈতন্যোদয় হয়েছে বলতে পারলে সকলেই খুসী হত। এতদিন একটা সম্প্রদায়ের আব্দার মেনে নেওয়া হয়েছে। তার সঙ্গে যুক্ত হচ্ছে, হরিজন, তফসিলভুক্ত জাতি, উপজাতি প্রভৃতিকে তোষণ করার একটা মানসিকতা ও প্রচেষ্টা। অনুন্নত যারা, তাদের উন্নতির জন্য সর্বরকম প্রচেষ্টা করা প্রত্যেক স্বাধীন দেশেরই অবশ্য কর্তব্যকর্ম। কিন্তু তার অর্থ এই নয়, যে তাদের নৈতিক, আর্থিক, শিক্ষাগত ও সংস্কৃতিগত উন্নতিসাধন না করে, তাদের জন্য (যোগ্যতার মানদণ্ডকে ত্যাগ করে) বিভিন্ন কয়েকটি আসন সংরক্ষিত করে রাখা। স্বাধীনতার পর দীর্ঘ তেত্রিশ বৎসর প্রায় পার হতে চলল। আর কতদিন তাদের জন্য এই আসন সংরক্ষণের ব্যবস্থা কায়েম থাকবে? তাদের জন্য সংবিধানের মধ্যে একটা সংরক্ষণের ব্যবস্থা ছিল হয় ত তখনকার অবস্থা বিবেচনা করে এবং সেও মাত্র পনর বছরের জন্য। কিন্তু

তাদের গুণগত উৎকর্ষ কতটা ঘটেছে তার কি কোন হিসাব নেওয়া হচ্ছে? এইভাবে পক্ষপাতমূলক ভাবে সুযোগ সুবিধা দিয়ে, দেশের অন্য সম্প্রদায়ের মানুষকে সম্প্রদায়-সচেতন করে তোলা হচ্ছে, দেশপ্রেমের আদর্শ থেকে বিচ্যুত করে। এখন অবশ্য নতুন সন্ধান পাওয়া যায় একটি আকাঙ্খার মধ্যে। সেটা হল ভোট লাভের আকাঙ্খা। দেশপ্রেমের আদর্শ, দেশের মঙ্গল সাধনের আদর্শ থেকে বিচ্যুত হয়ে এই ভোট লাভের উদ্দেশ্যটাই একমাত্র করণীয় কাজ হবে? তবে ত কেউ বাঁচবে না, এই সহজ সত্যটা কি নেতৃবৃন্দ এবং তাদের দলীয় সভ্য ও অনুগামীরা উপলব্ধি করতে পারছেন না?

সম্প্রতি উত্তরপ্রদেশে সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামার মোকাবিলা করার জন্য একটি ভয়ঙ্কর প্রস্তাব এসেছে? দেশের ভিতর যারা পুলিশবিভাগ, বা সৈন্যদলের মধ্যে আছেন, তাদের বাদ দিয়ে নতুন করে সংখ্যালঘু সম্প্রদায় থেকে লোক নিয়ে একটি বাহিনী গঠন করা হবে। এই দৃষ্টিভঙ্গী কি মারাত্মক হয়ে উঠতে পারে। সেটা কি সরকার ভেবে দেখছেন না? এরই মধ্যে কোন কোন নেতা দাবী রেখেছেন যে তার সম্প্রদায় থেকে এই দলে শতকরা ষাট জন লোক নিতে হবে? অন্য সংখ্যা লঘু দলের লোকেরাও নিশ্চয়ই চুপ করে থাকবে না। তারাও বিশেষ দাবী তুলবে। যেহেতু সবার দাবী মেনে নেওয়া সম্ভব নয়, সেইহেতু এ বিগঠিত বাহিনীর মধ্যে বিরোধ ও বিদ্বেষ থাকবেই। এই অবস্থায় তারা দুষ্কৃতকারীদের মোকাবিলা করবে কিভাবে? তা ভিন্ন, পুলিশ ও মিলিটারীতে সাম্প্রদায়িকতার বীজ বপন করা হবে এই কাজ করলে, মুখে যিনি যতই অস্বীকার করুন। আদৌ কেন সঙ্কীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গীকে স্বীকার করা হবে এবং তাকে লালন পালন করা হবে এটা দুর্বোধ্য। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের লোকদের জন্য যদি বিভিন্ন প্রকার আইন ও ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়, তবে ভারতীয়ত্ব বোধ মুছে যাবে চিরতরে। আর একটি সত্যকেও হৃদয়ঙ্গম করতে হবে নেতাদের এবং সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষের। সংরক্ষিত কয়েকটি আসন রেখে বা পক্ষপাতে দুষ্ট কিছু সুযোগ সুবিধা দিয়ে। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের লোকদের প্রকৃত কল্যাণ সাধন করা যাবে না। তারাও ভারতবাসী, ভারতের অন্যান্য সম্প্রদায়ের লোকদের ভাল মন্দের সঙ্গে তাদের ভাল মন্দ অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। যে বিভেদমূলক ও পক্ষপাত দুষ্ট নীতির জন্য তারা দাবী করছেন, সেই নীতি কিছু দিনের জন্য তাদের কিছুটা সুযোগ সুবিধা দিতে পারে। কিন্তু সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের মধ্যে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করার ফলশ্রুতি হিসেবে। একদিন তাদের উপর বুমেরাং হয়ে ফিরে আসবে। তখন কিন্তু সেই বিপদ থেকে মুক্তি পাওয়া সহজ হবে না।

বর্তমান রাষ্ট্রনায়কদের বুঝতে হবে যে দেশের নায়কদের একটি ভুলের জন্য একটা জাতিকে কি মাসুল দিতে হয় বহুদিন ধরে। দেশবিভাগের ভ্রান্তনীতির ফল আজও দেশের মানুষের রক্তক্ষরণ করছে এবং কবে ও কোথায় এর শেষ, তা কেউ জানেনা। সতর্কতা, সাবধানতা ও গভীরভাবে চিন্তা না করে কাজ করলেই দেশকে সর্বনাশের অতল তলে ডুবিয়ে দেবার পথ প্রশস্ত করা হবে। তাই কাণ্ডারীদের হুসিয়ার হবার সময় এসেছে।

আসাম সংকট কি ভাবে মিটবে?

কালীপদ সরকার

দুই মাস বিরতির পর গত ২৭শে অক্টোবর থেকে আসামে 'বিদেশী' সমস্যার আন্দোলন জোর কদমে শুরু হয়েছে। আন্দোলনের বয়স এক বছর পার হয়ে গেছে, আলাপ আলোচনা কয়েক দফা হয়েছে, মীমাংসার সূত্র খুঁজে পাওয়া যায় নি। মীমাংসা সম্ভব হয় যখন উভয় পক্ষ মীমাংসা চায়, এক পক্ষের চেষ্টায় মীমাংসা হয় না। সরকার নরম সুরে অনেক ভাবে আন্দোলনের নেতাদের বুঝাতে চেয়েছেন, আন্তর্জাতিক চুক্তি, ভারত সরকারের পূর্ব নির্দেশ, আইন, জাতীয় সংহতি এবং মানবিকতা বোধের অলঙ্ঘনীয় দায়দায়িত্বের প্রশ্ন তুলে। ১৯৭১ সালকে ভিত্তি বর্ষ ধরে অথবা কোন ভিত্তিবর্ষের সীমারেখা না টেনে, বিদেশী চিহ্নিত করণের কাজ আরম্ভ করতেও সরকার সম্মতি জানিয়েছেন কিন্তু ভবী ভুলবার নয়। আন্দোলনকারীরা ১৯৫১ সালের জাতীয় নাগরিক তালিকাকে ভিত্তি করে বিদেশী নির্ণয়ের যে দাবী এক বছর আগে করেছিলেন সেই দাবী আঁকড়ে ধরে আছেন।

আসাম থেকে বাঁশ পাট কাঠ বেত গাই উড এবং তেল বাইরে রপ্তানী বন্ধ করা আন্দোলনের পুরাতন কর্মসূচী তো আছেই, অতিরিক্ত যা হয়েছে তা হল আসাম বিধান সভার সদস্যদের ঘেরাও করে রাখা। অবস্থা দেখে মনে হয় যে নির্বাচিত সদস্যবৃন্দ একান্ত ভাবে অসহায়, অথবা স্বেচ্ছায় এই ঘেরাও মেনে নিয়েছেন। আন্দোলন নেতারা চান, বিধান সভার সদস্যবৃন্দ প্রকাশ্যে আন্দোলনের সামিল হোন।

আন্দোলন পুনরায় শুরু হলেও আন্দোলন এবার এক তরফা নয়। ২৭শে অক্টোবরের আসাম বন্ধ পুরোপুরি সফল হয় নি। কাছাড়, পার্বত্য কাছাড় করবি আংলং জেলায় বন্ধ পালিত হয় নি। কামরূপ জেলার মাদিরা, নওগাঁ জেলার লামডিং, ডোবকা লাহারিঘাট, রুপাহি, আমবাগান, ঢিং, জুরিয়া এবং উত্তর আসামে কয়লা ক্ষেত্র মারঘেরিটায় বন্ধ হয় নি।

বন্ধ স্বতঃস্ফূর্ত ছিল না, আন্দোলনকারীরা সর্বত্র পিকেটিং চালিয়েছিলেন এবং বহু স্থানে পিকেটার ও বিরোধীদের মধ্যে হাতাহাতি হয়েছিল। অবস্থা শান্ত করতে পুলিশকে কাঁদুনে গ্যাস ছুড়তে ও কয়েক শত পিকেটারকে গ্রেপ্তার করতে হয়। তবুও বলা যায় যে, আসু ও আসগণ অসমীয়া সমাজের বেশ কিছু বিত্তশালী সহরবাসী নারী পুরুষের উপর তাদের প্রভাব অক্ষুণ্ণ রাখতে সক্ষম হয়েছে। আন্দোলনের প্রবক্তা ও পরিচালকরাও সেই অভিজাত শ্রেণীর মানুষ। তাদের আন্দোলনের পিছনে নীরব সমর্থন ও অভিলাষপ্রিয়তা আরো অনেকের। সে কারণেই আন্দোলনের নেতারা যুক্তি ও রাষ্ট্রবিধি বিধানকে অস্বীকার করে সরকারের প্রতি চ্যালেঞ্জ জানাতে সাহসী হন।

গত ৪ঠা নভেম্বর থেকে সামরিক কর্মীদের সাহায্যে পাইপ লাইনে জমে থাকা তেল সরানোর কাজ চলছে এবং তা বিহারের বারাউনি শোধনাগারে পৌঁছাচ্ছে। জোড়হাটে অশোধিত তেল পাম্প

করার কাজও অব্যাহত আছে। আশাকরা যায় অল্প দিনের মধ্যে আসামে তেল উত্তোলন ও শোধন কার্য পুরোপুরি চালু হয়ে যাবে।

মনে হয়, ভ্রান্তি বিলাস নাটকের অভিনয় শেষ হতে চলেছে। আসাম আন্দোলনের নেতাদের অনমনীয় মনোভাবের পিছনে উত্তর পূর্ব ভারত সীমান্তে হাঙ্গামা জিইয়ে রাখার যে একটি সু-পরিকল্পিত চক্রান্ত বিদ্যমান, সরকার তার তথ্যাদি হাতে পেয়েছেন।

১৪ই নভেম্বর প্রস্তাবিত আলোচনা বৈঠক বসুক আর নাই বসুক, সরকার তার কাজ ঠিক মত যে চালিয়ে যাবেন সে সম্বন্ধে সন্দেহ নেই। সুতরাং আসাম আন্দোলন এখন চূড়ান্ত পর্যায়ে এসে গেছে অনায়াসে বলা যায়।

১৯৫১ সালের আসাম রাজ্যের জাতীয় নাগরিক তালিকাটি কি বস্তু একটু নেড়ে চেড়ে দেখা যেতে পারে। ব্যাপক মুসলিম অনুপ্রবেশের আশংকা করে ১৯৫১ সালে আসাম সরকার সেনসাস কর্মীদের সাহায্যে পরীক্ষামূলক ভাবে একটি জাতীয় নাগরিক তালিকা তৈরী করান। তালিকা তৈরীর সময় বিজ্ঞপ্তি প্রচার, তালিকার খসড়া প্রকাশ ও সংশোধনের কোন দিন তারিখ জানানো হয় না। এই তালিকায় বহিরাগতদের নামই শুধু তোলা হয়, স্থানীয়দের নাম তালিকাভুক্ত করা হয় না। সাংবিধানিক অথবা কেন্দ্রের নির্দেশও ছিল না এই ধরণের নাগরিক তালিকা প্রণয়নে।

১৯৫২ সালের পরে এই নাগরিক তালিকা নিয়ে কোন উচ্চবাচ্য হয় নি। ১৯৪৭ সালে দেশবিভাগের পর থেকে ১৯৭১ সালে ইন্দিরা মুজিব চুক্তি সম্পাদনের কাল পর্যন্ত যে সকল পূর্ব পাকিস্তান ত্যাগী হিন্দু আসামে এসেছে, আসাম সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের অর্থে তাদের অনেককেই আসাম রাজ্যে পুনর্বাসন দিয়েছেন' বাদ বাকিরা নিজেদের চেষ্টায় আসামে বৈধভাবে জমি কিনে ঘরবাড়ি তুলে বসবাস করছে। এই সকল উদ্বাস্তুরা নাগরিক সার্টিফিকেট সংগ্রহ না করলেও ভারতীয় নাগরিকরূপে বিবেচিত হয়েছে এবং ভোটার তালিকায় তাদের নাম অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। ১৯৭৭ এবং তার পূর্ববর্তী সাধারণ নির্বাচনগুলিতে তারা যথারীতি ভোটাধিকারও প্রয়োগ করেছে। ১৯৫১ সালের জাতীয় নাগরিক তালিকার কথা আসাম সরকার অথবা অপর কেউ কোনদিন তুলেন নি, কেউ শোনেও নি। তালিকাটি ছাপানো বা প্রকাশিত হয় নি, ফাইলবন্দী হয়ে সুদীর্ঘ কাল পরিত্যক্ত কাগজের সামিল হয়ে মহাফেজখানায় পড়ে আছে।

১৯৭২ সালের ১০ই ফেব্রুয়ারী সংসদ সদস্য শ্রীরবীন কাকোটি লোকসভায় এক প্রশ্ন তুলে জানতে চান, আসাম মনিপুর ও ত্রিপুরা রাজ্যে মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে আগত বাংলাদেশ ত্যাগী কত উদ্বাস্তু বাস করছে এবং তাদের বাংলাদেশে ফেরত পাঠাবার কি ব্যবস্থা করা হয়েছে। উত্তরে কেন্দ্রীয় পুনর্বাসনমন্ত্রী শ্রী আর, কে, খাদিলকর বলেন, আশ্রয় শিবিরগুলিতে যে বাংলাদেশ ত্যাগীরা ছিল তাদের সকলকেই বাংলাদেশে ফেরত পাঠানো হয়েছে। সামান্য কিছু উদ্বাস্তু যারা আশ্রয় শিবিরে না এসে, আত্মীয় বন্ধুদের গৃহে উঠেছিল, তাদের সকলেই প্রায় বাংলাদেশে ফিরে গেছে।

—লোকসভা ১৭তম খণ্ড।

১৯৭১ সালের পূর্বে যে সকল উদ্বাস্তু আসামে এসেছে, তাদের সম্বন্ধে কেউ কোনদিন ইতিপূর্বে প্রশ্ন তোলে নি। তাদের বিদেশী' বলে বহিষ্কারের কথা কোন অসমীয়া নেতা কল্পনাও করেননি।

১৯৬৮ সালে পূর্বপাকিস্তানে ব্যাপক দাঙ্গাহাঙ্গামা ঘটায় আসামে আগত ১২০০০ উদ্বাস্তু পরিবারকে আসাম সরকার পুনর্বাসন দেন। লোক সভার প্রশ্নোত্তর কালে কেন্দ্রীয় পুনর্বাসন মন্ত্রী শ্রীভগবদ ঝা আজাদ তথ্যটি পরিবেশ করেন।

—লোকসভা বিবরণী ২০।২।৬৯

পুনর্বাসন দেবার বিনিময়ে অর্থই হল নাগরিক অধিকার দান। যাকে নাগরিক হিসাবে গ্রহণ করা যায় না, তাকে কোন রাষ্ট্র তার ভূমিতে পুনর্বাসনও দেয় না। রিলিফ এবং রিহ্যাবিলিটেশন এক কথা নয়।

১৯৬৭ সালে আসাম ও নাগাল্যাণ্ড হাইকোর্টে ১৯৫১ সালের জাতীয় নাগরিক তালিকা সম্পর্কে একটি মোকর্দমা নিষ্পত্তি হয়।

(Second appeal No. 177 of 1967, Assam and Nagaland High Court) হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি জাতীয় নাগরিক তালিকাটি পরীক্ষা করে আদেশ দেন, "This document is not a public document within the meaning of Section 74 of the Indian Evidence Act. It is not sanctioned by any Law and Rule."

এই হল ১৯৫১ সালের আসাম জাতীয় নাগরিক তালিকার আইনগত মূল্য! অথচ প্রফুল্ল মহান্তি ভৃগু ফুকনরা তাকেই তাদের উপপাদ্য বিষয়ের 'ম্যাগনা কারটা' করতে বদ্ধপরিকর। দুর্বুদ্ধি প্রণোদিত বাতুল ছাড়া পরিত্যক্ত পচা অবৈধ এক দলিল নিয়ে এমন হৈ হট্টগোল কেউ কি কখনো করে?

আন্দোলনকারীদের অপর অভিপ্রায় সুস্পষ্ট, তারা যেন তেন প্রকারেণ আসাম থেকে বাঙ্গালী হিন্দুদের উৎখাত করতে চান। তারা অন্ধ বিচ্ছিন্নতা বোধের শিকার হয়ে ভুলে যান যে, আসাম ভারতের অঙ্গরাজ্য এবং আসামে যে কোন ভারতীয়ের আয় উপার্জন বসবাসের পূর্ণ অধিকার আছে।

আসাম সরকারের একটি বিবৃতি ১৯৮০ সালের ৩১শে মার্চ আসাম ট্রাইবুন পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। বিবৃতিটি এ সম্পর্কে প্রণিধানযোগ্য।

"So far as the members of the minority Community of erstwhile East Pakistan who have migrated into Assam before 1971 are concerned, there are already policy decisions laid down right upto 1969 to register them as Indian Citizen provided they fulfil the conditions laid down in Rule 9 of the Citizenship Rules. (i. e. permanently settled). These refugees have been accepted for all purposes as citizens. Not only have many of them have been rehabilitated by the Governments themselves in agriculture, trade, industries, etc. They are, therefore. foreign nationals only in the purely technical sense that they have not applied for and secured registration as citizens of India."

পাকিস্তান ত্যাগী উদ্বাস্তু হিন্দুদের ভারতীয় বলে গ্রহণ করতে কোন ভারতীয় কখনো দ্বিধা বোধ করেনি

(৫৫ পর ১৫ পাতায় দেখুন)

ভারত বিপ্লব আন্দোলনের ইতিহাস

॥ ক্ষীরোদ দত্ত ॥

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

কানপুরে ভগৎ সিং যোগেশচন্দ্রের সঙ্গে একই মেসে থাকতেন। যোগেশচন্দ্র যুবকের নতুন উদ্যমকে নতুনভাবে বৈপ্লবিক প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ করে তুলতে লাগলেন।

পূর্বেই বলা হয়েছে, শচীন্দ্রনাথ মহারাজের নিকট যুক্তপ্রদেশ সংগঠনের জন্য কিছু অস্ত্রশস্ত্র চেয়েছিল। মহারাজ শচীন্দ্রনাথকে কয়েকটা রিভলবার দেন। এই সময় তিনি শচীন্দ্রনাথকে বলেন, প্রয়োজন অনুযায়ী যত ইচ্ছা রিভলবার দেওয়া সম্ভব নয়। তবে বোমা প্রভৃতি প্রস্তুত ব্যাপারে কিছুটা সাহায্য করা যেতে পারে। এজন্য তিনি বোমা প্রস্তুত করবার জন্য দক্ষিণ কলকাতার তরুণ কর্মী যতীন্দ্রনাথ দাসকে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিয়ে শচীন্দ্রনাথের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন। যতীন্দ্রনাথ দাসকে পেয়ে যুক্তপ্রদেশে চারটি বিভিন্ন স্থানে চারটি বোমা প্রস্তুত কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা হল। যতীন্দ্রনাথ মাঝে মাঝে কলকাতা থেকে এই সমস্ত কেন্দ্রে গিয়ে বোমা তৈরী শিক্ষা দিয়ে আসতেন। এইভাবে তিনি যাদের বোমা তৈরী শিক্ষা দিয়েছেন তাদের মধ্যে ভগৎ সিং একজন। ভগৎ সিং যখন কানপুরে আসেন তখন তার বয়স ছিল মাত্র সতের বৎসর। যোগেশচন্দ্র তাকে একজন প্রকৃত বিপ্লবী করে তোলেন।

এই সময় কানপুরে বলশেভিক মামলা চলছিল। আসামী ছিলেন নলিনী গুপ্ত, ডাঙ্গে, মুজফ্ফর আহম্মদ এবং সৌকত ওসমানী। যোগেশচন্দ্র প্রায়ই বিচার দেখতে আদালতে যেতেন। ফলে কমিউনিজম সম্পর্কে ভগৎ সিংয়ের ঔৎসুক্য বৃদ্ধি পাইতে থাকে। তিনি যোগেশচন্দ্রের নিকট কমিউনিজম, ও রুশ দেশে সাম্যবাদী পার্টি সম্পর্কে নানা কথা জানতে চাইতেন। যোগেশচন্দ্রও তাকে সাম্যবাদের তত্ত্ব যতটা সম্ভব বুঝিয়ে বলতেন। এর ফলে কিছু-দিনের মধ্যে ভগৎ সিং প্রস্তাব দেন যে পার্টির নাম পরিবর্তন করে হিন্দুস্থান রিপাবলিকান পার্টি থেকে হিন্দুস্থান সোসালিষ্ট রিপাবলিকান পার্টি করা হোক।

যোগেশচন্দ্রের উদ্যোগে যুক্তপ্রদেশের বিভিন্ন জেলায় বিপ্লবী সংগঠন সম্প্রসারিত হতে থাকল। রায়বেরিলী, ফরাক্কাবাদ, ইটোয়া, শাহজাহানপুর শিলহিট, লক্ষ্ণৌ, এলাহাবাদ, মীরাট প্রভৃতি ছাব্বিশটি জেলায় বিপ্লব সমিতির শাখাপ্রশাখা ছড়িয়ে পড়ল। রায়বেরিলী জেলায় ভারপ্রাপ্ত কর্মী ছিলেন বনয়ারীলাল। ফরাক্কাবাদ জেলার ভার ছিল যার উপর তিনি শিক্ষকতা করতেন। এ জন্য তাকে ডাকা হত 'পণ্ডিতজী' বলে। শেষ পর্যন্ত তিনি পণ্ডিতজী নামেই পরিচিত হন। ইটোয়া জেলার ভারপ্রাপ্ত কর্মী ছিলেন পণ্ডিত জ্যোতিশঙ্কর দীক্ষিত। পণ্ডিত জ্যোতিশঙ্কর যুক্ত-প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির সেক্রেটারী হয়েছিলেন। তিনি কাশেরী ষড়যন্ত্র মামলায় গ্রেপ্তার হয়েছিলেন। কিন্তু সাক্ষ্য প্রমাণ অভাবে মুক্তি পান। রামপ্রসাদ বিসমিল বিপ্লবী দলভুক্ত হবার পরে শাহজাহানপুরে দলের একটা গুরুত্বপূর্ণ ঘাঁটি প্রতিষ্ঠিত হল। এখানে আসফাকউল্লা এবং ঠাকুর রোসন সিংও

দলভুক্ত হন। বিসমিল, আশফাক এবং রোসন সিং তিন জনেরই কাকোরী ষড়যন্ত্র মামলায় ফাঁসী হয়। বিসমিলের মাধ্যমে মৈনপুরী মামলার আরও দুজন বিশিষ্ট সদস্য দেবনারায়ণ এবং ভগবান সিং বিপ্লবী দলভুক্ত হন। এলাহাবাদে ভারপ্রাপ্ত কর্মী ছিলেন শচীন্দ্রনাথ সান্যালের কনিষ্ঠ ভ্রাতা জীতেন্দ্রনাথ সান্যাল। মীরাট জেলা সংগঠনের ভার ছিল বিষ্ণুশরণ দুবলীশের উপর। দুবলীশকে শচীন্দ্রনাথ সান্যাল দলভুক্ত করেন। আলিগড়ে সংগঠন গড়ে তুলবার জন্য ভগৎ সিংকে সেখানে ন্যাশনাল স্কুলে প্রধান শিক্ষক করে পাঠানো হয়। শচীন্দ্রনাথ মাঝে মাঝে কলকাতা গিয়ে জাহাজের খালাসীদের কাছ থেকে রিভলবার পিস্তল প্রভৃতি সংগ্রহ করে আনতেন। সংগঠন প্রসারে এবং অস্ত্র সংগ্রহের জন্য অর্থের প্রয়োজন হওয়ায় যোগেশচন্দ্র কুমিল্লায় মহেশ ভট্টাচার্যের নিকট থেকে কিছু অর্থ নিয়ে আসেন। কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় এ সামান্য। এই সময় কাশী সংগঠনের বিশিষ্ট কর্মী কেশব চক্রবর্তীকে রুশিয়ায় কমিউনিষ্ট পার্টির সঙ্গে সংযোগ স্থাপনের জন্য পাঠানো হয়। তিনি মুসলমান খালাসীর বেশে মাথায় টুপি পরে ভারতের বাইরে চলে যান। এ কাজে অনুশীলন সমিতির বিশিষ্ট সদস্য শ্রীবীরেন চ্যাটার্জী এবং সুশীল ব্যানার্জী তাকে সাহায্য করেন। কেশববাবু দলীয় নির্দেশ মত ইউরোপে বিভিন্ন ব্যক্তির সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন।

এই সময় যুক্তপ্রদেশ সংগঠনে খুবই অর্থাভাব দেখা দিল। সংগঠনের নেতৃবৃন্দ বাধ্য হয়ে ডাকাতি করতে উদ্যোগী হলেন। তারা বাঙলার নেতৃবৃন্দকে না জানিয়ে কানপুরে এক ডাকাতি করলেন। এই ডাকাতিতে যোগেশচন্দ্র নিজেও যোগ দিয়েছিলেন। এ ছাড়া ডাকাতিতে ছিলেন ভগৎ সিং, মন্মথ গুপ্ত, রবীন্দ্র কর, প্রণবেশ চ্যাটার্জী এবং আরও দু' একজন। এই ডাকাতিতে কোন অর্থ পাওয়া যায় নাই। যুক্তপ্রদেশে বিত্তবান পল্লীবাসীরা অর্থ মাটির নিচে লুকিয়ে রাখে। ভয়ানক নিষ্ঠুর অত্যাচার না করে সে অর্থের সন্ধান পাওয়া যায় না। বিপ্লবীরা পল্লীর নিরীহ লোকদের প্রতি এরূপ অমানুষিক অত্যাচার করতে চান নাই। ডাকাতিতে অর্থ না পেয়ে যোগেশচন্দ্র কুমিল্লা গিয়ে মহেশ ভট্টাচার্যের কাছ থেকে এক হাজার টাকা নিয়ে এলেন। শচীন সান্যাল তখন কলকাতায় তারও ভীষণ অর্থাভাব। এক হাজার টাকা থেকে তিনি তিনশত টাকা রেখে দিলেন।

যোগেশচন্দ্রের অক্লান্ত চেষ্টায় ক্রমে যুক্তপ্রদেশের ছাব্বিশটি জেলায় হিন্দুস্থান রিপাবলিকান পার্টির শাখাপ্রশাখা বিস্তৃত হল। যোগেশচন্দ্র এবারে এক প্রাদেশিক সম্মেলন আহ্বানের প্রয়োজন অনুভব করলেন। কানপুরেই প্রাদেশিক পরিষদের সদস্যগণ মিলিত হলেন। যোগেশচন্দ্র ব্যতীত রামপ্রসাদ বিসমিল, রাজেন লাহিড়ী, সুরেশ ভট্টাচার্য, বীরভদ্র তেওয়ারী উপস্থিত ছিলেন। আলোচনায় স্থির হল যে ভারতে রিপাবলিকান ধরনের গভর্ণমেণ্ট গঠনই পার্টির লক্ষ্য। মহারাজ ত্রৈলোক্য চক্রবর্তী অল্প কিছুদিন আগে আন্দামান থেকে ফিরে এসেছেন। কানপুরে বাঙলার প্রতিনিধিরূপে তিনি উপস্থিত ছিলেন। সমবেত আলোচনায় স্থির হল যে ভারতে শোষণহীন সমাজ প্রচেষ্টাই পার্টির আদর্শ। আর্থিক সমস্যা সমাধানের জন্য আলোচনায় স্থির হয় যে জনসাধারণের দানেই পার্টি চলবে। পরিষ্কার করে বলা না হলেও অর্থের জন্য ডাকাতি করা হবে না উপস্থিত সকলেরই মনোভাব। প্রাদেশিক পরিষদের পরবর্তী অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয় মীরাটে যোগেশচন্দ্র তখন জেলে। (চলবে)

Freedom fighters whose pension has been sanctioned

Name	Address	Amount p. m. Rs.	Date
	October—1980		
	Dist —CALCUTTA		
Ghosh Smt Srimati	14B, Deshopriya Nagar	100	18 10 79
w/o Late Jagadish Ghosh	Palpara, Calcutta—50	& 200	& 1 8 80
Ghosh Hriday Ranjan	14/2, Nilganj Road, Cal—56	300	1 8 80
Ghosh Ranjit Kumar	4/29, Netaji Nagar	200	3 7 80
	Calcutta—40	& 300	1 8 80
Guha Arun Chandra	32, A. P. C. Road, Cal—9	500	1 8 80
Roy Aranya Kumar	47, Christophar Road, Cal—46	300	1 8 80
Sen Sanli Ranjan	26, Kabi Nabin Sen Road	200	1 4 80
	Dum Dum, Calcutta—28	& 300	1 8 80
	Dist—MIDNAPUR		
Jana Kshitish Chandra	Dogra Union No. 10	200	21 8 73
	Narayangarh	& 300	1 8 80
Maji Smt Kishori & Smt Malina	Vill Gopal Nagar	100 each	11 9 72
w/o Late Mahadev	P, O. Debati	& 200 each	1 8 80
	Dist—COOCHBIHAR		
Chowdhury Amiya Sankar	Biswasingha Road	200	1 4 75
	P. O. Cooch Behar	& 300	1 8 80
Ghosh Smt Bina & Km Juthika	Shyama Prosad Colony	100	23 12 78
w/o Late Jogendra Kumar	P. O, Gariahati	& 50	,,
		200	1 8 80
		& 50	-

বর্ষীয়ান বিপ্লবী নেতা
হেমচন্দ্র ঘোষের কর্মজীবন

—শ্রীভবেশচন্দ্র নন্দী

দেশের অন্যতম বর্ষীয়ান বিপ্লবী নেতা হেমচন্দ্র ঘোষ গত শুক্রবার ১৪ই কার্তিক, ৩১শে অক্টোবর কালীঘাটে তার বাসস্থানে, বেশ কিছুদিন অসুস্থ থাকার পর, ৯৬ বৎসর বয়সে দেহরক্ষা করিয়াছেন। তিনি ছিলেন আমাদের সকলের রাজনৈতিক দাদা এবং "বড়দা" বলিয়া সাধারণত পরিচিত।

১৯৮৪ সালে বরিশাল জেলার গাভা গ্রামে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। ১৯০৯ সালে যখন তিনি ঢাকা জুবিলি স্কুলের ছাত্র তখন হইতেই তিনি রাজনীতিতে ঝুঁকিয়া পড়েন। ১৯০১ সালে ঢাকার জমিদার জীবন বাবুর বাড়ীতে, স্বামী বিবেকানন্দ, ঢাকা শহরে গিয়া কিছু সময়ের জন্য অবস্থান করেন, তখন শহরের বহু দর্শনপ্রার্থীর সঙ্গে তিনিও দু'একজন সাথী সঙ্গী লইয়া স্বামীজীর পদপ্রান্তে বসিয়া তাঁর কথা শোনার সুযোগ লাভ করিয়াছিলেন স্বামীজীর দৃপ্তকণ্ঠে দেশের কাজে তরুণদেরকে আত্মবলিদানের জন্য বলিষ্ঠ আহ্বান তাকে স্বদেশীকাজে ঝাপাইয়া পড়িতে আরো বিপুলভাবে উৎসাহিত করে। তিনি বহু সময়ে স্বামীজীর কাছে পাওয়া অনুপ্রেরণার কথা আমাদের কাছে বলিতেন এবং বেশ গর্ব অনুভব করিতেন।

সে যুগে পুলিন বাবু ঢাকাতে পি মিত্র মহাশয়ের নির্দেশ মত লাঠী অসি প্রভৃতি শিক্ষার মারফৎ দেশের তরুণদেরকে নির্ভিক ও সামরিক ভাবাপন্ন করিয়া তোলার চেষ্টায় ব্রতী হন। দেশের অজস্র তরুণের দল আসিয়া ঝাপাইয়া পড়ে। হেমদা তাদের সঙ্গে কিছুদিন মেলামেশা করেন। কিছুদিন পরে হেমদা করেকজন বিশ্বস্ত সাথী সংগ্রহ করিয়া নিজেই একটি দল গঠনের চেষ্টা করেন। তিনি কাজ শুরু করেন ঢাকার পার্শ্বনাথের কুস্তির আখড়াকে কেন্দ্র করিয়া। তিনি নিজে খুব ভাল কুস্তি করিতেন এবং সেই সূত্রেই তাহার সহিত পরিচয় হয় হরিদাস দত্ত, প্রমোদ দেব চৌধুরী, প্রমথ চক্রবর্তী ও জ্ঞান পোদ্দার। ইহা ছাড়া তিনি যাদের তখন রিক্রুট করেন তাদের মধ্যে ছিলেন বিনয় দত্ত, প্রফুল্ল মিত্র প্রভৃতি। এরা তখন সকলেই স্কুলের ছাত্র ছিলেন এবং বেশীর ভাগই জুবিলি স্কুলের। পার্শ্বনাথ নিজেও জুবিলি স্কুলের শিক্ষক ছিলেন। পার্শ্বনাথ ও শ্যামাকান্ত সে যুগের প্রসিদ্ধ বাঙ্গালী নাম। এই কুস্তি খানাকে কেন্দ্র করিয়াই দলের প্রথম সৃষ্টি। ক্রমে ক্রমে এ দল বিস্তার লাভ করে। সুরেন বর্দ্ধন, খগেন দাস, হরিদাস রায় এবং এর পরে আলীমুদ্দীন (মাষ্টার সাহেব), মঈনউদ্দীন আলাউদ্দীন প্রভৃতি কয়েক জন মুসলমান সদস্য এই দলে যোগ দেয়। মাষ্টার সাহেব অল্প বয়সেই মারা যান, মঈনউদ্দীন সাহেব পরে সহকারী পাবলিক প্রসিকিউটার হ'ন এবং আলাউদ্দীন ঢাকা বারে মোক্তারী করিতেন এবং শেষ দিন পর্য্যন্ত কাজে সহযোগিতা করিয়াছেন।

প্রথম মহাযুদ্ধ শুরু হওয়ার কিছুদিন পূর্বেই হরিদাস দত্ত, শ্রীশ পাল, খগেন দাস কলিকাতায় গিয়া বাস করিতে শুরু করেন এবং বিপিন গাঙ্গুলী মহাশয়ের দলের সহিত সহযোগিতায় কিছু কিছু কাজ করেন। এই সময়ে ইন্ডিনিয়ার রবার্ট ও'ব্রায়েন [illegible]

এই সব action এ এরা সক্রিয় ও কৃতীত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করেন। এর ফলে ইহাদের উপর পুলিসের নজর আসিয়া পড়ে এবং যুদ্ধ শুরু হইতেই তাহাদিগকে নানা নির্যাতন সহ্য করিতে হয়।

১৯১৪ সালে হেমদা' প্রথম গ্রেপ্তার হ'ন। স্বগ্রাম গাভায় কিছুদিন অন্তরাল থাকার পর তাকে পুলিশ হাজারীবাগ জেলে লইয়া যায় এবং সেখান হইতে পরে কলিকাতা প্রেসিডেন্সী জেলে চালান দেয়। যুদ্ধাবসানে ১৯১৯ সালে প্যারোলে তাকে ঢাকায় তার দাদার বাসায় কিছুদিন গৃহবন্দী রাখার পর ১৯২০ সালে মুক্তি দেওয়া হয়।

এই সময়ে আমি কলেজের ছাত্র। হেমদার সাথে একই গলিতে ও কাছাকাছি বাসায় বাস করিতাম। ফলে ১৯১৯ সালে তার সঙ্গে নিবিড়ভাবে মেলামেশার আমার সুযোগ হয়। তার নিজের সম্পর্কে অনেক কথা এবং রাজনীতি প্রভৃতি লইয়া দীর্ঘ আলোচনা তার মুখে শোনার সুযোগ আমার হয়। তিনি আমাকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন ও বিশ্বাস করিতেন। এর বাস্তব পরিচয় পাই ১৯২১ সালে আমার বন্ধু ও সহপাঠি সুকুমার চক্রবর্তী যখন কলিকাতা চলিয়া আসেন তখন দলের বিভিন্ন গ্রুপ পরিচালনা এবং নতুন সদস্য সংগ্রহ করার কাজের দায়িত্ব বণ্টনের প্রশ্ন উঠিলে হেমদার সুস্পষ্ট নির্দেশে অনিলদা' ও বুধুদা (প্রমথ চক্রবর্তী) আমার উপর সম্পূর্ণ দায়িত্ব ন্যস্ত করেন। সেই হইতে অনিলদা'র সুপারভিশনে দল সংগঠনের দায়িত্ব লইয়া আমি কাজ করি। তখন আমার সহযোগী ছিলেন আমার সহপাঠি বন্ধু সত্যগুপ্ত, মনীন্দ্র রায়, রসময় শুর, ভূপেন্দ্র রক্ষিত, প্রফুল্ল মুখার্জী প্রভৃতি। এরা সকলেই অনিলদা'র হাতে তৈরী কর্মী এবং পরে এরা হেমদার সাথে পরিচিত হন।

প্রথম মহাযুদ্ধের শেষে আমাদের দলের পুরণো লেফ্‌টেন্যান্টরা অল্প কয়েকজন বাদে প্রায় সবাই সংসার জীবনে প্রবেশ করেন। সক্রিয় কার্যক্ষেত্রে তখন ছিলেন প্রমোদ দেব, প্রমথ চক্রবর্তী ও অনিল রায়। এরা সতর্কতার সহিত নতুন করিয়া দল গড়ার কাজে প্রবৃত্ত ছিলেন। তাদের চেষ্টায় মহাযুদ্ধের পর নূতন পর্য্যায়ে হেমচন্দ্রের দল নতুন রূপ নেয়। হেমদার পত্রে এ সম্বন্ধে উল্লেখ আছে। মুক্তির পর হেমদা ঢাকার দলের নূতন রূপ ও বিস্তার দেখিয়া অত্যন্ত সন্তুষ্ট হন এবং বুধুদা (প্রমথ চক্রবর্তী) ও অনিলদা আমাকে ডাকিয়া বলেন তোমরা জোর কাজ চালাইয়া যাও, আমি আলগা থাকিয়া তোমাদেরকে লক্ষ্য করিব ও পরিচালনা করিব। তিনি রাজনীতি হইতে প্রকাশ্যে দূরে থাকিবার সিদ্ধান্ত করিলেন। বন্ধুবর ভূপেন রক্ষিত তার বইতে হেমদা সম্বন্ধে উদ্ধৃতি দিয়াছেন—"দলের কয়েকজন বিশিষ্ট সতীর্থের সহিত পরামর্শ করিয়া তিনি প্রচার করিয়া দিলেন যে রাজনীতির কাজের মধ্যে তাহারা আর থাকিবেন না। সমাজ সেবার মাধ্যমে দেশের হিত সাধনে তিনি ও তাহার সহকর্মীগণ শক্তি সামর্থ্য নিয়োগ করিবেন। তিনি তাহার পুরাতন কর্মক্ষেত্র ঢাকা শহর ছাড়িয়া কলিকাতায় আসিয়া বাস করিতে লাগিলেন। "হেমদা নিজেও লিখিয়াছেন "পুলিসের ছাপ থাকলে secret work হয় না। Secret work ব্যতীত বিপ্লব করা সম্ভব নয়। দলের নামী কর্মীরা তাই আপাত দৃষ্টিতে কাজ ছেড়ে দিলেন। প্রকাশ্যে তারা পুরা দস্তুর গৃহী, অতি সঙ্গোপনে তারা নূতন গড়ে ওঠা দলের সঙ্গে যোগাযোগ রাখেন।"

হেমদা ও হরিদাসদা দলের সহিত প্রকাশ্যে মেলামেশা না করাতে ঢাকার জনসাধারণ, এমন কি বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের বন্ধুরাও আমাদের যোগা-

যোগ অনুমান করিতে না পারিয়া এ দলকে অনিল রায়ের দল অথবা শ্রীসংঘ দল বলিয়া অভিহিত করিত। কার্য্যতঃ অনিলদার অক্লান্ত ও সুদক্ষ চেষ্টার ফলেই আট দশ বছরেই এত বড় দল গড়িয়া ওঠা সম্ভব হয়। সুপ্রীম নেতা হিসাবে হেমদা অনিলদার মারফৎ দলের বিশিষ্ট কর্মীদের সঙ্গে আলাপ পরিচয় করিতেন এবং যথারীতি নির্দ্দেশাদি দিতেন। তিনি নিজে প্রায় সারা বৎসরই কলিকাতায় থাকিতেন।

ইতিমধ্যে ঢাকাতে মহিলা সংগঠন গড়িয়া ওঠে। রবীন্দ্রনাথের আশীর্ব্বাদপুষ্ট লীলা নাগের অপূর্ব্ব কর্ম-সাফল্য হেমদাকে মুগ্ধ করে। হেমদা নিজে আগ্রহ করিয়া লীলা দেবীর সহিত পরিচয় করেন এবং পরম সন্তুষ্ট হন। মৃত্যুর এক বৎসর পূর্ব্বেও একদিন তিনি দীর্ঘ সময় লীলা দেবীর অপূর্ব্ব কর্ম্ম ক্ষমতা ও আন্তরিকতা সম্পর্কে আমার সঙ্গে আলোচনা করেন।

ঢাকার দল ক্রমশঃ নানা জেলায় ছড়িয়ে পড়ে। কর্মীরা যদিও দলের সুপ্রীম নেতা হিসাবে হেমদার সাক্ষাৎ বিশেষ পাইত না তিন্ন তারা সবাই জানিত সুপ্রীম নেতা কে।

হেমদা এই শতাব্দীর প্রথমেই রাজনীতিতে নামিয়াছিলেন। ফলে তৎকালীন বিশিষ্ট নেতাদের সকলের সঙ্গেই তার পরিচয় ছিল। ব্রহ্ম বান্ধব উপাধ্যায়, শ্রীঅরবিন্দ, ভগিনী নিবেদিতা, সতীশ মুখার্জী প্রভৃতি সকলের সাথেই পরিচিত হন। তিনি লিখিয়াছেন ১৯০৯ সালে মহানায়ক যতীন মুখার্জির সঙ্গে তার পরিচয়। তিনি লিখিয়াছেন— "বিপ্লবের যারা জন্মদাতা, তাঁদের অধিকাংশের স্নেহে আমি ধন্য।"

একান্তভাবে রাজনীতি হইতে দূরে থাকার ফলে ১৯২৫/২৬ সালে যখন দেশের প্রবীণ নেতারা অনেকে গ্রেপ্তার হন, হেমদার পক্ষে বাহিরে থাকা সম্ভব হয়, এ দলের একটা বিশেষ বৈশিষ্ট্য ছিল যে পুলিশ ও রাজনৈতিক অন্যান্য দলের বন্ধুরাও এই দলটাকে কট্টর বিপ্লবী দল হিসাবে বহুদিন পর্য্যন্ত জানিতে পারে নাই। সমাজসেবা দলই ভাবিত।

সুভাষ বাবুর উপর হেমদার একটা প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ছিল। হেমদা ও সত্যদা (সত্য বক্সী) সব ক্ষেত্রেই সুভাষ বাবুর সহিত সহযোগিতায় কাজ করিতেন। সুভাষ বাবুরও এঁদের প্রতি শ্রদ্ধা ও প্রগাঢ় বিশ্বাস ছিল।

১৯৩০ সালে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সম্পাদক হিসাবে গ্রেপ্তার হইয়া হেমদা দুই বৎসর কারাদণ্ড প্রাপ্ত হন। গান্ধী-আরউইন প্যাক্টের ফলে পূর্ব্বেই মুক্ত পাইয়া তিনি বেঙ্গল অর্ডিন্যান্সে গ্রেপ্তার হন এবং বক্সা, দেওলী প্রভৃতি ক্যাম্প ঘুরিয়া ১৯৩৮ সালে মুক্তি পান। ১৯৩৯ সালে ফরওয়ার্ড ব্লক গঠন ব্যাপারে তিনি সক্রিয় অংশ নেন এবং ১৯৪০ সালে রামগড়ে সুভাষবাবুর কনফারেন্সে যোগদান করেন। ১৯৪০ সালে কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়া আবার গ্রেপ্তার হন এবং ১৯৪৬ সালে মুক্তিলাভ করেন। ইতিমধ্যে কর্মীদের সহিত পরামর্শক্রমে তিনি দল ভাঙ্গিয়া দিয়াছিলেন।

তাঁর দীর্ঘ জীবন লাভের বিশেষ কারণ ছোট কালে যথেষ্ট শরীর চর্চ্চা করিয়াছিলেন এবং আজীবন স্বাস্থ্য সম্বন্ধে কঠোরভাবে নিয়ম মানিয়া চলিতেন। জীবনে সংযম ও নিষ্ঠা তাহাকে দীর্ঘ-জীবী করিয়াছিল।

তাঁর মধ্যে একটা সংকল্পের দৃঢ়তা, অক্লান্ত কর্ম-প্রবণতা ও রাজনীতি সম্বন্ধে গভীর জ্ঞান ও দীর্ঘ দিনের অভিজ্ঞতা তাহার কর্মীবৃন্দকে উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত করিত।

আজ তাঁর মৃত্যুতে রাজনৈতিক ইতিহাসের একটি দীর্ঘ অধ্যায়ের পরিসমাপ্তি ঘটিল। তাঁর পূণ্য জীবন স্মরণে আমরা মাথা নোয়াই।

— বন্দে মাতরম —

১৯ ফেব্রুয়ারী নৌ-বিদ্রোহ দিবস উদ্‌যাপন হবে কি ?

—ব্রজেন্দ্রচন্দ্র দাস

British Prime Minister Attlee stated in the House of Commons 'Britain was conceeding independence to India because Indian soldiers are no longer faithful to Britain and Britain could no longer afford to keep her own soldier in massive strength to keep India under her domination.

এই নির্মম সত্য উপলব্ধি করে নৌ-বিদ্রোহ শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই প্রধানমন্ত্রী ১৯৪৬ সালের ১৯শে ফেব্রুয়ারী ঘোষণা করেন – ভারতের স্বাধীনতা অর্পণ করার পূর্ণ ব্যবস্থা সম্পূর্ণ করার উদ্দেশ্যে শীঘ্রই ভারতে ক্যাবিনেট মিশন (Cabinet mission) প্রেরণ করা হবে। কাজেই নৌ-বিদ্রোহে ব্রিটিশ শংকিত হয়ে কংগ্রেস ও মোসলিম্-লিগ্ নেতাদের সঙ্গে আপোষ রফা করতে বাধ্য হয়। ইহা সত্ত্বেও স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিবৃত্তে নৌ-বিদ্রোহের অবদান তেমন উজ্জ্বল করে তুলে ধরা হয় না।

নৌ-বাহিনীতে ইংরেজ ও ভারতীয়দের একত্র বসে করতে হত। ইংরেজদের থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা পোষাক-পরিচ্ছদ, বেতন সব কিছুই ভারতীয়দের হতে উন্নততর এবং ভাল ছিল। এই বৈষম্য ভারতীয় জওয়ানদের মধ্যে প্রবল বিক্ষোভ দেখা দেয়। দেশের পরিস্থিতি সম্বন্ধে অজ্ঞ রাখার জন্য ভারতীয় জওয়ানদের সব সময়ই রাজনীতি হতে দূরে রাখা হত। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জওয়ানদের মানসিক পরিবর্তন ঘটে। এঁরা বুঝতে পারল ইংরেজরা মাতৃভূমির প্রভুত্ব রক্ষার জন্য লড়াই করছে, এদেশে ওদের শাসন কায়েম রাখার জন্য ইংরেজের পক্ষে ভারতীয়রা লড়াই করবে কেন? সেই সময় কোন কোন নৌ-জাহাজের জওয়ানরা নেতাজীর বীরত্বপূর্ণ কাহিনী ও ভারতীয় সৈন্যদের ইংরেজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে আই. এন, এ-তে যোগ দেওয়ার আহ্বান শুনেছে। এই খবর ধীরে ধীরে সমস্ত নৌ জাহাজে রটে গেল, গোপনে আজাদ হিন্দ নামে সংগঠন গড়ে উঠল। পাটনা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি স্যার ফজল আলী নেতৃত্বে গঠিত নৌ-বিদ্রোহের সরকারী তদন্ত কমিশনে বলা হয়েছে বিদ্রোহে বাইরের কোন রাজনৈতিক দলের উস্কানী ছিল না। নৌ-বাহিনীর জওয়ানদের দেশপ্রেম ও স্বাধীনতা লাভের আকাঙ্খাই এই বিদ্রোহের উৎস এবং সাহস যুগিয়েছে।

স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে ১৯৪৬ সালের ১৯শে ফেব্রুয়ারী একটি স্মরণীয় দিন। এই দিন ১১টি নৌ-বাহিনীর কেন্দ্রের ও বোম্বাই উপকূলের ৬০টি নৌ জাহাজের জওয়ানরা ধর্মঘট ঘোষণা করে নৌ-বাহিনী শুরু করে দেয়। বোম্বাইর Castle Barrackএর তিন হাজার (৩০০০) জওয়ান 'ভারত ছাড়, জয় হিন্দ, হিন্দু-মুসলমান একতা জিন্দাবাদ, আই, এন' এর বিরুদ্ধে মামলা তুলে নেও, আমাদের দাবী মেনে নেও, এই সমস্ত রাজনৈতিক দাবীমূলক ধ্বনিসহকারে বোম্বাই শহরের

রাস্তায় মিছিল বাহির করে। মিছিলে কংগ্রেস ও মোসলিম পতাকা বহন করে। সন্ধ্যার মধ্যে অন্যান্য পোর্টেও ধর্মঘট ছড়িয়ে পড়ে। করাচিতে হিন্দুস্তান ও ট্রাভাঙ্কোর এই দুইটি জাহাজ লঙ্গর করা ছিল। ট্রাভাঙ্কোরের জওয়ানরা ধর্মঘটের সামিল হয় এবং হিন্দুস্তানের জওয়ানরা ইংরেজ অফিসারদের হাত হতে জাহাজের দায়িত্ব ছিনিয়ে নেয়। হিন্দুস্তান জাহাজের বিদ্রোহের সংবাদ পেয়ে করাচিস্থিত জেনারেল বিদ্রোহ দমন করার জন্য দুই platoon বেলুচ সৈন্য প্রেরণ করে, বেলুচ সৈন্যরা ভারতীয় জওয়ানদের উপর গুলিবর্ষণ করতে অস্বীকার করে। তৎপর জেনারেল বিশ্বস্ত মনে করে 2nd Gurkha Battalion প্রেরণ করে, গোরখারাও হিন্দুস্তান জাহাজের জওয়ানদের উপর জুলুম করতে অস্বীকার করে। উপায়ন্তর না দেখে ইংরেজ সৈন্য প্রেরণ করে। ইংরেজ সৈন্যরা হিন্দুস্তান জাহাজ আক্রমণ করে। জাহাজের জওয়ানরাও গুলি চালায়, চার দিন ব্যাপি তীব্র গুলি বিনিময় ও সংগ্রাম চলে। জামনগর পোর্টের Balasur জাহাজের জওয়ানরা এই সংবাদ পেয়ে ইংরেজ অফিসারদের কুঠরিতে তালা বন্ধ করে করাচি অভিমুখে যাত্রা করে। কলিকাতার হুগলীর কর্মচারীরাও ধর্মঘটে যোগদান করে সাত দিন সংগ্রাম চালায়। মাদ্রাজ পোর্টের Aidyar' ভিসাগাপট্টমের Sonawati কোচিনের Shillong ও Ahamadabad জাহাজের জওয়ানরা বিদ্রোহ ঘোষণা করে ধর্মঘটে যোগ দেন। এমন কি ভারত উপকূল হতে মাইল মাইল দূরবর্তী জাহাজের জওয়ানরাও ধর্মঘট করে। ভারতের জওয়ানদের সংগ্রামে সহানুভূতি জাগায়ে এডেনের ৪৮ জন জওয়ান কাজ বন্ধ করে অনশন করে। আন্দামানে অবস্থিত ৭টি জাহাজের জওয়ানরা ধর্মঘট সমর্থন করে। ৭৮টি জাহাজ, ১০টি নৌ বাহিনী মোট কুড়ি হাজার (২০,০০০ জওয়ান এই সংগ্রামে অংশ গ্রহণ করে। বোম্বাইর জোয়ানরা আত্মরক্ষার এবং লড়াই চালাবার জন্য Castle Barrack আক্রমণ করে সমস্ত অস্ত্র শস্ত্র ও খাদ্য নিজেদের আয়ত্বে রাখে। ধর্মঘটের তৃতীয় দিনে বোম্বাইর ছাত্র ও শ্রমিকরা ধর্মঘট করে সহানুভূতি জানায়। Marine Dive ও Andheri Air-force এর জওয়ানরা সমর্থন জানাবে মিছিল করে। মারাঠা, বেলুচ, গোরখা সৈন্যরা Air-force এর সৈন্যরা নৌ বাহিনীর জওয়ানদের সংগ্রামের সমর্থনে এগিয়ে আসে। ব্রিটিশ প্রধান মন্ত্রী সন্ত্রস্ত হয়ে পার্লামেন্টে ঘোষণা করে—

"White Naval Forces were being deputed to quell the naval revolt." ২১ শে ফেব্রুয়ারী Rear Admiral Godfrey ঘোষণা করে all the forces at the disposal of Government would be yoked No matter if the entire navy is destroyed."

কেন্দ্রীয় ধর্মঘট কমিটি এই ভয় প্রদর্শনে ভীত না হয়ে সংগ্রাম চালায়ে যাওয়ার সিদ্ধান্তে অটল থাকায় ব্রিটিশ সরকার কংগ্রেস নেতাদের শরণাপন্ন হয়। কংগ্রেস সভাপতি মৌলানা আজাদ এবং কংগ্রেস নেতা সরদার প্যাটেলকে আশ্বাস দেয় নৌ-বাহিনীর জওয়ানদের দাবী মেনে নেওয়া হবে এবং কোন জওয়ানের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হবে না।

নৌবাহিনী সৈন্যদের সাহায্য করার জন্য এবং স্বাভাবিক কাজকর্ম চালু করার উদ্দেশ্যে দেশের প্রায়

সকল নেতারা বোম্বাই হাজির হলেন। জওহরলাল নেহেরু বললেন,—

"For the last twenty-five years the people of India have made tremendous sacrifices in the course of winning our national indepedence. Our freedom is near at hand today. We have all the virtues of winning our freedom, but I confess that we lack the discipline which is essential for a free-country." গান্ধীজীও ওঁদের সংগ্রামকে সমর্থন জানালেন না। নৌ-বিদ্রোহীরা জানালেন "where does the question of discipline come in when throughout the period of struggle for independence, disobedience of the British rule was the main plank of the freedom movement. We were beginning to feel Indian and to realise where our duty lay and you throw this charge at us about indiscipline. How were we wrong when disobedience was right for all Indians.

নৌ-বাহিনীর স্বাধীনতা সংগ্রামীরা কোন জাতীয় নেতার নেতৃত্ব ও সমর্থন পেল না। এমন কি কোন বিপ্লবী গোষ্ঠিও এঁদের সমর্থনে এগিয়ে এল না। ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টি যারা সশস্ত্র জন বিক্ষোভের মধ্য দিয়েই একমাত্র দেশ স্বাধীন করা যায় এই নীতিতে আস্থাবান তারাও এগিয়ে এসে নেতৃত্ব দিতে বিফল হল। ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টি আপোষ রফার দ্বারা স্বাধীনতা অর্জনে বিশ্বাসী না থাকলেও বৈপ্লবিক পরিবেশকে স্বাধীনতা লাভের সহায়ক করে তুলতে সাহায্য করে নাই। ফলে কমিউনিষ্ট পার্টি জাতীয় আকাঙ্খার প্রতীক হতে ব্যর্থ হল। ইহার মাশুল আজও কমিউনিষ্টদের গুণতে হচ্ছে। দেশবাসীর সমর্থন থাকা সত্বেও জাতীয় নেতাদের চাপে ও আগ্রহে নৌ-বিদ্রোহের নেতারা পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু ও সরদার পেটেলের অঙ্গীকারের উপর বিশ্বাস করে ২৩শে ফেব্রুয়ারী সংগ্রাম তুলে নিল। জাতীয় নেতারা আশ্বাস অনুযায়ী নৌ-বাহিনীর জওয়ানদের ব্রিটিশের অকথ্য অত্যাচার ও নিষ্পেষণ হতে রক্ষা করতে পারে নাই।

দেশের জন-রোষের প্রাবল্য এমন ছিল যে ভারতে ব্রিটিশ শাসন কায়েম রাখা সম্ভব ছিল না। ইহা নেতাদের ভাষণ ও ব্রিটিশ প্রধান মন্ত্রীর বক্তব্যে প্রকাশ পায়।

Central Legislative Assembly তে Minoo Masani বলেছেন "Why all the people of Bombay unanimously support the mutineers. It is because Indians do not differ..... The real cause of the mutintly is the existence of the British rule in the country মোসলিম সদস্য A R. Siddique বলেছেন "whether in Bombay or Karachi these boys (naval ratings) have behaved as any group of young folk would have done. Your age is finished and a new age has dawned unless you go with the spirit of the age there will be

trouble and misery for my own countrymen as well as for those who like to crush them.

১৯৪৬ সালের ২৬ শে ফেব্রুয়ারী বোম্বাই চৌপাঠিতে জনসভায় পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু বলেন—

The RIN episode has opened an altogether new chapter in the history of armed forces in India The INA episode the recent RIAF and RIN strikes have rendered the country a new great service.

পার্লামেন্টে ব্রিটিশ প্রধান মন্ত্রী এট্‌লী বলেন ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের শেষ পর্যায়ে নৌ-বাহিনীর ভূমিকা ও নৌ বাহিনীর বিদ্রোহের অবদান ও তাৎপর্য্য অনস্বীকার্য্য।

নৌ বিদ্রোহের নেতা নৌ বাহিনী জওয়ান শ্রী বি, সি, দত্তর উক্তি—

"The naval revolt sounded the parting tunes of the British rule from India. The mutiny accelerated the achievement of freedom. It would have come in any event, but the mutiny speeded up the process.

কাজে ১৯৪৬ সালের ১৯শে ফেব্রুয়ারীর নৌ-বিদ্রোহকে স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে একটি বিশিষ্ট স্থান দিতে হবে। আমরা বিভিন্ন ঘটনা কেন্দ্র করে বিশেষ বিশেষ দিবস উদ্‌যাপন করি। ১৯শে ফেব্রুয়ারী বৈপ্লবিক ঘটনাকে উজ্জ্বল করে তুলা জাতীয় কর্ত্তব্য। আশা করি স্বাধীনতা সংগ্রামীদের সংগঠন এ বিষয়ে এগিয়ে আসবে।

(৪র্থ পাতার শেষাংশ)

এবং কেন্দ্র অথবা কোন রাজ্য সরকার উদ্বাস্তুদের বিধিমতে ভারতীয় নাগরিকত্ব দানের যুক্তিযুক্ততা অস্বীকার করেননি। এ প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জহরলাল নেহেরু কর্তৃক লোক সভায় প্রদত্ত ঘোষণাটি স্মরণীয়।

"There is no doubt, of course, that those displaced persons who have came to settle in India are bound to have their citizenship. If the Law is inadequete in this respect, the Law should be changed."

কেন্দ্র ১৯৭১ সালকে ভিত্তি বর্ষ ধরে বিদেশী চিহ্নিত করণের যে প্রস্তাব দিয়েছেন তাকে ন্যায়সঙ্গত বলা যায় না। বাংলাদেশ সরকার জানিয়ে দিয়েছেন যে, আসামে যে সব বঙ্গ-ভাষাভাষী বাস করছে তারা সকলেই ভারতীয়, বাংলাদেশী কেউ আসামে নেই। ১৯৭১ সালের পরে যে সকল উদ্বাস্তু আসামে গিয়েছে, বিদেশী বলে চিহ্নিত হবার পর তারা যাবে কোথায় তাহলে? (চলবে)

পুস্তক পরিচয়

ইতিহাস পুরুষ নেতাজী — কালীপদ সরকার, মূল্য—কুড়ি টাকা।

প্রকাশক — শ্রী ডি. মেহরা, রূপা এ্যাণ্ড কোং,

১৫, বঙ্কিম চ্যাটার্জী ষ্ট্রীট—কলিকাতা-৭০০০৭৩,

নেতাজী সুভাষচন্দ্রের সম্বন্ধে কয়েকখানি পুস্তক এ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয়েছে। কেউ কেউ নেতাজীর অলৌকিক সাংগঠনিক প্রতিভা, অতুলনীয় মনীষা ও দেশ প্রেম, অসাধারণ চরিত্রবল ও অন্যান্য অনুকরণীয় গুণাবলীর দ্বারা মুগ্ধ হয়ে, কিছুটা ভাবাবেগের দ্বারা পরিচালিত হয়েছেন। ফলে তাঁর জীবনীতে কিছু কিছু ঘটনা সন্নিবেশ করেছেন। যে সম্বন্ধে ভিন্ন মত পোষণ করার সঙ্গত কারণ আছে। কিন্তু কালীপদবাবু ইতিহাসের ছাত্র হিসাবে তার নিরপেক্ষ ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে নেতাজীর জীবনের ইতিহাস রচনা করতে সমর্থ হয়েছেন।

নেতাজীর জীবনের কোন ঘটনাকেই কালীপদবাবু কল্পনা নির্ভর করেননি। তার ব্যক্তিগত পছন্দ অপছন্দ কোন ঘটনাকেই তার বক্তব্যকে প্রভাবিত করেনি। যা কিছু তুলে ধরেছেন, তার সমর্থনে তথ্য উদ্ধৃত করে প্রতিষ্ঠিত করতে প্রয়াসী হয়েছেন। এই বৈশিষ্ট্য বিদগ্ধ সমাজে প্রশংসা অর্জন করবে নিশ্চয়ই।

নেতাজীর জীবনধারা ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। তাই সংক্ষেপে অহিংস ও সহিংস সংগ্রামের গতি প্রকৃতিরও একটি নিখুঁত বিবরণী বইখানিতে পাওয়া যায়। লেখকের ভাষা সংযত, মার্জিত বলিষ্ঠ। সব মিলিয়ে বইখানি পড়ে সকলেই আনন্দ পাবেন বলেই বিশ্বাস করি।

নেতাজী জীবিত কি মৃত জনমানসে এই প্রশ্নটি বিশেষভাবে জাগ্রত। লেখকের বক্তব্যটি এ সম্বন্ধে নতুন আলোকপাত করতে পারে। প্রমাণাভাবে নেতাজীকে লেখক যেমন জীবিত বলে ঘোষণা করেননি। একই কারণে মৃত্যু সম্বন্ধে কোন কথা নিশ্চিতভাবে বলেননি। তবে তার দেওয়া ইঙ্গিতটি প্রণিধানযোগ্য।

প্রকাশক শ্রী ডি মেহরাকে ধন্যবাদ জানাই তিনি এই বইখানির উচ্চ মূল্য ধার্য্য করেননি। তাই সাধারণ মানুষের নাগালের বাইরে যাবে না। বইখানির ছাপা ভাল। বাঁধাই সুন্দর, কাগজ মূল্যবান। বরণীয়দের উক্তি, নেতাজীর জীবনপঞ্জী ও নির্ঘণ্টপত্র সন্নিবেশিত করে তথ্যানুসন্ধানী লেখকের ও পাঠকের বিশেষ উপকার করেছেন। শ্রী মেহরার কাছে আমরা প্রত্যাশা করব আরো কয়েকজন দেশনায়কের জীবনী প্রকাশ করে, দেশের মানুষের প্রশংসা-ধন্য হতে সচেষ্ট হবেন।

আমরা পুস্তকখানির বহুল প্রচার কামনা করি।....

—পুস্তক সমালোচক

"বিপ্লবী বাংলা"।

RgadNo. R. N. 24511/71 | Biplabi Bangla | Regd. W B/NC 77
Phone : 34-1795
বার্ষিক :—সডাক ১৫.০০ টাকা | ষাণ্মাসিক :—৮.০০ টাকা | মূল্য—৩০ পয়সা

30
0861 330 5

বিপ্লবী পুস্তকমালা

নেতাজীর সিক্রেট সার্ভিস — ডাঃ পবিত্রমোহন রায়—১০.০০

ক্ষীরোদ কুমার দত্তের—

১। বাংলার অগ্নিযুগ—১.৫০
২। ঘরোয়াভাবে ভারতীয় বিপ্লব প্রচেষ্টা—৮.০০
৩। অনুশীলন সমিতির পি, মিত্তির—২.০০
৪। গৌহাটী সংগ্রাম কাহিনী—১.০০
৫। কাকোরী শহীদবৃন্দ—১.১৫
৬। কলকাতা বাজার সংগ্রাম কাহিনী—.৪০
৭। রাসবিহারী ও অনুশীলন সমিতি—.৬০
৮। স্বাধীনতার শহীদ মা ও বোন—.৪০
৯। বিবেকানন্দ ও সমাজবাদ—.৬০
১০। বিপ্লবী বিবেকানন্দ—.৫০
১১। মহাত্মা ও সুভাষচন্দ্র—.৪০
১২। ভারতের নবজাগরণ ও ভগিনী নিবেদিতা—.১৫
১৩। বেশ কাছের তোপেনি (১)—১.০০
১৪। বেশ কাছের তোপেনি (২)—২.০০
১৫। শহীদ চন্দ্রশেখর আজাদ—.৫০
১৬। ১০ই এপ্রিল জাতীয় শহীদ দিবস—১.০০
১৭। হাতিয়ার তৈরী প্রচেষ্টা—.১৫
১৮। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও অনুশীলন সমিতি—৪.০০
১৯। ভারতের জাতীয় পতাকার ইতিহাস—.৪০
২০। লাট হত্যা প্রচেষ্টা—১.৫০

প্রাপ্তিস্থান :—৪নং বঙ্কিম চ্যাটার্জী ষ্ট্রীট কলিকাতা-৭০০০৭৩

টেলিফোন—১১/১/১৪৯ বঙ্কিম চ্যাটার্জী ষ্ট্রীট কলিকাতা-৭৩

— সম্পাদক মণ্ডলী —
শ্রীজগদীশ চট্টোপাধ্যায় (সভাপতি) শ্রীঅমরেশচন্দ্র মন্ত্রী, শ্রীপুলিন চ্যাটার্জী
সম্পাদক—শ্রীসাতি শরণ রায়চৌধুরী
বিপ্লবীর বিশেষ প্রতিনিধি—শ্রীবারীন ঘোষ। বেতালা—শ্রীমনগোপাল পাল।
প্রকাশক ও মুদ্রক :—শ্রীঅমিল সেনগুপ্ত । প্রচার সচিব—শ্রীসুরেন্দ্র সোম।
বিপ্লবী বাংলা কার্য্যালয় :—৪নং বঙ্কিম ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০৭৩
মুদ্রণে—প্রিন্টিং পাবলিসিটি, ১১১ নং কেশব সেন ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৭০০০০৯

বিপ্লবী বাংলা

বিপ্লবী পরিষদের সাপ্তাহিক মুখপত্র
স্থাপিত—১৯৫৬, 'বিপ্লবী বাঙ্গালী' নবকলেবরে—১৯৭৯

দশম বর্ষ	শনিবার ৬ই অগ্রহায়ণ ১৩৮৭ ২২শে নভেম্বর ১৯৮০	৭ম সংখ্যা

"এটা খুবই সম্ভব যে, যে সমস্ত ভারতবাসী স্বাধীনতা অর্জনের জন্য কোন ত্যাগই করেনি তারাই দেশে ক্ষমতা লাভ করবে এবং নিজেদের স্বার্থ-সিদ্ধির জন্য সেই ক্ষমতা ব্যবহার করবে। তোমরা জান যে ভারতবর্ষে এরকম লোক অনেক আছে যারা দেশের লোকদেরই শোষণ করে থাকে।"

—নেতাজী

প্রাক্তন বিপ্লবী শ্রীঅনিল দাসগুপ্তের জীবনাবসান

ব্রঙ্কো নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত হয়ে প্রায় দশ দিন শয্যাশায়ী থাকার পর পাঁচই নভেম্বর, ১৯৮০ বুধবার, কলকাতায় অনিল দাশ গুপ্ত তাঁদের দক্ষিণ কলকাতার এস. আর. দাশ রোডের বাসায় শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন। তিনি ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে ঢাকায় জন্মগ্রহণ করেন। ১৯২৫ খৃষ্টাব্দে তিনি বিপ্লবী সংগঠন অনুশীলন সমিতির সদস্য হন। তিনি ছিলেন একজন উৎসর্গীকৃত প্রাণ, একনিষ্ঠ স্বাধীনতা সংগ্রামী। তরুণ বয়সে ঢাকার বিপ্লবীদলের একটি দুঃসাহসিক ব্যর্থ প্রচেষ্টায় অংশ গ্রহণের পর তিনি বাঁকুড়ায় চলে আসেন এবং সেখানকার ওয়েসলিয়ান কলেজে বি-এস-সি পড়েন। সেখানেও তিনি নিয়ত বৈপ্লবিক সংগঠণের কাজে সক্রিয় ছিলেন। দলের কাজে তিনি বাঁকুড়া থেকে মুর্শিদাবাদ জেলার বহরমপুরে যান। ১৯৩০ খৃষ্টাব্দে তিনি বেঙ্গল ক্রিমিন্যাল ল এমেণ্ডমেণ্ট এ্যাক্টে বিনা বিচারে বন্দী হন এবং প্রায় ৬ বৎসর বন্দী অবস্থায় কাটান। পরে তাঁকে অন্তরীনে পাঠান হয় সেখান থেকে পালিয়ে গিয়ে দলের কাজে সক্রীয় হন। সেই অবস্থায় আবার ধরা পড়েন। অন্তরীন আইন লঙ্ঘনের জন্য তাঁর ১ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড হয়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় তাঁকে পুনরায় গ্রেপ্তার করে ও দীর্ঘকাল বিনা বিচারে আটক রাখে। তিনি অকৃতদার ছিলেন। তাঁর অমায়িক ও মধুর ব্যবহারের জন্য তিনি ছিলেন অজাতশত্রু। অনুশীলনের এক অংশ যখন বিপ্লবী সমাজতন্ত্রী দল সংগঠিত করে তখন তিনিও ছিলেন তার প্রতিষ্ঠাতাদের একজন। পরবর্তী কালে তিনি সক্রিয় রাজনীতি হতে সরে যান। অনেকে হয়ত জানেন না যে তিনি বালো দীর্ঘ ৬:৭ বৎসর ধরে শান্তিনিকেতনের ছাত্র ছিলেন।

বন্ধু বিয়োগ সর্বদাই শোকাবহ, কিন্তু অনিল দাশগুপ্তের ন্যায় আত্মস্বার্থে উদাসীন বিপ্লবীর প্রয়াণে এই কামনা উচ্চকিত হয়ে ওঠে যে দেশে যেন তাঁর মত দেশপ্রেমিকদের আবির্ভাব হয়।

সম্পাদকীয়—

দেশের রাজনৈতিক চিত্র

আমাদের দেশের রাজনীতির ক্ষেত্রটা এমন অপরিণামদর্শী হয়ে উঠছে। ঘোলাজলে মৎসশিকার করার প্রবৃত্তি এমন বেড়ে যাচ্ছে যে তার দ্বারা গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাটাই বিপন্ন হয়ে পড়ার উপক্রম হয়েছে। বিরোধীতার খাতিরে বিরোধীতা করা হবে। এমন কি জাতীয় স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হয়, এমন কাজকর্মকে সমর্থন করা হবে। (আসাম আন্দোলন যেমন ভারতীয় জনতাদল সমর্থন করে বলে তাদের সভাপতি মন্তব্য করেছেন) এতে বিরোধী দলের সম্ভাবনাই বিনষ্ট হচ্ছে, যার ফলে স্বাধীনতার তেত্রিশ বছর পরেও, কোন বিকল্প বিরোধী দল গড়ে উঠতে পারেনি। জনতাদল নাম দিয়ে বিভিন্ন বিরোধী দল যে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছিলেন, দেশের জনগণ তাদের সামনে যে সুবর্ণ সুযোগ তুলে ধরেছিল, তারা শোচনীয়ভাবে ব্যর্থ হয়েছেন। তার প্রধান কারণ এটা বলেই বহু মননশীল মানুষ মনে করেন যে দলের বিভিন্ন অংশ দেশের স্বার্থের উপরে নিজ নিজ দলের বা ব্যক্তিগত স্বার্থকে স্থান দিয়েছিলেন। নব রূপান্তর ঘটাতে না পারলে সফলতা অর্জন করা কখনও সম্ভব হবে না সুযোগ পেলেও, এটা কি সংশ্লিষ্ট পক্ষরা চিন্তা করে দেখছেন না?

যদি কেউ স্বেচ্ছায় আত্মঘাতী পথ বেছে নেয়, তবে সে পারিষদ তাদেরই। দেশের মানুষ কিন্তু এটা বরদাস্ত করবে না কখনই যদি তাদের স্বার্থের উপর সংসদের ষ্টীম রোলার কেউ চালায়। কৌশলে ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার ঘটনা যদি ঘটে, যেটা কোন সুস্থ লোকই চাইবেনা যতক্ষণ পর্যন্ত বিশৃঙ্খলা অরাজকতার রূপ ধারণ না করে। সেক্ষেত্রে কেউ যদি ভেবে থাকেন যে গণ্ডগোল সৃষ্টি করে সব কিছু ধ্বংস করে দিতে পারবেন তবে তিনি বা তারা নিশ্চয়ই মূর্খের স্বর্গে বসবাস করছেন। যদি কেউ কারো উপর অন্যায় অবিচার করে, তবে তার সুবিচারের জন্য জনতার আদালতেই যাওয়া উচিৎ, অবশ্যই গণতান্ত্রিক ভাবে সংবিধান সম্মত উপায়ে। এটাও স্মরণে রাখা দরকার গণ্ডগোল সৃষ্টি করে কোন দলের নিজেদের অযোগ্যতা ও অপদার্থতার গ্লানি মোচন করা যাবে না। জনতার আদালত কঠিন ঠাঁই। জনতার আস্থাভাজন না থাকলে কি পরিণতি হয় রাজনৈতিক দলের তার নমুনা দেশে বিদেশে বিরল নয়।

সম্প্রতি একটি খবরে প্রকাশ যে কেন্দ্রের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাবার জন্য, সরকারী দল-গুলির তরফ থেকে 'বাংলা বন্ধ'এর ডাক দেওয়া হয়েছে। এর পরিণতি হবে কেন্দ্র ও রাজ্যের মধ্যে সংঘর্ষকে ডেকে আনা। এটা কি সংবিধান সম্মত? তা ভিন্ন কেন্দ্রের সঙ্গে সংঘর্ষের ফলে যদি রাজ্যের পরাজয় ঘটে, যেটা ঘটার সম্ভাবনা সমধিক, তাহলে কি হবে? এলোমেলো করে দিয়ে পুটেপুটে খাওয়ার "নীতিকেই প্রশ্রয় দেওয়া হবে কি তাতে কার স্বার্থ রক্ষিত হবে? জনগণের কথা ত ছেড়েই দিলাম, সংশ্লিষ্ট দলগুলি কি টিকে থাকতে পারবে বহাল তবিয়তে? গণ-

[illegible] [illegible]

স্বার্থ সাধিত হবে কি এই পথে? কোন চিন্তাশীল মানুষই একে সমর্থন করবে না। তা ভিন্ন, অতীত দিনে এমন অপচেষ্টার ফলশ্রুতি কি দাঁড়িয়েছিল সে কথা ভুলে গেলে নিজেদের বিপদকেই ডেকে আনা হবে।

পশ্চিমবঙ্গের দুর্ভাগ্য এই যে কোন রাজনৈতিক দলই নিজেদের যোগ্যতার প্রমাণ দিতে পারছেন না। এমন কি ভারতের অন্যান্য প্রদেশে বহুলাংশে ক্ষমতাসীন আছেন, সেই দলও এখানে এলোমেলো। আত্মকলহ নিয়েই তারা ব্যস্ত। কাজেই মানুষের আস্থা তারা অর্জন করতে পারছেন না। তবে কি পশ্চিমবাংলা ধীরে ধীরে অথচ নিশ্চিতভাবে গভর্ণরের শাসন কায়েম করার পথে এগোচ্ছে? অত্যন্ত লজ্জার কথা, ক্ষোভের কথা, যেখানকার মানুষ একদিনও স্বদেশ সেবা, সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান, ধর্ম প্রভৃতি প্রতিক্ষেত্রেই যারা ভারতকে নেতৃত্ব দিয়েছিল, সেই রাজ্য কি আজ বন্ধ্যা? স্বামী বিবেকানন্দ, রামমোহন, রবীন্দ্রনাথ, শ্রীঅরবিন্দ, আচার্য জগদীশচন্দ্র আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র, দেশবন্ধু, নেতাজী সুভাষ, দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন, রাসবিহারী বসু, ব্রহ্মবান্ধব প্রভৃতির মত মনীষী সচরাচর জন্মগ্রহণ করেন না, একথা মেনে নিতে হয়। কিন্তু এরা ছাড়া যে সব আদর্শবাদী, মৃত্যুঞ্জয়ী সংগ্রামীরা একদিন জীবনপণ করে সব অন্যায় অবিচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়ে, ন্যায় সত্যের প্রতিষ্ঠা করেছিল তাদের প্রকৃত উত্তর সাধক কি কেউ নেই যারা বাংলা ও বাঙ্গালীকে এই মুমূর্ষু অবস্থা থেকে রক্ষা করে তাদের নবজীবন দান করতে পারে? ভরসা দিতে পারে এই পরিবেশ প্রলয়ের অশনি সংকেত নয়, এটা হচ্ছে নূতনের সৃজন-বেদন? "সবই কি নিচে যাওয়া ভলক্যানো" নেই কি কোন "তাজা ভিসুবিয়স্" যে "চারিত্রোর ক্রিয়া প্রভাবে" অন্যকে ক্রিয়াবান্ করতে পারেন?

সর্ব ভারতীয় রাজনীতি ক্ষেত্রে অবস্থাও হতাশাব্যঞ্জক শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর বিকল্প নেতার সন্ধান দেশে পাওয়া যাচ্ছে না। বিরোধী দল এই নেতৃত্ব দিতে সম্পূর্ণ ব্যর্থ। তবে গণ-অভ্যুত্থের ভবিষ্যৎ এদেশে কি নেই। Presidential form of Govt. কি আমরাই ডেকে আনছি না? হৈ চৈ করে গান্ধীর উপর সব দোষ চাপান যায়, কিন্তু তাতে মৌল সমস্যার কোন সমাধান হয় না। দেশপ্রেমিক প্রত্যেক মানুষকেই এই সমস্যার সমাধান খুঁজে পেতে হবে। নতুবা God helps us all বলা ভিন্ন কোন উপায় দেখা যাচ্ছে না। দেশের চিন্তাশীল মানুষ মাত্রেই সেই Messiah বা দেশের মুক্তি দাতার পথ চেয়ে বসে আছেন। তাঁকে স্বাগত জানাতে দেশবাসী প্রস্তুত।

———

একটি ঘোষণা

যান্ত্রিক গোলযোগের জন্য আগামী সংখ্যা বিপ্লবী বাংলা প্রকাশিত হইবে না। পরবর্তী সংখ্যা ৬ই ডিসেম্বর প্রকাশিত হইবে।

সম্পাদক—বি: বা:

দিল্লী অনেক দূর

—শ্রীসতীভূষণ সেন

মেঘে মেঘে বেলা শেষ। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের একশো কোটি টাকা হজম করে বড়বাবু ঢেকুর তুলছেন। ছোটবাবু 'টাকা-আনা'র বিশ্ব খেতাব জয় করে পরিশ্রান্ত; এখন শুয়ে শুয়ে 'সকবিতা' আর 'পিয়ারলেস' চিবোচ্ছেন। মেজো সেজোরা প্রত্যেকেই এক একজন ভীমসেন। "অতি হল, অতি খল, অতীব কুটিল" বলে গদা ঘুরোচ্ছেন, আর দাপাদাপি করছেন আসরে।

একজন সাংবাদিক শুধোলেন ইন্দিরাকে 'আর কতদিন ওদের খেলা দেখবেন? ওদের সম্বন্ধে আপনার মনের বাসনাটা কি?'

ইন্দিরা সোজাসুজি কারও কথার জবাব দেন না। সেটা ওঁর 'ষ্টাইল' নয়। বললেন, ওরা নতুন আর বিশেষ কি দেখাবেন? 'জনতা'র মাথায় পা দিয়ে, টুক করে ঘোড়ার পিঠে চড়ে বসেছেন, এই তো নোবেল প্রাইজ জেতার মত খেলা। এখন তেপান্তরের মাঠ চষে বেড়াচ্ছেন। কোন রাজকন্যেকে তুলে আনেন, দেখা যাক।

বহুদিন আগে জ্যোতিবাবু যখন বিলেত থেকে টাটকা বিলেবের গন্ধ গায়ে মেখে দেশে ফিরলেন, তখন তাঁর চোখে ছিল নেশা, বুকে ছিল আশা। সেদিকার কোন চিহ্নই খুঁজে পাবেন না আজকের গোমরা গোল মুখখানায়। তখন ক্ষমতার অলিগলিতে 'হাঁটি হাঁটি পা পা' শিখতে শুরু করেছেন মাত্র। দিল্লী অনেক দূরে, নাগালের বাইরে।

তাঁদের সম্বন্ধে আমরাও বিশেষ কিছু জানতাম না। দেখতাম একহাতে মোটা মোটা লাল কেতাব, অপর হাতে ছোট্ট একটি মাইক। সে মাইকের সে কি গলা ফাটানো আওয়াজ! ধ্বনি উঠল, লীগের দাবি মানতে হবে: একটি আওয়াজেই ঘায়েল হলেন মুসলিম লীগ। লীগের সবুজ পতাকা এগিয়ে এসে পার্টির লাল পতাকার সঙ্গে গাটছড়া বাঁধল, লেফট রাইট করতে লাগল সহরের রাজপথে। আমরা খুসী হয়ে ভাবলাম এবার লীগের জাত গেল। কিন্তু দেখলাম লীগের নড়বড়ে সংগঠন শক্তই হয়ে উঠতে লাগল পার্টির ছোঁয়া লেগে।

এই সময়টায় হিন্দু মুসলিম বিরোধ বেড়ে উঠতে লাগল চারদিকে। এজন্য আমরা মনে মনে পার্টিকে দায়ি করলাম। ওদের উল্টো পাল্টা ব্যাপার স্যাপার দেখে রাগ হল। ভয়ও হতে লাগল মনে। হিন্দু মুসলিম এদেশে তো আজকে নতুন আসেনি যে কেউ কাউকে সহ্য করতে পারবে না। তবে কেন একটুতেই রক্তারক্তি শুরু হয়ে যায়? যিনি বাধা দিতে যান, তারই মাথা বাঁচানো কঠিন হয়ে পড়ে? শেষটায় দেশ ভাগ হয়ে তবে শান্ত হল। শান্ত কি আর হল, জের তো এখনো চলছে।

দেশটা ভাগ করে রেখে গেলেন সাহেবরা, ভার মাশুল গুনতে হল আমাদের। পশ্চিমবাংলার রাজপথ, ছেয়ে গেল পূববাংলার বস্তুহারায়। যেদিকে চোখ যায়, পোঁটলা পুঁটলি ফেলে ছাড়ি আর ভাঙ্গা টিনের বাক্স। যেদিকে কান যায়, শুকনো পেট শিশুর মুখে ভাঙ্গা গলার কান্না। এদের আন্দামানে পুনর্বাসনের আয়োজন করলেন বিধানবাবু। বাধা দিলেন পার্টি। 'ওরা 'ক পুন'

না জানাত, যে কালাপানি পাঠাতে চাইছেন?' শুভকার্যে জঙ্গল সাফ করা হল সেটাও মনঃপুত হল না জ্যোতিবাবুর। একবার দেখতে গেলেন না, কোন আলোচনায় যোগ দিলেন না; দুই কানে আঙুল দিয়ে বিরোধী দলনেতার কর্তব্য সম্পাদন করে গেলেন।

যারা জমি চায়, পেতে লাগল ডোল। যারা কাজ চায় তাদের দেওয়া হল আলস্য। চিন্তাশীল মানুষ তো ছিলেন দু' চারজন পার্টিতে, কেউ বললেন না 'ভুল হচ্ছে'। মানুষকে হাত-পা বেঁধে ভিখিরী করা হতে লাগল। সে যে মনুষ্যত্বের কত বড় অপমান কারো চোখে পড়ল না। একটা 'র‍্যাকেট' গড়ে উঠল উদ্বাস্তুদের সাহায্য করা নিয়ে। ধর্মের অন্ধ উন্মাদনা দেখেছি দেশ বিভাগের আগে, আজও তার শাস্তি পাচ্ছি। স্বাধীনতার পরে দেখলাম রাজনীতির উগ্র অন্ধ আত্মানুবর্তীতা। তার তাণ্ডব থেকে কবে মুক্তি পাব, কে জানে?

তখনো বাস্তুহারাদের ক্লীব করে তোলা সফল হয়নি। দেখা গেল পার্টির 'কাডরে'রা দাড়ি রাখছেন, বিড়ি ধরছেন; চেড়া পাজামার পা সেদ্ধিয়ে দিয়ে ছিড়ে যাচ্ছেন শ্রমিকের লাইনে। পুরানো শ্রমিক নেতারা শ্রমিকদের 'পাওনার' কথার সঙ্গে দেওনা'র কথাটাও শেখাতেন। বলতেন 'যেমন মাইনে নেবে তেমনি পুরো কাজ আদায় করবে। তবেই তো দিকে দিকে নতুন শিল্প গড়ে উঠবে, কাজ পাবে তোমার বেকার ভাই।' নতুন নেতা শ্রমিকের কানে নতুন কথা শোনালেন। 'অনেক খেটেছো মালিকের জন্য। এখন সুদশুদ্ধ আদায় করে নেও। আমার সঙ্গে এসো, আমি তোমায় পাইয়ে দেব।' প্রকৃত ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন সেই দিন থেকে ডুবতে লাগল। উঁচুতে লাগল পার্টি, ইউনিয়নের মই বেয়ে।

সেদিন সাংবাদিক সম্মেলনে ইন্দিরাকে যখন প্রশ্ন করা হচ্ছিল, তখন বামফ্রন্টের হলদিয়া অবরোধের কাহিনী তাঁর কানে পৌঁচেছে। কলকাতার বন্দর কর্তৃপক্ষ হলদিয়া ডকের আইন শৃঙ্খলার গুরুতর অবনতির সংবাদ জানিয়েছেন। ডকের দুজন ইঞ্জিনিয়ার আহত হয়ে হাসপাতালে গেছেন। হাঙ্গামা দমনের জন্য রাজ্য সরকার কিছুই করছেন না। কারণ নাটের গুরু তাঁদেরই পেয়ারের সিটু CITU। ধর্মঘটিরা অফিসার কোয়ার্টারের সামনে গিয়ে মেয়েদের ভয় দেখাচ্ছে। পুলিশ একটা Camp বসিয়েছে ডকে, বলছে আর কিছু করতে পারবে না। শিল্প বিরোধের ব্যাপারে, তাদের নিজ থেকে কিছু করার স্বাধীনতা নেই।

এদিকে বিপাকে পড়ে গেছিলেন Indian oil এর কর্তৃপক্ষ। ডক ধর্মঘটের সঙ্গে তাদের কোন সম্পর্ক নেই কিন্তু এরই ফলে তাদের রিফাইনারি বন্ধ হয়ে যাওয়ার মুখে। কারণ অপরিশোধিত তেলের মজুত শেষ হয়ে গেছে। Dead Stock বা তলানি সাধারণ অবস্থায় বা তোলার চেষ্টা করা হয়না, তাই চেঁছে মুছে তুলে রিফাইন করা হচ্ছে। নইলে কাজকর্ম আগেই বন্ধ হয়ে যেত। তখন কলকাতা বন্দর থেকে বিহারের শেষ সীমা পর্যন্ত তেল ফুরিয়ে যেত। কেরোসিন, রান্নার গ্যাস, পেট্রল ডিসেল কিছুই থাকতো না। উনুন জ্বলত না, মোটর চলত না, ট্রাক ছুটত না। মাঠের জলসেচ বন্ধ হয়ে যাওয়ায় শুকিয়ে খড় হয়ে যেত ক্ষেতের ফসল। ক্রুডের যোগান যদি না আসে, সেই ভয়াবহ অবস্থাই আসবে, কলকাতা থেকে বিহার পর্যন্ত বিস্তীর্ণ এলাকায়।

ইরাক ইরানে দারুন লড়াই বেধেছে ; তাই কি তেল আসছে না ? মোটেই তা নয়। লড়াই সত্ত্বেও তেল আসা আটকে যায় নি। লাখ লাখ টন ক্রুড নিয়ে আমাদের ট্যাঙ্কার হলদিয়ায় পৌঁছেছে। কিন্তু ডকে ধর্মঘট তাই ট্যাঙ্কার সেখানে ভিড়তে পারছেনা। দুজন ইঞ্জিনিয়ার গেছিলেন একটা ট্যাঙ্কার থেকে তেল নামাতে। এমন শিক্ষা পেয়েছেন যে আর জীবনে তেল নামাবার চেষ্টা করবেন না। এখন হাসপাতাল থেকে ভালয় ভালয় বাড়ী ফিরলে হয়।

শেষটায় ইন্দিরার চিঠি পেয়ে জ্যোতিবাবু উঠে বসলেন, ডকেরও ট্রাইকের জ্বর ছাড়ল। আমাদের ফাঁড়া কাটল। আসল Strike লাগাবার কথা ১৮ই তারিখে, সেই কথাটি ভুলবেন না এক নকল Strike এর ধাক্কায় আমাদের সমাজ জীবন স্তব্ধ হয়ে যাবার যোগাড় হয়েছিল। সেই ঘটনা থেকে আমরা কি কিছু শিক্ষা লাভ করলাম ? কিছুমাত্র না। শুধু ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে দেখলাম কত সহজে মুহূর্তের মধ্যে একটা বিস্তীর্ণ এলাকার জীবন স্পন্দন থামিয়ে দিতে পারেন মনোরঞ্জন দা ! সিটু যে কতো শক্তিমান, আমরা যে তাঁর হাতে পিঁপড়ের মত অসহায়, সেইটে বোঝা গেল।

হলদিয়ায় যে এত ঘটনা ঘটছে, রাইটার্স বিল্ডিং-এ তার মুখ্যমন্ত্রী কিছুই জানতেন না। কলকাতার পাম্পিং ষ্টেসন গুলিতে ডিজেল ফুরিয়ে গেল, প্রাইভেট বাস একে একে অদৃশ্য হয়ে গেল রাজপথ থেকে তিনি জানতেও পারলেন না। তেলের জন্য অপেক্ষমান ট্রাকের দীর্ঘ লাইনের ছবি ছাপা হল দৈনিক কাগজে ; তাঁর চোখেও পড়ল না। কারণ রাজা কান দিয়ে দর্শন করেন চোখ দিয়ে নয়। অফিসিয়াল কাইলে, লাল ফিতে বেঁধে যে সব খবর আসবে, শুধু মাত্র সেগুলিই তিনি দেখবেন।

এবার চোখ ফুটল ইন্দিরার চিঠি পেয়ে। ধর্মঘট ভাঙলো, জাহাজ ভিড়লো, ক্রুড খালাস হল। রিফাইনারি চলতে শুরু করল। আমরা প্রাণে বাঁচলাম। —ধর্মঘটিদের জয় হল ; যে ছয়জন শ্রমিক নেতার উপরে সাসপেনশনের নোটিশ ছাড়া হয়েছিল, তাঁরা কাজে যোগ দিলেন। বিজয় মিছিল বেরিয়ে পড়ল হলদিয়ায়। যে সব শ্লোগান ছাড়তে লাগলেন তাঁরা, অফিসারদের পাড়ায় পৌঁছে, তাতে মা লক্ষ্মীরা পালিয়ে আসতে লাগলেন কলকাতায়।

এরপর আসছে বাংলা বন্ধ। অনেক দিন আগে একটা আসল বাংলা বন্ধ দেখবার সৌভাগ্য হয়েছিল। সেটাও ডেকেছিলেন CPM। তখন তারা সরকার বিরোধী দলের শিরোমনি পথে পথে গড়ে উঠেছিল অবরোধ ; ট্রাম বাস, গাড়ি ঘোড়া থেমে গেছিল। গুলি চলেছিল, ট্রেন জ্বলেছিল, মানুষ মরেছিল। নেমে এসেছিল কেয়ামতের দিন। এখন বামফ্রন্টের হাতে শাসণ ক্ষমতা, তারাই আয়োজন করেছেন বাংলাবন্ধের। কপালে থাকলে এই 'উলটো পুরান' দেখবার জন্যও বেঁচে থাকব। বুঝতে পারছিনা শাসক বামফ্রন্ট কি সেদিন ছিন্নমস্তার মত নিজের রক্ত নিজে পান করবেন, যাই করুন, দিল্লী তবু নাগালের বাইরেই রয়ে যাবে।

আসাম সংকট কি ভাবে মিটবে?

কালীপদ সরকার

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

আসামের বিদেশী বহিষ্কার আন্দোলন মূলতঃ বাঙ্গাল খেদা আন্দোলনের সুপরিকল্পিত নব সংস্করণ। আন্দোলনের লক্ষ্য এবং শিকার আসামে বসবাসকারী বাঙ্গালী হিন্দুগণ যারা ভাগ্য বিড়ম্বিত পূর্ব-পাকিস্থান ত্যাগী উদ্বাস্তু। প্রথমেই জানা দরকার এদের সংখ্যা কত, এদের অবস্থিতি আসামের ভাষা ও সংস্কৃতির বিপদের কারণ হয়েছে কিনা এবং জন-সংখ্যাবৃদ্ধির চাপ আসামের অর্থনৈতিক ও আঞ্চলিক ভারসাম্য বিনষ্ট করেছে কিনা।

১৯৭১ সালের পর আসামে উদ্বাস্তু আগমন বন্ধ হয়েছে। সুতরাং ১৯৭১ সালকে ভিত্তিবর্ষ ধরে পিছনের দিকে তাকান যেতে পারে। ১৯৭১ সালকে সীমারেখা করার আর একটি কারণ, ১৯৭১ সালের সেন্সাস রিপোর্ট অনুযায়ী সমীক্ষা চালাবার সুবিধা। পরবর্তী সেন্সাস হবে ১৯৮১তে।

১৯৭১ সালের সেন্সাস মতে আসামের জন সংখ্যা ১,৪৭,২৫,০০০। মুসলমান সংখ্যা তার মধ্যে শতকরা ২৪ জন। অসমীয়ারা মুসলমানদের প্রতি বিদ্বেষ ভাবাপন্ন নয়, তার কারণ মুসলমানদের মধ্যে অধিকাংশই কৃষিজীবি এবং ক্ষেত মজুর, যাদের না হলে অসমীয়া ভূমি মালিকদের চাষ আবাদের কাজ চলে না।

আসামে প্রতিবর্গ কিলোমিটারে লোক বসতি ১৫০, সে তুলনায় পশ্চিমবংগে ৫০৭ এবং সমগ্র ভারতে ১৭৭। জনসংখ্যার বিচারে আসামে লোক-বসতি সর্বভারতীয় হারের নীচে। এ তথ্য ১৯৭১ সালের সেনসাস অনুযায়ী। সুতরাং উদ্বাস্তু আগমনে আসামে জনবৃদ্ধির চাপ অসহনীয় হয়ে উঠেছে এ ধারণা অমূলক।

১৯৭৬ সালের ১২শে মার্চ লোকসভার অধিবেশনে শ্রীসোমনাথ চ্যাটার্জি এম. পি জানতে চান ১৯৪৮ থেকে ১৯৭১ সালের মধ্যে পূর্ব-পাকিস্থান তথা বাংলাদেশ ছেড়ে কতজন উদ্বাস্তু ভারতে এসেছেন এবং তার উত্তরে কেন্দ্রীয় সরবরাহ ও পুনর্বাসন মন্ত্রী শ্রীরাম নিবাস মিরধা বলেন এই সংখ্যা ৫২,৩১,০০০।

উদ্বাস্তুদের অধিকাংশই পশ্চিম বাংলায় বসতি স্থাপন করেছে। লোকসভার বিবরণ থেকে জানা যায় যে, ১৯৬৪ সালের ১লা এপ্রিল থেকে ১৯৭০ সালের ২১শে নভেম্বর পর্যন্ত আসামে উদ্বাস্তু আগমন সংখ্যা ছিল ২,১১,৮১২। ১৯৪৮ থেকে ১৯৬৪ সালের মার্চ পর্যন্ত কত উদ্বাস্তু আসামে এসেছে তার সঠিক তথ্য জানা না গেলেও তাদের সংখ্যা চার লক্ষের বেশী নয়। ১৯৭১ সালে ইন্দিরা-মুজিব চুক্তি সম্পাদনের পর কিছু উদ্বাস্তু বাঙ্গালাদেশে ফিরেও গিয়েছিল।

সুতরাং আসামে পূর্ব-পাকিস্থান আগত উদ্বাস্তু বাঙ্গালী অধিবাসীর সংখ্যা ৬ লক্ষের মত। ১৯৭১ সালের পরে যারা আসামে এসেছে তাদের সংখ্যা কয়েক হাজার মাত্র। ১৯৭১ সালের পূর্বে যে সকল উদ্বাস্তু আসামে এসেছিল তাদের অধিকাংশই আসাম-বাসীরূপে ১৯৭১ সালের সেনসাসে অন্তর্ভুক্ত এবং তাদের নাম ভোটার তালিকায় যথারীতি উঠেছে। তারা ১৯৭৭ সালের নির্বাচনে ভোটাধিকার প্রয়োগ করেছে। ভোটার তালিকায় নাম ওঠার সুবাদে, নাগরিকদের সার্টিফিকেট সংগ্রহ না করলেও, এই সব উদ্বাস্তু ভারতীয় নাগরিক হয়েছে। এতে বিদ্বেষর

(এর পর ১৭ পাতায় দেখুন)

স্বাধীনোত্তর ভারত কোন পথে ?

শ্রীবংশীধর বন্দ্যোপাধ্যায়

ভারত যখন স্বাধীন হয় তখন কৃষি, শিল্প, শিক্ষা প্রভৃতি সকল ক্ষেত্রেই এদেশ ছিল অনগ্রসর। সম্পদের বৈষম্য ছিল আকাশচোঁয়া। প্রশাসন ছিল মাথাভারী। প্রশাসনের নিচু তলায় দুর্নীতি ছিল বেশ জাঁকিয়ে, যদিও উঁচুতলায় দুর্নীতি ছিল না বললেই সত্য ভাষণ হয়। অবশ্য একথা সঠিক যে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে প্রশাসনের সর্বস্তরেই দুর্নীতির প্রাবল্য পরিলক্ষিত হয় মাত্রাতিরিক্ত আকারে। ঐ সময়ে ব্যবসা ও বাণিজ্যে কালোবাজারী দেখা দেয় নিত্যনৈমিত্তিকভাবে। জমতে শুরু হয় কালো টাকা ব্যবসায়ী ও মহাজনের ঘরে ঘরে। শিক্ষা শুধু মুষ্টিমেয় ওপর তলার প্রান্তিক অংশের কিছু লোকের সাধ্যায়ত্ত ছিল। ভারতের বিশাল জনসংখ্যার শতকরা মাত্র আশেরো থেকে কুড়িজনের আক্ষরিক জ্ঞান ছিল তখন। তারপর সুদীর্ঘ তেত্রিশ বছর পার হয়ে গেছে। ইতিমধ্যে ভারত উৎপাদনের প্রায় সর্বক্ষেত্রে প্রচুর সাফল্য অর্জন করেছে। প্রাকৃতিক ও অন্যান্য বহুতর প্রতিকূলতা সত্ত্বেও গ্রামাঞ্চলের খেটে খাওয়া মানুষ অশেষ ক্লেশ স্বীকারের মাধ্যমে কৃষির উৎপাদন প্রায় আড়াই গুণ বাড়িয়ে তুলতে সক্ষম হয়েছে। শহরে শিল্পে উৎপাদন বাড়িয়েছে শ্রমিকশ্রেণী প্রায় তিন গুণ ও গ্রামাঞ্চলে ক্ষুদ্র কুটির শিল্পের মাধ্যমে উৎপাদন বেড়েছে প্রায় দ্বিগুণ। উন্নতদেশগুলির তুলনায় আমরা অনেক পেছিয়ে থাকলেও বিজ্ঞান ও কারিগরি দক্ষতায় আমাদের অগ্রগতি বেশ উল্লেখযোগ্য। আমাদের সামরিক শক্তি জোর কদমে অগ্রসরমান এবং বিশ্বের যে সব দেশ আমাদের প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই স্বাধীনতা ফিরে পেয়েছে তারা কেউই এই ব্যাপারে অদ্যাবধি আমাদের সমকক্ষ নয়।

ভারতের সামগ্রিক উন্নতি বেশ দ্রুত তালে এগিয়ে চলেছে। সামগ্রিকভাবে এদেশের অর্থনৈতিক উন্নতি স্বাধীনতার পরে উল্লেখযোগ্য হলেও, তার সুফল পাবার ব্যাপারে জনগণের বৃহদাংশ বঞ্চিত বলেই বৈষম্য এত প্রকট। একচেটিয়া ব্যবসায়ী ও পুঁজিপতির দল ও তাদের কিছু আশ্রিত লোকেরাই উক্ত অর্থনৈতিক উন্নয়নের সুফল ভোগের সুযোগ ও অধিকার পেয়েছে। অন্যান্যেরা যার সংখ্যায় ভারতীয়দের মধ্যে শতকরা প্রায় আশীভাগ বা আরো কিছু বেশী হবে, তারা উক্ত সুযোগ ও অধিকার থেকে আজো বঞ্চিত। ফলে মানুষে মানুষে বৈষম্য বেড়েছে বৈ কমেনি। আর্থিক সংস্থানের ক্ষেত্রে, শিক্ষা সংস্কারের ক্ষেত্রে দারুণ ভুল ত্রুটি ঘটেছে কেন্দ্রীয় শিক্ষা মন্ত্রকের খামখেয়ালীপনায় ও নানান ভুল পরীক্ষা-নিরীক্ষা মূলক কর্মকাণ্ডের হঠাৎ অবতারণায় এবং ছাত্রদের ওপর অতিরিক্ত পাঠ্যের বোঝা চাপানোর ফলে। সমগ্র ভারতে শিক্ষা বিভাগের মৌলিক ব্যর্থতার ফলেই আজ শিক্ষা সংকটের মধ্য দিয়ে দেশ চলতে বাধ্য হচ্ছে, যা

জাতীয় ক্ষেত্রে ভবিষ্যতে এক কঠিন সমস্যার সৃষ্টি করবে।

স্বাধীন ভারতে কৃষি পণ্য ও শিল্পজাত পণ্য নিয়ে প্রতি বছরেই ব্যবসায়ীরা কালোবাজারী করেছে, এর ব্যতিক্রম কৈ কোন বছরেই তো দেখা যায়নি। কালো টাকার আনুমানিক মোট পরিমাণ বর্তমানে দশ হাজার কোটি টাকার বেশি বোধ হয়। এদেশে প্রচলিত সমস্ত আইন-কানুনের জন্য ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের হাতে অর্থ নৈতিক সাম্রাজ্যের চাবী কাঠি বহু পূর্বেই পৌঁছে গেছে। আজ তারাই সবকিছু নিয়ন্ত্রন করছে টাকার জোরে। জনগণ সব দেখে, জেনে, বুঝেও যেন অসাড় নির্বাক দর্শক মাত্র। জনগণের বাক্‌রুদ্ধ আজ হতাশায়, রাগে ও ঘৃণায়। জনগণ বৃটিশ আমলে যে আর্থিক দুর্দশায় ছিল এখনও সেই একই হীন অবস্থায় শুধুই জীবনের গ্লানি বহন করে বেড়াচ্ছে। তাদের আশা করবার মত আশা পর্যন্ত নির্মূল। কি মন্বন্তর ও হতাশাব্যঞ্জক পরিস্থিতি আজ ভারতে ? এর মূলে বৃটিশ শোষণের পরেই দেশীয় ধনিক-বণিকদের শোষণ যা স্বাধীন ভারতে অত্যন্ত নগ্নভাবে প্রকাশমান। ফলে মানুষে মানুষে দারুণ অবিশ্বাস বেড়েই চলেছে। কেউ ই কারো কথায় আস্থা রাখতে ভরসা পাচ্ছে না। দিনের পর দিন সমগ্র ভারতীয় সমাজ কলুষিত হচ্ছে। সমাজতন্ত্রের বুলি যতই আমরা আওড়াই না কেন, সমাজতন্ত্র ভারতে আসতে এখনও অনেক দেরী। নৈরাশ্যে দেশ হতমান, কঠিন বাস্তবের সম্মুখীন, যা এড়িয়ে যাওয়া চলে না। প্রতিকারের জন্য চাই কড়া আইন প্রণয়ণ ও তাকে কার্যকরী করা বাস্তব ভিত্তিক পন্থায় অত্যন্ত নির্মমভাবে। এ ছাড়া যে আর অন্য পথ খোলা নেই, এক রক্তাক্ত বিপ্লব ছাড়া। ভারতীয় ধনিক বণিকরা আজ যে পথে চলছে তা মারাত্মক বিপজ্জনক, কারণ আর কতদিন মানুষ এই অমানুষিক হীন অবস্থায় দিন কাটাতে এ ভাবে বাধ্য হবে ? এরও একটা পরিসমাপ্তির দিন নিকটতর হয়ে এসেছে বলে অনুমান হয়। চিরকাল এরূপ চলা উচিত নয় এবং তা চলতে দেওয়াও সামাজিক কঠিন অপরাধ ; তাই এর শেষ হবেই অদূর ভবিষ্যতে, হয় আইন কানুনের মাধ্যমে, আর না হয় রক্তাক্ত সংগ্রামের পথে। অর্থ নৈতিক স্বাধীনতা ছাড়া জাতীয় জীবন উন্নত ও বলশালী কখনও হয় না, অথচ সে চেষ্টা রাষ্ট্রীয় স্তরে ও অন্যান্য উপায়ে বারে বারে ব্যর্থ হচ্ছে কেন ? এর মূলেও সেই একই এজেন্সী অর্থাৎ বৃহৎ ধনিকগোষ্ঠি বা তাদের বশংবদেরা যারা এদেশের রাজনীতিতে নাক ঢুকিয়ে দেশকে চারযারে দিচ্ছে আত্মস্বার্থে ও গোষ্টিস্বার্থে।

ঐসব ধনিক ও বণিক গোষ্ঠী একজোট হয়ে এদেশে ব্যবসা ফেঁদেছে জাতীয় স্বার্থে নয়, একথা আমরা ভুলে যাই কেন ? এঁদের বিশ্বাস করি কেন ? এদেরহাত থেকে সুচতুর কৌশলে চাবি কাঠিটি কেড়ে নিতে হবে, নচেৎ ভারতবাসীর অর্থ নৈতিক মুক্তি নেই। রাষ্ট্র শক্তিই পারে সেই কঠিন দায়িত্ব পালন করতে জাতীর স্বার্থে। কিন্তু বাস্তবে সেটা এখনও সম্ভব হয় নি কেন ? কি এর আসল কারণ ? কারণটা যতদূর অনুমান হয় বেশ মারাত্মক, যেহেতু দেখা যায় যে রাষ্ট্রের কার্যকরী সকল স্তরেই ঐসব বড় ধনীদের ও বণিক সম্প্রদায়ের বেতন ভোগী অথবা উৎকোচে বশীভূত লোকেরাই কর্তৃত্বে আসীন বা কর্তা ব্যক্তিদের বিশ্বাস ভাজন আড়কাঠির দল।

কি ভীষণ অদৃশ্য উপায়ে এরা যে বিরাট জাল বিস্তার করেছে প্রায় প্রতিটি

বিচক্ষণতার ও বুদ্ধিমত্তার সাথে তা অনুধাবন করলে পরিষ্কার বুঝা যায় যে, রাজনৈতিক শীর্ষনেতাদের চেয়ে এরা অনেক বেশী বুদ্ধি ধরে ও অনেক বেশী বেপরোয়া, শোষণের ব্যাপারে। এই শোষণকারী দলই তাদের নিজস্ব বিশ্বাসভাজন লোকদের দিয়ে প্রশাসন চালবার ক্ষেত্রে তাদের অভিপ্রেত কাজ করিয়ে নিচ্ছে যা জনস্বার্থের পরীপন্থী অধিকাংশ ক্ষেত্রেই। এ দেশের জনগণ যে কত অসহায় তা সহজেই অনুমেয়। উক্ত ধনিক-বণিকরা আজো ভারতকে যে পথে নিয়ে যেতে চাইছে তাদের ব্যক্তি-স্বার্থে বা বাণিজ্যিক স্বার্থে, তা যে ক্রমশ ক্রমশই জনগণের জীবন ধারণের মান রক্ষার পক্ষে চরম ক্ষতিকর ও অমর্যাদাকর হয়ে দাঁড়াচ্ছে তা কি ওঁরা এখনও বুঝতে পারছেন না? না কি বুঝেও আত্ম স্বার্থ সংরক্ষণে এমনই মশগুল তারা যে মানুষের শত দুঃখের দিকে দৃষ্টিপাত করতে নারাজ। হৃদয়হীন পাষণ্ডের দল কি জানে না যে, ভীষণ রুদ্র রোষে ফেটে পড়বে মানুষের যুগ যুগ সঞ্চিত বিরাট অসন্তোষ ও তা রক্তাক্ত সংগ্রামের পথে স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে পরিচালিত হবে, আর ইতিহাস সেই কথাই স্মরণ করিয়ে দেয় যুগে যুগে, সর্বদেশে, সর্বকালে। চৈতন্যোদয় যদি শোষণকারী দলের না হয়, তবে অনেক কঠিন মূল্যে এর ঋণ শোধ করতে হবে।

পরিত্রাণ তখন আর থাকবে না বা সংশোধন হবার পথও আর খোলা থাকবে না—একথা যেন স্মরণ থাকে। টাকার পাহাড়ের সর্বোচ্চ শীর্ষে বসে থেকে তারা যে তখন গা বাঁচাতে পারবে না - একথা হলপ্ করে এখনই বলা যায়। বর্তমান বিশ্বে ঔপনিবেশিক শোষণের পথ বন্ধ প্রায়। সে স্থান দখল করেছে দেশীয় পুঁজিপতির দল, যদিও তারও অবসান হবে অচিরে জনগণের মধ্যে নৈতিক মুক্তি আসবেই অন্যান্য দেশের মত এদেশেও। কিন্তু কতদিনে শোষণ মুক্ত সমাজ ভারতে প্রতিষ্ঠিত হবে—সেটাই গবেষণার বিষয়। যতদিন না সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয় এদেশে ততদিন এদেশের ধনিক-বণিকরা শোষণের জগদ্দল পাথর সাধারণ মানুষের উপর নিষ্ঠুরভাবে চাপিয়ে রেখে দেবে। আমাদের মিশ্র অর্থনীতিতে সরকারী ক্ষেত্রকে সমাজতান্ত্রিক ধাঁচে চালান হচ্ছে। এই ক্ষেত্রকে সদাসর্বদা সি, পি, আইও সি, পি, এম বেশ ভালভাবেই সমর্থন করে চলেছে, কারণ উভয় কমিউনিষ্টদল শিল্পক্ষেত্রে জাতীয় করণ নীতির সমর্থক বহু দিন থেকেই, আর তা ছাড়া এদেশের বামপন্থীদল গুলিও জাতীয়করণের পক্ষপাতি সব সময়েই। করদাতাদের দেয় টাকার মোটা অংশ—যার অনেকটাই পরোক্ষ করের মাধ্যমে তোলা হয়, তা সরকারী শিল্প কারখানায় ঘন ঘ লোকসানের ফলে বরবাদ হচ্ছে।

ফলে গরীবরাই মার খাচ্ছে সব চেয়ে বেশী, কারণ সরকারী অপব্যয়ের জন্য তারাই ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে মারাত্মক রকমে শুরুতেই। সরকারী ক্ষেত্রগুলি সর্বদা বেসরকারী ক্ষেত্রগুলিকে যোগান দেবার মানসে মধ্যপর্যের জিনিষগুলি উৎপন্ন করে। বেসরকারীক্ষেত্র আবার ঐ গুলি হইতে বাজারের বিক্রয়যোগ্য পণ্য তৈরী করে নেয় ও ঐসব পণ্য বিক্রি করে প্রচুর মুনাফা লোটে। বাস্তবে দেখা যায় যে, সরকারী ক্ষেত্রের ভূমিকাটা দাঁড়িয়েছে যে, সরকারী খরচে বেসরকারী ক্ষেত্রটিকে গড়ে দেওয়া। সরকার একই সঙ্গে বেসরকারী ক্ষেত্রকে পশ্চিমী বহুজাতিক করপোরেশনের সঙ্গে সহযোগিতার চুক্তিতে আসতে মদত যুগিয়ে এসেছে এতাবৎকাল। ভারতে আজ এমন কোনও গুরুত্বপূর্ণ শিল্প সংস্থানেই যারা নানা উপায়ে এই বহুজাতিকদের সঙ্গে যুক্ত নয়

আবার ঐ সব বহুজাতিক সংস্থা গুলির মধ্যে কারো এদেশে নিজস্ব শিল্পসংস্থা চালু আছে যা থেকে তারাও মোটা মুনাফা পায়। স্বাধীন ভারতে পুঁজিবাদী ব্যবস্থা বেশ দ্রুতগতিতে বেড়ে চলেছে, যেটা কোনমতেই কাম্য ও অভিপ্রেত নয় দেশবাসীর স্বার্থে। ফলে অবস্থার অবনতি ঘটছে ক্রমান্বয়ে এবং দরিদ্ররা আরো দরিদ্র হচ্ছে ও ধনীরা আরো ধনী হচ্ছে। বস্তুত, স্বাধীন ভারতের সরকার জ্ঞানতঃ বা অজ্ঞানতঃ বেসরকারী ক্ষেত্রের সম্ভাবনাকে পুনর্বিন্যাস করেছে। নেহেরুজী সমাজতন্ত্রের একজন প্রকৃত প্রবক্তা ছিলেন।

তাঁর আপ্রাণ চেষ্টা ছিল ভারতে সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা, তা যত শীঘ্র সম্ভব। কিন্তু বাস্তবে তিনি বহু বাধা ও বিঘ্নের সম্মুখীন হন, এদেশীয় ধনিক-বণিকদের দ্বারা। ফলে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা তাঁর পক্ষে অসম্ভব হয়ে পড়ে। শ্রীমতী ইন্দিরাজীও সমাজতন্ত্রের পথে দেশকে এগিয়ে নিয়ে যেতে প্রচুর শ্রম স্বীকার করেন, কিন্তু তিনিও এখনো ঐ ব্যাপারে সফল হতে পারেন নি উক্ত একই কারণে। শ্রীমতীগান্ধী হাল ছাড়বার পাত্রী নন, তাই তিনি দৃঢ়হস্তে এর মোকাবিলায় সদা ব্যস্ত ও উদগ্রীব।

ভারতের বৃহৎ ধনিক গোষ্ঠীর সুচতুর ও ধুরন্ধর ব্যক্তিবর্গ ইন্দিরাজীর ঈপ্সিত সমাজতন্ত্রকে অঙ্কুরেই বিনাশ করতে উদ্যত এবং তারাই বিদেশী ধনিক-বণিকদের সাহায্যে ও সহযোগিতায় ইন্দিরাজীকে সমাজতন্ত্রকে দূরে সরিয়ে দিতে বদ্ধপরিকর দেখা যায়। মানুষের দুর্ভোগ ফলে বেড়েই চলেছে ও অসন্তোষ দানা বাঁধতে শুরু হয়েছে বহুদিন ধরেই। এদেশীয় নীতি জ্ঞানহীন শোষকের দল এখনও বুঝতে পারছে না যে, এদেশের কি বিরাট ক্ষতি তারা করে চলেছে আত্মস্বার্থে বা গোষ্ঠীস্বার্থে; তবে এরও পরিসমাপ্তি ঘটবেই স্বাভাবিক নিয়মে, মানব-জাতির কল্যাণার্থে। প্রকৃতির প্রতিশোধ আছেই এবং তা সুনিশ্চিত। সারা দেশ জুড়ে সামাজিক ও রাজনৈতিক উত্তেজনা বেড়েই চলেছে। দেশে দুর্নীতি ক্রমবর্দ্ধমান। বৃটিশ আমলের চেয়ে এখনকার প্রশাসনে দুর্নীতি অনেক বেশী। আজ রাজনৈতিক স্তরেও দুর্নীতি প্রকট ও তা সর্বজন বিদিত। দিল্লী ও অন্যান্য অঞ্চলের উন্নয়ন পরীক্ষা করলে দেখা যাবে যে, অঞ্চল ভেদে উন্নয়নের হারের তারতম্য আছে এবং পূর্ব ও উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্য-গুলির উন্নয়ন ঘটেছে সবচেয়ে কম এবং কোথাও কোথাও আদৌ উন্নয়ন সম্ভব হয় নি এতদঞ্চলে। ফলে ঐ সব এলাকায় অসন্তোষ বেড়েই চলেছে বহুদিন ধরে। প্রতিকার ও প্রতিবিধান বহু বিলম্বিত, তাই অশান্তি ঐ সব এলাকায় নিত্যকার ঘটনা, যার অবসান ত্বরান্বিত করা এখনই একান্ত প্রয়োজন জনস্বার্থে ও রাষ্ট্র স্বার্থে। ব্যর্থতার বিপদ বাড়বে বৈ কমবে না একটুও। সকল অঞ্চলে সমদৃষ্টির অভাব ইতিপূর্বে দেখা গেলেও আর তা চলতে দেওয়া সমীচীন নয়। প্রতিটি অঞ্চলকে ক্রমোন্নতির পথে একই হারে নিয়ে যেতে হবে এবং কেন্দ্রীয় সরকার সেই ব্যবস্থাই নেবে দেশস্বার্থে অচিরে, নচেৎ বিচ্ছিন্নতা ও বিভেদের সৃষ্টি হবে যা মারাত্মক ক্ষতিকর দেশবাসীর পক্ষে। কেন্দ্রীয় সরকারকে সমদৃষ্টি নিয়ে সকল অঞ্চলের জন্যই উন্নয়নের কাজকে দ্রুত কার্য্যকরী করে তুলতে হবে। কিন্তু বাস্তবে দেখা যায় যে, কোন কোন ক্ষেত্রে পক্ষপাতমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে, যা সত্যই দুঃখজনক। বিগত তেত্রিশ বছরেও যদি দেশকে গড়ে তোলা সম্ভব না হয়ে থাকে, তবে আর কত

(এর পর ১৬ পাতায় দেখুন)

নির্ম্মল সেন

রাখাল দে

তোমার পণ কি ?

"জীবন সর্ব্বস্ব"

"জীবন ত তুচ্ছ জিনিস"

"তবে আর কি আছে কি দিব ?"

"ভক্তি।"

জীবনকে যেমন পেয়েছি তেমনই দিয়ে দিলে তা ত কিছু না দেওয়ার মতই হলো। জীবনকে তপস্যা-দ্বারা পূতপবিত্র করে তার যা সার মন্থন তারই নাম ভক্তি। সেই ভক্তিদান তুচ্ছ জীবনদানের চেয়ে বহু বহুগুণে শ্রেষ্ঠদান। দুগ্ধকে মন্থন করে নবনীত দান। অহঙ্কারের, মমত্বের প্রতিটি শৃঙ্খল-কড়িকে ধৈর্য্যের সহিত কেটে কেটে জীবনকে নির্মোহ করে, নির্মল করে ইষ্টের চরণে সঁপে দেওয়া। এই দানই শ্রেষ্ঠ দান। উত্তেজনা বা উন্মাদনার মধ্যে জীবনদান এক জিনিষ, কিন্তু শান্তমনে, দৃঢ়চিত্তে জীবনকে পবিত্র নৈবেদ্য করে সাজিয়ে দেওয়া অন্য জিনিষ। বিপ্লবের উদ্দাম তরঙ্গ বিক্ষেপের মধ্যেও এরকম দু'একটি শান্ত, সমাহিত জীবন উৎসর্গিত হয়েছে। তার মধ্যে নির্মল সেন একজন।

মাতৃকণ্ঠের শৃঙ্খল মোচনের জন্য বিপ্লবের যে অগ্নিশিখা পুরোধা সূর্যসেনের হস্তেপ্রজ্বলিত হয়েছিল সে যজ্ঞাগ্নিকে ঘিরে বহু ঋত্বিকের সমাবেশ ঘটেছিল, চুম্বক যেমন করে তার পরিধির মধ্যহতে অনাবৃত লৌহখণ্ড গুলিকে অভ্রান্ত আকর্ষণে আকর্ষিত করে নেয় তেমনি করেই চট্টল সূর্য সূর্যসেন চট্টগ্রামের সর্বোৎকৃষ্ট প্রাণগুলিকে আকৃষ্ট করেছিলেন। ত্যাগ এবং তপস্যার দ্বারা জীবনকে সর্বমলিনতা থেকে মুক্ত করতে না পারলে এহেন কার্য সম্ভব হয়না। নিঃশেষে জীবন দানের ছবি আর প্রাতদানে সুনিশ্চিত মৃত্যু আর নির্যাতন বরণ এইত ছিল তাঁর একমাত্র আশ্বাস। আর এক বস্তু, বা অদৃশ্য অন্তরাল হতে আকৃষ্ট করে আমোঘ আকর্ষনে তা হলো অন্তরের উদার অকৃত্রিম ভালবাসা।

ইষ্ট সাধনের জন্য ত্যাগ এবং দুঃখকে নীলকণ্ঠের মত গলাধঃ করণের নামই তপ। আজকের দিনের মানুষের কাছে তপস্যা এক রস মাধুর্যহীন শুষ্ক কাষ্ঠবৎ জীবন চর্চার নামান্তর মাত্র। শিবের জন্য শৈবীর তপস্যা কি শুধু শুষ্ক নিরস কাষ্ঠ মাত্রই ছিল ? সমুদ্রে না গেলে সমুদ্রের ধারণা কি কেবল কুয়োয় বসে বসে তর্ক করলেই হয় ? ত্যাগ ছাড়া, দুঃখ বরণ ছাড়া প্রেম কবে হয়েছে ? আগুন জ্বালানোই যদি উদ্দেশ্য হয় কাঠকে শুকিয়ে নিতেই হবে, আর কাঠকে সরস রেখে রস চাখাই যদি উদ্দেশ্য হয় তবে কাষ্ঠ রসেই সমৃদ্ধ থাকতে হয়—জ্যোতির সাক্ষাৎ ভাগ্যে ছুটবে না। যাকে না পেলে জীবন রসহীন শূণ্য বোধ হয় তাকে পাওয়ার আকুল আকুতিতে যদি রস না থাকে তবে রস আছে কি কেবল জৈব জীবন ধারণেই ? তাই উমাই হলেন ভারতীয় তপস্যার প্রতীক যিনি রসবর্জ্য হয়ে 'অপর্ণা' হয়েছিলেন নিজের অন্তরে শিব-জ্যোতিকে ধারণ করার মানসে. সুতরাং 'তপস্যা' এই পুরোনো নামে যদি কারো অরুচি হয় তবে তাকে নূতন কোন নামে অভিহিত করুন—কিন্তু তার স্তোতনা তপস্যার সমতুল্য হওয়া চাই। অর্থাৎ আলোর প্রকাশের জন্য

সন্তের আলা। এরূপ তপস্যাই আজ পর্যন্ত মনুষ্যকে মহিমার উচ্চ শিখরে আরূঢ় করে রেখেছে। মাষ্টার দা এবং নির্মল সেনের মত চরিত্রের গূঢ় তাৎপর্য পরিস্ফুট করার জন্যই এই আপাতঃ অবান্তর তত্ত্ব কথার অবতারণা।

চট্টলভূমি এমনিতেই প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের নদী, সমুদ্র আর পাহাড় ঘেরা এই ক্ষুদ্র ভূখণ্ড এক মোহাগিনী নব কিশোরীর মাধুর্য নিয়ে একান্ত আপন অনুরাগে নিমগ্না। আবার 'চন্দ্রশেখর মোক্তিনী' হয়ে পবিত্রতার তীর্থ স্বরূপা হয়ে আছেন। কর্ণফুলি, চট্টলার কণ্ঠহার। মাতা মদালসার মত তাঁর বহু সন্তানকে ত্যাগ সন্ন্যাসে দীক্ষিত করেছেন। এই নদীতীরেই নয়াপাড়া, কোয়েপাড়া ইত্যাদি বর্দ্ধিষ্ণু গ্রামের অবস্থান, নয়া পাড়া সূর্য সেনকে জন্ম দিয়ে আর কোয়েপাড়া নির্মল সেনকে জন্ম দিয়ে ধন্য হয়েছেন। নির্মল ছোটবেলা থেকেই শান্ত স্বভাবের হওয়াতে মা, বাবা এবং পরিবার প্রতিবেশী সকলের একান্ত আদরের পাত্র ছিলেন। গ্রামের পাঠশালা ছেড়ে যখন চট্টগ্রাম শহরের মিউনিসিপ্যাল স্কুলে ভর্তি হন তখন থেকেই আমরা তাঁকে দেখতাম কিন্তু আলাপ পরিচয়ের তেমন সুযোগ এখনো হয়নি। আলাপ পরিচয় হয় অনেক পরে, মাষ্টার দার সঙ্গে পরিচয় ঘটার পর থেকে। দেখা হতো প্রায়ই খেলার মাঠে। খেলার ধুলোয় খুব যে একটা উৎসাহ ছিল তা মোটেই নয়, জোর করে নামিয়ে দিলে একবার তারপর দেখা যেত তার কর্তব্য ভাগ পালনের দায়িত্ব বোধ এবং দক্ষতা, স্বভাবের এই বৈশিষ্ট্যই তাঁকে পরবর্তী কালে তাঁর স্বভাব বিরুদ্ধ বৈপ্লবিক কাজের ভার গ্রহণ করতে বাধ্য করেছিল। স্বভাব বিরুদ্ধ কথাটা এজন্য বললাম যে তিনি স্বভাবতঃই ছিলেন উচ্চস্তরের ভাবুক। টানা টানা চোখ-দুটির দৃষ্টি প্রায়ই ঊর্ধ্বে নিবদ্ধ থাকতো। অন্তরের কোমলতা এবং পার্থিব বিষয়ে নিতান্ত উদাসীনতা এসমস্ত প্রথম দৃষ্টিতেই ধরা পড়তো চালচলন এবং কথাবার্তায়, বিপ্লবের কাজে নেমে পড়ার পরেও দেখতাম উদাস ভাব। অনীহা নয়, মাতৃকক্ষের শৃঙ্খল মোচনের আহ্বান তাঁর অন্তরকে নাড়া না দিয়ে পারেনি। বুঝে শুনেই তিনি উদ্দীপনাময় কর্মের বন্ধুর পথকে বরণ করেছিলেন। কিন্তু তথাপি তাঁকে ঘিরে সর্বদা জাগ্রত থাকতো এক ধ্যানানুকূল নির্লেপ ঊর্ধ্বলোকের ভাবনা। স্বভাবের নির্মলতা চোখের দৃষ্টিতেই অনায়াসে স্পষ্ট ভাবেই ধরা পড়তো। তিনি ছিলেন যেন ধ্যান লোকের কোন ঋষি, ধরার কোন বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনে জোর করে ধ্যান ভঙ্গ করে তাঁকে নীচে নামিয়ে আনা হয়েছে। বৈপ্লবিক কাজে লিপ্ত না হলে তিনি নিশ্চয়ই হিমালয়ের কোন গোপন গুহাতেই তার অন্তিম নিলয় প্রতিষ্ঠিত করতেন। কোন দিকদিয়ে কোন রকমেই নিজেকে প্রকাশ করার ভাব তাঁর মধ্যে একেবারেই দেখা যেতোনা, বরং যতটা সম্ভব নেপথ্যে থাকাটাতেই যেন তিনি স্বস্তি পেতেন।

মাষ্টার দা তাঁর নাম দিয়েছিলেন 'ব্যারিষ্টার'। অন্তরাদ বিপ্লবীদের সকলকেই এরূপ এক একটি উপ নামে ভূষিত করা হতো। কিন্তু কি ভেবে যে তিনি এমন এক সন্ন্যাসী স্বভাব নিরীহ মানুষের উপর এমন এক চটুল, চপল, কূটবুদ্ধির প্রতিমূর্তি 'ব্যারিষ্টারের' উপাধিটা এমন বেমানান করে নির্মল-দার ঘাড়ের উপর বসিয়ে দিলেন তা ভেবেই পাইনা। এ যেন গণেশের ঘাড়ে হাতীর মাথা চাপানোর মত ব্যাপার।

চট্টগ্রাম অস্ত্রাগারের সর্বাধি নায়কের মধ্যে যে দুর্লভ গুণটি লুকানো ছিল সেটি হলো মহানায়কের

সর্বাধারে গুণগ্রাহিতার অদ্ভুত ক্ষমতা। দূষিতের গুণাংশকে তিনি যেমন যথাক্ষেত্রে দক্ষতার সহিত কাজে লাগিয়েছেন গুণীর গুণকেও তিনি উপযুক্ত মর্যাদায় তার কাজে নিয়োজিত করতে পারতেন। নির্মল সেনের গুণছিল বৈপ্লবিক ভাবনারও অনেক উর্দ্ধে। বৈপ্লবিক কাজে তাঁর জীবন দীপটি অকালে নির্বাপিত না হলে হয়ত দেশবাসী তাঁর মুখে বেদের অমৃত বাণী শুনে ধন্য হতো। গৃহ-পরিবেশের মধ্যেও তাঁর স্বভাব প্রাপ্ত নির্লেপ ভাবটি উজ্জ্বল হয়ে চোখে ধরা দিত। যেন 'পদ্ম পত্র মিবাম্ভসা।' বাড়ী মায়ের চোখের মনি আর বৌদির অকৃত্রিম, নির্মল ভালবাসা, নিকট আত্মীয়ের অতি প্রিয় শান্ত সুশীল বালকটি। বিপ্লবী হওয়ার পরেও কোন দিন এঁদের প্রতি নির্মম কঠোর হননি, স্নেহময়ী বৌদি ছোটবেলা থেকেই তাঁকে বিশেষ যত্ন করতেন। বড় হওয়ার পরও যে ভালবাসার তারতম্য ঘটেনি। নির্মলের কখন কোন জিনিষের প্রয়োজন, জামা, কাপড়, দূর যাত্রার পাথেয় ইত্যাদির প্রতি বৌদির ছিল অতন্দ্রিত দৃষ্টি। কোথাও যেতে হলে পয়সা কড়িও কিছু বেশী করেই দিতেন। কিন্তু নির্মল ছিলেন নির্মম। এত স্নেহের এ সমস্ত দান তাও বিলিয়ে দিতেন অভাব পীড়িত সঙ্গী সাথিদের মধ্যে, যেন হাঁসের পিঠে জলের ধারা, পড়া মাত্রই গড়িয়ে যায়, গায়ে কিছুই লাগেনা। এমনিই ছিল নির্মলের স্বভাব।

প্রায় ষাট বছর আগেকার কথা লিখছি। সব কথা মনে নেই। একটি ক্ষুদ্র ঘটনার কথা মনে পড়ে। একবার নির্মলদার বাড়ী থেকে কিছু বে-আইনি বস্তু স্থানান্তরিত করার প্রসঙ্গ এলো। নির্মলদা আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন কোথায় রাখা যায়। আমাদের নিজের বাড়ী নিরাপদ নয় তাই আমাদের বাড়ী হতে কিছু দূরে আমার এক কাকীমা ছিলেন। তাঁর কাছে রাখার প্রস্তাব নির্মলদাকে দিলাম। তিনি সম্মত হলেন। কাকীমার বাপের বাড়ী নির্মলদার বাড়ীর নিকটেই। কিছু সম্পর্কও ছিল। তাই তিনি রাজী হলেন। রাত প্রায় তিনটার সময় আমরা বাড়ী থেকে বেরিয়ে পড়লাম জিনিষগুলি একটা ব্যাগে পুরে। নির্মলদার নির্দেশে এক মাঝী ঘাটে নৌকা নিয়ে আগেই এসেছিল। আমরা নৌকায় ওপারে গিয়ে আমাদের বাড়ীর পাশ দিয়েই চললাম কাকিমার বাড়ীর দিকে। তখনো কিছু রাত ছিল। ধীরে ধীরে কাকীমার ঘরের দরজায় টোকা দিয়ে তাকে ডাকলাম। কাকীমার তো একা থাকার কথা, কিন্তু সাড়া দিল আর একজন পরিচিত গলা। কে, রাখাল নাকি? আমি তাঁ বললাম, তিনি বললেন ওঁর আজ তিন দিন ধরে খুব অসুখ। তোমার কিছু দরকার আছে? হাঁ একটু বিশেষ দরকার ছিল। তিনি দরজা খুললেন। কাকীমাকে সব বললাম, তিনি সম্মত হলেন না। বাস্, আর কথা না বলে বেরিয়ে পড়লাম, যিনি ঘরে ছিলেন তিনি আমার কোন অনিষ্ট হয় এমন কাজ করবেন না এ বিশ্বাস আমার ছিল, কিন্তু যখন নির্মলদার সঙ্গে এসে মিললাম তখন বেশ কর্সাই হয়েছে। আমার বুকটা উদ্বেগে দুরু দুরু করছিল। নির্মলদাকে সব বললাম, তিনি নির্বিকার। তিনি বললেন, আপাতত: তোমাদের বাড়ীতেই রাখ, পরে ব্যবস্থা করা যাবে, যা কিছু হয়েছে এবং যা কিছু হবার সব কিছুর জন্যই তিনি যেন প্রস্তুত হয়েই থাকতেন, এরূপ পুরুষের নামই হলো "স্থিতধী:"

পোল্যাণ্ডে গান্ধী-সংগ্রাম-কর্ম্মধারা

পোল্যাণ্ড পূর্ব ইউরোপের একটি দেশ। ইউরোপের পশ্চিম রাশিয়া, যুগোস্লোভিয়া, পোলাণ্ড এবং আরো কয়েকটি দেশ বর্ত্তমানে সমাজতন্ত্রবাদী বা সাম্যবাদী শাসনের অন্তর্গত। যে-সব দেশগুলি সমাজ-তান্ত্রিক শাসনের আওতার মধ্যে আসে—তার মধ্যে রাশিয়া প্রভৃতি দু' একটি দেশে সমাজ-তান্ত্রিক আদর্শে অনুপ্রাণিত জনগণের স্বাভাবিক উত্থানের ভেতর দিয়েই, সাম্যবাদী শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু অন্যান্য কতকগুলি দেশে যে সাম্যবাদী শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়—ক্ষমতাশালী সাম্যবাদী শাসক গোষ্ঠির নানা চক্রান্তেই তা সম্ভব হয়েছিল। প্রকৃত পক্ষে ঐ সব দেশ সাম্যবাদী জঙ্গী শাসক গোষ্ঠীর দ্বারা অধিকৃত বা পরাধীন একথা বলা চলে।

পোল্যাণ্ডের জনগণও এক দুর্দ্ধর্ষ জঙ্গী সাম্যবাদী শাসনের দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে দীর্ঘদিন থেকে। শিল্প-প্রধান এই দেশের জনগণের অধিকাংশই হচ্ছে বড় কারখানার শ্রমিক। এই শ্রমিক-প্রধান দেশে যে-সাম্যবাদী শাসন পরিচালিত হচ্ছে—তার থেকে ধরে নেওয়া যেতে পারে যে, শ্রমিক শ্রেণীর নেতৃবৃন্দের পরিচালনায়,—শ্রমিক শ্রেণীর জীবনে বাঞ্ছিত গণশাসন দ্বারা, শ্রমিকদের স্বার্থরক্ষা, অগ্রগতি ও সর্বাঙ্গীন বিকাশের উদ্দেশ্যেই এই শ্রমিক শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়।

কিন্তু শ্রমিকদের দ্বারা শাসনের প্রচারটা আদৌ সত্য নয়। তথাকথিত শ্রমিক নেতারা, তথাকথিত সাম্যবাদ কায়েম ক'রে জঙ্গী শাসন চালিয়ে, শ্রমিকদের ন্যায়সঙ্গত বহু অধিকার থেকে বঞ্চিত ক'রে রেখেছিলেন এবং বাস্তব পক্ষে শ্রমিকদের অবাধ শোষণই তাঁরা করছিলেন। বিশ্বের কয়েকটি দেশই সমাজতন্ত্র বা সাম্যবাদের বড় বড় বুলি আউড়িয়ে, শ্রমিক তথা সাধারণ মানুষের সহায়তায়, দেশের শাসন ক্ষমতা দখল করা হয়েছে সত্য;—ঐ সব দেশে সর্বাত্মক তথাকথিত সাম্যবাদী শাসনও কায়েম করা হয় সত্য। কিন্তু ঐ সব দেশের ক্ষমতা-লোভী নেতৃবৃন্দ (যা অন্যান্য দেশেও চলছে)—ক্ষমতা হাতে নিয়ে, অবাধে স্বৈরতান্ত্রিক শাসন চালাচ্ছেন—নিজ নিজ দেশের শ্রমিক কৃষক সাধারণ গোষ্টিদের দমন ও শোষণ করার জন্য। দেশের জনগণের সত্যকার শাসন ক্ষমতার অধিকার নেই। তাঁরা জঙ্গী স্বৈরতন্ত্রের অধীনে পরাধীন জীবনই যাপন করছেন। তাঁদের জীবনে আত্মশাসন বা গণ শাসন বলে সত্যিই কিছু নেই। একথা আজ সমস্ত সাম্যবাদী দেশগুলি সম্পর্কেই সত্য।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে—শ্রেণী সংগ্রাম সর্বহারাদের শাসন—সমাজতান্ত্রিক শাসনের লক্ষ্য নিয়ে সারা বিশ্বে জনমনে একদিন যে মহান আশা সঞ্চারিত হয়েছিল—আজ তা মরীচিকার মতো মনে হচ্ছে। বহু আকাঙ্খিত সাম্যবাদী শাসনের প্রবর্ত্তনের পরে পরেই দেশের শ্রমিক কৃষক গোষ্টির—সর্বহারা শ্রেণীর মানুষেরা—উপলব্ধি করতে পারলেন যে, সাম্যবাদী

শাসনের সত্যকার স্বরূপ হচ্ছে—একনায়কতন্ত্র; আরেক রূপায়নে স্বৈরতন্ত্র।

এই সব দেশের জঙ্গী শাসনের হাত থেকে এই সব সাধারণ মানুষদের মুক্তির উপায়ও আজ এক বিরাট সমস্যা হয়ে দেখা দিয়েছে। একদিন এঁদের জীবনে ধনতান্ত্রিক, সামন্ততান্ত্রিক স্বৈরতান্ত্রিক শাসনের কবল থেকে মুক্তির উপায় বের করা—অত্যন্ত কঠিন কাজ ছিল। সশস্ত্র বিপ্লবের দ্বারা ঐ সব শাসনের পরাধীনতা ও শোষণের শৃঙ্খল থেকে মুক্ত হওয়ার চেষ্টার জন্য বহু দীর্ঘ সময়ও লেগেছে। বহু দুঃখ যন্ত্রণা, মৃত্যু ও সংকট পার হতে হয়েছে। তবেই মুক্তি এসেছিল। নামে ধনতান্ত্রিক স্বৈরতান্ত্রিক শাসনের অবসান হল সত্য; কিন্তু তা আবার দেখা দিল—ভয়াবহ সমাজতান্ত্রিক স্বৈরতান্ত্রিক জঙ্গী শাসনের রূপে।

বিপ্লব পূর্ব শাসন-ব্যবস্থাগুলি অত্যন্ত অত্যাচারী স্বৈরাচারী ছিল সত্য; কিন্তু তাদের সকলের শাসন ব্যবস্থা বিশেষ সংগঠিত, শক্তিশালী বা সুসংহত ছিল না। সেজন্য সংগ্রাম দেওয়া খানিকটা সহজ হয়েছিল। কিন্তু এখন ঐ সব সাম্যবাদী দেশের মানুষেরা আজ অনুভব করছেন যে, ধনতান্ত্রিক শাসনের ফুটন্ত কড়াই থেকে তাঁরা একেবারে আবার জলন্ত আগুনের মধ্যে এসে পড়েছেন। কারণ, তথাকথিত সাম্যবাদী শাসনের নেতৃবৃন্দ সংগ্রামের মধ্য দিয়ে তাঁদের সামরিক শক্তির দিকটা এতো শক্তিশালী, সুসংবদ্ধ ও অনবদ্য করে তুলেছেন যে, এ আরো অনেক কঠিন পাল্লা।

এই তথাকথিত সাম্যবাদী শাসনের অধীনস্থ দেশের মানুষগুলির ভুল যখন ভাঙ্গল, তাঁরা অনুভব করলেন যে, অত্যন্ত কঠোর তথা সাংঘাতিক শাসন দ্বারা তাঁরা আজ পরিচালিত; অনবদ্য গোয়েন্দা ব্যবস্থা দ্বারা তাঁরা পরিবেষ্টিত; মানবতাহীন নিষ্ঠুর জঙ্গী শাসকদলের মর্জীমতো না চললে, ঘাতকের যূপকাষ্ঠ তাঁদের জন্য সদা উদ্যত। এই পরিস্থিতিতে সশস্ত্র বিপ্লবের কথা চিন্তা করা বা তার চেষ্টা করা—হাতে চাঁদ ধরার মতই দুঃস্বপ্ন মনে হল।

কিন্তু তবু এই সব তথাকথিত সাম্যবাদী শাসনের অত্যাচার থেকে, শোষণ থেকে, লাঞ্ছনা থেকে, অসম্মান থেকে, মুক্তি পেতে হবে। কিন্তু পথ কোথায়? একদিন ভারতবর্ষে, যার সুসংবদ্ধ সুসঠিত সাংঘাতিক শাসনে, চন্দ্র সূর্য অস্ত যেত না—যার মারণাস্ত্র-বলল দুর্ধর্ষ শাসনের বিরুদ্ধে, সশস্ত্র, সংগ্রাম অভাবিত ছিল—সেই বৃটিশ শাসনে নিরস্ত্র নিঃসহায়, নিঃসম্বল ভারতের লক্ষ লক্ষ মানুষ আত্মবলে বলীয়ান হয়ে, অহিংস সংগ্রামের পথে, দুঃখ বরণের মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ হয়ে, এক অভিনব, অভাবিত সংগ্রাম দিল। বিশাল সত্যাগ্রহের ভেতর দিয়ে, সার্থক সংগ্রামে ভারতবাসী আপন আত্মমর্যাদা প্রতিষ্ঠিত করেছিল। কঠিন প্রেমের সাধনায়, ব্যাপক বিশ্ব-জনমত অনুকূলে এনে, ইংরাজকে ভারত ছাড়তে বাধ্য করেছিল। ভারতবর্ষের এই অভূতপূর্ব ঐতিহাসিক সংগ্রামের পর থেকে সারা বিশ্বে, নিরস্ত্র নিপীড়িত মানুষের মনে, দুঃখ মুক্তির আশা জাগলো।

তারই মহান প্রেরণায় আমেরিকার কোটি কোটি নিগ্রোর অবিসম্বাদী নেতা, আমেরিকার গান্ধী, নোবেল পুরস্কার-বিজয়ী মার্টিন লুথার কিং শ্বেতাঙ্গদের বৈষম্যের বিরুদ্ধে লক্ষ লক্ষ কৃষ্ণাঙ্গ নিগ্রোকে মহান, সত্যাগ্রহের পথে পরিচালিত করলেন। তাঁর মহান নেতৃত্বে, নিগ্রোদের উত্থান বিশ্বের বৈষম্যবাদীদের অচলায়তনের ভিত্তিকে

গভীরভাবে নাড়িয়ে দিল। বিশ্বের সর্বহারার দল গান্ধীবাদের মধ্যে তাদের মুক্তির পথ খুঁজে পেল।

বাকি ছিল সত্যাগ্রহের পথে, সাম্যবাদীদের দেশের নিরস্ত্রদের সংগ্রাম। স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে—একনায়কত্ববাদী জঙ্গী শাসনের বিরুদ্ধে, সর্বহারাদের মুক্তির সংগ্রাম সুরু হোল এক নবতম অধ্যায়।

পোলাণ্ডের শ্রমিকেরা গত দশ বছর ধরে, তাঁদের অর্থনৈতিক শোষণের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ ও বিক্ষোভ জানিয়ে আসছিলেন। কিন্তু সংগ্রাম শুধু রুটির সংগ্রাম বা অর্থনৈতিক সংগ্রামই ছিল না। সমাজ ও রাষ্ট্রের জন্য নূতন ব্যবস্থা কাঠামো, শিক্ষা ও সংস্কৃতির স্বাধীনতার ভিত্তিতে অগ্রগতির নূতন ধারা, এতাদর্শজনিত নূতন দাবি সমূহও ছিল এই প্রচণ্ড উত্থানের অন্যতম লক্ষ্য।

এই দাবিসমূহ নিয়ে দশ বছর আগে পোলাণ্ডে এক বিরাট ও ব্যাপক ধর্মঘট হয়। তখন তেমন কার্যকরীভাবে দাবি আদায় করা শ্রমিকদের পক্ষে সম্ভব হয় নি। কিন্তু শ্রমিক রাষ্ট্রের জীবনেই বিশাল শ্রমিকবৃন্দকে সর্বতোভাবে শোষণের বেড়াজালে সর্ব্বান্ত ক'রে রাখা—সহ্যের অতীত হয়ে উঠেছিল। সেদিনকার সংগ্রাম তাই থেমে যায় নি। গত জুলাই থেকে আবার প্রচণ্ড আকারে, আরো তীব্রতরভাবে সেখানে ধর্মঘট সুরু হল। ছ'মাস ধ'রে চলল অহিংস প্রতিরোধ। জঙ্গী শাসন মাথা নত করতে বাধ্য হলেন। শ্রমিকদের বহু দাবি-দাওয়া তাঁরা মেনে নিলেন—ভয়াবহ জঙ্গী শাসন শক্তির বিরুদ্ধে এই সংগ্রাম আবার প্রমাণ করল—অহিংস-প্রতিরোধ শক্তির অবিসম্বাদী মহিমা।

পোলাণ্ডের শাসক দলের এই নতি স্বীকারে তাঁদের অভিভাবক রাশিয়া অত্যন্ত চটে গেছেন। কিন্তু আজ রাশিয়ার কর্তারা জানেন না যে, তাঁদেরই দেশের অগণিত বিক্ষুব্ধ মানুষের উত্থানের অভিযান একদিন, তাঁদেরই সুদৃঢ় দুর্গের ফাটলের মধ্য দিয়ে, সত্যাগ্রহের বিশাল বলিষ্ঠ মহীরুহ রূপে, কী প্রচণ্ড অপ্রতিরোধ্য শক্তিতে আত্মপ্রকাশ করতে চলেছে। তার ইতিহাস আজ সৃষ্টি হচ্ছে অলক্ষ্যে। এ অবধারিত সত্য। অজেয় গান্ধীবাদ চিরজীবী হোক।

'মুক্তি'—সৌজন্যে

(১০ম পাতার পর)

দিনে তা সম্ভব হবে? জনগণের ধৈর্য্যের একটা সীমা নিশ্চয় আছে, আর তেত্রিশ বছর কিছু কম সময় নয়। এতদিনেও যদি অর্থনৈতিক স্বচ্ছলতা ও স্বাতন্ত্র্য অর্থাৎ অধিক স্বাধীনতার স্বাদ্ দেশবাসী আস্বাদন করতে অপারগ হয়, তবে এদেশের রাষ্ট্র-নায়করাই তার জন্য দায়ী। মানুষ মুখের কথায় আর বিশ্বাস রাখতে নারাজ। তারা কাজে দেখতে চায় যে, এদেশ প্রকৃত সমাজতন্ত্রের পথে কতটুকু এগিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছে। এর ব্যতিক্রমে মানুষ ব্যথিত, উত্তেজিত ও অশান্ত হয়ে রক্তাক্ত সংগ্রামের পথে অগ্রসর হতে বাধ্য হবে। সেই ভয়াবহ হিংস্র দিন যাতে ভারতে না আসে তার জন্য সকল রাজনৈতিক দলকেই কর্মতৎপর হতে হবে এবং ধনীদের চাঁদার পয়সায় নির্বাচনে দাঁড়াবার মানসিকতা সযত্নে পরিহার করতেহবে প্রকৃত জাতীয় স্বার্থে, নচেৎ ধ্বংস অনিবার্য্য।

(৬ পাতার পর)

কিছু নেই। ভারতের অপর রাজ্যগুলিতে যা ঘটেছে, আসামেও তাই ঘটেছে।

আসামের জনসংখ্যার ২৪ শতাংশ মুসলমান, সংখ্যা ৩৫ লক্ষ। এরাও বাংলা ভাষাভাষী কিন্তু সংস্কৃতির বিচারে উদ্বাস্তু হিন্দুদের থেকে স্বতন্ত্র। হিন্দু মুসলমান বাংলা ভাষীর সংখ্যা ৪১ লক্ষ অর্থাৎ আসামের মোট জন সংখ্যার এক তৃতীয়াংশের কিছু কম।

অসমীয়া একটি উন্নত ও সমৃদ্ধ ভাষা। সংবিধানের তপশীলভুক্ত ১৫টি প্রধান ভারতীয় ভাষার মধ্যে অসমীয়া অন্যতম। আসামে বসবাসকারী বাঙ্গালীরা অসমীয়া ভাষায় সর্বাধিক অধিগত। অপর সংখ্যা-লঘুদের তুলনায় হিন্দু বাঙ্গালীরা বেশি পরিমানে অসমীয়া সাহিত্য কাব্য চর্চায় নিযুক্ত।

অসমীয়া সাহিত্যিক ও কবি নবকান্ত বরুয়া, মহিম বরা, নির্মলপ্রভাবরদৈল প্রমুখদের পাশেই স্থান করে নিয়েছেন অসমীয়া ভাষার বাঙ্গালী সাহিত্যিক অখিল দত্ত, হেমাংগ বিশ্বাস, রবীন্দ্র সরকার প্রভৃতি। কবি ও অধ্যাপক অমলেন্দু গুহ এবং ডঃ যোগীরাজ বসুকে অসমীয়া ভাষার দুই দিকপাল বলা যায়। বাঙ্গালী মুসলমানরা নিজেদের পুরোপুরি অসমীয়া ভাষী বলে দাবি করে এবং ১৯৭১ সালের সেনসাসে তাদের অসমীয়া ভাষা ভাষী বলেই তালিকাভুক্ত করা হয়েছে।

আসামে বাঙ্গালীরা বসবাস করায় অসমীয়া ভাষার বিপদ অপেক্ষা শ্রীবৃদ্ধির কারণ হয়েছে মনে করলে ভুল হবে না। এবার সংস্কৃতির কথায় আসা যাক।

প্রখ্যাত লেখক ও ভাষাতত্ত্ববিদ গোপাল হালদার বলেছেন যে, বাংলা বিহার উড়িষ্যা ও আসামের সংস্কৃতি অভিন্ন। এই অভিমতের সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত হলেও, বলতে বাধা নেই, বিহার কিছুটা উত্তর প্রদেশ ও উড়িষ্যার কিছুটা তামিল প্রভাবে পড়লেও, বাংলা ও আসাম সংস্কৃতি ভাবনায় গভীর সম্পর্কযুক্ত। পরিচ্ছদ, খাদ্য, ভাষা, বর্ণমালা, বৈষ্ণব মতবাদ ও আকৃতিগত সাদৃশ্যে অসমীয়ারা বাঙ্গালীদের খুব নিকটের মানুষ।

অসমীয়া ও বাঙ্গালী হিন্দুদের মধ্যে বহুকাল থেকে বিবাহ প্রথা প্রচলিত আছে। যার ফলে অসমীয়াদের মধ্যে ভট্টাচার্য, মজুমদার, রায়-মেধি, সেন-ডেকা, মজুমদার-বরুয়া প্রভৃতি উপাধির উদ্ভব হয়েছে। অনেকেই হয়ত জানেন না, আসামের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বিমলা প্রসাদ চালিহা এবং প্রত্নতত্ত্ব-বিদ রায় বাহাদুর কনক বরুয়া বাঙ্গালী বংশোদ্ভূত।

প্রবাসী বাঙ্গালীরা তাদের ভাষা ও সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠত্বের বড়াই করে এবং অসমীয়া ভাষা ও সংস্কৃতিকে তাচ্ছিল্য করে—এই অভিযোগ সমাজের বাস্তব চিত্র প্রমাণ করে না। পক্ষান্তরে অসমীয়াদের কিছু ব্যক্তি অথবা Inferiority Chmplexএ ভোগে এবং তারাই এই অভিযোগ তোলে।

স্পর্শকাতরতা ভাষা অথবা সংস্কৃতির বিকাশের সহায়ক নয় কখনো অনুশীলন তাদের প্রকৃতি সম্মত জীবন ধর্মও নয়।

আসামের তথাকথিত জাতীয় নাগরিক তালিকাকে ভিত্তি করে ১৯৫১ সালকে কেন বিদেশী নির্ণয়ের জন্য ভিত্তিবর্ষরূপে গ্রহণ করা যায় না সে কথা পূর্বে আলোচিত হয়েছে। বাঙ্গালী উদ্বাস্তু আগমনে আসামে অসমীয়া ভাষা ও সংস্কৃতির বিপদের আশংকাও যে অমূলক সে বিষয়ও এই নিবন্ধে বলা হল।

উদ্বাস্তুগণের ভারতে আগমন দেশ বিভাগের ফল। তারা আইনতঃ অনুপ্রবেশকারী বিদেশী নয়। ভারতের নাগরিক উদ্বাস্তুদের ক্ষেত্রে আই-

ও নৈতিক অধিকার স্বীকৃত। এ সম্পর্কে ভারতের তিন প্রধান রাষ্ট্রনায়কের প্রতিশ্রুতি এখানে উদ্ধৃত করছি।

দেশবিভাগের প্রাক্কালে ১৯৪৭ সালের ২১শে জুলাই মহাত্মা গান্ধী বলেছিলেন:

"My friends ask whether those who being mortally afraid or otherwise leave Pakistan will get shelter in Indian Union. My opinion is emphatic on this point. Such refugees should get shelter in the Union & vice versa

Friends again ask me what will happen about land and buildings, if any, left in Pakistan. I have said repeatedly that the State should pay the present market price of the land and the buildings."

১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্ট জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণ দান কালে পণ্ডিত জওহর লাল নেহেরু বলেছিলেন:

"We think also of our brothers and sisters who have been cut off from us by political boundaries and who unhappily can not share at present in the freedom that has come. They are of us and will remain of us whatever may happen and we shall be sharers in their good and ill fortune alike."

ঐ একই দিনে জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণ দান প্রসঙ্গে সর্দার বল্লভ ভাই প্যাটেল বলেছিলেন:

"Our hearts naturally go out to those who were of us and with us so long but who are now to be separated. Few can realise the bitterness and sorrow which partition has brought to those who cherished unity but lived to fashion it details. But let not our brethren across the border feel that they are neglected or forgotton. Their welfare will claim our vigilance and we shall follow with abiding interest their future in full hope and confidence that sooner than later we shall again be united in common allegiance to our country."

ঐতিহাসিক প্রতিশ্রুতিগুলি পূর্ব-পাকিস্তান ত্যাগী উদ্বাস্তুগণ সম্পর্কে সংবিধান ও রাষ্ট্রনীতির মৌল ভিত্তি নয় কি? কালের ব্যবধানে প্রতিশ্রুতি গুলির গুরুত্ব কি ম্লান হতে পারে?

তারপর আছে ১৯৫০ সালের নেহেরু-লিয়াকত এবং ১৯৭১ সালের ইন্দিরা-মুজিব আন্তর্জাতিক চুক্তি। চুক্তি দুটি লোকসভায় যথাবিধি আলোচিত ও গৃহীত হয়েছিল। আসাম রাজ্য থেকে নির্বাচিত সংসদ সদস্যরা চুক্তিদুটিকে সমর্থন করেছিলেন। অসমীয়াগণ কিভাবে তাদের সেই সিদ্ধান্ত থেকে সরে আসবে?

পূর্বে বলেছি যে ত্রাণ ও পুনর্বাসন এক কথা নয়। যাদের পুনর্বাসন দেওয়া হয়েছে তাদের দেশের নাগরিক বলে স্বীকার করে নিয়েই ভারতভূমিতে বসবাসের ব্যবস্থা করা হয়েছে। কি ভাবে ত্রিশ ত্রিশ বছর পরে তাদের বিদেশী বলে বহিষ্কার করা সম্ভব? উদ্বাস্তু বাঙালী ছাড়া বিহারী, উড়িয়া, নেপালী, রাজস্থানী ও পাঞ্জাবী সংখ্যালঘু, যারা আসামে বাস করছে, তারা ভারতের বিভিন্ন রাজ্য থেকে এসেছে। তাদের বিদেশী বলা তো একান্তই অযৌক্তিক। বাঙালী মুসলমানদের অসমীয়ারা আসামে ডেকে এনেছে, নিজেদের স্বার্থে, ব্রিটিশ আমল থেকে। তা হলে আসামে বিদেশী কে? প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতি গান্ধীও তাই বলেছেন। সে কারণে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জৈল সিং বলেছেন যে, আসু ও গণ সংগ্রাম পরিষদ কেবল আন্দোলনের জন্যই আন্দোলন করছে।

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর অভিমতের সহিত আর একটু যোগ দিয়ে বলা যায় যে, দেশের কিছু পাঁকা মাথা এবং বিদেশের গোপন হাত আসু ও আগসপকে দিয়ে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে এই আন্দোলন চালাচ্ছে।

(চলবে)

ভারত বিপ্লব আন্দোলনের ইতিহাস

॥ ক্ষীরোদ দত্ত ॥

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

●

কাশিপুর সম্মেলনের অল্পদিন পরেই যোগেশচন্দ্র এম. এন. রায়ের নিকট থেকে চারখানি পত্র পান। ঐ সকল পত্রে তিনি প্রফুল্ল গাঙ্গুলি এবং বাদুগোপাল মুখার্জীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। বিদেশী শাসন অপসারণের জন্য সোভিয়েট সম্পর্ক প্রয়োজন হতে পারে এজন্য যোগেশবাবু এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করার সিদ্ধান্ত করেন। কিন্তু এদিকে রুশিয়ার সঙ্গে সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার যে অন্য প্রচেষ্টা চলছে যোগেশচন্দ্র তা জানতেন না। এম. এন রায় তার নিজের প্রতিনিধি নলিনী গুপ্তকে এই উদ্দেশ্যে কয়েকদিন আগেই ভারতে পাঠিয়েছিলেন। শ্রীগুপ্ত এই সময় অনুশীলন সমিতির ঢাকা কেন্দ্রে অবস্থান করছিলেন। তৃতীয় আন্তর্জাতিকের পক্ষ থেকে অবনী মুখার্জীও ভারতে এসেছিলেন ঠিক একই সময়ে। তিনিও অনুশীলন নেতৃবৃন্দের সঙ্গে ঢাকাতেই আলোচনা চালাচ্ছিলেন। কিন্তু কেউ কারও অবস্থানের কথা জানতেন না। অনুশীলন নেতৃবৃন্দ পরস্পরের নিকট থেকে অন্যের সঙ্গে আলোচনা গোপন রেখেছিলেন। নলিনীগুপ্ত প্রথম বিশ্বযুদ্ধ কালে ব্রিটিশকে বোমা প্রস্তুত করে দিতেন। এজন্য বোমা প্রস্তুত কার্য্যে তার দক্ষতা ছিল। তার সাহায্যে শক্তিশালী বোমা প্রস্তুত শিক্ষা করাই ছিল অনুশীলন নেতৃবৃন্দের উদ্দেশ্য। নলিনী গুপ্ত ঢাকায় কয়েকজন অনুশীলন কর্মীকে বোমা প্রস্তুত প্রণালী শিক্ষা দিয়েছিলেন। কিন্তু অবনী মুখার্জী অথবা নলিনী গুপ্ত কারও ভারত ভ্রমনই তৃতীয় আন্তর্জাতিক দিক থেকে ফলপ্রসূ হয় নাই। পক্ষান্তরে অনুশীলন সমিতি নিজেদের উদ্যোগেই তৃতীয় আন্তর্জাতিকের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনের চেষ্টা করেন। এ বিষয়ে কেশব চক্রবর্তীর কথা আগেই বলা হয়েছে। ১৯২৫ সালে গোপেন চক্রবর্তী নামে এক বিশিষ্ট কর্মীকেও অনুশীলন সমিতির পক্ষ থেকে রুশিয়ায় পাঠানো হয়। গোপেন চক্রবর্তী রুশিয়ায় গিয়ে এম, এন, রায়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং দেশে ফিরে এসে সম্পূর্ণভাবে কমিউনিষ্ট পার্টি ভুক্ত হয়ে কাজ করতে থাকেন। অবনী মুখার্জী কিছুদিন পলাতকরূপে অনুশীলন সমিতির আশ্রয়ে থেকে পলাতকরূপেই ভারত ত্যাগ করেন। এম. এন, রায় কিছুদিন পরে ছদ্মবেশে স্বয়ং এদেশে আসেন। কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই ধরা পড়ে কানপুরে বলশেভিক ষড়যন্ত্র মামলায় দণ্ডিত হন।

যোগেশ চন্দ্র, অবনী মুখার্জী অথবা নলিনী গুপ্তের বিষয়ে কিছুই জানতেন না। তাই পত্র পেয়ে এটাকে একটি সুযোগ মনে করে পণ্ডিচেরীতে এম, এন, রায়ের প্রতিনিধির সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে যান। সেখান থেকে ফেরার পথে গোয়েন্দাচরের দল যোগেশচন্দ্রকে অনুসরণ করতে থাকে এবং কলকাতায় তাকে গ্রেপ্তার করে। এই সময় একটা অর্ডিনান্স জারীর উদ্যোগ আয়োজন চলছিল। নূতন অর্ডিনান্স বিনা বিচারে আটকের আইন ছিল। যোগেশচন্দ্র

গ্রেপ্তার হন ১৮ই অক্টোবর। ২৫শে অক্টোবর নূতন অর্ডিনান্স জারী হয়। এই কয়েকদিন তাকে পুলিশের অধীনে আটক করে রাখা হয়। যোগেশ-চন্দ্র যখন কাশী ত্যাগ করে কানপুর যান তারপর থেকে পুলিশ তার কোন সন্ধান পায়নি। তাদের কাছে খবর ছিল যোগেশচন্দ্র বিদেশে গিয়েছে। এই জন্যই মাদ্রাজে তাকে দেখতে পেয়ে তাকে গ্রেপ্তার করার জন্য ছোড়জোড় আরম্ভ হয়। যোগেশচন্দ্র কানপুর যাবার পরে কানপুরই ছিল যুক্তপ্রদেশ বিপ্লবী সংগঠনের হেড কোয়ার্টার। যোগেশচন্দ্র প্রাদেশিক হেড কোয়ার্টারেই থাকতেন তবু পুলিশ তার সন্ধান পায়নি এটা আশ্চর্য্য ব্যাপার।

সংগঠনের কাজের জন্য অর্থের প্রয়োজন ছিল। কিন্তু বাঙলা সংগঠন কখনই অর্থের জন্য ডাকাতিতে লিপ্ত হয় নাই। কিন্তু বহির্বঙ্গ সংগঠন যে এই সময় এই বিষয় নিষ্ঠার সঙ্গে মেনে চলেছে তা বলা চলেনা। অবশ্য বাঙলাদেশে কর্মীরা সবাই গৃহে থেকেই সংগঠনের কাজ করতেন। কিন্তু বাঙলার বাইরে সংগঠনের জন্য সম্প্রসারণের জন্য সদস্যদের সর্বক্ষণের কর্মী হিসাবে ঘর ছেড়ে বিভিন্নস্থানে পাঠানো হয়েছিল। এই সকল কর্মীদের খাওয়া থাকার জন্য সামান্য সামান্য অর্থ দেওয়া হত। সমিতির কর্মী মুক্তারাম কাশীতে জলের কলে কাজ করতেন। তাকে পার্টির নির্দেশে সে কাজ ছেড়ে প্রতাপগড়ে গিয়ে বাস করতে হয়েছিল। পার্টি হতে তিনি মাসিক দশ টাকা করে মাত্র পেতেন। যোগেশবাবুকেও নিজেকে রান্নাবান্না করে খেতে হত। রান্নার বাসনও তিনি নিজেই পরিষ্কার করতেন। বৃদ্ধ গোবিন্দ করকে অতিকষ্টে জীবনধারণ করতে হত। চন্দ্রশেখর আজাদকে অনেকদিন উপবাস করে থাকতে হত। মন্মথ গুপ্ত মাঝে মাঝে সন্ধান নিতেন তিনি খেয়েছেন কিনা। যেদিন খেতেন তার খাওয়া হয়নি বাড়ীতে ডেকে নিয়ে তাকে খাওয়াতেন। রবীন্দ্রমোহন কর সম্পর্কে শুনা যায় অনেকসময় তিনি ঘোড়ার দানা খেয়ে দিন কাটাতেন। সহজেই বোঝা যায় সমিতির কর্মীদের দুর্দশা এই সময় চরমে উঠেছিল। মাঝে মাঝে শচীন্দ্রনাথ শিব প্রসাদ গুপ্তের নিকট থেকে কিছু কিছু অর্থ নিয়ে আসতেন। কিন্তু সে প্রয়োজনের তুলনায় অতি সামান্য। এজন্য পার্টিকে বাধ্য হয়েই আবার জোর করে দান গ্রহণের কথা ভাবতে হল। এ সম্পর্কে তারা লেলিনের নেতৃত্বে বলশেভিক পার্টির আদর্শ অনুসরণ করাই সঙ্গত মনে করলেন।

পার্টির নিয়ম প্রণালী কিছু পরিবর্তন করে নেওয়া হল অর্থাভাব হলে জোর করে দান গ্রহণ করা চলবে তবে যতদূর সম্ভব সরকারী অর্থ লুণ্ঠন করা হবে।

এরপরেও কয়েকবার জোর করে দানগ্রহণ করার চেষ্টা হয়। কিন্তু এদিকে অর্থাভাব বিশেষ কিছুই মেটে নাই। তাই শেষ পর্যন্ত এ প্রচেষ্টা পরিত্যক্ত হয়। যিনি জোর করে দানগ্রহণকারী পার্টিকে নেতৃত্ব দিতেন তাকে বলা হত পরমহংসদেব। পণ্ডিত রামপ্রসাদ বিসমিল ছিলেন পরমহংসদেব পরমহংস-দেবের পরে দ্বিতীয় স্থান ছিল 'অবধূত' এর। স্থির ছিল রামপ্রসাদ যদি গ্রেপ্তার হয়ে যান অবধূত তার স্থান গ্রহণ করবেন। আত্মগোপনকারী কেরার কর্মীকে বলা হত জীবনমুক্ত অর্থাৎ যিনি বেঁচে থেকেও মুক্ত আত্মা। ঐ সময় হিন্দুস্থান রিপাবলি-কান দলে জীবনমুক্ত ছিলেন একমাত্র গোবিন্দ কর। তিনি বাঙলাদেশের প্রবীন বিপ্লবী বলে কেবল অর্ডিনান্সের এক গ্রেপ্তারী পরোয়ানা তার পিছনে ফিরছিল। বিপ্লবী দলে 'জ্ঞান' কথার মানে ছিল ডাকাতি। একবার যে ডাকাতি করেছে তাকে বলা হত 'জ্ঞানী' দলের সদস্যরা সবাই ছিলেন 'ভক্ত'।

(চলবে

৺বিজয়া সম্মেলন

বিগত ২৬শে অক্টোবর রবিবার অনুশীলন ভবনে এক জনবহুল সমাবেশের মাধ্যমে অনুশীলন সমিতির ৺বিজয়া সম্মেলন উদ্‌যাপিত হয়। প্রখ্যাত শিক্ষাব্রতী ডঃ ত্রিপুরাশঙ্কর সেন শাস্ত্রী মহোদয় অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন। সভাপতির ভাষণে তিনি ৺বিজয়া সম্মেলনের তাৎপর্য এবং জাতীয় জীবনে ইহার গভীর অনুপ্রেরণার কথা হৃদয়গ্রাহী ভাষায় ব্যাখ্যা করেন এবং অনুশীলন সমিতির অবদান আলোচনা করেন। সভাপতি ছাড়াও বিশিষ্ট বিপ্লবী নেতা শ্রীনলিনী গুহ, শ্রীজীবনতারা হালদার ও শ্রীনরেন দাস ভাষণ দেন।

শ্রীপরেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, শ্রীতারাপদ লাহিড়ী, শ্রীভবেশচন্দ্র নন্দী, ডাঃ স্নেহময় চৌধুরী, শ্রীগোপেশচন্দ্র মল্লিক, শ্রীসমরেন্দ্র বসু ঠাকুর, শ্রীবিনয় গুপ্তগুপ্ত, ডাঃ বিভাস রায় প্রমুখ বিপ্লবীগণ সহ প্রায় দুই শতাধিক বিপ্লবী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

ডঃ সরলকুমার সেনগুপ্ত অনুশীলন সমিতির পক্ষে সকলকে স্বাগত জানান। শ্রীমতি শিপ্রা গুপ্তার কণ্ঠে 'বন্দেমাতরম্' সঙ্গীতের মধ্য দিয়া অনুষ্ঠান আরম্ভ হয়। অনুশীলন গুরুন শিল্পীগণ অনুষ্ঠানে সঙ্গীত পরিবেশন করেন। শ্রীরাখাল করের পরিচালনায় অনুষ্ঠানটি সুষ্ঠুভাবে উদ্‌যাপিত হয়।

এই অনুষ্ঠানের খরচ নির্বাহের জন্য সতীর্থদের আর্থিক সাহায্যের সাথে সতীর্থ বিপ্লবী শ্রীপ্রাণকুমার দাস ৫০০ টাকা বিশেষ সাহায্য করেন।

———

Regd. No. S. N Biplabi Bangla Regd. WB/NC 77
Phone : 34-1705
বার্ষিক :—সডাক ১৫.০০ টাকা ষাণ্মাসিক :—৮.০০ টাকা মূল্য—৩০ পয়সা

C/30

বিপ্লবী পুস্তকমালা

১। নেতাজীর সিক্রেট সার্ভিস —ডঃ পবিত্রমোহন রায়—

ক্ষীরোদ কুমার দত্তের—

১। বাংলার অগ্নিযুগ—১·৫০	২। বহির্ভারতে ভারতীয় বিপ্লব প্রচেষ্টা—৮·০০
৩। অনুশীলন সমিতির ইতিবৃত্ত—১·০০	৪। সোয়াটী সংগ্রাম কাহিনী—১·০০
৫। কাকোরী ষড়যন্ত্র—১·৫০	৬। কলতা বাজার সংগ্রাম কাহিনী—৩০
৭। বাসবিহারী ও অন্যান্যের সমস্তি—৩০	৮। স্বাধীনতার পটভূমি ও প্রেক্ষা—৩০
৯। বিবেকানন্দ ও সমাজবাদ	১০। বিপ্লবী বিবেকানন্দ—৫০
১১। মহাবোধ ও [illegible]—৩০	১২। ভারতের নবজাগরণ ও ভগিনী নিবেদিতা—১৫
১৩। দেশ বন্ধুর চোখেমি (১)—১·০০	১৪। দেশ বন্ধুর চোখেমি (২)—১·০০
১৫। শহীদ চন্দ্রশেখর আজাদ—৫০	১৬। ৩৫টি এপ্রিল আজাদ শহীদ দিবস—১·০০
১৭। হাজির হত্যা প্রচেষ্টা—১৫	১৮। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও অনুশীলন সমিতি—৪·০০
১৯। ভারতের জাতীয় পতাকার ইতিহাস—৪০	২০। লাট হত্যা প্রচেষ্টা—১·৫০

প্রাপ্তিস্থান :—৪৯ বলরাম দাস ষ্ট্রীট কলিকাতা-৭০০০০৭

নৈশপ্রভা—১/১/১/A, বঙ্কিম চাটার্জী ষ্ট্রীট কলিকাতা-৭৩

3 DEC 1980

— সম্পাদক মণ্ডলী —
শ্রীঅনিল চট্টোপাধ্যায় (সভাপতি) শ্রীহরেন্দ্রচন্দ্র নন্দী, শ্রীপুষ্প চ্যাটার্জী
সম্পাদক—শ্রীবারীন্দ্র নাথ রায়চৌধুরী
ছাপার যন্ত্রের প্রতিনিধি—শ্রীবারীন ঘোষ। ঠেকালা—শ্রীনরেন্দ্রগোপাল পাল।
প্রকাশক ও মুদ্রক :—শ্রীঅনিল সেনগুপ্ত। প্রচার সচিব—শ্রীসুরেন্দ্র সোম।
বিপ্লবী বাংলা কার্যালয় :—৪৯ বলরাম দাস ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০০৭
মুদ্রণে:—প্রিন্টিং এসোসিয়েটস, ১১১ বি বেলেঘাটা মেন রোড কলিকাতা—৭০০০১০

বিপ্লবী বাংলা

বিপ্লবী পরিষদের সাপ্তাহিক মুখপত্র
স্থাপিত—১৯৫৬, 'বিপ্লবী বাঙ্গালী' নবকলেবরে—১৯৭১

দশম বর্ষ	শনিবার ২০শে অগ্রহায়ণ ১৩৮৭ ৬ই ডিসেম্বর ১৯৮০	৯ম সংখ্যা

CALCUTTA UNIVERSITY CENTRAL LIBRARY

আমরা আরম্ভ করি শেষ করি না। আড়ম্বর করি কাজ করি না। যাহা অনুষ্ঠান করি তাহা বিশ্বাস করি না। যাহা বিশ্বাস করি তাহা পালন করি না। ভূরি পরিমান বাক্য রচনা করিতে পরি, তিল পরিমাণ আত্মত্যাগ করিতে পারি না। আমরা অহঙ্কার দেখাইয়া পরিতৃপ্ত থাকি। যোগ্যতা লাভের চেষ্টা করি না। আমরা সকল কাজেই পরের প্রত্যাশা করি। অথচ পরের ত্রুটি লইয়া আকাশ বিদীর্ণ করিতে থাকি।

এই দুর্ব্বল, ক্ষুদ্র, হৃদয়হীন, কর্মহীন, দাম্ভিক, তার্কিক জাতির প্রতি বিদ্যাসাগরের এক সুগভীর ধিক্কার ছিল। কারণ তিনি সর্ব বিষয়েই ইহার বিপরীত ছিলেন।

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

সম্পাদকীয়

বাংলা বন্‌ধ কি বুমেরাং হবে

ভারতবর্ষের রাজনীতি ক্ষেত্রে কোন কোন বিরোধী দলের ক্রিয়া কলাপ দেখে চিন্তাশীল মানুষেরা শঙ্কাবোধ করছেন এ দেশে গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎ নিয়ে। গণতান্ত্রিক কাঠামোতে বিরোধদলের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য্য। কিন্তু যে কোন ছলছুতায় যদি বিরোধীদলের লোকেরা দেশের বৃহত্তর এবং জাতীয় স্বার্থকে উপেক্ষা করে, নিজেদের জিদ্‌ ও অহমিকা বজায় রাখতে এবং যে কোন প্রকারে দেশের স্থিতিশীল সরকারকে বিপন্ন করার কাজে সর্বশক্তি নিয়োগ করেন, তবে সেই বিরোধীদলগুলি গণতন্ত্রে তাদের অবশ্য পালনীয় ভূমিকা পালন করতে পারেন কি? পারেন কি ক্ষমতামদমত্ত হয়ে দেশের মানুষের স্বার্থকে ক্ষুণ্ণ করে, তাদের আস্থা অর্জন করতে? পৃথিবীর রাজনীতির ইতিহাসে তার স্বাক্ষর মেলেনা। অবশ্য ডায়ালেকটিকসের মাধ্যমে স্থিতি, প্রতিস্থিতির সংঘর্ষে নতুন সংস্থিতির সৃষ্টি হয় বলে দাবী করেন যারা, তারা এমন অসম্ভবকে সম্ভব বলে মনে করতে পারেন। কিন্তু এই মতকে যদি কেউ উত্তপ্ত মস্তিষ্কের উদ্ভট পরিকল্পনা বলে মনে করেন, তবে তারা ভ্রান্ত বলে মনে করার কোন সঙ্গত কারণ নেই। ছিন্নমস্তার রাজনীতি বলে একে কেউ আখ্যা দিলেও, তার বিরুদ্ধে কিছু বলার আছে বলে মনে হয় না।

উপরোক্ত মনোভাবের পরিচয় বিরুদ্ধ দলের কার্যাকলাপে আগেও মিলেছে। আধুনিকতম প্রমাণ মিলেছে পশ্চিমবঙ্গে শাসক দলের 'বাংলা বন্ধের' ডাকের মাধ্যমে। শুধু বন্ধের ডাক দিয়েই এরা ক্ষান্ত থাকেন নি, বাধ্য হয়ে লোক যাতে এই বন্ধের শিকার হয়, তার জন্য দলীয় ও সরকারী প্রশাসনযন্ত্রকে কাজে লাগাতেও কোন লজ্জা বা দ্বিধা বোধ করেন নি। এমনিতেই প্রাদেশিক সরকারের ব্যর্থতার ফলে পশ্চিমবঙ্গের নাভিশ্বাস উঠেছে। একদিন বন্ধের ফলে অর্থনৈতিক দিক দিয়ে সরকার ও দেশের মানুষের কি পরিমাণ ক্ষতি হবে, সে দিকে ভ্রূক্ষেপও করেন নি। এখনকার শাসক গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত দলেরা। তা ভিন্ন গায়ের জোরে বন্ধ সফল করতে গেলে, সংঘর্ষও অনিবার্য্য। কারণ গোটা রাজ্যের মানুষ ত এই বন্‌ধ সমর্থন করেন না। এর ফলশ্রুতি হয়েছে সম্পত্তিনাশ, নানা ক্ষেত্রে বিশৃঙ্খলার উদ্ভব, এমন কি জীবনহানি। তার জের কতদিন চলবে তাও কেউ নিশ্চিত করে বলতে পারেননা।

মগজের মধ্যে সামান্য পরিমাণে ধূসর বর্ণের পদার্থের অস্তিত্ব থাকলেও। যে সব ভাষণ বা বিবৃতি দান করা হচ্ছে, সামান্যতম লজ্জাবোধ, শালীনতাবোধ, কাণ্ডজ্ঞান থাকলে সেটা করা হত না। দম্ভ, একগুয়েমি এবং নিজেদের চরম ব্যর্থতাবোধ, গদীচ্যুত হবার আশঙ্কা কারো দৃষ্টিশক্তি, বিচারশক্তি এমনভাবে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে, যা দেখে অনেকেই এদের মস্তিষ্কের সুস্থতা সম্বন্ধে সন্দিহান হয়ে পড়ছেন।

সবচেয়ে আশ্চর্য বনতে হয় এটা দেখে দলের উর্দ্ধতম স্তরের নেতাদের বক্তব্য শুনে। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বাংলার মুখ্যমন্ত্রীকে লেখা চিঠিতে বন্‌ধের দিন কেন্দ্রীয় অফিসগুলি খোলা রাখার বিষয়টিকে গুরুত্ব দিতে বলেছিলেন। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী বলেছেন যে বন্ধের দিন যদি কোন দুর্ঘটনা ঘটে, তবে তার দায়িত্বটা বহন করতে হবে পশ্চিমবঙ্গের সরকারকে। এর জবাবে বামফ্রন্টের সভাপতি বলেছেন রাজ্যের ব্যাপারে তার বলার কোন অধিকার নেই। এমন অদ্ভুত অবিবেচনা প্রসূত উক্তি কেউ কখনও শুনেছেন কিনা জানিনা। আজ যদি রাজ্যের শাসকদলের অবিমৃষ্যকারিতার ফলে পশ্চিমবঙ্গের মানুষের সমূহ বিপদ ডেকে আনার সম্ভাবনা, থাকে, তবে কেন্দ্র নীরব দর্শক হয়ে বসে থাকবে এই কি প্রমোদবাবুর সংবিধান সম্বন্ধে জ্ঞানের পরিচয়? পশ্চিমবঙ্গ কি ভারতের বাইরে কোন স্বাধীন রাজ্য যে গুরুতর ব্যাপারেও কেন্দ্র কোন কথা বলতে পারবে না। একে যদি কেউ আসামের হঠকারী আন্দোলনের রকম ফের বলে মনে করেন, তবে কি খুব ভুল করা হবে? সঙ্কট বেধে গেলে শেষ পর্যন্ত কেন্দ্রকেই রক্ষাকর্তার ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে হয়। ত্রিপুরারাজ্যে, যেখানে প্রমোদবাবুর বিধানই শেষ কথা, সাম্প্রতিককালে কি ঘটেছে তাকি এত শীঘ্রই বিস্মৃতির অতল তলে ডুবে গেল? বহু নিন্দিত সি, আর, পি পাঠিয়ে 'বাঁচাও বাঁচাও' আর্তনাদের ধ্বনি কি মনের মধ্যে কোন প্রতিধ্বনি জাগায় না? এখনও ত নিরাপত্তা সেখানে ফিরে আসেনি। ব্যর্থ ত্রিপুরা সরকার (এদেরই দলীয়) এখনও গদীতে টিকে আছে, কেন্দ্রীয় মিলিটারী ও সি, আর, পি বাহিনীর দয়ায় একথা রূঢ় হলেও, বাস্তব সত্য। এরা এসে না পড়লে দলীয় নেতাদের S. O. S বা কারো শ্রীমুখের বাণী দলকে, সরকারকে ওখানকার মানুষকে বাঁচাতে পারত? হস্তীমূর্খ ভিন্ন এর জবাব সবাই জানে।

এ রাজ্যে সরকারী বন্ধের ব্যবস্থা রাজনীতি ক্ষেত্রে নিশ্চয়ই অভিনব। এই বন্‌ধকে সফল করতে সরকারী স্তরকে সব ব্যবস্থাই নেওয়া হয়েছিল। অফিসে দরজা খোলা হয়নি, কাজে যোগদানেচ্ছু সরকারী কর্মীদের অফিসে ঢুকতে দেওয়া হয়নি। রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারের বন্‌ধ বিরোধী কর্মীদের জন্য কোন নিরাপত্তা ব্যবস্থা করা হয়নি। রেল চলাচলের জন্যও নিরাপত্তা ব্যবস্থা চেয়েও রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ পান নি। দলীয় কাডাররা রেল লাইনে বসে পড়ে রেলগাড়ী চলতে দেয়নি। মুখ্যমন্ত্রী মুখে অবশ্য বলেছিলেন যে যারা কাজ করতে চায়, তারা কাজ করবে। কিন্তু কাজ যারা করতে দেয়নি, তাদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক কোন ব্যবস্থা নেবার সংসাহস মুখ্যমন্ত্রীর আছে কি?

বন্‌ধের পর চিরাচরিত ন্যায়সঙ্গত পূর্ণ সাফল্য দাবী করা হচ্ছে। জোর জুলুম করে, মারামারি করে, খুন করে যে ভাবে বন্‌ধ প্রতিপালিত হয়েছে, সেটা আর যাই হোক গণতান্ত্রিক পন্থা বলে কোন চিন্তাশীল মানুষ মেনে নেবেন না। উচ্ছৃঙ্খলতাকে দলবাজির খাতিরে প্রশ্রয় দিলে এবং অন্য বিরোধী দল-গুলিকে দাবিয়ে রাখার ফল কি হতে পারে, তার প্রমাণ ত ত্রিপুরাতেই মিলেছে। অতীত দিনের অভিজ্ঞতা থেকে কোন শিক্ষাই কি নিতে চান না, এখানকার প্রশাসক দলগুলি? জাহান্নামের পথে যদি কেউ যেতে চায়, তবে সে স্বাধীনতা তার অবশ্যই আছে। কিন্তু দেশের মানুষকে সে পথে নিয়ে যাবার কোন অধিকার কোন শাসক দলের থাকতে পারে না।

বন্‌ধ ডাকার যে কৈফিয়ৎ এখানকার প্রশাসনযন্ত্র অধিকারী দল নেতারা খাড়া করেছেন, সেটা অত্যন্ত দুর্বল। কেন্দ্রের বিরুদ্ধে কোন ন্যায়সঙ্গত কারণ থাকলে গণতন্ত্রে, তার উত্থাপন করবার গণতান্ত্রিক পথও আছে। কেন সে পথে এরা যান নি, তা ওরাই জানেন। তবে যুক্ত রাষ্ট্রীয় কাঠামোতে কোন অঙ্গরাজ্য যদি সংবিধানসম্মত পথ পরিত্যাগ করে সংঘর্ষের পথে পা বাড়ান। তবে সে কাজের ফলাফলের জন্য তাদেরই দায়িত্ব বহন করতে হবে। কোন কোন মহল সন্দেহ করছে যে এখানকার প্রশাসক দল নিজেদের ব্যর্থতা ঢাকার জন্য এই পথ ধরেছেন। পদত্যাগ করার চেয়ে বরখাস্ত হওয়াকেই বাঞ্ছনীয় মনে করছেন। এই ভাবে দেশের মানুষকে ধোকা দেওয়ার চেষ্টা ব্যর্থ হতে বাধ্য। কারণ দেশের মানুষকে এরা যত বোকা মনে করছেন, তারা তা নন্‌। এই বন্‌ধ যেভাবে পরিচালিত হয়েছে, তাকে যদি কেউ নিজেদের জনপ্রিয়তা ও জনসমর্থন বলে মনে করেন, তবে যেমন বিপত্তি কালে বুদ্ধিভ্রংশ ঘটে বুদ্ধিমানদেরও, এদেরও সেই অবস্থা হয়েছে।

যুক্ত রাষ্ট্রীয় কাঠামোতে কোন অঙ্গ রাজ্য কেন্দ্রের সঙ্গে সংঘর্ষ করে বাঁচতে পারে না। যে মনো-মালিন্য ও তিক্ততার সৃষ্টি হয়েছে, তার পর কি করে সহযোগীতার কণ্টকমুক্ত হবে জানি না। মনে হয় ঈশান কোণে মেঘের সঞ্চার হচ্ছে, তার গতি ও বিস্তৃতি যদি পারস্পরিক সহযোগিতা দ্বারা রুদ্ধ করা না যায়, তবে প্রলয়ঙ্করী ঝড়ের আবির্ভাব অবশ্যম্ভাবী।

একটি হেঁয়ালি

—শ্রীসতীভূষণ সেন

অনন্ত সিং, আমাদের কাছে ছিল—একটি হেঁয়ালি।

জন্ম হয়েছিল ১৯০০ সালের ১লা ডিসেম্বর। আজকে তার ৭৭ বছর পূর্ণ হওয়ার কথা। সেই হিসেবে আজ তার ৭৮তম জন্মদিন। সভার বিজ্ঞপ্তি পত্রে প্রচারিত ৭৭ তম জন্মদিন নয়। উদ্যোক্তাদের পক্ষ থেকে এই ভুলটি সংশোধন করে নিতে চাই। —তার সম্বন্ধে সারা জীবনই তো আমরা ভুল করে এসেছি, আর পরে ধীরে সুস্থে সংশোধন করেছি। এর কি আর শেষ নেই?

একটি উচ্চ বিত্ত পরিবারে তার জন্ম। যখন প্রথম তাকে দেখি, চেহারা বা বেশ-ভূষায় পারিবারিক বিত্তের পরিচয় পাই নি। মোটা খদ্দরের ধুতি ও সার্ট, সুগঠিত শক্ত শরীর। শ্যামলা রং, মুখে শিশুর লাবণ্য। চোখে বুদ্ধির ঝিলিমিলি। মুখে পৌরুষ, মনে একটা অসাধ্য সাধনের দৌ। দুনিয়ার সব অন্যায় অনিয়ম ভেঙ্গে সমতল করে ফেলবার রোখ। অন্যায় দেখলেই তার রক্ত টগবগ করে ফুটে উঠত। নিজেকে আর সামলে রাখতে পারত না। এজন্য ছেলেবেলায় বাবার কাছে কি কম শাস্তি পেতে হয়েছে!

তার ঘটনা বহুল জীবনের কাহিনী মোটামুটি সকলেরই জানা।—অন্ত্রাগার অধিকারের পরে, জল যখন হাতের মুঠোয়, তখনই ভাগ্যলক্ষ্মী ছলনা করলেন। সোজা পথ ছেড়ে, বনের পথে নিয়ে গেলেন সকলকে। তা যদি না হত, প্ল্যান অনুযায়ী যদি সহর অধিকার করতেন?—তা হলে যা হত, আজকে সেটা আমাদের বিশ্বাসের সীমানার বাইরে। —কি যে হত, সে আলোচনা আজ নিষ্ফল।

বাংলার যৌবনের প্রতীক অনন্ত সিং আন্দামানের নির্বাসন থেকে ফিরলেন, কমিউনিষ্ট অনন্ত সিং রূপে। তখন দেশ স্বাধীন, সামনে নতুন নির্ব্বাচন। কমিউনিষ্ট পার্টি নির্বাচন নিয়ে মেতে উঠল। অনন্ত নির্বাচনে প্রার্থী হল না।

'তুমি যে নির্ব্বাচনে দাঁড়ালে না অনন্ত? এটা কী রকম হল!'

সে হেসে প্রশ্ন করল, 'নির্বাচন? এই টাটা বিড়লার গণতন্ত্রে?'—অল্প কথার মানুষ সে, প্রশ্ন করেই আমার মুখের দিকে চেয়ে রইল। এই ছিল তার স্বভাব। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে মুখের দিকে চেয়ে থাকা। অন্যের মনের কথা পড়বার চেষ্টা করা।—স্বীকার করছি, স্বাধীনতার প্রথম উষায় সংবিধানের ত্রুটি বিচ্যুতির চিন্তা, আমার মাথায় আসে নি।

সে সময় কমিউনিষ্ট পার্টির শ্লোগান ছিল, 'এ আজাদি ঝুটা হ্যায়। তবু সেই 'ঝুটা আজাদির' নির্বাচনে, প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে তাদের বাধে নি। মুখে

অবশ্য বলত, যে এই গণতন্ত্রের ভেতরে প্রবেশ করে, তার মুখোষ খুলে দেওয়াই তাদের আসল উদ্দেশ্য। আজ তিরিশ বছর পরে দেখছি, গণতন্ত্রের একটি দাড়ি, কমাও তারা বদলাবার চেষ্টা করেনি। অনন্ত সিংহের আমলে যেটা ছিল 'টাটা বিড়লার গণতন্ত্র', সেই খোড়-বড়ি-খাড়া, আজ হয়েছে প্রমোদ-জ্যোতির অতি পেয়ারের আশ্রয় ৪৩। লাভের মধ্যে এই ক' বছরে, দেশে জিনিষপত্রের দাম দশগুণ বেড়েছে, চারদিকে মাথা তুলেছে অরাজকতা। খুন, ছিনতাই, বোমবাজি; লুঠ, গুণ্ডামি ডাকাতি। গরীব আরো গরীব হয়েছে, ফেঁপে উঠেছে টাটা বিড়লার সাম্রাজ্য। ভাঙবার প্রতিজ্ঞা এখন হয়েছে পার্টির গদি আঁকড়ে, লুটপাট করে খাবার কেরামতি। আর—আর, অনন্ত সিং, পার্টি থেকে, নির্বাসিত হয়েছে বহুদিন আগে।

নির্বাসিত যখন হল, তখন তার বয়স ষাটের ওপরে। তখন আর কংগ্রেসে ফিরে যাওয়ার প্রশ্নই আসে না। নূতন উদ্যমে কাজে নামার বয়সই কি আছে?—কিন্তু রিটায়ার করবার মানুষ নয় অনন্ত সিং। আবার একটা মস্ত ঝুঁকি নিল। জীবনের শেষ ঝুঁকি।

জীবনে অনন্ত সিং অনেক ঝুঁকি নিয়েছে। অনেক ছোটখাট পরাজয়ের ঘা খেয়েছে। অনেক চমকপ্রদ সাফল্য অর্জন করেছে। আমরা তার কোন খবরই রাখি নি। এই শেষ সংগ্রামের ক্রান্তি মুহূর্তে, Betray করে বসল তার শরীর। রক্তের চাকা গ্রাস করল ধরণী। সে হেরে ফিরে গেল। ....এই শেষ প্রচেষ্টায় সে পরাজিত হয়েছে; সে জন্য আমি দুঃখিত। কিন্তু চেষ্টা যদি সে না করত, তবে আরও দুঃখ পেতাম।

[প্রয়াত বিপ্লবী অনন্ত সিংহের ৭৮তম জন্ম বার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষে স্মৃতিচারণ। প্রজ্ঞানানন্দ হল। ১লা ডিসেম্বর ১৯৮০]

——

পরলোকে মহেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

গত রবিবার ৩০শে ডিসেম্বর সকালে তাঁর কলিকাতার বাসায় পরলোক গমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স হয়েছিল ৭৬ বৎসর। উন্মুখ যৌবনেই তিনি বিপ্লবী নায়ক সুরেন্দ্র মোহন ঘোষের সংস্পর্শে আসেন এবং যুগান্তর বিপ্লবী দলে যোগ দেন। তার জন্ম বরিশালে কিন্তু কর্মস্থল ছিল মৈমনসিং এবং কলিকাতায়। 'স্বাধীনতা সংগ্রামে' প্রতিটি স্তরেই তিনি সক্রীয় অংশ গ্রহণ করেন।

তিনি ছিলেন একজন ধ্রুপদি সঙ্গীতের গুণায়ক ও শিক্ষক। এই অমায়িক বন্ধু বৎসল আদর্শনিষ্ঠ বিপ্লবীর কর্মময় জীবনের অবদানে আমরা ঋণিত। তাঁর বিদেহী আত্মার শান্তি কামনা করি এবং তার শোকার্ত পরিবারের সমবেদনা জানাই।

আসাম সংকট কি ভাবে মিটবে?

কালীপদ সরকার (শেষাংশ)

আসামে দেড় কোটি অধিবাসীর মধ্যে নয় লক্ষ উদ্বাস্তু বাঙ্গালী, তাদের জন্য অসমীয়া ভাষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে যে কোন বিপদের কারণ নেই কেন সে বিষয় পূর্বে বলা হয়েছে। উদ্বাস্তু পুনর্বাসনের জন্য আসাম রাজ্যে জনসংখ্যা বৃদ্ধির চাপও যে সর্ব-ভারতীয় প্রতি বর্গ কিলো মিটারে লোকবসতির হার অপেক্ষা কম তাও উল্লেখ করা হয়েছে। তাহলে কি বলতে হবে আসাম আন্দোলনের পিছনে কোনই সারবত্তা নেই? না, তা ঠিক নয়। আছে, আন্দোলনের পিছনে কারণ আছে। সে কারণ অর্থ নৈতিক।

আসামে যারা আন্দোলন করছেন তারা হলেন মধ্যবিত্ত শিক্ষিত পরিবারের মানুষ, মুখ্যতঃ ছাত্র ও যুবক। এদের অধিকাংশই অহম নৃপতিদের প্রশাসক ও সামন্ত বংশোদ্ভূত। বড় গোহাইন, বরদলৈ, ফুকন, বরা, ডেকা প্রভৃতি উপাধি বিভিন্ন স্তরের অহম প্রশাসকদের অতীত চিহ্ন।

১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে আসাম অধিকার করে ব্রিটিশ সরকার একমাত্র ক্রীতদাস প্রথা রহিত করা ছাড়া অসমীয়া সমাজ ব্যবস্থার অপর কোন পরিবর্তন আনতে সচেষ্ট হন নি। অসমীয়া ভূমি মালিকরা তাদের ভূমি আবাদ করতেন ক্রীতদাসদের দ্বারা। ক্রীতদাস সংগ্রহ হত যুদ্ধবন্দী ও বিদ্রোহী প্রজাদের মধ্য থেকে। ক্রীতদাস প্রথা রহিতের পর, মালিকরা আসাম সন্নিহিত পূর্ববঙ্গের জেলাগুলি থেকে মুসলমান ক্ষেত মজুর এনে জমি চাষ আবাদ করা শুরু করেন। যার ফলে অ-মুসলমান আসামে মুসলমান সংখ্যা বাড়তে থাকে।

১৯৪৭ খৃষ্টাব্দে স্বাধীনতা লাভের পর ভারতের সকল রাজ্যেই ভূমি সংস্কার বিধান চালু হয়। যার ফলে নির্ধারিত সীমার অতিরিক্ত ভূমি মালিক পক্ষের হাতছাড়া হয়ে যায়। আসামেও তাই ঘটে এবং সামন্ত বংশধরদের চাকুরি পেশা গ্রহণ করতে হয়। এদিকে দেশে যে শিল্পবিপ্লব ও সামাজিক শ্রেণী বিন্যাসের দ্রুত পরিবর্তন ঘটে চলেছিল সামন্ত-তান্ত্রিক আয়েসী মন তার খবর ঠিকমত রাখে নি।

অসমীয়া মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবীরা রাজ্য সরকারের চাকুরিতে প্রায় একচেটিয়া অধিকার কায়েম করতে পারলেও, বে-সরকারী চাকুরি ও ছোট শিল্প ব্যবসায় ক্ষেত্রে কঠোর পরিশ্রমী বাঙ্গালী উদ্বাস্তুদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় এঁটে উঠতে তেমন সক্ষম নয়। এই ব্যর্থতাই অসমীয়াদের বাঙ্গালী বিদ্বেষের হেতু। হেতুটা তাই অর্থ নৈতিক।

আসামে বসবাসকারী রাজস্থানীরা বড় কারবারী, মূলধন ও সর্ব ভারতীয় লেন-দেনের ব্যাপারে অসমীয়া ব্যবসায়ীরা রাজস্থানীদের উপর নির্ভরশীল। আসামের চা-বাগিচা গুলির মালিকানা এখন প্রায় রাজস্থানীদের হাতে। রাজস্থানীদের সহিত অসমীয়াদের এখনো স্বার্থসংঘাত দেখা দেয় নি। সেই কারণে আসাম থেকে চা রপ্তানীর উপর শুল্ক ফুকন প্রফুল্ল মহন্তরা নিষেধ আরোপ করেন নি। শোনা যায়, এর জন্য মোটা উৎকোচও দিয়ে যেতে হচ্ছে মালিকপক্ষের।

নেপালী, বিহারী, উড়িয়া ও পাঞ্জাবী সংখ্যালঘু আসামবাসী যে সব শ্রমসাধ্য ব্যবসা ও চাকুরিতে নিযুক্ত, তার প্রতি অসমীয়া মধ্যবিত্তদের আগ্রহ কম। তাই তারাও বিদ্বেষ বহ্নি থেকে কিছুটা মুক্ত।

সংখ্যালঘুদের বৃহত্তম গোষ্ঠী পঁয়ত্রিশ লক্ষ মুসলমানদের অধিকাংশই পল্লীবাসী কৃষক ও ক্ষেত মজুর।

তাদের না হলে অসমীয়া ভূমি মালিকদের চলে না। অসমীয়া শিক্ষিত সহরবাসীরা তাই মুসলমানদের প্রতিযোগী বলে মনে করেন না।

বাঙ্গালী মধ্যবিত্ত ও নিম্ন মধ্যবিত্ত হিন্দুই অসমীয়া শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বৃত্তি ও পেশার ক্ষেত্রে প্রতিযোগী। ছোট দোকানি, ফেরিওলা, তাঁতী, কামার, কুমোর, ছুতার ও জেলেদের কাজে উদ্বাস্তুগণ যে দক্ষতা ও উদ্যমশীলতার পরিচয় রেখে চলেছেন তাতেও অসমীয়ারা অসুখী। নিজেরা যে কাজ করবেন না, সে কাজ করে অপরে সাবলম্বী হয়ে উঠে এও তারা পছন্দ করেন না।

বাঙ্গালীরা আসামে পুনর্বাসন পেয়েছেন রাষ্ট্রীয় অধিকার বলে। তারা বিদেশী নন। 'বাংগাল খেদা' ধ্বনি তুললেই বাঙ্গালী খেদানো সম্ভব হবে না। ১৯৭৯ সালের আগষ্ট মাসে আসাম আন্দোলন শুরু হওয়া থেকে ১৯৮০ সালের জুন পর্যন্ত মৃত ও নিখোঁজের সংখ্যা ছিল ৫১০, আহতের সংখ্যা ২০০০ এবং গৃহহারা ২০,০০০ জন। সম্পত্তির ক্ষয় ক্ষতি কয়েক কোটি টাকা। এ তথ্য ১১।৬।৮০ তারিখে লোকসভায় পরিবেশিত হয়।

তারপরেও হতাহত ও ক্ষয়ক্ষতি ঘটেছে যার মধ্যে ধুলিয়াজান তেল প্রকল্পের বৈজ্ঞানিক ইনজিনিয়ার ডঃ রবীন মিত্রের নৃশংস হত্যাও আছে। হতাহত ও ক্ষতিগ্রস্তের মধ্যে অধিকাংশই যে বাঙ্গালী হিন্দু সে কথা বলা নিষ্প্রয়োজন।

আন্দোলনের ফলে রাজস্ব ক্ষতির পরিমান যে কত বিরাট তা অনুমান করা কঠিন। এক তেল উৎপাদন ব্যাহত হবার কারণে প্রতিমাসে নব্বই কোটি টাকার জাতীয় আয় বন্ধ হয়ে ছিল। আসাম ও উত্তর-পূর্ব সীমান্ত অঞ্চলের রাজ্যগুলির আর্থিক ক্ষতি ও নিত্যাবশ্যক দ্রব্যের অভাব জনিত অসুবিধাও হয়েছে প্রচুর। আন্দোলনের বিরুদ্ধে জনসাধারণের অসন্তোষ ক্রমেই মুখর হয়ে উঠেছে। আসু ও সংগ্রাম পরিষদের নেতারা তা যে না বুঝছেন এমন নয়। কিন্তু এখানেও আপসের পথে বাধা হল আন্দোলন নেতাদের অতীত কালের সামন্ততন্ত্রীয় একগুঁয়ে মনোভাব এবং গোপন হস্তের কারচুপি।

কেন্দ্রীয় সরকার আসামের অর্থনৈতিক অনগ্রসরতা দূর করতে বদ্ধ-পরিকর। রাজ্যে শান্তি শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনবার উদ্দেশ্যে জনপ্রিয় মন্ত্রীপরিষদ গড়তেও উদ্যোগী। সরকার অন্যদিকে সীমান্ত নিরাপত্তা ও অনুপ্রবেশ রোধের ব্যবস্থাও জোরদার করেছেন। সম্প্রতি চীন সরকার যে বলেছেন উত্তর-পূর্ব সীমান্তে অশান্তি সৃষ্টিকারীদের চীন ইন্ধন জোগাবে না, সে কথাও এই প্রসঙ্গে প্রণিধানযোগ্য।

আন্দোলনের প্রভাব ফলের দিকে, আন্দোলনকারী তরুণ-তরুণীদের রোমান্স-অনুভূতি ও প্রাণ-চাঞ্চল্যেও ভাঁটার টান পড়েছে। রাজ্য সরকারের কর্মচারীদের মধ্যে অসন্তোষ দেখা দিয়েছে। তবুও আসু ও সংগ্রাম পরিষদের নেতারা মনে হয় একটা সর্বাত্মক মহড়া না দেখিয়ে নিরস্ত হবেন না। অবশ্য সরকার তার জন্য প্রস্তুত।

আসামে ভারতীয় জাতীয়তাবাদী শুভবুদ্ধি-সম্পন্ন মানুষ নেই এ কথা বিশ্বাস করা যায় না। স্বাধীনতা সংগ্রামে আসামের ভূমিকা কম গুরুত্বপূর্ণ ছিল না। ভারতের অঙ্গরাজ্য আসামের নেতৃবৃন্দ উদ্বাস্তু পুর্নবাসন কর্মে এ যাবৎ নির্দিষ্ট দায়দায়িত্ব পালনেও পরাঙ্মুখ হন নি। একদল অপরিণত বুদ্ধি, ভ্রান্ত, ছাত্র ও যুবার বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনের প্রতি নেতৃবৃন্দ ও অসমীয়া জনগণ এক বৎসর ধরে কি করে উদাসীন রয়েছেন ভাবলে বিস্মিত না হয়ে পারা যায় না।

অটলবিহারী বাজপেয়ী প্রভৃতি যাই বলুন না কেন, আসু ও গণসংগ্রাম পরিষদের নেতা ও তাদের গোপন সমর্থকদের বুঝবার সময় এসেছে যে, কেন্দ্রের ইন্দিরা গান্ধী চালিত সরকার জনতা কিংবা লোক দলের নেতৃত্বে অকেজো সরকার নয়। জনতা আমল আসামে যে জটিল সমস্যা বাধিয়ে দিয়ে গিয়েছে, তার জট খুলতে সময়ের দরকার। এই বিলম্ব ও ধৈর্য থেকে একথা যেন কেউ মনে না করে যে, কেন্দ্র দুর্বল এবং আসাম সমস্যা সমাধানে ব্যর্থ হয়েছে।

গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে যতদূর সম্ভব জনগণের সাহায্যে গণতান্ত্রিক পন্থায় সমস্যার সমাধান বাঞ্ছনীয়। কেন্দ্রীয় সরকার সেই পথেই—বরাবর চলেছেন। 'Action and masterly in action' যার মৌল নীতি। মাস তিনেকের মধ্যেই আন্দোলন ভেঙে পড়বে অথবা প্রত্যাহৃত হবে। তখন সমস্যা সমাধানের সূত্র খুঁজে পাওয়া যাবে। আগামী মার্চের মধ্যে আসামের স্থগিত লোকসভা নির্বাচন অনুষ্ঠানও সম্ভব হতে পারে।

একটি প্রবাদ আছে—'People robbed of realities must escape into the world of make-belief'. আসাম আন্দোলনের নেতারা সেই কল্পনা বিলাসের শিকার হয়েছেন। দার্শনিক স্পিনোজা বলেছেন, উদ্যম ভাল তবে সে উদ্যমের পিছনে বস্তুনিষ্ঠ চিন্তা থাকা চাই।

আবার বলছি, অসমীয়া ভাষা-সংস্কৃতির যে বিপদের কথা আসাম আন্দোলনের নেতারা তুলেছেন তা একান্তই অলীক। কারণ সংস্কৃতিবোধ বংশ প্রভাবিত হলেও মানুষের অভিজ্ঞতা ও উদ্ভাবনা তাকে নিরন্তর পরিবর্তনের প্রবাহে বহায়। সংস্কৃতি ও সভ্যতা স্থাণুর ন্যায় চিরস্থির নয়, অথবা গ্রহ-তারকাদের মত নির্দিষ্ট অক্ষপথে বিচরণ করে না। মানুষ তাকে গড়ে, পালটায়, দরকার হলে ভাঙেও। বাঙালীদের সংস্পর্শে যদি অসমীয়া ভাষা সংস্কৃতির কিছু রূপ বদলায়, তাতে অসমীয়া ভাষা-সংস্কৃতি সমৃদ্ধই হবে। এতে ভয়ের কিছু নেই।

কোন ঘটনাকে নিরর্থক বলা চলে না। আসামে যা ঘটেছে তা থেকে দেশ শিক্ষালাভ করবে এবং জাতীয় সংহতি আরো দৃঢ়তর ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠার চেষ্টা চালাবে।

জাতীয় সংহতি পরিষদে প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধী তাঁর উদ্বোধনী ভাষণে যা বলেছেন তা থেকে দু' একটি কথা তুলে বক্তব্য শেষ করছি। তিনি পরিষদের সদস্যদের আহ্বান করে বলেছেন: 'দেশের স্বাধীনতা ও সংহতিকে চির নিশ্চিত বলে ধরে নেওয়া ঠিক নয়। ঐক্য ও স্বাধীনতাকে সদা সতর্ক দৃষ্টির দ্বারা সুরক্ষিত করার প্রয়োজন আছে। ভবিষ্যৎ বংশাবলীর জন্য ভারতকে আমরা এক শক্তিশালী ঐক্যবদ্ধ ও আত্মবিশ্বাস দৃপ্ত, না বিভেদ বিচ্ছিন্ন দুর্বল এবং অস্থির দেশরূপে রেখে যাব—সেই চিন্তা হল প্রধান প্রশ্ন।

বিশেষ করে বর্তমান আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিতে আমাদের দেশের আভ্যন্তরীণ দুর্বলতাকে শত্রুরা কাজে লাগাতে সক্রিয় আছে এবং সাবধান না হলে এ কাজ তারা আরো বেশি করে করবে। বহিঃশত্রু বারুদে যে অগ্নি সংযোগ করে কেবল তাকেই অপরাধী করা ঠিক নয়, বিস্ফোরণের জন্য যারা বারুদ সাজিয়ে রাখে তাদেরও দায়ি করতে হয়।'

আসাম আন্দোলন সম্পর্কে প্রধানমন্ত্রীর কথাগুলি বিশেষভাবে প্রযোজ্য।

কিবা লজ্জা দিব লজ্জাহীনে ?

শ্রীবংশীধর বন্দ্যোপাধ্যায়

যে কোন রাজনৈতিক দলের মূল লক্ষ্য হওয়া উচিত জনগনের সর্ব্বাঙ্গীন কল্যান, কিন্তু কি এদেশে কি বিদেশে সর্ব্বত্রই দেখা যায় যে কমিউনিষ্ট নামধেয় রাজনৈতিক দলগুলি বা তাদের সমগোত্রীয় অথবা সহযাত্রী দলগুলি জনকল্যানকে সর্ব্বাগ্রে স্থান না দিয়ে নিজ নিজ দল কল্যানকেই অগ্রাধিকার দিতে সদা ব্যস্ত থাকে এবং সেকারণেই তারা মিথ্যা প্রচারের আশ্রয় নেয়, জনগনকে ভোক বাক্যে ভুলিয়ে রেখে বা তাদের ভুল পথে পরিচালিত করে নিজ নিজ দলের আখের গোছাবার হীন আশায়। কমিউনিষ্ট পন্থীদের এই হীন প্রচেষ্টা বা শুধুই প্রচার নির্ভর তা আজ আর কারো অজানা নেই, কাজেই ওদের কড়া ও মিথ্যা প্রচারও আজ পদে পদে ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হচ্ছে। ওরা নিজেরাও তা জানে, তবুও ঐ মিথ্যা প্রচারের পথ ছাড়া অন্য কোন পথ ওদের জানা নেই। ওদের ধারণা এই যে, রোজ একই মিথ্যাকে ঢাক-ঢোল সহযোগে বেশ বড় আকারে সর্ব্ব-সাধারণের কাছে জোর দিয়ে প্রচার করলেই উক্ত মিথ্যা ও অলীক প্রচার সত্যে পরিণত হবে। কিন্তু পৃথিবীর বয়স বাড়ছে, ফলে মানুষ গোয়েবল্‌সের মিথ্যাচারীর কথাও জেনে গেছে এতদিনে, তাই ওদের মিথ্যা প্রচার পদে পদে জনগণের কাছে ধরা পড়ে যাচ্ছে। জনগণের বিরাট অংশ সেকারনে বিক্ষুব্ধ, বিরক্ত ও কমিউনিষ্ট বিরোধী শক্তিতে পরিণত হতে শুরু করেছে বিগত কয়েক বৎসর যাবৎ।

পশ্চিমবঙ্গের মানুষ এরাজ্যের বামফ্রন্ট সরকারকে তাই সহ্য করতে আর রাজি নয়। বামফ্রন্ট অর্থাৎ সি, পি, এম সরকার এরাজ্যে সর্ব্বৈব ভাবে ব্যর্থ হয়েছে। রাজ্য পরিচালনের প্রতিটি ব্যাপারে, এই সরকার চরমভাবে ব্যর্থ হয়েছে। সেই ব্যর্থতা ঢাকতে, সেই অপদার্থতা গোপন করতে, সেই অক্ষমতা চাপা দিতে, সেই নির্লজ্জতায় সাফাই গাইতে সি, পি, এম নেতারা মিথ্যা ও উদ্দেশ্য প্রনোদিত অবাস্তব সব গল্প কথা বিবৃতির মাধ্যমে জনগণের দরবারে উপস্থাপিত করে সংবাদ পত্রের পাতায় পাতায় বিষোদ্গার করছে। কিন্তু যাদের ঘুম পাড়িয়ে রাখতে ঐ প্রচেষ্টা বার বার চালু করা হচ্ছে তারা ঐ ভ্রান্ত কৌশল এখন বুঝে ও জেনে ফেলেছে। তবে সি, পি, এম দলের পারিশ্রমিক ভোগী-ক্যাডাররা এতেই নেচে কুঁদে সারা। তারা ঈশ্বরের দরজায় কায়মনো বাক্যে প্রত্যহ কামনা করছে ক্ষরার বা ঝরার অর্থাৎ বন্যার বা অনাবৃষ্টির বন্যা তাদের ঘরে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ সবই এনে দিয়ে ছিল গত ১৯৭৮ সালের শেষে।

পার্টি ফাণ্ড তাদের পুষ্টিলাভ করেছিল বন্যা বা অনাবৃষ্টির বছরে বেশ উল্লেখযোগ্য ভাবে। সাধারণ মানুষের বিপদই সি, পি, এম দলের শ্রীবৃদ্ধির কারণ স্বরূপ দেখা যায়। দরিদ্র মানুষের দারিদ্রের সুযোগ নিয়েই তারা তাদের মিথ্যাশ্রয়ী রাজনীতির খেলা দেখায় এবং সেটাই তাদের চিরাচরিত প্রথা হয়ে দাঁড়িয়েছে বর্ত্তমানে। ফলে সাধারণ মানুষ ঐ সব ফাঁদে পা দিতে নারাজ হচ্ছে ক্রমশই। কমিউনিষ্টদের মুখের কথায় আর কেউই আস্থা রাখতে রাজি নয়। ওদের জনপ্রিয়তা নিম্নমুখী সে কারণেই। কাজের কাজ ওরা কিছু করেনা বা করতে জানে না অথবা করতে চায়না। ফলে

পশ্চিমবঙ্গে সি, পি, এম দল ও তাদের সঙ্গে জোট-বদ্ধ অন্যান্য দলও আজ এ রাজ্যের শাসন কার্য্যে সীমাহীন ব্যর্থতার স্বীকারে পরিণত হয়েছে। রাজ্য পরিচালনের ক্ষেত্রে বামফ্রন্ট এমন অবস্থায় উপনীত যে, সমগ্র শাসন ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়ার উপক্রম। এই দুরবস্থার হাত থেকে মুক্তি পাবার আশায় শাসক বর্গ নানা মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে এরাজ্যের জনগণকে ধাপ্পার পর ধাপ্পার রহস্যজাল করে উল্টো সিধে বোঝাবার তালে মতলব ভেজে চলেছে এবং তার একটি হচ্ছে গত ২৭শে নভেম্বর তারিখে বাংলা বন্ধ্।

ঐ বনধ ডাকার পূর্ব্বে আলুর দাম, মাছের দাম, নিত্যপ্রয়োজনীয় ভোগ্যপণ্যের দাম কি রাজ্য সরকার ইচ্ছা থাকলে কমাতে পারতো না? দাম কমাবার কোন চেষ্টা না করে এ সরকার কেবল অপরের ঘাড়ে নিজেদের অক্ষমতার ও অপদার্থতার বোঝা চাপাতে ব্যস্ত। কেন্দ্রীয় সরকার কি পশ্চিমবঙ্গের বিদ্যুৎ ঘাটতির জন্য দায়ী না কি কেন্দ্র পশ্চিমবঙ্গের আইন শৃঙ্খলার অবস্থাকে পদে পদে নিম্নগামী করতে সচেষ্ট? কেন্দ্র কি পুলিসের মধ্যে এ রাজ্যে হীন ও চক্রান্তকারী রাজনীতির আমদানী করেছে বামফ্রন্ট সরকারের মত? কেন্দ্র কি পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষা ব্যবস্থায় হস্তক্ষেপ করে দলীয় রাজনীতির অনুপ্রবেশ ঘটিয়েছে উদ্দেশ্য প্রণোদিত ভাবে সি. পি, এম দলের মত। এ সব তো কিছুই কেন্দ্র করেনি, তবে কেন্দ্রের বিরুদ্ধে এত মিথ্যা প্রচার কেন? কেন্দ্র অবশ্য একটা বড় অন্যায় কার্য্য করেছে এবং তা হচ্ছে বামফ্রন্ট সরকারের কাছে কেন্দ্রীয় খয়রাতি বাবদ পঠান গম ও টাকার হিসাব চেয়ে পাঠিয়েছে. আর জ্যোতিবাবুর সরকার সেই হিসাব ঠিক ঠিক মত এখনো দিতে পারেনি বলে রেগে আগুন।

কেন্দ্রীয় সরকার হিসাব না নিয়ে জ্যোতিবাবুদের চাহিদা মত যদি গম ও টাকা দেয় অনবরত এরাজ্যে তবেই ভাল, নচেৎ জ্যোতিবাবুরা দলবদ্ধভাবে কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে মিথ্যা প্রচার চালিয়ে যাবে এরাজ্যে প্রতিদিন এবং এটাই সি, পি, এম দলের আসল নীতি। এরাজ্যে জ্যোতিবাবুদের এই হীন চক্রান্তের কারণ জনগন ধরে ফেলেছে এবং সে কারণে তারা বামফ্রন্ট সরকারের পতন ঘটাতে চায় এরাজ্যকে কমিউনিষ্টদের কব্জা থেকে মুক্ত করার বাসনায়! কমিউনিষ্ট পার্টি সে যে লেবেল আঁটাই হোক না কেন আসলে যে সে সর্ব্ব মারার দল তা এরাজ্যের বৃহত্তম জনসংখ্যা হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছে আর তাই তারা বামফ্রন্ট সরকারের বিরুদ্ধে অধুনা সক্রীয় ভাবে আন্দোলনে নামার কঠিন সংকল্প নিয়ে অগ্রসরমান। অল্প কয়েক দিনের মধ্যে কোলকাতার রাজপথে, প্রকাশ্যস্থানে, পার্কে পার্কে দেখা যাবে বামফ্রন্ট সরকারের উচ্ছেদ মানসে লক্ষ লক্ষ লোকের স্বতঃস্ফূর্ত সমাবেশ, মিছিল, নগর পরিক্রমা ও সংগ্রাম। বামফ্রন্ট তথা সি, পি, এম দলও তা জানে বেশ ভাল ভাবেই, আর সেই আশংকায় সি, পি, এম, তার কৃপাপ্রার্থী সি,পি, আই ও তথাকথিত বামপন্থীদল গুলি একযোগে কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে উদ্দেশ্য প্রণোদিত ভাবে চক্রান্ত করার হীন মতলবে ২৭শে নভেম্বর বাংলা বন্ধের ডাক দিয়েছে জনগনকে বিভ্রান্ত করার অভিপ্রায়ে।

উক্ত বন্ধকে সফল করার জন্য রাজ্য সরকার তার সমগ্র প্রশাসন ব্যবস্থাকে অচল করে, পুলিশ প্রশাসনকে বনধ বিরোধী শক্তির বিরুদ্ধে কাজে লাগিয়ে জোর জবরদস্তির মাধ্যমে কল-কারখানা, দোকান পাট, হাট বাজার, অফিস-কাছারি এককথায় সকল কর্ম্মকেন্দ্রগুলিকে বন্ধ রাখতে বাধ্য

করেছে। রাজ্য সরকার যেখানে বন্‌ধ করার স্বপক্ষে, সেখানে বন্‌ধ ঠেকান কঠিন সাধারণ মানুষের পক্ষে একথা সবাই জানে। জ্যোতিবাবু সেই বন্‌ধের নায়ক এবং তিনিই এরাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী। কাজেই বন্‌ধ যে হবে তা বোঝা যায়। কিন্তু বন্‌ধ সফল হোক আর বিফল হোক তাতে এরাজ্যবাসীর সুবিধাই বা কি আর তাতে শাস্তিই বা কার? জ্যোতিবাবুরাও এর সুফল ভোগে বঞ্চিত হতে পারেন কারণ এর ফল সু ও না আর কু ও না. এ একটা ছেলে ভোলান ঘটনা মাত্র, যার মূল্য এক কানা কড়িও নয়; বরং এর ফলে দেশের উৎপাদন ব্যাহত এবং, দিন আনা দিন খাওয়া শ্রেণীর মানুষ অভুক্ত থাকে একদিন, জাতীয় আর্থিক ক্ষতি হয়, অন্তঃরাজ্য বানিজ্য মার খাবে ইত্যাদি।

শ্রীমতী গান্ধীর স্তব-স্তুতি ও অনেক প্রশংসা করেও জ্যোতিবাবুর হালে পানি পাবার চেষ্টা ব্যর্থ হল। তাই কি এই শেষ চেষ্টা বন্‌ধ ডেকে? দেখা যাক সি, পি, এম জনরোষের হাত থেকে রক্ষা পায় কি উপায়ে। অল্প লোককে অল্পদিন ভুলিয়ে রাখা যায় সব লোককে কি চিরদিন ভুলিয়ে রাখা যায়? তা যায় না। এ রাজ্যবাসী গত সাড়ে তিন বছরের সি, পি, এম শাসনে উত্যক্ত ও বিরক্ত এত অধিক মাত্রায় যে, তারা আর ধৈর্য্য ধরে থাকতে নারাজ। তারা চায় এখনই সি, পি, এম দল ক্ষমতা চ্যুত হোক তাদের অক্ষমতার ও দুঃশাসনের জন্য। শাসকের ভূমিকায় সি, পি, এম যে মারাত্মক এক ক্ষতিকর সংস্থা, সে কথা আজ জনমুখে সদা প্রচারিত স্বতঃস্ফূর্তভাবে। সি, পি, এম রাজ্য শাসনের পরিবর্ত্তে এরাজ্যবাসীদের নানাভাবে দারুন ক্ষতিগ্রস্থ করেছে নিজ দল পুষ্টির হীন প্রচেষ্টায়, যা আজ সর্ব্বজন বিদিত। এরাজ্যের শিক্ষিত জন মানস সি, পি, এম দলের রাজনীতির হীনতায় ও দীনতায় বিশেষ বিক্ষুব্ধ ও বিরক্ত। সি, পি, এম দল জনগণের কল্যাণের ধার ধারে না। তাদের কেবল প্রচেষ্টা, নিজের দলের মানুষ গুলির পক্ষে প্রাপ্তিযোগের ব্যবস্থা করা—তা সে যে কোন উপায়েই হোক। সাধারণ সৌজন্য ও শালিনতা প্রকাশের কোন প্রয়োজনীয়তার কথা সি, পি, এম জানেও না এবং মানেও না। ওরা মত্ত হস্তীর মত নিজের চালে ও নিজের তালেই আছে। ফলে দরিদ্র জনসাধারণ ওদের আচার ও আচরনে সবিশেষ ক্ষুব্ধ। ক্ষমতায় বসার সাথে সাথেই সি, পি, এম ভোল্ পাল্টেছে। সর্ব্বহারাদের সংস্রব ত্যাগ করে ওরা এখন বিড়লা বাড়ীর বড় বাবুদের পদলেহনে দলবদ্ধভাবে সদাসর্বদা ব্যস্ত দেখা যায়। কি কারণ এর? কারণ সরল ও সহজ। কৃষক, শ্রমিক ও কর্ম্মচারীরা কি নির্বাচনের [ভোটের] সময় লক্ষ্য লক্ষ্য টাকা দিতে পারবে। নির্বাচনের খরচ জোগাড়ের ধান্ধায় সি, পি, এম তার অতীতের নীতি ছেড়ে নূতন রাস্তায় চলতে শুরু করেছে ক্ষমতার মোহে. আর তাই ধনীদের দুয়ারে সি, পি, এম দলের ঘন ঘন ধরনা। এতদ্ স্বত্বেও তারা সামনের নির্বাচনে পশ্চিমবঙ্গে সাংঘাতিক রকম হার হারবে, কারণ সি, পি, এম-এর মুখোস খুলে দিয়েছে এরাজ্যের শিক্ষিত জনমানস সহজ পাঠ, প্যান্টানোর দুরভিসন্ধিমূলক প্রচেষ্টার ব্যাপারে। ওদের বড়ই করুন অবস্থা জন চোক্ষে। সি, পি, এম পশ্চিমবঙ্গে নিন্দিত ও পরিত্যাজ্য সর্ব্বসাধারণের কাছে নিজ দোষে ও প্রমত্ততায় এরাজ্যে রামরুষ্ট নিপাত যাক বলে প্রতি সন্ধ্যায় মিছিল বার হতে শুরু হয়েছে।

——

বাংলা বন্ধ্

—মলয় ঘোষ

পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্ট সরকারের সাড়ে তিন বছরের শাসন-ইতিহাসে একটি নবতম কীর্তি সংযোজিত হল। গত ২৭ তারিখের বাংলা বন্ধের মাধ্যমে তাঁরা দেখিয়ে দিলেন, বামপন্থীরা ক্ষমতায় এলে কতো অদ্ভুতভাবে প্রগতিবাদী হতে পারেন—চিরাচরিত রীতিনীতিকে অগ্রাহ্য করে, সংবিধানের ধারাকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে ও তার নেতীবাচক ব্যাখ্যার সুবিধা নিয়ে কিভাবে তাঁরা অনায়াসে রাজিমাত্ করতে পারেন।

ভারতীয় সংবিধানে যেহেতু 'বন্ধ' ডাকার ব্যাপারে রাজ্য সরকারের অধিকার বা অনধিকার সম্পর্কে কোন উল্লেখ নেই, সেহেতু পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রন্ট সরকার 'বাংলা বন্ধ' ডাকার সুযোগ নিলেন। ক্ষমতায় আসীন একটা রাজ্য সরকার কর্তৃক নিজের রাজ্যেই একেবারে 'বন্ধ' করে দেওয়ার এই ঘটনা স্বাধীনতত্তর ভারতবর্ষের ইতিহাসে এই প্রথম এবং পৃথিবীর ইতিহাসেও সম্ভবতঃ নতুনতম। রাজ্যের পরিবহণ, বিদ্যুৎ, জল সরবরাহ, অসামরিক প্রতিরক্ষা, গুণ্ডা ও কালো বাজারী দমন এবং সামগ্রিকভাবে রাজ্যের জনগণের জীবন ও সম্পত্তি রক্ষার দায়িত্বও সম্ভবতঃ বামফ্রন্ট সরকার অগ্রাহ্য করবেন—সংবিধানের নেতীবাচক ব্যাখ্যার সুবিধা নিয়ে।

আসলে, রাজ্যের বামফ্রন্ট নেতৃবর্গের মধ্যে, বিশেষতঃ সি, পি, এমের নেতৃত্বে বর্তমানে একটা অদ্ভুত স্বৈরতন্ত্রী ও স্বেচ্ছাচারীতার মনোভাব স্পষ্ট ভাবে প্রকাশিত হয়ে পড়ছে—যার অন্যতম নিদর্শন হলো ২৭ এর বন্ধ। আমরা কোন কাজ করবোনা, কোথাও কাজ হলে আমাদের ইউনিয়ন দিয়ে বাগড়া দেব, সমাজের প্রতিটি ক্ষেত্রে নির্লজ্জভাবে পার্টি-বাজী করে যাবো, কেন্দ্রের দয়া দাক্ষিণ্যের ওপর পরিপূর্ণ নির্ভর করে থাকবো—অথচ কথায় কথায় কেন্দ্রকেই চোখ রাঙাবো, যুড কর ওয়ার্কের গম আর টাকা নিয়ে চরম দুর্নীতি করবো এবং হিসাব চাইলেই 'বিমাতৃসুলভ আচরণ' বলে চেঁচামেচী করবো, বিরোধী দলের আন্দোলনকে দমাতে প্রশাসন ও পুলিশকে লেলিয়ে দেব—আবার বিরোধী দলের উপরতলার নেতৃত্বের কাছে গিয়ে সাফাই গাইবো—রাজ্যের কোন সমস্যার সমাধান করতে পারবো না বরং দিনে দিনে সমস্যার পাহাড় জমিয়ে যাবো—এবং এত সব করেও বুক ফুলিয়ে বলে বেড়াবো—আমরা একটা পরিচ্ছন্ন জনগণতান্ত্রিক সরকার চালাচ্ছি, সারা ভারতবর্ষ আমাদের দিকে তাকিয়ে আছে। আল্টিমেটাম দেব—অতএব আমাদের কাজের কোন কৈফিয়ৎ চেও না। তাহলেই রাজ্য জুড়ে চরম বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হবে। বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গের ক্ষমতাসীন বামনেতারা খুব সুপরিকল্পিত ভাবে এই ট্যাকটেজি নিয়ে চলেছেন।

২৭ তারিখে 'বাংলা বন্ধের' দিন 'বন্ধ' হয়েছিল—এটা কোন উল্লেখযোগ্য ঘটনা নয়। যাঁদের হাতে সরকার, প্রশাসন, পুলিশ, তাঁরা যদি বন্ধ ডাকেন—বিশেষতঃ সরকার নিজেই যদি, বন্ধের সপক্ষে সার্কুলার পাঠান অধীনস্থ বিভিন্ন বিভাগে—সেক্ষেত্রে বন্ধ সফল না হওয়াটাই অস্বাভাবিক। উল্লেখযোগ্য হল এটাই যে জনসাধারণের একটা বিরাট অংশ, বলা যায় গরিষ্ঠতর অংশই ঐ দিন কাজকর্ম করতে

চেয়েছিলেন। আমি ট্রেণে, ট্রামে, বাসে বহুলোককে বন্ধের আগের দিন বলতে শুনেছি—২৭ তারিখে যানবাহন চলাচল করলে তাঁরা অবশ্যই কর্মস্থলে যাবেন। কোলকাতার অফিস, কাছারী, স্কুল, কলেজ ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে অধিকাংশ কর্মী আসেন মফঃস্বল থেকে। ২৭ তারিখে রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ ট্রেন চালিয়েছিলেন কিন্তু মাঝপথে বন্ধের সমর্থকরা লাইন অবরোধ করে ট্রেন বন্ধ করে দেয়—কোথাও কোথাও ড্রাইভার ও গার্ডকে মারধর করবারও খবর পাওয়া গেছে। আমি একথা জোর দিয়ে বলতে পারি—বন্ধের দিন অন্ততঃ ট্রেন যদি নিয়মিত চলতে পারতো তবে অধিকাংশ কর্মী তাঁদের কাজে যোগ দিতেন। মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতিবাবু রাজ্য সরকারী কর্মচারী ফেডারেশনের আন্দোলনের চাপে পড়ে বলতে বাধ্য হয়েছিলেন—বন্ধের দিন কেউ কাজ করতে চাইলে করতে পারবেন—তাঁদের বাধা দেওয়া হবে না। অথচ ২৭ তারিখে আমরা কি দেখলাম? খোদ রাইটার্স বিল্ডিংসে পুলিশ সমস্ত গেট বন্ধ করে রেখেছিল এবং ইচ্ছুক কর্মচারীদের ভেতরে ঢুকতে দেয়নি—তাঁরা নিজেদের পরিচয়পত্র দেখানো সত্ত্বেও। রাইটার্সের কোন ঘর ঐদিন খোলা হয়নি অথচ বিশেষ ব্যবস্থায় মুখ্যমন্ত্রী ও পূর্তমন্ত্রীর ঘর খোলা হয়েছিল এবং তাঁরা ও কয়েকজন অফিসার রাইটার্সে ঐদিন প্রবেশাধিকারও পেয়েছিলেন। এই চরম বিদ্যুৎ-সংকটের দিনে বন্ধের আগের দিন বিকাল থেকে বন্ধের পরের দিনের সকাল পর্যন্ত রাইটার্সের ঘরে ঘরে, বারান্দায়, করিডোরে এমন কি লিফ্‌টগুলিতে পর্যন্ত কেন আলো জ্বালা ছিল, কার বা কাদের ওপর সেগুলি অফ্‌ করার দায়িত্ব ছিল এবং কেনই বা তা' করা হয়নি এবং সর্বোপরি, এই গাফিলতির জন্য তাদের কোন শাস্তিমূলক ব্যবস্থার আওতায় আনা হয়েছে কিনা—এ কথা সাধারণ মানুষ জানতে চান। লিলুয়ায়, সোদপুরে কল্যাণীতে কেন দুজন শ্রমিককে খুন করা হল এবং একজন যুবক ছুরিকাহত হল, দুর্গাপুরে সাতজন নিরীহ যুবককে বিনা কারণে কেন প্রচণ্ড প্রহার করা হল—যার ফলে একজনের মৃত্যু হল, বন্ধের ব্যাপারে কোন পুলিশ যাবে না ঘোষণা করেও কেন দলের সমর্থকদের সাহায্য করতে বামফ্রন্ট সরকার বিভিন্ন ঘটনায় পুলিশ লেলিয়ে দিলেন—জনসাধারণ তার কৈফিয়ত চান। স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রীর ঘোষণায় বিশ্বাস করে কাজে যোগদান করতে গিয়ে লিলুয়ার যদুনাথ রাজভড় কেন খুন হল এবং এই খুনের জন্য মুখ্যমন্ত্রীকেই কেন দায়ী করা হবে না—সাধারণ মানুষ তা বুঝতে পারছেন না। ২৭ তারিখের বন্ধের ফলে শ্রমজীবি দিন আনা দিন খাওয়া জনজীবনের যে আর্থিক ক্ষতি হল, বন্ধের পরের দিন থেকেই নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষ-পত্রের দাম যে আর একধাপ উঁচুতে উঠে গেল—অথচ যেসব ইস্যুতে এই বন্ধ ঘোষিত হয়েছিল—তার কোন কার্যকরী সমাধান হলো না—বরং কেন্দ্রের সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের সম্পর্ক আরও তিক্ত হয়ে গেল, এই অবিমৃষ্যকারীতার জন্য দায়ী যে বা যারা—জনগণ তাদের বিচার চান।

কিন্তু সে বিচার হবে না। আবার এই সব অন্যায় ঘটবে জনসাধারণকে তা বিনা প্রতিবাদে মেনে নিতে হবে। কারণ এ তাঁদের চাপের প্রায়শ্চিত্ত, তাঁরা 'স্বখাত সলিলে' ডুবতে বসেছেন। '৭৭ থেকে '৮১—পুরো পাঁচ বছর এই বামফ্রন্ট সরকারের মেয়াদ—তার তিন বছর পার হয়ে পরের দিকে চলেছে। এই সময়টাই সবচেয়ে মারাত্মক। ছলে বলে কৌশলে বামফ্রন্ট ও তার অন্তর্ভুক্ত শরীক

দলগুলি এই শেষের দেড়টা বছরকে নিজেদেরস্বার্থ-সিদ্ধিতে লাগাবে। চক্ষুলজ্জার শেষতম ব্যবধান-টাকেও ছিঁড়ে খুঁড়ে ফেলে এরা আরও ভয়ংকর ভয়ংকরতর রূপে দেখা দেবে—অবাধে চলবে লুণ্ঠন, শোষণ, হত্যা, অত্যাচার, গণতন্ত্রের নামে গণতন্ত্রের কণ্ঠরোধ। সি. পি, এম সহ বামফ্রন্টের ছোটবড় মাঝারী সব শরীরই এইসব কাজে উঠে পড়ে লেগেছে। ২৭-এর বাংলা বন্ধ তারই ট্রেজ্ রিহার্সাল্। প: বঙ্গের জেলায় জেলায়, যাদ কলকাতায় লাখ লাখ টাকা খরচ করে বিশাল বিশাল পার্টি অফিস তৈরী হচ্ছে। রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের কো-অর্ডিনেশন কমিটির অফিস বাড়িটা দেখে আসুন দক্ষিণ কলিকাতায় আর খোঁজ নিয়ে দেখুন বিভিন্ন অ্যাকাউন্টে ওঁরা কতো সংগ্রহ করেছেন গত সাড়ে তিন বছরে। বাম নেতারা বলছেন—জনগণের উদার সহায়তায়, চাঁদায়, Street collection ক'রে আমরা পার্টি অফিস করছি। কি হাস্যকর কৈফিয়ত। ক্ষমতায় আসার আগে পর্যন্ত—বিরোধী পক্ষে থাকার দীর্ঘ দিনগুলিতে ওঁদের কোন collection ছিল না, জনগণ সহায়তা করতেন না—ক্ষমতায় আসা থেকেই রাতারাতি তাঁরা এত চাঁদা তুললেন যে প্রতিটা জেলায় বিশাল বিশাল প্রাসাদ তৈরী হয়ে গেল।

রিজার্ভ ব্যাংক থেকে ওভারড্রাফ্ট নিলেন এঁরা ১০০ কোটি টাকা—রাজ্যগুলির যা সীমা, তার দ্বিগুণ। গৌরী সেন পেয়েছেন হাতের মুঠোয়, চারহাতে দান-ধ্যান শুরু করলেন—বেকার ভাতা, কৃষক-ভাতা, বিধবা ভাতা আরও কত কি। পার্টির সম্মান বাড়লো, প্রভাব প্রতিপত্তি অক্ষুণ্ণ রইলো। ছেলেগুলো, যারা দুদিনে খেটেছিল ওদের তো কিছু পাইয়ে দেওয়া গেল! গ্রামের সরল, গরীব মানুষগুলোকে তো বাঁধা গেল কৃতজ্ঞতার ঋণে! এখন কি অবস্থা! টাকায় টান পড়েছে, ফলে রাজ্যের সমস্ত উন্নয়নমূলক কাজকর্ম বন্ধ হতে বসেছে; ঠিকাদাররা টাকা পাচ্ছেন না, P.W.D হাত গুটিয়ে ফেলেছে, গ্রামে গ্রামে, জেলায় জেলায় কাজ অর্ধসমাপ্ত থেকে গেল; টানেল তৈরীতে বাধা পড়লো, ব্রীজ বাঁধানো হল না—নলকূপ রইল অর্ধেক পোঁতা। এখন সামাল সামাল! খরচ কমাও যে কোন উপায়ে, মন্ত্রীদের যখন তখন গাড়ী চড়া বারণ, হিল্লী-দিল্লী ঘুরে বেড়ানো কমাতে হবে—বেকার ভাতাও বোধহয় কয়েক মাস দিতে পারা যায়নি, আদৌ আর যাবে কিনা সন্দেহ! এই কি একটা বিচক্ষণ সরকারের নমুনা! কোটটা যখন তৈরী করতে দিয়েছিলেন, দেখেননি কাপড় কতোটা আছে! নাকি ভেবেছিলেন—যতোই নিয়ে রাখি, চোখ রাঙালেই সুড় সুড় ক'রে কেন্দ্র টাকা দেবে, গম পাঠাবে! খুব ভুল ভেবেছিলেন। সামনে দিন আসছে, আরও দুঃসহ, কঠোরতম অগ্নিপরীক্ষার দিন।

হ্যাঁ, সেই কারণেই এই বনধ্! যতো এই বামফ্রন্ট ব্যর্থ হচ্ছেন, পেরে উঠছেন না সামাল দিতে, আগামী দিনের সম্ভাব্য অনটন আর ইতিমধ্যে অপ্রত্যাশিতভাবে বাড়িয়ে-ফেলা খরচপত্রের মধ্যে ক্রম-বর্দ্ধমান সামঞ্জস্যহীনতা দেখে আতংকিত হচ্ছেন—ততোই ওঁরা পাশ কাটানোর চেষ্টা করছেন—চাইছেন পালিয়ে যেতে। ২৭-এর বন্ধ্ এই দুরভি-সন্ধির তাড়নাজাত এক অপচেষ্টা মাত্র; মানুষের মনকে অন্যদিকে ঘুরিয়ে দেবার, মানুষের বিক্ষোভকে পাশ কাটানোর এক বিমূঢ় কৌশল মাত্র: নিজেদের সমস্ত অপদার্থতা আর ব্যর্থতার দায়-দায়িত্ব কেন্দ্রের ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে গণতান্ত্রিক সুযোগটাকে প্রাণপণে

আঁকড়ে থাকার বাতুল প্রচেষ্টামাত্র। কিন্তু সফল হতে কি পারবেন? রঙের কারসোর সবচেয়ে দামী রঙ এই 'বন্ধু' ব্যবহার করেও তো দেখলেন, ছবিটা খুব খুললো না, বরং আরও ঝাপসা হয়ে গেল! আপনারা কি সুনিশ্চিত, আজকের পশ্চিমবঙ্গের এই চরম অবস্থার জন্য রাজ্যের সাধারণ মানুষ আপনাদের যুক্তি মেনে নিয়েছে মেনে নিয়েছে রাজ্যের প্রতি কেন্দ্রের, বিশেষত: পশ্চিমবঙ্গের প্রতি প্রধানমন্ত্রীর 'বিমাতৃসুলভ' আচরণের অভিযোগ!

বোধহয় না, মেনে নেয়নি। আপনারাও সেটা জানেন। আর জানেন বলেই আরও হিংস্র হয়ে উঠছেন, উঠবেনও। কিন্তু তাতে কি সুবিধা হবে? গণতন্ত্রের, জনগণের কণ্ঠরোধ ক'রে কি কোনদিন কেউ আত্মরক্ষা করতে পেরেছে? ইতিহাস কি সেই সাক্ষী দেয়?

●

পরলোকে প্রবীণ বিপ্লবী

ঢাকার প্রবীণ বিপ্লবী শচীন সরকার গত সোমবার রাত্রিতে পি জি হাসপাতালে ৭০ বৎসর বয়সে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন। এই অমায়িক সর্বজন প্রিয় বন্ধু বৎসল, স্বাধীনতা সংগ্রামের একনিষ্ঠ সৈনিকের মৃত্যুতে আমরা ব্যথিত।

আমরা তাঁর বিদেহী আত্মার শান্তি কামনা করি এবং শোক সন্তপ্ত পরিবারকে আন্তরিক সমবেদনা জানাই।

পরলোকে প্রবীণ বিপ্লবী হেমচন্দ্র ঘোষ

সর্বজন শ্রদ্ধেয় বড়দার মহাপ্রয়াণে আমরা শোকস্তব্ধ। আগামী সংখ্যা তাঁর উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধাঞ্জলী নিবেদন করা হইবে।

—সঃ বিঃ বাঃ

ভারত বিপ্লব আন্দোলনের ইতিহাস

॥ ক্ষীরোদ দত্ত ॥

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

পিলভিত জেলার বিজপুরী গ্রামে প্রথম দানগ্রহণ অভিজান হল। ডাকাতিতে বিপ্লবীদের অভিজ্ঞতা নাই বলে রামপ্রসাদ কয়েকজন পেশাদারী ডাকাতকে ডেকে নিয়ে এলেন। কিন্তু কার্যকালে দেখা গেল বিপ্লবীদেরও পেশাদার ডাকাতদের মধ্যে পার্থক্য গভীর। প্রথম থেকেই তারা অল্পবয়স্ক বিপ্লবীদের অবজ্ঞা করতে লাগল। ডাকাতরা যেমন বিপ্লবীদের শিশুও মনে করত বিপ্লবীরা তেমনি ডাকাতদের মনে করতেন অপরাধী। কিন্তু শেষপর্যন্ত এই ডাকাতদল বিপ্লবীদের এমন একটা বাড়ীতে নিয়ে গেল যেখানে তন্নতন্ন করে খুঁজেও একটি পয়সা পাওয়া গেলনা। ঘরের মেঝে বহু স্থানে খোঁড়া হল। কিন্তু সব বৃথা। স্থির হল পেশাদার ডাকাতদের আর ডাকা হবেনা। এরপরে আর যে সব জোর করে দানগ্রহণ অভিজান তাতে বিপ্লবীরা নিজেরাই অংশগ্রহণ করেন। দ্বিতীয় অভিজান হয়েছিল পিলভিত জেলার বনরৌলী গ্রামে। গ্রামের অত্যাচারী জমিদার ধুর্জন বলে খ্যাত। বিপ্লবীরা স্থির করলেন তার কাছ থেকেই জোর করে দানগ্রহণ করা হবে। জমিদার গৃহের পাঁচীল ডিঙ্গান মাত্রই গ্রামবাসীরা চারদিক থেকে গুলি আরম্ভ করল ছাদে যারা ছিলেন তারা শুয়ে পড়লেন। গৃহের মধ্যে যারা ছিলেন তারা যথারীতি লোহার সিন্দুক ভাঙতে লাগলেন। প্রতি আক্রমন পেয়ে রামপ্রসাদ খুব খুশী হলেন। ছাদের লোকদের তিনি গুলি করতে নিষেধ করলেন। নিজে মাঝে মাঝে গুলি করতে লাগলেন। এইভাবে কাজ শেষ হল। অর্থও কিছু পাওয়া গেল। এবারে পালাবার পালা গ্রামবাসীদের বন্দুক তখনও চলছিল। একজন অবসর প্রাপ্ত সৈনিক গুলি চালিয়ে যাচ্ছিল। রোসন সিং তাকে চিনতেন। তিনি চিৎকার করে সৈনিককে সম্মুখ যুদ্ধে আহ্বান করলেন। সৈনিকও আহ্বানে সাড়া দিয়ে এগিয়ে এল। রোশন সিং দ্রুত গতিতে গুলি চালালেন। সৈনিকও আহত হল। হাত থেকে তার বন্দুকটা পড়ে গেল। বিপ্লবীরা এইভাবে বিপদমুক্ত হল। এই দানের টাকায় 'বিপ্লবী' নামে এক ইস্তাহার পেশোয়ার থেকে রেঙ্গুন পর্যন্ত ছড়ানো হয়েছিল।

এই সমস্ত পল্লী ডাকাতিতে অনুশীলন সমিতির প্রথমদিকের ডাকাতির রীতিনীতি মেনে চলা হত। স্ত্রীলোকের গায়ে হাত দেওয়া সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ ছিল। একবার এক ডাকাতিতে ডাকাতের সংখ্যা কম দেখে দুজন স্ত্রীলোক বাধা দিতে এগিয়ে এল বিপ্লবীরা সংখ্যায় ছিলেন মোট আট জন।

স্ত্রী লোকেরা দুজনেই একসঙ্গে দুজন বিপ্লবীর উপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন। তাদের হাতের রিভলবার চেপে ধরলেন। সঙ্গে সঙ্গে মারতেও লাগলেন। বিপ্লবীরা অসহায়। স্ত্রী লোকের উপর বলপ্রয়োগ তাদের উপর নিষেধ। তারা শুধু শরীরের সমস্ত বলপ্রয়োগ করে নিজ নিজ রিভলবার ধরে রেখেছেন। অপরদিকে স্ত্রী লোকেরা রিভলবার ধরে টানছেন। শেষ পর্যন্ত মন্মথ গুপ্ত তার রিভলবার সমস্ত শক্তি দিয়ে কেড়ে নিলেন। দ্বিতীয় ব্যক্তি ছিলেন চন্দ্রশেখর আজাদ। পার্টির সামরিক অধিনায়ক।

(ক্রমশ)

gedNo.R. N. 24511/71 Biplabi Bangla Regd. W B/NC 77
Phone : 34-1795
বার্ষিক :—পঞ্চাক ১৫.০০ টাকা ষাণ্মাসিক :—৮.০০ টাকা মূল্য—৩০ পয়সা

1 DEC 1980

বিপ্লবী পুস্তকমালা

নেতাজীর সিক্রেট সার্ভিস — ডাঃ পবিত্রমোহন রায়—১০.০০

ক্ষীরোদ কুমার দত্তের—

১। বাংলার অগ্নিযুগ—১.৫০
২। অনুশীলন সমিতির পি, মিত্রের—২.০০
৩। কাকোরী শহীদবৃন্দ—১.২৫
৪। রাসবিহারী ও অনুশীলন সমিতি—৯১
৫। বিবেকানন্দ ও সমাজবাদ—.৯০
৬। মহারাজ ও সুভাষচন্দ্র—.৫০
৭। দেশ যাদের ভোলেনি (১)—১.০০
৮। শহীদ চন্দ্রশেখর আজাদ—.৫০
৯। রাষ্ট্রিক হত্যা প্রচেষ্টা—.৭৫
১০। ভারতের জাতীয় পতাকার ইতিহাস—.৫০
১১। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও অনুশীলন সমিতি—৪.০০
১২। জাট হত্যা প্রচেষ্টা—১.৫০

১। ভারতে চরমপন্থীর বিপ্লব প্রচেষ্টা—৮.০০
২। স্বাধীনতা সংগ্রাম কাহিনী—১.০০
৩। কলকাতা যাদুঘর সংগ্রাম কাহিনী—.৫০
৪। স্বাধীনতার শহীদ মা ও মেয়ে—.৫০
৫। বিপ্লবী বিবেকানন্দ—.৫০
৬। ভারতের নবজাগরণ ও ভগিনী নিবেদিতা—.৭৫
৭। দেশ যাদের ভোলেনি (২)—২.০০
৮। ১৯৩ এপ্রিল জাতীয় শহীদ দিবস—১.০০
৯। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও অনুশীলন সমিতি—৪.০০

প্রাপ্তিস্থান :—৪নং বঙ্কিম ঘোষ ষ্ট্রীট কলিকাতা-৭০০০০৭

শৈলজা—১/১/১/A বঙ্কিম চাটার্জী ষ্ট্রীট কলিকাতা-৭৩

— সম্পাদক মণ্ডলী —
শ্রীঅনাদি পাল চৌধুরী
শ্রীসুখেন্দু ঘোষ। ভেরোদা—শ্রীনন্দগোপাল পাল।
প্রকাশনী সচিব :—শ্রীঅনিল সেনগুপ্ত। প্রচার সচিব—শ্রীসুখেন্দু ঘোষ।
বিপ্লবী বাংলা কার্যালয় :—৪নং বঙ্কিম ঘোষ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০০৭
মুদ্রণে:—প্রিন্টিং হাউসিনী ১২ নং কেশব সেন ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৭০০০০৯

বিপ্লবী বাংলা

বিপ্লবী পরিষদের সাপ্তাহিক মুখপত্র
স্থাপিত—১৯৫৬, 'বিপ্লবী বাঙ্গালী' নবকলেবরে—১৯৭১

দশম বর্ষ	শনিবার ৫ই পৌষ ১৩৮৭ ২০শে ডিসেম্বর ১৯৮০	১০ম সংখ্যা

KRISHNAGAR

আমরা আরম্ভ করি শেষ করি না। আড়ম্বর করি কাজ করি না। যাহা অনুষ্ঠান করি তাহা বিশ্বাস করি না। যাহা বিশ্বাস করি তাহা পালন করি না। ভূরি পরিমাণ বাক্য রচনা করি, তিল পরিমাণ আত্মত্যাগ করিতে পারি না।

আমরা অহংকার দেখাইয়া পরিতৃপ্ত থাকি। যোগ্যতা লাভের চেষ্টা করি না। আমরা সকল কাজেই পরের প্রত্যাশা করি। অথচ পরের ত্রুটি লইয়া আকাশ বিদীর্ণ করিতে থাকি।

এই দুর্বল, ক্ষুদ্র, হৃদয়হীন, কর্মহীন, দাম্ভিক, তার্কিক জাতির প্রতি বিদ্যাসাগরের এক সুগভীর ধিক্কার ছিল। কারণ তিনি সর্ব্ব বিষয়েই ইহার বিপরীত ছিলেন।

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

সম্পাদকীয়

মৈত্রীর জয়যাত্রা

সোভিয়েত প্রেসিডেন্ট ব্রেজনেভ চারদিনের জন্য ভারত সফরে এসেছিলেন এবং ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরার সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক এবং আন্তর্জাতিক বহু বিষয় নিয়ে আলাপ আলোচনা করে স্বদেশে ফিরেও গিয়েছেন। মিঃ ব্রেজনেভের এই সফর উপলক্ষে বহু জল্পনা কল্পনার সৃষ্টি হয়েছিল। স্বদেশের কাগজের সংবাদ দাতারা অনেক 'স্কুপিং' করেছিলেন, রাজনৈতিক বিশ্লেষকরাও কিছু ভবিষ্যৎ বাণী দিয়েছিলেন। এরাই আবার বৈঠকের পর নিজেদের দৃষ্টিভঙ্গী অনুযায়ী বৈঠকের ফলাফল সম্বন্ধে নানা প্রকার উক্তি করেছেন। সংক্ষেপে বলা যায়, প্রত্যেকেই নিজ নিজ উক্তিকে সঠিক ও মনোগত ইচ্ছাকে পূর্ণ দেখতে চেয়েছিলেন। কিন্তু সফরের মৌল উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সচেতন থাকলে এটা ঘটত না।

দুইটি দেশ যখন পারস্পরিক আলোচনায় বসে, তখন দ্বিপাক্ষিক সমস্যা ও জাতীয় স্বার্থ সমাধান করার জন্যই এই কাজ করে। আজকালকার পৃথিবীতে কেউ একক ও বিচ্ছিন্ন হয়ে বসবাস করতে পারে না। তাই আন্তর্জাতিক ঘটনাবলী ও পরিস্থিতি নিয়ে এই সাক্ষাৎকারে আলোচনা করতেও বাধ্য হয়। আলোচনারত দুই দেশই চায় এই সব সমস্যা সম্বন্ধে সহমত হতে। কিন্তু নিজ দেশের স্বার্থ বিলিয়ে দিয়ে কাজ কেউ করেনা। তবে প্রচেষ্টা চলে যে দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্যের এলাকাকে যতটা সম্ভব সঙ্কুচিত করতে। তাই সকল সমস্যা সম্বন্ধে একমত না হলেও, আলোচনা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয় না। অধিকাংশ ব্যাপারে ঐক্যমত স্থাপিত হলেই, আলোচনাকে সফল বলা চলে। তবে অবিরাম চেষ্টা চালিয়ে যায় যাতে ভবিষ্যতে এক দেশ অন্য দেশের আরো কাছাকাছি আসতে পারে। কোন দেশের পররাষ্ট্রনীতি কখন স্থানু বা অচল অনড় হয়ে থাকতে পারেনা। দেশ বিদেশের ঘটনাবলীর পরিপ্রেক্ষিতে পররাষ্ট্র নীতির কিছুটা পরিবর্তন, এমন কি সংশোধনও করতে হয়। তাই পররাষ্ট্রনীতিকে যে দেশ সমীক্ষা নিরিক্ষা করেনা তাকে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে অনেক সময় নির্বোধ বনে যেতে হয়। তবে তার অর্থ এই নয় যে কোন দেশ সহসা তার বৈদেশিক মৌলনীতি অনুসরণ করা থেকে সুবিধাবাদের পথ নেয়।

রাশিয়ার সঙ্গে ভারতবর্ষের বন্ধুত্ব বহু দিনের এবং বহু অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ। সুখের দিনে রাশিয়া ভারতের সঙ্গে থেকেছে, দুঃখ এবং বিপদের দিনেও সমান আগ্রহ ও আন্তরিকতা নিয়ে আমাদের পাশে দাঁড়িয়েছে। যে সুখের সাথী, দুঃখের ভাগী, সেই জন্যই ত সে আপন জন। রাশিয়া আমাদের আপন জন এটা ত সময়ের কষ্টিপাথরে আজ সংশয়াতীত ভাবে প্রমাণিত। কিন্তু তবুও এই বন্ধুত্বকে অব্যয় ও অক্ষয় বলে ধরে নেওয়া সুবোধ সঙ্গত নয়। আর বহু বিষয়ে ঐক্যমত হওয়া মানে এটা নয় যে একদেশ অন্য দেশের অন্ধ স্তাবক। সময়ে সময়ে মত পার্থক্য ঘটবেই। তারই পরিপ্রেক্ষিতে টেবিলের পাশে বসে আলাপ আলোচনা প্রয়োজন।

এবারকার আলোচনা বহু ক্ষেত্রে দুই দেশের দৃষ্টিভঙ্গীর মধ্যে পার্থক্য দেখা যায় নি। সমগ্র বিশ্বে শান্তি স্থাপন, বহু দিনের প্রতিষ্ঠিত নীতি অনুসরণ, অন্য কোন দেশের সীমানা অলংঘন, ভিন্ন দেশের ব্যাপারে কোন প্রকারে নাক না গলানো, এখনও পর্য্যন্ত পরাধীন দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে সমর্থন দান, ভারত মহাসাগরে শান্তির এলাকা স্থাপন, সব সমস্যার আলাপ আলোচনার মাধ্যমে সমাধান, পঞ্চশীলের নীতি অনুযায়ী সহ-অবস্থান, পৃথিবীর ভবিষ্যৎকে নিরাপত্তাদানের ব্যবস্থা কায়েম করার জন্য আত্মনিয়োগ এবং অন্যান্য জরুরী বিষয়েও উভয় দেশের মধ্যে কোন মত পার্থক্য নেই। অর্থ-নৈতিক ও বানিজ্যক্ষেত্রেও দুই দেশের বন্ধু সুলভ মানসিকতা ক্রমবর্দ্ধমান। কিন্তু আফগানিস্থানের ব্যাপারে দুই দেশের মত পার্থক্য কিছুটা আছে। আফগানিস্থানের ব্যাপারে ভারতের দৃষ্টিভঙ্গী স্বচ্ছভাবে ও দ্বিধাহীন ভাবে ভারত ব্যক্ত করেছে বারংবার। কিন্তু এই পরিস্থিতির জন্য যারা সব দোষ রাশিয়ার ঘাড়ে চাপাতে চায়, ভারত সরকার তাদের সঙ্গে একমত নয়। আফগানিস্থানের সমস্যাটা নিছক আফগানিস্থানের সমস্যা নয়। রাশিয়ার ভৌগলিক অবস্থান যা, তাতে হাজার হাজার মাইল দূরবর্ত্তী আমেরিকা, চীন এবং পার্শ্ববর্তী, পাকিস্তানের কার্যকলাপ একেবারেই সমর্থনযোগ্য নয়। রাশিয়া দুর্বল দেশ নয়, বরং সে পৃথিবীর অন্যতম প্রধান শক্তিশালী দেশ। তার সীমানার রেখার উপর কোন বিদেশী শক্তি এসে ঘাটি স্থাপন করবে, এটা কোন শক্তিমান দেশই নীরবে সহ্য করতে পারেনা। যারা আজ রাশিয়াকে সব নষ্টের মূল বলে প্রমাণ করতে চাচ্ছে, তাদের নিজেদের কর্যাকলাপ আদৌ পরিচ্ছন্ন এবং সমর্থনযোগ্য নয়। একমাত্র ভারত ছাড়া অন্য কেউ ত দ্বিধাহীন কণ্ঠে রাশিয়ার স্বার্থের দিকটা তুলে ধরছেন না। দুর্ভাগ্যক্রমে আমাদের দেশের বিরোধী দলভুক্ত কোন কোন নেতা এতে ভারতের তরফে নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গী ভঙ্গ করা হচ্ছে বলে অভিযোগ তুলেছেন। অবশ্য তাদের সম্বন্ধে যদি কেউ উক্তি করে যে তারা আমেরিকার চশমা চোখে দিয়ে এই সমস্যার বিচার করছেন, তবে তারা কি বলবেন জানিনা। এরা কি ভেবে কি কথা বলেন, তাও অনেক সময় বুঝতে কষ্ট হয়। সাম্প্রতিক কালে, মিঃ ব্রেজনেভের সফরের অব্যবহিত পূর্ব্বেই এই দেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী রাশিয়া সম্বন্ধে যে বিবৃতি দিয়েছেন, সেটা শুধু অবিমৃষ্যকারিতারই পরিচায়ক। এই সব সমালোচক চীন, ভিয়েৎনাম, কামপুচিয়ার ব্যাপারে, যে সব ভূমিকা পালন করেছেন, সেখানে তাদের কণ্ঠস্বর এত ক্ষীণ কেন? নিছক বুদ্ধিমত্তার অভাব, না ইন্দিরা বিদ্বেষ? অথবা দুই-ই।

যাহক, যদি কেউ ভেবে থাকেন যে ভারতের বন্ধুত্ব বজায় রাখার জন্য ভারতের নির্দ্দেশ রাশিয়া মেনে নেবে, তবে তারা মূর্খের স্বর্গে বাস করছেন। যারা মত প্রকাশ করছেন যে অন্যান্য ক্ষেত্রে রাশিয়া যে সহযোগিতার হস্ত প্রসারিত করেছে, সেটা নাকি করেছে আফগানিস্থানের ব্যাপারে তাদের কার্যকলাপের সমর্থন আদায় করতে, তাদের হস্তী মূর্খ ভিন্ন অন্য কিছুই বলা যায় না। আবার যারা মনে করেন যে ভারতের নীতি সমর্থন না করলে, বন্ধুত্ব ক্ষুন্ন করাই উচিৎ। তাদের সম্বন্ধে ঐ একই বিশেষণ প্রযোজ্য। রাশিয়ার বক্তব্য আগ্রাসী মনোভাবের পরিচায়ক, একথা মনে করাও ভুল হবে। তাদের বক্তব্যের যৌক্তিকতা একদম উড়িয়েও দেওয়া যায় না। সাংবিধিক অর্থে নীতির দোহাই তুলে ধরাটা বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক নয়। পাকিস্তান যখন আমাদের দেশ আক্রমণ করল, লক্ষ কোটি মানুষ যখন ওপার বাংলা থেকে আমাদের

মাথার উপর পর্বত প্রমাণ বোঝা চাপিয়ে দিল, তখন আবেদন করা সত্ত্বেও, একমাত্র রাশিয়া ব্যতীত কেউ সাহায্য করতে এগিয়ে আসেনি। বিশ্ব বিবেকের পরিচয় আমাদের ক্ষেত্রে ও অন্যান্য ক্ষেত্রেও অদ্যো প্রশংসনীয় নয়। সুতরাং যেটা হয়েছে, সেটা নিঃসন্দেহে অভিনন্দন যোগ্য। সর্বোপরি পাওয়া এবং না—পাওয়ার, ঐক্যমত ও ভিন্নমতের পরিমাণ তুলাদণ্ডে যদি তৌল করা যায়, তবে নিশ্চিত ভাবেই দেখা যাবে পাওয়া এবং ঐক্যমতের পাল্লাটা অনেক ভারী। শ্রীমতী গান্ধীর কূটনৈতিক প্রতিভা, স্বমতে প্রতিষ্ঠিত থেকে বহু ক্ষেত্রে ঐক্যমত স্থাপন করার ক্ষমতা, সর্বোপরি শুধু ভারতের নয়, বিশ্বপরিস্থিতির উন্নতিকল্পে রাশিয়ার সমর্থন আদায় করা বিশিষ্ট দক্ষতার পরিচায়ক। সাধুবাদ অবশ্যই প্রাপ্য দুই দেশের নেতৃদ্বয়েরই যারা কোন মতান্তরকে মনান্তরে পরিণত হতে দেন নি। আমরা ভারত ও রাশিয়ার মৈত্রীর জয়ধ্বনি করি।

পুস্তক সমালোচনা

নেতাজীর সিক্রেট সার্ভিস—ডাঃ পবিত্র মোহন রায়। মূল্য—দশ টাকা।

সম্পাদনা—দেবাশিস বন্দোপাধ্যায়, প্রকাশক—সীমা ঘোষ, ৭বি, সুরেশ সরকার রোড, কলিকাতা-১৪

এই বইখানি গতানুগতিক কোন ইতিহাস নয়। অথচ ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামে একটি বিশেষ গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়ের নিখুঁত বর্ণনা। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে আজাদ হিন্দ ফৌজের অবদানের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস আজো দেশের মানুষের অজানা। দ্বিতীয় বিশ্ব-মহাযুদ্ধের সময় মধ্য পূর্ব্ব এশিয়ায় যে দুটার স্বাধীনতা আন্দোলন গড়ে উঠেছিল, শ্রদ্ধেয় রাসবিহারী বসু মহাশয় ও নেতাজী সুভাষচন্দ্রের নেতৃত্বে, ভারতে সেই আন্দোলনের বিস্তৃতি ও প্রসার লাভ ঘটাবার জন্য যে কয়েকটি যুবক, স্ত্রী পুত্র, সম্পদ ত্যাগ করে, মরণকে নিজেদের হাতের মুঠোয় করে, ডুবো-জাহাজে এসে ভারতে উপস্থিত হন এবং কি ভাবে তাদের উপর ন্যস্ত দায়িত্বপালন করতে গিয়ে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হন, বইখানিতে তারই কাহিনী লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে তথাকথিত কয়েকজন প্রদেশীওয়ালাদের অপকীর্তির কথাও বলা হয়েছে। তবে লেখকের বৈশিষ্ট্য এই যে যারা তাদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করে তাদের ফাঁসি কাঠে ঝুলিয়ে দেওয়ার সহায়তা করেছিল, তাদের সম্বন্ধে তাঁর ভাষা অত্যন্ত সংযত এবং ভদ্র। মনে হয় তিনি আরো অনেকের কুকীর্তির কথা বলতে পারতেন। কিন্তু তিনি নর্দমা ঘাটাঘাটি করতে চাননি। এ দৃষ্টি ভঙ্গী নিঃসংশয়ে প্রশংসার্হ।

বই খানিতে এমন চাঞ্চল্যকর ঘটনাবলী নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে যে পড়তে আরম্ভ করলে, এক নিঃশ্বাসে শেষ করার আগ্রহ জাগিয়ে দেয়। এমন রোমাঞ্চকর ঘটনাবলীর নায়ক যে নিজেকে আড়ালে রেখে এমন বস্তুগত ভাবে সব ঘটনা ব্যাক্ত করেছেন, সে কাজ অত্যন্ত কঠিন। সম্ভবতঃ প্রথম জীবনে বিপ্লব মন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণ ও পরবর্তীকালে নেতাজীর অলৌকিক নেতৃত্ব তাকে একটি খাঁটি মানুষ রূপে গড়ে তুলতে সাহায্য করেছিল। বিপ্লবীরা সাধারণতঃ অস্ত্রধারণ করতেই সমর্থ, কিন্তু পবিত্রবাবু যে ভাবে লেখনী ধারণ করেছেন, সেটা রীতিমত বিস্ময়কর। আমরা তার থেকে আরো ইতিহাস রচনা প্রত্যাশা করি। বইখানির প্রচ্ছদপট উচ্চ-মানের, ছাপাও ভাল। যে প্রকাশক এই ধরনের বই ছাপাতে অগ্রসর হয়েছেন, লাভালাভের হিসাব না করে, তিনিও ধন্যবাদার্হ।

পোলাণ্ডের গণবিক্ষোভ

—কালীপদ সরকার

বেশ কিছু দিন ধরে পোল্যাণ্ডে গণ বিক্ষোভ চলছে। বিক্ষোভের নেতৃত্ব দিচ্ছেন শ্রমিক দল। ক্ষমতাসীন সরকার এবং শ্রমিক দল উভয়ই কমিউনিষ্ট। আন্দোলন অর্থনৈতিক দাবি নিয়ে শুরু হলেও তা যে রাজনৈতিক মোড় নিয়েছে সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নেই। নতুবা পোল্যাণ্ডের সীমানা বরাবর রাশিয়া বিপুল সেনা সমাবেশ করবে ন এবং সোভিয়েত প্রেসিডেন্ট ব্রেজনেভই বা শবেন, কমিউনিজমকে বাঁচাবার জন্য প্রয়োজন ণ্ডে ওয়ারশ জোটের সেনা পাঠানো হবে। টের সৈন্য বাহিনী রুশবাহিনীরই অন্ত- বৈচালনাধীন।

কবল অর্থনৈতিক হলে পোল্যাণ্ডের তার একটা ফয়সালা করা সম্ভব আন্দোলনকারীদের শ্লোগান হল, 'we bread and freedom' সেখানেই সমস্যা এবং সে সমস্যা সমাধানের শক্তি পোল-সরকারের আছে বলে মনে হয় না। যদিও কমিউনিষ্ট পোল-সরকার আন্দোলনকারীদের দাবীর যুক্তিযুক্ততা অস্বীকার করতে পারছেন না।

কেবল পোল্যাণ্ড নয়, পূর্ব ইউরোপের সব কটি কমিউনিষ্ট রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ অবস্থা একই ধরণের এবং সর্বত্রই স্বাতন্ত্র্যলাভের ইচ্ছা বর্তমান। মার্কিণ প্রেসিডেন্ট কার্টার হুমকি দিয়েছেন যে, পোল্যাণ্ডের নিজস্ব ব্যাপারে অন্যের হস্তক্ষেপ অযৌক্তিক। তবে তাঁর যুক্তিবাদ কে আর মানছে। হাঙ্গেরী ও চেকোস্লোভিকিয়ার দৃষ্টান্ত এত শীঘ্র ভুলবার নয়।

পূর্ব ইউরোপের কমিউনিষ্ট রাষ্ট্রগুলি কৃত্রিম উপগ্রহ ছাড়া আর কিছু নয়, নির্দিষ্ট কক্ষপথে গ্রহের পাশে থেকে আবর্তন করা হল তাদের কাজ। হাঙ্গারী ও চেকোস্লোভিকিয়া কক্ষপথ পরিবর্তনের চেষ্টা করে যে বিপদ ডেকে এনেছিল, পোল্যাণ্ড নিশ্চয়ই সে ভুল করবে না। তাই পোল্যাণ্ডে কমিউনিষ্টদের আশংকার কারণ নেই মনে করলে অন্যায় করা হবে।

১৯৪৩ খৃষ্টাব্দ অর্থাৎ স্তালিনের মৃত্যুকাল পর্যন্ত পূর্ব ইউরোপ রুশ কমিউনিষ্ট পার্টি এবং রুশ রেড আর্মির প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণে ছিল। ১৯৫৫ খৃষ্টাব্দে কিছুটা যে সামাল পূর্ব ইউরোপের কমিউনিষ্ট দেশগুলিকে ভালমত করায়ত্ত করার জন্য মিঃ ক্রুশ্চভ মৈত্রী, সহযোগিতা এবং পারস্পরিক সাহায্যের চুক্তি-বন্ধনে তাদের আবদ্ধ করেন। এই চুক্তি ওয়ারশ জোট নামে খ্যাত এবং পশ্চিমী শক্তি বর্গের ন্যাটো সামরিক জোটের পাল্টা ব্যবস্থা।

ওয়ারশ চুক্তি পূর্ব ইউরোপে রুশ বাহিনীর অবস্থানকে বৈধ ও স্থায়ী করল। ওয়ারশ পোল্যাণ্ডের রাজধানী এবং কমিউনিষ্ট জোটের কেন্দ্র, তাই সোভিয়েত রাশিয়ার পক্ষে পোল্যাণ্ডের ইচ্ছিউতি কোনমতে বরদাস্ত করা সম্ভব নয়। তাছাড়া, রাশিয়ার সহিত যারাই একবার মৈত্রীচুক্তি সম্পাদন করে তাদের পক্ষে চুক্তি থেকে বেরিয়ে আসা খুবই কঠিন।

ওয়ারস্ সামরিক জোট ছাড়া, পূর্ব-ইউরোপের কমিউনিষ্ট রাষ্ট্রগুলির অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ উদ্দেশ্যে গঠিত হয়েছে কমিশন সংস্থা। একেও

পশ্চিমী রাষ্ট্রগুলির দ্বারা গঠিত ইউরোপীয় কমন মার্কেটের পালটা ব্যবস্থা বলা যায়॥

দুই প্রতিদ্বন্দ্বী শক্তি শিবিরের জোটগুলি পূর্ব ও পশ্চিম ইউরোপের চিরন্তন স্বাভাবিক শিল্প-বাণিজ্যের সম্পর্ককে ব্যাহত করেছে এবং তাতে বেশিভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে পূর্ব-ইউরোপ। সোভিয়েত রাশিয়া নির্ভর অর্থনীতি ক্রমেই পূর্ব-ইউরোপের কমিউনিষ্ট রাষ্ট্রগুলির নিকট কিছুটা অবাঞ্ছিত ও উন্নতির পরিপন্থী বলে বিবেচিত হচ্ছে। পশ্চিম ইউরোপের প্রাচুর্য এবং খোলা বাজার তাদের অনেককেই হাতছানি দিচ্ছে।

পোল্যাণ্ডের গুরুতর মুদ্রাস্ফীতি, ভোগ্য পণ্যের মূল্যবৃদ্ধি এবং দুষ্প্রাপ্য তা কমিউনিষ্ট আর্থিক ব্যবস্থার উপর পোলদের অনাস্থা সৃষ্টি করেছে। সাম্প্রতিক বিক্ষোভের অন্যতম প্রধান কারণও তাই।

কমিউনিষ্ট দেশগুলির উৎপাদন ও জীবনমান অ-কমিউনিষ্ট পশ্চিম-ইউরোপের তুলনায় নিম্নমুখী হওয়ায়, দীর্ঘদিন ধরে কমিউনিষ্ট প্রচার যন্ত্র যে আশার বাণী শুনিয়ে এসেছে তা এখন নিষ্প্রভ হয়ে গিয়েছে। পোল্যাণ্ডের ন্যায় মধ্যবর্তী দেশ যারা পশ্চিম ইউরোপের মুক্ত সামাজিক অবস্থার সঙ্গে সম্পূর্ণ অপরিচিত নয়, সেখানেই কমিউনিষ্ট অর্থ-নীতির মূল্যায়ণ নতুন করে শুরু হয়েছে।

শ্রেণীহীন সমাজবিপ্লবের যে চিত্ত উন্মাদকর ভাবনা একদিন কমিউনিষ্ট আন্দোলনের পিছনে প্রেরণা জুগিয়েছিল, কমিউনিষ্ট রাষ্ট্রগুলির গতি ও প্রকৃতি এবং পরিমাণের ভিত্তিতে পারিশ্রমিকের উঁচু নীচু পার্থক্য স্বীকারের ফলে, কমিউনিষ্ট রাষ্ট্রে আর্থিক অসাম্য দূর করা সম্ভব হয় নি। বরং নতুন সুবিধাভোগী শ্রেণীর সৃষ্টি হয়েছে। তাই সেখানে এখনো ট্রেনে শ্রেণীবিভাগ এবং সাদা ও কালো রুটির প্রচলন অব্যাহত। তাছাড়া, সব রাষ্ট্রেই গড়ে উঠেছে এক শক্তিশালী প্রশাসনিক গোষ্ঠীতন্ত্র।

মোহভঙ্গ কবে হবে সে কথা কেউ এখনি বলতে পারে না, তবে পোল্যাণ্ডের শ্রমিক আন্দোলনে তার আভাস সুস্পষ্ট।

তিন কোটি চল্লিশ লক্ষ নরনারীর বাসভূমি, কৃষি, বন ও খনিজ সমৃদ্ধ পোল্যাণ্ড এক ভাগ্যবিড়ম্বিত দেশ। সতের থেকে বিশ শতাব্দীর মধ্যে পোল্যাণ্ডের উপর দিয়ে অনেক ঝড় বয়ে গিয়েছে। রাশিয়া, জার্মানী এবং অষ্ট্রিয়ার রণদুর্মদ শাসকরা বার বার পোল্যাণ্ডকে জয় করে, নিজেদের মধ্যে ভাগ বাটোয়ারা করে নিয়েছে। পোল্যাণ্ড ইউ-রোপের মানচিত্র থেকে অবলুপ্ত হয়ে গিয়েছে। পোলদের ওরা সম্পূর্ণরূপে জাতিহীন করে আত্মসাৎ করার চেষ্টাও করেছে কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় পোল্যাণ্ড মরেনি, মরেনি তার ঐতিহ্য, ভাষা, সংস্কৃতি এবং ক্যাথলিক খ্রীষ্টধর্ম। পুরাণ বর্ণিত ফিনিক্স পাখির মত ধ্বংসস্তূপের মধ্য থেকে পোল্যাণ্ড আবার বেঁচে উঠেছে।

পোলদের মুক্তি-সংগ্রাম বিশ্ব ইতিহাসের স্বর্ণময় অধ্যায় এবং সে অধ্যায়ে বিপ্লবী নায়ক পিলসুইডস্কি চির ভাস্বর হয়ে আছেন। তাঁরই সংগ্রামের ফলে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শেষে পোল্যাণ্ড স্বাধীন রাষ্ট্রের মর্যাদা লাভ করে।

পোলদের ধর্মযাজক কার্ডিনাল ভিসিনস্কিকে দীর্ঘকাল জেলে পুরে রেখেও স্তালিন অবস্থার পরিবর্তন ঘটাতে ব্যর্থ হন। বর্তমান আন্দোলনে ক্যাথলিক যাজকরাও যোগ দিয়েছেন। স্তালিনের নির্দেশে পোল্যাণ্ডের কমিউনিষ্ট নেতা গোমুলকাও কারারুদ্ধ হয়েছিলেন। স্তালিনের মৃত্যুর পর তিনি

কারামুক্ত হন এবং পোল্যাণ্ডের কমিউনিষ্ট দলনেতা-রূপে কার্যভার গ্রহণ করেন।

১৯৫৬ খৃষ্টাব্দে গোমুলকা পোল্যাণ্ডে যে শাসন-সংস্কার প্রবর্তন করেন তার মধ্যে ছিল, যৌথ-খামার তুলে দিয়ে কৃষকদের হাতে ভূমি প্রত্যার্পণ, যাজকদের অবাধ ধর্মানুশীলন এবং স্বাধীন চিন্তা ও মত প্রকাশের অধিকার। শিল্পোন্নয়নের উদ্দেশ্যে গোমুলকা পোল্যাণ্ডে যৌথ উদ্যোগে শিল্প স্থাপনের জন্য পশ্চিম জার্মানীর বিখ্যাত কুরুপ কোম্পানিকে আমন্ত্রণ জানান। গোমুলকার শাসনব্যবস্থায় উদবিগ্ন হয়ে সোভিয়েত প্রেসিডেন্ট ক্রুশ্চভকে পোল্যাণ্ডে আসতে হয়, তবে শেষে গোমুলকার সহিত আপস করে ক্রুশ্চভ অবস্থা আয়ত্তে রাখেন।

অবশ্য সে যুগে বিশ্ব কমিউনিষ্ট আন্দোলন বর্তমানের মত ত্রিধা বিভক্ত হয়নি এবং মার্কসবাদের নানা শোধনমূলক ব্যাখ্যাও প্রকট ছিল না। গোমুলকার পোল্যাণ্ড সোভিয়েত রুশের সহিত সংঘাত এড়িয়ে আত্মরক্ষা করে বেঁচে আছে আজও।

ইতিমধ্যে ভিস্চুলা নদী বহে অনেক জল বল্টিক সাগরে গড়িয়ে গিয়েছে। পূর্ব ইউরোপ পশ্চিমের নিকটতর হয়েছে এবং ইউরোপবাসী বিভেদ প্রাচীর তুলে দেবার জন্য নানাভাবে মত প্রকাশ করেছে কিন্তু যবনিকা উন্মুক্ত হয়নি। তবে হেলিসিংকির পূর্ব-পশ্চিম সম্মেলনকে প্রথম বরফ-গলা বলা চলে। যিশুর করুণা আশীর্বাদময় ভবিষ্যতের দিকে চেয়ে পোলরা সুদিনের প্রতীক্ষা করে আছে, আর গেয়ে চলেছে তাদের প্রিয় গানটা—'Jeszeze Polska Nie Zginela, Kiedy my Zyjemy....' [পোল্যাণ্ড, তুমি মৃত্যুহীন, যতকাল আমরা রব বেঁচে....]

●

অনুশীলন সতীর্থ বার্ষিক প্রীতি সম্মেলন—১৯৮১

স্থান :—মহারাজ ত্রৈলোক্য চক্রবর্ত্তী ও শহীদ যতীন দাস

স্মৃতি সমিতি প্রাঙ্গন

৪৭, চণ্ডীতলা লেন, টালিগঞ্জ, কলিকাতা-৪০

প্রিয় সতীর্থ,

অনুশীলন সমিতি সতীর্থগণের বার্ষিক প্রীতি সম্মেলন এবার ১১ই জানুয়ারী, ১৯৮১, রবিবার, উপরোক্ত স্থানে (টালিগঞ্জ ট্রাম ডিপোর অনতিদূরে, চালিহা রোলিং মিল ষ্টপে) সারাদিনব্যাপী অনুষ্ঠিত হইবে।

অনুষ্ঠানে আপনার যোগদান ও সর্ব্বতোভাবে সহযোগিতা প্রার্থনা করি।

ইতি—৭-১২-৮০

বিনীত—

পূর্ণানন্দ দাশগুপ্ত

শচীন্দ্রনাথ গুহঠাকুরতা

ভারত বিপ্লব আন্দোলনের ইতিহাস

॥ ক্ষীরোদ দত্ত ॥

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

বাংলাদেশের বৈপ্লবিক নেতৃবৃন্দ পুলিশের কাছে সুপরিচিত। দু-একটি ঘটনা ঘটলেই তাদের গ্রেপ্তার করে ফেলার সম্ভাবনা ছিল। এই জন্যই বাঙলা এবং বাঙলার বাইরের সম্পর্কের সতন্ত্র ব্যবস্থা নিতে হয়েছিল। বাঙলা সম্পর্কে স্থির করা হয়েছিল যে এখানে প্রস্তুতি পর্ব সম্পূর্ণ হওয়ার আগে কোনরূপ Action হবে না। তাই বাঙলাদেশে একবারেই বড় রকম আঘাত আনার জন্য প্রস্তুতি চলছিল।

কিন্তু সকল বিপ্লবী দল অনুশীলন সমিতির এই নীতি মেনে নেননি। অনুশীলন সমিতির ন্যায় সর্ব-ভারতীয় সংগঠন অন্য কারও ছিলনা এবং তাদের বৈপ্লবিক দৃষ্টিভঙ্গিও ছিল স্বতন্ত্র। গান্ধী আন্দোলন হঠাৎ স্তব্ধ হয়ে যাওয়াতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলের তরুণ কর্মী দল কোন প্রকার স্বশস্ত্র Action-এর জন্য উৎকণ্ঠিত হয়ে উঠলেন। তারা দীর্ঘ কর্মসূচীর জন্য অপেক্ষা করতে সম্মত ছিলেন না। প্রথম Action-এ নামলেন মধ্য কলকাতার বিপিন বিহারী গাঙ্গুলীর দলের বিশিষ্ট তরুণ কর্মী সন্তোষকুমার মিত্র এবং তাঁর কয়েকজন সঙ্গী। বাইরে থেকে রিভলবার প্রভৃতি আমদানির জন্য অপেক্ষা করতেও প্রস্তুত ছিলেন না। তাই আরম্ভ হল যা কিছু অস্ত্রশস্ত্র আছে তা নিয়ে ডাকাতি এবং বোমা তৈরীর প্রচেষ্টা।

১৯২৩ খৃষ্টাব্দে জুলাই মাসে যোগেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় অনুশীলন নেতৃবৃন্দের নির্দেশে বিপ্লবী সংগঠন সম্প্রসারনের উদ্দেশ্যে যখন যুক্ত প্রদেশে যান তারই সমসাময়িক কালের এ ঘটনা ১৯২৩ সালের ৩রা আগষ্ট। সন্তোষ মিত্রের সহকর্মী বরেন্দ্র ঘোষ এবং অপর তিনটি যুবক মধ্য কলকাতার শাখারীটোলা ডাকঘরে প্রবেশ করলেন। বিপ্লবীরা পোষ্টমাষ্টার অমৃতলাল রায়ের নিকট ডাকঘরে যা কিছু অর্থ আছে চাইলেন পোষ্টমাষ্টার একটু ইতস্ততঃ করছিলেন বিপ্লবীরা গুলি করে তাকে হত্যা করলেন। হত্যার পরেই বিপ্লবীরা পালিয়ে যান কিন্তু কেরানী শ্যাম-দুলাল দাস এবং হরিচরণ দাস তাদের পিছন পিছন এসে সেন্টজেমস স্কোয়ারের মধ্যে বরেন্দ্র ঘোষকে ধরে ফেললেন। বরেনের হাতে তখনও পিস্তল ছিল। বরেন ১৮১নং হ্যারিসন রোডে থাকতেন। সেখানে তল্লাসী করে আরও দুটি রিভলবার পাওয়া যায়। বিচারে বরেন্দ্রের প্রাণদণ্ডের আদেশ হয় কিন্তু শেষ পর্যন্ত প্রাণদণ্ড রহিত হয়ে দ্বীপান্তর দণ্ড হয়। শাখারী টোলার এই ঘটনার কয়েকদিনের মধ্যেই সন্তোষ মিত্র, সুবোধ লাহিড়ী, ধীরেন রায় প্রভৃতি আটজন বিপ্লবীকে গ্রেপ্তার করে অভিযুক্ত করা হয়। ষড়যন্ত্র মামলা নামে খ্যাত। কয়েকমাস ধরে বিচার চলে কিন্তু জুরীরা তাদের নির্দোষ বলায় বিচারক তাদের বেকসুর মুক্তি দিতে বাধ্য হন। কিন্তু সরকার পক্ষ নীরব ছিলেন না। তারা এই সকল ঘটনার সুযোগ নিয়েই ১৯২৪ সালের ২৫শে সেপ্টেম্বর বিশিষ্ট বিপ্লবী ডাক্তার যাদুগোপাল মুখার্জী, উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যো-পাধ্যায়, অমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, অধ্যাপক জ্যোতিষ চন্দ্র ঘোষ মনোমোহন ভট্টাচার্য্য, প্রতুল চন্দ্র গাঙ্গুলী, রবীন্দ্র মোহন সেন, মনোরঞ্জন গুপ্ত, ভূপেন্দ্র কুমার দত্ত, বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী, ভূপতি মজুমদার প্রভৃতি সতের জনকে গ্রেপ্তার করে ১৮১৮ সালের তিন আইনে গ্রেপ্তার করে। অনুশীলন নেতৃবৃন্দ ঠিকই বুঝেছিলেন এবারে পরিস্কার বোঝা গেল সরকার এই সুযোগেরই সন্ধান করছিলেন।

কিন্তু পরিচিত বিপ্লবীদের এই গ্রেপ্তারের পরেও

বিপ্লবী কার্য্যকলাপ বন্ধ হল না। সাম্রাজ্যবাদী সরকারের এই চ্যালেঞ্জের প্রতিবাদে তরুণ বিপ্লবী কর্মীদল তাদের কার্যকলাপ চালিয়ে যেতে লাগল। ১৯২৩ সালের ডিসেম্বর মাসে চট্টোগ্রামের আসাম বেঙ্গল রেলওয়ের সতের হাজার টাকা লুণ্ঠিত হয়। এই ঘটনায় চট্টগ্রাম দলের অনন্ত সিংহের সঙ্গে সন্তোষ মিত্রের সহকর্মী দেবেন সে অংশগ্রহণ করেছিলেন। এই দুঃসাহসিক কার্য্য দিনের বেলা অনুষ্ঠিত হয়। ডাকাতির পরে বিপ্লবীরা নিকটবর্ত্তী একগ্রামে এক গৃহে আশ্রয় নিয়েছিলেন। পুলিশ ঘটনার কয়েকদিন পরে ঐ গৃহ তল্লাসী করে কিছু অস্ত্রশস্ত্র উদ্ধার করে। ঐ সময় বিপ্লবীদের সঙ্গে পুলিশের গুলি বিনিময় হয়। দুজন বিপ্লবী গ্রেপ্তার হন। এর দুদিন পরে পুলিশের জনৈক দারগা এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করতে গেলে তাকে গুলি করে হত্যা করা হয়।

একবারের ঘটনা ঘটে ১৯২৪ সালের ১৮ই জানুয়ারী মেসার্স কিলবার্ণ কোম্পানীর জনৈক শ্বেতাঙ্গ কর্মচারী মিষ্টার ডে সকাল দশটার সময় চৌরঙ্গী রোড ধরে যাচ্ছিলেন। গোপীনাথ সাহা নামে জনৈক বিপ্লবী যুবক তাকে পুলিশ কমিশনার টেগার্ট মনে করে হত্যা করেন। বিপ্লবী দমন কার্য্যে মিষ্টার টেগার্ট কুখ্যাত হয়েছিলেন। জনৈক ট্যাক্সী চালক গোপীনাথকে অনুসরণ করবার চেষ্টা করে গোপীনাথ তাকে লক্ষ্য করেও গুলি চালায়। গুলী ট্যাক্সী চালকের তলপেটে বিদ্ধ হয়। গোপীনাথ এর পরে জনৈক মোটর চালককে তাকে নিয়ে ওয়েলিসলী ষ্ট্রিট ধরে তাকে যেতে বলেন। মোটর চালক সম্মত না হওয়াতে তিনি তাকেও গুলিবিদ্ধ করেন। মিষ্টার অগ নামে জনৈক শ্বেতাঙ্গ গোপীনাথকে ধরে ফেলে।

(ক্রমশঃ)

যুগান্তর বিপ্লবী সম্মেলনী

ষোড়শ প্রীতি সম্মেলন, ১৩৮৭ (ইং ১৯৮০)

সবিনয় নিবেদন,

আগামী ১৩ই পৌষ ১৩৮৭ (২৮শে ডিসেম্বর '৮০) রবিবার চেতলা বয়েজ হাই স্কুল প্রাঙ্গণে এবার প্রীতি সম্মেলনের আয়োজন করা হয়েছে। সকাল ৮টায় শুরু এবং বিকাল ৪টায় সমাপ্তি।

সকাল ৯টায় পতাকা উত্তোলন ও শহীদ বেদীতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ। অনুষ্ঠানে আপনার উপস্থিতি ও সক্রিয় সহযোগিতা একান্ত ভাবে কামনা করি। শুভেচ্ছান্তে—

প্রবোধ সেন

অমরনাথ চক্রবর্ত্তী,
যুগ্ম-সম্পাদক

সতীভূষণ সেন
সরোজ কাহালী
শশধর চৌধুরী

১লা ডিসেম্বর ১৯৮০

আপনার বাড়ীর ছেলেমেয়েরা কি স্কুলে যায় ?

সংসারের টানাপোড়েনের মধ্যে ছেলেমেয়ের স্কুলের টাকা জোগাড় করার সমস্যাতেও তো আপনি চিন্তিত ছিলেন। এখন দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত আপনি অন্তত নিশ্চিন্ত। টানাপোড়েন সরকারেরও। টাকা নেই সামর্থ্য সীমিত। তার মধ্যে দাঁড়িয়েও দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত লেখাপড়া অবৈতনিক করা হয়েছে। এই কারনেই যাতে অল্প বিত্তবান পরিবারের অসংখ্য ছেলেমেয়ে শিক্ষা থেকে বঞ্চিত না হোন। আমরা এটিও নজর রাখছি যাতে শিক্ষকরা মাস পয়লায় মাইনে পাওয়ার ক্ষেত্রে খানিকটা নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন। সমস্যা এখনও আছে অনেক। তবু আমরা চাই শিক্ষার আঙিনায় জনসাধারণের প্রবেশ।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

তথ্য ও সংস্কৃতি—১৯২৯৮/৮০

প্রশাসন উৎখাতের পথে

—বংশীধর বন্দ্যোপাধ্যায়

বিগত নির্বাচনের ফলাফলের ওপর সজাগ দৃষ্টি রাখলে পরিষ্কার বুঝা যায় যে, পূর্বের তুলনায় বর্তমানে ভারতের বিভিন্ন অঙ্গ রাজ্যে কমিউনিষ্টরা উত্তরোত্তর শক্তি বৃদ্ধি করতে সক্ষম হচ্ছে। এই শক্তি বৃদ্ধির মূলে প্রধান কারণ হচ্ছে—ভারতীয় জনগণের এক দিকে জাতী চেতনার অভাব ও অন্যদিকে সীমাহীন দারিদ্র। তা ছাড়া বিভিন্ন জাতীয়তাবাদী রাজনৈতিক দলগুলি পরস্পর হতে বিচ্ছিন্ন বা পরস্পর বিরোধী অতি তুচ্ছ কারণে। উপরন্তু জাতীয়তাবাদী রাজনৈতিক শক্তিগুলি একে অপরের প্রতিদ্বন্দ্বী ব্যক্তি স্বার্থে বা দলস্বার্থে কোথাও বা উচ্চাকাঙ্খা পূরণের তাগিদে বা প্রতিটি জাতীয়তাবাদীদলকে কমিউনিষ্টদের সঙ্গে সংগ্রামের ক্ষেত্রে দুর্বল করে দিচ্ছে পদে পদে। তবুও তাদের হুস নেই, তাই তারা আত্মকলহে মত্ত, কারণে-অকারণে। ভারতের বেশীর ভাগ জাতীয়তাবাদী দলই দ্বিধা ও দ্বিধা বিভক্ত, ফলে কমিউনিষ্টরা এদেশের দরিদ্র মানুষের দারিদ্রের সুযোগ নিয়ে নিরক্ষর মানুষের নিরক্ষরতার সুযোগ নিয়ে, বেকারদের বেকারীর সুযোগ দিকে দিকে মিথ্যা ও অভিসন্ধিমূলক প্রচারের মাধ্যমে ভারতীয় জনতাকে বিভ্রান্ত করে বিপথগামী করতে সাহসী হচ্ছে।

কমিউনিষ্টদের সাফল্যের মূলে আছে অতিরঞ্জিত মিথ্যা প্রচার একদিকে এবং অপর দিকে জাতীয়তাবাদী শক্তিগুলির নিষ্ক্রীয়তা ও পরস্পর বিরুদ্ধতা। এছাড়া কমিউনিষ্ট দলগুলির সংগঠন মজবুত ও কঠোর নিয়মনিষ্ঠ। ওদের কর্মীরা সদা জাগ্রত প্রহরীর ন্যায় পার্টির স্বার্থেই সর্বদা কর্মচঞ্চল ও শৃঙ্খলাপরায়ণ। কমিউনিষ্ট ক্যাডাররা, যতই মত ভেদ হোক না কেন, কেউ কারো বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে কোন বিবৃতি দেয় না বা একে অপরের কুৎসা প্রচার করে না। এটা একটা মস্ত গুণ ওদের, যা সর্ব দলের সকল কর্মীর পক্ষে অবশ্য অনুকরণীয়। কমিউনিষ্ট নেতৃত্বের মধ্যেও মত পার্থক্য থাকে বহু বিষয়ে অনেক সময়ে, তবুও তাদের সেই গোপন কথাটা বা মত পার্থক্যের ব্যাপারটা সাধারণ মানুষ বা ওদের বিরোধীরা কোন সময়েই কোন ভাবেই জানবার সুযোগ পায় না।

সংগঠন সুপরিচালনার ব্যাপারে ওরা খুবই সুশৃঙ্খল ও বিরোধীশক্তিগুলির সম্বন্ধে সদা সচেতন। ওদের উক্ত সদ্‌গুণ গুলি সবই সুষ্ঠু সংগঠনী শক্তির পরিচায়ক, যা প্রশংসার দাবী রাখে। সে কারণেই কমিউনিষ্ট বিরোধীদের সুসংবদ্ধ ও সুসংহত হতে হবে, যদি তারা সাফল্য অর্জন করতে চায়। জাতীয়তাবাদী দলের সংগঠনকে শৃঙ্খলাপরায়ণ, নিয়মনিষ্ঠ ও প্রচারদক্ষ হতে হবে যদি সে দল কমিউনিষ্টদের সঙ্গে রাজনৈতিক দ্বন্দ্বে জয়ী হতে চায় জাতীয় স্বার্থে।

প্রচার যে কোন রাজনৈতিক দলের প্রধান ও সর্বশ্রেষ্ঠ হাতিয়ার, অথচ প্রচারের ক্ষেত্রে দেখা যায়, জাতীয়তাবাদী দল বা দল সমষ্টির তুলনায় কমিউনিষ্টরা অনেক বেশী সচেতন ও কর্মক্ষম এবং সে কারণেই তারা আজ সারা ভারতে ধীরে ধীরে শক্তি সঞ্চয়ের ব্যাপারে ক্রম বর্দ্ধনশীল। ওদের হাত থেকে রাজনৈতিক ক্ষমতা কেড়ে নিতে হলে যে কোন জাতীয়তাবাদী দলকে বেশ দৃঢ়তার সঙ্গে একতাবদ্ধ

হয়ে যুব ও ছাত্রশক্তি দিয়ে নিষ্ঠার সঙ্গে জনতার সম্মুখীন হতে হবে ও মানুষকে কমিউনিষ্ট রাজ যে জন কল্যাণকর নয়:মাত্র দলকল্যাণকর এই বিশুদ্ধ সত্য কথাটা ভালভাবে বোঝাতে হবে, আর কমিউনিষ্টরা যে ধ্বংসেরই কারণ জাতীয় উন্নয়নের নয়, সেই সত্যটা বেশ যুক্তিতর্ক দিয়ে ও ওদের রাজ্য শাসনের বাস্তব দৃষ্টান্ত দিয়ে, মানুষের চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিতে হবে যাতে জনগণ কমিউনিষ্টদের প্রকৃত বিভৎস স্বরূপটা দেখতে ও বুঝতে পারে। ওরা যে জনকল্যাণের ধুয়া ধরে কেবল ওদের দলের জন্য হীন চক্রান্ত কায়েম করে দলকে বাড়াতে চেষ্টা করে, সে কথাটা প্রকাশ্য প্রচার ও তার উদাহরণ হাতে নাতে মানুষের সামনে তুলে ধরে দেখাতে ও বোঝাতে হবে জাতীয় স্বার্থে। ব্যক্তি স্বার্থ বা দল স্বার্থ যে জাতীয় স্বার্থের পরিপন্থী তা পরিস্কার করে জনগণকে বুঝিয়ে দিয়ে কমিউনিষ্টদের মুখোস খুলে দিতে হবে। কে বা কারা একাজে অগ্রণীর ভূমিকা নেবে পশ্চিমবঙ্গে? যতদূর দেখা যায়, তাতে এ রাজ্যে সি, পি, এম দলের কুক্ষিগত বামফ্রন্ট সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করার শক্তি রাখে একমাত্র কংগ্রেস (ই) নামক জাতীয়তাবাদী দল, অবশ্য যদি ঐ দলের যুব ও ছাত্ররা দ্বিধা বা ত্রিধা বিভক্ত না হয়ে সবাই মিলে মিশে একযোগে প্রকৃতপক্ষে একতাবদ্ধ হয়ে সংগ্রামের পথে নামে, জাতীয় স্বার্থ সংরক্ষণের মহান ব্রত নিয়ে। এ রাজ্যের সর্ব্ব সাধারণ বর্তমান পরিস্থিতিতে নানান বিপর্য্যয়ের হাত থেকে নিস্তার পাবার আশায় কংগ্রেস (ই) দলের হাতে ক্ষমতা দেখতে চায়, কারণ তারা জানে যে শিক্ষা সংস্কারের নামে সি, পি, এম তথা বামফ্রন্ট সরকার যে দ্রুততার সাথে শিক্ষা সংহারের উন্মত্ত আবেগে অগ্রসরমান তার গতি রোধ করতে হলে কংগ্রেস (ই) দলই তা পারবে, পশ্চিমবঙ্গের অপামর জন সাধারণের সমর্থন ও সক্রীয় সহযোগিতার মাধ্যমে কংগ্রেস (ই) দলের ওপর কি শিক্ষিত, কি উচ্চ শিক্ষিত, কি স্বল্প শিক্ষিত সবাই নির্ভরশীল কারণ তারা সবাই বামফ্রন্টের পতন চায় এ রাজ্যে।

শিক্ষার প্রতিটি স্তরে যে দলীয় চণ্ডনীতি চালু করেছে সি, পি, এম বা বামফ্রন্ট তা কেউই আর একদিনও বরদাস্ত করতে রাজি নয়। শিক্ষা ও সাধারণ প্রশাসন এবং পুলিস প্রশাসন সি, পি, এম দলের দাপটে আজ যে দারুণভাবে বিপর্য্যস্ত তা জানতে ও বুঝতে কোন মানুষের আর বাকী নেই। সে কারণ পশ্চিমবঙ্গের বৃহত্তম জনসংখ্যা আজ অধীর আগ্রহে অপেক্ষামান একটা পরিবর্তন দেখতে—সেটা হচ্ছে বামফ্রন্টের পতন ও কংগ্রেস-(ই) দলের ক্ষমতা লাভ। বামফ্রন্টের পতন ছাড়া শিক্ষাক্ষেত্রে যে নৈরাজ্য ও নৈরাশ্য এবং হীনতার অনুপ্রবেশ ঘটেছে তার অবসান অসম্ভব। জ্ঞানবান বুদ্ধিমান ও স্থিতধি মানুষের ধারণা, এরূপ জাতীয় বিপর্য্যয়ের মুখে যখন পশ্চিমবঙ্গ দারুণ দুর্বিপাকে প্রায় নিমজ্জিত হ'তে বসেছে, তখন নিশ্চয় জাতীয়-স্বার্থে এ রাজ্যের কংগ্রেস (ই) দলের সকল কর্মী একযোগে একতাবদ্ধ হয়ে গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব ভুলে সি, পি, এম তথা বামফ্রন্টকে ক্ষমতাচ্যুত করার মহান প্রয়োজনে সংগ্রামের পথে শীঘ্রই সামিল হবে। অন্যান্য জাতীয়তাবাদীদল যেমন কংগ্রেস (আ) ইত্যাদি বা অন্যান্যেরাও কমিউনিষ্টদের ক্ষমতাচ্যুত করার মহান কাজে কংগ্রেস (ই) দলের পাশে দাঁড়াবে দৃঢ়তার সাথে ঐক্যবদ্ধ প্রতিজ্ঞা নিয়ে—এই প্রত্যাশা ও বিশ্বাস রাজ্যবাসী জাতীয়তাবাদী মানুষেরা নিশ্চয় করে।

কমিউনিষ্ট শাসন যে স্বৈরতন্ত্রী শাসন এ কথা

এ রাজ্যের সবাই একবাক্যে স্বীকার করে। কমিউনিষ্টরা দলই বোঝে, মানুষের কল্যাণ তাদের কাছে মূল্যহীন, তাই তারা দলের জন্য সব রকম অন্যায় কাজ যে-পরোয়া ভাবে করে চলেছে এ রাজ্যে। রাজ্যবাসীরা ঐ সি, পি, এম দলের দৌরাত্ম্যে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে বিগত প্রায় সাড়ে তিন বছর ধরে। এ রাজ্যের প্রতিটি সচেতন মানুষ সি, পি, এম দলকে শাসন ক্ষমতা থেকে দূরে নিক্ষেপ করতে চায়, অত্যাচারের প্রতিকারের আশায় ও শিক্ষাক্ষেত্রে এবং সমাজ জীবনে ভারসাম্য রক্ষার একান্ত আবশ্যকতায়। অরাজকতা, অশান্তি, অব্যবস্থা অসাম্য, অনিশ্চয়তা ও আইন-শৃঙ্খলার ক্রমাবনতি এ রাজ্যের মানুষজনকে হতাশা গ্রস্ত করেছে, বামফ্রন্ট তথা সি, পি, এম দলের দুঃশাসনে। ফলে সেই ক্রমাগত দলবাজী ও অত্যাচারী দুঃশাসনের অবসান করে এ রাজ্যের সবস্তর মানুষের সুশিক্ষিত সমাজকে ও বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়কে সক্রীয়ভাবে সি, পি, এম দলের বিরুদ্ধে সংগ্রামের তথা ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের পথে নেতৃত্ব দিতে হবে সংস্কার প্রতিরোধ করার জন্য এবং পশ্চিমবাংলার অতীত ঐতিহ্য ও কৃষ্টিকে সুরক্ষা করার জাতীয় স্বার্থে।

কংগ্রেস (আর্স) দলের প্রবীণ সভাপতি শ্রদ্ধেয় শ্রী প্রিয়রঞ্জন দাস মুন্সিকে শ্রীমতী গান্ধী বিশ্বাস করতে পারছে তার সঙ্গে অচিরে সমঝোতা করে নেওয়া শ্রীমতী গান্ধীর একান্ত দরকার, পশ্চিম বাংলার দুঃশাসন উৎখাত করার মত জাতীয় প্রয়োজনে। শ্রীযুক্ত দাস মুন্সীরও উচিত বামফ্রন্ট তথা সি, পি, এম সরকারকে উচ্ছেদ করার জন্য শ্রীমতী গান্ধীর পরামর্শও সাহায্য নেওয়া এ রাজ্যের সর্বস্তর কল্যাণের একান্ত প্রয়োজনে। কমিউনিষ্ট শক্তিগুলিকে পরাস্ত করার জন্য প্রতিটি জাতীয়তাবাদী দলের সচেষ্ট হওয়া এখনই দরকার। জাতীয়তাবাদী দল বা দল সমষ্টির অতীতের ভুলের ও স্বার্থবাদী রাজনীতির ফলে কমিউনিষ্টরা এরাজ্যে, কেরলায় ও ত্রিপুরায় ক্ষমতা দখলে সক্ষম হয়েছে। ভবিষ্যতে কোন জাতীয়তাবাদী শক্তিরই তাই পুনরায় কমিউনিষ্টদের সঙ্গে জোটবদ্ধ হওয়া জাতির প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করার সামিল হবে। কংগ্রেস (ই) দলের, বিশেষ করে এ রাজ্যের নেতা ও কর্মীদের শ্রীযুক্ত প্রিয়রঞ্জন দাসমুন্সির সঙ্গে সংগ্রামের পথে একাত্ম হওয়া ও তাঁর নিকট হ'তে সর্বপ্রকার সাহায্য ও সক্রীয় সমর্থন পাবার জন্য সচেষ্ট হওয়া বিশেষ আবশ্যক। সি, পি, এম দল জানে যে, যতক্ষণ শ্রীমতী গান্ধীর দলের যুব-ছাত্র ও সংগঠনী নেতারা দ্বিধা বিভক্ত থাকবে ততক্ষণ তারা এ রাজ্যের বুকে দুঃশাসনের ও দলীয় স্বার্থান্ধের জগদ্দল পাথর চাপিয়ে রাখতে পারবে এবং সন্ত্রাসের রাজত্ব যেমন চালাচ্ছে বিগত কয়েক বছর ধরে তেমন ভাবেই তারা চালিয়ে যাবে নির্বিবাদে। কিন্তু যখনই এ রাজ্যের জাতীয়তাবাদীরা জোটবদ্ধ হয়ে কংগ্রেস (ই) দলকে সঙ্গে নিয়ে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের পথে নামবে এবং জনগণের কাছে সি, পি, এম এর দলবাজী ও জঘন্য দুরাচারের এবং দুঃশাসনের কথা প্রচার মাধ্যমে ব্যক্ত করবে তখনই এ রাজ্যের সুস্থ জনসংখ্যা ঊক্ত সি, পি, এম দলের দুঃশাসনের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবে এবং বামফ্রন্টকে উচ্ছেদ করার জন্য সর্বাত্মক সংগ্রামের সামিল হবে, অত্যাচারের অবসান করে। যৌথ প্রচেষ্টা, ঐক্যবদ্ধ প্রচার ও সর্বাত্মক আন্দোলনের পথে যদি কংগ্রেস (ই), কংগ্রেস (আ) ও অন্যান্য জাতীয়তাবাদী দলগুলি জনগণকে সাথে নিয়ে দ্রুত তালে অগ্রসর হয়, তবে অচিরেই বামফ্রন্ট তথা সি, পি, এম সরকারের সর্বগ্রাসী কবল থেকে দেশবাসী মুক্তি পাবে।

রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্র নাথের স্মৃতি কথা

["A Nation In Making" এর অনুবাদ]

অনুবাদক—অধ্যাপক নলিনীমোহন দাশগুপ্ত

মন্ত্রীরূপে আমার কাজ-কর্ম।

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

বেশ কিছুটা আক-জমক পূর্ণ ঘটনার মধ্যে ১৯২১ সালের ৪ঠা জানুয়ারী তারিখে আমরা মন্ত্রীরূপে কার্যভার গ্রহণ করি। শোভাযাত্রা করে আমরা মন্ত্রিগণ ও একসিকিউটিভ কাউন্সিলারগণ সিংহাসন-কক্ষে গমন করি। শোভাযাত্রায় আমাদের প্রধান-রূপে ছিলেন মহামান্য গভর্ণর বাহাদুর। সিংহাসন-কক্ষে আমরা কার্যভার গ্রহণ সংক্রান্ত শপথ গ্রহণ করলাম। শপথ গ্রহণ শেষ হলে আমরা একটি গোল টেবিলের চারিদিকে মন্ত্রী পরিষদরূপে আমাদের বৈঠকে বসি। পরিষদের প্রধান ব্যক্তি ছিলেন গভর্ণর। একটি খাতায় আমরা সই করলাম এবং শোভাযাত্রা সহকারেই আমরা সিংহাসন কক্ষ ছেড়ে চলে এলাম। তারপর যে যার অফিস ঘরে গেলাম। বেশ উৎসাহ আগ্রহের মধ্যে আমাদের কাজ শুরু হল। একাজে অসুবিধাও নেহাৎ কম ছিলনা; আর আমাদের পক্ষে উৎকণ্ঠা ও আশঙ্কারও কমতি ছিলনা। এ কাজে আমরা একেবারেই নবাগত। এই অফিস এই পরিবেশ সবই আমাদের কাছে নতুন। এই রকম বাস্তবতার মধ্যে ইতিপূর্বে আমরা কখনও নিঃশ্বাস গ্রহণ করিনি। তবে এই পরিবেশ অদ্ভুত এবং অভিনব মনে হলেও এর মধ্যে আমরা যথেষ্ট উৎসাহও বোধ করেছি।

আমার সেক্রেটারী ছিলেন একজন আইরিস-ম্যান। তার মধ্যে তার কেল্‌টিক জাতির সমস্ত গুণ স্পর্শানুভূতির ভাব ছিল। তিনি আমাকে সব কাজে সাহায্য করার মনোভাব প্রদর্শন করেন। অফিসি কায়দায় এই শিষ্টাচার পূর্ণ ব্যবহার তো ইতিপূর্বে কখনও চলিনি। তাই তিনি আমাকে সময় সময় বুদ্ধি-পরামর্শ দিতেন। তার সাহিত্যে আমার অনুভূতি কি রকম হত তা প্রকাশ করতে হলে বলতে হয় যে তিনি আমাকে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বুঝতে পেরেছেন। জাতির জন-প্রতিনিধি মহা সভায় তিনি আমার নাম শুনেছেন। ভারতে কর্মচারী বহু ইংরেজই সে ভাবে আমাকে জানেন। কিন্তু অফিসের কাজে তিনি ট্রেনিং পেয়েছেন এবং বৃহত্তর কর্মক্ষেত্রের সহিত যে পরিচিতি লাভ করেছেন তাতে তিনি একথা বুঝতে পেরেছেন যে ভাসা-ভাসা, অসতীর্ণ জ্ঞানের দ্বারা, মানুষ সম্পর্কেই হোক বা কোন বিষয় বা বস্তু সম্পর্কেই হোক, তিনিষের প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে কোন কিছু ধারণা করা যায় না। কাছে থেকে পর্যবেক্ষণ করলে উগ্র বিপ্লবীর মধ্যেও মিলীত, মিষ্ট স্বভাব ভদ্রলোকের সন্ধান পাওয়া যায় যুক্তি-বিবেচনা ও সাধারণ বুদ্ধির প্রভাবের কাছে যার মন উন্মুক্ত থাকে। তাই মি[illegible] মাসে কাউন্সিল চেম্বারের

নীরস বিতর্ক মূলক বক্তৃতায় খুসী না থেকে আমার প্রকাশিত বক্তৃতাগুলি পাঠ করতে লেগে গেলেন। এ কথা তিনি নিজেই আমাকে একবার বলেছিলেন এবং তার কাজের মধ্য দিয়েও আমিতা লক্ষ করেছি। কাউন্সিল চেম্বারের নীরস বক্তৃতা শুনতে শুনতে আমাদের অনেকেরই নিদ্রাকর্ষণ হত। এই ভাবে তিনি আমার অজ্ঞাতসারেই আমাকে অধিকতর ঘনিষ্ট ভাবে বুঝতে পেরেছেন। যে বিশ্বস্ততার সহিত তিনি আমার কাজে সহায়তা করেছেন, তাতেই তাকে আমি জানতে পেরেছি। আশ্চার্য্য রকমের সুসম্পর্কের মধ্যে আমরা কাজ করেছি। ১৯২১ সালের অক্টোবর মাসে দীর্ঘ দিনের ছুটি নিয়ে তিনি চলে যান। সেই সময় থেকে প্রকৃত পক্ষেই তার সঙ্গে আমার দুঃখ জনক বিচ্ছেদ ঘটে।

তবে আমার সম্পূর্ণ দপ্তরটাই ছিল এই রকম মনোভাবের দ্বারা উজ্জীবিত। ডাঃ বেন্টলি ছিলেন সেনিটারী ডিপার্টমেন্টের প্রধান। জন-স্বাস্থ্য রক্ষা বিষয়ে তিনি ছিলেন আমার দক্ষিণ হস্ত স্বরূপ। মন্ত্রীরূপে আমার নিয়োগের অব্যবহিত পরেই তিনি আমার সঙ্গে দেখা করে তার সহযোগিতার নিশ্চয়তা দান করেন। তার এই নিশ্চয়তা দানের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করেই চলতে পেরেছি। তিনি ছিলেন একজন উৎসাহী কর্মচারী। জ্ঞানের সঙ্গে ধর্ম প্রচারকের মত নিষ্ঠার এক সংমিশ্রণ ছিল তার মধ্যে। যে কোন ব্রিটিশ সরকারী কর্মচারীর চেয়ে কাজে গরীমসি-করার মনোভাব তার মধ্যে কম ছিল। এই সংগুনটি না থাকার ফলে সময় সময় তাকে একটু অসুবিধায় পড়তে হয়েছে। তবে সেটা ছিল তার নিজস্ব ব্যাপার। মোটামুটিভাবে আমি মনে করি সরকারী কাজের ক্ষেত্রে আমার পক্ষে এটা ছিল একটা দস্তুর মত লাভ। আমার মনে হয় ইণ্ডিয়ান মেডিকেল সার্ভিসের সঙ্গে তার সম্পর্ক ভাল ছিল না। সে মনোভাব দু তরফেই ছিল। এর ফলে যে সঙ্কট দেখা দিত তা দূর করতে ঊর্ধতন কর্তৃপক্ষের সময় সময় হস্তক্ষেপ করার প্রয়োজন হত। ডাঃ বেন্টলের উৎসাহে গোটা স্বাস্থ্য দপ্তরের মধ্যেই একটা নতুন প্রেরণা দেখা দেয় এবং পূর্ণ উৎসাহ উদ্যমের সঙ্গে সব কাজ নিষ্পন্ন হতে থাকে। এতদ্‌সত্বেও লেজিস্‌লেটিভ কাউন্সিলে যখন তখন এ রকম প্রস্তাব সুপারিশ করা হত যে কর্ম সংস্থাপনায় ছাটাই করা হোক, প্রচার কার্য্য কমান হোক। একবার তো একটা প্রস্তাবই উঠলো যে ডঃ বেন্টলের পদ বাতিল করা হোক। তাদের এই প্রস্তাবগুলি প্রত্যাহার করিয়ে নিতে বা ভোটে পরাজিত করে দিতে আমার কোন অসুবিধা হয় নি। জনসাধারণের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য; জন-সাধারণের প্রতিনিধিরূপে কাউন্সিলে এসে যারা এরূপ আচরণ করেন, তারা যে কতখানি দায়িত্বজ্ঞান-হীন এই সমস্ত প্রস্তাব তাই প্রমাণ করে।

এই রকম সতঃস্ফূর্ত সমর্থন আমি সেনিটারি ওয়ার্কসের চীফ ইঞ্জিনীয়ার মিঃ ডি, বি, উইলি-রামসের কাছ থেকেও পেয়েছি। তিনি স্বেচ্ছায় আমার সঙ্গে সহযোগিতা করেন এবং আমার পরি-কল্পনাগুলিকে যেখানে সম্ভব কাজে রূপায়িত করতে প্রস্তুত ছিলেন। এর একটি সুস্পষ্ট দৃষ্টান্ত হল নদী তীরবর্ত্তী অঞ্চলে জল সরবরাহ করা সম্পর্কে আমার পরিকল্পনা আমার কথায় তার ডিপার্টমেন্ট এই কার্য-ভার গ্রহণ করে। কয়েক বছর আগে এবং নতুন শাসন সংস্কার প্রবর্তিত হওয়ায় বহু পূর্বেই এই পরিকল্পনার ধারণা জেগেছিল। কিন্তু তা পরিত্যাগ করতে হয়। কি কারণে তা পরিত্যাগ করতে হয়েছিল, তা বলার আর আবশ্যক নেই। আমি নদী

তীরবর্তী অঞ্চলে বাস করেছি। তাই ব্যক্তিগত ভাবে জানি পরিশ্রুত পানীয় জলের ব্যবস্থা জন-স্বাস্থ্যের পক্ষে কত হিতকর ও প্রয়োজনীয়। আরও বড় কথা হল এই যে জনমত এর অভাব বোধ করতে শুরু করেছে। এবং এই কাজের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যয় ভার বহনের দায়িত্বও তারা বোধ করতে আরম্ভ করেছেন। ক্রম বর্ধমান জনমতের চাপেই এই-সুযোগে আমি উপলব্ধি করলাম যে আমাকে আমার পদের ক্ষমতা ও দায়িত্ব নিয়ে একাজে নেমে পড়তে হবে। প্রথমে যে কাজে হাত দিলাম তা হল হুগলী নদীর বাঁ দিকের তীর ভূমি বরাবর যে মিউনিসিপ্যালিটিগুলি আছে সেগুলিতে জল সরবরাহের উদ্দেশ্যে উপস্থিত পরিকল্পনাগুলির বিচার বিবেচনার জন্য একটি কমিটি গঠন। মিঃ উইলিয়ামসকে প্রধান করে গঠিত এই কমিটি এই সমস্ত মিউনিসিপ্যালিটিতে টিউবওয়েল বসাবার জন্য সুপারিশ করে। অধিক টানাটানি না থাকলে এতদিনে এই টিউবওয়েল বসানোর কাজ আমাদের অনেকগুলি মিউনিসিপ্যালিটিতেই সম্ভব হত। অর্থের টানাটানি আমাদের সবদিকের কাজেই ব্যাঘাত সৃষ্টি করে আসছে।

এবারে মেডিকেল ডিপার্টমেন্টের কাজের কথায় আসা যাক। মেডিকেল ডিপার্টমেন্ট হস্তান্তরিত বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত। আমার স্বীকার করতে বাধা নেই, এই ডিপার্টমেন্ট নিয়ে আমাকে আরও অসুবিধা পোহাতে হয়েছে। এই ডিপার্টমেন্টের প্রধান এবং মেডিকেল সার্ভিসের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সঙ্গে আমার বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক ছিল। কারও কারও সঙ্গে তা ছিল খুবই আন্তরিক। কর্মচারীদের সম্পর্কে আমার কোন অভিযোগ নেই। বরং তাদের অনেক কাজের জন্য ধন্যবাদই জানাতে হয়। আমার অসুবিধার কারণ হল আমার নিজেরই নীতি যার সঙ্গে আমি সারা জীবনভর জড়িয়ে আছি। এ নীতি আমি পরিত্যাগ করতে পারিনা বা এর কোন সংশোধনও করতে পারিনা। কারণ তাহলে জীবনে যে সত্য, যে মূলমন্ত্র ও যে বিশ্বাস নিয়ে এগিয়ে, তাই আমাকে বিসর্জন দিতে হয়। আমি চেয়েছিলাম আমার দপ্তরকে যতদূর সম্ভব ভারতীয় করে তুলতে দক্ষতার প্রশ্নে অবিচল থেকে। আর তা করতে গিয়ে চিকিৎসা বিজ্ঞান শিক্ষা ও হাসপাতালের সুষ্ঠু পরিচালনার কাজে যাতে কোন ব্যাঘাত সৃষ্টি না হয় সেদিকেও লক্ষ্য রেখেছি। এ কাজটিকে সম্পূর্ণ সাধ্য কাজ বলেই আমি মনে করি। আমি কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করছি যে লর্ড রোণাল্ডসে এবং লর্ড লিটন—উভয়ের কাছ থেকেই আমি সমর্থন লাভ করেছি। দুজনেই পূর্ণ সহানুভূতিশীল ছিলেন এবং শক্তিশালী সমর্থন দিয়ে এ কাজে আমাকে সাহায্য করেন। সঙ্গতভাবেই একথাও বলতে পারি যে আমার দপ্তরের কার্য পরিচালনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সার্জেন জেনারেলগণও আমার নীতির সারবত্তা উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। যতদূর পর্যন্ত তাদের মনোভাব সম্পর্কে বিচার করতে পেরেছি তাতে মনে হয়েছে যে তারা অনুভব করতে পেরেছেন যে ইণ্ডিয়ান মেডিকেল সার্ভিসকে ভারতীয়-করণের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া এবং হাসপাতালের কাছে বেসরকারী ডাক্তারদের সাহচর্য্য গ্রহণ করার সময় এসে গেছে। আমাদের মধ্যে পার্থক্য দেখা দিল খুঁটিনাটি ব্যাপারে। আমাদের মধ্যে আলোচনা হল, একাজে বর্তমানে কতদূর অগ্রসর হওয়া যায় এবং এই লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য এক ধাপের পর আর এক ধাপে বর্তমানে কতখানি উন্নতি সাধন করা যায় তাই নিয়ে। কোন

তবেকেই মত পার্থক্যকে বড় করে দেখার কোন মনোভাব ছিল না। যেখানে পেরেছি আমরা পরস্পরের সঙ্গে সহযোগিতা করেছি; যেখানে মতের মিল হয়নি সেখানে আমাদের মত-পার্থক্য থেকেই গিয়েছে। কিন্তু সেক্ষেত্রে সৌজন্য বা ভদ্রতার কোন অভাব ঘটেনি। কারণ সকলেরই ভারতের হিত কিসে হবে সে বিষয়ে একটা চিন্তা ছিল। আর সে চিন্তা ছিল তুচ্ছ বর্ণগত ও চাকুরেদের স্বার্থ চিন্তার ঊর্ধে। স্বাস্থ্য দপ্তরের সঙ্গে আমার সম্পর্ক কিরূপ ছিল নিম্নে উদ্ধৃত পত্রখানা থেকেই তা বিচার করা যাবে আমার মন্ত্রীত্বের কাজ ছেড়ে দেওয়ার সময় বাংলার সার্জেন জেনারেল মেজর জেনারেল ডেয়ারের কাছ থেকে পত্রখানা পেয়েছিলাম।

২৪৫, লোয়ার সার্কুলার রোড
জানুয়ারী ৬, ১৯২৪

প্রিয় স্যার সুরেন্দ্র,

সার্জন জেনারেল রূপে কাজ করার সময় আপনার কাছ থেকে সর্বদা যে সৌজন্য, ধৈর্য ও সহানুভূতি লাভ করেছি তাতে আপনার মন্ত্রীপদ ছেড়ে যাওয়ার যে গভীর বিচ্ছেদ বেদনা অনুভব করছি তা প্রকাশ না করে পারছি না। সব ব্যাপারে হয়ত আমরা একমত হতে পারিনি; কিন্তু আমি সব সময়ই এটা অনুভব করেছি যে আমরা সরল মন নিয়ে নানা সমস্যার আলোচনা করতে পেরেছি এবং মোটামুটি কোন কোন বিষয়ে একমত হতে পেরেছি। আপনার মত একজন পরিণত বিচার বুদ্ধিসম্পন্ন, প্রশস্ত দৃষ্টিভঙ্গী ও গঠন-মূলক কর্ম প্রতিভার অধিকারী রাষ্ট্রনীতিজ্ঞ ব্যক্তির সঙ্গে আমার যে অফিসী সম্পর্ক ছিল তাকে আমি মূল্যবান মনে করে এসেছি। আমরা উভয়ে যে দেশকে ভালবাসি, দীর্ঘকাল বেঁচে থেকে আপনি সেই দেশের সেবা করুন, এই কামনা করি।

আন্তরিকভাবে আপনার
বেন, এইচ, ডেয়ার।

এটা একটা লক্ষ্য করার মত বিষয় যে আমার তিন বছরের মন্ত্রীত্বকালের মধ্যে আর কোনও সার্জেন জেনারেলের সঙ্গে আমার এত লড়াই করতে হয়নি। আমার মনে হয়, তুমি যদি কোন ইংরেজকে দু-একটি ধাক্কা দেও, এবং সেও তোমাকে অনুরূপভাবে ধাক্কা দেয়, তা হলেই তুমি তার প্রকৃত মনের নাগাল পাবে। এই রকম ধাক্কা-ধাক্কির পরে তোমরা পরস্পরের বন্ধু হয়ে দাঁড়াবে। আমার অভিজ্ঞতায় মনে হচ্ছে, তার মন পাওয়ার এটাই প্রশস্ত পথ। এর ফলে পরস্পরের মধ্যে সম্ভ্রম বোধ ও বিশ্বাসের সৃষ্টি হয়।

(ক্রমশঃ)

RegdNo.R. N .24911/71 | Biplabi Bangla | Regd. WB/NC 77
Phone : 34-1795
বার্ষিক :—ডাক ১৫.০০ টাকা | ষাণ্মাসিক :—৮.০০ টাকা | মূল্য—৩০ পয়সা

বিপ্লবী পুস্তকমালা

CALCUTTA POLICE

নেতাজীর সিক্রেট সার্ভিস — ডাঃ পবিত্রমোহন রায়—১০.০০

ক্ষীরোদ কুমার ভট্টাচার্য—

১। বাংলার অগ্নি-যুগ—৫.৫০
২। বহির্ভারতে ভারতীয় বিপ্লব প্রচেষ্টা—৮.০০
৩। অনুশীলন সমিতির রূপ, মিত্তির—২.০০
৪। গৌহাটী সংগ্রাম কাহিনী—১.০০
৫। কাকোরী শহীদবৃন্দ—১.২৫
৬। কলকাতা বাজার সংগ্রহ
৭। রাসবিহারী ও অনুশীলন সমিতি—৯০
৮। স্বাধীনতার শহীদ ও ঘরে—
৯। বিবেকানন্দ ও সমাজবাদ—৯০
১০। বিপ্লবী বিবেকানন্দ—৫০
১১। মহাত্মা ও সুভাষচন্দ্র—৫০
১২। ভারতের নবজাগরণ ও ভগিনী নিবেদিতা—১৫
১৩। বেশ কাছের তোলেনি (১)—১.০০
১৪। বেশ কাছের তোলেনি (২)—২.০০
১৫। শহীদ চন্দ্রশেখর আজাদ—৫০
১৬। ১৩ই এপ্রিল জাতীয় শহীদ দিবস—১.০০
১৭। হাডিঞ্জ হত্যা প্রচেষ্টা—১৫
১৮। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও অনুশীলন সমিতি—৫.০০
১৯। ভারতের জাতীয় পতাকার ইতিহাস—৫০
২০। লাট হত্যা প্রচেষ্টা—১.৫০

প্রাপ্তিস্থান :—৪নং বঙ্কিম দাস ষ্ট্রীট কলিকাতা-৭০০০০৭

শৈলশ্রী—১/১/১/A বঙ্কিম চ্যাটার্জী ষ্ট্রীট কলিকাতা-৭৩

24 DEC 1980

— সম্পাদক মণ্ডলী —
শ্রীজগদীশ চট্টোপাধ্যায় (সভাপতি) শ্রীঅরবিন্দচন্দ্র নন্দী, শ্রীপুষ্প চ্যাটার্জী
সম্পাদক—শ্রীনাভি সরল রায়চৌধুরী
দিল্লীর বিশেষ প্রতিনিধি—শ্রীবারীন্দ্র ঘোষ। বেতালা—শ্রীনন্দগোপাল পাল।
প্রকাশক ও মুদ্রক :—শ্রীঅনিল সেনগুপ্ত। প্রচার সচিব—শ্রীসুরেন্দু সোম।
বিপ্লবী বাংলা কার্য্যালয় :—৪নং বঙ্কিম দাস ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০০৭
মুদ্রণে:—প্রিন্টিং পার্টনারসিটি, ১১৭ নং কেশব সেন ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৭০০০০৯

বিপ্লবী বাংলা

॥ বিপ্লবী পরিষদের সাপ্তাহিক মুখপত্র ॥

স্থাপিত—১৯৫৬, 'বিপ্লবী বাঙ্গালী' নবকলেবরে—১৯৭৯

দশম বর্ষ ● শনিবার ১৯শে পৌষ ১৩৮৭, ৩রা জানুয়ারী ১৯৮১ ● ১২ সংখ্যা

থানা পুলিশের আজ এই অসহায়তা কেন ?

সমগ্র পশ্চিমবঙ্গে আজ আইন শৃঙ্খলার অবস্থা চূড়ান্ত অবনতির পর্যায়ে এসে পৌঁচেছে থানায় এনিয়ে দৈনিক রিপোর্ট তৈরী হয় রিপোর্ট নিয়ে থানার বড়বাবু, মেজবাবু চনাতেও বসেন কিন্তু কার্যক্ষেত্রে উন্নতি চোখে পড়েনা। এই যে একটা নিষ্ক্রিয় অবস্থা হয়ে আছে এই রাজ্যে পুলিশের— এক একটিই কারণ, কিন্তু ব্যবস্থা নি ওপর তলার রাজনীতির কোন না কোন : চাপ আসতে শুরু করে, ওকে ছেড়ে দাও, ওকে ধোরো না' প্রভৃতি।

বিপ্লবী বাংলা
বর্ষ — ১০
সংখ্যা— ১২, ২২, ২৪—২৬ ব করছেন।
২৮, ৩০—৩৪, ৩৬— ৩৯ বিশেষ বিপন-
৪২, ৪৩ কোন কারণেই
১৩৮৭—৮৮ (১৯৮১) শংকা করছে,
বলা হলো,

সমস্যাটা আজ এমন এক পর্যায়ে গিয়ে পৌঁচেছে যে পুলিশের চোখের সামনেও যদি বেআইনী কোন ঘটনা ঘটে কোন খুনও হয়, বা ডাকাতি—তা'হলেও পুলিশ সম্ভবতঃ প্রতিরোধে এগিয়ে যেতে ভয় পাবে। রাজ্যে প্রশাসন ও আইন শৃঙ্খলাকে বজায় রাখতে হলে এ অবস্থাটা অত্যন্ত মারাত্মক।

কলকাতার চেয়ে গ্রামাঞ্চলে অবস্থাটা আরও ভয়াবহ ডাকাতের পর ডাকাতি হচ্ছে একজনের জমির ধান অপরে জোর করে কেড়ে নিয়ে যাচ্ছে, তারা হয়তো আগেও একাধিক খুনের ঘটনায় জড়িত, কাকস্য পরিবেদনা; থানার বড়বাবু গম্ভীর ভাবে বললেন, 'দেখুন আমরা তো ঘটনা কিছু না ঘটলে ব্যবস্থা নিতে পারিনা। আপনি খুন হওয়ার মিছিমিছি ভয় পাচ্ছেন ! দেখাই যাক্‌না আগে খুন হোন, তারপরে নিশ্চয়ই যাবো ! এ তো আমাদের ডিউটী।'

ধান কাটার ব্যাপার নিয়ে সাম্প্রতিক কালে প্রতিদিনের খবরের কাগজে সংঘর্ষ, খুন, জখম, অগ্নিসংযোগের ঘটনা প্রকাশিত হচ্ছে এর

কতগুলির যথাযথ তদন্ত করেছে পুলিশ? মালদার সায়েরা গ্রামে চারজন মানুষকে প্রচণ্ড প্রহার করে পরে চোখে ছুঁচ ফুটিয়ে অন্ধ করে দেওয়া হল! দেড় মাস পরে জানা গেল স্বয়ং স্বরাষ্ট্র সচীবও এ বিষয়ে কোন খবর রাখতেন না? ঐ গ্রামে বা সদরে কি কোন পুলিশী ব্যবস্থা ছিলোনা? কলকাতার মুরারী পুকুর, কসবা, টালীগঞ্জ, বাগমারী, ঢাকুরিয়া, যাদবপুর ও আরও একাধিক অঞ্চলে সমাজবিরোধীদের নিত্য তাণ্ডবে জনজীবন অসহনীয় হয়ে পড়েছে। এই সেদিন কসবায় সমাজবিরোধী দমন করতে গিয়ে পুলিশের গুলীতে প্রাণ দিলেন এক নিরীহ মহিলা ও তাঁর কন্যা! এইসব সমাজবিরোধী কারা? কোথায় থাকে? এসব খবর কি পুলিশ জানেনা? পুলিশের গোয়েন্দা দপ্তর কি এই কয়েক বছরে একেবারে অপদার্থ হয়ে গেল? পশ্চিম দিনাজপুরের ইসলামপুর গ্রামে শুধুমাত্র প্রতিহিংসা চরিতার্থ করতে গিয়ে পশ্চিমবঙ্গ পুলিশেরই যেসব কনষ্টেবল চরম নিষ্ঠুরতার পরিচয় দেখালো, পুলিশের বড় কর্তারা কি তাদের চেনেন-না? বদলীর আদেশকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে কিভাবে তারা বহাল তবিয়তে চাকরীতে টিকে থাকে—এ ব্যাপারে কর্তৃপক্ষের কি কিছুই করার নেই।

আসলে এর সর্বগ্রাসী ভয় ও আতংক সৎ, দায়িত্ববান পুলিশদেরও আচ্ছন্ন করে রেখেছে। ভয় বদলীর, ভয় শাসকশ্রেণী ও তাঁদের আঞ্চলিক দণ্ডমুণ্ড বিধাতাদের কোপানলে পড়ার। ভয় অনিশ্চয়তা ও অবমাননার। বাম ফ্রন্টের গত সাড়ে তিন বছরের শাসনে পশ্চিমবঙ্গ ও কলকাতা পুলিশকে যে চরম অত্যাচার ও অপমান সহ্য করতে হয়েছে, তার তুলনা নেই।

গ্রামে পঞ্চায়েতের কর্তার কথায় তাঁদের চলতে হচ্ছে' সহর ও আধা সহরগুলিতে পার্টি অফিসের নির্দেশ অনুযায়ী তাঁদের কর্তব্য স্থির অথবা পরিবর্তন করতে হচ্ছে। নীচের তলার লোককে ওপরে এনে বসানো হচ্ছে পার্টির আনুগত্যের কারণে। কারণে অকারণে প্রায়শ, ওপরতলার রদবদল করা হচ্ছে নিজেদের খেয়ালখুশী মতো। যে পুলিশ অফিসারকেই লাল পার্টির প্রতি তাঁর বশংবদতা সম্পর্কে সন্দেহ করা হচ্ছে, তাঁকেই বিনা কারণে বা বাজে অজুহাতে নির্বাসনে পাঠানো হচ্ছে। এ অবস্থাটা কোন মানুষের পক্ষেই গ্রহণ যোগ্য বা সম্মানের নয়।

আর এই কারণে এই রাজ্যের পুলিশ ক্রমশঃ নিষ্ক্রীয় হয়ে যাচ্ছে। তাদের মনোভাবটা হলো—যে যা করছে করুক আমি কেন দেখতে যাবো? কেন যেচে নিজের বিপদ ডেকে আনবো? আর আছে পুলিশের মধ্যে অর্থলোভী দুর্নীতিগ্রস্ত একটা শ্রেণী যারা এই সুযোগে যা ইচ্ছে তাই করে নিচ্ছে।

তবু এর মধ্যে কিছু সৎ, নির্ভীক ও নিরপেক্ষ অফিসার এখনও আছেন যাঁরা সহস্র প্রতিকূলতা, প্রলোভন ও চোখ রাঙানীকে অগ্রাহ্য করে নিজেদের কর্তব্যে অবিচল রয়েছেন। নীচুর তলার অনেক পুলিশ কর্মীও এই দুঃসহ অবস্থাকে আর সহ্য করতে পারছেন না। শুধুমাত্র রাজনৈতিক বিরোধীদের পেটানোর কাজে তারা নিজেদের হাতিয়ারকে ব্যবহার করতে চাইছেন না। এঁরাই সংঘবদ্ধ হচ্ছেন। একত্রিত হচ্ছেন অন্যায়ের প্রতিবাদ জানাতে, দুর্নীতির বিরুদ্ধে সোচ্চার হতে। তাই এঁদের বিরুদ্ধেই মুখ্যমন্ত্রী হুংকার ছেড়েছেন—'ওরা যদি মহাকরণ অবরোধে আসেন তো আসুন। ওদের হাতে বন্দুক আছে, আমাদের জনগণ আছে।' জানতে ইচ্ছে করে জনগণ বলতে জ্যোতি বাবু প্রকৃতপক্ষে কি বোঝেন?

●

সম্পাদকীয়

অগ্নি পরীক্ষা

গভীর উদ্বেগের সঙ্গে দেশের চিন্তাশীল ও দেশপ্রেমিক মানুষেরা লক্ষ্য করছেন যে ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তে তুচ্ছ ও অসমর্থনযোগ্য কারণে আন্দোলন ও অশান্তির ঢেউ উঠছে ও ক্রমাগত বেড়েই চলেছে। ভারতবর্ষের চিরাচরিত নীতি অনুসারে যে কাজ আলাপ আলোচনার মাধ্যমে করা সম্ভব, আন্দোলন বা বিক্ষোভকারীরা কিন্তু সে পথে চলছেন না। অথচ সমগ্র বিশ্বের মানুষ কিন্তু ক্রমবর্ধমান-ভাবে এই নীতির প্রতি সমর্থন জানাচ্ছেন এবং এই নীতি অশান্ত এবং বিবদমান দেশগুলির ও অন্যান্য সব দেশের পক্ষে সমর্থনযোগ্য বলে স্বীকার করছেন। কিন্তু দুঃখের কথা এই নীতির প্রধান প্রবর্তক ও অনুসরণকারী বলে যে ভারত দেশ-বিদেশে প্রশংসা লাভ করেছে, সেই ভারতবর্ষেরই কয়েকটি দল ও মানুষ উলটো পথে চলে, দেশের শান্তি, শৃঙ্খলা ও অগ্রগতি ব্যাহত করছে তাদের নির্লজ্জ ও অবিবেচক প্রসূত কাজ কর্মের মাধ্যমে। বাড়তি বোনাস, উচ্চতর স্তরের ও সুযোগ সুবিধার দাবীতে যখন তখন যেখানে সেখানে কর্মীরা ধর্মঘট করছেন, যার ফলে উৎপাদন ব্যাহত হচ্ছে, দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পাচ্ছে, দেশের মানুষের দুঃখ দুর্দশা ক্রমাগত বেড়েই চলেছে। অথচ দেশের জনসংখ্যার এরা একটি অতি ক্ষুদ্রাংশ মাত্র। অর্থনীতির একটা মৌলনীতি এরা বুঝতে পারছেন না, অথবা মতলব বাজ রাজনীতিকদের অসাধু প্ররোচনার শিকার হচ্ছে। বর্ধিত বেতন এবং সুযোগ সুবিধা নির্ভর করে উৎপাদনের উৎকর্ষ ও পরিমাণ বৃদ্ধির উপর। এই সহজ সত্যকে উপলব্ধি করে যদি এরা কাজ না করেন, তবে এদের ভাগ্যের উন্নতি-সাধন হবে না কোনদিন। যে সব বিরোধী দল ও নেতারা, তাদের উস্কানি দিচ্ছেন, তারা ক্ষমতাসীন হলেও এই অসম্ভবকে সম্ভব করতে পারবেন না। এই সত্য ত বারংবার প্রমাণিত হয়েছে। আজ যারা বর্তমান প্রশাসক দলকে সব নষ্টের মূল বলে অভিহিত করতে চাচ্ছেন। যে কোন প্রকারে তাদের যোগ্যতার নমুনা ও অতি-সম্প্রতিও মিলেছে। ভারতবর্ষ একটা বিরাট দেশ। বহু সম্প্রদায়ের মানুষ এখানে বাস করে। তাদের সমস্যাও বহু রকমের। তার সমাধান করাও খুব অনায়াস লভ্য নয়। অজ্ঞানতা, ধর্মান্ধতা, আঞ্চলিকতাবাদ, প্রাদেশিকতা, জাত্যাভিমান প্রভৃতির মত ব্যাধি বহুদিন ধরে বিদেশী শাসকরা নিজেদের স্বার্থে এদেশে সৃজন ও লালন পালন করেছিল। সেই রোগ থেকে দেশের বহু মানুষ আজো মুক্ত হতে পারেনি। তাদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তার, জাতীয়তাবাদ ও স্বদেশপ্রেম সৃষ্টি করার কাজগুলি অল্প সময়েই করা সম্ভব নয়, এ কাজ সময় সাপেক্ষ। গণতান্ত্রিক দেশের সব দলেরই অবশ্য কর্তব্য এই মহৎ কাজে ব্রতী হওয়া। সকলের উদ্যম, প্রচেষ্টা ও সহযোগ যদি সুসংহত করে কাজ করা যায়, তবে সফলতা লাভের কাল সঙ্কুচিত হয়, পরিমাণও বৃদ্ধি পায়। সর্বাগ্রে এই অনুভূতি

সকলেরই থাকা দরকার যে সমাজ দেহ রাজনৈতিক ক্ষেত্র থেকে এই ব্যাধি নির্মূল করতে না পারলে, ব্যক্তি ও সমষ্টি কারো কল্যাণ সম্ভবপর নয়। এমন কি বহু শহীদের রক্তদানে বহু স্বাধীনতা সংগ্রামীদের অশেষ দুঃখ কষ্ট ও নির্যাতন ভোগের ফলে যে স্বাধীনতা এসেছে, তাও বিপন্ন হতে পারে। জাহাজ মরিলে বাঁচিবে কে? এই মৌল সত্য হৃদয়ঙ্গম করে কাজ না করলে কারো পরিত্রাণ নেই।

কিন্তু মনস্তাপের কথা, ক্ষোভের কথা, দেশের প্রকৃত স্বার্থের বিরুদ্ধে কাজ করার মত হীনবুদ্ধি দল ও লোকের অভাব নেই। সামান্য কারণে কোথাও কোন হাঙ্গামা হলেই তাকে একটি রাজনৈতিক রূপ দিয়ে কোন কোন বিরোধী পক্ষ সক্রিয় হয়ে ওঠে এবং বিদ্বেষের তাড়নায়, মতলোভের লোভে দেশের স্থিতিশীলতাকে বিঘ্নিত ও বিপন্ন করতে একটুও দ্বিধা করে না। আজ মহারাষ্ট্রের কৃষকরা যার নেতৃত্বে আন্দোলন সুরু করেছিল, সেই নেতাটি কিন্তু এর মধ্যে রাজনীতির অনুপ্রবেশ ঘটতে দিতে চাননি। তিনি মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে আলাপ আলোচনা, সমস্যা সমাধানের জন্য ৯ই জানুয়ারী পর্যন্ত তার পরিচালিত আন্দোলন স্থগিতও রেখেছেন। হয়ং হতমান বিরোধী দলের কয়েকজন নেতা এই সুযোগটিকে অপব্যবহার করে, হাজারে হাজারে কারাবরণ করার আন্দোলনের নেতৃত্ব দিচ্ছেন। মোরাদাবাদ, আলিগড় প্রভৃতি স্থানে কিছুটা ভুল বোঝাবোঝির জন্য একটা হাঙ্গামার সূত্রপাত হয়, অমনি এই মার্কা দলের নেতারা আসরে অবতীর্ণ হলেন, সমস্যা সমাধান করার জন্য নয়, ইন্ধন জুগিয়ে হাঙ্গামাকে ব্যাপকতর করে বর্তমান শাসক দলকে হেয় প্রতিপন্ন করতে। অবশ্য মনের গভীরে গোপন বাসনা ছিল। পুনরায় ক্ষমতা লাভের মৌকা যাতে মিলতে পারে। আসাম প্রদেশের ঘটনা সম্বন্ধেও একই দৃষ্টিভঙ্গী। সমস্যা সমাধানের কোন উপায় কেউ খুঁজে পাননি। অথচ কথাবার্তা এমনভাবে বলছেন যাতে আন্দোলনকারীদের প্রশ্রয় দেওয়া হয়। আন্দোলনকারীরা মানুষ খুন করবে, ঘরবাড়ী জ্বালিয়ে মানুষকে পথে দাঁড় করাবে। অর্থনৈতিক অগ্রগতি ও বর্তমান ব্যবস্থাকে ক্ষুণ্ণ করে অগণিত সাধারণ মানুষের অবর্ণনীয় দুর্দশা ঘটাবে। ইট, পাথর ছুড়ে, হিংসা ও ত্রাসের জমানা সৃষ্টি করবে, অত্যন্ত অযৌক্তিক দাবী করে, আলোচনায় বসতে দেবে না, তাদের বিরুদ্ধেও কোন ধিক্কার দেয় না এরা। বলে না যে দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন চাই। প্রতিশ্রুতি দেয় না যে দেশ ও জাতির স্বার্থে দেশদ্রোহীদের মোকাবিলা করতে জাতীয় সরকারকে সর্ব রকমে সাহায্য করবে। কিন্তু কেন? দেশপ্রেমের লোচনীয় অভাব এদের মধ্যে। রাজত্ব শাসনের নক্কারজনক লোভ এদের দৃষ্টিকে করেছে অন্ধ, বিবেককে করেছে নিষ্ক্রিয়, ন্যায়-অন্যায় বোধকে করেছে পঙ্গু। যে জনতা দলের প্রশাসনকালে আসামের এই দেশদ্রোহী দল সৃষ্ট ও পুষ্ট হয়েছিল যার বহিঃপ্রকাশ আজ সহ্যের সীমা অতিক্রম করতে চলেছে, এদেরই ত সর্বাগ্রে এগিয়ে আসা উচিত ছিল এই দুষ্ট চক্রকে দমন করে জেলে পুরে গুড়িয়ে দেবার কাজে অগ্রণী হয়ে। তারা হয়ত মজা দেখছে বর্তমান সরকারের বিপন্ন অবস্থা দেখে। একমাত্র সি, পি, আই (এম) দলই পরিষ্কারভাবে তাদের নীতি এই অপকর্মের বিরুদ্ধে প্রকাশ করেছে। কিন্তু অধিকাংশ দল মৌনী হয়ে আছেন, শিকারী জন্তুর মত শিকার লাভের সম্ভাবনায়। কিন্তু এই মহামূর্খেরা বুঝছেন না যে আগুন যখন লাগে তখন সকলকেই পুড়িয়ে মারে বাছবিচার না করে।

কিন্তু প্রশ্ন এসে পড়েছে শাসকদল কি ভাবে এই আসাম সমস্যার মোকাবিলা করবেন। চিন্তাশীল মানুষ মনে করে আসামের এই জাতীয় সংহতি বিরোধী আন্দোলনের ফলেই দেশের অন্যান্য কয়েকটি প্রতিবেশী রাষ্ট্রে এর বিপজ্জনক প্রভাব পড়ছে, সে সব জায়গাতেও বিচ্ছিন্নতাকামী আন্দোলন মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে। অন্যায় করলেও সরকার দমন ও শাসন করতে পারে না ; এই মানসিকতাও অস্ত্র ছড়িয়ে পড়ছে ও পড়বার সম্ভাবনা রয়েছে। যা খুসী তাই করে পার পাওয়া যায়। এই ভয়ঙ্কর মানসিকতার ব্যাপক প্রসারতা ঘটলে দেশ বাঁচবে কি করে? তা ভিন্ন এই সুযোগে দেশীয় ও বিদেশীয় শক্তি সক্রিয় হয়ে উঠেছে ও আরো উঠবে। বিশ্বব্যাপী তৈল সঙ্কটের দিনে আসামে তৈল উৎপাদন হবে না ও হলেও দেশের অস্ত্র নেওয়া চলবে না, বিদেশী মুদ্রা উপার্জনকারী পাট অস্ত্র নেওয়া যাবে না। দেশের শিল্পের জন্য কাঁচামাল এখান থেকে সরানো, চা রপ্তানী ব্যাহত করা হবে, প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলিতে অত্যাবশ্যক দ্রব্যাদি পরিবহন করা যাবে না। এই দেশদ্রোহাত্মক কার্যকলাপ কতদিনে বন্ধ করা হবে, এই প্রশ্ন সন্নিহিত রাজ্যগুলির, ভারতের বিভিন্ন রাজ্যগুলির, আসামের একটি বৃহদাংশের ও দেশের জনসাধারণের মনে দানা বেঁধে উঠছে। যথেষ্ট সময় দেওয়া হয়েছে, হিতকথা এই দুষ্কৃতকারীর দল শুনবে না, এই সত্য তারা তাদের কাজের মাধ্যমে সংশয়াতীত ভাবে প্রমাণ করেছে। প্রধানমন্ত্রী বলেছেন যে ভারতের নিকটবর্তী স্থানে যুদ্ধের সম্ভাবনা ও এদেশে তার বিস্তারের আশঙ্কা অমূলক নয়। দেশের আইন ও শৃঙ্খলার যদি এই ক্রমাবনতি চলতে থাকে, তবে ত দেশকে ঘরের ও বাইরের শত্রুর সঙ্গে মোকাবিলা করতে হবে এবং সকলেই জানেন যে সে কাজ কত দুরূহ। সরকারকে কঠোর হতেই হবে একদিন। তবে দেরী করে পায়ের তলায় কাঁটা জন্মাতে দেওয়া উচিৎ হবে না। কংগ্রেস (ই) দলের সমগ্রভাবে সঠিক কার্যক্রম নির্দ্ধারণ করে Missionary Zeel নিয়ে কাজ সুরু করতে হবে। শুধু শ্রীমতী গান্ধীর পক্ষপুটে আশ্রয় নিয়ে, তাঁর সুনাম, জনপ্রিয়তা, অসাধারণ চরিত্র প্রভাব ও মনোবল ভাঙ্গিয়ে কেবলমাত্র মন্ত্রীত্বের গদীর দিকে শ্যেন-চক্ষু দিয়ে তাকিয়ে থাকলে চলবে না। আসাম ও দেশের সব রাজ্যের মানুষের যথা কর্তব্য পালনের জন্য সাহস, দৃঢ়তা, মনোবল ও দেশ সেবার মনোভাব নিয়ে এগিয়ে আসতে হবে দেশ বৈরী পর্যুদস্ত করতে। সকলের সামনে অগ্নি পরীক্ষা, এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ না হলে কারো রক্ষা নেই। মুষ্টীমেয় কয়েকটি দেশদ্রোহীদের সঙ্গে সকল মোকাবিলা না করতে পারলে উত্তরকালের দেশবাসীদের নিকট জবাবদিহি করার কিছুই থাকবে না।

নববর্ষ ১৯৮১/আশা নিরাশা

— কালীপদ সরকার

১৯৮০ সাল শেষ হল। অনেক আশা নিয়ে সে এসেছিল যাবার সময় রেখে গেল আশা ও নিরাশার আলো—আঁধার, দুঃখের স্মৃতি এবং সংকট সংঘর্ষ কুয়াশা। এ বর্ষ দেখেছিল শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর সগৌরবে রাষ্ট্রক্ষমতায় প্রত্যাবর্তন, সোভিয়েত সৈন্যের আফগানিস্থানে প্রবেশ, সঞ্জয় গান্ধীর অকাল মৃত্যু, ত্রিপুরায় গণহত্যা, ইরাক-ইরানের যুদ্ধ, পেট্রলজাত দ্রব্যের অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি, বিশ্বব্যাপী মুদ্রাস্ফীতি এবং প্রেসিডেন্ট কার্টারের নির্বাচন-পরাজয়।

এই আন্তর্জাতিক পটভূমিতে এসেছে ১৯৮১ সাল। তাই মুক্ত হৃদয়াবেগে নব বর্ষকে স্বাগত সম্ভাষণ জানাতে দ্বিধাবোধ না জেগে পারে না। তবুও তাকে অভ্যর্থনা জানাই। কারণ আমরা বিশ্বাস করি মানুষের শুভবুদ্ধিতে, মানুষের দেবতাত্মার তার তমোহীন বিবর্তনে।

শংকাকুল ধরিত্রীর তপ্ত বুক শান্তির মহামন্ত্র চায়, অস্তিত্বের শৃংখলার বাহবদ্ধ বিদ্রোহী মানবাত্মা চায় মুক্তি এবং দীন দরিদ্র আতুর চায় বাঁচবার শাশ্বত অধিকার।

তাই নববর্ষের ভোরে বিধাতার কাছে আমাদের প্রার্থনা—তিনি যেন শক্তি ও বুদ্ধি দেন আমাদের। বিভেদ বিচ্ছিন্নতা, অজ্ঞান নিশ্চেতনা এবং মোহ দুর্বলতা জয় করে ভারত যেন আলোক করা নির্মেঘ ভূ লোকে শান্তির পরিক্রমায় বিশ্ববাসীকে পথ দেখাতে পারে।

এই অনুধ্যান আজ চিত্তকে অধিকার করে বসেছে শুধু এই কারণে যে, যখন দেশের সীমান্ত সন্নিকটে আগুনে মেঘের ঘনঘটা, তখন দেশ জুড়ে চলেছে বন্ধ, বিক্ষোভ, সংঘর্ষ ও গৃহযুদ্ধের উন্মাদ নৃত্য। অবস্থা দেখে মনে হয়, আমাদের নেতারা বুঝি দেশকে ভুলে গিয়েছেন, নতুবা তাঁরা নির্বাচনে পরাজিত হয়ে যে কোন উপায়ে ক্ষমতাসীন সরকারকে অপদস্থ করার জন্য এ ভাবে কোমর বেঁধে লাগবেন কেন?

মুখে যারা প্রতিনিয়ত গণতন্ত্রের জয়গান করেন তারা কেন পরবর্তী নির্বাচন কালের প্রতীক্ষা না করে অসংযম ও অগণতান্ত্রিক সংঘর্ষের পথ বেছে নিয়েছেন?

আসামের বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন, উত্তর প্রদেশের দাঙ্গা, দক্ষিণ-পশ্চিম ভারতের কৃষক বিক্ষোভ এবং পশ্চিম বাংলার গণতন্ত্র শাসনের অরাজকতার দিকে গভীর ভাবে তাকালে এই সত্যই প্রকটিত হয় যে, কর্মকাণ্ডগুলি পরিকল্পিত এবং উদ্দেশ্য প্রণোদিত। তাদের লক্ষ্যও এক, তা হল দেশের স্থিতিশীলতা নাশ। এক অর্থে তাই আন্দোলন ও সংঘর্ষগুলি শ্রীমতী গান্ধীর সরকারের প্রতি চ্যালেঞ্জ স্বরূপ এবং দেশকে ১৯৭৫ সালের অস্থির অবস্থায় ফিরিয়ে নেবার চেষ্টার সামিল।

কমিউনিস্টদের চরিত্র বোঝা সহজ, অরাজকতা সৃষ্টি এবং সমাজস্থিতির দ্রুত অবক্ষয় তাদের ক্ষমতা দখলের চিরাচরিত পটভূমি। সীমান্তে যুদ্ধের গুরু-গর্জন সেই পটভূমিকে আরো সতেজ করে। কিন্তু জাতীয়তাবাদী বলে পরিচিত নেতারা যখন অরাজকতা সৃষ্টির কাজে প্রবৃত্ত হন তখন স্বভাবতঃই সন্দেহ জাগে, পৃথিবীর নানাস্থানে স্থিতিশীলতা নাশের যে রাজনৈতিক গোপন চক্রান্ত ক্রিয়াশীল, তারা তার শিকার হন নি তো?

পাকিস্থান রাজস্থানের সীমানায় সেনা সমাবেশ

করেছে, বিপুল অস্ত্র ভাণ্ডার গড়ে তুলছে এবং পরমাণু বোমা তৈরির দুরাশায় চেষ্টায় লিপ্ত আছে।

ইরাক-ইরানের যুদ্ধ অব্যাহত আছে, পশ্চিম এশিয়ার কয়েকটি দেশ পরোক্ষভাবে সে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েছে এবং দুই বিশ্বশক্তি ইরাক ও ইরানের পিছনে কলকাঠি নাড়ছে। এ অবস্থায় আফগানিস্থান ছেড়ে সোভিয়েত সেনা স্বদেশে যে ফিরে যাবে না তা সুনিশ্চিত।

ভারত মহাসাগর দুই বৃহৎ শক্তির রণতরী বহরে তোলপাড় হচ্ছে। অষ্ট্রেলিয়া থেকে হরমুজ প্রণালী পর্যন্ত মার্কিন যুদ্ধ জাহাজগুলি মহড়া দিচ্ছে। দিয়েগো গারসিয়া দ্বীপে মার্কিন দুর্গে মজুদ করা হয়েছে রাশি রাশি অত্যাধুনিক মারণাস্ত্র। পশ্চিম এশিয়ার সংকট ছায়া দক্ষিণ এশিয়াকে আবৃত করেছে।

অন্যদিকে পোল্যাণ্ডের গোলযোগ ইউরোপকে করছে উত্তেজনা কবলিত। পোল্যাণ্ডের আন্দোলনকে এখন আর কেবল শ্রমিক বিক্ষোভ বলে ব্যাখ্যা দেওয়া চলছে না। পোল্যাণ্ড কমিউনিজমের শিকড় ধরে টান দিয়েছে। সম্প্রতি পোল্যাণ্ডের আন্দোলন নেতা মিঃ ওয়ালেচা বলেছেন 'রাশিয়া যে পোল্যাণ্ডকে আক্রমণ করবে এমন নাও হতে পারে। তবে আমরা রুশ আক্রমণের ভয়ে ভীত নই। রাশিয়া আমাদের পরাজিত করতে পারে কিন্তু কখনো পদানত করতে পারবে না। পোল্যাণ্ড যদি সংকট কাটিয়ে ওঠে, তবে তা সম্ভব হবে মাননীয় পোপ, পোল্যাণ্ডের যাজক এবং শ্রমিক দলের চেষ্টায়।'

পোল্যাণ্ডের সীমানা বরাবর অবশ্য সোভিয়েত সেনা ইতিমধ্যে উপস্থিত হয়েছে এবং জ্যাটো তাদের পাঁচটি যুদ্ধ জাহাজকে অতলান্তিকে তৈরি থাকতে নির্দেশ দিয়েছে।

অবস্থা নিঃসন্দেহে অগ্নিগর্ভ এবং বিস্ফোরণমুখী। তবে কি সত্যই সেই ভয়ংকর তৃতীয় বিশ্বসমর আসন্ন? সম্ভাব্য সেই মহাযুদ্ধ থেকে ভারত কি নিজেকে সাবধানে দূরে রাখতে পারবে? ভারত-সোভিয়েত মৈত্রীচুক্তির দায়দায়িত্ব ভারত তখন কি ভাবে পালন করবে? এই সব গুরুতর প্রশ্ন নিয়ে ১৯৮১ সাল এসেছে। তাই আশা নিরাশা-সংশয় দ্বন্দ্বে মন ব্যাকুলিত।

বহু অনিশ্চয়তার মধ্যে একটি সম্ভাবনা, অভাবিতের মধ্যে একটি ভাবনা এবং অপ্রত্যাশিতের গর্ভ থেকে একটি নিষ্ঠুর পরিহাস ক্রমেই স্পষ্ট হয়ে উঠছে এবং তা হল ভারত বিশ্বযুদ্ধে জড়িত হলে, ভারত কমিউনিষ্ট রাষ্ট্র হয়ে যাবে। গণতন্ত্রী ধুরন্ধর রাষ্ট্রনায়কদের বুদ্ধির ফলে প্রথম বিশ্বযুদ্ধে রাশিয়া এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে চীন ও পূর্ব ইউরোপে কমিউনিজম বিস্তৃত হয়েছে। তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধকাল হল ভারতের পালা। এ কথা বলছি এই কারণে যে, যুদ্ধরত অবস্থায় ভারতের উপর সোভিয়েত প্রভাব প্রচণ্ড ভাবে বৃদ্ধি পাবে এবং সেই সুযোগে ভারতীয় কমিউনিষ্টরা রাষ্ট্র ক্ষমতা দখল করবে।

অতীতের ব্যর্থ রাজনীতিকদের উত্তরসূরিরা হয়ত সেই কারণেই বিশ্বের বৃহত্তম গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রকে কমিউনিষ্ট জোটের দিকে ঠেলে দিচ্ছেন। নতুবা তারা হটাৎ পাওয়া বন্ধু লাল চীন এবং উগ্র ধর্মীয় রাষ্ট্র স্বৈরাচারী পাকিস্থানের সঙ্গে জোট বাঁধতে এত আগ্রহী হয়ে উঠবেন কেন। পাকিস্থানকে অস্ত্র-সজ্জিত করেই বা তারা কেন বার বার ভারত আক্রমণে উৎসাহিত করবেন?

দুর্যোগময় সে সংকট থেকে উদ্ধারের একটি পথই আছে। দেশ যদি আঞ্চলিক, ব্যক্তিগত এবং দলীয়

(১৩ পৃঃ দেখুন)

দার্শনিক পণ্ডিত ত্রিপুরাশঙ্কর সেনশাস্ত্রী

—অনিলকুমার ভট্টাচার্য

বাংলা সাহিত্য, শিক্ষা এবং সংস্কৃতির ক্ষেত্রে পণ্ডিত ত্রিপুরাশঙ্কর সেন শাস্ত্রী বিশেষ খ্যাতনামা ব্যক্তি। প্রকৃত পাণ্ডিত্য যাকে বলে ত্রিপুরাশঙ্কর তা আয়ত্ত করেছিলেন। 'বিদ্যা দদাতি বিনয়ম্'—ত্রিপুরাবাবুর সঙ্গে যাঁরই পরিচয় ঘটেছে তিনিই জানেন এই সদ্য সরল হাস্যময় পুরুষটিকে যাঁর প্রশস্ত ললাটে চিন্তার বলীরেখা, কিন্তু কথাবার্তায়, আচার-ব্যবহারে—শিষ্টাচার, নম্রতা এবং ভদ্রতা। দারিদ্র্য যাঁর অলঙ্কার, বিদ্যা যাঁর ভূষণ, চারিত্রিক মহিমায় যিনি উন্নতমনা সেই স্বভাবশিশু ব্যক্তিটির প্রতি আকৃষ্ট হননি—ত্রিপুরাশঙ্করের অগণিত বন্ধু, পাঠক, ছাত্র-ছাত্রী সম্প্রদায়ের মধ্যে তা বিরল।

তাঁর সুদীর্ঘ জীবন শুধু অধ্যয়ন এবং অধ্যাপনায় কেটেছে। তিনি আচার্য, এবং আচার্য জীবনের সকল গুণেরই অধিকারী ছিলেন।

দর্শনের অধ্যাপক ত্রিপুরাশঙ্কর সাহিত্যচর্চায় বিশেষ মুন্সিয়ানায় পরিচয় দেন। ধর্ম-চিন্তায় তিনি ছিলেন শক্তি-সাধনার উপাসক। শুধু মন্দিরের শক্তি বিগ্রহের প্রতি ভক্তি বিশ্বাস এবং নিষ্ঠায় পরিসীমিত নয়—মহাশক্তির ভাবকেই এবং স্ফূর্তিকেই তিনি দেখেছিলেন তাঁর মানস-সাধনায়। বাংলা যুবশক্তির বিপ্লব-সাধনাকে তাই অভিনন্দিত করে গেছেন মাতৃ-সাধক দেশপ্রেমিক ত্রিপুরাশঙ্কর। পরাধীনতার শৃঙ্খলিতা দেশ-জননীর মুক্তিতে বিপ্লব-আন্দোলনের প্রতি প্রত্যক্ষ সম্পর্ক ছিল কিনা তা আমার জানা নেই,—তবে তাঁর রচনা পাঠ করে এবং ব্যক্তিগত আলাপ-আলোচনায় বুঝেছি বঙ্কিমের আনন্দমঠের ভবানন্দ সন্ন্যাসীর আদর্শকে তিনি মুক্তিপথ বলে মানতেন। দেশমাতৃকার ধ্যানে তিনি জননী এবং জন্মভূমিকে স্বর্গাদপি গরীয়সী জ্ঞান করতেন।

স্বামী বিবেকানন্দ কথিত মহাবাণী—'তুমি মায়ের জন্য বলি প্রদত্ত।'—এ ধারণাকে বহু জায়গায় তাঁর বহু রচনার মধ্যে স্বাক্ষরিত করে রেখেছেন।

পণ্ডিত ত্রিপুরাশঙ্কর সেন খাঁটি বাঙালি চরিত্রের এক মহান পুরুষ। শিক্ষায় দীক্ষায়, জ্ঞানে গরিমায়, চারিত্রিক মহিমায়, ঔদার্যে—গর্বিত বাঙালির তিনি ছিলেন উত্তম সাধক। আশী ঊর্ধ্ব বয়সেও দেখেছি—বার্ধক্যে তিনি অবনত নন। জরা তাঁকে গ্রাস করতে পারেনি। অকস্মাৎ পড়ে গিয়ে আহত হয়ে হাসপাতালে নীত হন। তার আগেও তিনি কর্মোদ্যম উচ্চচেতা ব্যক্তি। বাস্তব জীবনে অবস্থার দুর্বিপাকে, অর্থাভাব কিংবা কোন প্রকারের নৈরাশ্যে পীড়িত হয়ে তিনি কখনো পরাজয় স্বীকার করেন নি। Plain Living and High Thinking - এই ছিল তাঁর জীবনাদর্শ।

পূর্বেকার অখণ্ড বাংলার ঢাকার এক কলেজে আচার্য ত্রিপুরাশঙ্কর সেন ছিলেন দর্শনের লেকচারার। পার্টিশনের সময় পশ্চিমবঙ্গে সপরিবারে এসে তিনি এক বেসরকারী কলেজে দর্শনের অধ্যাপনার বৃত্তি গ্রহণ করেন। গায়ে পাঞ্জাবী, পরণে ধুতি, পায়ে স্যাণ্ডেল—অধ্যাপক ত্রিপুরাশঙ্করকে দেখেছি জ্ঞান পিপাসু, অধ্যাত্মবাদী, দার্শনিক এবং সাহিত্যাচার্য রূপে।

আচার্য ত্রিপুরাশঙ্কর সেন শাস্ত্রী পরলোকগত বাংলা-সাহিত্যের সমালোচক অধ্যাপক ভক্টর রবীন রায়, কবি শুদ্ধাসত্ত্ব বসু, বিশিষ্ট সাহিত্যিক শ্রীমতী বাণী রায় প্রভৃতি। আমিও ছিলাম সেই সঙ্গে। শিয়ালদহ এক্সপ্রেসে আসানসোল যাত্রাকালে আমরা

ট্রেনের দু'খানি কামরায় পৃথক দলে বিভক্ত হয়ে যাত্রা করেছিলাম। তরুণদের দলে ছিলেন ডক্টর রথীন রায়, কবি শুদ্ধসত্ত্ব বসু, শ্রীমতী বাণী রায় প্রমুখ তরুণ সম্প্রদায়। পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়ও ছিলেন ওই দলে। আর তরুণ হয়েও আমি ছিলাম উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, সাংবাদিক নন্দগোপাল সেনগুপ্ত, অধ্যাপক ত্রিপুরাশঙ্কর সেনশাস্ত্রীর সঙ্গে থাকার কামরায়। পবিত্রদা এক এক স্টেশনে ট্রেন থামলে দু' কামরার সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করছিলেন। প্রথম থেকেই আড্ডা জমেছিল। রসিক পুরুষ উপেন্দ্রনাথ আসর জমিয়ে বসেছিলেন। এমন আড্ডার খবর পৌঁছাতেই দু' কামরা এক হয়ে গেল। উপেন্দ্রনাথ, ত্রিপুরাশঙ্কর এবং নন্দগোপাল সেনগুপ্তের সম্মেলনে এমন রসের আসর ছেড়ে ট্রেনের অপর কক্ষে কেউই আর পৃথক থাকতে চান না।

আসানসোলে অনুষ্ঠিত তিনদিনের সকাল সন্ধ্যার সাহিত্য অধিবেশন শেষে যে গৃহে আমাদের বাসস্থান সেখানেও ঠিক অনুরূপ ঘটনা ঘটেছিল। গৃহস্বামী ছিলেন আসানসোল কোর্টের প্রখ্যাত উকীল, অত্যন্ত সাহিত্য রসিক এবং অতিথি পরায়ণ। তাঁর বাড়ির ত্রিতলের দু'খানা ঘরে আমাদের থাকার জায়গা। ট্রেনের দুখানি কামরার মতন দু'দলে আমরা দুখানি ঘরে ছিলাম। নৈশ আহারের পর আড্ডা জমত। রাত কোথা দিয়ে পার হয়ে যেত তার হিসেব নেই।

বৃদ্ধদের ঘরে একদিন রাতে গানের আসর শুরু হল। প্রাচীনকালের রঙ্গ রস এবং বৈঠকী গান গাইছিলেন উপেন্দ্রনাথ। উপেন্দ্রনাথ বৃদ্ধ বয়সেও সুকণ্ঠের অধিকারী ছিলেন। নন্দগোপাল সেনগুপ্ত সঙ্গীত প্রিয়—তিনি খুয়ো ধরছিলেন। গান শুনে পাশের ঘর থেকে ছুটে এলেন তরুণ সম্প্রদায়। ঘরে সকলের শোওয়া-বসার মতন প্রশস্ত স্থান না থাকলেও কি হয়—'যদি হও সুজন, এক কম্বলে দশজন'—এই উদার নীতিতে আমরা সবাই এক ঘরে মিলিত হলাম।

রসিক উপেন্দ্রনাথ অনুরোধ জানালেন দার্শনিক ত্রিপুরাশঙ্করকে গান গাইবার জন্যে। আমরা সবাই সোল্লাসে তা সমর্থন করলাম। ত্রিপুরাশঙ্করা পড়লেন বিপাকে—গান তিনি জানেন না।

'তাই কি হয়? কণ্ঠে সুর না থাকলেও প্রাণে কি সুরের অভাব আছে?'

অগ্রজ উপেন্দ্রনাথের কথা ঠেলতে পারলেন না ত্রিপুরাশঙ্কর। গাইলেন, 'আমার মাথা নত করে দাও হে তোমার চরণ ধূলার তলে।'

কণ্ঠের নয় প্রাণের আকুতিতে ভরা ত্রিপুরাশঙ্করের সে গানের কথা আজও আমার স্মৃতিপটে আঁকা।

৮২ বছর বয়সে ত্রিপুরাশঙ্কর পরলোক গমন করলেন। 'একে একে নিভিছে দেউটি—বাঙালির ঘরে আর প্রদীপের শোভা নেই। স্বগৃহে প্রবাসীর জীবন, খণ্ডিত ভঙ্গুর অপবাদ ক্লিষ্ট বাঙালি আজ কোথায় নেমে চলেছে।

চিন্তার ক্ষেত্রে অগ্রগামী বাঙালি মনীষীর শেষ প্রদীপটি বুঝি নির্বাণোন্মুখ। নৈরাশ্য, নৈরাজ্য, লোভ, লালসা, কামনা, স্বার্থপরতা এবং অপ-সংস্কৃতিময় সমাজ-জীবনকে পুনরুজ্জীবিত করার মতন ব্যক্তি পুরুষ বাঙালি-সমাজে দিনে দিনে বিরল হয়ে আসছে। মেকলের সেই প্রশস্তির বাণী—'What Bengal thinks to-day India thinks to-morrow,—এখন বুঝি শুধুমাত্র প্রবাদ বাক্য। সূর্যকে দেখার দৃষ্টিকে হারিয়ে ফেলেছি আমরা। এমন দিনে সুপণ্ডিত প্রাজ্ঞ দার্শনিক

ত্রিপুরাশঙ্করের মৃত্যু বাঙালী সমাজের জাতীয় ক্ষতি।

ঘরে-বাইরে অন্ধকার। জ্ঞানী গুণীর মর্যাদা দিতেও আজ আমরা ভুলে গেছি, এ আমাদের জাতীয় দৈন্য। তা না হলে ত্রিপুরাশঙ্কর সেনশাস্ত্রীর মতন আচার্যদের প্রতিও আমরা জাতীয় কর্তব্য পালন করি নে কেন?

পিতৃসম গুরুজনদের স্বীকৃতি দান আমাদের শাস্ত্রীয় বিধি। পরম পরিতাপের বিষয় সব সময় নত হয়ে উন্নতদের প্রতি শ্রদ্ধা-দৃষ্টি দিতে আমরা ক্রমশ ভুলে যাচ্ছি। নিম্নস্তরের দলীয় সংকীর্ণতায় আমরা উদারচেতাদের চিনি না, জানি না। সংস্কৃতির প্রশস্ত ক্ষেত্রে এই হীনমন্যতা জাতির অধঃপতনেরই নিদর্শন। দুঃখের কথা এই যে ত্রিপুরাশঙ্করের প্রয়াণের সংবাদ আধুনিককালের বড় বড় সংবাদপত্রে মাত্র কয়েক লাইনের সংবাদরূপে পরিবেশিত হল! অথচ কত কত প্রতিবেদনের বাহার সংবাদপত্রে পাঠ করি সাধারণ সাংবাদিক তথাকথিত কবি লেখক এবং শিল্পীর ক্ষেত্রে। 'বিপ্লবী বাংলা' বাগ্মী ত্রিপুরাশঙ্কর সম্পর্কে কিছু আলোচনার যে স্থান দিলেন তার জন্যে ধন্যবাদ জানাই।

●

জীবনলাল সহযোগী ও অনুরাগী সম্মেলন

মহাশয়/মহাশয়া,

আগামী ১৭ই জানুয়ারী, ১৯৮১ শনিবার সেন্ট্ পল্‌স্ ক্যাথিড্রালের প্যারিস হলে দশম জীবনলাল সহযোগী ও অনুরাগী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হইবে। বেলা দশটায় অনুষ্ঠান আরম্ভ হইবে। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করিবেন শ্রীসতীভূষণ সেন। অই অনুষ্ঠানে আপনার উপস্থিতি ও আলোচনায় অংশগ্রহণ বিশেষভাবে কামনা করি। অনুষ্ঠান প্রসঙ্গে আপনার অর্থানুকূল্য কামনা করি।

— আহ্বায়কগণ —

সুধীর ঘোষ রাখাল দাস পূর্ণানন্দ দাসগুপ্ত অমিয় মণ্ডল
গণেশ সরখেল বিভাস রায় বীরেশ্বর ব্যানার্জী শিখা গাঙ্গুলী
ইন্দুভূষণ বসু জয়ন্তী কর্মচৌধুরী (চাম্পনা)

—: যোগাযোগ কেন্দ্র :—

শ্রীবাদল চ্যাটার্জী

২৪১, বি, বি, গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট,

কলিকাতা-৭০০ ০১২

একটি আলোচনা চক্রে

—কৃষি সাংবাদিক

গত ২৬শে ডিসেম্বর নদীয়া জেলার কৃষি বিভাগে উদ্যোগে চাকদহ রামলাল একাডেমীকে জেলার বিভিন্ন ব্লকের দুই শতাধিক কৃষকের একটি কার্যকরী আলোচনাচক্র হলো। সারাদিনের এই আলোচনা-চক্রে সভাপতিত্ব করেন স্বনামধন্য কৃষি বিজ্ঞানী ও পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বিশেষ আধিকারিক ডঃ শুধাংশু ভূষণ চট্টোপাধ্যায়।

আলোচনার উদ্দেশ্য বর্ণনা করে জেলার মুখ্য কৃষি আধিকারিক শ্রীত্রিদিবেশচন্দ্র কর বলেন ভাল জাতের কলা উন্নত প্রথায় চাষ করে এবং আমের রোগ পোকা সময় মত সঠিক উপায়ে প্রতিরোধ করে নদীয়ার চাষীরা অর্থকরী দিক দিয়ে আরও যাতে লাভবান হতে পারেন সেই উদ্দেশ্যেই তিনি পঞ্চায়েত সমিতির সহযোগীতায় বিশেষজ্ঞদের সাথে কৃষকদের এই আলোচনাচক্রের আয়োজন করেছেন।

সভাপতির ভাষণে ডঃ চট্টোপাধ্যায় বলেন কৃষি বহুমুখী করে কৃষি কার্য্যে আরও বেশী লাভ করতে হবে। নদীয়ায় কলা চাষের বিশেষ সম্ভাবনা রয়েছে এবং সময় মত আমবাগানের যত্ন নিয়ে এবংবৈজ্ঞানিক চিন্তাধারা নিয়ে নূতন আম বাগান করে নদীয়ার কৃষকেরা কৃষিকে ব্যাবসায়িক ভিত্তিতে নিয়ে যেতে পারেন। নদীয়াতে যে নূতন ৬০ বিঘা জমির চাষ এবার করা হয়েছে আগামী বছরে এর বহুগুণ সম্প্রসারণের সম্ভাবনা আছে।

উন্নত প্রথায় কলা চাষ করে কৃষকেরা কিভাবে বেশী লাভ করতে পারেন সে সম্বন্ধে জেলা কৃষিবিদ শ্রীবিষ্ণুপদ চাকলাদার বিশদভাবে আলোচনা করেন। আমের প্রধান রোগ ওকীট শত্রু কি, কেন কি উপায়ে প্রতিরোধ করলে আমের আরও অনেক বেশী লাভজনক ফলন পাওয়া যাবে সে বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা করেন জেলার শস্য সংরক্ষণ আধিকারিক শ্রীপবিত্র মোহন সরকার। ডঃ বি, রায় ক্রুট বাইওকেমিষ্ট সকলকে বুঝিয়ে বলেন সংরক্ষণের নানা পদ্ধতি। সহকারী উদ্যানতত্ত্ববিদ শ্রীবিমল রঞ্জন বসাক ও শ্রীহিমেন্দ্র কুমার রায় ফল উৎপাদন পরিকল্পনা ও সঙ্কীর্ণ উন্নত প্রথায় চাষ বিষয়ে আলোচনায় অংশ নেন। আম চাষে বিশেষজ্ঞ চাষী শ্রীসন্তোষ কুমার রায় ফলন তৈরীর উন্নত প্রথা নিয়ে বিশদ আলোচনা করেন।

কেচুয়াডাঙ্গার কলা চাষী শ্রীগৌর দেবনাথ, পারুরাডাঙ্গার শ্রীসুধাংশু গুহ, মহৎপুরের শ্রী আকবর আলী, মণ্ডল হাটের শ্রীঅজিত চৌধুরী, বালিয়ার শ্রীহেমেন্দ্র নাথ রায়, বলরামপুরের শ্রীসাধন দাস, সিলিগুর শ্রীবিশ্বেশ্বর রায়, শ্রীহরেন্দ্র চন্দ্র বর্দ্ধন প্রমুখ বহু চাষী আলোচনায় অংশ নেন।

চাকদহ পঞ্চায়েত সমিতির কর্মাধ্যক্ষ শ্রীবিমল কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, এই ধরণের সময়োপযোগী বৌথ আলোচনাচক্রের বন্দোবস্ত আরও যত বেশী হবে গ্রামের চাষীদের তত বেশী মঙ্গল।

মহকুমার কৃষি আধিকারিক শ্রীপ্রতীপ চন্দ্র লাহিড়ী চাকদহের কৃষি আধিকারিক শ্রীঅজিত মণ্ডল, শ্রীকমল ভট্টাচার্য্য ও শ্রী সন্তোষ কুমার পঞ্চায়েত সভাপতি শ্রীসফিয়র রহমানের এই বিষয়ে ঐকান্তিক প্রচেষ্টা বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

ভারতে বিপ্লব আন্দোলনের ইতিহাস

॥ ক্ষীরোদ দত্ত ॥

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

এ ছাড়া বালেশ্বর যুদ্ধে নিহত যতীন্দ্রনাথ ও তার সঙ্গীদের প্রশংসা কাহিনী বহু পত্র পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। ১৯২৩ সালে প্রকাশিত ভারতীয় পত্রপত্রিকা সাক্রান্ত বার্ষিক বিবরণী থেকে।

১৯৩৩-৩৪ সালে প্রকাশিত 'জয়েন্ট কমিটি রিহার্ট'-এর ভলিয়ম-২ ২৮ নং পৃষ্ঠায় বলা হয়েছে, '১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দের শেষ দিকে অবস্থা বিশেষ উদ্বেগজনক হয়ে ওঠে। দেশের মধ্যে ঐ সময় একটা বৈপ্লবিক সংগ্রাম গড়ে উঠছিল এতে কোনরূপ সন্দেহ নাই। এমন কি স্বরাজ্য দলের নেতা চিত্তরঞ্জন দাসও একথা স্বীকার করেছেন। এই বৈপ্লবিক সংগ্রামের শক্তি দিন দিনই বেড়ে যাচ্ছিল। ১৯১৬ সালের মত এবারেও সাধারণ আইনের সাহায্যে এ দমন করা সম্ভব হয় নাই। এ জন্য বাঙলা সরকার বড়লাটের নিকট আবেদন করে এক বিশেষ আইন জারী করে। এই আইন বা অর্ডিনান্স ছিল ভারত রক্ষা আইনের অনুরূপ।'

১৯২৪ সালের পঁচিশে মে নূতন আইন বেঙ্গল অর্ডিনান্স জারী করা হয়। ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে এই অর্ডিনান্সকে আইন সভার সাহায্যে সাধারণ আইনে পরিণত করার চেষ্টা হয়। কিন্তু স্বরাজ্য দলের উপস্থিতির জন্য এ পাশ হয় না। বাঙলা গভর্নরের বিশেষ ক্ষমতা বলে পাঁচ বছরের জন্য এক স্থায়ী আইন করে নেওয়া হয়। ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসের মধ্যে ১৮৭ জন বিপ্লবী নেতা ও কর্মীকে ১৮১৮ সালের তিন আইনে অথবা এই নূতন অর্ডিনান্সে আটক করা হয়। তরুণ বাঙালী বিপ্লবীরাও সরকারের এই আক্রমনাত্মক মনোভাবকে প্রতি আক্রমন দ্বারা রোধ করতে চাইলেন। ১৯২৪ সালের ৩রা ফেব্রুয়ারী বরিশালে বিপ্লববাদী পুস্তিকা বিতরিত হয়। এই সম্পর্কে রবীন্দ্র কর নামে এক যুবক গ্রেপ্তার হন।

পূর্বেই বলা হয়েছে যোগেশচন্দ্র উত্তর প্রদেশে যাওয়ার পরে শচীন্দ্রনাথ সান্যাল বাঙলা দেশে এসে ভবানীপুরে প্রাণনাথ পণ্ডিত ষ্ট্রীটে এসে বাস করতে থাকেন। ঐ সময় তিনি বাঙলার কর্মীদের বিশেষ করে দক্ষিণ কলিকাতার কর্মীদের সংস্পর্শে থাকেন। বোমা প্রস্তুত প্রণালী শিক্ষা দেবার জন্য যতীন্দ্রনাথ দাসকে পূর্বেই বাঙলার বাইরে যাবার অনুমতি দেওয়া হয়েছিল। এই সুযোগে অনুশীলন সমিতির অন্যান্য কর্মীরাও শচীন্দ্রনাথ সান্যালের সঙ্গে মেলামেশা আরম্ভ করেন। এদের মধ্যে ছিলেন ধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, দেবেন্দ্রনাথ বসু, সুশীল বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতি চ্যাটার্জী, বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়। বিনয় রায় প্রেমরঞ্জন সেন প্রভৃতি। যতীন্দ্রনাথ দাস এবং প্রেমরঞ্জন সেন একদিন বর্মা অয়েল কোম্পানীর দরোয়ানের চোখে ধূলা নিক্ষেপ করে তার কাছ থেকে পাঁচ হাজার টাকা নিয়ে আসেন। ১৯২৪ সালের ডিসেম্বর মাসে শচীন্দ্রনাথ বিপ্লবী ইস্তাহার বিলি সম্পর্কে গ্রেপ্তার হন। তাকে কলকাতাতেই গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। কিন্তু তার বিরুদ্ধে রাজদ্রোহের মামলা হয় বাঁকুড়ায়। তিনি দুই বৎসর কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। এর অল্পদিন পরে যতীন্দ্রনাথ এবং অনুশীলন সমিতির আরও অনেক কর্মী বেঙ্গল অর্ডিনান্সে গ্রেপ্তার হন।

তরুণ কর্মীরা একটা কিছু করবার জন্য উতলা হয়ে পড়েছিলেন। এর মধ্যে ছিলেন বিপিন বিহারী গাঙ্গুলীর দলের কর্মীরা, যুগান্তরের বিভিন্ন দলের এবং

এদের সঙ্গে এসে জুটেছিলেন অনুশীলনের কিছু কর্মীও। নেতাদের সম্পূর্ণভাবে তারা বিশ্বাস করতে পারছিলেন না। বোমা তৈরী করে তাড়াতাড়ি কিছু একটা 'এক্সন্' করাই তাদের উদ্দেশ্য ছিল। তাদের চোখের উপরে তারা দেখছেন বাঙলার বাইরে তরুণ দল 'এক্সন্'-এর পর 'এক্সন্' করে চলছেন। তাছাড়া দীর্ঘকাল ধরে বাঙলার বুকে কোন প্রকার বৈপ্লবিক কার্য্যকলাপ নাই এ তাদের কাছে অসহনীয় হয়ে পড়েছিল।

(চলবে)

(৪র্থ পাতার পর)

ক্ষুদ্রতাকে ভুলে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয় এবং বিপ্লবী যুগের ত্যাগ ব্রত গ্রহণ করে, তাহলে অমল বীর্যসত্তা ও তেজ প্রবাহে সকল সংশয় কুয়াশা ছিন্ন হবে। আত্মদানের সংকল্পই পারে সংকীর্ণ স্বার্থ ও ভেদবুদ্ধির গণ্ডী ভেঙ্গে দিয়ে জাতিকে স্বনির্ভর, সাহসী ও শক্তিশালী করতে।

১৯৮১ হয়েছে বিশ্ব পানীয় জল সমস্যার সমাধান বর্ষ। শিশুবর্ষ ও নারী বর্ষে যা হয়েছে, জলদান বর্ষে কাজ তার চেয়ে ভাল হবে বলে সবাই আশা করে। তার জন্য যে আন্তর্জাতিক শান্তি ও সহমর্মিতা প্রয়োজন আমরা তাই কামনা করি।

পরলোকে বিশিষ্ট স্বাধীনতা সংগ্রামী

বরিশাল জেলার স্বাধীনতা সংগ্রামী ভবরঞ্জন গাঙ্গুলী গত ১১। ১২। ৮০ তারিখে এস, এস, কে, এম, হস্‌পিটাল-এ পরলোক গমন করেছেন। তিনি বরিয়ান বিপ্লবী নেতা শ্রীঅশ্বিনী গাঙ্গুলীর ভ্রাতুষ্পুত্র।

প্রয়াত বিপ্লবীর আত্মার শান্তি কামনা করি ও তাঁহার পরিবার বর্গকে আমাদের সমবেদনা জানাই।

পরলোকে প্রবীণ বিপ্লবী পরেশ মৌলিক

গত সোমবার ২২-১২-৮০ তারিখে সুভাব গ্রামের বাসায় প্রবীণ বিপ্লবী পরেশ মৌলিক পরলোক গমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭০ বৎসর। ঢাকা জিলার কেওকা গ্রামে তাঁর বাড়ী ছিল।

তাঁর কর্মস্থল ছিল ঢাকা বিক্রমপুর। স্বাধীনতা আন্দোলনে তাঁর অবদান অবিস্মরণীয়।

আমরা এই বিপ্লবীর অমর আত্মার শান্তি কামনা করি এবং তাঁর পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানাই।

Freedom fighters whose pension has been sanctioned

Name	Address	Amount p. m. Rs.	Date
	November—1980		
	Dist —C \LCUTTA		
Basu Mazumdar Sailesh Ch.	10/6 Netajinagar, Cal—41	300	1 8 80
Chatterjee Smt Mukti	24 Sardar Sankar Road	200	1 8 80
w/o Late Kshetra Gopal Chatterjee			
Dutta Shibapada	11/1 Joy Krishna Paul Road	200	2 7 76
	Calcutta—38	300	1 8 80
Ghosh Smt Umasashi	14, Lake Avenue	200	1 8 80
w/o Late Barendra Kr. Ghosh	Calcutta—26		
Ghosh Nabagiban	'Jnana Shree' 60/1 Central Rd. Cal, 32	300	1 8 80
Mukherjee Ashutosh	64/1 Lenin Sarani Cal—13	300	1 8 80
B. Narayan	28/2D, Beniapukur Rd. Cal. 14	300	1 8 80
Roy Naresh Chandra	45/4 Manujendra Dutta Rd. Cal. 28	300	1 8 80
Sarkar Smt Suprov	8/1A/1 Keyatala Road	300	1 8 70
w/o Late Ashis Chandra	Calcutta—29		
Sengupta Fakir Chandra	48/71A Prince Anwar Shah Rd Cal 45	300	1 8 80
Sengupta Smt Parul	Block A Flat No. 3 L.I.G,H. Estate	100	27 1 80
w/o Late Dhirendra Ch	37 Belgachia Road Calcutta 37	200	1 8 80
	Dist—24 PARGANAS		
Chakraborty Bibhuti Bhusan	Vill Manikpur P.O. Harinavi	300	1 8 80
Dey Smt Amala Bala	Scheme No, 5	150	21 12 79
w/o Late Atul Chandra		250	1 8 80
	Dist —HOOGHLY		
Ghosh Achal Chandra	Vill Alipur. P- O. Narayanpur	300	1 8 80
Sen Smt Karunamoyee	19 Khudiram Sarani	200	3 8 80

	Dist—HOWRAH		
Bag Balai	P. O. & Vill Khalna P. S, Amta	300	1 8 80
	Dist—BURDWAN		
Modak Tarapada	P. O. & Vill Patuli (Burdwan Dist) & c/o Biswnath Mistanna Bhnndar Camp—2 Bhila, Dist—Durg P.O. Khushipur (Madhya Pradesh)	300	1 8 80
	Dist—BIRBHUM		
Sarbanom Ganesh Kr.	P .O & Vill Imambazar	300	1 8 80
Sarkar Santi Kr.	Debendraganj (Bolpur) P.O, Bolpur	300	1 8 80
	Dist—MIDNAPUR		
Das Haripad	P. O. & Vill Dalsbai	303	1 8 80
Gajendra Mahapatra	Vill Naradari	303	1 8 80
	P. O. Byabatterbat	300	1 8 10
Jana Benode Behari	Vill Jagatpuri P. O. Patanada	300	1 8 80
Pal Trilochan	P. O. Garchakraberia	300	1 8 80
Purkait Pravat Kumar	P O. & Pankhal	300	1 8 80
Samanta Janardan	P. O.& Vill Manuchak	300	1 8 80
	Dist—MAL A		
Bhattacharjee Nani Gopal	Chotta Karkhana Lane, Puratoli P[O. Malda	300	1 8 83
Das Smt Shephali Rani w/o Late Kshitish Ch.	Fulberia P. S. English Bazar Dist—Malda	200	1 8 80
	Dist—DARJEELING		
Bania Hazari Ram	Vill Khalpara P. O. Siliguri	300	1 8 80
	Dist—COOCHBIHAR		
Chakraborty Krishna Das alias Himangshu Kr. Chakraborty	Coochbehar	300	1 8 80

14 JAN 1981

RgedNo.R. N. 24511/71 | Biplabi Bangla | Regd. WB/NC 77

Phone : 34-1795

বার্ষিক :—সডাক ১৫.০০ টাকা | ষাণ্মাসিক :—৮.০০ টাকা | মূল্য—

130

॥ সম্পাদকমণ্ডলী ॥

সভাপতি—
শ্রীজগদীশ চট্টোপাধ্যায়

সম্পাদক –
শ্রীশান্তিশরণ রায়চৌধুরী

সহ-সম্পাদক—
মলয় ঘোষ

সদস্য—
শ্রীউমেশচন্দ্র নন্দী
পুষ্প চ্যাটার্জী

প্রকাশক ও মু
শ্রীঅনিল [illegible]

দিল্লীর বিশেষ প্রতিনিধি—
শ্রীবারীন ঘোষ

খোলা—
শ্রীনন্দগোপাল পাল

অনুশীলন সতীর্থ বার্ষিক প্রীতি সম্মেলন—১৯৮১

স্থান—মহারাজ ত্রৈলোক্য চক্রবর্ত্তী ও শহীদ যতীন দাস স্মৃতি সমিতি প্রাঙ্গন

৪৭, চণ্ডীতলা লেন, টালীগঞ্জ, কলিকাতা-৪০

প্রিয় সতীর্থ,

অনুশীলন সমিতি সতীর্থগণের বার্ষিক প্রীতি সম্মেলন এবার ১১ই জানুয়ারী, ১৯৮১, রবিবার উপরোক্ত স্থানে (টালীগঞ্জ ট্রাম ডিপোর অনতিদূরে, চালিহা রোলিং মিল ষ্টপেজ) সারাদিনব্যাপী অনুষ্ঠিত হইবে।

অনুষ্ঠানে আপনার যোগদান ও সর্বতোভাবে সহযোগিতা প্রার্থনা করি।

ইতি - ৭।১২।৮০

বিনীত—
পূর্ণানন্দ দাশগুপ্ত
শচীন্দ্রনাথ গুহঠাকুরতা

: অনুষ্ঠান সূচী :

সকাল ৯-১০ ঘটিকা : জাতীয় পতাকা উত্তোলন, জাতীয় সঙ্গীত, শহীদ বেদীতে মাল্যদান ও শ্রদ্ধা নিবেদন।

সকাল ১০-১১ ঘটিকা : প্রীতি বিনিময় ও চা পানের ব্যবস্থা।

মধ্যাহ্ন ১১-৩০ হইতে ২-৩০ পর্য্যন্ত মধ্যাহ্ন আহার।

অপরাহ্ন ৩-৫ ঘটিকা : স্মৃতিচারণ, সমাপ্ত সঙ্গীত।

মূল কার্যালয়—৪নং বল্লভ দাস ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০০৭ শ্রীঅনিল সেনগুপ্ত কর্তৃক প্রকাশিত এবং তৎকর্তৃক প্রিন্টিং পাবলিসিটি, কেশবচন্দ্র সেন ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০০৯ হইতে মুদ্রিত।

বিপ্লবী বাংলা

॥ বিপ্লবী পরিষদের সাপ্তাহিক মুখপত্র ॥

স্থাপিত—১৯৫৬, 'বিপ্লবী বাঙ্গালী' নবকলেবরে—১৯৭৯

দশম বর্ষ ● ১৩ সংখ্যা

● শনিবার ২৬শে পৌষ ১৩৮৭, ১০ই জানুয়ারী ১৯৮১ ●

বেশীর ভাগ রাজনীতিবিদের কাছে রাজনীতি মূল্যবোধহীন এক ধরণের বৃত্তি ছাড়া আর কিছুই নয়। এই মূল্যবোধের অভাবেই রাজনীতিতে দেখা দিচ্ছে ক্ষমতা-লোলুপতা ও হিংসা। এই মূল্যবোধ ফিরিয়ে আনতে না পারলে রাজনীতি আমাদের ধ্বংসের পথে নিয়ে যাবে।

—শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী

সম্পাদকীয়

মূল্যবোধহীন রাজনীতি কোথায় নিয়ে যাবে

ভারতবর্ষকে স্বাধীনোত্তর যুগে একটি গণতান্ত্রিক ধর্ম নিরপেক্ষ ও সমাজতান্ত্রিক দেশরূপে গড়ে তুলবার অঙ্গীকার স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে আমাদের সংবিধানে। কিন্তু গণতান্ত্রিক কাঠামোকে সফল করতে হলে একটি সহ মতের মাধ্যমে কাজকর্ম করা একান্ত প্রয়োজন। কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে কোন নীতি সম্বন্ধে কোন প্রকার আলাপ আলোচনা চলবে না, বা সুস্থ গঠনমূলক সমালোচনাকে বন্ধ করে দেওয়া হবে। তাই গণতান্ত্রিক কাঠামোতে সুস্থ সবল বিরোধী দলের প্রয়োজন অনস্বীকার্য্য। কিন্তু বিরোধী দল শুধু বিরোধীতার জন্য বিরোধিতা করবে না, এটাও সুবোধসঙ্গত। জাতীয় সমস্যার সমাধানে, সরকারের সঙ্গে সর্বপ্রকারে সহযোগিতা করা বিরোধী দলগুলির অবশ্য কর্তব্য। কিন্তু দুর্ভাগ্য-ক্রমে আমাদের দেশে যারা বিরোধী দল বলে পরিচিত, তারা তাদের কর্তব্য পালন করছেন না এ সম্পর্কে। তারা তাদের সব কার্য্যসূচী নিয়ন্ত্রিত করেন, একটি মাত্র উদ্দেশ্য নিয়ে এবং সেটা হল, যেন তেন প্রকারেণ গদী দখল করা। এমন কি জাতীয় স্বার্থকেও ক্ষুণ্ন করতে দ্বিধাবোধ করেন না। তার ফলশ্রুতি হয় দেশের সংহতি ও ঐক্যের বিনষ্টি, দেশের অগ্রগতির বাধাপ্রাপ্তি, সংক্ষেপে দেশ ও জাতির স্বার্থনাশ। এই নীতি অনুসরণ করলে বিরোধী দল কখনও দানা বেঁধে উঠতে পারে না। দলের মধ্যে ভাঙ্গন সৃষ্টি হয় উপদল। এর জলন্ত প্রমাণ এই দেশের বিরোধী দলগুলির ইতিহাসের মধ্যেই মিলবে। বিরোধী দল বলে দেশে স্বীকৃতি পেতে চান যারা, তাদের ভেবে দেখার সময় এসেছে যে তাদের নীতি ও কার্য্য-ক্রমের আমূল বদল না করলে, তাদের কোন ভবিষ্যৎ নেই। বিভিন্ন স্বাধীন দেশে বিরোধী দলেরা যে স্বীকৃতি ও সম্মান পেয়ে থাকেন, তা এরা পাবেন না কোনদিন। দল, উপদল, গোষ্ঠী বা ব্যক্তির স্বার্থকে প্রাধান্য না দিয়ে দেশের স্বার্থ-সাধনকেই সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিতে না পারলে, দেশের জনগণের দ্বারা অপাংক্তেয় ও বর্জনীয় হবেন।

অতীত দিনের ব্যর্থতা ও গ্লানির অভিজ্ঞতায়, বিরোধী দলগুলির শিক্ষা-গ্রহণ করা উচিৎ এবং নতুন অধ্যায়ের সূচনা করা উচিৎ। ভারতে প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী তাদের সামনে একটি চমৎকার সুযোগ উপস্থাপিত করেছেন। সাংবাদিকদের সঙ্গে কথাবার্তা বলার সময় তিনি দ্বিধাহীন কণ্ঠে বলেছেন যে জাতীয় সমস্যা সমাধানে তিনি বিরোধীদের সহযোগিতা চান এবং তিনি কোন রকম সংঘর্ষের বিরোধী। বিরোধীদের সঙ্গে তিনি আলাপ আলোচনা করতেও প্রস্তুত। তবে তিনি এই কথাও বলতে চান নি যে বিরোধীরা সরকারপক্ষের স্তাবক হয়ে উঠুন। তিনি বলেছেন যে যেকোন প্রশ্নেই বিরোধীরা সরকারের বিরুদ্ধে যেতে পারেন। তবে কিছু কিছু সমস্যা আছে যা জাতীয় সমস্যা বা জাতীয় স্তরের এইসব সমস্যার ক্ষেত্রে বিরোধীরা সরকারের সঙ্গে সহযোগিতার বদলে চেষ্টা করছেন সরকারকে বেকায়দায় ফেলতে। শ্রীমতী গান্ধী আরো বলেছেন যে দেশের অধিকাংশ সমস্যার মোকাবিলা করা কোন একটি দল বা সংস্থার পক্ষে সম্ভব নয়। এর জন্য সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টা চাই। এই উদাত্ত ও আন্তরিকতাপূর্ণ আবেদনে সাড়া দিয়ে বিরোধী দলগুলি দেশের মঙ্গলযজ্ঞে আত্মনিবেদন করতে কি এগিয়ে আসবেন না? নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করবার এমন সুবর্ণ সুযোগ কি তারা হেলায় হারাবেন?

তবে একাজ করতে হলে এই দলের মানসিকতার আমূল পরিবর্তন করতে হবে। তাদের সমস্ত অন্তর দিয়ে অনুভব করতে হবে শুধু বিরোধিতা করা অর্থই হবে নিজেদের শক্তির অবক্ষয়, দেশের ক্ষতি-সাধন ও শেষ পর্যন্ত নিজেদের অবলুপ্তির পথ প্রস্তুত ও প্রশস্ত করা। একটি উদাহরণ দিলেই এই সত্য হৃদয়ঙ্গম করা সহজ হবে। দেশের মধ্যে সাম্প্রদায়িকতা, আঞ্চলিকতা, প্রাদেশিকতা, জাতিভেদে প্রবণতা, বিচ্ছিন্নতাবাদ ও দেশের সংহতি ও ঐক্য বিনষ্টকারী মনোভাব ও আন্দোলনকে প্রশ্রয় দিলে, কারো কল্যাণ সাধিত হবে না, এটা হস্তীমূর্খ ভিন্ন সকলেই স্বীকার করবেন। আজ এই সব সমস্যার কোন অর্থবহ সমাধান ত কোন দলই দিতে পারেন নি। এই লজ্জার কলঙ্ক থেকে তারা কি মুক্ত হতে পারবেন কোনদিন দেশের চরম সর্বনাশ ঘটলে, কি বিরোধী দলের নেতা গভীর দুঃখের সঙ্গে স্বীকার করেছেন যে এদেশের বিরোধী দলগুলির মতিগতি হল যে যদি কেউ বলে সূর্য পূর্বদিক থেকে ওঠে, তৎক্ষণাৎ তারা বলবেন সূর্য পশ্চিম দিক থেকে ওঠে। ছোটখাট ঘটনাকে ফাঁপিয়ে তুলে দেশব্যাপী একটা অবস্থিকর অবস্থার সৃষ্টি করলে, দেশের অগ্রগতিকেই ব্যাহত করা হবে। দেশের মানুষকে যুক্তিহীনভাবে উত্তেজিত করলে কি পরিণতি হয়, তার প্রমাণ বহুল পরিমাণে প্রকট হয়ে উঠেছে। শুধু দাবী আদায় করা হবে, কিন্তু নিজেদের কর্তব্য কাজ করা হবে না, এটা কোন দেশে কোথায়ও কি চলতে দেওয়া হয়? যেখানে চলতে দেওয়া হয়, সেখানে দেশের ধ্বংস প্রাপ্তির সম্ভাবনাকেই সুনিশ্চিত করা হয়। এ রকম দায়িত্বহীন কাজকর্মের দ্বারা ক্ষমতাসীন প্রশাসক দলকে অসুবিধায় ফেলা যায় সাময়িক ভাবে সন্দেহ নেই। কিন্তু গণতান্ত্রিক দেশে ক্ষমতার আসনে পালা বদল ঘটে। তখন যদি বর্তমান উদ্ধানীদাতা দল ক্ষমতাসীন হন, তবে তাদের ভবিষ্যৎ কি হয়, ১৯৭৭ সালে বিপুল ভোটাধিক্যে জয় লাভ করা সত্ত্বেও। জনতা দলের শোচনীয় ব্যর্থতা প্রমাণ করে দিয়েছে। আজো দল বিশেষের কোন কোন

নেতা। আসামে অনশনের প্রহসন সুরু করেছেন, অথচ তাদের কার্যকালের মধ্যেই আসামের এই দুষ্ট আন্দোলনের সূত্রপাত হয়। মানুষ খুন করছে যারা, মানুষের ঘর-বাড়ীতে আগুন ধরিয়ে দিচ্ছে যারা, হাজার হাজার মানুষকে কোন সঙ্গত কারণ ব্যতিরেকেই যারা ঘরবাড়ী ছাড়া করছে, তাদের বিরুদ্ধে নিন্দাবাদ নেই, নেই কোন ধিক্কার। শুধু পুলিশকেই দোষ দিলে চলবে? তা ভিন্ন আসামের আন্দোলনের ফলে প্রতিক্রিয়া হিসাবে যদি অন্য রাজ্যেও এই রকম কাজকর্ম সুরু হয়, তখন কি করে তার মোকাবিলা করা যাবে? রাজনীতি থেকে মূল্যবোধকে বিসর্জন দিয়ে, যারা রাজনীতিকে বৃত্তি হিসাবে গ্রহণ করে, নিজেদের জন্য সুখ সুবিধার অন্বেষণে অন্ধ হয়ে আছেন, তারাই শুধু এ রকম কাজ করতে পারেন। তবে অশান্তি, হিংসা ও আক্রোশের আগুন জ্বালিয়ে দিলে, তাদেরও সেই আগুনে পুড়ে মরতে হবে। কেউ বাঁচাতে পারবে না। সুতরাং সময় এসেছে আমূল পরিবর্তনের। নিজেরা না করলে, দেশের মানুষ তাদের বাধ্য করবে। নিজেদের স্বার্থ রক্ষার খাতিরে এটা ভুলে গেলে কারো পরিত্রাণ নেই।

প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর এই প্রসঙ্গে বক্তব্যটি প্রণিধানযোগ্য। অনুকরণযোগ্য। তিনি বলেছেন বেশীর ভাগ রাজনীতিবিদদের কাছে রাজনীতি মূল্যবোধহীন এক ধরণের ব্যবসা ছাড়া আর কিছু নয়। এই মূল্যবোধের অভাবেই রাজনীতিতে দেখা দিচ্ছে ক্ষমতা লোলুপতা ও দুর্নীতি। মূল্যবোধে ফিরিয়ে আনতে না পারলে রাজনীতি আমাদের ধ্বংসের পথে নিয়ে যাবে।

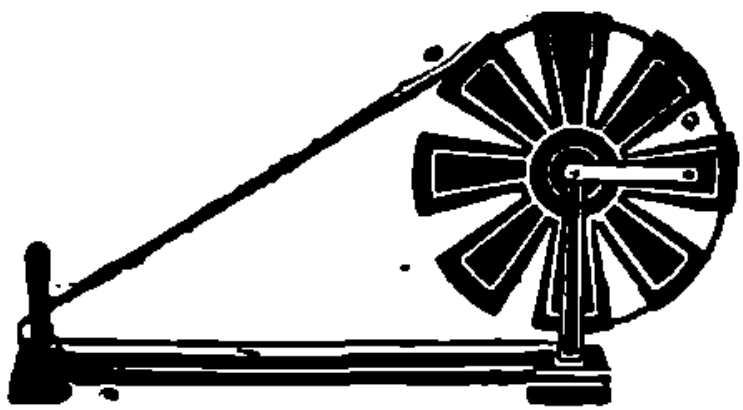

নৈরাশ্য ক্লান্ত বামফ্রন্ট সরকার

—কালীপদ সরকার

পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রন্ট সরকার কার্যতঃ সি, পি, আই (এম) সরকার। বিধান সভায় একক সংখ্যা গরিষ্ঠতা থাকায়, সি পি, আই (এম) ফ্রন্টের অপর শরিক দল গুলির সাহায্য ছাড়াই প্রশাসন চালাতে সক্ষম। এমন একটি সুস্থিত দলগত অবস্থা মার্কস বাদীরা আর কখনো পান নি। এ জন্য মার্কসবাদী-দের নিকট ছিল একান্ত অপ্রত্যাশিত। ১৯৭৭ সালের নির্বাচনে অকমিউনিষ্ট ভোট কংগ্রেস ও জনতা দলের মধ্যে ভাগাভাগির ফলে, প্রদত্ত ভোটের মাত্র এক তৃতীয়াংশ পেয়ে সি. পি, আই (এম) বিধান সভায় অধিকাংশ আসন অধিকার করতে সমর্থ হয়। সে বিচারে বামফ্রন্ট সরকার এ রাজ্যের নির্বাচকমণ্ডলীর অধিকাংশের সমর্থিত সরকার হন।

ডা: রায়ের আমল থেকে কংগ্রেসই পশ্চিমবংগে ক্ষমতাসীন ছিল। দু'বার যুক্তফ্রন্ট সরকারের ব্যর্থ-তার পর, ১৯৭৭ সালে সি, পি, আই (এম) যখন সরকার গড়ল তখন তাদের সমর্থক ছাড়াও বহু লোক বিশেষ করে শিক্ষিত বুদ্ধিজীবিদের এক অংশ আশা করেছিল যে, বিপ্লবপন্থী মার্কসবাদী সরকার আর কিছু করতে পারুন আর নাই পারুন তারা রাজ্যে একটি সৎ ও দক্ষ প্রশাসন গড়ে তুলবেন। সরকারের পাচ বছর মেয়াদের মধ্যে চার বছর অতি-ক্রান্ত প্রায়, বাকি এক বছর যাবে পরবর্তী নির্বাচনের প্রস্তুতি কর্মে, সুতরাং সরকারের পক্ষে নতুন বড় কিছু করার সুযোগ নেই। তাই বামফ্রন্ট তাদের শাসন কালে কি করেছে সঙ্গত কারনেই জনসাধারণ তা জানতে চায়।

গণতন্ত্রের প্রতিশ্রুতি এবং সংবিধানের প্রতি আনুগত্যের শপথ নিয়ে সরকার গড়ার পর, সি, পি আই (এম) প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি এবং শপথের মর্যাদা কিভাবে রক্ষা করেছে জনসাধারণকে তাও বিচার করতে হবে। চূড়ান্ত রায় দানের ক্ষমতা জনগণের।

প্রথমেই সরকারী কর্মচারী ও পুলিশের কথায় আসা যেতে পারে। কারণ প্রশাসনের তারা হল দুটি স্তম্ভ। সি পি আই এম ভোষণ ও পাইয়ে দেবার রাজনীতি করে প্রশাসন যন্ত্রের এই দুই বিভাগকে প্রথম থেকে দলভুক্ত করতে চেষ্টা করেছে। ধাপে ধাপে বেতন ও ভাতা বৃদ্ধি, কর্মচারীদের জন্য নতুন আচরণবিধি প্রণয়ন এবং ধর্মঘটের অধিকার সহ ট্রেড ইউনিয়নের অধিকার দানে এই অভিপ্রায় সুস্পষ্ট। এ সম্পর্কে জনসাধারণের কথা সরকার বিবেচনার মধ্যে আনার প্রয়োজন বোধ করেন নি। দেশের দীন দরিদ্রের কথাও ভাবেন নি। মুদ্রাস্ফিতির প্রসঙ্গ না হয় ছেড়েই দিলাম।

সরকারী কর্মচারী ও পুলিশকে দল নিরপেক্ষ গণ-তান্ত্রিক আচরণ বিধি অনুসরণের পরিবর্তে দলতন্ত্রে দীক্ষিত করার যে কাজে বামফ্রন্ট ব্রতী হয়েছেন, তার ফলে গণতান্ত্রিক শাসন কাঠামো ভেঙ্গে যেতে এবং কাজে ফাঁকি, বিশৃঙ্খলা এবং দুর্নীতি বেড়েছে

এ অভিযোগ বহু লোকের। খাস মহাকরণে বসে খুন্য স্ত্রীকে যখন বলতে হয় "কাজের কথা বলব কাকে? চেয়ারকে? তখন অফিস আদালতে কাজ কেমন চলছে বলে দেবার দরকার হয় না।

পুলিশকে নিষ্ক্রিয় করে দেওয়া এবং জঘন্য অপরাধে ধৃতিজনের তথাকথিত রাজনৈতিক কারণ দেখিয়ে মুক্তি দান পুলিশের মনোবল ক্ষুন্ন করেছে। দলীয় স্বার্থে পুলিশকে নিয়ন্ত্রণ ও ব্যবহার পুলিসের আইন মোতাবেক কাজ করারস্পৃহা ও কর্তব্য নিষ্ঠার উপর আঘাত হেনেছে। যার অবশ্যম্ভাবী ফল হয়েছে সমাজে চুরি, ডাকাতি, ছিনতাই মস্তানি এবং খুন খারাপির সংখ্যা বৃদ্ধি। এ অভিযোগ সমগ্র রাজ্যবাসীর।

বামফ্রন্ট সরকার যদি মনে করে থাকেন, পইতে দেবার রাজনীতি করে সরকারী কর্মচারীদের দলীয় আন্দোলনের হাতিয়ার করতে পারবেন তাহলে খুব সম্ভব ভুল করেছেন। কারণ এরা বসন্তের কোকিল।

কলিকাতা পুরসভা থেকে মফঃস্বল পুরসভাগুলি পর্যন্ত সর্বত্রই প্রায় নির্বাচিত কর্মপরিষদ বাতিল ঘোষিত। পুরসভাগুলি চালাচ্ছেন সরকার মনোনীত কর্মকর্তারা। তিন বছরের মধ্যে নির্বাচন অনুষ্ঠান সম্ভব হয় নি। এই হল সি পি আই (এম)-এর গণতান্ত্রিক চরিত্রের নমুনা।

পুরসভাগুলির কাজ কেমন চলছে যদি জানতে চান এবং কাজে অবহেলা সম্পর্কে যদি অভিযোগ করেন- কর্মসচিবের নিকট থেকে উত্তর পাবেন— টাকা নেই। টাকা থাকবে কেমন করে। পুরবাসীদের নিকট থেকে ট্যাক্স বাবদ যে অর্থ আদায় হয় তার প্রায় সবটায় খরচ হয় পুরকর্মীদের বর্ধিত বেতন ভাতা, সাজ সরঞ্জাম, পৌরভবন নবীকরণের দায় মেটাতে। মন্দ কথা নয় তো, কয়েক হাজার লোককে বসে বসে ভবন উজল করে রাখার জন্যই কি পুরবাসীরা ট্যাকের পয়সা খের করে ট্যাক্স গুণবে?

শিক্ষাক্ষেত্রের দিকে তাকান, দেখবেন সি পি আই (এম) ক্ষমতায় আসার পর, বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রাথমিক বিদ্যালয় অবধি অধিকাংশ বিদ্যায়তনের নির্বাচিত কর্মপরিষদ বাতিল হয়েছে। বাতিল পরিষদের স্থলে নিযুক্ত হয়েছেন পরিচালক। পরিচালকদের যোগ্যতার মাপকাঠি হল দলের সহিত তাদের সম্পর্কের গভীরতা। একটি প্রথম শ্রেণীর পরিচালক হওেছেন এক নন-মাট্রিক রেশন দোকানের মালিক। স্কুল কলেজের শিক্ষক নিয়োগের ব্যাপারে পুনর্বিচারের চেয়ে দল আনুগত্যের ছাপ বড় হয়েছে, ফলে শিক্ষালয়ে অসন্তোষ দেখা দিয়েছে এবং শিক্ষার মান হ্রাস পেয়েছে।

পাঠ্য পুস্তক নির্বাচনে কি হচ্ছে তা 'সহজ পাঠ' তুলে দেবার সিদ্ধান্তকে কেন্দ্র করে রাজ্য, জোড়া বিতর্ক থেকে কিছুটা খুবে নিন। 'সহজ পাঠ' একটি দৃষ্টান্ত মাত্র। জাতীয় ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি চেতনা মার্কসবাদীদের নিকট অবাঞ্ছিত। ছোট বয়সের ছাত্রদের মার্কসীয় শ্রেণী সংগ্রামের তত্ত্ব শিখিয়ে যাতে মগজ ধোলাই করা যায় তার চেষ্টার বিরাম নেই। ইংরাজী শিক্ষার ভিত কাঁচা করার কারণ হল, ইংরাজি মাধ্যমে বিশ্ব সাহিত্য-কাব্য-দর্শনের যে পরিচয় লাভ করা যায় তাতে চিত্ত হয় যুক্তি নির্ভর, উদার এবং গণতন্ত্রনিষ্ঠ। এ সব মানসিক উৎকর্ষ মার্কসীয় গোঁড়ামীর পরিপন্থী।

সহর-জীবনকে দুর্বিসহ করে তুলেছে বিদ্যুৎ সঙ্কট ও পরিবহন বিভীসিকা। এ দুটি সমস্যা আগেও ছিল তবে এমন ভয়ংকর ছিল না তখন। এই দুই

দৈনন্দিন নিষ্ঠুর পরিহাস বামফ্রন্ট সরকারের ইতিকথায় চির-স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

সহর ছেড়ে গ্রামের দিকে পা বাড়ান, আপনি বুঝতে পারবেন তখন সি পি আই (এম) এর ব্যূহ-রচনা কাকে বলে। ৩৫৫২ টি গ্রাম পঞ্চায়েতের মধ্যে প্রায় তিন হাজার তাদের দখলে। পঞ্চায়েত গুলির হাতে বিভিন্ন উন্নয়ণ খাতে দেওয়া হয়েছিল প্রায় ছশো কোটি টাকা। তছরিল তছরূপ, হিসাব না দেওয়া, দলবাজি ইত্যাদির অভিযোগ ও মামলার প্রতি কাণ না দিয়ে, গ্রামগুলি ঘুরে দেখলে আপনি দেখবেন যে, কোথাও কাজের কাজ একটাও হয় নি। খাদ্যের বদলে কাজের প্রকল্পগুলিরও সেই একই হাল। যোগ্য পরিকল্পনা পরিচালনা ও তদারকির অভাবে সব উদ্দেশ্যই বানচাল। টাকা গোবরী সেনের, তা নিয়ে কারো মাথা ব্যথা নেই। যদি জিজ্ঞাসা করেন এত টাকা,চাল, গমের কি হল ? উত্তর গ্রামের মানুষই দেবে। তবে তাকে ডেকে নিয়ে যেতে হবে নির্জনে, তাহলেই সে সব খবর আপনাকে দেবে। উত্তর গাঁয়ের মানুষরা অন্যভাবে দিয়েছেন কিছুদিন পঞ্চায়েত উপ-নির্ব্বাচন গুলির মাধ্যমে।

এবার আসুন 'অপারেশন বর্গা শিবিরে'। বর্গা-জমিতে ভাগচাষীর নাম সরকারী রেকর্ডভুক্ত করার নামই 'অপারেশন বর্গা'। একাজ জরিপ বিভাগ ১৯৪৫ সাল থেকে করছেন এবং যতদিন বর্গাপ্রথায় জমি চাষ থাকবে ততদিন করতে হবে। বাদপড়া মৃতের ওয়ারেশ এবং পরিবর্তিত চাষীর নাম রেকর্ডের কাজ চলতে থাকবে। এ ব্যাপারে নতুন যা হচ্ছে তা হল যে-দলের বর্গাদারের নাম পালটে দলের লোকের নাম রেকর্ড করানো পঞ্চায়েত ও জরিপ বিভাগের কিছু কর্মচারীর সাহায্যে এই কাজ চলছে। এ অভিযোগ শুনতে পাবেন সর্বত্র। অসংখ্য মামলাও হয়েছে এ নিয়ে।

কৃষক আন্দোলন শুরু হবার আগে ভূমি-মালিক ও ভাগচাষীর সম্পর্ক ভাল ছিল। একে অপরের উপর বিশ্বাস স্থাপন করে চলত। জমি চাষ, বীজ বপন এবং ফসল কাটা নিয়ে ঝগড়া হত না।

ভাগচাষীদের শ্রেণীসংগ্রামের হাতিয়ার করার পর থেকে বর্গাজমির চাষে নানা বাধা বিপত্তির উদ্ভব ঘটেছে। অতীতের সম্পর্ক বিনষ্ট হয়েছে। লাঙ্গল যার জমি তার এ দাবী যুক্তিসঙ্গত। বামফ্রন্ট সরকার নিজেদের কৃষকদরদী বলে প্রচার করেন। বর্গাচাষ সমস্যার প্রকৃত সমাধান হল বর্গাজমিতে বর্গা বা ভাগচাষীকে রায়তি অধিকার দান। সরকার তা না করে একটা অমীমাংসিত দীর্ঘকালীন বিরোধকে কেন জিইয়ে রেখেছেন

কেন জিইয়ে রাখছেন তার কারণ হল, (১) পল্লী অঞ্চলে ভাগচাষী মালিক বিরোধ মিটে গেলে সি পি আই (এম) এর লড়াকু কাডারেরা কি নিয়ে থাকবেন। (২) বর্গা জমির মালিকদের মধ্যে অধিকাংশ সি পি আই (এম) সমর্থক এবং দলের শক্তি। তারা পঞ্চায়েত সদস্যও। বর্গাজমিতে বর্গাচাষীকে মালিকানা দিলে এ ব্যক্তিরা বামফ্রন্টের প্রতি রুষ্ট হবেন এই আশঙ্কা।

গ্রামে অভিযোগ শুনবেন, সি পি আই (এম) দলে না ঢুকলে পঞ্চায়েতরা কৃষককে নতুন রেশন কার্ড দেয় না, দিন মজুর হিসাবে নিয়োগে বাধা দেয়, খাদ্যের বদলে কাজে নেয় না, বর্গাচাষীরূপে নাম রেকর্ড হয় না, কৃষিঋণ মেলে না ইত্যাদি

ইত্যাদি। ইচ্ছা হয় সাহস থাকে, আপনি অভিযোগগুলির সত্যতা যাচাই করতে পারেন। নতুবা ফিরে আসুন আবার সহর এলাকায়।

এবার কলকারখানাগুলির দিকে তাকান। সেখানে প্রতিদিন ৮ থেকে ১০ ঘন্টা বিদ্যুৎ ছাটাই, উৎপাদন হ্রাস এবং শ্রমিক অশান্তি বহমান। শিল্প মালিকরা বলছে, ১২ ঘন্টা কাজের জন্য ২৪ ঘন্টার মজুরি দিয়ে আমরা কি করে প্রতিযোগিতায় দেশের ভিতরে অথবা বিদেশে মাল বিক্রয় করে টিকে থাকব। ক্রমাগত সময়মত সাপ্লাই না দেবার কারণে কি ভাবে খরিদ্দারদের অচিরাজ্যে অর্ডার দেওয়া বন্ধ করব, অথবা বিদ্যুৎ সংকটের জন্য কারখানা বন্ধ করে দেওয়ায় যন্ত্রপাতির যে ক্ষয় ক্ষতি ও যোগ্যতা নষ্ট হচ্ছে তার কি প্রতিকার আমরা করব। প্রশ্ন, কতকাল এ অবস্থা চলবে?

কিছু সংখ্যক বেকার সামান্য কিছু বৃদ্ধ কৃষক এবং বিধবাদের পেনসন সহর মূল সমস্যাকে এড়িয়ে পল্লব স্পর্শী চমক সৃষ্টি ছাড়া আর কি বলবেন? প্রচার ধর্মী এসব ব্যবস্থাও অর্থাভাবে ভেঙ্গে পড়ার মুখে। নবম ও দশম শ্রেণীর ছাত্রদের বেতন রহিত, শিক্ষক অশিক্ষক কর্মীর বেতন বৃদ্ধি এবং সরকারী ও পুরসভা কর্মচারীদের বেতন ও ভাতা বৃদ্ধি নিঃসন্দেহে ভাল কাজ। কিন্তু সেই সঙ্গে মনে করতে হয় যে, সংবিধানে প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারের যে নির্দেশ আছে বামফ্রন্ট তা পালনে সচেষ্ট হন নি। পশ্চিম বাংলায় কয়েক হাজার প্রাথমিক বিদ্যালয় সরকারী অনুমোদনের অভাবে দুর্দশায় ভুগছে।

এ প্রসঙ্গে রাজ্য সরকারের আর্থিক সামর্থের বিষয় এবং কোন প্রকার অগ্রাধিকার লাভের যোগ্য বিবেচ্য। অনেকেরই ধারণা, বামফ্রন্ট সেই বিবেচনা যথার্থভাবে করেন নি। রাজ্য এবং কেন্দ্রের রাজস্ব-ভাণ্ডার জনসাধারণের প্রদত্ত ট্যাক্স ও শুল্ক দ্বারা গঠিত। জনসাধারণের ক্ষমতার সীমা আছে। রাজস্ব ভাণ্ডারকে দেউলিয়া করে দেওয়া কোন সরকারের পক্ষেই সমুচিত ও বৈধ নয়। বে-হিসেবী ব্যয়ের ফলে এ অবস্থা।

সি পি আই (এম) একটি সুগঠিত দল এবং দলে কিছু ভাল কর্মী আছে। সরকার চালাতে এসে দল কেবল সমর্থকদের আস্থাই যে হারিয়েছে তাই নয়, সদস্যদের মধ্যে একটি অংশের মনে নেতৃত্বের প্রতি অবিশ্বাস ও নৈরাশ্যের সঞ্চার করেছে। গত সাড়ে তিন বছরে সি পি আই (এম) পশ্চিম বঙ্গে দলের সদস্য সংখ্যা ৫৯,৬১৩ থেকে বাড়িয়ে ৬৬,১৭৫ করতে পারলেও, দলের ভাবমূর্তি একটুও উজ্জ্বল করতে পারে নি।

সি পি আই (এম) ক্ষমতায় এসেই রাজ্য সরকারের সীমিত ক্ষমতা ও আর্থিক সামর্থের অজুহাত তোলেন, কিন্তু দলের নেতারা গদিতে বসবার আগে কি জানতেন না যে রাজ্যের শক্তি সামর্থ কতটা? এই সীমিত ক্ষমতার সদ্ব্যবহার করে গুজরাট, মহারাষ্ট্র, পাঞ্জাব, হরিয়ানা, কর্ণাটক প্রভৃতি রাজ্য প: বঙ্গকে পিছনে ফেলে এগিয়ে গেছে। এই সীমিত ক্ষমতা হাতে করে একদা ডা: বিধান রায় পশ্চিম বংগে কি করেছিলেন সে তো সকলেই জানে। সীমিত শক্তির কাঁদুনি, কেন্দ্রের প্রতিকূল মনোভাব এবং পূর্ববর্তী কংগ্রেস সরকারের ভ্রান্তনীতির অজুহাত বামফ্রন্টের ব্যর্থতা ঢাকার চেষ্টা

(এর পর ১৬ পৃ: দেখুন)

অভিশপ্ত পশ্চিমবঙ্গে সি পি এম ব্যর্থ রাজনৈতিক সমীক্ষা

●

১৯৭৭ সালের বিধান সভা নির্বাচনে সি. পি. এম নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে কঠিনতম পরীক্ষার মধ্য দিয়ে চলতে হয়েছে। পরীক্ষার ফলাফলের উপর নির্ভর করছে ভারতে মার্কসবাদের ভবিষ্যৎ এবং বহুলাংশে ভারতবর্ষের রাজনীতির ভবিষ্যৎ। শাসন করা এবং বৈপ্লবিক রাজনৈতিক সংগ্রাম একই সঙ্গে চালিয়ে যাওয়ার কৌশল ফলপ্রসূ করতে রাজনৈতিক বিচক্ষণতার উপর নির্ভর করে। এই বিষয়ে সচেতন দৃষ্টি না থাকলে নির্বাচনী রাজনীতির বুর্জোয়া প্রভাব পার্টি নেতাদের আচ্ছন্ন করে দেয়। পার্লামেন্টারী রাজনীতি ও বিপ্লবী শ্রেণীসংগ্রামের মধ্যে যে অন্তর্নিহিত দ্বন্দ্ব বিদ্যমান তার সমন্বয় করতে গিয়ে বিচার করতে হবে নেতৃত্ব কি এগিয়ে চলেছে না পিছু হটেছে। শাসন ক্ষমতায় আসার আগে বিপ্লবী সংগ্রামকে এগিয়ে নেওয়ার জন্য যে ধরণের কাজে অভ্যস্ত শাসনক্ষমতা লাভ করার পর তার সুযোগ নেই। ভারতীয় সংবিধানের চতুষ্কোণের মধ্যে রেখেই পশ্চিমবঙ্গকে সুশাসিত, সুগঠিত, সুসংহত করে সমাজতন্ত্রের পথে এগিয়ে নেওয়া বিপ্লবী কাজ এই তত্ত্বটা রোগানের মধ্যেই রয়ে যাওয়ায় সি. পি. এম ধমকে গিয়ে নির্বাচনের ফলে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ল। ১৯৭৮ সালের পঞ্চায়েৎ নির্বাচনে এবং ১৯৮০ সালের লোকসভা নির্বাচনে সি. পি. এম এর পক্ষে জনগণের সমর্থন অটুট থাকায় সি. পি. এম জড়িয়ে পড়ল পঞ্চায়েতের স্থানীয় কোন্দলে, প্রলুব্ধ হয়ে পড়ল ক্ষমতা ও রসদের অপব্যবহার করতে। ক্ষমতা ভোগ ও ব্যবহার করাটাই নেশা হয়ে দাঁড়াল। নির্বাচনী রাজনীতির বুর্জোয়া প্রভাবে দল আচ্ছন্ন হয়ে গেল, ফলে দেশকে সমাজতন্ত্রের পথে এগিয়ে নেওয়ার জন্য পশ্চিমবঙ্গের শিল্পের অধোগতির দিকে লক্ষ্য রেখে কর্মপন্থা গ্রহণ ও জনমত সংগঠিত করার প্রচেষ্টা গৌণ হয়ে গেল। অর্থনীতিতে মৌলিক নীতি পরিবর্তনে অসমর্থ হয়ে কতক যুবককে কিঞ্চিৎ বেকার ভাতা দিয়ে সস্তায় বাজিমাৎ করার চেষ্টা হল।

জেনারেল সার্ভে অব ইণ্ডাষ্ট্রিজ-এর সমীক্ষায় গত ৩০ (ত্রিশ) বৎসরে সারা ভারতের সামগ্রিক উন্নয়ন তিন শতাংশ, পশ্চিমবঙ্গের মাত্র এক শতাংশ। এই কয় বৎসরে পশ্চিমবঙ্গের মাথাপিছু আয় প্রথম স্থান থেকে ষষ্ঠ স্থানে পিছিয়ে গেছে। ১৯৬০-৬২ সালে এই রাজ্যের শিল্প উন্নয়ন ছিল সারা ভারতের ২০ শতাংশ ১৯৭৮-৭৯ সালে তা হ্রাস পেয়ে মাত্র ১১ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। ১৯৬৬ সালে পশ্চিমবঙ্গে সব কোম্পানীর আদায়ীকৃত মূলধন ছিল ১৮ শতাংশ, ১৯৭৯ সালে তা হ্রাস পেয়ে ১৪ শতাংশের নিচে নেমেছে। এই আপেক্ষিক অবনতির কারণ শিল্পে অনগ্রসর রাজ্যগুলি অগ্রণী রাজ্যগুলির সমকক্ষ হওয়ার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা চালাচ্ছে এবং এগিয়েও চলেছে। রাষ্ট্রীয় পরিকল্পনায় ও অনগ্রসর অঞ্চলগুলিকে অসাম্য দূর করার জন্য অধিক

সাহায্য দিতেছে। অগ্রণী রাজ্যগুলির মধ্যেও পশ্চিমবঙ্গ ব্যাঙ্ক থেকে ঋণ পায় ১৬০০ কোটি মহারাষ্ট্র পায় ৩৫০০ কোটি টাকা। ১৯৭৮-৭৯ সালে পশ্চিমবঙ্গ ভারতের শিল্পোন্নয়ন ব্যাঙ্ক পশ্চিমবঙ্গকে মাত্র ১২ কোটি টাকা ঋণ দিয়েছে, ব্যাঙ্ক কর্তৃক ঋণের পরিমাণের মাত্র ৯॥ শতাংশ, শিল্প অর্থ করপোরেশন পশ্চিমবঙ্গকে মাত্র ১০ কোটি টাকা দিয়েছে, করপোরেশনের মোট ঋণের ৬। শতাংশ। তূলা, তেলবীজ, রাসায়নিক দ্রব্য ইত্যাদি শিল্পের প্রয়োজনীয় উপাদানগুলির ক্ষেত্রে দাম পার্থক্যকরণ নীতি প্রযুক্ত হওয়ায় এগুলির জন্য পশ্চিমবঙ্গের শিল্পগুলিকে বেশী দাম দিতে হয় কিন্তু কয়লা এবং লোহা ও ইস্পাতের ক্ষেত্রে সমদাম নীতি প্রযুক্ত হওয়ায় পশ্চিমবঙ্গ এই শিল্পগুলির সুবিধা থেকে বঞ্চিত। কলিকাতা বন্দর ও বোম্বাই বন্দরের জাহাজের মাশুলের পার্থক্য থাকায় বোম্বাই অঞ্চলের শিল্পগুলির সুবিধা হয়। এই সমস্ত পার্থক্য নীতির জন্য পশ্চিমবঙ্গ শিল্পে এগুতে পারছে না। বামফ্রন্ট ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়েও পশ্চিমবঙ্গে শিল্প সম্প্রসারণের প্রয়োজনীয় নীতি ও পন্থা গ্রহণ করতে পারে নাই। অধিকন্তু সরকারের একতিয়ারে ভুক্ত সমস্যাগুলিও এড়িয়ে গেছে, দৃঢ়তার সঙ্গে অগ্রসর হয় নাই, যেমন শিল্পোন্নতির জন্য শান্তি শৃঙ্খলা অপরিহার্য্য এই দায়িত্ব পালনেও পশ্চিমবঙ্গ সরকার অন্য রাজ্য হতে পিছনে। পরিসংখ্যান থেকে দেখা যায় ১৯৭৯ সালে পশ্চিমবঙ্গে সর্বাধিক শ্রমদিন নষ্ট হয়েছে। ঐ সময়ে ১৪৫টি ধর্মঘট, ১৫১টি লক্-আউট হয় যার জন্য যথাক্রমে ১৬০ লক্ষ ও ৩১ লক্ষ শ্রমদিবস নষ্ট হয়। সরকারী সংস্থাগুলি শৃঙ্খলাহীনতা ও নৈরাজ্যের লীলাভূমি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তরফ হতে শিল্পে অরাজকতা দমনের চেষ্টা নেই বলা যায়। রাজ্যে বিদ্যুতের অবস্থা সঙ্গীন সীমার বাইরে। এটাই সবচেয়ে বড় কারণ যার জন্য পশ্চিমবঙ্গে উন্নয়ন স্তব্ধ হয়ে গেছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকার এই ব্যাপারে কিছুই করতে পারছে না। প্রথমে পূর্বতন সরকারের উপর দোষ চাপিয়ে দায়িত্ব এড়াতে চেষ্টা করেছে, এখন ঐসব বুলি চালান যাবে না দেখে একেবারে চুপসে গেছে। সি, পি, এম সরকার পশ্চিমবঙ্গের শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা করে শিল্পের উন্নয়নকে অগ্রাধিকার দিতে সমর্থ হয় নাই। শ্রমিক সংগঠনগুলিকে নয়া পরিবেশে ঢেলে পুনর্গঠিত করতে পারে নাই। সমাজতন্ত্রের পথে শিল্পের মোড় ঘুরাতে পারে নাই মার্কসবাদীর নিকট এটা চূড়ান্ত নীতি ভ্রষ্ট ও অপদার্থতা।

মহামতি লেনিন মার্কসবাদকে পরিবর্ধন করে সাম্রাজ্যবাদী রাজ্যগুলির দ্বারা আক্রান্ত ও বাধাপ্রাপ্ত হয়েও রাশিয়ায় সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত করে প্রমাণ করেছেন—'Socialism in one Country' সম্ভব। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর চীন বিপ্লব সম্পন্ন হওয়ায় পৃথিবীতে সাম্রাজ্যবাদী ও সমাজতান্ত্রিক এই দুই সমান্তরাল শিবিরের উদ্ভব হয়। উপনিবেশিক দেশগুলি স্বাধীন হওয়ার পর সমাজতান্ত্রিক শিবিরের দিকে ঝুঁকে পড়ে। এই পরিস্থিতিতে সমাজতান্ত্রিক শিবিরের বিশ্লেষণ ছিল বর্তমান যুগে শ্রমিক-শ্রেণীর নেতৃত্বে সশস্ত্র বিপ্লব সংগঠিত না করেও গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা সম্ভব এবং ধনিক শ্রেণী জনগণের ভোটের ফলাফল মানতে বাধ্য হবে। গত নির্বাচনে পশ্চিমবঙ্গে সি, পি, এমকে নিরংকুশ সংখ্যাগরিষ্ঠে নির্বাচিত করে পশ্চিমবঙ্গের জনগণ মার্কসবাদের চিন্তাধারার মর্যাদা রক্ষা করেছে। কিন্তু সি, পি, এম নিরংকুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করেও জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণে ব্যর্থ

হল। সমাজতন্ত্রের পথে পশ্চিমবঙ্গের অর্থনীতি এগিয়ে নেয় নাই। জনগণের দুঃখকষ্টের কোন প্রকার সুরাহা হল না। দিন দিনই দুর্গতি বেড়েই চলেছে, দুর্নীতি, স্বজনপোষণ বিরাট আকার নিয়েছে, দলবাজী করে শিক্ষা অর্থনীতি সর্বক্ষেত্রে অরাজকতা সৃষ্টি হয়েছে। জনগণের আশা আকাঙ্খা নিরাশার পরিণতি হয়েছে। সি, পি. এম নেতৃত্বেও দিশা-হারা। মাঝে মাঝে মার্কসীয় নীতি হতে বিচ্যুতি হয়েছে মনে করে শ্রমিক ও মেহনতী মানুষের প্রতি দরদী বুলি আওড়ায়ে জনদরদী মুখোশ পরছে। মৌলিক নীতি পরিবর্তনের পথে সি, পি, এম নেতৃত্ব এগিয়ে যেতে পারছে না।

অভিশপ্ত পশ্চিমবঙ্গের অভিশাপ এখনও মোচন হয় নাই। রামমোহন শ্রীচৈতন্য ও রবীন্দ্রনাথের বাংলা—মৈত্রী ও সাম্যের দেশ। রামমোহনই ভারতে প্রথম কলিকাতা ময়দানে সাম্য মৈত্রী, স্বাধীনতার নিশান উড়িয়ে ফরাসি জনগণকে অভিনন্দন জানায়েছিল, শ্রীচৈতন্য জাতিধর্ম নির্বিশেষে সকলকে সার্বজনীন প্রেমের বন্যায় ভাসায়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ 'রাখীবন্ধন' দ্বারা সমস্ত জাতীকে একসূত্রে গেঁথেছিলেন, তাঁর বাণী আজ বিশ্বজনীন, তাই রবীন্দ্রনাথ বিশ্ববরেণ্য। সেই পশ্চিমবঙ্গে আজ খুনাখুনির ও আদর্শহীন বিভেদের রাজনীতি স্থান নিয়েছে। নেতাজী সুভাষচন্দ্রের ভাষায় (১১ পৌষ, ১৩৩২। 'অষ্টাদশ শতাব্দিতে বিদেশী বণিককে গৃহ প্রবেশের পথ দেখিয়ে তোমাদের পূর্ব-পুরুষেরা যে পাপ সঞ্চয় করে গেছেন, এই বিংশ শতাব্দিতে তোমাদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে। ভারতের নব জাগ্রত জাতীয় আত্মা আজ মুক্তির জন্য হাহাকার করছে! তাই বলছি তোমরা সকলে এস ভ্রাতৃবন্ধনের রাখি পরিধান করে মায়ের মন্দিরে দীক্ষা নিয়ে আজ এই প্রতিজ্ঞা করো যে মায়ের কালিমা তোমরা ঘুচাবে।' বিংশ শতাব্দির প্রথমভাগে বাংলাদেশে অনেক সাধক, কবি, সাহিত্যিক, চিন্তাবিদ, কর্মবীর ও জননায়ক আবির্ভূত হয়েছে। তাঁদের পরিত্যক্ত স্থান এখনও শূন্য। বাঙ্গালীর ইহা লজ্জা। বাঙ্গালী জাতি মরে নাই, বিভিন্ন ক্ষেত্রে সাধনায় লিপ্ত। কিন্তু সাধনা এখনও পূর্ণাবয়ব ও সর্বাঙ্গ-সুন্দর হয় নাই, সেইজন্য মনীষী বা নায়কের আবির্ভাব এখনও হয় নাই। সর্বাঙ্গ-সম্পন্ন জাতিকে চোখের সামনে রেখে জাতীয় সাধনায় প্রবৃত্ত না হলে সে সাধনা কখনও জয়যুক্ত ও সাফল্যমণ্ডিত হবে না। জাতীর জীবনের বহুদিক আছে। সবদিক দিয়েই জাতিকে গড়ে তুলতে হবে। প্রাণের বন্যা যখন জাতির শরীরে প্রবেশ করবে তখন শিক্ষা সংস্কৃতি অর্থনীতি সবদিক দিয়েই তার বিকাশ হবে। তা না হলে যা সৃষ্টি হবে তা কখনও সর্বাঙ্গসুন্দর হতে পারে না। এই কর্তব্য সম্পাদন করতে জীবন পণ করে সর্বক্ষেত্রে তরুণদেরই সাধনায় প্রবৃত্ত হতে হবে। আশার কথা চারিদিকে এই সাধনার আয়োজন চলছে, চলবে, পশ্চিমবঙ্গের সাধনা সিদ্ধ হবে। সঠিক নেতৃত্ব গড়ে উঠবে।

●

ঃ ঘোষণা ঃ

বিপ্লবী বাংলার আগামী সংখ্যা ২৪শে জানুয়ারী প্রকাশিত হইবে।

—সঃ বিঃ বা

সংঘর্ষমুখী বিশ্বরাজনীতি নিষ্ঠারকরা

—বংশীধর বন্দ্যোপাধ্যায়

বর্তমান বিশ্বে পরমাণু অস্ত্রে বলীয়ান রাষ্ট্রগুলি এবং বিশেষ করে বৃহৎ বৃহৎ শক্তিধর রাষ্ট্রগুলি, যথা আমেরিকা, রাশিয়া, চীন প্রভৃতি রাষ্ট্রের নায়কগণ অপেক্ষাকৃত দুর্বল ও পরমাণু শক্তিহীন রাষ্ট্রগুলির ওপর প্রভুত্ব বিস্তার করে আপন আপন স্বার্থ পূরণের আশায় নানা ধরণের মিথ্যা ও কল্পিত প্রচারের সাহায্যে তথাকার কিছু সংখ্যক মানুষের সমর্থন লাভে সমর্থ হচ্ছে। ফলে বিশ্ব-রাজনীতিতে ভারসাম্য অনিশ্চিত আকার ধারণ করছে, যা অন্যান্য সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রের পক্ষে ভবিষ্যত বিপদের আশংকা বা যুদ্ধের আবহাওয়া সৃষ্টিতে সাহায্য করছে। তাই এই সদা চঞ্চল ও স্বার্থবাদী রাষ্ট্র-নায়কদের সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের কর্তাব্যক্তিরা সংযত করার জন্য প্রয়াস পেতে সচেষ্ট হন, কিন্তু এতদ সত্ত্বেও রাশিয়া যখন কামপুচিয়া ও আফগানিস্থানে তার নখের থাবা প্রসারিত করল তখন বিশ্বরাজনীতি কম্পমান হলেও রাশিয়া তাকে কোনরূপ আমল বা মূল্য দিল না। রাশিয়ার ভাবটা এই হল তখন যে, দেখা যাক না শেষ অবধি কি হয়? বিশ্ব-জনমতকেও রাশিয়া বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখাতে তখন কসুর করল না। তার এই সীমাহীন স্পর্ধা ধীরে ধীরে অপরাপরা সহ্য করতে বাধ্য হলেও, আমেরিকা রাশিয়ার এই সাম্রাজ্যবাদী নীতির বিরুদ্ধে বিশ্ব জনমত সৃষ্টির আশার দিকে দিকে সক্রীয় অভিযান শুরু করল তার নিজস্ব প্রচারের মাধ্যমে।

আমেরিকা আশা করল যে, বিশ্বের অন্যান্য রাষ্ট্রের নায়করা আমেরিকার পাশে দাঁড়িয়ে ন্যায় ও নীতি রক্ষার জন্য রাশিয়ার বিরুদ্ধে তার উক্ত কাজের জন্য প্রতিবাদ মুখর হবে তীব্রভাবে; ফলে আফগানিস্তান থেকে রাশিয়া তার সশস্ত্র সৈন্যবাহিনী সরিয়ে নিতে বাধ্য হবে, আর কামপুচিয়ার ব্যাপারে সে আরো একটু সংযত হয়ে চলবে, বিশ্ব জনমতকে শ্রদ্ধা জানাতে। কিন্তু বাস্তবে দেখা গেল যে, রাশিয়া সে পথ পরিহার করে বিশ্ব-জনমতকে অগ্রাহ্য করল। তার এই অন্যায় ও অযৌক্তিক সাহস কোথা থেকে এল? মনে হয় পারমাণবিক শক্তিধর রাষ্ট্রগুলি, বিশেষ করে রাশিয়া বা চীন বা আমেরিকা এই ভাবেই আত্মস্বার্থেই নির্লজ্জের মত পররাজ্য আগ্রাসী নীতি নির্ধারণে সংকোচ বোধ করে না, বরং অনেক ক্ষেত্রেই ঐ সব শক্তিধর রাষ্ট্রের নায়করা স্বেচ্ছাচারী হয় ক্ষমতা মদমত্ততায়, সাধারণ সৌজন্য পর্যন্ত তারা হারায়। ক্ষমতার দম্ভে তারা অন্ধ হয়ে হিতাহিত জ্ঞান বর্জিত অবস্থায় হীন কাজে নেমে পড়ে, যার পরিণামে পৃথিবীর শান্তি ও সংহতি হঠাৎ বিপর্যস্ত হয় অকারণে।

রাশিয়া যে বদ্ দৃষ্টান্ত স্থাপন করল আফগানিস্তানে সৈন্য পাঠিয়ে তা নিশ্চয় কোন স্বদেশ-প্রেমিক আফগান নাগরিক ক্ষমা করবে না। স্বদেশে বিদেশী সৈন্যের এরূপ প্রকাশ্যে ও বীরদর্পে প্রবেশ কেউই বরদাস্ত করতে পারে না, কিন্তু বারবার কারণ

নিজের গদী রাখতে সেই কাজকেই মেনে নিতে বাধ্য হল হীন আত্মস্বার্থে। এরূপ স্বার্থপর শাসক কখনই স্বদেশের মনোরঞ্জন করতে পারে না। স্বদেশবাসী দেশপ্রেমী জনগণ বারবার কায়মালকে ক্ষমতাচ্যুত করবেই। রাশিয়ার পদলেহীকে আফগানরা কিছুতেই সহ্য করবে না, তাকে উৎখাত করার জন্য শাসকদল বিরোধীরা জোট বাঁধবে, প্রয়োজনবোধে প্রতিবেশী রাষ্ট্রের সহায়তা নিয়ে সশস্ত্র বিদ্রোহের পথে তারা এগিয়ে যাবে এবং সেটাই চিরাচরিত প্রথা বিশ্বের সর্বত্র। আফগান বীর দেশ প্রেমিকরা সেই পথই নিয়েছে ঐতিহাসিক নিয়মে। বিদ্রোহী আফগানরা জয়ী হবেই শেষ অবধি, কারণ তারা আত্মস্বার্থে লড়ছে না, তারা লড়ছে দেশের অখণ্ডতা ও মুক্তির জন্য। জয় তাদের হবেই। বিশ্বের স্বাধীনচেতা জনমানস তাদের নৈতিক সমর্থন দেবে আফগান বীরদের বিপ্লবকে সার্থক ও সফল করতে এবং তার মূল্য বড় কম নয়। ভারত প্রতিবেশী রাষ্ট্র হিসাবে রাশিয়ার উক্ত সৈন্য প্রেরণ কার্যকে সমর্থন দেয়নি, বরং আফগানিস্তান থেকে রুশ সৈন্য সরিয়ে নেবার জন্য ব্রেজনেভকে শ্রীমতী গান্ধী বার বার অনুরোধ করেছেন। রাশিয়া ভারতের বন্ধু রাষ্ট্র তাই এর বেশী কিছু করা শ্রীমতী গান্ধীর পক্ষে সমীচীন হতো না কূটনৈতিক ও বাণিজ্যিক বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখার বাস্তব প্রয়োজনে। আমেরিকা অবশ্য প্রকাশ্যে রাশিয়ার বিরুদ্ধে নিজে সোচ্চার হয়েছে ও অন্যান্য রাষ্ট্রকেও সক্রীয় প্রতিবাদে গর্জে উঠতে বলেছে। চীন ও পাকিস্তান ঐ ব্যাপারে আমেরিকার যুক্তি মেনে নিয়ে রাশিয়ার বিরুদ্ধে প্রচার ও প্রতিরোধে নেমে পড়েছে। নীতিগতভাবে চীন ও পাকিস্তান ঠিক কাজই করেছে, কারণ পররাজ্য আক্রমণের মতই সদম্ভে ও সসৈন্যে রাশিয়া আফগানিস্তানে প্রবেশ করেছিল অত্যন্ত গর্হিত কারণবশ যা বিশ্বের সর্বজন কর্তৃক নিন্দনীয় ও অমার্জনীয়।

কমিউনিষ্ট রাশিয়া সাম্রাজ্যবাদীর ভূমিকায় ইতিপূর্বে তার প্রতিবেশী স্বাধীন রাষ্ট্রগুলির ওপর অহেতুক মাতব্বরী করার নেশায় মদগর্বী বর্ব্বরোচিত হীন পন্থায় সশস্ত্র সৈন্য সমভিব্যাহারে তাদের স্বাধীন সার্ব্বভৌম রাষ্ট্রের চৌহদ্দীর মধ্যে প্রবেশ করেছিল। ঘোষিত উদ্দেশ্য ছিল—সঠিকভাবে কমিউনিজম শিক্ষা দেওয়া ঐসব প্রতিবাসীদের। রাশিয়া কমিউনিষ্ট দুনিয়ার গুরুগিরি করতে গিয়ে মার্শাল টিটোর হাতে বেশ কড়া রকম শিক্ষা গ্রহণ করে শান্ত হতে বাধ্য হয়। বর্তমানে আবার সেই একই কায়দায় আফগান রাজনীতির উপর প্রভুত্ব বিস্তারের ষড়যন্ত্রে রাশিয়া লিপ্ত। রাশিয়া তার সাম্রাজ্যবাদী রীতি নীতি ঘুরিয়ে ফিরিয়ে তার প্রতিবেশী দুর্বল রাষ্ট্রের উপর প্রয়োগ করতে চায় আত্মস্বার্থে যা হীন চক্রান্ত ছাড়া আর কিছুই নয়। কিন্তু মুখে তার বড় বড় শ্রমিক-কৃষাণ দরদী যত সব অবাস্তব বুলি বা অসহ্য ন্যাকামী ছাড়া অন্য কিছু নয়। রাশিয়া নিজেকে খুব চালাক চতুর ভাবে, অথচ কার্যক্ষেত্রে এমন এমন বোকামী ও ন্যাকামী সে করে বসে যে তার পেটের কথা সবাই শেষ পর্যন্ত বুঝতে পারে এবং তা অনাবৃত্তক, একটা প্রহসন ছাড়া আর কিছুই নয়। তবুও রাশিয়া কেন যে সংযত হয় না তা বোঝা শক্ত নয়, কারণ লোভ তার অপরিসীম। সেই লোভের শিকার সে যত্র তত্র যখন তখন।

আমেরিকা, কোরিয়া রাশিয়াকে পাগল করে রেখেছে। অবশ্য আমেরিকারও রাশিয়া কোরিয়া রোগ বেশ কঠিন ও দুরারোগ্য বলে দেখা যায়

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রায় সমাপ্তির সাথে সাথেই। উভয়ে মিলে সারা বিশ্বে যে ক্ষমতার লড়াইয়ের কায়দা কানুন দেখাতে সদা ব্যস্ত তা বিশ্বের সর্ব্বত্র শান্তিকামীদের রাতের নিদ্রা হরণ করেছে। উভয়ে যদি পরস্পরকে অবিশ্বাস একটু কম করে এবং শান্তিতে থাকবার জন্য অন্ত পর্য্যন্ত প্রস্তুত সমুদয় পারমানবিক অস্ত্র সম্ভার সমুদ্রের জলে স্বেচ্ছায় বিসর্জন দেয় তবেই শান্তি, নচেৎ নয়। আমেরিকা ও রাশিয়া পারমানবিক অস্ত্রহীন অবস্থায় নিশ্চয়ই আর সাম্রাজ্যবাদী মনোভাবের পরাকাষ্ঠা দেখাতে পরস্পরের বিরুদ্ধে প্রচার ও পাল্টা প্রচারে নামবে না। কিন্তু সেরূপ সুলক্ষণের কোন আভাস বিশ্ববাসী আজও পায় নি। উক্ত দুটি রাষ্ট্রের কর্ণধারগণ পরস্পরকে বাস্তবে অবিশ্বাস ও সন্দেহ করে, অত্যন্ত মারাত্মক ধরণের। কারণ অবশ্য দুটি রাষ্ট্রের দুই বিপরীত মুখী চিন্তাধারা কূটনৈতিক ধরণ ধারণ, নীতি গত প্রভেদ ও আদর্শের সংঘাত, যার ফল এরা দুই মেরুর বাসিন্দার মত পরস্পরের নিকট হতে বিচ্ছিন্ন ও সমান্তরাল দূরত্বে অবস্থিত মনের দিক থেকে এবং নিখিলের দিক থেকে। এর ফলে সমগ্র বিশ্ব আজ এক অশান্ত পরিবেশের মধ্যে নিত্য যুদ্ধাতঙ্কে ভুগছে। ফলে ঠাণ্ডা লড়াই লেগেই আছে। আমেরিকা তার নজর থাবা বাবার চেষ্টা করেছিল কিউবার ওপর ইতিপূর্বে এবং হালে ভিয়েৎনামকে কব্জা করতে গিয়ে রাশিয়ার কূট কৌশলের কাছে কার্যতঃ সে হার স্বীকার করে গোমড়া মুখে ঘরে ফিরে যেতে পথ খুঁজে পায় নি, এমনি প্রচণ্ড মার খায় সে কমিউনিষ্ট দুনিয়ার হাতে, যার ব্যাথা আমেরিকা আজো ভুলতে পারে নি। সে কি কখনও ভোলা যায়? মারের পাল্টা মার দিতে পারে নি বলেই আমেরিকা রাশিয়ার উপর মহাখাপ্পা। কূট নীতির খেলায় দেখা যায় রাশিয়ার ধুর্তামি শীর্ষ স্থানীয়। আমেরিকা সে বিষয়ে মাঝে মাঝে চমক দেখাতে পারলেও আসলে রাশিয়ার তুলনায় তা ম্লান মনে হয়। বিশ্বের রাজনীতি নির্দ্ধারণের কাজে রাশিয়া ও আমেরিকা বর্তমানে শীর্ষে, আর তারাই যদি ঠাণ্ডা লড়াইয়ে এভাবে মেতে থাকে, তবে অদূর ভবিষ্যতে সংঘর্ষ অনিবার্য্য। বিশ্ব শান্তি রক্ষায় রাশিয়া মুখে অনেক ভাল ভাল কথা প্রচার করলেও কার্য ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, সে পাকা খেলোয়াড়, তাই আফগানিস্তানে তার সৈন্য প্রেরণ। আমেরিকা এটাকে বিশ্ব শান্তির পক্ষে বিপদজনক বলে মনে করে। তবুও আমেরিকা এক্ষেত্রে যে ধৈর্য্যের পরিচয় দেয় তা তার শুভবুদ্ধির কারণে। বিশ্ব শান্তিকে নষ্ট করার ক্ষমতা উক্ত দুইটি রাষ্ট্রেরই আছে, কাজেই উভয়ের শুভ বুদ্ধির ও পরস্পর সহনশীলতার মনোভাবই বিশ্বে স্থায়ী শান্তিকে নিশ্চিৎ করতে পারে, নচেৎ যুদ্ধ বিগ্রহ অবশ্যম্ভাবি বলেই মনে হয়।

———

আমের মুকুল বাঁচান

শোষক পোকার হাত থেকে আপনার স্বাদ গন্ধ ও নানান্ গুণে ভরপুর রসালো আমকে বাঁচান। এরজন্য আমগাছটিকে অন্তত দুবার কীটনাশক ওষুধ ছেটানোর ব্যবস্থা করুন। প্রথমবার গাছে যখন দু তিনটির মুকুল দেখা যাবে আর দ্বিতীয়বার গুটির আকার যখন মসুরডালের মতো হবে। নীচে এক লিটার জলের জন্য কোন্ কীটনাশক ওষুধ কতটুকু পরিমাণ লাগবে তা বলা হোল। (১) থায়োডান্ বা হিলডান ৩৫% (দুই মিলিলিটার) (২) সাম্বিথিয়ন বা ম্যালাথিয়ন ৫০% (দুইমিলিলিটার) (৩) সেভিন ৫০% (তিনগ্রাম) (৪) মেটাসিড ৪০% ই, সি (একমিলিলিটার)। যেকোন একটি কীটনাশক ওষুধ বেছে নিয়ে গাছের বাড় অনুযায়ী ওষুধ ও জলের মাত্রা বাড়িয়ে স্প্রে নিশ্চয়ই করবেন।

শোষকপোকা ছোট কোনাকৃতি বাদামী ধূসর বর্ণের। ঝাঁকে ঝাঁকে আমের মুকুল থেকে রস চুষে খায়। ফলে, ফুল শুকিয়ে যায়, গুটি কম ধরে ও ঝরে যায়। কুয়াশাতে এদের আক্রমণ বাড়ে।

সুতরাং আপনার সাধের আমগাছটিকে শোষক পোকার হাত থেকে বাঁচান। গাছ তো আপনার, আর ফলন যা পাবেন তাও কিন্তু আপনার।

—কনককমল চাটার্জি

রাজ্য কলা প্রতিযোগিতার ফলাফল

১৯৮০ সালে রাজ্য কলা প্রতিযোগিতার ফলাফল জানালেন রাজ্য-কৃষি বিভাগের উদ্যানবিদ্। হুগলী জেলার চুঁচুড়া মগড়া ব্লকের বারোল গ্রামের শ্রীবাদল চন্দ্র ঘোষ প্রথম হয়ে এক হাজার টাকা পাচ্ছেন। দ্বিতীয় হয়ে পাঁচশো টাকা পাচ্ছেন নদীয়া জেলার করিমপুর ব্লকের কেচুয়াডাঙ্গা গ্রামের শ্রীগৌর চন্দ্র দেবনাথ আর আড়াইশো টাকা পাচ্ছেন তৃতীয় হয়ে করিমপুর ব্লকেরই কেচুয়াডাঙ্গা গ্রামের শ্রীভিখুরাম মণ্ডল। এরা তিনজন আগামী সারা ভারত উদ্যান প্রতিযোগিতার জন্য মনোনীত হয়েছেন।

(পশ্চিমবঙ্গ কৃষি-তথ্য সংস্থা)

(৭ম পাতার শেষাংশ)

ছাড়া যে আর কিছু নয় সেটি জনসাধারণ ভালভাবেই বুঝে নিয়েছে।

বামফ্রন্ট রাজ্য ব্যাপী বনধ্ ডেকে কার্যতঃ জনমানসে নিজেদের অযোগ্যতা ছাড়া আর কোন প্রতিক্রিয়ার ছাপ ফেলতে পারেন নি। ফ্রন্টের শরিকদের মধ্যে মনান্তর ও রেষারেষিও কিছু কম নেই, কেবল ক্ষমতার আকর্ষণ মনান্তর মতভেদে পরিণত হতে দেয় নি।

সি পি আই (এম)-এর নেতারা প্রায়ই কেন্দ্র কর্তৃক বামফ্রন্ট সরকারের বরখাস্তের আশংকা প্রকাশ করেন। এ আশঙ্কা একটি কমপ্লেক্স। হয়ত তারা শহীদ হবার সুযোগ চান। নিজেদের কাজের রেকর্ড নিয়ে সি পি আই (এম) কি আগামী নির্বাচনে কংগ্রেস (ই)র সামনে দাঁড়াতে আতঙ্কিত? একটা বিষয় কিন্তু দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট, তা হল ফ্রন্ট কর্মী ও সমর্থক মহলে এক নৈরাশ্য-ক্লান্তির ছায়া বিস্তার করেছে যা নিয়ে বামফ্রন্ট নেতারা রীতিমত উদ্বিগ্ন।

:ed No.R. N .24511/71 Biplabi Bangla Regd. WB/NC 77
Phone : 34-1795
বার্ষিক :—ডাক ১৫.০০ টাকা ষাণ্মাসিক :—৮.০০ টাকা মূল্য—৩০ পয়সা

C/30

॥ সম্পাদকমণ্ডলী ॥

সভাপতি—
শ্রীজগদীশ চট্টোপাধ্যায়

সদস্য—
শ্রীভবেশচন্দ্র নন্দী
পুষ্প চ্যাটার্জী
মলয় ঘোষ

প্রকাশক ও মুদ্রক—
শ্রীঅনিল সেনগুপ্ত

দিল্লীর বিশেষ প্রতিনিধি—
শ্রীবারীন ঘোষ

বেহালা—
শ্রীনন্দগোপাল পাল

সম্পাদক—
শ্রীশান্তিশরণ রায়চৌধুরী

বিপ্লবী পুস্তকমালা

নেতাজীর সিক্রেটসার্ভিস ডাঃ পবিত্রমোহন রায়—

—ক্ষীরোদ কুমার দত্তের—

১। বাংলার অগ্নিযুগ—১·৫০, ২। বহির্ভারতে ভারতীয় বিপ্লব প্রচেষ্টা—৮·০০
৩। অনুশীলন সমিতির পি, মিত্তির—২·০০, ৪। গৈরিকী সংগ্রাম কাহিনী—১·০০, ৫। কাকোরী ষড়যন্ত্র—১·২৫, ৬। কলকাতা যাদু সংগ্রাম কাহিনী—·৪০, ৭। রাসবিহারী ও অনুশীলন সমিতি—১·০০
৮। স্বাধীনতার শহীদ মা ও মেয়ে—·৪০, ৯ বিবেকানন্দ ও সমাজবাদ—·৬০
১০। বিপ্লবী বিবেকানন্দ—·৫০, ১১। মহারাজ ও সুভাষচন্দ্র—·৪০
১২। ভারতের নবজাগরণ ও ভগিনী নিবেদিতা—·৭৫, ১৩। বেঙ্গল অর্ডিনেন্স (১)—১·০০, ১৪। বেঙ্গল অর্ডিনেন্স (২)—২·০০
১৫। শহীদ চন্দ্রশেখর আজাদ—·৫০, ১৬। ১৯শে এপ্রিল জাতীয় শহীদ দিবস—১·০০, ১৭। হাতিয়ার হত্যা প্রচেষ্টা—·৭৫, ১৮। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও অনুশীলন সমিতি—৪·০০, ১৯। ভারতের গুপ্তহত্যার ইতিহাস—·৪০, ২০। লাট হত্যা প্রচেষ্টা—১·৫০

— ৪নং বল্লভ দাস ষ্ট্রীট কলিকাতা-৭০০০০৭

১১/১/১/A বঙ্কিম চ্যাটার্জী ষ্ট্রীট কলিকাতা-৭৩

মূল কার্যালয়—৪নং বল্লভ দাস ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০০৭ শ্রীঅনিল সেনগুপ্ত কর্তৃক প্রকাশিত এবং তৎকর্তৃক 'প্রিন্টা' পাবলিসিটি, ১১৭, কেশবচন্দ্র সেন ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০০৯ হইতে মুদ্রিত।

: A : 1981

বিপ্লবী বাংলা

॥ বিপ্লবী পরিষদের সাপ্তাহিক মুখপত্র ॥

স্থাপিত—১৯৫৬, 'বিপ্লবী বাঙ্গালী' নবকলেবরে—১৯৭১

দশম বর্ষ ● শনিবার ১৭ই মাঘ ১৩৮৭, ● ৩১শে জানুয়ারী ১৯৮১ ● ১৫ সংখ্যা

CALCUTTA UNIVERSITY CENTRAL LIBRARY

প্রজাতন্ত্র দিবস উপলক্ষে
বিশেষ সংখ্যা

আমার ধ্যানের ভারত

আমি সেই ভারত-ই গড়িতে চাই, যে ভারত দরিদ্রতম ব্যক্তিও মনে করিবে—এই তাহার দেশ, এই দেশে তাহার একটা সক্রিয় সত্তা আছে। সেই ভারতে থাকিবে না উঁচু-নীচু-ভেদ, সম্প্রদায়ে-সম্প্রদায়ে থাকিবে অকুণ্ঠ প্রীতি। সেই ভারতে থাকিবে না অস্পৃশ্যতার অভিশাপ, থাকিবে না মাদকতার বিষ। নারী সেই ভারতে ভোগ করিবে পুরুষের সমান অধিকার। সেই ভারত করিবে পৃথিবীর প্রত্যেকটি জাতির সঙ্গে সহযোগিতা। আমরা অপরের শত্রু হইব না, অপরকে শোষণ করিব না, অপরকে আমাদের উপর শোষণ চালাইতে দিব না। এই আমার ধ্যানের ভারত।

—মহাত্মা গান্ধী

শান্তিসেনা পরিষদ

বিপ্লবী মহানায়ক ৺পূর্ণচন্দ্র দাস প্রতিষ্ঠিত

৪৮-বি শাঁখারীটোলা ষ্ট্রীট

কলিকাতা—৭০০০১৪

আগামী ১৫ই ফেব্রুয়ারী রবিবার ১৯৮১ শান্তিসেনা পরিষদের বার্ষিক প্রীতি-সম্মেলন সকাল ৯টা হইতে অপরাহ্ণ ৫টা পর্যন্ত নেতাজী নগর বিদ্যামন্দির (টালিগঞ্জ) প্রাঙ্গনে অনুষ্ঠিত হইবে।

আপনাদের উপস্থিতি বাঞ্ছনীয়।

সভাপতি
শ্রীপঞ্চানন চক্রবর্তী

সাঃ সম্পাদক
শ্রীনলিনী গুহ

পথ নির্দেশ :—

ধর্মতলা হইতে বাস নং ৬, ৮০এ, ৪১এ, ৪১, ৪১/১, ২০৫

মিনিবাস—নাগতলা রাণীকুঠি রুট

স্পেশাল বাস—৬নং রুট

ষ্টপেজ—নেতাজী নগর (টালিগঞ্জ)

পরলোকে প্রবীণ বিপ্লবী মণীন্দ্র দাসগুপ্ত

গত ২২শে জানুয়ারী বৃহস্পতিবার অশোক নগরে আমাদের পরম বন্ধু সহকর্মী সর্বজন প্রিয় অনুশীলন সমিতির একনিষ্ঠ কর্মী বিপ্লবী মনিন্দ্র দাসগুপ্ত ৭২ বৎসর বয়সে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে পরলোকগমন করেন, বহুদিন ধরে তিনি অসুস্থ ছিলেন, স্বাধীনতা আন্দোলনে সক্রীয় অংশে গ্রহণ করে তিনি দীর্ঘদিন কারাবাস করেন, বিপ্লব আন্দোলনে তার অবদান স্মরণীয়। বিপ্লবী বাংলা পত্রিকার সঙ্গে বিশেষ ভাবে যুক্ত ছিলেন—মৃত্যুকালে এক পুত্র, দুই কন্যা ও স্ত্রী রেখে গেছেন। এই বিপ্লবী বন্ধুর তিরোধানে আমরা মর্মাহত। আমরা তার বিদেহী আত্মার শান্তি কামনা করি এবং পরিবারের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা জানাই।

সম্পাদকীয়

— প্রজাতন্ত্র দিবস —

ভারতবর্ষ স্বাধীনতা লাভ করেছিল ১৯৪৭ পনরই আগষ্ট। তারপর দেশনায়করা দলমত নির্বিশেষে একত্রিত হয়ে ভারতবর্ষের সংবিধানের রূপ রেখা তৈরী করলেন। ১৯৫০ সালে ঘোষিত হল ভারতবর্ষ হবে একটি ধর্মনিরপেক্ষ, গণতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের রাষ্ট্র। ভারতবর্ষ হবে একটি প্রজাতন্ত্র। সেই থেকে স্বাধীনতা-পূর্ব একটি অর্থমূল বিশিষ্ট দিনে প্রজাতন্ত্র দিবসরূপে পালিত হবে। সেই পূর্বেকার স্বাধীনতা দিবস হল বর্তমানের প্রজাতন্ত্র দিবস।

প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্য হল যে এখানে জনগণ ও তাদের দ্বারা নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতেই থাকে চরম ক্ষমতা। জনগণই তাদের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মাধ্যমে নিজেদের ভাগ্যরচনা করেন এখানে। ভারতবর্ষে সেই ব্যবস্থা কায়েম হয়েছে নিঃসন্দেহে। কিন্তু মানুষের খাওয়া পরা, শিক্ষা, আবাসন, স্বাস্থ্যরক্ষা প্রভৃতির মত অত্যাবশকীয় প্রয়োজন আজো পূর্ণ হয়নি প্রত্যাশিত সফলতা অনুযায়ী। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে নিরপেক্ষতার নীতি অবলম্বন করে ভারত বিশ্বের সামনে অনুকরণযোগ্য একটি নতুন আদর্শস্থাপন করতে পেরেছে। পঞ্চশীল নীতির প্রধান প্রবক্তা হিসাবে বিশ্বের দরবারে একটি মর্য্যাদার আসনও প্রতিষ্ঠিত করেছে। কিন্তু অর্থ-নৈতিক স্বাধীনতা আজো পুরাপুরি অর্জন করতে পারেনি। অবশ্য চলার পথে হিমালয় সদৃশ বাধার সম্মুখীন তাকে হতে হয়েছে। পরদেশী শাসকের পীড়ন শোষণের ফলে দেশের মানুষকে রিক্ত ও সর্বহারার পর্যায়ে রেখে গিয়েছিল। নতুন ভারতের কর্ণধারদের শুরু করতে হয়েছিল প্রায় শূন্য থেকে। সেই লক্ষ্য সামনে রেখে দেশের নেতৃবৃন্দ চেষ্টার ত্রুটি করেন নি প্রথম দিকে। কিন্তু দেশের অভ্যন্তরে নানাপ্রকার সমস্যার সৃষ্টি করতে থাকল কোন কোন দল যারা ভারতের স্বাধীনতাকে হাস্যাস্পদ করার চেষ্টায় ধ্বনি তুলেছিল 'এ আজাদী ঝুটা হায়'। সমাজের ধনীরা ও বড় ব্যবসায়ীরা নতুন ব্যবস্থা থেকে প্রসূত সব সুযোগ সুবিধা [illegible]

ফলে, এই সুখ সুবিধা থেকে জনগণের বিরাট অংশ বঞ্চিত হল। এই দুরবস্থার অবসান পুরাপরি না ঘটাতে পারার জন্য, লোভ, ক্ষমতালোলুপতা সংক্রামকভাবে রাজনৈতিক দল ও নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি-দের মধ্যে সংক্রামিত হল এবং ব্যাপকভাবে সমাজের বিভিন্নস্তরেও ছড়িয়ে পড়ল। মূল্যবোধহীন রাজ-নীতিকে একটি পেশা হিসাবে গ্রহণ করেছেন রাজনীতিবিদরা। ফলে লক্ষ্যে পৌঁছাবার পথে বাধার প্রাচীর গড়ে উঠেছে। আদর্শনিষ্ঠা, ত্যাগ ও তিতিক্ষার মানসিকতা ও দেশপ্রেমের অভাব ঘটেছে ভয়ঙ্কর ভাবে। স্বামী বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ, শ্রীঅরবিন্দ, রাসবিহারী, নেতাজী, গান্ধীজীর মত মহান পূর্বসূরী-দের দৃষ্টান্ত ও উপদেশ তারা গ্রহণ করতে পারেনি। দেশের স্বাধীনতালাভের জন্য জনসাধারণের দুঃখ দুর্দশা দূর করার জন্য আত্মাহুতি দিয়ে যারা শহীদ হয়েছেন, অশেষ লাঞ্ছনা, নিপীড়ন ভোগ করে যে অগণিত স্বাধীনতা সংগ্রামী মহান দেশপ্রেমের গৌরবোজ্জ্বল আলোকশিখা জ্বেলে রেখেছিলেন, তাদের ভুলে গিয়াছে একালের রাজনীতিবিদরা ও তাদেরই সৃষ্টি ধিক্কারজনক পরিবেশের শিকার হয়েছেন একদল মানুষ। শুধু তাই নয়, যে বা যারা জনগণের কল্যাণের জন্য কিছু কাজ করতে অগ্রসর হচ্ছেন, তাদের সব প্রচেষ্টাকে ব্যর্থ করে দিচ্ছেন। এই দুরবস্থার আমূল পরিবর্তন না হলে জনগণ যে তিমিরে ছিল, সেই তিমিরেই থাকবে।

দেশের মানুষের এ সম্বন্ধে বিশেষ কর্তব্য আছে। দেশটা যখন প্রজাতান্ত্রিক, তখন নির্ব্বাচিত প্রতিনিধিরা আদর্শনিষ্ঠ দেশপ্রেমিক না হলে, দেশের মঙ্গলসাধন অসম্ভব। কাজেই প্রতিনিধি নির্বাচনের সময় বিশেষ বিচার বিশ্লেষণ করে কাজ করতে হবে। সুবিধাবাদী মানুষদের, যে দলভুক্তই হোক না কেন তারা, গলা ধাক্কা দিয়ে নির্ব্বাসিত করতে হবে সব ক্ষেত্র থেকেই। একাজ না করতে পারলে, দেশে গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎ অন্ধকারাচ্ছন্ন হবে। মনে রাখতে হবে, ফাঁসির মঞ্চে গেয়ে গেল সারাজীবনের জয় গান। আসি অলক্ষে দাঁড়ায়েছে তারা, এবং প্রশ্ন করছে, "দিবে কোন বলিদান।" আজকের প্রজাতন্ত্র দিবসে দেশের মানুষকে শপথ গ্রহণ করতে হবে যে দেশকে এবং দেশের মানুষকে আমরা বাঁচাবই। সঙ্কল্প করতে হবে "করেঙ্গে ইয়া মরেঙ্গে" মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীর পতন। ভারতের জয় হবেই। কোটি কণ্ঠে আওয়াজ তুলতে হবে, 'জয় হিন্দ্'।

বন্দে-মাতরম্

॥ যাদের জীবনে লভীয়া জীবন ॥

—সুবোধ চক্রবর্ত্তী

●

মুক্তি সাধনার গোপন প্রস্তুতি চলেছে। পরাধীন ভারতের বিপ্লবী সৈনিকদের মুক্তি সাধনা। বাংলার দৃঢ় প্রতিজ্ঞ বিপ্লবীদের অতি গোপন আয়োজন চলছে গোপনতার সুড়ঙ্গপথে। সংগ্রহ চলছে রিভলবার, পিস্তল, বোমা তৈরীর আয়োজন স্থানে স্থানে।

ইংরাজ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম বিপ্লবীদের। সীমাহীন স্পর্দ্ধা তাঁদের। অফুরন্ত কর্মশক্তি। মুক্তি সংগ্রামের প্রেরণা দেশপ্রেমে।

কত দেশ প্রেমিক করেছেন আত্মত্যাগ। মৃত্যুহীন অমৃতলোকে হয়েছে তাঁদের স্থান। কত অজানা শহীদ সবার অলক্ষ্যে হারিয়ে গেছেন দৃষ্টির আড়ালে। পরিচয় মুছে গেছে তাঁদের। গোপনতার অবগুণ্ঠনে ঢেকে আছে সব।

বাংলার শহীদ-কুলের ইতিহাস আজও রচিত হয়নি। তাঁদের বুকের রক্ত চিহ্ন আজও বর্তমান। সেই রক্তে মাটি হয়েছে উর্বর। ফলেছে স্বাধীনতার ফসল। কিন্তু বীরগণ আজও হয়েছেন নামহীন। তাঁরা দিয়েছেন বিলিয়ে সব কিছু, পরিবর্তে চাননি কিছুই। তাঁদের ইতিহাসের এক অধ্যায় লিখিত হলো এই প্রবন্ধে।

১৯০৭ সনে রক্ত হলো বাংলা প্রথম শহীদের চরণ স্পর্শে। শহীদ প্রফুল্ল চক্রবর্তী, তাঁর আজ আর মিলবে না কোন পূর্ণ পরিচয়। তাঁর রক্তের স্বাক্ষর হয়েছে শুধু বিপ্লবীদের চলার পথে। তাঁর অপূর্ব নিষ্ঠা মিলিয়ে আছে আকাশে বাতাসে।

দেওঘর কুহিনী পাহাড়ে উল্লাস কর দত্তের তৈরী বোমা পরীক্ষার সময় মৃত্যুকে আলিঙ্গন করেন তিনি।

১৯০৭ সনের প্রস্তুতি রূপায়িত হলো ১৯০৮ সনে। গত বৎসরের রক্ত ধারায় বিপ্লবীদের পাথেয় হয়েছে সঞ্চিত। প্রস্তুতি হয়েছে সমাপ্ত। এবার শুরু হলো আক্রমণ ইংরাজ রাজপুরুষদের ওপর।

৩০শে এপ্রিল মজফরপুরে কিংস ফোর্ডের গাড়ীর ওপর বোমা নিক্ষেপ করা হলো। এ সীমাহীন সাহস আর কারো নয়, দুটি কিশোর বিপ্লবী প্রফুল্ল চাকী আর ক্ষুদিরাম।

কিন্তু ভুল হয়ে যায় তাঁদের। গাড়ীতে ছিলেন মিসেস ও মিস কেনেডি। তবু দেশবাসী অভিনন্দন জানালো। নেতাগণ হলেন আনন্দিত। মৃত্যু হলো তাদের দুজনেরই।

পরদিন ভোরে ইচ্ছা মৃত্যুবরণ করলেন প্রফুল্ল চাকী। নিজের রিভলবার গুলি বিদ্ধ মস্তকে। পুলিশকে দিলেন ফাঁকী।

বন্দী হলেন ক্ষুদিরাম পুলিশের হস্তে। বিচারের প্রহসনে ফাঁসীর হুকুম হলো। তারপর ১১ই আগষ্ট একটি ফুলের মালার মতো ফাঁসির দড়ি পরলেন গলায়। মুহূর্তে সব হয়ে গেল শেষ। তাঁর দেহমুক্ত আত্মা মিলিয়ে গেল আকাশে। কিন্তু মুক্তি নেই প্রফুল্ল চাকী গ্রেপ্তারকারী দারগা নন্দলালের।

বিপ্লবীদের তীক্ষ্ণদৃষ্টি তার ওপর। অকস্মাৎ গর্জে উঠলো এক বিপ্লবীর আগ্নেয়াস্ত্র। কোলকাতার সারপেনটাইন লেনে শ্রীশ পাল এর গুলিতে নিহত হলেন নন্দলাল ব্যানার্জী।

এই সনেই আবার শহীদের রক্তে রাঙ্গা হলো ঢাকার মাটি। অর্থ সংগ্রহ করার কাজে গোপাল সেন নিয়োজিত গ্রামে। পুলিশের সঙ্গে হয় প্রচণ্ড সংঘর্ষ। পুলিশের গুলি এসে বিদ্ধ হয় তাঁর বুকে। তারপর মাটির বুকে আশ্রয় নিলেন তিনি। চির নিদ্রা নেমে এলো চোখে।

আলিপুর বোমার মামলা। রাজসাক্ষী নরেন্দ্র গোঁসাই। আলিপুর জেলে বিপ্লবী বন্দীগণ আবদ্ধ।

বিশ্বাস হত্যার চরম সাজা দেবার প্রস্তুতি হয়েছে সমাপ্ত। কারা প্রাচীরের রন্ধ্র পথে এসেছে রিভলবার দুটি।

জেল হাসপাতালে অসুস্থ কানাইলাল দত্ত। সত্যেন বসুও এলেন অসুস্থতার ভান করে।

কানাইলালের চিঠি পেয়ে দেখা করতে এল সুরেন্দ্র গোসাই হাসপাতালে।

সত্যেন গুলি চালালেন, অসুস্থ কানাইলালের রিভলবার গর্জে উঠলো। গুলিবিদ্ধ হলো নরেন।

প্রাণ ভয়ে ভীত নরেন ছুটে পালালেন। কিন্তু মুক্তি নেই বিশ্বাসঘাতকের। কানাইলালের গুলিতেই তাঁর মৃত্যু হলো।

বিচারে ফাঁসির হুকুম হলো কানাইলাল ও সত্যেনের। নির্দিষ্ট দিনে হলো ফাঁসি। তাঁদের অপূর্ব আত্মত্যাগ আজও জেগে আছে বাংলার ঘরে ঘরে। ১০ই ও ২১শে নভেম্বর এই তারিখ দুইটিতে ফাঁসি হল তাঁদের।

আলিপুর বোমার মামলা চলেছে তখনো। সরকারী উকিল তাঁর কাজে নিয়োজিত। বিপ্লবীদের বিরুদ্ধে হাজারো প্রমাণ দাখিল করেছেন তিনি। গর্বিত তার কণ্ঠ।

সহসা সরকারী উকিলের বুকে বিদ্ধ হলো একটি রিভলবারের গুলি।

আদালতে ধৃত হলেন এক যুবক। তার নাম চারু চন্দ্র বসু। দক্ষিণ হস্তে 'পক্ষাঘাত'। সেই হাতে রিভলবার বাঁধা। বাঁ হাত দিয়ে রিভলবারের ঘোড়া টিপে গুলি করেছেন তিনি। তিনিও ফাঁসির মঞ্চে জীবন দান করিলেন। সে বছরটি ছিল ১৯০৯ সন।

আলিপুরের বোমার মামলার আপিল চলেছে হাইকোর্টে। এ মামলায় পদোন্নতি হয়েছে সামসুল আলমের। পুলিশ ইন্সপেক্টার থেকে হয়েছেন পুলিশের ডেপুটি সুপারেনটেনডেন্ট। মহাখুশি তিনি। নথিপত্র তাঁর হাতে। মামলা শেষ করে সিঁড়ি বেয়ে নেমে আসছেন। গর্বিত তাঁর পদক্ষেপ।

বীরেন্দ্র গুপ্ত এগিয়ে এলেন তাঁর সম্মুখে। পথ রুদ্ধ করে প্রশ্ন করলেন যুবক, 'Are you Samsul Alam ?' 'yes' বললেন তিনি।

বীরেন্দ্রের রিভলবার অকস্মাৎ গর্জে উঠলো। মৃত্যু হলো মিঃ আলমের। ইংরাজের রাজশক্তি তাঁকে রক্ষা করতে পারে নি।

১৯১০ সনের ২৪শে ফেব্রুয়ারী বীরেন্দ্র দত্ত গুপ্তকে ফাঁসি দেওয়া হল।

১৯১২ সন। ডিসেম্বর।

উৎসবে মুখরিত দিল্লী নগরী। কোলকাতা থেকে স্থানান্তরিত হয়েছে রাজধানী দিল্লীতে। নির্দিষ্ট দিনে গভর্ণর জেনারেল হার্ডিঞ্জ প্রবেশ করবেন নূতন রাজধানীতে।

চলেছে শোভা যাত্রা রাজপথ দিয়ে। হস্তী পৃষ্ঠে সজ্জিত হাওদায় হার্ডিঞ্জ ও তাঁর স্ত্রী।

অকস্মাৎ উৎসব বন্ধ হলো। একটি মাত্র বোমা বিস্ফোরণের ফলে। বোমার আঘাতে মাটিতে ছিটকে পড়েছেন বড়লাটপত্নী। বড়লাটও আহত হয়ে পড়ে রইলেন হাতীর পিঠে। হস্তী চালকের হলো মৃত্যু।

এই উপলক্ষে গ্রেপ্তার হলেন বসন্ত বিশ্বাস। বিচারের প্রহসন চললো কয়েকমাস ধরে। তারপর যথা নিয়মে হলো ফাঁসির আদেশ। ফাঁসীর মঞ্চে বীর শহীদ দিয়ে গেলেন নিজের দেহ মায়ের চরণ তলে।

বিপ্লবী তরুণ কর্মী যোগেন্দ্র অনুসরণ করছেন ক্রীহট্টের ডি, সি, মিঃ গর্ডনকে। বিপ্লবী প্রচেষ্টা চলেছে অতি গোপন পথে। অবশেষে ১৯১২ সনের ১৮শে মার্চ এলো সেই শুভদিনটি। মেলভি বাজারে যুবক অপেক্ষা করছেন বোমা হাতে নিয়ে। কিন্তু অকস্মাৎ বোমাটি তাঁর হাতে ফেটে যায়। এবং ঘটনা স্থলেই হয় তাঁর মৃত্যু।

১৯১৬ সন।

আসাম সীমান্তে চলেছেন পায় হেটে অজ্ঞাত বিপ্লবী নেতা। এসেছে দূরের আহ্বানে, চলেছেন শত্রুরের পথে, বিপ্লবী নেতা শ্রীশমিত্র (হাবুমিত্র) বৃটা কোম্পানীর অস্ত্র উধাও করার অন্যতম নায়ক তিনি, চলেছেন এগিয়ে, আরো এগিয়ে। ভারতের সীমা অতিক্রম করে চীনে প্রবেশ করার নির্দেশ তাঁর উপর—দলের নির্দেশ।

সহসা সীমানা রক্ষির বজ্র কণ্ঠ ধ্বনিত হলো, 'হু কামস দেয়ার?' জবাব এলো না দুর্গম পথের যাত্রীর কণ্ঠ হতে। সম্মুখে তাঁর গতি। দাঁড়াবার সময় যে নেই। মুক্তি পাগল বিপ্লবী মুহূর্তের জন্যও পেছন ফিরে তাকালেন না।

গর্জে উঠলো রাইফেল। বিপ্লবীর দেহে বিদ্ধ হলো গুলি। কঠিন পাথর তাকে বুকে তুলে নিলো। কঠিনতার বুকেও যেন জেগেছে মায়া। বিপ্লবীর রক্ত ধারায় ভিজে গেল পাহাড়ের বুক। শহীদ শ্রীশ মিত্রের আত্মাহুতি দেবার রক্ত চিহ্ন আজও বুঝি বর্তমান।

১৯১৫ সনের ১৩ই ফেব্রুয়ারী।

বালেশ্বরের গভীর জঙ্গল। পাঁচজন বিপ্লবী অপেক্ষা করছেন অতি গোপনে জার্মান থেকে অস্ত্র বোঝাই জাহাজ এসে পৌঁছাবে। সেই অস্ত্রের সন্ধানে এসেছেন যতীন্দ্র মুখার্জী এসেছেন অপর বিপ্লবী বন্ধুগণ।

আত্মগোপন করে আছেন বিপ্লবীগণ

পুলিশের কাছে খবর পৌঁছে গিয়েছিল খবর। স্বয়ং পুলিশের সুপার [illegible] উপস্থিত হলেন অসংখ্য সৈন্য সঙ্গে।

সহসা গর্জে উঠলো রাইফেল আর মাউজার পিস্তল। তুমুল যুদ্ধ শুরু হলো বিপ্লবীদের সঙ্গে।

গুলির জবাবে চলেছে গুলি বিপ্লবীদের পিস্তল হতে। একেবারে সামরিক কায়দায় চলেছে তাঁদের যুদ্ধ। অকস্মাৎ গুলির আঘাতে প্রাণ বিসর্জন দিলেন চিত্ত প্রিয়। আহত হলেন দলের নেতা যতীন মুখার্জী। নীরেন দাস গুপ্ত, মনোরঞ্জন সেনগুপ্ত, জ্যোতিশ দাস বন্দী হলেন।

কটকের হাসপাতালে বাংলার বাঘা বিপ্লবী বাঘা যতীন লাভ করলেন মহাপ্রয়াণ। ফাঁসীর মঞ্চে জীবন দান করলেন নীরেন ও মনোরঞ্জন।

এই বছরও চলছিল বিপ্লবী প্রথার অর্থ সংগ্রহ করার কাজ। ১৯৩৪ সনের ৩০শে এপ্রিল। নদীয়া জেলার প্রাগপুর গ্রামে অর্থ সংগ্রহ করার কাজে নিয়োজিত সুশীল সেন। সীমাহীন সাহস ও নিষ্ঠা তাঁর কাজে। কিন্তু কঠিন সংঘর্ষ শুরু হলো অপর

পক্ষের সঙ্গে। মৃত্যু হলো তাঁর ঘটনা স্থলেই। শহীদ সুশীল সেনের একনিষ্ঠতায় রক্ষিত হলো দলের চলার পথের পাথেয়।

নলিনী বাকচি বাংলার অন্যতম বিপ্লবী। তাঁর অপূর্ব বিপ্লব নিষ্ঠা ইতিহাসের পাতায় উজ্জ্বল হয়ে থাকবে।

আসামের গৌহাটী পাহাড়। বিপ্লবীগন সমবেত হয়েছেন গোপন আস্তানায়। গৌহাটী শহরের লড়াই শেষ করে আশ্রয় নিয়েছেন পাহাড়ের ওপর।

পাহাড়ের চারদিকে পুলিশ। উপর থেকে পাথর ফেলে পুলিশদের খতম করা হচ্ছে। ভীষণ সংগ্রামে রত বিপ্লবীগণ।

কিন্তু এ কি অকস্মাৎ পাহাড়ের উপর পুলিশের আগ্নেয়াস্ত্র গর্জে উঠলো। শুরু হলো সম্মুখ সংগ্রাম। গুলির জবাবে গুলি। এই যুদ্ধে নলিনী ঘোষ ও প্রভাস লাহিড়ী আহত হয়ে ধৃত হন। নলিনী বাকচি ও আরো কয়েকজন বিপ্লবী পুলিশকে ফাঁকি দিতে সক্ষম হন। আসাম থেকে বিহার, বিহার থেকে এলেন নলিনী কোলকাতায়। অসুস্থ তিনি। ক্লান্ত দুটি চরণ। জ্বরে সমস্ত শরীর উত্তপ্ত। দেহ হলো অক্ষম। কোলকাতার গড়ের মাঠেই রইল শুয়ে। দেখা হয়ে গেল বিপ্লবী সতীশ পাকড়াশীর সঙ্গে। তাই তাঁর মিললো আশ্রয়।

চাকা এসেছেন নলিনী বাকচি, অপর বিপ্লবীদের সঙ্গে একত্রে একটি বাসা ভাড়া করে রইলেন। ২৮নং কলতা বাজারের বাসাটি বিপ্লবীদের হলো একটি আস্তানা।

১৯১৮ সন। ১৫ই জুন

রাত্রি শেষে বাসার চারদিকে পুলিশের পদধ্বনি। পুলিশ সুপার ও ইন্সপেক্টার এসেছেন তাঁদের সৈন্য নিয়ে। দেওয়াল টপকে প্রবেশ করতে হলো বাড়ীর ভেতর। তারপর শুরু হলো সম্মুখ যুদ্ধ। যুদ্ধে তারিণী মজুমদারের মৃত্যু হল। আহত হলেন নলিনী বাকচি।

গ্রেপ্তার করা হলো বিপ্লবী নলিনী বাকচিকে। শুরু হলো পুলিশের প্রশ্নবান। কিন্তু বিপ্লবীর কণ্ঠ নীরব। নিজেকে প্রচার করতে চান না তিনি। মহান মৃত্যুর পদধ্বনি শুনতে পাচ্ছেন। পরম আদরে তাকে গ্রহণ করার জন্য প্রস্তুত তার অন্তর। পুলিশের প্রশ্নের উত্তরে শুধু বললেন তিনি, Ah? dont disturb me let me die peacefully. তারপর তাঁর অমর আত্মা মিলিয়ে গেল উর্ধ্ব লোকে।

অত্যাচারী টেগার্ট। তাঁর অত্যাচারে দেশবাসী অতিষ্ঠ। হৃদয়হীনতার সীমা নেই তাঁর।

টেগার্টকে নিধন করার চেষ্টায় দৃঢ় প্রতিজ্ঞ গোপীনাথ সাহা। ১৯১৪ সন। ১২ই জানুয়ারী। রিভলবার সহ প্রস্তুত হয়ে নেমে এলেন রাস্তায়।

চৌরঙ্গী রোড হল এণ্ড এণ্ডারসন কেম্পানীর কাছে গর্জে উঠলো গোপীনাথের আগ্নেয়াস্ত্র। গুলি বিদ্ধ হলো সাহেবের গায়, মৃত্যু হলো তখনি তাঁর।

কিন্তু এতো টেগার্ট নয়, গুলি বিদ্ধ অবস্থায় রাস্তায় লুটিয়ে আছেন কিলবার্ণ কোম্পানীর আর্নেষ্টডে।

গ্রেপ্তার হলেন গোপীনাথ। হাইকোর্টের বিচারে তাঁর ফাঁসির হুকুম।

ফাঁসির সেলে গোপীনাথ। এক অপূর্ব আনন্দে ছেয়ে আছে তাঁর অন্তর। ওজন বৃদ্ধি পেলো পাঁচ পাউণ্ড।

১লা মার্চ চির বাঞ্ছিত মৃত্যুকে আলিঙ্গন করলেন গোপীনাথ ফাঁসির মঞ্চে।

সারা ভারতে উত্তেজনার ঢেউ খেলে গেল। শুরু হয়েছে বিক্ষোভ কাকোরি ষড়যন্ত্র মামলায় গ্রেপ্তার করা হয়েছে বহু দেশপ্রেমিককে। পুলিশের হাতে মজুত রাজদ্রোহের দলিল। মিলেছে শচীন সান্যালের রচিত বন্দী জীবন, শ্বেত পত্র, সবুজ পত্র। হস্তগত করেছে বিস্ফোরক পদার্থ।

পুলিশের ডি, আই, জি মিঃ নর্টন তদন্ত করছেন মোকদ্দমা। ১৯৩৬ সনের ৩রা মে থেকে শুরু করে ১৯২৭ সনের ১২ই মার্চ পর্যন্ত চলে মামলা। ৬ই এপ্রিল রায় প্রকাশ পেলো মামলার। এই মামলায় ফাঁসি হয় :—আসফাক উল্লা, রামপ্রসাদ বিসমিল, রোসন সিং রাজেন লাহিড়ী।

পলাতক চন্দ্রশেখর আজাদ। ১৯৩১ সনের ২৭শে ফেব্রুয়ারী পুলিশের দৃষ্টি পথে আসেন। এলাহাবাদের এলফ্রেড পার্কে তাঁকে গ্রেপ্তার করতে পুলিশ এগিয়ে আসে। কিন্তু বিপ্লবী আজাদ পুলিশের সঙ্গে শুরু করেন লড়াই। আহত হয় ইংরাজ পুলিশ কর্মচারী। কিন্তু রিভলবারের গুলি ফুরিয়ে আসছে তাঁর। শত্রুর হস্তে বন্দীর চেয়ে মৃত্যুই কাম্য। তাই রিভলবারে শেষ গুলিটি নিক্ষেপ করলেন আপন মস্তকে মৃত্যুর কোলে আশ্রয় নিলেন বীর বিপ্লবী চন্দ্রশেখর আজাদ।

আই বি বিভাগের ডে পু টি সুপারেনটেনডেন্ট ভূপেন্দ্র চাটার্জী। গুপ্ত খবর সংগ্রহ করার প্রবল আগ্রহ তাঁর। তাই তিনি নিয়মিত আসেন প্রেসিডেন্সি জেলে। জেল গেট থেকে সোজা চলে যান সেন্ট্রিগেসন ইয়ার্ডে।

বোমা ইয়ার্ডে ছিলেন দক্ষিণেশ্বর বোমার মামলার বন্দী বীরগণ। বিপ্লবীদের কাছ থেকে খবর আদায় করার কৌশল প্রয়োগ করেন ভূপেন্দ্র চাটার্জি। কিন্তু আই বি ডেপুটির জানা ছিল না যে বিপ্লবীদের নিয়ে খেলা করা চলে না।

সূর্য্য পশ্চিম আকাশে ডুবে যাচ্ছে প্রায়। কয়েদীদের দিনের কাজ হয়েছে সমাপ্ত। আহারের আয়োজন চলেছে তাদের।

অকস্মাৎ ভূপেন চাটার্জিকে আক্রমণ করেন জন কয়েক বিপ্লবী বন্দী। তাদের হস্তে লোহার ডাণ্ডা।

লোহার ডাণ্ডার আঘাতে মৃত্যু হয় গোয়েন্দা ডেপুটির। তারপর বিচারের প্রহসন করে ফাঁসির দড়িতে ঝুলিয়ে দেওয়া হয় অনন্তহরি মিত্র ও প্রমোদ রঞ্জন চৌধুরীকে।

সেইদিন ছিল ৯ই আগষ্ট ১৯৩৬ সন।

১৯২৭ সনে এলো সাইমন কমিশন। Go back Simon আন্দোলন শুরু হলো। জাতীয় নেতাগণ এগিয়ে এলেন। দিকে দিকে শুরু হল বিক্ষোভ। সভা আর শোভাযাত্রায় দেশ মুখরিত।

পুলিশের নির্মম অত্যাচার চলে দেশবাসীর ওপর। কত দেশপ্রেমিকের ওপর লাঠি চালিয়েছে পুলিশ। কত কর্মী হয়েছে কারারুদ্ধ। নেতা-পণ্ডিত মদন মোহন মালবা ও লালা লাজপত রায় নেতৃত্ব গ্রহণ করেছেন জনতার। তাদের ওপরও চলে নির্মম প্রহার। এই প্রহারের ফলে মৃত্যু হয় দেশ নেতা লালা লাজপত রায়এর।

মৃত্যুঞ্জয়ী যতীনদাস। তাঁর আত্মত্যাগের অপূর্ব্ব ইতিহাস লেখা হয়ে আছে ভারতবাসীর অন্তরলোকে। তিনি সর্বজন প্রিয়।

লাহোর ষড়যন্ত্র মামলায় ধৃত হন যতীন দাস। বোরষ্টাল জেলে তাঁকে আটক রাখা হয়। মামলার চলেছে বিচার।

জেল কর্তৃপক্ষের অন্যায় অবিচার চলতে থাকে

বন্দীদের ওপর। ৫৩ প্রতিভূ বন্দীগণ জানান তীব্র প্রতিবাদ। রাজনৈতিক বন্দীদের যথার্থ মর্য্যাদার দাবী তাঁদের কণ্ঠে। শুরু হয় অনশন ধর্মঘট।

জেল কর্তৃপক্ষ চালালো অত্যাচার আরো নির্মম ভাবে। জোর জবরদস্তি চললো তাঁর ওপর। কিন্তু সঙ্কল্পে অটুট-দেশ প্রেমিক যতীন দাস। অনশন ভঙ্গ করা তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। মৃত্যুকে আলিঙ্গন করবেন তিনি যদি দাবী পূর্ণ না হয়।

দিনের পর দিন চলে যাচ্ছে। দেশবাসীর অন্তর হাহাকার করে উঠলো। তিল তিল করে মহান মৃত্যু বরণ করলেন বীর যতীনদাস। বিপ্লবী একনিষ্ঠার মূর্ত প্রতীক যতীন দাস। ৬৪ দিনে বাঞ্ছিত মৃত্যু এসে হাত ধরে নিয়ে যায় অমৃত লোকে।

সেদিন ছিল ১৩ই সেপ্টেম্বর—১৯২৯।

১৯৩০ সন। এপ্রিল মাস।

চট্টগ্রামের বিপ্লবীদের অগ্নিনালিকা গর্জে উঠলো চট্টগ্রাম এলো বিপ্লবীদের দখলে সাময়িক ভাবে। জালালাবাদে বিপ্লবীদের দখলে অপূর্ব যুদ্ধের কৌশল, ধলঘাটের সংগ্রাম পাহাড় তলীর ক্লাব আক্রমণ ঘটে গেল যেন কোন যাদুদণ্ড স্পর্শে।

১৮ই তারিখ চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার আক্রমণ করা হলো তার পরে পর পর ঘটে যায় কত না যুদ্ধ, নানা ধরনের গুপ্ত কাজ! সে রোমাঞ্চকর ঘটনা উপন্যাসকেও হার মানায়।

কত শহীদের রক্তে রাঙ্গা হয়েছে চট্টগ্রাম। কত অত্যাচারীর উদ্ধত শির ধূলায় লুটিয়েছে বিপ্লবীদের গুলির আঘাতে। শক্তি সাধক বাঙ্গালীর মূর্ত প্রতীক চট্টগ্রাম। ধন্য চট্টগ্রাম!

অস্ত্রাগার আক্রমণের পূর্বে বিপ্লবের আয়োজন চলছিল। সেই প্রস্তুতির মুখে ট্রেনিংয়ের সময় বোমা বিস্ফোরণে দুজন আলিঙ্গন করেন ধীরেন দে। তারপর শুরু হলো আত্মবলির পালা।

১৮ই এপ্রিল, ১৯৩০ সন। আক্রমণ করা হলো চট্টগ্রামের অস্ত্রাগার। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হলো হিমাংশু সেনের।

২২শে এপ্রিল হলো জালালাবাদ যুদ্ধ। এ যুদ্ধে ১২ জন বিপ্লবী সম্মুখ সমরে বীরের মৃত্যু বরণ করেন—

১। নরেশ রায় ২। ত্রিপুরা সেন ৩। বিধু ভট্টাচার্য ৪। হরিগোপাল বল (ট্যাগরা) ৫। মতি কানুনগো ৬। প্রভাস বল ৭। মনোরঞ্জন সেন ৮। নির্মল লালা ৯। জীতেন দাশগুপ্ত ১০। মধুসূদন দত্ত ১১। পুলিন ঘোষ ১২। অর্দ্ধেন্দু দস্তিদার।

এপ্রিল মাসেই অপর এক সংঘর্ষ হয় গহিরা আশ্রমে। এই সংঘর্ষে মৃত্যু হয় সমরেন্দ্র নন্দীর।

১৫ই মে আবার বিপ্লবীদের আগ্নেয়াস্ত্র জবাব দিলো ইংরাজের আক্রমণের বিরুদ্ধে। আবার গুলির আওয়াজে চকিত হলো চট্টগ্রামবাসী। এবার যুদ্ধ হলো কালার পোলো। এ যুদ্ধে মৃত্যুর গৌরব লাভ করলেন—রজত সেন। স্বদেশ রায়, দেবপ্রসাদ গুপ্ত, মনোরঞ্জন সেন।

১৯৩০ সনে অপর একটি আন্দোলন চলেছিল। টেলিগ্রামের তার কাটা চলছিল অতি গোপনে। নৃপেন দত্ত ও বীরেন রায় চৌধুরী দুটি তরুণ জলপাইগুড়িতে টেলিগ্রামের তার কেটে কেটে চলেছেন। প্রভাত হয়েছে, কিন্তু কুয়াশায় ছেয়ে আছে চারদিক। রেল লাইনের ওপর দিয়ে চলেছেন তাঁরা। অকস্মাৎ একটি ট্রেন এসে পড়ে একেবারে তাদের উপর। মৃত্যু হলো দুজনারই ঘটনাস্থলে।

টেগার্টকে আবার আক্রমণ করা হয় ১৯৩০ সনের ২৫শে আগষ্ট। এ আক্রমণে নিহত হন বিপ্লবী অনুজা সেন।

১৯৩০ সন। ১লা ডিসেম্বর।

খবর পৌঁছে গেল বিপ্লবীদের কাছে। আজই আসবেন পুলিশের বড় কর্তা ক্রেইগ সাহেব চাঁদপুরে।

প্রস্তুত হলেন রামকৃষ্ণ বিশ্বাস। দলের নির্দেশে প্রস্তুত তিনি। ট্রেন এসে দাঁড়ালো চাঁদপুর ষ্টেশনে। ভোরের আলো দেখা দিয়েছে পূর্ব-গগনে কিন্তু আঁধার তখন মিলিয়ে যায়নি আলোর স্পর্শে। অকস্মাৎ গর্জে উঠলো রামকৃষ্ণ বিশ্বাসের রিভলবার। অব্যর্থ তাঁর নিশানা। কিন্তু কোথায় ক্রেইগ? এ যে পুলিশ ইনস্পেক্টার তারিণী মুখার্জী। আহত মুখার্জীর আর্তনাদ ভেসে উঠল বাতাসে।

অসংখ্য লোকের মাঝেও উধাও হয়ে গেলেন রামকৃষ্ণ। পায় হেঁটে চলে এলেন মেহের কালীবাড়ী।

মেহের কালীবাড়ীতেই ধৃত হলেন তিনি। তারপর বিচারে হলো ফাঁসির হুকুম। এবং নির্দিষ্ট দিনে ফাঁসির মঞ্চে জীবন দান করেন তিনি।

৮ই ডিসেম্বর। ১৯৩০ সন।

দুপুর প্রায় একটা। অকস্মাৎ গর্জে উঠলো রিভলবার। ডালহৌসী স্কোয়ার এলাকা হলো চঞ্চল। পথচারীদের পথ চলা বন্ধ। দাঁড়িয়ে গেছে ট্রাম, দাঁড়িয়ে গেছে বাস।

রাইটার্স বিল্ডিংস্-এর দেয়ালে দেয়ালে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে গুলির আওয়াজ। ভয়ে ভীত ইংরাজ রাজপুরুষগণ। পলায়নের পথ খুঁজছে তাঁরা। কিন্তু কোথায় পথ? অগ্নি বৃষ্টি হচ্ছে। বিপ্লবীদের অগ্নিনালিকা গর্জে উঠছে থেকে থেকে।

বাংলার কারাসমূহের বড় কর্তা গুলি বিদ্ধ হন। তাঁর প্রাণহীন দেহ পড়ে রইলো টেবিলের ওপর।

কে এই বিপ্লবীগণ? কোন মাতৃবক্ষ হতে অনন্ত সুধা ধারা পান করে পেয়েছে এই সীমাহীন সাহস?

এ যে ত্রয়ী বীর! বিনয় বসু, দীনেশ গুপ্ত, সুধীর গুপ্ত (বাদল)।

শুরু হলো আবার যুদ্ধ। রাইটার্স বিল্ডিংস্-এর অলিন্দের যুদ্ধ। ছুটে এলো টেগার্টের বাহিনী। কিন্তু সাধ্য কি ওদের তিন জনের কাছে এগিয়ে যায়! বীরত্ব ঘুচে যায় তাদের।

দপ্তরের পর দপ্তর আক্রমণ করেছেন বিপ্লবীগণ। গুলির পর চালাচ্ছেন গুলি। আহত হচ্ছেন ইংরাজ রাজপুরুষগণ।

ফুরিয়ে গেল বিপ্লবীদের রিভলবারের গুলি। একটি করে মাত্র গুলি রয়েছে অবশিষ্ট।

হুকুম হলো নেতা বিনয় বসুর। দাঁড়িয়ে গেল সবাই। পটাসিয়াম সাইনাইডের প্যাকেট পুরে দিল মুখে। বাদলের প্রাণহীন দেহ লুটিয়ে পড়লো মাটিতে।

সায়নাইড খেয়েও নিশ্চিন্ত নন বিনয় ও দীনেশ। গর্জে উঠলো রিভলভার। আপন মস্তকে বিদ্ধ করলো গুলি।

বীরদর্পে এলো পুলিশ। গ্রেপ্তার হলো তিনজন। মিলেছে পলাতক বিনয়কে। পুলিশের আই. জি লোম্যান নিধনকারী বিনয়কৃষ্ণ বসুকে।

হাসপাতালে বিনয়-দীনেশ। রাজকীয় চিকিৎসা চলছে তাদের। লুপ্ত প্রায় চৈতন্য বিনয়ের। মাঝে মাঝে প্রলাপ উচ্চারিত হচ্ছে।

মনে পড়ে যায় মাকে বলে চলেন, ছেলে ছেলে

জীবন কাটাবার জন্য তোমার ছেলের জন্ম হয়নি মা!'

মুহূর্তে আঙুল চালিয়ে দেন মাথায়। ক্ষতস্থান থেকে রক্ত ঝরে পড়ে। বিবাক্ত হয়ে গেল বা।

চির বাঞ্ছিত মৃত্যুর পদধ্বনি শোনা যায় বুঝি! ধীরে ধীরে মৃত্যুর ছায়া নেমে আসে সারা অঙ্গে। তারপর ১৩ই ডিসেম্বর বাঞ্ছিত মৃত্যুর কোলে লাভ করেন চির-শান্তি। বিপ্লবী বিনয় বসু।

দীনেশের বিচার হলো আদালতে। হুকুম হলো ফাঁসির। আলিপুর সেনট্রাল জেল। ৭ই জুলাই।

রাত্রি তখনো শেষ হয়নি। আঁধারের চাদর লেপ্‌টে আছে গাছে গাছে।

দীনেশ এসে দাঁড়ালেন ফাঁসির মঞ্চে। বলিষ্ঠ দেহ, উন্নত ললাট, বীরত্বের বিভা তাঁর সারা অঙ্গে।

তুলে নিলেন ফাঁসির দড়িটি হাতে। তারপর হাসিমুখে গলিয়ে দিলেন গলায় পরম আদরে।

মুহূর্তে সব হয়ে গেল শেষ। দীনেশের প্রাণহীন দেহ পড়ে রইলো। মৃত্যুর স্নেহ স্পর্শে যেন হয়েছেন সুন্দর। সৌন্দর্যের ধারায় স্নান করে হয়েছে পবিত্র দেহ-তনু। চির-সুন্দরের স্পর্শ মিলেছে তাঁর।

১৯৩১ সন। ২৭শে জুলাই।

আলিপুর বিচারালয়। বিচার চলেছে আদালতে। জজ সাহেব নিজের আসনে বসে শুনছেন সওয়াল জবাব। উকিলের কণ্ঠ ভেসে আসছে।

বিচারক গার্লিক। দীনেশ গুপ্তের বিচার করেছেন তিনি। তাঁর কলমে ঘোষিত হয়েছে মৃত্যু দণ্ড।.....

সহসা বিচারকের বক্ষে একটি গুলি বিদ্ধ হলো। বিস্মিত সবাই। ভয়ে ভীত আদালতের লোকজন। এক কোণে দাঁড়িয়ে আছেন এক যুবক রিভলভার হস্তে। তাঁর ওষ্ঠে লেগে আছে যেন মধুর হাসি। পকেট থেকে তুলে নিলেন সাইনাইডের শিশি। পরম নিশ্চিন্তে অমৃত পান করলেন তিনি। লুটিয়ে পড়লো তাঁর দেহ।

কনেষ্টবল ও সার্জেন্টের চেষ্টা ব্যর্থ হলো। তাদের শত চেষ্টাকে অতিক্রম করে বিপ্লবী যুবক মৃত্যুর শীতল কোলে আশ্রয় নিয়েছেন। চির শান্তি নেমে এলো। চির নিদ্রায় নিদ্রিত তিনি।

হলো তল্লাসী তাঁর পবিত্র দেহ। রয়েছে রিভলভার আর ১৪টি তাজা গুলি। পকেটে একটি কাগজ। লেখা রয়েছে, 'তুমি নিপাত যাও, দীনেশের প্রতি যে অবিচার করিয়াছ, তাহার ফল ভোগ কর।

ইতি—

বিমল গুপ্ত।'

কিন্তু কে এই বিমল গুপ্ত - হয়রাণ হলো গোয়েন্দা ধুরন্ধরগণ। সন্ধান মিলে না তাঁর।

সন্ধান মিলে যার অবশেষে পুলিশের তৎপরতায়। বিমল গুপ্ত তাঁর ছদ্ম নাম। নাম তাঁর কানাই ভট্টাচার্য্য।

নিজের পরিচয় মুছে ফেলে আত্মত্যাগের অপূর্ব দৃষ্টান্ত রেখে যান মৃত্যুঞ্জয়ী কানাই।

অত্যাচারী পুলিশ ইন্সপেক্টার। কুখ্যাত ইন্সপেক্টার আসানোল্লা। তাঁর হৃদয়হীনতার বহু নিদর্শন বর্তমান। সহরবাসী ভীত তার বর্বর অত্যাচারে। বিপ্লবীদের সন্ধানে তার সীমাহীন তৎপরতা। ইংরাজের গোলামী মিশে গেছে তাঁর রক্তে। ইংরাজের করুণাআশীষ তাঁর বর্বর পথের পাথেয়।

চট্টগ্রামের বিপ্লবীগণ চুপ করে নেই। তাঁরা লক্ষ্য করে আসানৌল্লার গতিবিধি। তাঁর শেষ দিন ঘনিয়ে এলো বুঝি।

একদিন অতর্কিতে গুলি বিদ্ধ হলেন আসানৌল্লা। রিভলবার হস্তেই মৃত হলেন কিশোর বিপ্লবী হরিপদ ভট্টাচার্য্য।

বিচার হলো আদালতে। যথা নিয়মে হলো ফাঁসির হুকুম।

সে বছরটি ছিল ১৯৩১ সন।

১৬ই সেপ্‌টেম্বর। ১৯৩০ সন।

হিজলির বিশেষ জেল। বাংলার রাজবন্দীদের কারাগার। বছরের পর বছর আটক রাখা হচ্ছে বিনা বিচারে তাঁদের। আইনের নামে চলেছে অবিচার।

মানুষের মর্য্যাদা পদদলিত এখানে। এখানে নেই স্নেহ মমতা, নেই রোগের চিকিৎসা।

কর্তৃপক্ষের নির্মমতার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ালেন রাজবন্দীগণ। রাজবন্দীদের জব্দ করার কৌশল খোঁজে ইংরাজ কর্ম্মচারীগণ।

ভ্রমণরত বন্দীগণ। সান্ত্রীদের সঙ্গে হয় বচসা। তারপরই সুরু হয় বেপরোয়া গুলি বর্ষণ।

বন্দীদের আত্মরক্ষার উপায় নেই। গুলিবিদ্ধ হতে থাকেন একের পর এক। রক্তগঙ্গা বয়ে যায়। প্রাচীরে প্রাচীরে প্রতিধ্বনিত হয় আহতদের আর্ত-নাদ আর রাইফেলের গুলি। আহত হলেন শতাধিক বন্দী। নিহত হলেন সন্তোষ মিত্র আর তারকেশ্বর সেনগুপ্ত।

সারা বাংলা চঞ্চল হয়ে উঠলো। এই নৃশংস হত্যার বিরুদ্ধে জানালো তীব্র প্রতিবাদ। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠেও ধ্বনিত হলো কোটির প্রতি-বাদের ভাষা। কোলকাতার মাঠে এক বিরাট সভায় সভাপতিত্ব করলেন তিনি।

এই নিষ্ঠুর নৃশংস হত্যা ইতিহাসে বিরল। বাংলা ভোলেনি সেদিনের কথা। আজও বাঙালীর হৃদয় ব্যথায় ভারাক্রান্ত হয়ে ওঠে, জল আসে চোখে।

সহসা জেগে উঠলো চন্দননগর-বাসী। গুলির আওয়াজ ভেসে আসছে বাতাসে। গুলির পর গুলি। অবিরাম চলেছে গুলি। শেষ রাত্রের নিস্তব্ধতা ভেদ করে সে আওয়াজ মিলিয়ে যাচ্ছে দিগন্তে।

যুদ্ধ হচ্ছে, যথার্থই যুদ্ধ। ইংরাজ সৈন্যের সঙ্গে বিপ্লবীদের যুদ্ধ। গোন্দলপাড়ার একটি গৃহ গুলির আঘাতে ক্ষত-বিক্ষত। চূণের প্রলেপ খুলে গেছে স্থানে স্থানে।

গুলির জবাবে চলেছে গুলি। থেমে নেই বিপ্লবীদের রিভলবার। মৃত্যুই যাঁদের কাম্য তাঁদের আর কী? অফুরন্ত শক্তি তাঁদের। অসীম সাহসে ঝাঁপিয়ে পড়েন মরণ যজ্ঞে।

অবশেষে বন্ধ হলো গুলির আওয়াজ। ধূলায় লুটিয়ে আছেন বিপ্লবী জীবন ঘোষাল। তাঁর দেহ হতে রক্তধারা বইছে। দেহমুক্ত প্রাণ মিলিয়ে গেছে ঊর্দ্ধে।

সেদিন ছিল ১লা সেপ্‌টেম্বর। ১৯৩১ সন।

চিরস্মরণীয় মেদিনীপুর বাংলার তীর্থস্থান। ধন্য মেদিনীপুর! তার রক্তধারায় স্নান করে ধন্য হয়েছে বাংলা, ধন্য হয়েছে ভারত। ইতিহাসের পাতায় চির-উজ্জ্বল মেদিনীপুর।

জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট ডগলাস। তাঁর আদেশে চলেছে নির্মম অত্যাচার। মেদিনীপুর-বাসীর জীবন হয়েছে অতিষ্ঠ। [illegible] তাদের মধ্যে অত্যাচারের প্রতিশোধ

চাইই চাই। 'বিপ্লবীদের গোপন আদালতে বিচার হয়ে গেল সাহেব ম্যাজিষ্ট্রেটের। হলো তাঁর মৃত্যু-দণ্ডের আদেশ।

৩০শে এপ্রিল, ১৯৩২ সন। সভা হচ্ছে জেলা বোর্ডের। মিঃ ডগলাস সভাপতি। ভার চলেছে আলোচনা।

সহসা আলোচনা হলো বন্ধ। ভীত সবাই। ভীরু তনু কাঁপছে ভয়ে। স্থির তাদের দৃষ্টি। ভাষাহীন নয়নে তাকিয়ে থাকে খোলা দরজার দিকে।

দৃঢ় হস্তে রিভলবার ধরে দাঁড়িয়ে আছেন দুইজন। গর্জে উঠলো রিভলবার। গুলি বিদ্ধ হলেন ডগলাস। গর্বিত ইংরাজ রাজপুরুষের শির লুটিয়ে পড়লো ধূলায়।

তৎপর হয়ে উঠলো ইংরাজের গোলামগণ। সুরু হলো ধস্তাধস্তি। ধৃত হলেন প্রদ্যুৎ ভট্টাচার্য্য। চললো তাঁর উপর নৃশংস অত্যাচার। কিন্তু বিপ্লবী বীর সঙ্কল্পে অটুট। কোন গোপন খবর তাঁর কণ্ঠ হতে উচ্চারিত হলো না।

বিচারে ফাঁসির হুকুম হলো তাঁর।

১২ জানুয়ারী, ১৯৩৩ সন।

ফাঁসির মঞ্চে দণ্ডায়মান প্রদ্যুৎ। তাঁর সারা অঙ্গে পবিত্রতার প্রলেপ। বীরত্বের উজ্জ্বলতা মুখমণ্ডলে।

মেজিষ্ট্রেট বার্জ জিজ্ঞেস করলেন, are you ready, Prodyot ?

'One minute please, Mr. Burge !

এক মিনিটের অনুমতি মিললো তাঁর। তার পর দৃঢ় কণ্ঠে বললেন তিনি, 'We are determined Mr. Burge, not to allow any European to remain at Midnapore. Yours is the next turn ; get yourself ready.....,

'আমি প্রস্তুত,' বললেন তিনি স্নিগ্ধ শান্ত কণ্ঠে তাঁর কণ্ঠ যেন কোন স্বর্গলোক হতে নেমে এসেছে।

মুহূর্তে সব হয়ে গেল শেষ। বিপ্লবীর পবিত্র আত্মা চলে গেল অমর লোকে।

১৯৩২ সন।

বিপ্লবীদের গোপন আস্তানা। চট্টগ্রামের ধলঘাটের নবীন চক্রবর্তীর বাড়ী। অবস্থান করছেন পলাতক বিপ্লবীগণ।

পুলিশের হামলা হলো ১৩ই জুন। গর্জে উঠলো পুলিশের রাইফেল। জবাব দিলেন বিপ্লবীগণ রিভলবারের গুলি দিয়ে।

সুরু হলো প্রচণ্ড যুদ্ধ। আহত হলো ইংরাজ সৈন্যগণ। নির্মল সেন ও অপূর্ব সেন হলেন গুলি বিদ্ধ। তারপর তাঁদের মৃত্যু হলো ঘটনাস্থলে। তাঁদের সংগ্রামী দেহ পড়ে রইলো মাটির বুকে।

কুখ্যাত কামাখ্যা সেন। ঢাকা জেলার গ্রামে গ্রামে তাঁর অত্যাচারের চিহ্ন বর্তমান। দেশ-প্রেমিকদের ওপর তাঁর বর্বর অত্যাচার।

অত্যাচারের পুরস্কার মিলেছে তাঁর ইংরাজের কাছে। পদোন্নতি হলো তাঁর। হলেন তিনি ঢাকা জেলার সাব ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট।

ঢাকা সহরের ওয়ারীর একটি গৃহ। সুখ নিদ্রায় শায়িত কামাখ্যা সেন। অসহ্য গরম। খোলা রয়েছে ঘরের জানালা।

১৯৩২ সনের ২৭শে জুন।

রাত্রি শেষে গুলির আওয়াজ ভেসে এলো। নিদ্রিত কামাখ্যা সেনের দেহে বিদ্ধ হলো রিভলবারের গুলি—কয়েকটি গুলি।

চিৎকার করার শক্তিও তাঁর রইলো না। মুহূর্তে

তাঁর মৃত্যু। ধৃত হলেন কালীপদ মুখার্জী। বিক্রমপুরের ইছাপুরা গ্রামে তাঁর বাড়ী।

'আমিই করেছি কামাখ্যা সেনকে নিধন। তাঁর অত্যাচারের অবসান করাই ছিল আমার উদ্দেশ্য। সফল হয়েছি আমি।' বললেন কালীপদ পুলিশের কাছে।

বিচারে ফাঁসির হুকুম হলো তাঁর। ২২শে জানুয়ারী, ১৯৩০ সনে হলো ফাঁসি।

১৯৩২ সন।

ঢাকা সহরের গোয়েন্দা অফিস। অফিসারগণ মহাব্যস্ত। গ্রেপ্তার করেছে বিপ্লবী অনিল দাসকে। হ্যাঁ, এঁর মুখ থেকেই পেতে হবে সমস্ত গোপন খবর। গোয়েন্দাগণ তৎপর হয়ে উঠলো। প্রশ্নবাণে জর্জরিত করে অনিলকে। কিন্তু অনিল নির্বাক। তাঁর মুখে কোন কথা নেই।

আমরা কথা বলাতে জানি, গর্জে উঠলেন এক-জন অফিসার। তারপর শুরু হলো নির্মম প্রহার। কিন্তু অটল অনিল। কোন কথাই বলেন না তিনি।

এবার পৈশাচিক উল্লাসে ঝাঁপিয়ে পড়লো সবাই অনিলের উপর। বর্বর অত্যাচার শুরু হলো তাঁর উপর। লুটিয়ে পড়লেন তিনি মাটিতে।

উল্লাসে চিৎকার করে উঠলেন অফিসারগণ, 'হয়েছে, এই বার হয়েছে। বীরত্ব ঘুচেছে এবার।'

মৃত্যুঞ্জয়ী অনিলের প্রাণহীন দেহ পড়ে রইলো মাটির উপর। তারপর তাঁকে গোপনে রাস্তায় ফেলে দিয়ে নিশ্চিন্ত হল গোয়েন্দাগণ।

ওয়াটসন,! ষ্টেট্‌স্‌ ম্যানের সম্পাদক ওয়াটসন। তাঁর লেখনীর বিষে জর্জরিত দেশবাসী। সে বিষ যেন মিলিয়ে আছে আকাশে বাতাসে। স্পর্দ্ধাভরে চলে তাঁর কলম বিপ্লবী কার্যকলাপের বিরুদ্ধে।

১৯৩২ সন। ৫ই জুন।

গাড়ী করে যাচ্ছেন সম্পাদক চৌরঙ্গী রোড দিয়ে। হঠাৎ অপূর্ব সেন লাফিয়ে ওঠেন ফুটবোর্ডে। রিভলবার হাতে গুলি করেন তিনি। কিন্তু গুলিটি কানের পাশ দিয়ে চলে যায়। ধৃত হন তিনি তখনই।

কিন্তু পটাসিয়াম সায়ানাইড মুখে দিয়ে মৃত্যুকে বরণ করেন বিপ্লবী বীর।

১৯৩২ সন।

চট্টগ্রামের ইয়োরোপীয়ান ক্লাব। বিদেশীদের আড্ডা সেখানে। দেশের বিরুদ্ধে তাঁদের গভীর চক্রান্ত। কাজেই এই ক্লাবকে ভেঙ্গে মিলিয়ে দিতে হবে মাটির সঙ্গে।

শৈলেশ্বর চক্রবর্তীর উপর কাজের ভার ন্যস্ত হলো। এলেন তিনি ঘটনা স্থলে। কিন্তু অবস্থা ছিল প্রতিকূল। আক্রমণ করা হলো না সম্ভব। অকৃতকার্যের অপমানে মুহ্যমান। অসহ্য লাগল এই অবস্থা। জীবন দান করলেন পটাসিয়াম সায়ানাইড খেয়ে।

শহীদ প্রীতিলতা! বাংলার বীর নারী প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার!

প্রীতিলতার অপূর্ব বীরত্বগাথা ছড়িয়ে আছে সর্বত্র, বাংলার মাটি অতিক্রম করে দিগন্ত মুখরিত হচ্ছে। স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসের অগ্নিক্ষরা এই উপাখ্যান উজ্জ্বল হয়ে থাকবে যুগ যুগ ধরে। প্রীতিলতার অপূর্ব সংগ্রামের কৌশল মহান আত্মা-হুতির দৃঢ়তা পৃথিবীর ইতিহাসে দুর্লভ।

১৯৩২ সন। ২৪শে সেপ্টেম্বর।

চট্টগ্রাম পাহাড়তলীর ইওরোপীয়ান ক্লাব। আনন্দে মেতেছে সবাই। সাহেবের আনন্দ কোলা-হলে মুখরিত ঘরটি। ঠিক এমনি সময়ে অকস্মাৎ

ভীষন আওয়াজে বোমা বিদীর্ণ হলো। নিভে গেল আলো। গর্জে উঠলো রিভলবার।

ভীত ক্লাবের সাহেবগণ। পলায়ন করার পথ খুঁজছে। প্রাণ বাঁচাতে হবে তাঁদের। তাই লেগে গেল পালাবার প্রতিযোগিতা। পালিয়ে গেল জন কয়েক।

অন্ধকার ঘর হতে ভেসে এলো আহতদের আর্তনাদ।

এ আক্রমন চলেছে প্রীতিলতার নেতৃত্বে। তার সঙ্গে ছিলেন অপর কয়েকজন বিপ্লবী সৈনিক। চলে গেছেন সবাই। শুধু একা রয়েছেন প্রীতিলতা। তাঁর অঙ্গে লেগেছে বোমার টুকরো। রক্তে ভিজে গেছে সামরিক পোষাক। পুরুষের বেশে এসেছেন তিনি সংগ্রামে।

খবর পৌঁছে গেছে পুলিশের কাছে। হয়তো এখনই এসে পড়বে সদলবলে পুলিশ। ধৃত হওয়া চলবে না তাঁর। তাই পটাসিয়াম সাইনাইড গ্রহণ করলেন মুখে। তারপর মহান মৃত্যুর কোলে আশ্রয় নিলেন তিনি।

আবার আক্রমণ হলো ওয়াটসনের ওপর। তিনি আহত হলেন।

২৮শে সেপ্টেম্বর। ১৯৩২ সন।

নিজের গাড়ীতে চলেছেন ওয়াটসন। তখন অপরাহ্ন ছ'টা।

মনুমেন্টের কাছে এসে দাঁড়ালো। সঙ্গে সঙ্গেই শুরু হলো গুলি বৃষ্টি ওয়াটসনের গাড়ীর উপর।

বিপ্লবীদের গাড়ী মুহূর্তে উধাও হয়ে যায়। পুলিশ তাঁদের সন্ধান পায় মাকের হাটের ঝুড়ো শিবতলায়। এখানে পুলিশের গুলিতে নিহত হন দুই বিপ্লবী বীর ননী লাহিড়ী ও গোপাল চৌধুরী।

বন্দী সন্তোষ বেরা আহত হয়েছেন পুলিশের হস্তে। বন্দীর উপর নির্মম প্রহার চালালো পুলিশ। প্রহারে প্রহারেই তাঁর দেহের প্রাণের স্পন্দন গেল থেমে।

১৯৩২ সনেই এই ঘটনা ঘটে মেদিনীপুর জেলায়।

১৯৩৩ সন। ৭ই জুলাই

আবার গর্জে উঠলো চট্টগ্রামে বিপ্লবীদের অগ্নি-নালিকা। মিলিটারি পেরেড গ্রাউণ্ড-এ অকস্মাৎ হানা দিলেন চারজন বিপ্লবী। যুদ্ধ শুরু হলো ভীষণ ভাবে। দু'দিক থেকে গুলি বৃষ্টি হচ্ছে।

এই যুদ্ধে নিহত হন—নিত্যগোপাল ভট্টাচার্য্য, হিমাংশু ভট্টাচার্য্য। ধৃত হন কৃষ্ণ চৌধুরী ও হরেন্দ্র চক্রবর্ত্তি। বিচারে তাঁদের হয় ফাঁসি।

বিপ্লবী সূর্য্য সেন! বাংলার নরনারী শ্রদ্ধাস্তুত নাম স্মরণ করে সূর্য্য সেনের নাম। তাঁর পবিত্র নাম উচ্চারণে ধন্য হয় দেশবাসী।

সূর্য্য সেনের নেতৃত্বে চট্টগ্রামকে করেছে ধন্য। ধন্য হয়েছে বাংলা, ধন্য হয়েছে ভারত। পরাধীন ভারতের মুক্তিদাতা সৈনিকদের অগ্রদূত সূর্য্যসেন।

চট্টগ্রামের বিপ্লবীগণ গ্রেপ্তার হয়েছেন একের পর এক। সম্মুখ যুদ্ধে জীবন দান করেছেন। ফাঁসির মালা পরেছেন গলায়।

সূর্য্য সেন তখনও গ্রেপ্তার হননি। তাঁকে গ্রেপ্তার করার জন্য ইংরাজ শক্তি নিয়োজিত। তৎপর রাজশক্তি।

গৈরলা গ্রামে অবস্থান করছেন সূর্য্য সেন। তাঁর বন্ধুরাও অনেকে রয়েছেন সেখানে।

সন্ধান পেয়ে যায় পুলিশ বিপ্লবীদের। ১৬ই ফেব্রুয়ারী অকস্মাৎ ঘেরাও করে সেনাবাহিনী। তার পর শুরু হয় প্রচণ্ড সংগ্রাম। বিপ্লবীদের রিভলবার অগ্নি বৃষ্টি করতে থাকে। পলায়নের পথ খুঁজছেন

তিনি। কিন্তু সহসা এক গুর্খা সৈন্য তাঁকে গ্রেপ্তার করে বসে। বন্দি হলেন তিনি।

তারকেশ্বর দস্তিদারও ধৃত হলেন। ১৯শে মে গইলা গ্রামে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়।

বিচার চললো বিপ্লবী নেতা সূর্য্য সেনের। দীর্ঘ-দিনের বিচারের প্রহসনের পর ফাঁসির হুকুম হলো তাঁর। ১৯৩৪ সনের ১২ই জানুয়ারী সূর্য্য সেন ফাঁসির মঞ্চে প্রাণ দান করেন।

সেদিন দেশবাসী শোকে মুহ্যমান। বাংলার একান্ত প্রিয়জনকে হারিয়ে দিশেহারা বাংলা।

বিচারে তারকেশ্বর দস্তিদারেরও ফাঁসি হলো।

দীনেশ মজুমদারের হয়েছিল আজীবন কারা-বাস। মেদিনীপুর জেলে বন্দী তিনি। ইংরাজের অতন্দ্র প্রহরী বেষ্টীত কারাগার। আকাশ ছোঁয়া প্রাচীর। কিন্তু দীনেশকে আবদ্ধ রাখতে পারেনি কারাগারে।

পালিয়ে এলেন জেল হতে। কোলকাতা এসেই বিপ্লবের কাজে মন দিলেন। মুক্তি সাধনায় পাগল তিনি। সাধ্য কি তাঁকে আবদ্ধ করে রাখে কারাগারে।

কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রিটে একটি ভাড়া বাড়ীতে আছেন দীনেশ। শুরু হলো এখানে বিপ্লবীদের গোপন কাজ।

১৯৩৩ সনের ২২শে মে। পুলিশ বেষ্টিত হলো বাড়ীটি। কিন্তু বিনা যুদ্ধে বিপ্লবীগণ আত্মসমর্পণ করবেন না। তাই তাঁদের আগ্নেয়াস্ত্র গর্জে উঠলো। যুদ্ধ হলো বেশ কিছুক্ষণ। গুলি ফুরিয়ে গেল। ধরা পড়লেন দীনেশ। ধরা পড়লেন নলিনী দাস ও জগদানন্দ মুখার্জি।

ফাঁসি হলো দীনেশের। তাঁর দেহ মুক্ত আত্মা মিলিয়ে গেল অসীমে।

প্রদ্যোতের সতর্কবাণী কি মনে নেই। নিশ্চয় মনে আছে মিঃ বার্জ এর। কাজেই মেদিনীপুর জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট অধিক সতর্কতা অবলম্বন করলেন। মৃত্যুকে আড়াল করার চেষ্টা চলতে থাকলো তাঁর।

খেলোয়ার বার্জ। খেলতে ভালবাসেন তিনি।

ফুটবল খেলার মাঠ। অসংখ্য দর্শকের ভিড়। শুরু হয়েছে ফুটবল খেলা। দুটি দলের প্রতিযোগিতা হয়েছে শুরু। বার্জও নেমেছেন খেলতে টাউন ক্লাবের পক্ষে। অপর দলটি মহামেডান ক্লাব।

অকস্মাৎ দুজন যুবক ঝাপিয়ে পড়লো বার্জের উপর। রিভলবারের গুলি বিদ্ধ হলো ম্যাজিষ্ট্রের দেহে। পরপর কয়েকটি গুলি খেয়ে লুটিয়ে পড়লেন তিনি।

ভিড় জমে গেল সরকারী কর্মচারীদের। প্রভুকে রক্ষা করার পবিত্র কাজে এগিয়ে এল তাঁরা। কিন্তু বার্জের মৃত্যু হলো তখনই।

সরকারী কর্মচারীদের দেহরক্ষীগণ গুলি চালাতে থাকে যুবকদের ওপর। অনাথ বন্ধু পাঞ্জা ও মৃগেন্দ্র নাথ দত্ত গুলির আঘাতে মৃত্যুবরণ করলেন।

বিপ্লবীদের সন্ধানে পুলিশ হলো তৎপর। সামরিক ফৌজ নেমিয়ে দেওয়া হলো মেদিনীপুর শহরে। তাঁদের অত্যাচার সীমা ছাড়িয়ে গেল। স্বাভাবিক জীবন আর রইল না সহরে।

অবশেষে গ্রেপ্তার হলেন বিপ্লবীগণ। দীর্ঘদিন চললো মামলা। তারপর রায় প্রকাশ পেলো। কয়েকজনের হলো দ্বীপান্তর। আর ফাঁসির হুকুম হলো—ব্রজকিশোর চক্রবর্তী, রামকৃষ্ণ রায় ও নির্মল জীবন ঘোষের।

তিনটি কিশোর বিপ্লবী ফাঁসির মঞ্চে জীবনদান করলেন।

কুখ্যাত পুলিশ ইন্সপেক্টর মহিউদ্দিন আমেদ।

ময়মনসিংহে এর জামালপুরে তার আগমন হয়েছে। তাঁর অত্যাচারের সীমা নেই। হৃদয় হীনতার নিদর্শন কার্যকলাপে।

গ্রেপ্তার হলেন ধীরেন্দ্রনাথ দে। তাঁর উপর চললো অমানুষিক অত্যাচার। প্রহারে দেহ তাঁর ক্ষতবিক্ষত। কিন্তু তবুও মুখে একটিও কথা নেই। দলের গোপন খবর রেখেছেন গোপন।

ক্ষেপে গেলেন মফিজুদ্দিন। প্রহারেই মাত্রা আরো বৃদ্ধি পেলো। এই প্রহারের মৃত্যু হলো ধীরেন্দ্রের।

তাঁর মৃত দেহ ফেলে দেওয়া হলো রাস্তায়।

প্রচার করে দিলো, "দলের লোকই হত্যা করেছে। পুলিশের কাছে গুপ্ত খবর প্রকাশ করার এই পরিণতি।

এমনি করে প্রচার করা হলো শহীদ ধীরেনের বিরুদ্ধে।

এই ঘটনা ১৯৩৩ সনে।

নারায়ণ গঞ্জের উপকণ্ঠে অবস্থিত দেওভোগ গ্রামটি। বিপ্লবীদের গোপন আস্তানা এই গ্রামে। রাত্রির অন্ধকারে তাঁদের আনাগোনা।

১০ই এপ্রিল। ১৯৩৪ সন।

রাত্রির অন্ধকারে মতি মল্লিক বাড়ী থেকে নেমে এলেন রাস্তায়। মিলিত হলেন অপর দুই বন্ধুর সঙ্গে, একটি মন্দিরে বসলেন তাঁরা।

আলোচনা চললো তাঁদের। অস্ত্র গচ্ছিত ছিল মতির কাছে। তাকে সাবধান হবার জন্য জানালেন অপর বন্ধুটি।

পুলিশের দৃষ্টি পড়েছে এ গ্রামটির ওপর, বললেন একজন বন্ধু।

মতি বললেন, 'ভয় কিছু নেই, আমাদের কাজ গোপনতার আবরণে ঢাকা।

এই গোপনতার আবরণ উন্মোচন করা পুলিশের সাধ্য কি?'

রাত হয়ে গেল অনেক। বিপ্লবীদের সভা ভঙ্গ হলো। এগিয়ে এলেন তাঁরা শহরের দিকে।

কিন্তু সম্মুখেই দেখা হলো ভিলেজ গার্ডের সঙ্গে। ইংরাজের গোলাম এরা। শুরু হলো সংঘর্ষ। বিপ্লবীদের অগ্নিনালিকা গর্জে উঠলো।

জমাট বাঁধা অন্ধকার। পড়ে গেলেন মতি রাস্তা থেকে খালের ভেতর ধরা পড়লেন তিনি। তারপর বিচারে হলো তাঁর ফাঁসি।

১৯৩৪ সনে বিপ্লবীগণ অর্থ সংগ্রহের কাজে তৎপর হয়ে ওঠেন। নানাস্থানে তাঁদের অর্থ সংগ্রহ করার কাজ চলতে থাকে।

ত্রিপুরায় ইটাখোলায় অর্থ সংগ্রহের কাজে ধৃত হন অসিং ভট্টাচার্য্য। বিচারে তার ফাঁসি হয়।

ফরিদপুর চরমুগুরিয়া ডাক লুটে ধৃত হন মনোরঞ্জন। বিচারে হয় তার ফাঁসি।

দার্জিলিং এর ঘোড়দৌড়ের মাঠ। দর্শকের ভিড় জমে উঠেছে। জুবিলি স্যানটোরিয়াম থেকে যখন সময়ে বেরিয়ে এলেন বিপ্লবী ভবানী ও রবি পুরো সাহেবী পোশাকে। মাঠে গভর্ণরের অত্যন্ত কাছে নিজেদের স্থান করে নিলেন। অকস্মাৎ ইংরাজের চূড়ান্ত প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা স্তব্ধ করে দিয়ে বিপ্লবীদের রিভলবার গর্জে উঠলো গভর্ণরকে লক্ষ্য করে। এতারসনের দেহরক্ষীগণও ভয়ে বিহ্বল হয়ে যায়। সমস্ত জনতা স্তম্ভিত বিপ্লবীদের দুঃসাহস লক্ষ্য করে।

ধৃত হলেন ভবানী। তাঁর অপর বন্ধুদেরও গ্রেপ্তার করা হলো। ট্রাইবুনালের বিচার। ট্রাইবুনালের সাভপতি প্রশ্নের জবাবে বললেন ভবানী, হাঁ, আমি দুঃখিত, কিন্তু যা করেছি তার জন্য নয়।

আমার দুঃখ এই যে গভর্ণর এখনও বেঁচে আছেন।

বিচারে ফাঁসির হুকুম হলো ভবানীর।

রাজসাহী জেলের প্রাচীরের অন্তরালে মৃত্যু পথ যাত্রী ভবানী। মৃত্যুকে আলিঙ্গন করার জন্য প্রস্তুত তিনি। অবশেষে এলো সেই চিরবাঞ্ছিত দিনটি। ১৯০৪ সনের জানুয়ারী মাসে ভবাণী ভট্টাচার্য ফাঁসির রজ্জু গলায় ধারণ করলেন। মহা মৃত্যুকে বরণ করে নিজেকে দিব্য বিভায় প্রকাশ করলেন।

সেদিন ছিল অর্দ্ধোদয় যোগ।

১৯৩৬ সন।

অন্তরিণে আবদ্ধ রুহিনী বড়ুয়া। ফরিদপুর জেলার কোন এক থানায় তাকে রাখা হয়েছে।

থানার দারোগা নিজেই যেন ম্যাজিষ্ট্রেট। বন্দীকে তিনি গ্রাহ্যই করেন না। তার অভদ্র আচরণে মুক্তি সংগ্রামের সৈনিকের কাছে অসহ্য মনে হয়। তাই একদিন দারোগার ওপর ঝাপিয়ে পড়েন তিনি। তাঁকে নিধন করে ফাঁসির মঞ্চে জীবনদান করেন।

খুঁজে পাচ্ছে না। বাড়ীর সবাই ব্যস্ত। সবাই চিন্তিত ননীজীবন ঘোষের জন্য।

কোথাও তাঁর সন্ধান মিললো না। হতাশ হলেন সবাই।

কিন্তু সন্ধান মিলে গেল। পাওয়া গেল ননীর মৃতদেহ। পড়ে আছে রাস্তায়।

কি করে মৃত্যু হলো এই বিপ্লবী বীরের?

পুলিশের নির্মম প্রহারে হয়েছে তার মৃত্যু। মেদিনীপুরে ১৯৩৬ সনে এই ঘটনাটি ঘটে।

১৯৪০ সনে জাতীয়তা বিরোধী সংগঠন তৎপর হয়ে ওঠে। জাতীয়তাবাদীদের উপর তাদের চলে হামলা।

নারায়ণগঞ্জ শহরে এই রূপ একটি সংঘর্ষ হয়। সংঘর্ষে নিহত হন ছাত্র নেতা জ্যোতির্ময় ভৌমিক।

অপর একটি সংঘর্ষ হয় ঢাকা শহরের সূত্রাপুর অঞ্চলে। এই সংঘর্ষে নিহত হন অখিলচন্দ্র দাস পুলিশের গুলিতে।

১৯৪২ সন। ৮ই ডিসেম্বর 'কুইট ইণ্ডিয়া' প্রস্তাব গ্রহণ করলেন কংগ্রেস।

এলো জনজাগরণ। মুক্তি পাগল জনতা মুক্তি সংগ্রামে সক্রিয় হয়ে উঠলো। তাদের পঞ্জীভূত বেদনা সহসা যেন মুক্তি পেল। দিকে দিকে শুরু হলো সংগ্রাম জলস্রোতের মত জনতা এগিয়ে এলো সংগ্রামে।

যুদ্ধের প্রয়োজনে খাদ্য মজুদ করেছে সরকার। বাজার থেকে ধান চাল হয়েছে হাওয়া। ১৯৪৩ সনে দেখা দিল দুর্ভিক্ষ।

ভেসে আসছে নেতাজীর কণ্ঠস্বর। রেডিওতে তাঁর বাণী প্রচারিত হচ্ছে। সে বাণী শুনে দেশবাসীর হৃদয়ে জাগে আশা অসীম সাহসে সংগ্রামে করে আত্মনিয়োগ। শুরু হলো সরকারের ভীষণ অত্যাচার সে অত্যাচারে জনতা যেন ক্ষেপে গেল। শুরু হলো ধ্বংস যজ্ঞ। দাবানল জ্বলে উঠলো দেশময়। থানায় থানায় জনতার হলো হামলা। বিপ্লবের জয়ধ্বনিতে মুখরিত দেশ।

ইংরাজ লেলিয়ে দিলো সামরিক বাহিনী। তারা চালালো অমানুষিক অত্যাচার। সে অত্যাচারের ইতিহাস আজও রচিত হয়নি। ৫২৮টি ক্ষেত্রে গুলি চালালো পুলিশ। ২০ হাজার লোক নিহত হল গুলির আঘাতে। ৫০ হাজার লোক হয়েছে আহত। ৬০২২৯ জন লোক গ্রেপ্তার করা হলো। ১০ হাজার লোককে ভারত রক্ষা আইনে গ্রেপ্তার করা হলো। একমাত্র মেদিনীপুর জেলার তমলুক মহকুমায় ইংরাজের অত্যাচরের নমুনা—গ্রেপ্তার ১০০০, বিচারে দণ্ড প্রাপ্ত ৫০০, [illegible] ১৯; গৃহ পুঠন—১০৪৪, মান [illegible] [illegible] জরিমানা

১৯০০০০০ টাকা, নারী ধর্ষণ—৭৩, ধর্ষণের চেষ্টা ৩১, শ্লীলতা হানি ১৫০, বেআইনি আটক ৫০৭৩, লাঠির আঘাত ৪২২৬, ভারত রক্ষা আইনে আবদ্ধ ১২৯, গুলিতে নিহত ৪০ ও গুলিতে আহত ১৯৯।

৯ই আগষ্ট ঢাকা শহরের ইংলিশ রোডের মোড়ে জনতা ও পুলিশের হয় সংঘর্ষ। এই সংঘর্ষে মৃত্যু হয় হৃষিকেশ সাহা ও বিপুল বসাকের।

ঢাকার কোতোয়ালী থানা আক্রমণ করার সময় মৃত্যুবরণ করেন রাধানাথ সেন।

ঢাকা জেলার তালতলা গ্রাম। স্টীমারে ষ্টেশনে ভোর হতেই জনতার ভিড়। ছুটে এলো পুলিশ। জনতার সঙ্গে শুরু হলো যুদ্ধ! পুলিশের রাইফেল হতে গুলি বর্ষিত হলো। জনতাও আক্রমণ করলো পুলিশকে। ঘটনা স্থলে মৃত্যু হলো হীরালাল দত্ত ও আরো তিনজন।

সেদিন ছিল ১৭ই সেপ্‌টেম্বর।

মেদিনীপুর জেলার মহিষাদল থানা। ২২শে সেপ্‌টেম্বর জনতা কর্তৃক আক্রান্ত হল থানা। জনতার হাতেও রয়েছে অস্ত্র; কণ্ঠে তাদের বন্দেমাতরম ধ্বনি। আগুন লাগিয়ে দিলো থানায়। পুলিশের গুলি বর্ষিত হলো জনতার উপর রক্তে রাঙ্গা হলো শ্যামল ধরণী।

এই সংঘর্ষে মৃত্যুবরণ করেন যামিনী কান্ত কামিলা, অনন্ত কুমার পাত্র ও আরও তিনজন।

এই তারিখেই আবার বেলকনি থানা আক্রান্ত হলো। এই আক্রমণে নিহত হন ভজহরি রাউত, বংশীধর কর, চন্দ্রমোহন জানা, হেমন্ত কুমার দাস, চৈতন্য বেরা, বৈদ্য চরণ মহাপাত্র, শিব প্রসাদ, চন্দ্র মোহন দাস, সবেশ্বর পরামাণিক ও রামপ্রসাদ জানা।

আবার মহিষাদল থানা আক্রান্ত হলো। এবার জনতা আরো দৃঢ় প্রতিজ্ঞ, মৃত্যুর ভয় নাই তাদের। পুলিশের গুলিতে মৃত্যু হলো শশীভূষণ মান্না, সুরেন্দ্র নাথ কর, ধীরেন্দ্র নাথ দিড়াধেরা।

২৭শে সেপ্‌টেম্বর নন্দীগ্রাম থানা আক্রমণে পুলিশের গুলিতে নিহত হয়—বীরেন্দ্র নাথ মণ্ডল, তানুরাণা, ভূতনাথ সাহু, গোবিন্দ চন্দ্র দাস।

২৯শে সেপ্‌টেম্বর আক্রান্ত হলো কৃষ্ণাপুর থানা, পুলিশের গুলিতে জীবন দান করেন—গৌরহরি কামিলা, গাঙ্গার সাহু।

২৯শে সেপ্‌টেম্বর মহিষাদল থানা আক্রমণে শহীদ হন—ভোলানাথ মাইতি, হরিচরণ দাস, আশুতোষ কুইলা, সুধাংশু চন্দ্র হাজরা, প্রসন্ন কুমার ভুঞ্যা, পঞ্চানন দাস, দ্বারকা নাথ দাস, গুনধর হাওাল, সুরেন্দ্র নাথ মাইতি, যোগেন্দ্র নাথ দাস, রাখাল চন্দ্র সামন্ত, কুদিরাম বেরা।

২৯শে সেপ্‌টেম্বর তমলুক শহরে বিপ্লবী জনতার ভিড় জমে গেল। তাদের কণ্ঠে ইনক্লাব জিন্দাবাদ, বন্দেমাতরম্। মাতঙ্গিনী হাজরার নেতৃত্বে এসেছে এই বাহিনী। পুলিশের রাইফেল গর্জে উঠলো। জনতার বুকের রক্ত ঝরে পড়লো ধরণীর বুকে। শহীদ হলেন মাতঙ্গিনী হাজরা, নরেন্দ্র নাথ সামন্ত ও আরো অনেকে।

৩০শে সেপ্‌টেম্বর আক্রান্ত হলো কেশপুর থানা, আক্রমণে শহীদ হলেন—শশীবালা দাসী, রামকৃষ্ণ ঘোষ ও অপর দুজন।

নন্দীগ্রাম থানা আক্রান্ত হলো এই তারিখেই। শহীদ হলেন শেখ আসাউদ্দিন ও আরও চার জন।

১লা অক্টোবর বাটানগর সংঘর্ষে মৃত্যুবরণ করেন, অমূল্য শাঁশমল, সুধীরচন্দ্র মাইতি।

পটাশপুর থানা আক্রান্ত হয় ২রা অক্টোবর, শহীদ হলেন কেদারনাথ জানা।

৮ই অক্টোবর সংঘর্ষ হলো পুলিসের সঙ্গে। নন্দীগ্রামে পুলিশের গুলির আঘাতে মৃত্যুবরণ করেন মুচিরাম দাস।

১৩ই অক্টোবর আলিন গিরি পুলিশ সংঘর্ষে আত্মদান করেন ভগীরথী রথ, মুরারী মোহন বেরা।

১৬ই অক্টোবর, গুলির আওয়াজ ভেসে আসছে পূর্বলক্ষ্য থেকে, গুলির আঘাতে মৃত্যু হলো বিপিন বিহারী মণ্ডল, চন্দ্রমোহন দিন্দা।

ঘরে ফেরা ধর মৃত্যু বরণ করেন গোবিন্দপুর সংঘর্ষে. ১৮ই অক্টোবর এই সংঘর্ষ হয়।

মেদিনীপুরের ভগবানপুর থানা, জনতার আক্রমণে দারোগা পুলিশ সন্ত্রস্ত। পুলিশের হাতে রিভলবার. রাইফেল। জনতার জয়ধ্বনিতে মিলে যায় বুঝি গুলির আওয়াজ, বুকের রক্ত ঢেলে দিচ্ছে তারা। গুলির আঘাতে মাটির কোলে আশ্রয় নিল এক এক করে, ভিজে গেল কঠিন মাটি রক্ত ধারায়।

এই সংঘর্ষে শহীদ হলেন—যুধিষ্ঠীর জানা, বিভূতি ভূষণ দাস, জগন্নাথ পাত্র, শ্রীনাথ চন্দ্র প্রধান, হরিচরণ বেরা, রমাকান্ত দাস, রঘুনাথ মণ্ডল, হরিপদ মাইতি, তারক জানা, ভারত চন্দ্র সিংহ, জ্ঞানদা মাইতি, পরেশ চন্দ্র জানা, কৃষ্ণ মোহন চক্রবর্ত্তি, ভূষণ সামন্ত, ধীরেন্দ্র নাথ দশপাঠে।

আগষ্ট মাসেই কর্ণওয়ালিস্ ষ্টিটে পুলিশের গুলিতে নিহত হন দিলীপ বসু।

১৯৪৩ সন। সামরিক বাহিনীতে তখন চলেছে বিদ্রোহের আয়োজন, দেশপ্রেমিক সৈনিক মানকুমার বসু একাজে তৎপর কিছুদিনের মধ্যে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হলো. বিচারে হলো তাঁর ফাঁসি।

১৯৪৪ সন।

বাংলায় চলেছে গোপন প্রস্তুতি, আজাদহিন্দ 'হোমফ্রন্ট' এর কাজ চলেছে অতি গোপন পথে, লোক মারফৎ ও রেডিও যোগে রাখা হচ্ছে নেতাজীর সঙ্গে সংযোগ।

ইংরাজের সামরিক গোপন তথ্য সংগ্রহ হচ্ছে। সেই তথ্য চলে যাচ্ছে নেতাজীর কাছে।

বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে রয়েছে পলাতক বিপ্লবীদের আস্তানা, কোলকাতার কেন্দ্রীয় গোপন অফিস। ৪৬ নং শিব ঠাকুর লেনের চার তলায় অবস্থিত এই অফিসটি।

সূর্য্য ডুবে গেছে, কিন্তু তার শেষ আভা মিলিয়ে যায়নি তখনো, কর্মচঞ্চল বড়বাজার, অসংখ্য লোকের ভিড়, এই ভীড়ের পথ বেয়ে এগিয়ে এলেন দু'জন নারী কর্মি শিবঠাকুর লেনে। উঠে গেলেন সোজা চার তলায়, পলাতক বিপ্লবীগণ অপেক্ষা করছেন সেখানে। ঘরে প্রবেশ করলেন নারী কর্মী দীপ্তি ও হেনা ঘোষ। অতি গোপনে একটি কাগজের বাণ্ডিল তুলে দিলেন সত্যব্রত মজুমদারের হাতে।

সন্ধ্যার অন্ধকার নেমে এলো কোলকাতার রাস্তায়, বিপ্লবীগণ আস্তানা থেকে নেমে এলেন। ঘরে রইলেন দুজন, জরুরী কাগজ গচ্ছিত তাঁদের কাছে, গভীর রাতে চলে যাবে গোপন খবর নেতাজীর কাছে।

খুট. খুট, খুট।

অপরিচিত টোকা দরজায়।

চকিতে প্রস্তুত হলেন বিপ্লবী দু'জন। একজন পিঠ দিয়ে দাঁড়ালেন। আর গোপাল সেনের হাতে সেই কাগজ বাণ্ডিল, এক বার করে তাকালেন হাতের দিকে গোপাল তারপর আগুন লাগালেন কাগজে। জ্বলে উঠল আগুন।

দরজায় প্রচণ্ড আঘাত শুরু হলো। ভেঙ্গে গেল দরজা, ঘরে প্রবেশ করলো পুলিশ পল্টন কালান্তক জমের মত। বন্দী হলেন দুজন বিপ্লবী, গোপাল

দৃঢ় হস্তে চেপে ধরলেন রুমালে লিখিত কাগজ, এ কাগজের কাছে জীবন তুচ্ছ। পুলিশের হাত থেকে রক্ষা করতেই হবে।

সম্মুখে রয়েছে বারান্দা, পলায়নের চেষ্টা করলেন গোপাল, এবার পুলিশ হলো উন্মাদ। ঝাঁপিয়ে পড়লো তাঁর উপর, এক হাতে দৃঢ় মুষ্টিতে আবদ্ধ কাগজ। অপর হাত দিয়ে লড়াই করছেন শত্রুর সঙ্গে; অসীম শক্তি তাঁর বাহুতে, শত্রুপক্ষ কিছুতেই কাগজ পেলোনা হাতে, ক্ষেপে গেলো পুলিশ, এক পৈশাচিক উন্মাদনা এলো তাদের মনে।

জড়িয়ে ধরলো গোপালকে, তারপর শূন্যে তুলে ফেলে দেয় মাটিতে, দেহ হলো তাঁর ক্ষতবিক্ষত। তাঁর তাজা রক্তে ভেসে গেল রাজপথ, কিন্তু তখনও তাঁর হাতে রয়েছে কাগজ—জীবনের চেয়েও প্রিয় সে অর্ধদগ্ধ কাগজ।

পুলিশের মুখে ফুটে উঠলো হাসি, পৈশাচিক আনন্দের বর্বর হাসি. গ্রেপ্তার করা হলো তাঁকে। নিয়ে গেলো হাসপাতালে, রাস্তায় হলো মৃত্যু. শহীদ গোপাল সকল বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে চলে যান পরলোকের পথে, তাঁর প্রিয় অগ্রদূতদের সঙ্গে মিলিত হবার নিসূঢ় সৌন্দর্য্য।

সেদিন ছিল ২২শে জুলাই, ১৯৪৪ সন।

২১শে নভেম্বর, ১৯৪৬ সন।

আজাদ হিন্দ বন্দী বিচার প্রতিবাদ দিবস, চলেছে শোভাযাত্রা কোলকাতার রাজপথে। যোগ দিয়েছে ছাত্র যুবক আর শ্রমিক, সারা দেশে এসেছে অভূতপূর্ব চাঞ্চল্য, বাধা দিল পুলিশ, পুলিশের গুলিতে নিহত হন রামেশ্বর ব্যানার্জি।

৭ই জুলাই, ১৯৪৬ সন।

দিল্লীর লাল কেল্লা, বন্দী যতীশ চন্দ্র গুহ। তিনি নেতাজীকে পৌঁছে দিয়েছিলেন সীমান্তে, তাই বন্দী তিনি। প্রতিদিন চললো নির্মম অত্যাচার, নিষ্ঠুর প্রহারে আক্রান্ত হলেন রোগে. সেই রোগেই তাঁর মৃত্যু হলো কোলকাতায়।

১৯৪৭ সন, ২রা সেপ্‌টেম্বর।

সাম্প্রদায়িক উন্মাদনা কোলকাতায়, হিন্দু মুসলমানে দাঙ্গা। শান্তি চাই! দাঙ্গা রুখতে হবে, মহাত্মাজী কলকাতায় শান্তির জন্য অনশনরত। শোভাযাত্রা চলেছে রাজপথে, অকস্মাৎ শচীন মিত্র ছুরিকাহত হন। ওরা হাসপাতালে হয় তাঁর মৃত্যু আদর্শের জন্য। মানব কল্যাণের জন্য নিজের জীবন স্বেচ্ছায় বিলিয়ে দিলেন তিনি।

আক্রান্ত বিপ্লবী কর্মী তিনজন, শান্তি বাহিনীর অগ্রদূত তাঁরা। সাম্রাজ্যবাদের চক্রান্তকে ব্যর্থ করতে বদ্ধপরিকর, তাঁদের রয়েছে অতীতের বিপ্লবের ঐতিহ্য। সেই পাথেয় নিয়ে তাঁরা নামলেন শান্তি আন্দোলনে।

৩রা সেপ্‌টেম্বর, ১৯৪৭ সন। অন্যতম নেতা সুশীল দাসগুপ্ত শান্তির প্রচার কার্য্যে রত, সহকর্মী সুভাষ বন্দোপাধ্যায় ও বীরেশ্বর ঘোষ তাঁর সঙ্গে। লোয়ার সার্কুলার রোড ও পার্কষ্ট্রীটের মোড়ে আক্রান্ত হলেন। তিনজনেই আহত হলেন, এই আঘাতেই বুঝি মৃত্যুর ছায়া নেমে এলো দেহে। সুভাষের মৃতদেহ ধূলায় লুটিয়ে পড়ল। ১১ই সেপ্‌টেম্বর হাসপাতালে—শান্তির অগ্রদূত সুশীল মিলে যান অসীমের সঙ্গে, দেহ মুক্ত আত্মার মিলন হলো অমৃতলোকে। বিরেশ্বর হাসপাতালেই জীবন দিয়ে অমর হলেন।

ছাব্বিশে জানুয়ারী

নতুন দেশ গড়ার শপথ

ছাব্বিশে জানুয়ারী।

১৯৫০ সালে এই দিনটিতে ভারত সাধারণতন্ত্র হিসাবে ঘোষিত হয়।

ছাব্বিশে জানুয়ারীর ইতিহাস আরও প্রাচীন। আরও ঐতিহ্যময়। ১৯৩০ সালের এই দিনটিতে আসমুদ্রহিমাচল ভারতবর্ষ পূর্ণ স্বাধীনতার দাবীতে উৎসর্গকৃত দিন হিসাবে পালন করে। সুদীর্ঘ দুই দশক এই দিনটি 'স্বাধীনতা দিবস' হিসাবে উদ্‌যাপিত হয়। সাধারণতন্ত্র হিসাবে চিহ্নিত হবার অনেক আগেই এক জাগ্রত জাতির সাহসিকতা ও আত্মোৎসর্গের দিন হিসাবে স্মরণীয় হয়ে ওঠে।

কিন্তু অর্ধশতাব্দীর সেই পূর্ণ স্বাধীনতার শপথ কি আজ সফল? রাজনৈতিক স্বাধীনতাপ্রাপ্তির তিন দশকের পরেও লক্ষ কোটি নিপীড়িতের স্বাধিকার কি প্রতিষ্ঠিত? সংবিধানের সীমিত অধিকারও কি সাধারণ মানুষের জীবনে স্বীকৃত?

সংবিধানের প্রথম অনুচ্ছেদের সেই ঘোষণা। যেখানে ভারতকে বলা হয়েছে বিভিন্ন রাজ্যের সম্মেলন। গত ত্রিশ বছরে চল্লিশেরও অতিরিক্ত সংশোধনে সেই সংবিধান বিকৃত। রাজ্যের ভূমিকা আজ সেখানে নিতান্তই গৌণ। ধর্মনিরপেক্ষ ভারতভূমিতে সাম্প্রদায়িকতার সন্ত্রাস। বিচ্ছিন্নতাবাদের তাণ্ডবে জাতীয় ঐক্য আজ বিপন্ন। সংসদীয় গণতন্ত্রে বর্তমান সংবিধানে জনসাধারণের গণতান্ত্রিক অধিকারকে ধ্বংস করার জন্য স্বৈরতন্ত্র আবার বিষাক্ত ফণা তুলতে চাইছে।

অতীতের অবহেলা ও অপশাসন থেকে উদ্ভূত সমস্ত প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও পশ্চিমবাংলার আকাশে আজ সূর্যস্নানের ইঙ্গিত। বাতাসে মুক্তির সুবাস। গ্রাম-নগরে মেহনতী মানুষের দেহে ও মনে নতুন সাহসিকতা। গত তিন বছরে এক সুস্বপ্নকে সে লালন করে এসেছে। সে স্বপ্ন স্বাধিকারের। গণতন্ত্রের। শোষণমুক্তির। তার কথায় ও কাজে আজ প্রতিরোধের প্রতিশ্রুতি। স্থির প্রত্যয়ের ঘোষণা : 'জনগণই শেষ কথা বলেন।'

পশ্চিম বঙ্গ সরকার

আই সি এ ৯১৩/৮১

RegdNo.R. M .24511/71 | Biplabi Bangla Phone : 34-1795 | Regd. WB/NC 77

বার্ষিক :—সডাক ১৫.০০ টাকা | ষাণ্মাসিক :—৮.০০ টাকা | মূল্য—৩০ পয়সা

বিপ্লবী পুস্তকমালা

নেতাজীর সিক্রেটসার্ভিস—ডাঃ পবিত্রমোহন রায়—১০·০০

—কীয়োর কুমার দত্তের—

১। বাংলার অগ্নিযুগ—১·৫০, ২। ঘরিস্তারতে ভারতীয় বিপ্লব প্রচেষ্টা—৮·০০ ৩। অনুশীলন সমিতির পি, মিত্তির—২·০০, ৪। দৌহাটী সংগ্রাম কাহিনী—১·০০, ৫। কাকোরী ষড়যন্ত্র—১·২৫, ৬। কলকাতা যাদুঘর সংগ্রাম কাহিনী—·৪০, ৭। রাসবিহারী ও অনুশীলন সমিতি—·৬০ ৮। স্বাধীনতার শহীদ মা ও মেয়ে—·৪০, ৯। বিবেকানন্দ ও সমাজবাদ—·৬০ ১০। বিপ্লবী বিবেকানন্দ—·৫০, ১১। মহারাজ ও সুভাষচন্দ্র—·৪০ ১২। ভারতের মহাসমর ও জগিনী নিবেদিতা—·৭৫, ১৩। দেশ যাদের চোলেনি (১)—১·০০, ১৪। দেশ যাদের চোলেনি (২)—২·০০ ১৫। শহীদ চন্দ্রশেখর আজাদ—·৫০, ১৬। ১৯শে এপ্রিল জাতীয় শহীদ দিবস—১·০০, ১৭। হাজির হত্যা প্রচেষ্টা—·৭৫, ১৮। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও অনুশীল সমিতি—৭·০০, ১৯। ভারতের জাতীয় পতাকার ইতিহাস—·৪০, ২০। লাট হত্যা প্রচেষ্টা—১·৫০

সম্পাদক—
শ্রীনান্তিশরণ রায়চৌধুরী
॥ সম্পাদকমণ্ডলী ॥

শ্রীজগদীশ চট্টোপাধ্যায় (সভাপতি)

শ্রীউমেশচন্দ্র নন্দী
পুষ্প চ্যাটার্জী
মলয় ঘোষ

প্রকাশক ও মুদ্রক—
শ্রীঅনিল সেনগুপ্ত

শিল্পীর বিশেষ প্রতিনিধি—
শ্রীবরীন ঘোষ

ফোলা—
শ্রীনন্দগোপাল পাল

প্রাপ্তিস্থান :— ৪নং বলরাম দাস ষ্ট্রীট কলিকাতা-৭০০০০৭

টৈশলশ্রী—১/১/১/A বঙ্কিম চ্যাটার্জী ষ্ট্রীট কলিকাতা-৭৩

মূল কার্যালয়—৪নং বলরাম দাস ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০০৭ শ্রীঅনিল সেনগুপ্ত কর্তৃক [illegible] এবং তৎকর্তৃক প্রিন্টিং পাবলিসিটি, ১১৭, কেশবচন্দ্র সেন ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০০৯ হইতে মুদ্রিত।

বিপ্লবী বাংলা

॥ বিপ্লবী পরিষদের সাপ্তাহিক মুখপত্র ॥

স্থাপিত—১৯৫৬, 'বিপ্লবী বাঙ্গালী' নবকলেবরে—১৯৭১

দশম বর্ষ	শনিবার ৯ই ফাল্গুন, ১৩৮৭ ২১শে ফেব্রুয়ারী ১৯৮১	১৮ সংখ্যা

I was a fighter,
One fight more,
The last and
The best.

Rash Behari Bose
25/1/42

CALCUTTA U. CENTRAL LIBRARY.

পরলোকে প্রবীণ দেশসেবক ক্ষিতিশচন্দ্র দাস

গত ৮ই ফেব্রুয়ারী ৮৩ বৎসর বয়সে ক্ষিতীশ চন্দ্র দাস হাওড়া বাসভবনে পরলোক গমন করেন। ক্ষিতীশ চন্দ্র দাস ৩০শে আশ্বিন ১৩০৪ বাং (ইং ১৮৯৮) বরিশাল জেলার উত্তর সাহাবাজপুরে জন্মগ্রহণ করেন। বরিশাল শহরে লেখাপড়া করেন। ছাত্র জীবনেই হিন্দু-মহাসভা সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত হন। বরিশালের শরৎচন্দ্র গুহ, ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, নির্ম্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, আশুতোষ লাহিড়ী, ডাঃ বারে, ডাঃ ভোপৎকার, বীর সাভারকার প্রমুখ সর্বভারতীয় নেতাদের সংস্পর্শে এসে সারা বাংলা ও ভারতের বিভিন্ন স্থানের হিন্দু মহাসভার সক্রিয় সংগঠকের দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

বীর সাভারকার ও অন্যান্য বিপ্লবীদের নিকট বিপ্লবী মহানায়ক রাসবিহারী বসুর বৈপ্লবিক কর্মকাণ্ডের বিষয় জানিতে পারেন। রাসবিহারী বসুর বৈপ্লবিক কর্মকাণ্ডের তথ্য সংগ্রহের জন্য দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ও বাংলার হেমেন্দ্র প্রসাদ ঘোষ, হরিহর শেঠ, অমরেন্দ্র নাথ চট্টোপাধ্যায়, ভূপতি মজুমদার, মনোরঞ্জন গুপ্ত, আশুতোষ লাহিড়ী, নলিনী কিশোর গুহ, হেমচন্দ্র ঘোষ প্রমুখ বিপ্লবী নেতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করে বিপ্লবী মহানায়ক রাসবিহারী বসু স্মৃতিরক্ষা কমিটী গঠন করেন। এই কমিটীর সম্পাদক ক্ষিতীশ বাবুই ছিলেন এবং ১৯৫৪ সাল থেকে এই কমিটীর কাজেই ব্রতী হন। তাহারই প্রচেষ্টায় কয়েক বৎসর ব্যাপি প্রতি বৎসর রাসবিহারী বসু স্মৃতি সভার আয়োজন হয়েছে, সেই সময় প্রকাশিত স্মারকগ্রন্থে রাসবিহারী বসুর কর্মকাণ্ডের অনেক তথ্য আমরা জেনেছি। বিপ্লবী মহানায়কের স্মৃতি রক্ষার্থে ক্ষিতীশ বাবুর অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলেই ১৯৬৭ সালে ভারত সরকার স্মারক ডাক টিকিট প্রকাশ করেন, কলিকাতার ক্যানিং ষ্ট্রীটের নাম পরিবর্তন করে বিপ্লবী রাসবিহারী বসু রোড হয়। ক্ষিতীশবাবু আমাদের মধ্যে না থাকলেও তাঁর প্রারব্ধ কাজ সম্পন্ন করতে পশ্চিম বঙ্গ সরকার ত্রুটি করবে না।

ক্ষিতীশ বাবুর অভাব বিপ্লবীরা বিশেষ ভাবে অনুভব করবে। আমরা ক্ষিতীশবাবুর পরিবারের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা জানাই। তাঁর স্মৃতিতে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করি।

— এ কু শে ফে ব্রু য়া রী —

কালের প্রবাহ পথে, প্রত্যেক জাতির জীবনে চলে অন্ধকার ও আলোর খেলা। নিরবিচ্ছিন্ন গৌরবের অধিকারী কেউ থাকে না, পতন-অভ্যুদয়ের পথে তাকে চলতেই হয়। কিন্তু অন্ধকারের মধ্যে যে সব আলোর দিশারী, আপন প্রাণের প্রদীপ জ্বেলে, পথপ্রদর্শকের ভূমিকা পালন করেন, যে সব মানুষ কবির ভাষায় যাদের বলা যায়- সাধক, পাগল ও প্রেমিক, তারা মানব ইতিহাসে চিরভাস্বর ও অবিস্মরণীয় হয়ে থাকেন। এদেশের এমন অনন্য-সাধারণ মানুষের সংখ্যা খুব কম নয়। তারা প্রত্যেকেই তাদের জীবিতকালে, নিজেদের চারিত্র প্রভাবে অগ্রাগুদের করেছেন উদ্দীপিত, নিজেদের অন্তর্নিহিত তীব্র জারক রসে জারিত করেছেন বহু মানুষকে, যার ফলে তারা জীবন-মৃত্যুকে করেছে পায়ের ভৃত্য' চির যাদের হয়েছে ভাবনাহীন, যার প্রভাবে তারা মেরুদণ্ড সোজা করে সংগ্রাম করেছে সব অবিচার, অন্যায় ও নিপীড়নের বিরুদ্ধে এমন কি হাসিমুখে ফাঁসিকাষ্ঠে আত্মনিবেদন করেছে অভূতপূর্ব শৌর্যবীর্য্য ও অপরূপ মহিমায়। ভারত-জননী এমন অনেক সন্তানের জন্মদান করেছেন যারা শুধু ভারতেরই নয়, সমগ্র বিশ্বের। ভারতের নবজাগরণের যুগেই এদের আবির্ভাব ঘটেছিল। তাই দেশবাসী আজ শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করে রাজা রামমোহনকে, স্বামী বিবেকানন্দকে, রবীন্দ্রনাথকে, শ্রী অরবিন্দকে, মহাত্মা গান্ধীকে, রাসবিহারী বসুকে, নেতাজী সুভাষচন্দ্রকে এবং আরো অনেক নেতৃবৃন্দ ও দেশহিত ব্রতে নিবেদিত-প্রাণ শহীদ ও স্বাধীনতা সংগ্রামীদের।

জাতির জীবনে শুভকর্ম-সূচনা করার দিনগুলিও চিরস্মরণীয়। এই দিনগুলি জাতীয় জীবনের চলার পথের একটি একটি আলোকস্তম্ভ। জাতীয় ইতিহাসের একটি দিক্‌চিহ্ন। পরবর্তীকালে যখন দেশের মানুষ নানাকারণে দিশাহারা হয়ে পড়ার সম্ভাবনার মুখোমুখি হয়ে সঠিক পথ নির্ধারণ করার দুরূহ কাজে ব্রতী হয়, তখন এই সব দিক চিহ্নগুলিই ঘণায়মান অন্ধকারের মধ্যে দীপশিখার কাজ করে। ভারতের ইতিহাসে একুশে ফেব্রুয়ারী এমনই একটি দেদীপ্যমান দিন।

উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে দুর্দিনে আলো জ্বালাবার প্রচেষ্টায় মঙ্গল পাণ্ডে নিজ জীবন বিসর্জন দিয়ে যে বিপ্লবের হোমাগ্নি জ্বালিয়েছিলেন, যে যজ্ঞে চাপেকার ভাইয়েরা জীবনাহুতি দিয়ে সমিধ্ জুগিয়েছিলেন, সেই বিপ্লব যজ্ঞ সম্পূর্ণ করার জন্য একুশে ফেব্রুয়ারী দিনক্ষণ ধার্য্য করেছিলেন বিপ্লবী মহানায়ক রাসবিহারী বসু। ভারত, বর্মা, সিঙ্গাপুরস্থিত সৈন্যবাহিনীর মধ্যে সশস্ত্র বিদ্রোহ ঘটিয়ে, দেশের অভ্যন্তরস্থিত বহ্নিমান বিপ্লব আন্দোলন কে সফল করে দেশমাতৃকার পরাধীনতার শৃঙ্খল মোচন করতে চেয়েছিলেন রাসবিহারী এই একুশে ফেব্রুয়ারী তারিখেই। যারা একে পুলিশ বিদ্রোহ বলে আখ্যা দিতে চান, তারা বিপ্লব আন্দোলনের গতি, প্রকৃতি ও ইতিহাস সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ। যাই হোক, এই দিনটি নির্ধারণ করার ব্যাপারে বাংলার কোন বিশিষ্ট বিপ্লবী নেতার সঙ্গে কিছুটা মত-বিরোধ হলেও, রাসবিহারী কিন্তু তার পরিকল্পনা এই দিনেই বাস্তবায়িত করতে দৃঢ় সঙ্কল্প করলেন 'শ্রদ্ধেয় বসু মহাশয়।' কিন্তু দেশের দুর্ভাগ্য যে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে আরো কয়েকটি জগৎ শেঠ, উমিচাঁদ,

মীরজাফরের উত্তরসূরীদের অভাব ঘটল না। এবার একাজ করলেন রূপাল সিং প্রমুখ কয়েকজন বিশ্বাসঘাতকেরা। তারা ইংরেজ কর্তৃপক্ষের নিকট সব কথা ফাঁস করে দিয়ে সিঙ্গাপুর থেকে কাবুল পর্যন্ত বিস্তৃত মহাবিপ্লবের পরিকল্পনাকে ব্যর্থ করেছিল। রাসবিহারীর আজীবন সাধনারত সফলতা লাভ করার একটি অপূর্ব সুযোগ নষ্ট করে দিল; অবশ্য সাময়িকভাবে। এমনিতেই কোন বিবর্তনই সম্পূর্ণ নষ্ট হয় না, প্রত্যাশিত ফল লাভকে বিলম্বিত হয় মাত্র। রাসবিহারী পরবর্তীকালে বিংশ শতাব্দীর চতুর্থ দশকে আবার দুর্জয় আজাদবাহিনী সংগঠন করে, তার স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করলেন। ইংরেজ সাম্রাজ্যের ভিত্তিমূল শিথিল করে দিয়েছিল, রাসবিহারী ও নেতাজী সুভাষচন্দ্রের আজাদ হিন্দ্ বাহিনী একথা আজ কে অস্বীকার করবে

একুশে ফেব্রুয়ারীর পরিকল্পনা এক দিনে বা হঠাৎ গড়ে ওঠেনি। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশক থেকে যে বিপ্লবী সংগ্রামের ধারা বেয়ে উঠতে থাকে,এই পরিকল্পনা বিবর্তনের পথে একটি সুসংহত সুপরিকল্পিত পরিণতি মাত্র।

গান্ধীজীর ভারতীয় রঙ্গমঞ্চে আবির্ভাবের পূর্বে এই বিপ্লবীরাই এই ঘুমের দেশে এরাই জেগেছিল সবার আগে. আর এরা জেগেছিল বলেই কোটি কোটি তন্দ্রাপুর। পুরোপুরি না জাগুক, তবু যুগের একটু আধটু আড়মোড়া ভাঙতে শুরু করেছিল।" যারা আজ স্বাধীনতা সংগ্রামে বিপ্লবীদের অবদানকে অস্বীকার করে শুধু গান্ধীজীর আন্দোলনের জন্য দেশের স্বাধীনতা এসেছে বলে ইতিহাস রচনা করতে চান, তারা ভ্রান্ত, অন্ধ এবং অকৃতজ্ঞ। তারা ঋষি-ঋণকে মর্য্যাদা না দেবার অপরাধে অপরাধী। নেতাজী এদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত থাকার ফলে অকুণ্ঠচিত্তে স্বীকার করেছিলেন। বলেছিলেন "দেশের শ্রেষ্ঠ ত্যাগ, শ্রেষ্ঠ বীর্যের যদি পরিচয় পেতে হয়। তবে সন্ধান করতে হবে নামজাদা রাজনৈতিকদের মধ্যে নয়। এই অজ্ঞাত, অখ্যাত, লাঞ্ছিত, নিরাশ্রয় দেশ প্রেমিকদের মধ্যে।" একুশে ফেব্রুয়ারীর পরিকল্পনা, প্রস্তুতি, সংগঠন, বাস্তবায়নের প্রচেষ্টা এই মন্তব্যের সত্যতাই প্রমাণ করে। তাই সারা দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামীরা এই দিনটিকে ঐতিহাসিক মূল্য দেয় ও শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করে। একুশে ফেব্রুয়ারী দিনটিও দেশ ও কাল অতিক্রম করে আজও সারা বিশ্বের ও নিরবধি কালের ক্যালেন্ডারে শুভ্র সমুজ্জ্বল রূপে ভাস্বর হয়ে আছে ও থাকবে।

প্রসঙ্গতঃ বাঙ্গালী মাত্রেরই এই দিনটিকে আরো একটি কারণে মনের মনিকোঠায় সমুজ্জ্বল হয়ে থাকবে। রাজনৈতিক অদূরদর্শিতার ফলে ভারত মাতার অঙ্গচ্ছেদের দরুণ যে নতুন একটি ভৌগলিক সীমা গড়ে উঠেছিল, তারই পূর্ব প্রান্তে একদল দামাল বাঙ্গালী ছেলে মাতৃভাষার মর্যাদা ও সম্মান প্রতিষ্ঠা করে বুকের রক্ত ঢেলে দিয়ে ঢাকার রাজপথ রাঙিয়ে দিয়েছিল। বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্র ভাষা হিসাবে স্বীকৃতি দিতে বাধ্য করেছিল, সর্বোদ্ধত অবাঙ্গালী শাসকদের, যেটা এপার বাংলায় আমরা আজো করতে পারিনি।

আমরা একুশে ফেব্রুয়ারী দিনটির উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা নিবেদন করি ও কোটি কণ্ঠে আওয়াজ তুলি, একুশে ফেব্রুয়ারী জিন্দাবাদ।

বিপ্লবী মহানায়ক রাসবিহারী বসু

[সর্বভারতীয় সশস্ত্র অভ্যুত্থান ৬৬তম স্মারক দিবসে মহাজাতি সদনে ২১শে ফেব্রুয়ারী পঠিত]

—প্রজেন্দ্রচন্দ্র দাস

মাননীয় সভাপতি ও সমাবত বন্ধুগণ,

গত বৎসর ২১ ফেব্রুয়ারী এই মঞ্চ হতেই বিপ্লবী মহানায়ক রাসবিহারী বসুর অর্দ্ধশতাব্দী ব্যাপি বিপ্লবী কর্মকাণ্ডের রূপরেখা আপনাদের নিকট নিবেদন করার আমার সৌভাগ্য হয়েছিল। আজ আবার ১৯১৫ সালের ২১ ফেব্রুয়ারী সর্বভারতীয় সশস্ত্র অভ্যুত্থানের ৬৬ তম স্মারক দিবসে গভীর সভায় ক্ষোভের সহিত প্রকাশ করতে বাধ্য হতেছি যে আমাদের দেশের ঐতিহাসিক ও রাজনৈতিক নেতারা এখনও রাসবিহারী বসুর বৈপ্লবিক কর্মকাণ্ডের মূল্যায়নে একেবারে উদাসীন। নেতাজীর জন্মদিনে আজাদ হিন্দ আন্দোলন বিষয়ে অনেক উল্লেখ হয়েছে অথচ আজাদ হিন্দ সঙ্ঘ ও ফৌজ যার নেতৃত্বে প্রচেষ্টায় ও পরিকল্পনায় গড়ে উঠেছিল, সেই রাসবিহারী বসুর অবদানের সামান্যতম উল্লেখ শুনা যায় নাই। এতে আমাদের দেশের বৈপ্লবিক আন্দোলনের ইতিহাসকেই ম্লান করা হয়েছে। নিরবচ্ছিন্ন সশস্ত্র বৈপ্লবিক আন্দোলনের জন্যই মূলতঃ ভারতে ধাপে ধাপে ইংরেজের শাসন সংস্কার হয়েছে এবং শেষ পর্যন্ত ব্রিটিশ ক্ষমতা হস্তান্তর করতে বাধ্য হয়েছে। এই বাস্তব ঘটনা উপেক্ষা করা হতেছে, ফলে স্বাধীনতোর যুবকদের মনে সশস্ত্র বৈপ্লবিক আন্দোলনের আদর্শ মূর্ত হয়ে উঠছে না, যুবকরা দেশ গঠন কাজে বিপ্লবীদের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হতেছে না, জাতি ধাপে ধাপে অবক্ষয়ের পথে নেমে চলেছে।

১৯২১ সালের ২১ ফেব্রুয়ারী সারাভারত ব্যাপি সশস্ত্র গণ-অভ্যুত্থানের প্রয়াস একটী বিচ্ছিন্ন বৈপ্লবিক ঘটনা নয়। বড়লাট লর্ড হার্ডিঞ্জের উপর বোমা নিক্ষেপ, সারাভারত ব্যাপি গণ-অভ্যুত্থানের প্রয়াস পূর্ব এশিয়ায় সাম্রাজ্যবাদ বিরোধ, ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন, আজাদ হিন্দ সঙ্ঘ ও আজাদ হিন্দ ফৌজ গঠন ভারতের স্বাধীনতা লাভের ধারাবাহিক প্রচেষ্টার সময়োপযোগী রূপদান এই পটভূমিকায় বিচার করতে হবে।

রাসবিহারী বসুর নেতৃত্বে ১৯১২ সালের ২৩ ডিসেম্বর বড়লাট লর্ড হার্ডিঞ্জের উপর বোমা নিক্ষেপ ১৯১৫ সালের ২১ ফেব্রুয়ারী সর্বভারতীয় গণ-অভ্যুত্থানের প্রয়াস, ১৯২৪ সালের পূর্ব-এশিয়ায় Indian Independent League গঠন, ব্রিটিশ হেগ্যাণ্ড ফ্রান্স প্রভৃতি পাশ্চত্য সাম্রাজ্যবাদীদের বিরুদ্ধে আন্দোলনের জন্য ১৯২৬ সালে ১লা আগস্ট জাপান চীন, ভারত, আফগানিস্তান, ভিয়েতনাম, ফিলিপাইন প্রভৃতি দেশের প্রতিনিধি দ্বারা All Asia People's Organization গঠন যার রণধ্বনী ছিল পাশ্চাত্য সাম্রাজ্যবাদ থেকে মুক্ত করব এশিয়া ভারত মুক্ত করব ব্রিটিশ তাড়ায়ে, ভারতের মুক্তি

বিশ্বের মুক্তি, ১৯৪১ সালের ৮ই ডিসেম্বর জাপান মিত্র শক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার পর ইণ্ডিয়ান ইণ্ডিপেনডেন্ট লিগের সভাপতিরূপে জাপানী সামরিক বিভাগের সঙ্গে পূর্ব এশিয়ার ভারতীয়দের মিত্ররাষ্ট্রের নাগরিক গণ্য করার চুক্তি করে টকিয়োতে আনন্দ মোহন সহায়, দেশপাণ্ডে, লিগম, রাসমূর্ত্তি, জেনাসন, নারায়ণ প্রভৃতি ৭০ জন সুপরিচিত ভারতীয়ের নেতৃত্বে আজাদ হিন্দ সঙ্ঘ ফৌজ গঠন, বেংকক কলেজের দর্শন শাস্ত্রের অধ্যাপক ফরিদপুর নিবাসী বিপ্লবী সত্যানন্দ পুরী, ওরফে প্রফুল্ল কুমার সেন ও আরও চারজন ভারতীয় এই সম্মেলনে যোগদান করার জন্য রেঙ্গুনে যাওয়ার পথে বিমান দুর্ঘটনায় মারা যায়। সঙ্ঘ সমগ্র পূর্ব এশিয়ায় আজাদ হিন্দ ফৌজ সংগঠন করে ১৭ই ফেব্রুয়ারী ভারতীয়দের নিকট আবেদন স্বদেশে ও বিদেশে বিগত একশ বৎসর আমরা ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে আসছি, সহস্র সহস্র ভারতবাসী আত্মোৎসর্গ করেছেন এই বিরাট সংগ্রামে। অস্ত্রের অভাবে আমাদের উদ্দেশ্য সাধন করতে পারিনি। আজ আমরা পেয়েছি সুবর্ণ সুযোগ, আসুন এই সুযোগে ব্রিটিশের সঙ্গে সব সম্পর্ক ছিন্ন করি। আজাদ হিন্দ ফৌজ সামরিক কায়দায় সুসজ্জিত করে, আনুষ্ঠানিকভাবে জাপানের প্রধান সামরিক দপ্তরের কমাণ্ডার-ইনচিফ জেনারেল সুগিয়ামার সঙ্গে সমভিত্তিক রাজনৈতিক চুক্তি করে, ফৌজের মধ্যে আভ্যন্তরীণ বিরোধ নিষ্পত্তি করে ১৯৪৩ সালের ৪ঠা জুলাই সিঙ্গাপুর ময়দানে ৫০ হাজার ভারতীয়ের বিরাট সভায় সুভাষ চন্দ্রকে উপস্থিত করে আমি আজ আপনাদের জন্য এই উপহার নিয়ে এসেছি, এই নেতাজী, ভারতের যা কিছু শ্রেষ্ঠতম, যা কিছু শক্তিশীল তারই প্রতীক তিনি আমি বিশ্বাস করি সুভাষ চন্দ্রের নেতৃত্বে সংগ্রাম বিজয়ের পথে এগিয়ে যাবে এই ভাষণের পর সুভাষ চন্দ্রকে আজাদ হিন্দ ফৌজের সর্বাধিনায়ক ঘোষণা করা।

২১ অক্টোবর নেতাজী সুভাষচন্দ্রকে স্বাধীন ভারত রাষ্ট্রের অস্থায়ী সরকারের রাষ্ট্রপ্রধান নিযুক্ত। নিজেও সরকারের সঙ্গে যুক্ত হলেন প্রধান পরামর্শদাতারূপে নেতাজীর অনুরোধে।

এই সমস্ত বৈপ্লবিক কর্মকাণ্ডের মধ্যে কয়েকটি বিশেষ বিশেষ ঘটনার উল্লেখ করে রাসবিহারী বসুর বৈপ্লবিক চরিত্রের বৈশিষ্ট্য তুলে ধরব।

লর্ড হার্ডিঞ্জের উপর বোমা নিক্ষেপের নেতা রাসবিহারী বসু এবং সমস্ত আয়োজন তিনিই করে ছিলেন এমন অবস্থায়ও গোয়েন্দা দপ্তর রাসবিহারী বসুকে কলিকাতায় প্রেরণ করেন বড়লাটের উপর বোমা নিক্ষেপের তথ্যাদি সংগ্রহ করতে রাসবিহারী সেই সময় কলিকাতার বরিশাল ষড়যন্ত্র মামলার পলাতক আসামী প্রফুল্ল চন্দ্র গাঙ্গুলী প্রমুখের সঙ্গে একত্র বাস করতেন, এবং সর্বভারত ব্যাপি সশস্ত্র গণ-অভ্যুত্থানের জন্য অনুশীলন সমিতির সঙ্গে অন্যান্য বিপ্লবী গোষ্ঠীর সমন্বয় সাধন করে সারাভারত ব্যাপি বিপ্লবী সংগঠনের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন,. সেই সময় অনুশীলন সমিতির প্রথম সারির প্রায় সব নেতাই গ্রেপ্তার, রাসবিহারী পলাতক অবস্থায় ছদ্মবেশে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন পরিচয়ে, কখনও কাবুলিওয়ালা, কখনও বা পাঞ্জাবী ব্যবসায়ী, কখনও রাজস্থানী জমিদারী কখনও বা সরকারী কর্মচারীর পত্নী, কখনও রেলওয়ে কুলি, কখনও পুরোহিত, কখনও জমাদার পরিচয়ে পেশোয়ার হতে সিঙ্গাপুর পর্যন্ত ২৯টি মিলিটারি সৈন্যবাহিনী ও বিপ্লবী সংগঠন সংগঠিত করেন।

সাধারণ লোকের নিকট পরিচয় ছিল সুরেন্দ্র নাথ দত্ত।

ভারতের বিভিন্ন বিপ্লবী গোষ্ঠির মধ্যেও বিদেশে ও ভারতীয় বিপ্লবীদের সমন্বয় সাধন করে বিপ্লবের পথে রাসবিহারী এগিয়ে যান। এই সমন্বয় অটুট বিশ্বাস ছিল বলেই রাসবিহারী বাংলার অনুশীলন নেতাদের নিকট রবীন্দ্রনাথের ভাষা উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন "ঘন্টা যখন উঠবে বেজে, আসবে সবাই আপনি সেজে, এক সঙ্গে সব যাত্রী যত একই রাস্তা লবেই লবে"। আমেরিকাতে গদর দল জার্মানিতে বার্লিন কমিটির নেতৃত্বে ও অন্যান্যস্থানের বিপ্লবীরা এই অভ্যুত্থানের প্রস্তুতির সামিল হয়। একই সময়ে বর্মা সিঙ্গাপুর সহ সারাভারতে স্বাধীনতা ঘোষণার জন্য বিপ্লবীদলের কর্মীদল, তাদের সমর্থক ও তাদের দ্বারা প্রভাবিত জনগনও প্রস্তুত হয়। বিশ্বাস-ঘাতকতার জন্য ব্রিটিশের আক্রমণ নির্দ্ধারিত দিনের আগেই শুরু হওয়ায় সারাভারত ব্যাপি অভ্যুত্থান একই দিনে একই সময়ে সম্ভব হয় নাই। কিন্তু বিপ্লবী সৈন্যরা নীরবে ইংরেজের বশ্যতা স্বীকার করে নাই।

ফিরোজপুরে লড়াই করে ৫০ জন বিপ্লবী মৃত্যু বরণ করে, অন্যান্য স্থানেও লড়াই হয়। সিঙ্গাপুরে ডাণ্ডিখানের নেতৃত্বে 15th mahamadan platoon ও 35th Sikh Regiment স্বাধীনতা ঘোষণা করে প্রায় এক সপ্তাহ নিজেদের শাসন কায়েম রাখে। অভ্যুত্থান পর্যুদিস্ত হয়ে যাওয়ার পর রাসবিহারী সরোজমিনে তদন্ত করে সহকর্মিদের জানালেন বর্তমানে সৈন্যদের অস্ত্রশস্ত্রের উপর নির্ভর করা যায় না কাজেই স্থির হল বিদেশ হতে ভারতে বিপ্লবীদের হাতে অস্ত্রশস্ত্র পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। রাজা পি এন ঠাকুর ছদ্মনামে ১৯১৫ সালের ১২ই মে বিদিরপুর ডকের ১২নং বার্থ থেকে সাজকীমারু জাহাজে রাসবিহারী জাপানে চলে গেলেন। জাপানে যাওয়ার পাসপোর্ট সংগ্রহে রাসবিহারী অসমা সাহস, অদ্ভুদ কৌশল ও অপূর্ব উপস্থিত বুদ্ধির পরিচয় দিয়েছিলেন।

সেই সময় রবীন্দ্রনাথের জাপান সফরে ব্যবস্থা করার জন্য রাজা পি, এন, ঠাকুরের জাপান যাওয়ার সংবাদ পত্রিকায় প্রকাশ হয়েছিল। রাসবিহারী বসু এই সুযোগ নিয়ে নিজের চেহারা 'মেক্-আপ্' দিয়ে পি, এন ঠাকুর করে পাসপোর্ট অফিসে ফরাসি মহিলা অভ্যর্থনায় অফিসারকে রবীন্দ্রনাথের গীতাঞ্জলির ফরাসি সংস্করণ উপহার দেন। মহিলা অফিসার খুশী হয়ে পাসপোর্ট অফিসারের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন, তখন সেখানে উপস্থিত সরকারী কর্মচারী দেশনেত্রী বিপ্লবী লীলা রায়ের পিতা গিরিশ চন্দ্র নাগ রাসবিহারীকে রাজা, পি, এন, ঠাকুর বলে সম্বোধন করেন, ইহাতে কার্য্যহাসিল হয়।

গিরিশ চন্দ্র নাগ ও রাসবিহারীর সহকর্মী নগেন্দ্র দত্ত ওরফে গিরিজাবাবু একই গ্রামবাসী ছিলেন। গিরিজাবাবু বেনারস ষড়যন্ত্র মামলায় ১৯১৬ সালে ১৪ ফেব্রুয়ারী কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়ে কারাগারেই মৃত্যুবরণ করেন। বিপ্লবীদের সংস্পর্শে ছিল বলেই গিরিশবাবুর ঘরে লীলারায়ের মত একজন বিপ্লবী মহিলার আবির্ভাব হয়েছিল। জাপান যাওয়ার সময় রাসবিহারী সহকর্মীদের বলে গেলেন সংগঠন রক্ষা করুন, যুবকদের দেশাত্মবোধ বিপ্লবী চেতনায় উদ্বুদ্ধ করে দলভুক্ত করতে থাকুন, সৈন্যদের মধ্যেও সংযোগ রাখার চেষ্টা করবেন খুব সতর্কতে।

জাপানে পৌঁছেই রাসবিহারী বিপ্লবী অবণী

মুখার্জী ও গদর দলের নেতা ভগবান সিং-এর সহযোগিতায় জার্মান কনসাল জেনারেলের সঙ্গে যোগাযোগ করে দুই জাহাজ বোঝাই অস্ত্র সম্ভার ভারতে বিপ্লবীদের কাছে পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা করেন। ইতিমধ্যে যুদ্ধোপসাগরে ব্রিটিশ নৌবহর টহল শুরু হওয়ায় অস্ত্র সম্ভার ভারতে পৌঁছান সম্ভব হল না। ভারতে বিপ্লবীদের সমিতির উপরও আক্রমণ শুরু হল।

১৯১৫ সালের ৯ই সেপ্টেম্বর বালেশ্বরে বুড়িবালামের তীরে ব্রিটিশ সৈন্যবাহিনীর বিরুদ্ধে বিপ্লবীনায়ক যতীন্দ্র নাথ ও তাঁর সহকর্মীগণ আত্মাহুতি দেন। ১৯১৮ সালে ৭ই ও ৯ই জানুয়ারি গৌহাটি আঁটগাও ও নবগ্রহ পাহাড়ে বিপ্লবী নলিনী কান্ত ঘোষের নেতৃত্বে সশস্ত্র পুলিশ বাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধ হয়। ১৯১৮ সালের ১৩ই জুন ঢাকা শহরে কলতাবাজারে সশস্ত্র পুলিশের সঙ্গে লড়াই করে বিপ্লবী নলিনী বাকচি ও বিপ্লবী তারিণী মজুমদার মৃত্যুবরণ করেন।

অভ্যুত্থান পর্যন্ত করে ইংরেজ সরকারের নির্মম অত্যাচারের বিরুদ্ধে শেষ সংগ্রাম কলতাবাজারে নলিনী বাকচি ও তারিণী মজুমদারের যুদ্ধ। ২১ ফেব্রুয়ারি অভ্যুত্থান প্রয়াসে ফিরোজপুরে ব্রিটিশ সৈন্যদের সঙ্গে লড়াই এ এবং সিঙ্গাপুরে হিন্দু-মোসলমান শিখ সৈন্যদের স্বাধীনতা ঘোষণার মধ্য দিয়ে স্বাধীনতার বেদীমূলে যে আত্মত্যাগের সূচনা হয়েছিল, বিপ্লবী নায়ক যতীন্দ্র নাথ ও তাঁর সহকর্মী এবং শহীদ নলিনী বাকচি ও তারিণী মজুমদারের আত্মোৎসর্গে তা আরও কয়েক ধাপ এগিয়ে নিয়ে গেল। ইংরেজ বুঝতে পারল কেবল নির্যাতন নিপীড়ন দ্বারা ভারত শাসন করা যাবে না, তাই ১৯২০ সালে মন্টেগু চেমসফোর্ডের রিফরমস এ্যাক্টের প্রবর্তন হল।

কংগ্রেস কর্তৃক প্রকাশিত ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে সশস্ত্র বিপ্লবী আন্দোলনের অবদান তেমনভাবে প্রকাশ না থাকলেও ব্রিটিশ পার্লামেন্টের রিপোর্টে লিপিবদ্ধ ছিল বিপ্লবীদের সঠিক সশস্ত্র স্বাধীনতা সংগ্রামের কাহিনী। ব্রিটিশ ভারতীয় পুলিশ স্যার চার্লস টেগার্ট ১৯৪১ সালে প্যালেসটাইনের বিপ্লব দমনকারী শাসকরূপে এক বক্তৃতায় বলেছিলেন পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম আদর্শবাদী আত্মত্যাগী বিপ্লবী আমি দেখেছি বাংলার বিপ্লবীদের মধ্যে। ভারতের গভর্নর জেনারেল লর্ড হার্ডিঞ্জ ও পাঞ্জাবের গভর্নর স্যার মাইকেল ওডায়ার তাদের আত্মজীবনীতে বিশেষভাবে রাসবিহারী বসুর কৃতিত্ব পূর্ণ মুক্তি সংগ্রামের কথা উল্লেখ করেছেন। রাউলাট কমিটির রিপোর্টে বলা হয়েছে যে সংখ্যক বাঙ্গালী বিপ্লবীর কার্যকলাপ ভারতে ব্রিটিশ শাসন প্রায় অসম্ভব করে তুলেছিল, তাদের মধ্যে রাসবিহারী বসু ছিলেন প্রধানতম।

যুদ্ধ শেষ হল, পূর্ব এশিয়ার ব্রিটিশ, ফ্রান্স হল্যান্ড সাম্রাজ্যবাদের আগ্রাসন নীতি বেড়ে গেল। রাসবিহারী বসুকে ব্রিটিশ বহু চেষ্টা সত্ত্বেও গ্রেপ্তার করতে সমর্থ হল না। ১৯১৩ সাল থেকে ভারতে ও জাপান ব্রিটিশ গোয়েন্দাদের সমস্ত প্রচেষ্টা ও চক্রান্ত ব্যর্থ করে দিয়ে রাসবিহারী ১৯২৪ সালে জাপানের নাগরিকত্ব লাভ করেন। ভারতের মুক্তি যুদ্ধের নয়া কৌশল প্রচার ও সংগঠনের কাজে ব্রতী হলেন। সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির মধ্যে শক্তিশালী ছিল ব্রিটিশ ব্রিটিশের আধিপত্যের প্রধান উৎস ভারত শোষণ, তাই রাসবিহারী বলেছিলেন ভারতের মুক্তি

এশিয়ার মুক্তি। পাঞ্জাব কেশরী লালা লাজপৎ রায় আমেরিকা হতে ভারতে ফিরার পথে জাপানে পদার্পণ করেন. সেই সময় লাজপৎ রায় রাসবিহারীকে মহাচীনের মহানায়ক সান-ইয়াৎ-সেনের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন। প্রখ্যাত জাপান মনীষি ম্যাক ডাগন সমিতির অধিনায়ক মিতপুরু তামাসা রাসবিহারীর এশিয়ায় সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আন্দোলন সমর্থন করেন। উভয়ই রাসবিহারীকে এশিয়ার মুক্তি সংগ্রামের অগ্রপথিকরূপে গ্রহণ করেন। রাসবিহারীর রাজনৈতিক প্রজ্ঞা সফল হল। রাস বিহারী এগিয়ে পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধি নিয়ে ১৯২৬ সালে ১লা আগষ্ট গঠিত হল All Asia people's Organisation. পাঞ্জাব ও বাঙ্গলার জননেতারা এবং কংগ্রেস নেতাদের অনেকে বিপ্লবীদের কার্যাকলাপ সমর্থন করে এগিয়ে যাওয়ার পাথেয় সংগ্রহ করতে সাহায্য করেছেন।

পেনাং এ ক্যাডেটদের ট্রেনিং শিবিরের বাঙ্গালী ক্যাডেটদের সঙ্গে সমুদ্রতীরে এসে রাসবিহারী বলেছিলেন 'এই পথে আজ থেকে প্রায় ২৮ বছর আগে পরাধীন ভারতবর্ষ থেকে চলে যাই. আবার এই পথেই স্বাধীন ভারতে ফিরে যাব। কাজেই জাপান নাগরিকত্ব গ্রহণ করলেও মনে প্রাণে, বিপ্লব সাধনায় রাসবিহারী পুরাপুরি বাঙ্গালী ও ভারতীয় ছিলেন।

১৯৪৪ সালের প্রথম থেকেই রাসবিহারীর সারাজীবন সাধনা পূর্ণ হতে চলল—জানুয়ারী মাসে আন্দামান নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ ব্রিটিশ শাসন মুক্ত হল, ব্রিটিশ পতাকার স্থান দখল করল ভারতের জাতীয় পতাকা মার্চ মাসে আজাদ হিন্দ ফৌজ টুংবাজার মেইথন, কালাদান, ফোর্টহোয়াইট, হেটলাসেলট ও কেনেডি পর্বত চূড়াস্থিত ব্রিটিশ ঘাঁটিগুলি দখল করে ভারতে পদার্পণ করে ১৫ই মার্চ জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হয়। ভগ্নস্বাস্থ্য ও পীড়িতাবস্থা সত্বেও রাসবিহারী এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। এই অনুষ্ঠান হতে ফিরে এসেই বিপ্লবী মহানায়ক গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েন।

একই সময়ে উত্তর বর্মাদেশের পথে ঠাডংজান উক্রুল, টিড্রিম, খোলেন, সাংকক, খোরস, তামপু, কবার্ড ও হেংষ্টানে অবস্থিত ব্রিটিশ সামরিক ঘাঁটিগুলি দখল করে ৪ই এপ্রিল দখল করল ভারতভূমি অন্তর্ভুক্ত কোহিমা। তারপর কাংরাটোঙ্গী ময়রা, ওটেংলাউলাল জয় করে আজাদ হিন্দ ফৌজ এগিয়ে চলল। ২২ মার্চ আজাদ হিন্দ ফৌজ গ্রহণ করল সকল মুক্ত ভারতীয় অঞ্চলের শাসনভার। রাসবিহারী রোগ শয্যাতেই স্বাধীন ভারতে ফিরে যাবেন এই আনন্দে উৎফুল্ল হলেন। ইঙ্গ-মার্কিন সামরিক কর্তৃপক্ষ স্থির করলেন বাংলা ও আসাম পরিত্যাগ করে আশ্রয় নিবে বিহার ও উড়িষ্যায়। এমন সময় শুরু হল প্রচণ্ড বর্ষা। জাপানী সৈন্যবাহিনীও প্রতিশ্রুতি রক্ষা করতে পারল না। ফলে আজাদ হিন্দ ফৌজকে স্থগিত রাখতে হল তাদের অগ্রগতি। ২২শে জুলাই থেকে শুরু হল আজাদ হিন্দ ফৌজের পশ্চাতঅপসরণ, ১৯৪৪ সন শেষ হওয়ার আগেই আজাদ হিন্দ ফৌজ বর্মায় প্রত্যাবর্তন করতে বাধ্য হল। এ খবর রোগ শয্যায় পেয়ে রাসবিহারী বসু প্রচণ্ড আঘাত পেলেন, আঘাত অসহনীয় হয়ে উঠল, ধীরে ধীরে ১৯৪৫ সালের ২১শে জানুয়ারী শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন।

জাপান থেকে রাসবিহারী বসু সম্বন্ধে নেতাজী বলেছিলেন, আমি তাকে চিনি না, কিন্তু তিনি যে

টকিয়ো থেকে ভারতের স্বাধীনতার উদ্দেশ্যে এত দীর্ঘকাল সমর তীব্র সংগ্রাম করে যাচ্ছেন এটাই প্রেরণা দায়ক আমার কাছে। আমি সানন্দে তাঁর অধিনে সৈনিক হয়ে ভারতের মুক্তির জন্য সংগ্রাম করব।

সুভাষচন্দ্র জার্মানিতে পৌঁছেই জার্মান সরকারের সঙ্গে চুক্তি করে Indian National Army (আজাদ হিন্দ ফৌজ) গড়ে তুলেছিলেন। এই আর্মি জার্মান সেনাবাহিনীর সঙ্গে আফ্রিকা পর্য্যন্ত এসে আর এগুতে পারি নাই। রাসবিহারী বসু এই খবর জেনে সুভাষচন্দ্রকে জানালেন ইউরোপের সুদূর থেকে রণপ্রস্তুতি চালালে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদকে চরম আঘাত দেওয়া যাবে না। চলে এস, পুবের দ্বার প্রান্তে, দক্ষিণ পূর্ব্ব এশিয়ার ক্ষেত্র প্রস্তুত। বিপ্লবী মহানায়কের আহ্বানে সুভাষচন্দ্র জীবনের ঝুঁকি নিয়ে গভীর সমুদ্রের অতল গহ্বর ভেদ করে সাবমেরিনে চলে এলেন দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার রণ-ভূমিতে। বিপ্লবী মহানায়ক তরুণ বিপ্লবী সুভাষ চন্দ্রকে বরণ করে তুলে দিলেন তার হাতে নেতৃত্বের মহান দায়িত্ব।

রাসবিহারী বসু জীবিত থাকলে আজাদ হিন্দ ফৌজের অগ্রগতির প্রতিবন্ধকতা রুখা যেত, নেতাজী কে হারাতাম না, ভারতে প্রেরিত সিক্রেট সার্ভিসের ক্যাডেটরা স্থানীয় সমর্থনের অভাবে ইংরেজের কবলে পড়তে হত না, নৌসেনানী ও অন্যান্য সৈন্যদের সশস্ত্র বিক্ষোভ সঠিক নেতৃত্বে ইংরেজ শাসনের চূড়ান্ত আঘাত দিয়ে অখণ্ড স্বাধীন ভারতের জন্মদিত, ভারত বিখণ্ডিত হত না।

এই ইতিহাস তুলে ধরলে জাতীয় ঐতিহ্যের প্রতি আস্থা ফিরে আসবে; জাতীয় সংহতি দৃঢ় হবে, জাতী নববলে বলীয়ান হয়ে সারাভারত এক জাতী এক প্রাণ এই সম্বিৎ ফিরে পাবে।

সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী, জাতী সমন্বয়ে বিশ্বাসী রাসবিহারী বসু ছিলেন জাতীয়তাবাদী, সাম্যবাদী, অর্থনীতিতে বিশ্বাসী, ভারতীয় জাতীয়তাবাদে একান্ত আস্থাশীল। ভারতের মুক্তি এশিয়ার মুক্তি এই পটভূমিকায় সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী জাতীয়তাবাদ চিন্তাধারায় রাসবিহারী বসু অন্যূন: ১৪টি পুস্তক জাপানী ও অন্যান্য ভাষায় প্রকাশ করেছেন। রামায়ণ ভাগবৎগীতা রবীন্দ্রনাথের শেষের কবিতা জাপানী ভাষায় অনুবাদ করে প্রকাশ করেছেন, বিভিন্ন জাপানী পত্রিকার নিয়মিত লেখক ছিলেন, এশিয়ান রিভিউ ও নয়া এশিয়ার সম্পাদক ছিলেন। জাপানী ভাষায় সুবক্তা ছিলেন। তাদের অনুষ্ঠানের উদ্যো-ক্তাদের নিকট আমাদের নিবেদন রাসবিহারী বসুর রচিত পুস্তক ও প্রবন্ধ সংগ্রহ করে বাংলা বা ইংরা-জীতে প্রকাশ করুন ইহাই হবে বিপ্লবী মহানায়কের প্রতি শ্রেষ্ঠ শ্রদ্ধা প্রদর্শন।

জয়তু রাসবিহারী
জয়তু নেতাজী

বিপ্লবী মহানায়ক রাসবিহারী বসুর জীবন স্মৃতি

—ভবেশ নন্দী

কালের চলার পথে পরিবর্তনের তীব্র গতিবেগে নূতন রূপে ও রং-এ গড়ে উঠছে বর্তমান সমাজ তার আধুনিক মনোভাব ও নীতিবোধের ধারণা নিয়ে। অতীতের কথা আদর্শ, নীতিমালা ও ভাবাবেগ সম্পূর্ণ ভাবে ম্লান হয়ে যাওয়ার পথে। পরাধীন দেশের দুঃখ যন্ত্রণার কশাঘাত যাদের সইতে হয় নাই তারা উপলব্ধি করতে পারে না. একদল মৃত্যুঞ্জয়ী বীর নিজেদের সকল সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের কথা সম্পূর্ণ ভুলে গিয়ে, এমন কি মূল্যবান জীবনকেও তুচ্ছ করে, স্বাধীনতার তীব্র আকাঙ্খায় ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত জেনেও, নিজেদের প্রাণ অকাতরে বলি দিয়ে গেল কেন? কিসের আশায়! কী ধরণের ধ্যান ধারণা তাদের ছিল? বর্তমান তরুণ মনে আজ এটা একটা জিজ্ঞাসা! তাই আজ এই তরুণদের কালে শঙ্খ, ঘণ্টা বাজিয়ে, সভাসমিতি করে, ইংরেজকে যারা বিতাড়ণ করে দেশকে স্বাধীন মুক্ত করেছেন, তাদের নাম ও তাদের কীর্তির কথা শুনানর চেষ্টা চলেছে। এই আশায় যে অতীতের সাধক কর্মীদের জীবন-আদর্শ, দেশপ্রেম, আত্মত্যাগ স্পৃহা যদি আজকের দিনের তরুণদের মনে এতটুকু ঝঙ্কার তুলতে পারে। ত্যাগ ছাড়া কোন দেশ কখনো বড় হয় না; ত্যাগ ছাড়া স্বাধীনতা কখনো স্বার্থক হতে পারে না। দেশ-মাতৃকার স্বর্ণ-আসন জগৎ-সভায় প্রতিষ্ঠিত হতে পারবে না, যতদিন না দেশের লোক স্বার্থ-চিন্তা বিসর্জন দিয়ে সকলের মঙ্গলের জন্য, 'সর্বজন হিতায়' এগিয়ে না আসতে শেখে। আজ কাল শহরে শহরে, প্রতি মাসে মাসে শহিদ-স্মৃতি দিবস পালিত হচ্ছে। তাদের শুভ চেষ্টায় তরুণ মনে কত টুকু আলোড়ন সৃষ্টি করতে পেরেছে জানি না।

ভারতের বরেণ্য মহানায়ক রাসবিহারী বসুর কথাও দেশের লোকের মন থেকে কোন বিস্মৃতির কোঠায় পৌঁছে গেছে! প্রথম মহাযুদ্ধের কাল। যুদ্ধে ইংরেজ শক্তি চতুর্দিক থেকে কাবু হয়ে আসছে ভারতের স্বাধীনতাকামী ব্যক্তিরা উদগ্রীব হয়ে উঠেছে কি উপায়ে ইংরেজকে এই সুযোগে বিতাড়িত করে দেশ স্বাধীন করবে। আশার সম্ভাবনায় তরুণদের শুধু নয়, প্রবীণদের মনও উৎসাহে আলোড়িত কিন্তু দেশে বিপ্লবী প্রস্তুতি তখনো অসম্পূর্ণ উৎসাহ, আবেগ ও ত্যাগ স্পৃহার কোন অভাব নাই। কিন্তু হাতিয়ার কোথায়? যথেষ্ট হাতিয়ারের দারুণ অভাব। এ অবস্থায় রাসবিহারী ঠিক করলেন, যে দেশী সৈন্যের সাহায্যে ইংরেজ আমাদেরকে শাসন ও শোষণ করে আমরা তাদের মন জয় করে ইংরেজের বিরুদ্ধে তাদেরকে বিদ্রোহাত্মক করে তুলব। দেশ-ব্যাপী সেনা বাহিনী বিদ্রোহী হলে সামান্য সংখ্যক ইংরেজ পল্টন তাদের মোকাবিলা করতে পারবে না। স্বাধীনতা নিশ্চিত। তাই প্রথম থেকে রাসবিহারী দেরাদুনে থেকে বিভিন্ন সেনা-ছাউনীতে অবিরাম প্রচার চালিয়ে অত্যন্ত সুফল লাভ করেন। সেনা-বাহিনী ইংরেজ শাসকের বিরুদ্ধে অস্ত্র তুলে ধরতে ব্যগ্র হয়ে উঠে। এদিকে জার্মানীর সাহায্য নিয়ে কাবুলে অবস্থিত ভারতীয় বিপ্লবীরা কাবুল থেকে

ভারত আক্রমণ করার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিল। সমুদ্র পথেও জার্মান-সাহায্য আসার কথা চলেছিল।

অভ্যুত্থানের দিনও স্থির হল ২১শে ফেব্রুয়ারী ১৯১৫। কিন্তু ভারতের দুর্ভাগ্য কিছু কমের দোষে খবর জানাজানি হয়ে যায়। কৃপাল সিং নামক একজন সৈনিক লাহোরে ব্রিটিশ গোয়েন্দার কবলে প'ড়ে সব কথা বলে দেয়, এমন কি, পরিবর্তিত তারিখের কথাও সে প্রকাশ করে দেয়। ধর-পাকড়, অত্যাচার শুরু হয়ে গেল। এ ব্যাপারে রাসবিহারীর অন্যতম সহযোগী পিংলে এক বাক্স বোমা সহ মীরাট ষ্টেশনে ধরা পড়লেন। মহা নায়ক রাসবিহারী তখনো লাহোরে। ব্যর্থ মনোরথ হয়ে তিনি কাশী ও চন্দননগর হয়ে কলিকাতায় এলেন। অদম্য আত্মবিশ্বাস ও কর্মক্ষমতা এতটুকু ম্লান হোলো না। তিনি দেশে থাকা নিরাপদ মনে না করে, 'টেগোর' এই ছদ্ম নামে জাপানে গিয়ে পৌছান। মনে মনে তাঁর সংকল্প আবার সুযোগ পেলে বিদেশী সাহায্য নিয়ে ইংরেজের উপর ঝাঁপিয়ে পড়বেন। কিন্তু দুর্ভাগ্য! জাপানে পৌছেও মহাবিপদে পড়লেন। জাপান ছিল তখন ইংরেজের 'দোস্ত'। ইংরেজ তাঁকে ধরার জন্য জাপানী সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি করল, এবং জীবিত বা মৃত যে ভাবেই হোক, তাঁকে ধরার জন্য চতুর্দিকে জাল বিস্তার করল। প্রথম ৮ বৎসরকাল এই মহান বিপ্লবী নেতা, আত্মগোপন করে এবং অবর্ণনীয় দুঃখ কষ্ট সহ্য করে জাপানে বাস করেন। পরে স্থানীয় জাপানী বন্ধুবান্ধবের আন্তরিক চেষ্টায় জাপানী নাগরিকত্ব লাভ করে জাপানে বাসবাস করতে থাকেন। তাহার পক্ষে জাপানী নাগরিকত্ব লাভ করাও সহজ ব্যাপার ছিল না। জাপানী একটি রুটি কোম্পানীর সম্ভ্রান্ত মালিক 'মি: সোমারা' তার বিপ্লবী কন্যাকে রাসবিহারীর সহিত বিবাহ দিতে সম্মত হওয়ায় নাগরিকত্ব লাভ করা সম্ভব হয়েছিল। সোমারা পরিবারের ভারত প্রীতি এবং ত্যাগ স্বীকার নিশ্চয়ই আদর্শ স্থানীয়।

এই মহান নায়ক একদিনের জন্যও দেশের পরাধীনতার কথা ভুলতে পারেন নাই। পরাধীন দেশকে কি করে মুক্ত করা যায় এই ছিল তার ধ্যান—তার সাধনা। তাই দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ লাগার ফলে যখন আবার সুযোগের আভাস পাওয়া গেল, তিনি এগিয়ে এলেন। জাপান সরকারের সাহায্যে ভারত জয়ের জন্য সেনাবাহিনী গঠন করে সিঙ্গাপুরে ঘাঁটি স্থাপন করলেন। এরপর নেতাজী সুভাষ-চন্দ্রকে বার্লিন থেকে এনে তাঁর হাতে সব কিছু সঁপে দেন। নেতাজীর আজাদহিন্দ বাহিনী গঠন ও দেশের মুক্তির জন্য চেষ্টার কথা সবাই জানেন। মহানায়ক রাসবিহারীর বহুদিনের চেষ্টার ফলেই নেতাজী সিঙ্গাপুরে পৌছেই ক্ষেত্র প্রস্তুত দেখেন। তার প্রত্যেক কাজে মহানায়ক রাসবিহারীর দীর্ঘ-কালের অভিজ্ঞতা ও সহায়তা নেতাজীকে শতগুণে বলীয়ান করে।

১৯৪৫ সালের জানুয়ারীতে টোকিও শহরে ভারতের এই মহা বীর সন্তান দেহরক্ষা করেন। তাঁর মৃত্যুর পূর্বেই স্ত্রী-বিয়োগ ঘটেছিল। এখন এক পুত্র ও এক কন্যা বর্তমান।

দেশের কয়জন লোক এই মহানায়কের ইতিবৃত্ত জানেন! যে দেশের তরুণদেরকে শেখান হয় না তার নিজের দেশের বীর সন্তানদের শ্রদ্ধা করতে, তাদের জীবনাদর্শ অনুসরণ করতে বরঞ্চ তার

(এর পর ১৬ পাতায় দেখুন)

২১শে ফেব্রুয়ারীর বৈপ্লবিক অভ্যুত্থান প্রয়াস ও বিপ্লবী মহানায়ক রাসবিহারী বসু

: কালীপদ সরকার :

১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের সিপাহী যুদ্ধের পর ভারতবর্ষে অনেক দিন কোন স্বাধীনতা সংগ্রাম ঘটে না। ব্রিটিশ সরকার কিছুটা নিশ্চিত মনে সাম্রাজ্যশাসন করে চলে। স্বাধীনতা লাভের ইচ্ছা যে দেশের মানুষের মনে ছিল না এমন নয়। ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে সরকারের উদ্যোগে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস স্থাপিত হল। ব্রিটিশ চেয়েছিল স্বাধীনতাকামীরা যাতে উগ্রপন্থা গ্রহণ না করে নিয়ম তান্ত্রিক আন্দোলনের পথে থেকে রাষ্ট্রীয় অধিকার লাভের চেষ্টা করে।

কালপ্রবাহ অনেক সময় এমন এক-একটা সন্ধিক্ষণে যখন এক সঙ্গে বহু অভাবিত ঘটনা ঘটে যায় এবং বড় রকমের পরিবর্তনের পথ প্রস্তুত করে। রাজারামমোহন রায়ের অভ্যুদয় কাল থেকে জাতীয় জীবনের অজ্ঞান তমিস্রা অপসৃত হতে থাকে। স্বামী বিবেকানন্দের আবির্ভাব সেখানে জাগায় প্রভাত সূর্যের দীপ্তি। স্বামীজীর মানবতা ভিত্তিক ধর্ম-প্রচার একদিকে যেমন যুগ-যুগান্তর সঞ্চিত কু সংস্কার মিথ্যা আচার ও সংশয় জড়তার বন্ধন ছিন্ন করতে লাগল, অন্যদিকে তাঁর স্বদেশ চিন্তা আত্মবিস্মৃত জাতির অন্তরে জাগিয়ে তুলল স্বদেশ প্রেম। বিবেকানন্দ তরুণ সমাজকে ত্যাগ ও শক্তির মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ করলেন। ভবিষ্যতের কঠোর সংগ্রামের জন্য জাতিকে দিলেন দুঃখ বরণের প্রেরণা।

যে ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে স্বামী বিবেকানন্দ চিকাগো ধর্ম মহাসম্মেলনে ভারতীয় ধর্মের বিজয় পতাকা উড়ালেন, শ্রীঅরবিন্দ দীর্ঘ প্রবাসের পর ফিরে এলেন ভারতবর্ষে। শ্রীঅরবিন্দের আগমনের সঙ্গে দেশের রাজনৈতিক চিন্তা ক্ষেত্রে বিপ্লব ঘটে গেল। ইংরাজ শাসকবর্গের শুভেচ্ছার প্রতি আস্থাশীল নিয়ম তান্ত্রিক আন্দোলনের অবসান আসন্ন হল। অরবিন্দই সর্বপ্রথমে দ্বিধাহীন কণ্ঠে বলেন,—"আমরা পূর্ণ স্বাধীনতা চাই চাই বিদেশীর আদেশ ও বন্ধন থেকে সম্পূর্ণ মুক্তি।" কংগ্রেস অধিবেশনে স্বরাজের ব্যাখ্যা করে তিনি ঘোষণা করলেন—'পূর্ণ স্বাধীনতা ছাড়া স্বরাজ কথার অন্য অর্থ নেই।"

১৯০৫ খৃষ্টাব্দে ইংরাজ সরকার বঙ্গ বিভাগ করল। বঙ্গ-বিভাগ রদের উদ্দেশ্যে আন্দোলন আরম্ভ হল সারা বাংলা জুড়ে। বিভাগ রদের আন্দোলন ব্রিটিশ শাসন উচ্ছেদের আন্দোলনে পরিণত হল। সভা সমিতি করে প্রতিবাদ জ্ঞাপন, বিলেতী দ্রব্য বয়কট এবং অসহযোগ নীতি যখন শাসকদের মনে রেখাপাত করতে ব্যর্থ হল তখন একদল তরুণ সশস্ত্র পন্থা অবলম্বনে কৃতসংকল্প হল। এই ভাবে ভারতে সশস্ত্র, বিপ্লব আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটল।

১৯১১ খৃষ্টাব্দে বঙ্গভঙ্গ রদ হলেও, বৈপ্লবিক কর্ম-কাণ্ড বন্ধ হল না। কারণ সংগ্রাম তখন ভারতবর্ষের স্বাধীনতা অর্জনের বৃহত্তর পটভূমিতে এসে দাঁড়িয়েছে। বাংলার বাইরে মহারাষ্ট্র ও পাঞ্জাবের

তরুণদের আকৃষ্ট করেছে।

১৯০২ খৃষ্টাব্দে কলিকাতায় মুক্তিসংগ্রামের পাদপীঠ অনুশীলন সমিতি গঠিত হয়। ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে ঢাকায় অনুশীলন সমিতির যে শাখা প্রতিষ্ঠিত হয় তাই সমিতির প্রধান কর্মকেন্দ্র হয়ে উঠে। সিডিশান কমিটির রিপোর্টে দেখা যায় যে, অনুশীলন সমিতি সমগ্র বঙ্গদেশে তার তৎপরতা ছড়িয়ে দিয়েছিল এবং সহর ও গ্রামে সমিতির পাঁচ শতাধিক শাখা ছিল। রাসবিহারী বসুর বাল্যকাল কেটেছিল চন্দন নগরে। চন্দননগর ছিল বিপ্লবীদের একটি প্রধান কর্মকেন্দ্র। সেখানে কিশোর বয়সে রাসবিহারী অনুশীলন সমিতির সংস্পর্শে আসেন এবং অসাধারণ প্রতিভাবলে অল্পকালের মধ্যে সমিতির অন্যতম প্রধান নেতার পদে বৃত হন।

১৯১৪ খৃষ্টাব্দে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হলে বাংলার বিপ্লবীবাদীরা সকলে একত্র হয়ে যে সশস্ত্র অভ্যুত্থানের আয়োজন করেন তা ছিল সিপাহী যুদ্ধের পর স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রথম বড় বিস্ফোরণ। বিপ্লবীদের কর্ম তালিকায় ছিল ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে যুদ্ধরত জার্মানী থেকে অস্ত্রশস্ত্র আমদানী সরকারী ও বেসরকারী অর্থ লুণ্ঠন করে অর্থভাণ্ডার গড়া এবং ব্রিটিশের ভারতীয় সৈন্যদের সরকারের প্রতি মন বিরূপ করে বিপ্লবী দলে টেনে আনা এবং অভ্যুত্থান কালে তাদের সাহায্য গ্রহণ। এ সকল কাজ ছাড়া পদস্থ ব্রিটিশ কর্মচারী হত্যা, পুল উড়িয়ে দিয়ে রেল পথের যোগাযোগ নষ্ট করা, টেলিগ্রাফ-টেলিফোনের তার কেটে ফেলা, বোমা প্রস্তুত প্রভৃতিও কর্ম তালিকা ভুক্ত ছিল। অভ্যুত্থানের নায়ক ছিলেন রাসবিহারী বসু ও যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।

ভারতবর্ষে তখন গোরা সৈন্য ছিল না বললেই হয়। ভারতীয় সৈন্যদের এক বড় অংশও ইউরোপ ও মধ্যপ্রাচ্যের রণক্ষেত্রে প্রেরিত হয়েছিল। ব্যাপক বিদ্রোহ ঘটলে ব্রিটিশ সরকারের পক্ষে তা সামাল দেওয়া একরূপ অসম্ভব ছিল। রাসবিহারী এই সুবর্ণ সুযোগ ভারতীয় সৈন্যদলে বিদ্রোহ ঘটিয়ে বিটিশ শাসনের উচ্ছেদ করতে উদ্যোগী হলেন। বিদেশ থেকে অস্ত্রসংগ্রহ ছিল অনিশ্চিত ও সময় সাপেক্ষ তাই তিনি সৈন্য বিদ্রোহের উপর বেশি জোর দেন।

রাসবিহারী বসুর বিরুদ্ধে তখন তিনটী গ্রেপ্তারী পরোয়ানা ঘুরছে. তাঁকে জীবন্ত অথবা মৃত অবস্থায় ধরে দেবার জন্য সরকার এক লক্ষ টাকা পুরস্কার ঘোষণা করেছে। তিনি বড়লাট লর্ড হার্ডিঞ্জের উপর বোমা নিক্ষেপ, দিল্লী ও লাহোর ষড়যন্ত্র মামলার প্রধান আসামী। পুলিশের চোখে ধূলি দিয়ে রাসবিহারী কিন্তু লাহোর, লক্ষ্ণৌ, কানপুর, কাশী, চন্দননগর এবং কলিকাতা ঘুরে বেড়াচ্ছেন এবং বিপ্লবী সতীর্থদের নির্দেশ ও পরামর্শ দিচ্ছেন। তাঁর চেষ্টা অচিরেই সম্ভাবনাময় হয়ে উঠল।

সেনাবাহিনীর Twelfth Cavalry, 12Sth Pioneers, 23rd Cavalry Regiment, 7th Rajput Battalion প্রভৃতি ব্রিটিশের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে প্রস্তুত হল। নওশেরা থেকে লুধিয়ানা, জলন্ধর, কর্পূরতলা, লক্ষ্ণৌ, মীরাট, কাশী এবং মধ্যবর্তী স্থানের সেনা ছাউনিগুলিতে বিদ্রোহের সম্ভাবনা উজ্জ্বল হল। বাংলা থেকে বিধ্বংসী বোমা এনে উত্তর ভারতের গোপন ঘাঁটিতে জমা করা হল। নায়ক রাসবিহারীর নির্দেশ নিয়ে তাঁর বিপ্লবী সহকর্মীরা নিয়ম শৃঙ্খলা রক্ষা করে নিরলস কাজ করে চলেছেন।

প্রস্তুতি পর্ব্ব যখন সমাপ্তপ্রায় তখন রাসবিহারী বসু সহযোগীদের সঙ্গে পরামর্শ করে ১৯১৫ খৃঃ

২১শে ফেব্রুয়ারী সশস্ত্র অভ্যুত্থানের দিন স্থির করলেন। সংবাদ ছড়িয়ে দেওয়া হল ভারতবর্ষের প্রতিটি বিপ্লবকেন্দ্রে সংগোপনে। সকল কর্মী, অনুগামী ও সাহায্যকারী প্রতিক্ষীত ২১শে ফেব্রুয়ারী দিকে চেয়ে রইলেন।

আমেরিকা ও কানাডার বহু স্বাধীনতাকামী শিখ ছিলেন, তাদের মধ্যে অনেকে ছিলেন বিপ্লবী 'গদর' দলের সদস্য। বৈপ্লবিক অভ্যুত্থানে যোগ দেবার উদ্দেশ্যে তারা অস্ত্র নিয়ে দেশে ফিরে এলেন। যারা দেশে পৌঁছতে পারলেন না, তারা মালয়, বার্মা, সিঙ্গাপুর প্রভৃতি স্থানে হামলা শুরু করার জন্য অপেক্ষায় রইলেন। অধিনায়ক রাসবিহারী বসু তাদের সহিত সংযোগ রক্ষা করে চললেন। পাঞ্জাব থেকে সিঙ্গাপুর পর্যন্ত বিপ্লবের আয়োজন যখন সম্পূর্ণ, উত্থানের সব কিছু প্রস্তুত, তখন এক বিশ্বাস ঘাতক কৃপাল সিং ব্রিটিশের নিকট প্রস্তাবিত অভ্যুত্থানের তারিখ ও সংশ্লিষ্ট তথ্যাদি ফাঁস করে দিল। সংগে সংগে রাসবিহারী অভ্যুত্থানের তারিখ এগিয়ে এনে ১৯শে ফেব্রুয়ারী স্থির করলেন এবং পরিবর্তিত তারিখের বিষয় জানিয়ে দিলেন সকল কেন্দ্রে।

বৃটিশ সরকার তখন সতর্ক হয়ে গেছে। ফৌজকে সম্পূর্ণ ডীনিং করে ফেলেছে। শুরু হয়েছে সর্বত্র ধরাপাকড়। সরকার ফৌজের মধ্যে সন্দেহভাজন রেজিমেন্টগুলিকে দূরে দূরে পাঠিয়ে দিল, অনেককে কোর্ট মারশাল করে হত্যা করল এবং শতাধিক জওয়ানকে নির্বাসন দণ্ডে দণ্ডিত করল। মিঃ পিংলে প্রমুখ বিপ্লবীদের সরকার ফাঁসি দিল এবং অপর অনেককে দীর্ঘ মেয়াদী দণ্ডে ও বিনা বিচারে কারারুদ্ধ করল। এইভাবে ২১শে ফেব্রুয়ারীর অভ্যুত্থান প্রয়াস অল্পের জন্য বাস্তবায়িত হতে পারল না।

বিপ্লব সংগ্রামে ব্যর্থতা নেই, নেই বিপ্লবীর জীবনে পরাজয়। বিপ্লবী চির আশাবাদী। নতুন সুযোগের প্রতীক্ষায় সাবধানে আত্মরক্ষা করে চলা হল তাঁর রণনীতি। রাসবিহারী দেখলেন, সহকর্মীদের মধ্যে অনেকের ফাঁসি হল, কারাদণ্ড হল, নির্বাসন হল। তিনি অবিচালিত, নির্ভয়। মাথার উপর তাঁর খড়্গ ঝুলছে। লাহোর ছেড়ে এলেন কাশী। কাশী থেকে কলিকাতা, চন্দননগর, নবদ্বীপ কত জায়গায় গেলেন! বিপ্লবী নেতাদের সহিত পরবর্তী কর্মপন্থা সম্বন্ধে আলোচনা করলেন। বার কয়েক ধরা পড়তে পড়তে বেঁচে গেলেন। দেশের সামগ্রিক অবস্থা অনুধাবন করে রাসবিহারী ১৯১৫ খৃঃ ১১ই মে 'সানুকিমাক' নামক জাপানী জাহাজে 'পি, এন, টেগোর' ছদ্মনামে কলিকাতা ত্যাগ করে জাপান চলে গেলেন।

ব্রিটিশের গোয়েন্দা চক্র ও সান্ত্রী ব্যূহ ভেদ করে রাসবিহারী যখন দেশ ত্যাগ করেন তখন জাপান ব্রিটেনের মিত্র রাষ্ট্র। তা জেনেও অন্য কোন দেশে আশ্রয়লাভের চেষ্টা না করে তিনি জাপানে গিয়েছিলেন শুধু এই কারণে যে, তিনি বুঝেছিলেন, দ্রুত বিকাশশীল এশীয় রাষ্ট্র জাপানের সহিত ইংলণ্ডের স্বার্থসংঘাত অনিবার্য এবং একদিন তিনি সেই সুযোগ স্বীয় পরিকল্পনামত মুক্তি সংগ্রাম গঠন করতে পারবেন। রাসবিহারী বসুর এই সিদ্ধান্ত তাঁর গভীর আন্তর্জাতিক রাজনীতি জ্ঞান ও দূরদর্শিতার পরিচয় দেয়।

সেদিনের সেই সিদ্ধান্ত যে নির্ভুল ছিল পরবর্তী ইতিহাস তার প্রমাণ। নেতাজী পরিচালিত আজাদ হিন্দ ফৌজের মুক্তি সংগ্রামকে যদি আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধের চূড়ান্ত অধ্যায়রূপে ধরা যায়, তা হলে স্বীকার করতে হয় যে, সেই ফৌজের নির্মাতা ছিলেন রাসবিহারী বসু।

১৯৪১ খৃঃ সুভাষচন্দ্রের দুঃসাহসিক গৃহত্যাগ ও পেশোয়ার কাবুল হয়ে বার্লিনে উপস্থিতি, জাপানের হাতে দঃ পূঃ এশিয়ার ব্রিটেনের পরাজয় এবং ১৯৪২ সালে সিঙ্গাপুরের পতন, রাসবিহারী বসু কর্তৃক দঃ পূঃ এশিয়ার মুক্তি সংগ্রাম সংগঠন এবং গান্ধীজীর 'ইংরাজ ভারত ছাড়' সংগ্রামী ঘোষণা মনে হয় যেন কোন অদৃশ্য সূত্রে বাঁধা ছিল। এ সম্পর্কে পণ্ডীচেরী আশ্রমের শ্রীমার একটি বাণী তাৎপর্যপূর্ণ। শ্রীঅরবিন্দের দিব্য উপলব্ধি ব্যাখ্যা করে শ্রীমা বললেন—"History is not a teaching, not even a revelation, it is a decisive action direct from the Supreme."

বিপ্লবী নায়ক রাসবিহারী বসুর স্বদেশ সেবা মুক্তি আন্দোলনের বিস্ফোরণ যুগ থেকে চূড়ান্ত সংগ্রামকাল অবধি বিস্তৃত ছিল। তাঁর জীবনের সমস্যা, সঙ্কট ও দুঃখ ছিল তাঁর একান্ত আপনার। বাইরের লোক এমনকি তাঁর সহকর্মীরাও তার খুব সামান্যই জানতেন। স্বচ্ছ দূরদৃষ্টি ছিল তাঁর চালক সহজাত প্রকৃতি চিত্র প্রশান্তির উৎস, অসাধারণ প্রত্যুৎপন্নমতি তাঁর পরিরক্ষক এবং সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের শক্তি দিয়েছিল তাঁকে বৃহত্তম বিপ্লবীদল অনুশীলনের নেতৃত্বে।

বিপ্লব সংগ্রাম ছিল গুপ্ত সংগঠন ভিত্তিক, কর্মিরা ছিলেন মন্ত্রগুপ্তির শপথনিষ্ঠ, কৌতূহল পরিপ্রশ্ন ও প্রচার প্রমুখ। সে কারণে অগ্নিযুগের অনেক ঘটনাই লোকচক্ষুর অন্তরালে রয়ে গেছে। একদিকে ছিল ব্রিটিশ সরকারের প্রখর দৃষ্টি গোয়েন্দা তৎপরতা এবং অমানুষিক নির্যাতন, অন্য দিকে ছিল জন সাধারণের নিশ্চেতনা। এই দুয়ের প্রতিকূল পরিবেশে বিপ্লবীদের দুঃসাধ্য কর্মসাধনে পথ করে চলতে হত।

সংসার বিরাগী সন্ন্যাস নেন আপন আধ্যাত্মিক মুক্তি কামনায়, বিপ্লবী ঘর ছাড়লেন দেশের মুক্তির উদ্দেশ্যে। তার জীবন ছিল উৎসর্গীকৃত। বিপদ-সংকুল আঁধার রাতে এক হাতে জীবন অন্যহাতে মৃত্যুকে নিয়ে পথচলা ছিল সত্যই বিস্ময়কর। বিপ্লবীদের পরম শত্রু কলিকাতার পুলিশ কমিশনার মিঃ টেগার্টকেও তা ই বলতে হয়েছে—"The greatest of revolutionaries. I have even met is the Bengal Brand. In sheer excellence of caracter they surpass their Counter parts in any other Country." রাসবিহারী ছিলেন সেই বিশ্ববরেণ্য বিপ্লবীদের মহানায়ক।

প্রখ্যাত ঐতিহাসিক ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার তাঁর Histoy of Freedon Movement গ্রন্থে লিখেছেন "Among the agencies at work towards the attainment of Indian Freedom, I have laid special stress on the Revolutionary movements in India and the formation of I. N. A. by Subhas Bose."

লক্ষ্য করার বিষয় এ দুয়ের মূলে ছিলেন রাসবিহারী বসু। 'পথের দাবির' সব্যসাচী যাঁর ঔপন্যাসিক রূপরেখা, বাস্তব সেই বনস্পতি তুল্য রাসবিহারীর স্বদেশ ভাবনা, সংগ্রাম কৌশল এবং বিপ্লব চিন্তা ছিল তাঁর নিজস্ব মৌলিক ধারণা প্রসূত। এদিক দিয়ে তিনি তাঁর সমকালীন বিপ্লবী নেতাদের

থেকে ছিলেন স্বতন্ত্র, তুলনাহীন।

জাপানে আশ্রয়গ্রহণ, জাপানী নাগরিকত্ব গ্রহণ এবং জাপানী মহিলা মহিয়সী শ্রীমতী তোসিকা সোমার সহিত বিবাহ ছিল রাসবিহারী বসুর বিপ্লব জীবনের মূল লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে যাবার অঙ্গবন্ধ মাত্র। বস্তুতঃ কি স্বদেশে কি প্রবাসে, জীবনের শেষদিন পর্যন্ত তিনি ভারতের মুক্তি সংগ্রামের চিন্তায় অভিনিবিষ্ট ছিলেন।

টোকিও শহরে কোকুহিকান মহাবিদ্যালয়ে রাসবিহারী শিক্ষকতা করতেন। তিনি জাপানী ভাষা ভালভাবে আয়ত্ত করেছিলেন। জাপানের বিভিন্ন অঞ্চলে মাঝে মাঝে বক্তৃতা দিতে বের হতেন, বলা বাহুল্য বক্তৃতার বিষয় বস্তু থাকত আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ভারতের স্বাধীনতার প্রয়োজন। ভারত থেকে যারা জাপানে যেত তাদের জন্য তিনি টোকিওর উপকণ্ঠে একটি আশ্রয়কেন্দ্র 'আজিয়া-গো' (Centre of Asia) স্থাপন করেছিলেন। 'নিচি-ইন-তোমোনোকাই' অর্থাৎ ভারত জাপান মৈত্রী সঙ্ঘের তিনি ছিলেন অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা।

জাপানীরা শ্রীবসুকে প্রগাঢ় শ্রদ্ধার চোখে দেখত এবং একজন মহান মুক্তি যোদ্ধার উপযুক্ত সম্মান দিত। ১৯৪২ খৃঃ তিনি যখন যুদ্ধ বন্দী ভারতীয় সৈন্যদের নিয়ে মুক্তি ফৌজ গঠনের প্রস্তাব দেন, জাপান সরকার সে প্রস্তাবে দ্বিধাহীন ভাবে সম্মতি জানায় এবং সর্বপ্রকার সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দেয়। একজন প্রবাসী নেতার পক্ষে এই সাফল্য সহজ নয়।

১৯৪২ খৃঃ ১৫ই জুন ব্যাঙ্ককে রাসবিহারী বসু ভারতীয় স্বাধীনতা লীগের যে ঐতিহাসিক সম্মেলনের অনুষ্ঠান করেন তা তাঁর জীবনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কীর্তি। শ্রীবসুর সভাপতিত্বে এই সম্মেলন চলে নয় দিন ধরে। সম্মেলনের উদ্বোধন করেন থাইল্যাণ্ডের সহকারী পররাষ্ট্র মন্ত্রী। বার্মা, মালয়, থাইল্যাণ্ড, ইন্দোচীন, ফিলিপাইন, জাপান, চীন, ইন্দোনেশিয়া হংকং ও আন্দামান থেকে প্রবাসী ভারতীয়দের প্রতিনিধিগণ সম্মেলনে যোগ দেন। সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন জাপান জার্মানী ও ইতালীর রাষ্ট্রদূতগণ। আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি সম্মত এমন স্বাধীনতা লাভের সম্মেলন ভারতে অথবা ভারতের বাইরে এর আগে কখনো অনুষ্ঠিত হয়নি।

এই সম্মেলনের প্রাণপুরুষ রাসবিহারী স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রশ্নে গৌরবময় নেতৃত্বের সম্মানকে অনায়াসে ত্যাগ করে—আজাদ হিন্দ ফৌজের সংগ্রাম পরিচালনার জন্যে জার্মানীতে অবস্থানরত নেতাজী সুভাষচন্দ্রকে পূর্ব এশিয়ায় আসবার আমন্ত্রণ জানান এবং এক বছর পরে সুভাষচন্দ্র পূর্ব এশিয়ায় এলে ১৯৪৩ খৃঃ ৪ঠা জুলাই সিঙ্গাপুরের বিশাল ক্যাথে হলে পূর্ব এশিয়াবাসী ভারতীয়দের সমাবেশে বিপুল উদ্দীপনার মধ্যে সানন্দে সুভাষচন্দ্রের হাতে সংগ্রামের নেতৃত্বভার তুলে দেন। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের দীর্ঘ ইতিহাসে স্বেচ্ছায় রাজনৈতিক ক্ষমতা হস্তান্তরের এ ধরনের দৃষ্টান্ত বিরল।

ব্যক্তিগত জীবনে রাসবিহারী বসু নানা শোক দুঃখ পেয়েছিলেন। শিশু বয়সে মাতৃহীন হয়েছিলেন, বিবাহের কিছুকাল পরে পত্নীকে এবং পৌঢ় বয়সে একমাত্র পুত্রকে হারিয়েছিলেন। তবে দুঃখ ভার অথবা অসুস্থতা তাঁর বৈপ্লবিক চিত্তবহ্নিকে কখনো ম্লান করতে পারেনি। রাসবিহারী ছিলেন ভারতীয়

আধ্যাত্মিক জ্ঞানের অধিকারী। তাঁর অন্তর্দৃষ্টি ছিল প্রশান্ত উদার ও অসাম্প্রদায়িক। ইংরাজী ও জাপানী ভাষায় লেখা তাঁর চিঠিপত্র, বক্তৃতা ও প্রবন্ধ পাঠ করলে বোঝা যায় বিপ্লবী মহানায়ক রাসবিহারী বসু ছিলেন গণতান্ত্রিক সমাজবাদী।

পরম দুর্ভাগ্য আমাদের যে স্বাধীনোত্তর ভারতে এই মহানায়ককে দেখার সুযোগ হল না। ১৯৪৫ খৃঃ ২১শে জানুয়ারী রাসবিহারী ঘুমিয়ে পড়লেন চিরনিদ্রায়। কণ্ঠে তখন তাঁর অস্ফুট বন্দেমাতরম মন্ত্র, হাতে তুলসী জপমালা। ঝঞ্ঝাময় জাগতিক সত্তা চিরশান্ত মহাসত্তায় অন্তর্লীন হল। মৃত্যুর পূর্বে জাপানের সম্রাট রাসবিহারী বসুকে জাপানের শ্রেষ্ঠ সম্মান 'মেরিট অব দি রাইজিং সান' উপাধিতে ভূষিত করেন।

রাসবিহারী বসুর মৃত্যু নেই, ভারতের মুক্তি সংগ্রামের ইতিহাসে তিনি চিরজীবী হয়ে থাকবেন।

(১০ম পাতার পর)

পরিবর্তে তাত্ত্বিক ধূম্রজাল সৃষ্টি করে বিদেশী ভাবধারায় তরুণদের মনকে বিভ্রান্ত করা হয় সে দেশের কল্যাণ কি করে হতে পারে। তার ফলে চতুর্দিক আজকে দেখি শুধু স্বার্থের সংঘাত। ব্যাপক জাতীয় কল্যাণের আদর্শ ম্লান ও ক্ষীণ। এই ঘন কালো অন্ধকারের মধ্যেও আমরা আশাকরি নতুনতর বলিষ্ঠ আদর্শের রূপায়ণ আসবে। কবির ছন্দে আবৃত্তি করি—

'প্রাণ দিয়ে তোর জ্বেলে আগুন
জ্বালা সকল ঘরে,
স্বার্থ, দ্বন্দ্ব, মৃত্যুভীতি
ছাই হয়ে যাক্ পুড়ে।'

শিক্ষার সম্প্রসারণে বামফ্রন্ট সরকার

১৯৭৭ সাল থেকে ১৯৮১ সাল পর্যন্ত শিক্ষাক্ষেত্রে কি অর্জন করা গেছে—

শিক্ষাক্ষেত্রে স্বাভাবিক পরিবেশ, সময়ে পরীক্ষার ফল প্রকাশ, শিক্ষক ও কর্মচারীদের নির্দিষ্ট সময়ে বেতন।

৩৪০০ বিদ্যালয়হীন গ্রামে প্রাথমিক বিদ্যালয়, ৪০০০ নূতন প্রাথমিক বিদ্যালয় গৃহ ৩১ লক্ষ শিশুর জন্য বিদ্যালয়ে খাদ্য, সমস্ত শিশুর জন্য সব ভাষায় বিনামূল্যে বই, খাতা, শ্লেট, মেয়েদের জন্য পোষাক, প্রাথমিক বিদ্যালয়ে খেলাধুলা, ২৩, ৮০০ নূতন প্রাথমিক শিক্ষক।

৯০০ নূতন মাধ্যমিক বিদ্যালয়, সকলের জন্য সরকারী অনুদান, ২৫০০ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের গৃহ নির্মাণ, মাধ্যমিক স্তরে বিনামূল্যে পাঠ্য বই, খেলাধুলা, বিজ্ঞানাগারের উন্নতি ১০,০০০ নূতন মাধ্যমিক প্রাথমিক স্তরে জীবনমুখী শিক্ষার পাঠক্রম, গণতান্ত্রিক প্রাথমিক শিক্ষা আইন, গণতান্ত্রিক মাধ্যমিক শিক্ষা আইন, গণতান্ত্রিক বিশ্ববিদ্যালয় আইন, গণতান্ত্রিক সাধারণ গ্রন্থাগার আইন, রাজ্য শিক্ষা গবেষণা ও শিক্ষণ পর্ষদ সংগঠন।

১৫৭৫টি নূতন গ্রামীণ গ্রন্থাগার যেখানে মোট গ্রন্থাগারের সংখ্যা ছিল ৭০১টি, গ্রন্থাগারগুলির জন্য সাহায্য ১০ গুণ বৃদ্ধি, বেসরকারী গ্রন্থাগারে সাহায্য, কোলকাতা নগর গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

RegdNo.R. N .24511/71 | Biplabi Bangla | RegJ. W B/NC 77
Phone : 34-1795
বার্ষিক :—সডাক ১৫.০০ টাকা | ষাণ্মাসিক :—৮.০০ টাকা | মূল্য—৩০ পয়সা

সম্পাদক—
শ্রীশান্তিপ্রিয় রায়চৌধুরী

॥ সম্পাদকমণ্ডলী ॥

শ্রীজগদীশ চট্টোপাধ্যায় (সভাপতি)

শ্রীঅবেশচন্দ্র নন্দী
পুষ্প চ্যাটার্জী
মলয় ঘোষ

প্রকাশক ও শ্রীঅনিল

দিল্লীর বিশেষ প্রতিনিধি—
শ্রীবারীন ঘোষ

বেহালা—
শ্রীনন্দগোপাল পাল

বিপ্লবী পুস্তকমালা

CALCUTTA

বেতাজীর সিক্রেটসার্ভিস – ডাঃ পবিত্রমোহন রায়—১০.০০
বিপ্লবী মহানায়ক রাসবিহারী—সুবোধ মজুমদার
অনুশীলন সমিতির বিপ্লবী প্রচেষ্টা—ব্রজেন্দ্র দাস

—ক্ষীরোদ কুমার দত্তের—

১। বাংলার অগ্নিযুগ—১.৫০, ২। ভারতীয় বিপ্লব প্রচেষ্টা—৮.০০
৩। অনুশীলন সমিতির পি, মিত্তির—২.০০, ৪। গৌহাটী সংগ্রাম কাহিনী—১.০০, ৫। কাকোরী ষড়যন্ত্র—১.২৫, ৬। কলকাতার সংগ্রাম কাহিনী—.৪০, ৭। রাসবিহারী ও অনুশীলন সমিতি—.৬০
৮। স্বাধীনতাসংগ্রামে মা ও মেয়ে—.৪০, ৯। বিবেকানন্দ ও সমাজবাদ—.৬০
১০ বিপ্লবী বিবেকানন্দ—.৫০, ১১। মহারাজ ও সুভাষচন্দ্র—.৪০
১২। ভারতের নবজাগরণ ও ভগিনী নিবেদিতা—.৭৫, ১৩। দেশ বাঘের তোপেনি (১)—১.০০, ১৪। দেশ বাঘের তোপেনি (২)—২.০০
১৫। শহীদ চন্দ্রশেখর আজাদ—.৫০, ১৬। ১৯শে এপ্রিল জাতীয় শহীদ দিবস—১.০০, ১৭। হাজির হত্যা প্রচেষ্টা—.৭৫, ১৮। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও অনুশীল সমিতি—৮.০০, ১৯। ভারতের জাতীয় [illegible]—.৪০, ২০। লাট হত্যা প্রচেষ্টা—১.৫০

প্রতিষ্ঠান :— ৪নং বঙ্কিম দাস ষ্ট্রীট কলিকাতা-৭০০০০৭

শৈলশ্রী—১/১/১/A বঙ্কিম চ্যাটার্জী ষ্ট্রীট কলিকাতা-৭৩

মূল কার্যালয়—৪নং বঙ্কিম দাস ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০০৭ শ্রীঅনিল সেনগুপ্ত কর্তৃক প্রকাশিত এবং তৎকর্তৃক প্রিন্টিং পাবলিসিটি, ১১৭, কেশবচন্দ্র সেন ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০০৯ হইতে মুদ্রিত।

বিপ্লবী বাংলা

॥ বিপ্লবী পরিষদের সাপ্তাহিক মুখপত্র ॥
স্থাপিত—১৯৫৬, 'বিপ্লবী বাঙ্গালী' নবকলেবরে—১৯৭১

দশম বর্ষ	শনিবার ১৬ই ফাল্গুন, ১৩৮৭ ২৮শে ফেব্রুয়ারী ১৯৮১	১৯ সংখ্যা

CALCUTTA UNIVERSITY CENTRAL LIBRARY

মহা বিদ্রোহী রণক্লান্ত—
আমি সেই দিন হব শান্ত।
যবে উৎপীড়িতের ক্রন্দন রোল—
আকাশে বাতাসে ধ্বনিবে না।
অত্যাচারীর খড়্গ কৃপাণ
ভীম রণভূমে রণিবে না॥

—নজরুল

সম্পাদকীয়

শিক্ষাক্ষেত্রে রাজনীতি

সম্প্রতি যে পরিবেশের দরুণ আনন্দমোহন কলেজের অধ্যক্ষা ডাঃ সাধনা সরকারের মৃত্যু ঘটেছে, তাকে স্বাভাবিক মৃত্যু বলে কোন নিরপেক্ষ ও হৃদয়বান মানুষ মনে করেন না। একে মৃত্যু না বলে, প্রকৃত পক্ষে হত্যা বলেই আখ্যা দেওয়া উচিৎ বলে বহু চিন্তাশীল মানুষ মনে করেন। সংবাদে প্রকাশ একদল ছাত্রী ও তাদের কয়েকজন অভিভাবক আজীবন শিক্ষাব্রতী ও শিক্ষা কার্যে নিজেকে যিনি সর্বতোভাবে নিয়োজিত করেছিলেন ডাঃ সরকারকে দীর্ঘ পাঁচঘণ্টা ঘেরাও করেছিলেন। ডাঃ সরকারকে এই ঘেরাও থাকার সময়ে তাঁর জলের পাত্র সরিয়ে রেখে, তাঁকে পানীয় জল গ্রহণ করার সুযোগ থেকেও বঞ্চিত করে রেখেছিলেন। মানসিক যন্ত্রণায় ডাঃ সরকার কাতর ও অসুস্থ হয়ে পড়েন। তার ফলেই তাঁকে অসুস্থ হয়ে পড়তে হয় ও শেষ পর্যন্ত তার জীবনাবসান ঘটে। সংবাদে প্রকাশ, এই অপকর্মের পেছনে মদত দিয়েছিলেন বাইরের মানব-দেহ-ধারণকারী কয়েকটি জন্তু ও বিশেষ একটি ছাত্র সংস্থার কয়েকজন সভ্য। ঘটনা সূত্রপাত হয়, কয়েকটি বিষয়ে ফেল করা ছাত্রীদের পাশ করিয়ে দেবার দাবীকে অধ্যক্ষা মহোদয়া গ্রহণ না করার জন্য। এমন হাস্যাস্পদ অসমর্থনযোগ্য দাবী সভ্য সমাজে কেউ পেশ করতে পারে, এটা বিশ্বাস করা খুবই শক্ত। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে তাই ঘটেছে। অবশ্য পশ্চিমবাংলার সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতি যেখানে এসে দাঁড়িয়েছে। এই ঘটনাটি তারই একটা নিকৃষ্ট নমুনা মাত্র। এখানে যেভাবে, সামান্য সামান্য কারণে হামেশাই খুন খারাপি চলছে, দাঙ্গাহাঙ্গামা বাধছে, মানবীয় মূল্যবোধকে বিসর্জন দিয়ে দানবীয় কার্যকলাপ চলছে বিনা বাধায়, সুপরিকল্পিত উপায়ে, দলগত প্রশ্রয়ে, এইসব ঘটনা তারই নয়-দোসর মাত্র। ভারতবর্ষের গুরু-শিষ্যের সম্বন্ধ অত্যন্ত মধুর ও ঐতিহ্যপূর্ণ ছিল, যার নমুনা এই সেদিনও দেখা গেল নোবেল পুরস্কার বিজয়ী ছাত্রের পূর্বতন শিক্ষকের চরণ-বন্দনার মাধ্যমে। সেখানে এই প্রকার দুরপনেয় কলঙ্কজনক ঘটনা কেন ঘটছে, তার মৌল কারণ খুঁজে বের করার দায়িত্ব সকলের এবং এই ধিক্কার জনক পরিস্থিতির পুনরাবৃত্তি ঘটতে না পারে এটাও নিশ্চিত করার দায়িত্ব সভ্য সমাজের প্রত্যেক মানুষের। এ কর্তব্য অবশ্য পালনীয় রাষ্ট্রনায়কদের।

কিন্তু অত্যন্ত ক্ষোভের কথা, পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী এ সম্বন্ধে যে সব মতামত প্রকাশ করেছেন, তার ফলে দোষীদের অনুতপ্ত হবার সম্ভাবনার চেয়ে, উৎসাহ বোধ করার প্রবণতা বেশী হবে বলে আশঙ্কা হয়। পশ্চিমবাংলার বিধানসভায় যখন বিরোধী পক্ষের সদস্যরা এ ব্যাপারটা বিধান সভায় উত্থাপন করেন। এই ঘটনার নিন্দা করেন ও প্রকাশ্য তদন্ত দাবী করেন, তখন প্রশাসনের পরিচালনের অন্যতম জনৈক অধ্যাপক

নামে (খ্যাত কি অখ্যাত বলা শক্ত) পরিচিত একজন এর মধ্যে রাজনীতি টেনে না আনার উপদেশ বর্ষণ করলেন। তিনি কিন্তু দলমত নির্বিশেষে দোষীদের শাস্তি বিধানের দাবি করেন নি। মুখ্যমন্ত্রীর বিবৃতিতে তার দলের ছাত্র শাখার সদস্যদের বেকসুরে খালাস দেবার জন্য যতটা জোরালো ভাষা ছিল, দোষীদের শাস্তি প্রদানের কোন প্রতিশ্রুতি তার মধ্যে খুঁজে পাওয়া যায়নি। তার স্বভাববিরুদ্ধ মৃদুভাষায় বললেন যে ঘেরাও পছন্দ করেন না। আরো বললেন যে এটা মার্ডার কেস এর পর্য্যায়ে ফেলা যায় না। মুখ্যমন্ত্রী নিজে একজন আইনজ্ঞ। অবশ্য আইনের জ্ঞানের পরিচয় দুর্ভাগ্যক্রমে দেশের মানুষ জানতে পারেনি। কারণ ব্যারিষ্টার হবার পর তিনি আইনের অঙ্গনে প্রবেশ করার চাইতে রাজনীতির ক্ষেত্রটাই বেছে নিয়েছেন। তবে আইনের জ্ঞানটাত আর মুছে যায়নি। হত্যা এবং হত্যার সহায়তা করার জন্য ছোট আইনই বর্তমান আছে বলে অজ্ঞ লোকেরা মনে করে। আনন্দমোহন কলেজের ছাত্রীদের যে দলটি অধ্যক্ষা মহোদয়ার মৃত্যুকে ত্বরান্বিত করল, তারা ত হত্যার সহায়ক হিসাবে নিশ্চয়ই দণ্ডার্হ।

কিন্তু সে পথে যাবার তার বাধা আছে এবং সেটা রাজনৈতিক বলেই মানুষ মনে করে। তদন্ত না করে, কোন বিশেষ ছাত্র সংস্থাটি এই হত্যার সমতুল্য কাজের পিছনে ছিল না, তিনি বললেন কি করে? যাদের নামে অভিযোগ, তারা মুখ্যমন্ত্রী যে রাজনৈতিক দলভুক্ত, তাদেরই অঙ্গ। কাজেই তার মতামত কি নিরপেক্ষ বলে মনে না করলে ভুল হবে? তা ভিন্ন, তিনি যখন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর আসন দখল করে আছেন, যেন তার নিজ দলের স্বার্থ ছাড়া, দেশের সমস্ত মানুষের ন্যায্য দাবী ও অধিকার রক্ষা করতে, তিনি সাংবিধানিক কারণে বাধ্য। তা ভিন্ন, অন্য একটি বক্তৃতার মাধ্যমে যে বক্তব্য রেখেছেন, সেটা রীতিমত রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গীর অবিসংবাদিত প্রকাশ। অল ইণ্ডিয়া ফেডারেশন অব এডুকেশনাল অ্যাসোসিয়েশানের প্রতিনিধিদের সঙ্গে দেখা করার সময় প্রধানমন্ত্রী অধ্যক্ষা সাধনা সরকারের মৃত্যুর কাহিনী শুনে মর্মাহত হয়েছেন বলে সংবাদে প্রকাশ। এই সংস্থার জাতীয় সম্মেলনে দশটি রাজ্যের ৫০ জন উপস্থিত প্রতিনিধি শ্রীমতী সরকারকে ঘেরাও করে রাখার ঘটনার বিচার বিভাগীয় তদন্ত দাবী করেছেন। দেশশুদ্ধ লোক নিছক রাজনীতি করছে এমন একটি মর্মন্তুদ ঘটনায়. আর সাধু শুধু আজ পশ্চিমবাংলার মুখ্যমন্ত্রী এই কি মেনে নিতে হবে? আর না নিলেই ষড়যন্ত্রকারী বলে কুখ্যাত হতে হবে এবং কাডারদের হাতে জীবন বিসর্জন দিতে হবে?

প্রধানমন্ত্রীর অন্য একটি মন্তব্যে এখানকার মুখ্যমন্ত্রী ক্ষুব্ধ হয়েছেন মনে হয়। প্রধানমন্ত্রী বলেছেন যে সি, পি, আই (এম) শিক্ষাক্ষেত্রে রাজনীতির অনুপ্রবেশ ঘটিয়েছে। অধ্যক্ষ সমিতি প্রধানমন্ত্রীর নিকট এ বিষয়ে একটি তথ্যপূর্ণ জোরালো বক্তব্য রেখেছেন। তারা তদন্তের দাবী করে বলেছেন যে তদন্ত করলে তাদের বক্তব্যের সমর্থনে আরো অনেক ঘটনার প্রকাশ ঘটবে। এ প্রদেশের মানুষও জানে যে সংগঠিত কমিটিগুলি ভেঙ্গে দিয়ে দীর্ঘ প্রায় চার বছরের মধ্যে কোথাও নির্বাচন হয় নি। সংস্থাগুলির দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে দলীয় লোকদের উপর, তার মধ্যে আছেন এমন লোক শিক্ষাক্ষেত্রে যাদের মত-হস্তী বলা চলে। অনেক স্থলে রাজনৈতিক কারণে, ডজন প্রধান শিক্ষক, একই পদে একাধিক শিক্ষক নিয়োগ করা হয়েছে।

নির্বাচন করা হয়নি রাজনৈতিক কারণে এ সত্য অস্বীকার করবে কে ? হরিড়া রামকৃষ্ণ মিশনের কলেজটিকে আজো ঘেরাও করে রাখা হয়েছে। কাজটি সম্পূর্ণ বে-আইনী বলে রাজ্যের এ্যাডভোকেট জেনারেল শ্রীআচার্য মত প্রকাশ করলেও, সরকার নীরব, উদাসীন ও শিক্ষা-সংহারকারী ভূমিকা পালন করছেন। কোন কোন কলেজে স্কুলে আদালতের বিচারে কার্যভার গ্রহণ করার অধিকারী বলে রায় দিলে, স্থানীয় কাউরা তাকে কলেজে ঢুকতে দেয়নি। স্বগোত্র বলে সরকার অন্ধ ও বধিরের ভূমিকা পালন করছেন কেন, এটা সাধারণ বুদ্ধির অগম্য। কোন নিরপেক্ষ তদন্ত হতে দেব না, অথচ কেউ রাজনীতির অনুপ্রবেশ ঘটাবার অভিযোগ করলে, গাত্রদাহ সৃষ্টি হবে, তার ওষুধ কি হবে, সেটা জানা নেই। বর্তমান ঘটনা সম্বন্ধে কেউ মন্তব্য করলে, তার মধ্যে আগামী সালের নির্বাচন কোন সম্ভাবনাময় ইঙ্গিত খুঁজে বের করার চেষ্টা করলে, বুদ্ধির খুব তারিফ করা যায় কি ? বেলঘরিয়া রেল স্টেশনের ঘটনার মধ্যে শ্রীমতী গান্ধীর ষড়যন্ত্রের অস্তিত্ব খুঁজে বের করে সেদিন যে বিধায়ক বিধানসভায় বিবৃতি দিয়েছিলেন, তাকে ডক্টরেট উপাধি দেওয়া যায় কিনা, সেটা বঙ্গবন্ধ বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ভেবে দেখতে পারেন। কিন্তু কোন ভদ্র মার্জিতরুচি, জ্ঞানী ও বিদগ্ধজনের সমর্থন পাওয়া যাবে না, এটা নিশ্চিত ভাবেই বলা যায়। দেশের বিদগ্ধজনদের অন্যায় অপবাদ দিয়ে হেয় করার প্রচেষ্টাকে চরম মূর্খতার পরিচয় হবে। যুক্তি তর্কের ধার কোন মূল্য না দিয়ে গায়ের জোরে কোন অপকর্মকে দলীয় রাজনৈতিক দৃষ্টি দিয়ে জনসাধারণের বিচার বুদ্ধিকে আচ্ছন্ন করার চেষ্টা করলে, পরিণাম ভয়ঙ্কর হতে বাধ্য। একবার উচ্ছৃঙ্খলতার আগুন জ্বললে, সেই আগুনে সকলেরই পুড়ে মরতে হবে এটাও অবধারিত।

শেষ কথাটা হল, শিক্ষা ব্যবস্থার সুস্থ ও স্বচ্ছন্দগতি অব্যাহত রাখতে কেন্দ্রীয় সরকার সংবিধান অনুসারে বাধ্য। অধ্যক্ষদের প্রতিবেদনে একথা স্পষ্টভাবেই বলা হয়েছে। নির্বাচনে ফায়দা তোলার দুরাশায় সব দোষ কেন্দ্রের উপর চাপিয়ে দেবার অপকৌশল বিপৎকালে খুব সহায়ক হবেনা, এটাই চিন্তাশীল মানুষেরা মনে করেন। প্রশাসক দল সময়ে অবহিত হবেন, এ আশা কি দুরাশায় পরিণত হবে ?

———

PRESS NOTE

1. Freedom Fighters' Pension Scheme was introduced by the Government of Iudia with effect from 15. 8. 72. The last date for receiving application under the Scheme expired on 31, 3. 74. Conditions of eligibility, among others were 6 months imprisonment, gross annual income not exceeding Rs. 4, 999/ - and the claim of absconsion/internment/externment should be supported by evidenee based on official records.

2. Government of India have liberalised the said Scheme with effect from 1. 8. 80 and renamed it as "Swatantrata Sainik Samman Pension Scheme." It has since been modified to the effect that :—

i) Annual income ceiling of Rs. 5,000/- for eligibility to pension be removed '

ii) Scheduled Caste/Scheduled Tribe and Woman Freedom Fighters who themselves have uudergone actual imprisonment for 3 months would be eligible to this pension, and ;

iii) In case of absconsion/internment/externment claim, certificates from personal knowledge from prominent freedom fighters who had themselves undergone actual imprisonment for more than 5 years would be accepted.

3. Persons belonging to the categories mentioned at para' 2 (i) (ii), (iii) above who could not / did not apply earlier are only eligible to apply anew upto 31. 7. 81 in the prescribed form.

4. For the persons living in the districts the prescribed form will be available free of cost in the offices of District Magistrates and Offices of Block Development Officers. For the persons living in the Calcutta Corporation area the forms will be available from the Finance (P. S. P) Deptt., Writers' Buildings, Cal.-1 from 12-00 noon to 2-00 P. M. and 3-00 P M. to 4 P. M. Certificates of imprisonment would also be available to these new categories of freedom fighters from the respective Jail authorities on application.

আর একটি হেঁয়ালী

—শ্রীশিবনাথ ব্যানার্জী

৬ই ডিসেম্বর তারিখের বিপ্লবী বাংলায় শ্রীসতীভূষণ সেনের লেখা 'একটি হেঁয়ালি' পড়িলাম তাতে আমারও আর একটী হেঁয়ালির কথা মনে পড়ল। তিনি লিখেছেন "অস্ত্রাগার অধিকারের পর জয় যখন হাতের মুঠোয়, তখন সোজা পথ ছেড়ে বনের পথে নিয়ে গেলেন সকলকে। তা যদি না হত, প্লান অনুযায়ী যদি সহর অধিকার করতেন? ইত্যাদি।

কে বা কাঁহারা সোজা পথ ছেড়ে বনের পথে সকলকে নিয়ে গেলেন? অনন্ত সিং? তাতে কি সর্ব্বাধিনায়ক মাষ্টারদা সূর্য্য সেনের মত নেওয়া হয়েছিল? সহর অধিকার করিবার কি প্লান ছিল? এ প্রশ্নের পরিষ্কার জবাব শ্রীগণেশ ঘোষ বা অন্য কারোর কাছে পাইনি তাই এই প্রশ্ন শ্রীসতীভূষণ সেনের নিকট রাখছি। আশাকরি 'বিপ্লবী বাংলা' মারফৎ জবাব পাব। কারণ এ প্রশ্ন আমার একার নয় ঐটা ঐতিহাসিক প্রশ্ন।

অস্ত্রাগার অধিকারের কাজ খুবই সুশৃঙ্খলার সাথে অমিত বিক্রমে হয়েছিল—কিন্তু অস্ত্রাগার অধিকারের পর সেখানেই তাঁহারা কেন থাকিলেন না বা কিছু লোক সেখানে রাখিয়া বাকী সকলে সহর অধিকার করিতে গেলেন না ওখানকার ৫০০ ইংরাজদের সেপাইরা পলায়ন করিয়াছিল? তারপর প্রশ্ন প্রায় ৫০০ রাইফেল হস্তগত হবার পর সেগুলি লুণ্ঠন না করিয়া ভাঙ্গিয়া বা পেট্রল জ্বালাইয়া নষ্ট করিলেন কেন? ঐ রাইফেলগুলি চট্টগ্রামের বিপ্লবী যুবকদের মধ্যে বিতরণ করিলেন না কেন? মাজিষ্ট্রেটের বাড়ী দখল করিলেন না কেন? ইংরেজ যা ওখানে ছিল সর্ব্বত্র ত পলাইয়া ষ্টীমারে আশ্রয় লইয়াছিল। সহর অধিকার করিবার বা সহরের কর্তৃত্ব বিপ্লবীদের নিজেদের হাতে লইবার কোন বাধাই ছিল না! সে প্লান কি আগে থেকে প্রস্তুত ছিল? হয়ত ছিল না কিন্তু সম্পূর্ণ সফলতার সাথে অস্ত্রাগার অধিকার করিবার পরও কি সহর অধিকার করিবার ও বিপ্লবী সরকার গঠন ও পরিচালনা করিবার কোন প্লান কখনও হয়েছিল - যদি হত তবে সোজা পথ ছেড়ে বনের পথে গেলেন কেন? কি যে হত সে আলোচনা নিষ্ফল বলেছেন সতীবাবু। আমি তা মনে করিনা। অপর পরিপ্রেক্ষাতে অনুরূপ অবস্থা এদেশে অন্য কোথাও হতে পারে। বিপ্লবীদের এ বিষয় চিন্তা ভাবনা দরকার।

১৮৭১ সালে প্যারিস কমিউন হয়েছিল। প্যারিস সহরের অধিকার হাতে পেয়ে তাঁরা তাদের মনোমত সরকার গঠন করেছিলেন এবং ৭২ দিন বিশেষ কৃতিত্বের সাথে কমিউন সরকার চালিয়ে ছিলেন। তারপর বহু রক্ত ও প্রাণ বলি দিয়েও কমিউন রক্ষা হয় নি। হয়ত চট্টগ্রামে নিজেদের সরকার চালাইলেও পরে হয়ত আরো বেশী বলি হত সাক্ষাৎ সংগ্রাম হত জনগণের সক্রিয় সহায়তা পেলে একমাস বা দুই মাস সাক্ষাৎ জনযুদ্ধ করতে পারতেন সেরূপ কি কোন প্লান কখনও করা হয়েছিল? অস্ত্রাগার অধিকারের আগে বা পরে

(এর পর ১৯ পাতায় দেখুন)

মিথ্যার বেসাতি চালাকি অসহনীয় আজ

বংশীধর বন্দ্যোপাধ্যায়

●

কৃষি পণ্য উৎপাদনে ভারত উল্লেখযোগ্য উন্নতি করেছে বর্তমানে, ফলে বিদেশে চাল ও গম রপ্তানী করতে ভারত সক্ষম এখন। পঁয়ষট্টি কোটি ভারত-বাসীর জন্য গড়ে প্রতিদিন প্রত্যেক মানুষের জন্য পাঁচশত গ্রাম খাদ্যশস্য (চাল-গম) বরাদ্দ করেও ভারত প্রায় দশ থেকে পনের লক্ষ টন উদ্বৃত্ত রাখার মত খাদ্যশস্য বছরে উৎপন্ন করে : ভারত সরকারের পরিসংখ্যান বিভাগের সঠিক হিসাব মত। ভারতে এবার খাদ্য উৎপাদন হবে প্রায় তের কোটি টনেরও কিছু বেশী অর্থাৎ প্রত্যহ পঁয়ষট্টি কোটি মানুষ যদি প্রত্যেকে পাঁচশো গ্রাম খাদ্যশস্য খায়, তাহলেও প্রায় দশলক্ষ টনের বহু বেশী খাদ্যশস্য উদ্বৃত্ত থাকবে এ বছরে। এই উৎপাদন সন্তোষ-জনক মনে হলেও গ্রামীন অর্থনীতি কিন্তু এর ফলে বিশেষ চাঙ্গা হয়নি। তার মূল কারণ এই যে, গ্রামে গ্রামে কুটির-শিল্পের ও ক্ষুদ্র-শিল্পের তেমন প্রসার ঘটান এখনো সম্ভব হয়নি নানাকারণে। গ্রামীণ কৃষি ও শিল্প যতক্ষণ না একযোগে উন্নীত হয়, ততক্ষণ গ্রামীণ অর্থনীতি সুদৃঢ় হতে পারে না ; কারণ কৃষি ও শিল্প পরস্পরের ওপর নির্ভরশীল, আর তাছাড়া কৃষি-শ্রমিকরা কৃষি কাজের অবসর কালে যদি কুটির বা ক্ষুদ্রশিল্পে নিজেদের নিয়োজিত করার সুযোগ না পায়, তবে তারা অলস হয়ে বসে থেকে গ্রামীণ অর্থনীতির বুনিয়াদকে দুর্বল করে দেয় এবং নিজেরাও দারিদ্র্যের দ্বারে বসে হা-হুতাশ করে, বেকারীর দারুণ জ্বালায়।

কর্ম-সংস্থানের মাধ্যমে ছাড়া বসিয়ে বসিয়ে বেকার ভাতা দিলে মানুষ অলস ও হতোদ্যম হয়ে পরবাধ হবে যা মোটেই শুভ নয়। যদি কোন সরকার কাজের ব্যবস্থা করে দিতে অক্ষম হয়ে সুস্থ সবল ও কর্মক্ষম মানুষকে বেকার ভাতা দেয় বা দিতে বাধ্য হয়, তবে বুঝতে হবে যে, সেই সরকার অপদার্থ। যে রাজনৈতিক দল সেই সরকার চালায়, সে রাজনৈতিক দলও দৈন্যের রাজনীতিতে ভোগে, সুস্থ চিন্তা ও মানবিক চেতনা তার লোপ পায় শীঘ্রই সারা ভারতের কৃষি সম্পদের শ্রীবৃদ্ধি গত পনের বছরের মধ্যে এমন একটা স্তরে এসে দাঁড়িয়ে হয়ে দাঁড়িয়েছে যে, যে কোন সরকারকেই এদেশে আজ 'খাদ্যের বদলে কর্মপ্রকল্প' চালু করতেই হবে, পূর্বোল্লিখিত উদ্বৃত্ত খাদ্যশস্যের সুষ্ঠু বিলি ব্যবস্থা করার জন্য, নচেৎ খাদ্যশস্য গুদামে পড়ে থেকে হয় অখাদ্যে পরিণত হবে, আর না হয় পোকামাকড়ের বা ইঁদুরের পেটে যাবে, বা বাঞ্ছনীয় নয় কোন মতেই। 'কাজের বদলে খাদ্য' কেন্দ্রীয় সরকার চালু করেছে ঠিক সেই কারণেই।

তাঁরা এর ভিতর কোন রাজনীতি আমদানি করেননি। কিন্তু বামফ্রন্ট সরকার কেন্দ্রের কাছে পাওয়া বিনামূল্যের ঐ চাল গম পশ্চিমবাংলার গ্রামে

গ্রামে বিলি করছে তাদের রাজনৈতিক মুনাফা অর্জনের আশায়, মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে ও নানাধরণের কারসাজির মাধ্যমে। গ্রামীণ শান্ত ও সরল মানুষের মনে তারা এই ধারণাই দলীয় প্রচারের মাধ্যমে বদ্ধমূল করে দিতে সদা সচেষ্ট যে, বামফ্রন্ট দরিদ্র দেশবাসীর দুঃখে কাতর হয়ে সরকারী অর্থে তাদের বিনামূল্যে চাল গম দিচ্ছে সামান্য কিছু কাজের বিনিময়ে। বামফ্রন্টের এই ধাপ্পাবাজী গ্রামীণ মানুষ বোধহয় আজো ধরতে পারেনি। বামফ্রন্ট অপরের ধনে পোদ্দারী করছে, আর লোকে ভাবছে যে, কি সদয় সরকার, আহামরি। বামফ্রন্টের ঐ মিথ্যার স্বরূপ হালে বিভিন্ন গ্রামে প্রকাশ হয়ে পড়ছে সি পি এম দলের দলবাজী ও তীব্র অত্যাচারের ফলে। কতদিন আর মিথ্যাকে সত্য বলে চালান বাস্তবে সম্ভব? লোকে সি, পি, এম দলের কারসাজি, বোমাবাজী ও মিথ্যা প্রচারের জ্বালায় জর্জরিত ও চরম বিরক্ত বর্তমানে, গ্রামবাংলার ঘরে ঘরে গ্রামবাংলায় নিত্য ডাকাতি, খুন, রাহাজানি ও নারীর ওপর নির্যাতন প্রভৃতি এমন অতিরিক্ত মাত্রায় সংঘটিত হচ্ছে যে, গ্রামীণ মানুষ নিজ নিজ পৈত্রিক ভিটামাটি ছেড়ে অন্যত্র পালাতে বাধ্য হচ্ছে বিগত প্রায় বৎসরাধিকাল ধরে।

বর্তমানে গ্রামে বাস করা প্রায় একটা অসম্ভব ব্যাপারে পরিণত হয়েছে, সি পি এম দলের দুর্বৃত্তদের অমানুষিক ও পৈশাচিক অত্যাচারের ফলে। পঞ্চায়েতের ভূমিকা রক্ষকের বদলে ভক্ষক হয়ে দাঁড়িয়েছে গ্রামবাংলায়, বিশেষ করে বীরভূম, মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, বর্ধমান ও চব্বিশ পরগণা জিলার বিভিন্ন অংশে। সরকার সব খবর জেনেও নীরব যে কেন,—সেটাই বোঝা দুঃসাধ্য ব্যাপার। গ্রামবাংলার মানুষের জীবনের যে কোন মূল্যই নেই। গ্রামে-গঞ্জে হাটে-বাজারে খুন নিত্য নৈমিত্তিক ঘটনায় পর্যবসিত বর্তমানকালে যা উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হয়েই চলেছে। এর শেষ যে কোথায় ও কবে হবে তা অনুমান করাও আজ কঠিন কর্ম। চাল গম দেশে বেশী ফলন হলেও যদি গ্রামে প্রতিনিয়ত উক্ত অশান্তি দিন দিন বাড়তেই থাকে, তবে মানুষ দাঁড়াবে কোথায়, কার কাছে? সরকার সব দেখে শুনেও যদি কাঠের পুতুল সেজে অনড় ও নিস্পন্দ হয়ে বসে থাকে, তবে দেশবাসী কি গর্জে ওঠে সে সরকারের পতন চাইবে না? গ্রামীণ মানুষ সঙ্ঘের শেষ সীমায় দাঁড়িয়ে এই সরকারের বিরুদ্ধে যদি সমবেত প্রচেষ্টায় সংগঠিত শক্তি নিয়ে বিদ্রোহ ঘোষণা করে কেবলমাত্র মানুষের মত বাঁচার একান্ত প্রয়োজনে, তবে কি তা অনুচিত হবে সরকার এখনো সজাগ হোন, গ্রামবাংলার কঠোর ভাবে নির্যাতিত প্রতিটি মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে অন্যায় অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিকারের মানসিকতা গড়ে তুলুন, তবেই তো দেশবাসী সরকারের ওপর যে বিশ্বাস হারিয়েছে তা ফিরে পাবে ও সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা করবে। অন্যথায় এ সরকারের বিপদ অবশ্যম্ভাবীরূপে দ্রুত এগিয়ে আসবে, যা ঠেকান সত্যই কঠিন হবে ভবিষ্যতে।

যে কোনও উন্নত গণতান্ত্রিক দেশে বিভিন্ন দলের রাজনৈতিক নেতারা নির্বাচনের পূর্বেই বিভিন্ন দল কি কি জন কল্যাণমূলক কাজ করবে বা করতে বদ্ধ পরিকর তা জনগণের সামনে তুলে ধরে ও নির্বাচক মণ্ডলীকে প্রতিশ্রুতি দেয় সেই মর্মে। জনগণ সেই প্রতিশ্রুতির ভিত্তিতেই কাদের অর্থাৎ কোন দলকে নির্বাচিত করবে তা ঠিক করে। সেই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী নির্বাচিত দল সরকার দখলে সমর্থ হয়।

পশ্চিমবাংলার অধিক সংখ্যক মানুষ সি. পি. এম দলকে ভোট দিয়েছিল গত নির্বাচনে এবং তার ফলেই তারা সরকার দখলে সমর্থ হয়। কিন্তু নির্বাচক মণ্ডলী কি সেদিন স্বপ্নেও ভেবেছিল যে, তাদের দ্বারা নির্ব্বাচিত সি. পি. এম প্রতিনিধিরা বর্তমানে যে সব জঘন্য অন্যায়, অবিচার ও অত্যাচারের মহড়া চলছে গ্রামবাংলায়, তার প্রতিরোধ ও প্রতিকারে নিস্পৃহ হয়ে মজা দেখবে শুধুই। এই মারাত্মক দুঃসহ অবস্থার কথা সেদিন কল্পনাও করেনি কোন নির্বাচক। সি, পি এম দলের আসল চেহারা যে এত-বিশ্রী, নোংরা ও স্বার্থপর তা কেউ ই সেদিন ভাবতে পারেনি।

জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই সি, পি, এম দলের হীন ও অসভ্য রাজনীতির শীকার হচ্ছে আজ মানুষ কিন্তু এর প্রতিফল বড়ই তিক্ত হবে পরিণামে। বেকার ভাতা যারা পাচ্ছে তারাও কি খুশী ? না তা কখনই নয়, কারণ ঐ সামান্য অর্থে মানুষের জীবন যাপন বর্তমান দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির আকাশ ছোঁয়া অবস্থায় সত্যই অসম্ভব। লোকে নির্বিরোধ ও নিশ্চিন্ত জীবন যাপনের পথ খুঁজতে চায়। বেকার ভাতা সে পথে কাঁটা দেয়, তাই মানুষ বেকার ভাতায় সন্তুষ্ট নয়।

তারা চায় কোন স্থায়ী চাকুরী বা স্থায়ী জীবিকা উপার্জনের পথ। বেকার ভাতা সে পথ নয়, বরং তার হন্তারক সবদিক দিয়েই। সরকারের প্রাথমিক কর্তব্য জনগণের জন্য কর্মসংস্থানের নূতন নূতন ব্যবস্থা গ্রহণও তার যোগ্য উপায় অন্বেষণ। সম্ভাব্য ক্ষেত্রে কৃষি ও শিল্প বাণিজ্যের যথোপযুক্ত প্রসার সাধন করতে হবে সরকারকেই। কোন দেশের গণতান্ত্রিক সরকার সেই প্রাথমিক ও সর্বপ্রধান দায় ও দায়িত্ব এড়িয়ে গিয়ে কেবলমাত্র বেকার ভাতা মঞ্জুর করেই নিশ্চিন্ত থাকতে পারে না এবং তা যে সরকার করে ও সেই বেকার ভাতা দিতে না পারায় ঢাক ঢোল পিটিয়ে নিজেরাই নিজেদের অযোগ্যতা জনগণকে প্রচার মাধ্যমে শুনায় ও তাতেই মহানন্দে নৃত্য করে, সে সরকার জনগণের বাস্তব ক্ষতি সাধন করে এক দিকে, আর অপরদিকে দেশের জাতীয় অর্থনীতিকে পর্যায়ক্রমে ধীরে দুর্বল থেকে দুর্বলতর করে এবং পরিশেষে সমগ্র দেশকে ধ্বংসের পথে নিয়ে যায় নিজেদের ভুল আত্মসন্তুষ্টি ও আহাম্মকির জন্য, যার কোন ক্ষমা নেই।

যে সরকার জেনে শুনে এভাবে দেশের সীমাহীন বিপদকে ডেকে আনে নিজেদের মনকে বৃথা স্তোক দিয়ে ভুলিয়ে রাখার জন্য সে সরকার স্থায়ী হয় না। অচিরকাল মধ্যে দেশের মানুষ সে সরকারকে উৎখাত করে নির্বাচনের মাধ্যমে। কাজেই সি, পি, এম দল নিজেদের যতই বুদ্ধিমান ও কর্মপটু এবং মিথ্যা প্রচার সিদ্ধহস্ত ভাবুক না কেন, দেশ ঐ দলকে ছুঁড়ে ফেলে দেবে সামনের নির্বাচনে, কারণ ঐ দলের কার্যকলাপে সারা পশ্চিমবাংলার সাধারণ মানুষ, জ্ঞানী গুণীরা ও খ্যাতিমান শিল্পী-সাহিত্যিকগণ বীতশ্রদ্ধ।

তাঁরা সম্মিলিত শক্তিকে সংহত করে সি, পি, এম দলের বিরুদ্ধে চারিদিকে সক্রীয় আন্দোলনে হালে রাস্তায় নেমেছেন বামফ্রন্ট সরকারকে উচিত শিক্ষা দেবার ও তাকে গদীচ্যুত করার আশু প্রয়োজনে। বাংলার বর্তমানকালের সর্বশ্রেষ্ঠ শিক্ষাবিদ সাহিত্যিক, সাংবাদিক ও পাণ্ডিত্যের ক্ষেত্রে লব্ধপ্রতিষ্ঠ মহান ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন মহা মহা রথীবৃন্দ বামফ্রন্টের উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ও জনস্বার্থবিরোধী মারাত্মক

নীতিগুলির বিরুদ্ধে যেভাবে ও ভাষায় দিনের পর দিন নির্দিষ্ট কর্মসূচী নিয়ে সক্রীয় পন্থায় কাজে নেমেছেন, তাতে এটা বেশ পরিষ্কার যে বামফ্রন্টের বিদায়ের ক্ষণ ঘনিয়ে এসেছে।

মুখ্যমন্ত্রী যে ভাষায় ও ভাবে তাঁদের সমালোচনার প্রত্যুত্তর দিয়ে চলেছেন তাতে বাংলার শিক্ষিত জন মানস খুবই বিক্ষুব্ধ। সরকার কৃত ভুল বা অন্যায়ের প্রতিকার যদি সরকার নিজেই করে, তবে জনগণ সে সরকারের সাহায্যে এগিয়ে আসে, আর যে সরকার ইচ্ছাকৃত ভাবে জিদের বশবর্ত্তী হয়ে ভুলের পর ভুলই করে চলে বুক ফুলিয়ে, সে সরকারের পতন অবশ্যম্ভাবী, কারণ দেশের জনগণ ঐ স্বেচ্ছাচারী, মদগর্ব্বী ও বিকার গ্রস্থ সরকারের উৎখাত নিশ্চিত করার জন্য সর্বপ্রকার যোগ্য ব্যবস্থাই গ্রহণ করে, দেশের বৃহত্তর স্বার্থের মুখচেয়ে। পশ্চিমবঙ্গের শিল্প বাণিজ্যের প্রসার ঘটাতে গেলে যে আবহাওয়া সৃষ্টি করার একান্ত প্রয়োজন ছিল, বামফ্রন্ট তা ইচ্ছা করেই করে নি, কারণ তাহলে বেকার ভাতা দিয়ে দলের লোকদের মাথা কিনে রাখতো কি উপায়ে দলপতিরা? সি, পি, এম দল দেশকে জাহান্নামে পাঠাতেও রাজি যদি তাতে দলের কিছু সুবিধা হয়। ওরা দলকে মজবুত করার একান্ত বাসনা নিয়ে সরকার গঠনে প্রস্তুত হয়েছিল।

জনগণের ভাল হোক আর না হোক সি, পি, এম দলের কর্মী ও সমর্থকদের যাতে ভাল হয় সেইদিকেই বামফ্রন্ট সরকারের নজর ছিল প্রখরভাবে, ফলে বামফ্রন্ট ক্ষমতায় বসায় সি, পি, এম দলই সব দিক দিয়ে গুছিয়ে নিয়েছে। এমনকি ওদের শরিক-দলের কর্মী ও সমর্থকরাও সবদিক দিয়ে রক্ষিত হয়েছে বলে শুনা যায়। আর জনগণ ওদের যে ভয়ংকর মূর্তি দেখেছে, কি শহরে, কি গ্রামে, তাতে তারা সদা সন্ত্রস্ত হয়ে ওদের উৎখাতের জন্য বাস্তব পন্থা গ্রহণের পথে বর্তমানে দলে দলে এগিয়ে আসছে। পশ্চিমবাংলার সামগ্রিক মঙ্গলের জন্যই বামফ্রন্ট সরকারের পতন আসবে বলে বুদ্ধিজীবিরা মনে করেন। বুদ্ধিজীবিগণ একজোট হয়ে সি. পি, এম তথা বামফ্রন্টের হাত থেকে সরকারী ক্ষমতা উচ্ছেদের জন্য বেশ সুষ্ঠু উপায়ে অগ্রসর হতে শুরু করেছেন হালে এবং এটাই এ দেশবাসীর নিকট আজ আশীর্ব্বাদ স্বরূপ। জনগণ অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে বহু পূর্বেই কিন্তু সি, পি, এম দলকে তারা ঠিকমত শায়েস্তা করতে পারেনি দীর্ঘ সাড়ে তিন বছরে।

এবারে সর্ব্বস্তরে ও সর্ব্বক্ষেত্রে মানুষ সি, পি, এম দলের বিরুদ্ধে বেশ দৃঢ় পদক্ষেপে আগুয়ান হবার মত সাহস সঞ্চয় করেছে এবং মানুষের মনোবলও বেশ সুদৃঢ় হচ্ছে দেখা যায়। কাজেই পশ্চিম বাংলার ক্ষমতায় থাকা, সি, পি, এম ও তার দোসরদের এর পরে অত্যন্ত কঠিন হবে বলেই মনে হয়। সরকারী কর্মচারীদের অবসর গ্রহণের ফলে যে সব চাকুরী খালি হয়েছে, তাও বামফ্রন্ট পূরণ করেনি, অথচ চালাও বেকার ভাতা দিয়ে দলপোষণ ও দলতোষণ করে চলেছে সরকারী অর্থে তারা। অপরপক্ষে সিদ্ধার্থরায়ের মন্ত্রিসভা কংগ্রেসী আমলে গড়ে বছরে প্রায় সাত হাজার শিক্ষিত বা অর্দ্ধশিক্ষিত বেকারের জন্য স্থায়ী চাকুরীর ব্যবস্থা করেছিল। ফলে পাঁচ বছরে প্রায় ত্রিশ থেকে পঁয়ত্রিশ হাজার তরুণ তরুণীর স্থায়ী চাকুরী হয়েছিল সিদ্ধার্থ রায়ের মুখ্যমন্ত্রীত্ব কালে।

(এর পর ১১ পাতায় দেখুন)

ভারত বিপ্লব আন্দোলনের ইতিহাস

॥ ক্ষীরোদ দত্ত ॥

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

স্থির করালেন গুহাজার যুবককে সামরিক পোষাকে সজ্জিত করে সামরিক কায়দায় তাদের ট্রেনিং দেওয়া হবে। প্রথমে স্থির হয়েছিল কংগ্রেস অধিবেশনের স্বেচ্ছাসেবকদেরই মাত্র এই ট্রেনিং দেওয়া হবে। কিন্তু পরে এব্যবস্থা স্থায়ী করা হয় এবং প্রায় প্রত্যেক জেলায়ই আলাদা আলাদা বাহিনী গড়ে ওঠে। সুভাষচন্দ্র নিজে ছিলেন এই বাহিনীর সর্বাধিনায়ক বা জী, ও. সী.

সামরিক ট্রেনিং চলছে কিন্তু সমরায়োজন কোথায় ফলে তরুণ দল তাদের মানসিক উত্তেজনা আর চেপে রাখতে পারছেনা। প্রাচীন নেতারা তরুণদের এই মনোভাব ঠিক ঠিক বুঝে উঠতে পারলেন না। তারা পূর্ণ আয়োজন না করে কিছুতেই বিপ্লব প্রচেষ্টা আরম্ভ করবার অনুমতী দিবেন না। ফলে বিপ্লবী দল গুলির মধ্যে প্রবীণদের নেতৃত্বের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ক্রমেই বেড়ে উঠতে লাগল প্রবীণরা তরুণদের শৃঙ্খলা ভঙ্গের অভিযোগে অভিযুক্ত করলেন। এর ফলে বিপ্লবী দলগুলির মধ্যে শৃঙ্খলা আরও ভেঙে পড়ল। তরুণদল আর অপেক্ষা করতে পারছিলেন না। তারা একটা কিছু করে দেশের জন্য আত্মদান করতে চান এই সকলের মনোভাব। তারা বললেন একটি মাত্র প্রচেষ্টায় ভারতের স্বাধীনতা আসবেনা বহুবার এজন্য চেষ্টা করতে হবে। এই আয়োজনও হবে ক্রমে বৃহৎ থেকে বৃহত্তর। সুতরাং প্রথম প্রচেষ্টা অবশ্যে আরম্ভ করা প্রয়োজন। প্রবীণদের সম্পর্কে তাদের যে পরিপূর্ণ বিপ্লবী মনোভাব ছিল তা নয়। তরুণ বিপ্লবীরা নিজেদের মধ্যে মুখে বলতেন। "আমরা একটা কিছু আরম্ভ করলেই দাদারা আমাদের সঙ্গে যোগ দিবেন" এটা তারা মনে মনে বিশ্বাসও করতেন। আসলে সমগ্র দেশে তখন একটা উত্তেজনার আবাহাওয়া বইছিল। বহিরঙ্গ ব্যাপক বিপ্লব প্রচেষ্টা এবং বাঙলার সামরিক ট্রেনিং প্রভৃতির মধ্য দিয়েই এ আবাহাওয়া চারদিকে ছড়িয়ে পড়ছিল। এই সময় জাতীয় কংগ্রেসের আন্দোলনও ছিল এর অনুকূলে। কংগ্রেসের মাদ্রাজ অধিবেশনে পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাব গৃহীত হয়েছিল। সুভাষচন্দ্র এবং জওহরলাল নেহেরুর উদ্যোগে কংগ্রেসের মধ্যে একটা দাবী উঠেছিল যে স্বাধীনতার অনুকূলে অবিলম্বে একটা পরিবর্তন চাই। প্রাচীন বিপ্লবীনেতারা দেশের এই অবস্থা সমাক বুঝে উঠতে পারেন নি। ফলে তরুণদের সঙ্গে তাদের মতানৈক্য কয়েকটি বিচ্ছিন্ন বিপ্লব প্রচেষ্টায় পর্যবসিত হল। সামগ্রিক অভ্যুত্থান প্রচেষ্টাও এর ফলে ব্যাহত হল।

অনুশীলন সমিতির ঢাকা ময়মনসিংহ এবং অন্যান্য জেলার একদল তরুণ বিপ্লবী ১৯২৮ সালের ডিসেম্বর মাসে কলকাতায় কংগ্রেস অধিবেশনের সময় এক গোপন বৈঠকে মিলিত হলেন। তাদের দাবী আমরা কাজ চাই। কাজ বলতে বুঝায় সরকারের সঙ্গে সশস্ত্র প্রতিরোধ। নায়ক থেকে ভগৎসিং

এবং আরও কয়েকজন এসে কলিকাতা কংগ্রেসে যোগ দিয়েছিলেন। যতীনদাসকে আগেই বোমা প্রস্তুতের শিক্ষক হিসাবে শচীন সান্যালের সঙ্গে মিলিয়ে দেওয়া হয়েছিল। কলকাতা কংগ্রেসের স্বেচ্ছাসেবক দলে তিনি অন্যতম মেজর ছিলেন। তিনি যাদের বোমা প্রস্তুত শিখিয়েছিলেন তাদের মধ্যে জগৎ সিংহ একজন। কাজেই তার মাধ্যমে বাঙলার তরুণ বিপ্লবীদের সঙ্গে হিন্দুস্থান রেভোলিউশনারি এ্যাসোসিয়েশনের মিলনের সুযোগ ঘটেছিল। পারস্পরিক মিলনের এই সুযোগে, যুক্তপ্রদেশ এবং পাঞ্জাবের বিপ্লবীদের কিছুটা উদ্বুদ্ধ করেছিল। মিলিত অনুশীলন তরুণদল অপেক্ষাকৃত প্রবীণ কর্মী সতীশ পাকড়াশীকে এই উদ্যোগের নেতৃত্ব গ্রহণ করতে আহ্বান করেন।

কলিকাতা কংগ্রেস অধিবেশনে পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাব উত্থাপন করবার জন্য বিপ্লবীরা সমগ্রভাবেই সুভাষচন্দ্রের উপর চাপ দেন। ভোটাভুটিতে সে প্রস্তাব পাশ না হলেও স্বাধীনতার অনুকূলে আবহাওয়া উত্তাপ হয়ে ওঠে তরুণ বিদ্রোহী দলের উত্তেজনা আরও বৃদ্ধি পায় যুগান্তর দলের বরিশাল শাখায় চট্টগ্রাম দল এবং অনুশীলন দলের ঢাকা, ময়মনসিংহ, বরিশাল, দক্ষিণ কলকাতার ও বহরমপুরের একটা বড় অংশ অবিলম্বে সংগ্রাম আরম্ভ করার জন্য সচেষ্ট হলেন। ঢাকার বেঙ্গল ভলেন্টিয়ার দলও এই বিদ্রোহী দলের সঙ্গে সংগ্রাম শুরু করবে বলে কথা দিয়েছিল। মিলিত বিদ্রোহী দলের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন অনুশীলনের সতীশ পাকড়াশী এবং নিরঞ্জন সেন, চট্টগ্রাম দলের সূর্যসেন অম্বিকা চক্রবর্তী এবং অনন্ত সিংহ। দক্ষিণ কলিকাতার অনুশীলন সমিতির যতীন দাস এবং বিনয় বসু এবং বহরমপুরের অনুশীলন দলের প্রভাত চক্রবর্তী।

১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দের প্রথম ভাগের রঙপুরে প্রাদেশিক কংগ্রেস সম্মেলন অনুষ্ঠিত হল। বিদ্রোহী দলের নেতৃবৃন্দ এখানে মিলিত হয়ে কর্মসূচী স্থির করলেন। আলোচনায় স্থির হল পত্ত হত্যার যুগ অতীত হয়েছে সন্ত্রাসবাদের দ্বারা স্বাধীনতা লাভ সম্ভব নয়। তবে সর্বভারতীয় সশস্ত্র অভ্যুত্থানের মত শক্তিসংগ্রহ করা এখনও বিপ্লবীদের পক্ষে সম্ভব হয় নাই, বিশেষভাবে বিদ্রোহী দলের পক্ষেতো নয়ই। সুতরাং ছোট ছোট বিদ্রোহাত্মক সংগ্রাম করেই উন্নততর বিপ্লবী সংগ্রামের পথ উন্মুক্ত করতে হবে। স্থির হল একই সময় বিভিন্ন জেলায় সরকারী কয়েকটি অস্ত্রের ঘাঁটি এবং সরকারী শক্তির কেন্দ্র আক্রমন করা হবে। অভিযানের আশু কর্মসূচী হিসাবে স্থির হল যে ময়মনসিংহ, চট্টগ্রাম এবং বরিশাল জেলা শহরের সরকারী অস্ত্রাগার তিনটি এবং ঢাকা ও কলকাতার ছোটখাট কয়েকটী কেন্দ্র একটি দিনে এবং একই সঙ্গে আক্রমন করা হবে। পরে অবস্থানুযায়ী যতদিন সম্ভব সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়া হবে। পরবর্তী চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন এই পরিকল্পনারই একটি অংশ। (চলবে)

(৯ম পাতার পর)

রামমন্ত্র সেদিক শোচনীয়ভাবে ব্যর্থ হয়েছে। কেবলমাত্র সীমাহীন মিথ্যার বেসাতি ও চালাকি দ্বারা কি রাজ্য শাসন বাস্তবে দীর্ঘস্থায়ী হয় কখনো কোন রাজ্যে ? তা হয় না, বরং শাসকদলের কুৎসিত চিন্তা ও কার্যে সে দেশের শোষিত জনগণ মরীয়া হয়ে শাসকদের গদীচ্যুত করে গায়ের জ্বালা ও মনের মর্মান্তিক বিক্ষোভ মেটাতে। পশ্চিমবঙ্গের বিক্ষুব্ধ জনগণ আজ মনস্থির করে সেই পথই বেছে নিয়েছে, যুক্ত হোক মনে রাখা প্রয়োজনে।

রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্র নাথের স্মৃতি কথা

["A Nation In Making" গ্রন্থ থেকে অনুবাদ]

অনুবাদক—অধ্যাপক নলিনীমোহন দাশগুপ্ত

মন্ত্রীরূপে আমার কাজ-কর্ম।

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

অতুন অবস্থা সুযোগের মধ্যে জনগণের সহযোগিতা যে একান্ত প্রয়োজন তা আমি সর্বদাই অনুভব করেছি। আমার সাধ্যমত আমি সে সহযোগিতা পাওয়ার জন্য চেষ্টা করেছি। যে দুঃখ জনক পরিস্থিতির কথা আমি উল্লেখ করেছি, তা যদি সৃষ্টি না হত তাহলে আমার প্রচেষ্টা আরও অধিক পরিমাণে সন্তোষজনক সাফল্য লাভ করত। আমার এই কর্ম-পরিকল্পনা অনুযায়ী আমি পূর্ব, পশ্চিম ও উত্তর বঙ্গের বিভিন্ন সহরে পরিভ্রমণ করেছি, ডিস্ট্রিক্ট্ বোর্ডের মেম্বারদের সঙ্গে এবং স্থানীয় নেতৃবৃন্দের সঙ্গে সম্মেলন করেছি। কোথাও কোথাও অসহযোগীরা গোলমাল করার চেষ্টা করেছে। কিন্তু স্থানীয় সরকারী কর্মচারীরা তা আয়ত্তে আনতে সমর্থ হয়েছেন। ঢাকা ডিভিসনের কমিশনার মিঃ ইয়ংম্যান ঢাকা থেকে রংপুর ছুটে এলেন যাতে সেখানে কোন গোলযোগ না হয় এবং সেই অসহযোগের দুর্গ রংপুরে কোন গোলমালই হয়নি, সমাজের যুবক শ্রেণীর ছেলেরাই অসহযোগের পিকার সবচেয়ে বেশী পরিমাণে আকৃষ্ট হয়ে পড়েছিল এবং বিক্ষোভ প্রকাশ করে সরকারের কাজের নিন্দায় উৎসাহী ছিল।

এই রংপুরেই মাত্র পনেরো বছর আগে সেই ঐতিহাসিক রংপুর জমায়েত অনুষ্ঠিত হয়েছিল। সেই সময় এই রংপুরেই 'বঙ্গ-ভঙ্গের বিরুদ্ধে সর্বাপেক্ষা অধিক স্মরণীয় বিক্ষোভ ঘটেছিল। আমিই ছিলাম সেই বিক্ষোভের কেন্দ্রীয় চরিত্র ও নায়ক। এক বিশাল জনতা আকাশ বাতাস বিদীর্ণ করে তখন আমায় অভ্যর্থনা করেছে। তাদের সেই উচ্ছসিত আনুগত্যের আবেগ অতি কঠিন-প্রাণ ব্যক্তিকেও হৃদয় দ্রবীভূত করত। আজ পঞ্চদশ বৎসর এল ও চলে গেল। ইতিমধ্যে অসহযোগ তার কাজ হাসিল করে ফেলেছে। সরকারের বিরুদ্ধে এই যে সরকারের সঙ্গে কোন না কোন ভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন তাদের সকলের বিরুদ্ধেই এক তীব্র অসন্তোষের সঞ্চার গড়ে তুলেছে। শাসন সংস্কার বা শাসন সংস্কারের অন্তর্নিহিত তাৎপর্য, কোন কিছুই সেই অসন্তোষের উপশম করতে সক্ষম হয়নি। রংপুরে এসেছিলাম একটি জনহিতকর কার্য ব্যাপদেশে যার সঙ্গে রাজনীতির কোন ভূমিকা বা সম্পর্ক ছিলনা। জন স্বাস্থ্যের উন্নয়ন করে সংপ্রকার সরকারী অর্থানুকূল্য ও সংগঠন সংক্রান্ত শক্তি নিয়ে আমি রংপুরে এসেছিলাম। কিন্তু জন সাধারণের পক্ষে অতি মঙ্গল জনক এমন একটি অতি প্রয়োজনীয় দানও গ্রহণ যোগ্য বলে মনে হল না, যেহেতু সে দান আসছে সরকারের পক্ষ থেকে। সরকারের সে দান হয় এমন এক ব্যক্তির মাধ্যমেও এসে থাকে যাকে তারা দুঃখের সঙ্গেও একজন জনসেবক বলে স্বীকার করে সম্বর্ধনা জানিয়েছেন, তা হলেও সে দান গ্রহণের অযোগ্য বলে বিবেচিত হয়ে গেল। অবস্থা দেখে আমার ভারিলের উইলিয়ম টেল মনে পড়ে গেল। উক্তিটি হল 'গ্রীকরা যদি হাতে কোন ভেট নিয়েও আসে, তাহলেও তাদের আমি ভয় করি।' তবে সর্বত্রই এই মনোভাব ছিলনা, আর বোধ হয় এটা জনগণের সাধারণ মনোভাবও নয়। তা হলেও ভাবটা যে ছিল, তাও ঠিক। স্থানীয় জনগণের মধ্যে এই মনোভাব সজীব ছিল এবং তা বেশ সহজ ও প্রকাশমুখীন ছিল। ছিঃ মটেগুর একটি মন্তব্য আমার বেশ মনে আছে। ১৯১৯ সালে লণ্ডনে আমি একবার তাকে বলেছিলাম যে আমার দেশের লোক এই নবাশাসন সংস্কারের জন্য তার প্রতি কৃতজ্ঞ থাকবে। তার উত্তরে মটেগু বলেছিলেন 'এতটা বেশী আশাবাদী হয়ো না; রাজনীতিতে কৃতজ্ঞতা বলে কোন কথা নেই।' তখন আমি বুঝতে পারিনি যে এত তাড়া- [illegible]

আমার বরিশাল প্রবেশের সময়ে এটাই একমাত্র উল্লেখ যোগ্য ঘটনা নয়। অদৃষ্টের পরিহাসে কিছু অদ্ভুত ঘটনাও সেখানে ঘটেছে।

১৯০৬ সালে বরিশাল কনফারেন্সের সময়ে মিঃ ইমার্সন ছিলেন সেখানকার ম্যাজিস্ট্রেট। তিনিই সে সময়ে আমাকে গ্রেপ্তার করার আদেশ দিয়েছিলেন এবং শাস্তি হিসাবে আমার জরিমানা করেছিলেন, কনফারেন্স পণ্ড করে দিয়েছিলেন। কিন্তু আজ সেই ইমার্সন সাহেব বিচারীয় কমিশনার রূপে আমাকে সর্বপ্রকারে সাহায্য করলেন। সেই আগের মানুষের আজ কত পরিবর্তন!

ইমার্সন সাহেব ছিলেন একজন হৃদয়বান খাইরিস-ট্যান। তার সঙ্গে আমার খুবই সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। এই সান্নিধ্যের ফলে তার ব্যক্তিত্বের প্রতি আমার সম্ভ্রম বোধ জাগ্রত হয়। ভারতে কোন সরকারী কর্মচারীর অফিসীয় আচরণ দেখে তার সম্পর্কে প্রকৃত বিচার করা অনেক সময় কঠিন হয়ে পড়ে। ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশ মতই অনেক সময় তাকে তার কর্তব্য পালন করতে হয়। তাতে প্রকৃত মানুষটির ও তার চরিত্রের বিচার করা যায় না। ভুল ধারনারই সৃষ্টি হয়।

১৯০৬ সালে বরিশাল থেকে চলে আসার সময় মিঃ ইমার্সন সম্পর্কে যে ধারণা নিয়ে আসি, পরবর্তী অভিজ্ঞতার আলোকে তা আমাকে সংশোধন করতে হয়েছে। ইম্পেরিয়াল লেজিস্লেটিভ কাউন্সিলের সদস্য রূপে পরে আমরা পরস্পরের খুব কাছাকাছি এসে পড়েছিলাম। কিছু সংখ্যক রাজবন্দী ডেটিনিউ তার তত্ত্বাবধানে ও নিয়ন্ত্রণাধীনে ছিলেন। ম্যাজিস্ট্রেট হিসাবে তাকে তাদের ব্যাপার দেখতে হত, এবং আমার মনে হয় সরকারী কড়া নজরেই তিনি যে সব দেখতেন। এই রকম কড়া অবস্থানীয় সরকারী কর্মচারীই ছিলেন ইমার্সন সাহেব। কিন্তু তার এই বাইরের নিয়ম ও কড়া আচরণের আড়ালে একটি কোমল হৃদয়ের অস্তিত্ব ছিল যার ফলে তিনি সেই নির্যাতীতদের প্রতি সহানুভূতি বোধ করতেন, এবং তারা যত বিপদগামীই হয়ে থাকুন না কেন, তাদের স্বদেশ প্রেম সম্পর্কে একটা স্পষ্ট ধারণা পোষণ করতেন। একবার তিনি অকপট শ্রদ্ধার সহিত তার বেকায়দায় আটক একজন রাজবন্দীর সততা ও নিষ্কলুষ জীবনের বিবরণ আমাকে দিয়েছিলেন। সে কথা আমার স্মরণে আছে এবং যদি সঠিক ভাবে স্মরণ করে থাকি তা হলে মনে হয় যেন এ কথা তিনি কাউন্সিল হাউসের প্রকাশ্য সভায় তার বক্তৃতায় বলেছিলেন।

ইম্পেরিয়াল লেজিস্লেটিভ কাউন্সিলে রাউলাট বিলের উপর আলোচনার সময় আমাকে একবার তার সম্পর্কে উল্লেখ করতে হয়েছিল। একটু পরিহাস ছলেই তার কথা বলেছিলাম। আমরা দুজনেই সে পরিহাসে আনন্দ উপভোগ করেছি। আমি একটি সংশোধনী প্রস্তাব এনেছিলাম। আমার সে সংশোধন প্রস্তাবটি ছিল এই যে আসামীকে জুরীদের অধিকার দিতে হবে। মূল বিলে এর ব্যবস্থা ছিল না। সংশোধন প্রস্তাবটিকে জোরদার করার জন্য আমি বরিশাল কনফারেন্সের উল্লেখ করলাম যে ঘটনার সময় ইমার্সন সাহেব ছিলেন বরিশালের ম্যাজিস্ট্রেট এবং তিনিই আমাকে অভিযুক্ত করেছিলেন। মিঃ ইমার্সন এই সময় আমার এক রকম কাছেই বসা ছিলেন। তার দিকে এক নজর তাকিয়ে আমি বললাম, 'সেই ছেলে যে ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব আমার ৩০০ শত টাকা অর্থ দণ্ড করেছিলেন তিনি আজ এই চেয়ারে আমি যেখানে দাঁড়িয়ে কথা বলছি তার অনতি দূরেই বসে আছেন। সেই আদেশ পরে হাইকোর্ট বাতিল করে দেয়। কিন্তু আপীল করার অধিকার না থাকলে বা আপীল না করলে একটা অন্যায় কাজ দীর্ঘদিন ধরে বহাল থাকত, এর কোন প্রতিকার বা প্রতি বিধানের কোন উপায় থাকত না। এই সময় সদস্যদের মধ্যে একটু খানি চাপা গুঞ্জন ধ্বনি ওঠে। সহসাসব বুঝতে পেরেছিলেন, কার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। সভাশেষ হলে আমি ইমার্সন সাহেবের নিকট যাই এবং বলি 'আমি আশা করি এর জন্য আপনি অসন্তুষ্ট হন নি।' মিঃ ইমার্সন বিনীত ভাবে বললেন 'আমি অসন্তোষের স্পর্শের অনেক দূরে, এতে আমি গৌরবই বোধ করছি।'

সেই থেকে আমাদের সম্পর্ক ছিল বন্ধুত্বপূর্ণ। যতদিন

কাজে নিযুক্ত হওয়ার পরে আমি যখন ঢাকা সহরে গেলাম, তখন সব মহল থেকেই আমি কমিশনার সম্পর্কে উচ্চ প্রশংসার কথা শুনতে পেয়েছি। তাই মিঃ বসুপালের অবসর গ্রহণের পরে ইম্প্রুভমেন্ট ট্রাষ্টের চেয়ারম্যানের পদ খালি হলে যখন সেই পদের জন্য উপযুক্ত পাত্র বলে তাঁর নাম প্রস্তাব করা হল, আমি তৎক্ষণাৎ সে প্রস্তাব গ্রহণ করি এবং তাঁকে সেই পদে নিয়োগ করি। দেশের জন্য আমি যা কিছু করেছি, তার মধ্যে এই পদটির সৃষ্টি করা আমার অন্যতম শ্রেষ্ঠ কাজ। এ পদটি কঠিন পরিশ্রম ও শুরু দায়িত্বের পদ। আমি মনে করি আমার বাছাই যে সম্পূর্ণ সঙ্গত হয়েছে মিঃ টমাসনি তা প্রমাণ করেছেন। কলকাতা মহানগরীর বিভিন্ন বিভাগের বড় বড় কাজের মধ্যে সম্ভবতঃ আমার যে বিষয়টি সর্বশেষে মিঃ বসুপাল হাতে নিয়েছিলেন মিঃ টমাসনি তা বিপুল উদ্যম ও অসীম দক্ষতার সহিত চালিয়ে যেতে থাকেন। তাই এর পরে যখন এক প্রতিনিধি সভার প্রস্তাব গৃহীত হল যে নদীর অপর পাড়ে হাওড়াতেও একটি ইম্প্রুভমেন্ট ট্রাষ্ট গঠন করা হবে তখন এ সিদ্ধান্তও গৃহীত হয় যে কলকাতা ইম্প্রুভমেন্ট ট্রাষ্টের চেয়ারম্যানই হবেন ওই নতুন ট্রাষ্টের ও চেয়ারম্যান।

আমি যখনই যেখানে বদলি হয়েছি স্থানীয় অসহযোগীরা সেখানেই একটা 'হরতাল' করার মনোভাব দেখিয়েছে। তবে তা কোথাও খুব বেশী হয়নি। ফরিদপুরে হরতালের ডাককে কেউ তেমন গুরুত্ব দেয়নি, কারণ, সেখানে তখনও সেই অসাধারণ ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন পূর্ব বঙ্গের 'বুড়ো বাঘ' বাবু অশ্বিনীকুমার দত্তমহাশয় জীবিত ছিলেন। যদিও তিনি রোগশয্যায় শায়িত ছিলেন, তথাপি তাঁর নেতৃত্বের প্রতি প্রগাঢ় প্রভাব ছিল। অবিচল এবং সুদৃঢ় প্রগতির সাধক ছিলেন তিনি। দিনাজপুরে অসহযোগীরা চেষ্টা করেছিলেন যেন আমার সভায় কেউ না যান। কিন্তু সে চেষ্টা ব্যর্থ হয়। জন সাধারণ তাদের স্বাস্থ্য রক্ষার ব্যবস্থা চায় না, ব্যাপারটা তা নয়, ব্যাপারটা হচ্ছে, তারা প্রত্যক্ষ ভাবে সরকারের কাছ থেকে তা নিতে চায় না। তাদের কিছু পুনঃ পুনঃ সরকারী আদালতে যেতে বাধ্যে। কারণ সেখানে তারা তাদের ব্যবসা চালিয়ে অর্থোপার্জন করেন সরকারী হেল থাকতে হতে বা সেই অফিস ও টেলিগ্রাম অফিসে যেতে হলেও তাদের বাধা নেই। এ এক অদ্ভুত মনস্তাত্ত্বিক অসহযোগ, সব কিছুই নিজের চাহিদা ও প্রয়োজন মিটাবার দিকে লক্ষ্য রেখে।

এ অসহযোগের স্বরূপ প্রকাশ পায় জন সভায় বক্তৃতা করে 'বয়কাট' দেশিয়ে এমন সমস্ত সাহসিকতা পূর্ণ মত ঘোষণা করার মধ্য দিয়ে যা নেতাদের কাছে প্রীতিকর বলে মনে হয় না। এদেরই লেজিস্লেটিভ কাউন্সিলের বন্ধুদের মধ্যে এরকম একটা ধারণা জন্মেছিল যে আমরা এই সকল কাজে সরকারী তহবিল থেকে মোটা রকমের ভাতা পাই। এ নিয়ে কাউন্সিলে প্রশ্নও করা হয়েছিল এবং তার জবাবও দেওয়া হয়। তাতে জানা যায় যে এরকম কোন ভাতা আমরা পাইনি, কেবলমাত্র ভ্রমণের ভাড়া দেওয়ার ব্যবস্থাই আমাদের জন্য ছিল। প্রকৃত পক্ষে এই সব সফরের খরচ নিজেদের পকেট খরচের টাকা থেকেই বহন করতে হত এবং তার ফলে ব্যক্তিগত ভাবে বেশ কষ্ট ও অসুবিধায় পড়তে হত। দিনাজপুর একটি ম্যালেরিয়া অধ্যুষিত অঞ্চল বলে কুখ্যাত। এই দিনাজপুরে আমাকে সফিট হাউসে একটি ঘরে শুয়োতে হয়েছে। মশারির ব্যবস্থা অবশ্য ছিল। কিন্তু সে মশারি আমাকে মশার কামড় থেকে রক্ষা করতে পারেনি। ফলে আমাকে ভুগতে হল। আর সে জ্বর থেকে পুরো সুস্থ হয়ে উঠতে আমার কয়েক মাস সময় লেগে গেল

(ক্রমশঃ)

(৫ম পাতার পর)

ইহাই জ্ঞাতব্য। পরবর্ত্তী যুগের বিপ্লবীদের সাহায্যের জন্য।

প্যারিস কমিউন অসফল হলেও তার সম্বন্ধে মার্কস এঙ্গেলস্ লেনিন প্রভৃতি প্রচুর গবেষণা করেছেন ভুল ত্রুটিও দেখিয়াছেন রাশিয়ার বিপ্লবের সময় তাহা হইতে অনেক শিক্ষাও বিপ্লবীরা গ্রহণ করেছেন।

চট্টগ্রাম সশস্ত্র বিপ্লবের এক বৎসর ব্যাপী স্মৃতি রক্ষার সাথে সাথে এ দিকটা নিয়েও একটু চিন্তা ভাবনা করিলে দেশে বিদেশে বিপ্লবীদের অনেক সুবিধা হতে পারে।

চট্টগ্রাম ও জেনালাবাদ পাহাড়ে ও অন্যত্র বিপ্লবীদের সংগ্রাম অনেক কে প্রেরণা জুগিয়েছে আরও বিশ্লেষণ করলে ভবিষ্যৎ বিপ্লবীদের পথ আরও পরিষ্কার হবে। তার জন্যই আমার এই আবেদন।

RegdNo.R. N .24911/71 | Biplabi Bangla | Regd. WB/NC 77
Phone : 34-1795
বার্ষিক :—ডাক ১৫.০০ টাকা | বাষ্মাষিক :—৮.০০ টাকা | মূল্য—৩০ পয়সা

C/30

সম্পাদক—
শ্রীশান্তিশরণ রায়চৌধুরী

॥ সম্পাদ॥

শ্রীজগদীশ চট্টোপাধ্যায় (সভাপতি)

শ্রীভবেশচন্দ্র নন্দী
পুষ্প চ্যাটার্জী
মলয় ঘোষ

প্রকাশক ও মুদ্রক—
শ্রীঅনিল সেনগুপ্ত

শিল্পীর বিশেষ প্রতিনিধি—
শ্রীবাধীন ঘোষ

হেহালা—
শ্রীনন্দগোপাল পাল

বিপ্লবী পুস্তকমালা

LIBRARY

নেতাজীর সিক্রেটসার্ভিস—ডাঃ পবিত্রমোহন রায়—১০'০০
বিপ্লবী মহানায়ক রাসবিহারী—সুবোধ মজুমদার
অনুশীলন সমিতির বিপ্লবী প্রচেষ্টা—ব্রজেন্দ্র দাস

—ক্ষীরোদ কুমার দত্তের—

১। বাংলার অগ্নিযুগ—১'৫০, ২। বহির্ভারতে ভারতীয় বিপ্লব প্রচেষ্টা—৮'০০
৩। অনুশীলন সমিতির পি, মিত্তির—২'০০, ৪। গৌহাটী সংগ্রাম কাহিনী—১'০০, ৫। কাকোরী ষড়যন্ত্র—১'২৫, ৬। কলকাতা বাজার সংগ্রাম কাহিনী—'৫০, ৭। রাসবিহারী ও অনুশীলন সমিতি—'৬০
৮। স্বাধীনতাসংগ্রামে মা ও মেয়ে—'৫০, ৯। বিবেকানন্দ ও সমাজবাদ—'৬০
১০। বিপ্লবী বিবেকানন্দ—'৫০, ১১। মহাবোধি ও সুভাষচন্দ্র—'৫০
১২। ভারতের নবজাগরণ ও ভগিনী নিবেদিতা—'৭৫, ১৩। দেশ বাসের চোলেনি (১)—১'০০, ১৪। দেশ বাসের চোলেনি (২)—২'০০
১৫। শহীদ চন্দ্রশেখর আজাদ—'৫০, ১৬। ১৯৪ এপ্রিল জাতীয় শহীদ দিবস—১'০০, ১৭। হাতিয়ার হত্যা প্রচেষ্টা—'৭৫, ১৮। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও অনুশীল সমিতি—৪'০০, ১৯। ভারতের জাতীয় পতাকার ইতিহাস—'৫০, ২০। লাট হত্যা প্রচেষ্টা—১'৫০

5 MAR 1981

প্রাপ্তিস্থান :— ৪নং বল্লভ দাস স্ট্রীট কলিকাতা-৭০০০০৭

শৈলশ্রী—১/১ [illegible] স্ট্রীট কলিকাতা-৭৩

মূল কার্যালয়—৪নং বল্লভ দাস স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০০৭ শ্রীঅনিল সেনগুপ্ত কর্তৃক প্রকাশিত এবং তৎকর্তৃক প্রিন্টিং পাবলিসিটি, ১১৭, কেশবচন্দ্র সেন স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০০৯ হইতে মুদ্রিত।

বিপ্লবী বাংলা

॥ বিপ্লবী পরিষদের সাপ্তাহিক মুখপত্র ॥

স্থাপিত—১৯৫৬, 'বিপ্লবী বাঙ্গালী' নবকলেবরে—১৯৭১

দশম বর্ষ	শনিবার ৩০শে ফাল্গুন, ১৩৮৭ ১৪ই মার্চ ১৯৮১	২১ সংখ্যা

নাগিণীরা চারিদিকে—
ফেলিতেছে বিষাক্তনিঃশ্বাস।
শান্তির ললিত বাণী
শোনাইছে ব্যর্থ পরিহাস।
বিদায় নেবার আগে তাই—
ডাক দিয়ে যাই।
দানবের সাথে যারা সংগ্রামের তরে
প্রস্তুত হতেছে ঘরে ঘরে।

—রবীন্দ্রনাথ

Name	Address	Amount Rs.	with effect from
	CALCUTTA		
Barua Smt Arati	Vivekananda Road, Cal-32	150	31 7 80
w/o Late Mohendra Lal Barua		250	1 8 80
Bhattacharya Nepal	25/6C, Diamond Harbour Rd. Cal-8	300	1 8 80
Santi Ranjan	23/1, Selimpur Lane Dhakuria Cal-37	300	1 8 80
Sudhir Ch.	19/B, Raja Dinendra Street Cal-9	300	1 8 80
Syamadas	10, Galif St. Flat No. 60 Block 5 Cal-3	300	1 8 80
Chakraborty Makhanlal	P556 Parnashri Palli, Cal-60	300	1 8 80
Chaudhuri Sukumar	3/8. Baishnabghata Bye Lane Cal-47	300	1 8 80
Dasgupta Sushil Chandra	23/9 Kabi Nabin Sen Rd. Cal-28	300	1 8 80
Dey Smt Juthika	45 Amherst Street Calcutta-9	300	30 8 80
w/o Late Jiban Krishna			
Guha Thakurta Sadhana Nanda	90/B Christofer Road Cal-46	300	1 8 80
Maira Santosh Kumar	30B/1C Sarat Ghosh Garden Lane Cal 31	300	1 8 80
Roy Krishna Binode	132 Lenin Sarani Sarani, Calcutta—13	300	1 8 80
Sultana Begum	w/o Late Mirza Mohd. Badar Bokh, Great Grand son of last Moughal Emperor Late Bahadur Shah Zafar II	400	1 8 80
	Dist—24 PARGANAS		
Saha Poddar Ramesh Chandra	Peyara Bagan, Laskarpur	300	1 8 80
Sengupta Satya Ranjan	Sumati Bhusan Naya Palli, Barasat	300	1 8 80
	Dist—HOOGHLY		
Das Shyam Lal	Srigorunagar P. O. Chinsura Rs. 200 2 1 74 to 31 7 80 Rs. 300		1 8 80
Sen Badal Krishna	99 B, Makaltala Lane, Bhadrakali	300	1 8 80
	Dist—BURDWAN		
Chowdhury Dhananjoy	P.O. & Vill Mondolgram	300	1 8 80
Debabhuti Smt Usha Rani	c/o New Kamala Stores	200	31 7 80
w/o Late Jatindra Mohan	Hutton Road, Asansol	300	1 8 80
Nath Kanai Lal	Vill Srikrishnapur P.O. Jyotsriram	300	1 8 80

(Contd. 3rd Cover)

সম্পাদকীয়

পশ্চিমবঙ্গের জনজীবন থেকে চরম ও দুর্বার গতিতে, ভদ্রতা, সৌজন্য, শালীনতাবোধ যেন জ্যামিতিক হারে অবক্ষয় লাভ করছে। এজন্য জনজীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে যাঁরা দায়িত্বপূর্ণ পদে আসীন আছেন, তাঁদের কথাবার্তা, বক্তৃতা ও কাজকর্ম যে বহুলাংশে দায়ী, সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নেই। গত সোমবার রাজ্যের মন্ত্রী যে মন্তব্য করেছেন, সংবাদে তার স্পষ্ট উল্লেখ নেই। হয়ত অত্যন্ত কুৎসিত বলে ছাপা হয়নি। অবশ্য ইতিপূর্বে কয়েক বছর আগে একজন বিধানসভার সদস্য, যিনি আজ দলতন্ত্রের দৌলতে একটী মন্ত্রীর পদ দখল করে আছেন, তর্কবিতর্কের সময় অন্য একজন সদস্যের 'জিব টেনে ছিঁড়ে ফেলব' বলে হুমকি দিয়েছিলেন। সমাজ বা রাষ্ট্রের উঁচু পদে যাঁরা জনগণকে প্রতিশ্রুতি দিয়ে থাকেন, তাঁদের আচার-আচরণ যাতে ভদ্রজনোচিত হয়, অন্যের বিশেষ করে ছাত্র ও যুবকদের অনুকরণযোগ্য হয়, এটা তাঁদের অবশ্য করণীয় এবং এ সম্বন্ধে সদাসর্বদা তাঁদের অবহিত মনোযোগী থাকা উচিত। অন্যথায় তাদের উপর মানুষের শ্রদ্ধা থাকে না এবং তাঁদের অনুকরণ করে অল্পবয়সীরা শালীনতাবোধ হারিয়ে ফেলে। তা ভিন্ন, যে মন্তব্যের সমর্থনে এইসব বক্তারা অভদ্র ভাষা ব্যবহার করেন, সেই বক্তব্য বিষয়ের সমর্থন লাভ করাও সম্ভব হয় না। 'আপনি আচরি ধর্ম, জীবেরে শেখায়' বলে যে নীতিবাক্য যুগ যুগ ধরে এদেশের বহু মনীষী ও মহামানবেরা প্রচার করে গিয়েছেন ও নিজেদের জীবন ও বাণীর মাধ্যমে তার উজ্জ্বলতম স্বাক্ষর রেখে গিয়েছেন, তাকে হয়ত বুর্জোয়াদের প্রচারিত নীতি বাক্য বলে এঁরা উপহাস করবেন, কিন্তু তার দ্বারা এই নীতিবাক্যের মূলকে অবনমন করা সম্ভব হবে না। এই নজীর ও দৃষ্টান্ত যদি অন্যরা গ্রহণ করেন, তবে এঁদেরও কালক্রমে এমন সব বিশেষণে বিবেশিত হতে হবে, যেটা আদৌ শ্রুতি মধুর হবে না। এঁরা নিজেদের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে নিজ দায়িত্বে উদাসীন থাকবেন কিনা সেটা এঁদেরই বিচার্য। কিন্তু জনসাধারণের আপত্তি এই হেতু যে দেশের মধ্যে অস্বাস্থ্যকর রুচি বিগর্হিত, পুতিগন্ধময় একটা আবহাওয়ার সৃষ্টি হবে, যার ফলে সুপ্রাচীন ও বিশেষ ঐতিহ্যপূর্ণ এই দেশের, বিশেষ করে ভারতের নবজাগরণের অগ্রপথিক, বাংলা দেশের ভাবমূর্তি কলঙ্ক মলিন হবে। দুই-একটী উদাহরণ উল্লেখ করলে অপ্রাসঙ্গিক ত হবেই না, বরং চিত্রটা আরো পরিস্ফুট হয়ে উঠবে।

পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষানীতি নিয়ে এই রাজ্যের মধ্যে একটা সঙ্ঘবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তুলেছেন আজীবন শিক্ষাব্রতী, জ্ঞানী গুণী মানুষ, ছাত্র যুবকেরা। প্রাথমিক স্তরে বাংলা ভাষার মাধ্যমে শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করা হবে কিনা, মাতৃভাষায় শিক্ষাদান করা হবে কিনা, এ নিয়ে চিন্তাশীল দেশী বিদেশী পণ্ডিতজনদের মত পার্থক্য আছে এবং থাকতেও পারে। ইংরাজী ভাষাকে প্রাথমিক স্তরে তুলে দেওয়া উচিৎ কি অনুচিত সে সম্বন্ধেও মত পার্থক্য থাকতে পারে। কিন্তু এক পক্ষের যুক্তির বিরুদ্ধে যুক্তি দিয়ে মত খণ্ডন করার চেষ্টা না করে ব্যক্তিগত ভিত্তিহীন ও অভদ্র ভাষা প্রয়োগ করলে নিজেদের দুর্বলতাই প্রকাশ পায়

অত্যন্ত ক্ষোভের কথা, লজ্জার কথা, পশ্চিমবাংলার মত রাজ্যে যেখানে বহু মনীষী জন্মগ্রহণ করেছিলেন যাঁরা শুধু নিজেদের জন্মভূমিই নয়, সারা বিশ্বের জ্ঞান ভাণ্ডারে বিশেষ অবদান রেখে গিয়েছেন, সেই রাজ্যের বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী একের পর একটি করে কটূকাটব্য করছেন। তৃতীয় শ্রেণীর উপযুক্ত গালিগালাজ করছেন। চীনে ইংরেজী বর্জন করা হয়েছে কিনা প্রকাশ্য জনসভায় উৎপল দত্ত নামক একটী লোককে জিজ্ঞাসা করলেন যে তাঁর মতামত কি চীন দেশ সম্পর্কে। এটা ত ভাড়ামির পর্যায়ে পড়ে বলে অনেকে মনে করেন। ভূতপূর্ব প্রধান বিচারপতি রাশিয়াতে ইংরেজী চালু আছে এই মত প্রকাশ করছেন বলে, শ্রীমিত্র কবে রাশিয়ার বিরুদ্ধে কথা বলেছিলেন বলে কি তার মত খণ্ডন করা যায়? যুক্তির বিরুদ্ধে যুক্তি না দিয়ে, ব্যক্তিগত কুৎসা রটনা করা কোন ভদ্র সমাজে চালু আছে বলে আমরা মনে করিনা।

বর্তমান সরকারের ভুলে যাওয়া উচিৎ নয়, শুধু প্রাথমিক স্তরে ইংরেজী তুলে দেবার প্রশ্নেই জনমত সোচ্চার হয়ে ওঠেনি। জনগণে ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে তাঁদের গোটা রাজনীতির বিরুদ্ধেই। তাঁরা ভারতের প্রাচীন ঐতিহ্যকে বিসর্জন দিয়ে বিশেষ রাজনৈতিক উদ্দেশ্য নিয়েই শিক্ষাব্যবস্থাকে ঢেলে সাজাবার হীন প্রচেষ্টায় ব্রতী হয়েছেন, অবশ্য এঁরা যে-রাজনৈতিক মতবাদের সমর্থক, তাতে এঁদের পিতৃভূমির সব কিছুই নিন্দার্হ। যে রবীন্দ্রনাথ সারা বিশ্বে তাঁর জীবন দর্শন, সাহিত্য, মানবপ্রেম ও অন্যান্য বহু সদগুণাবলীর জন্য আজও সম্মানিত, শ্রদ্ধেয় ও মহামানব বলে স্বীকৃত, সেই রবীন্দ্রনাথকে এই শতাব্দীর চল্লিশের দশক পর্যন্ত এঁরা কোন আমলই দেননি, 'বুর্জোয়া' কবি বলে। বুলগানিন ও ক্রুশ্চেভ রবীন্দ্রনাথকে শ্রদ্ধা জানাবার জন্য যখন তাঁর পৈত্রিক বাসস্থানে গমন করেন ও তাঁর উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন, তখন থেকে অবশ্য এই নিন্দুকেরা তাঁর বিরুদ্ধে অপপ্রচারে ক্ষান্ত হন। আর এখানকার মুখ্যমন্ত্রী নিজেকে জাহির করছেন রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে তাঁর জ্ঞান, ডাঃ সুকুমার সেন, ডাঃ নীহার রঞ্জন রায়, প্রথম বিশী, অন্নদাশঙ্কর রায় মহাশয়ের থেকেও গভীর। কিন্তু তাঁর কথাবার্তায়, চালচলনে এটাই প্রতীয়মান হয় যে তিনি রবীন্দ্রনাথকে কিছুই বুঝতে পারেন নি। পারলে অন্ততঃ সৌজন্যতাবোধের এমন অভাব ঘটতে পারে না। যাহোক, বর্তমান সরকারের শিক্ষানীতি হচ্ছে এমন পাঠ্যক্রম প্রণয়ন করা, এমন পাঠ্যপুস্তক তৈরী ও প্রচলন করা যার দ্বারা বিদ্যালাভ হোক বা না হোক, একদল মগজহীন, বশংবদ তৈরী করা যায়। যে কাজীদের জন্য এঁরা দরদ দেখাচ্ছেন, সেই বাংলা ভাষাকে এঁরা কোন মর্যাদায় স্থান দিয়েছেন দ্বিতীয় স্তরে Compulsory optional সোনার পিতলের বাটির বিষয় করে? ইংরেজী ও সংস্কৃত ভাষা বাংলা ভাষা শিক্ষার পরিপূরক। দুইটিকেই বিসর্জন দিয়েছেন কোন যুক্তিতে? আর যুক্তি দিতে পারছেন না বলে ব্যঙ্গবিদ্রুপ গালিগালাজ ও শ্রদ্ধেয়জনদের চরিত্র হনন করার কাজে ব্যাপৃত হয়েছেন। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে যদি অনুসরণ করে কেউ তাঁরই মুদ্রায় তাঁর পাওনা মিটিয়ে দেবার ব্যবস্থা করে, তখন অবস্থাটা কি হবে একটু ভেবে দেখলে তিনি নিজেরই হিতসাধন করবেন।

পশ্চিমদিনাজপুরে বন্দুক লুট কারা করল ?

: কালীপদ সরকার :

গত ফেব্রুয়ারী শেষ সপ্তাহে পশ্চিম দিনাজপুর জেলার ইটাহার, বংশীহারী এবং কুশমণ্ডী থানার অন্তর্গত কয়েকটি গ্রাম থেকে একদল সশস্ত্র লোক ৬৭টি বন্দুক লুট করে নিয়ে গেছে। দুটি ক্ষেত্র ছাড়া কোথাও লুণ্ঠনকারীরা প্রতিরোধের সম্মুখীন হয়নি। হামলায় নিহত হয়েছে একজন বন্দুক মালিক এবং আহত হয়েছে চারজন গ্রামবাসী। যাদের বন্দুক খোয়া গেছে, তারা নিজেরা পুলিশ অথবা স্থানীয় কর্তৃপক্ষের কাছে সে-খবর দেয়নি। বন্দুক ছিনতাই-কারীদের খোঁজে পুলিশ যে তদন্ত শুরু করেছে তার সঙ্গে সহযোগিতা করছে না বন্দুকের মালিক ও গ্রামবাসী।

বন্দুক লুট হয়েছে ৪০ বর্গ কিলোমিটার পরিমিত একটি ক্ষুদ্র এলাকায়। লুটের সংখ্যা সরকারী হিসাব মত ৬৭, কিন্তু প্রকৃত সংখ্যা নাকি ৯১। ৯২। এ পর্যন্ত নাকি লুণ্ঠিত বন্দুকগুলির মধ্যে উদ্ধার হয়েছে মাত্র ৪টি। একটা ক্ষুদ্র পরিমিত স্থানে পর পর কদিন ধরে বন্দুক লুট হল, পুলিশ কোন বাধা দিল না, বন্দুকের লাইসেন্সধারীরা থানায় গিয়ে এজাহার দিতে দোনামোনা করল, এমন কি সশস্ত্র পুলিশ ক্যাম্প বসানর পরেও বন্দুক লুট হল। ব্যাপারটা রীতিমত গোলমেলে।

যে অঞ্চলটিতে বন্দুকগুলি খোঁয়া গেল তার গ্রাম ও অঞ্চল পঞ্চায়েতগুলি প্রধানতঃ বামফ্রন্ট সমর্থকদের দখলে। বন্দুক যাদের বেহাত হয়েছে তাদের প্রায় সকলেই সম্পন্ন কৃষক এবং দল নিরপেক্ষ ব্যক্তি। যে ৬৭টি বন্দুক উধাও হয়েছে তার ৪৮টিই ইটাহারের। আবার ইটাহারের হারানো বন্দুকের সব কটিই গিয়েছে পরিরাজপুর ও সৈয়দপুর এই দুইটি অঞ্চল থেকে। দুটি অঞ্চলের একজন সি: পি, এমের।

কুশমণ্ডী থানার ৫নং অঞ্চলের একজন সি, পি, এম ক্যাডারের বন্দুক আছে। ঘটনার ঠিক আগের দিন তিনি তার বন্দুকটি মেরামতির জন্য দোকানে দিয়ে কলিকাতায় চলে যান মিটিং করতে। পরদিনই বন্দুক ছিনতাই শুরু হল। পাশের ৬নং অঞ্চল প্রধান কংগ্রেসের সমর্থক। তার বন্দুকটি গেল। অথচ ৫নং অঞ্চলের আর-এস-পি প্রধানের বন্দুক ছিনতাই হল না। পরে তা থানায় জমা পড়ল এবং সি, পি, এম ক্যাডারের বন্দুকটি এস-ডি ও এসে দোকান থেকে নিয়ে গেলেন। এরা এদের বন্দুক ফেরৎ পাবে। যাদের বন্দুক খোঁয়া গেছে তারা পাবেন না। তাদের লাইসেন্স বাতিল। এ খবর দৈনিক প্রকাশিত হয়েছে এবং মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন।

অকুস্থলের পাশেই মালদা জেলার নাজোল, হরিশ্চন্দ্রপুর ও বামনগোলা থানা। স্থানটি বাংলা-দেশ ও বিহার সংলগ্ন এবং কিছুটা দুর্গম। তল্লাসির সময় পুলিশ কিছু প্রচার পত্র পেয়েছে তাতে নাকি নকসালবাড়ী, শ্রীকাকুলাম ও ভোজপুর আন্দোলনের প্রশস্তি এবং চীন কমিউনিষ্ট নেতা লিন পিয়াওয়ের উক্তি আছে। প্রচার পত্রে নাকি বলা হয়েছে যে,

ভারতের পরিস্থিতি বিপ্লবের জন্য তৈরী। গ্রামে গ্রামে ঘাঁটি গড়ে তুলে বিপ্লবের মতাদর্শ প্রচার, শ্রেণীশত্রু খতম ও সশস্ত্র গেরিলা যুদ্ধ আরম্ভের সুযোগ এসেছে। প্রচার পত্রে কোন রাজনৈতিক দলের নাম আছে কিনা জানা যায় নি, তবে স্বাক্ষরকারীদের যে নাম আছে তা ছদ্মনাম! এটিও বেশ রহস্যময়।

সংবাদপত্রে প্রকাশ যে লুণ্ঠনকালে হামলাকারীরা 'নকসালবাড়ী জিন্দাবাদ' ধ্বনি দিয়েছিল। তারা তখন বন্দুক মালিকদের আর কি বলে ছিল যার জন্য তারা দিনাধাধার সুড়সুড় করে বন্দুকগুলি ছিনতাইকারীদের হাতে তুলে দিয়েছিল তা এখনো অপ্রকাশিত। ছিনতাইকারীদের তারা চেনে কিনা তাও জানা সম্ভব হয়নি। কারণ বন্দুকের মালিক এবং সাধারণ গ্রামবাসী ভয়ে মুখ খুলতে নারাজ। তারা প্রশাসন ও পুলিশের উপর আস্থা রাখতে পারছে না। দেশে সন্ত্রাসের রাজত্ব কত চরমে উঠলে জনসাধারণের মনোবল এমন শোচনীয় ভাবে ভেঙ্গে যেতে পারে অবস্থাটি তারই একটি সুস্পষ্ট দৃষ্টান্ত।

পশ্চিমবাংলার মুখ্যমন্ত্রী স্থানীয় পুলিশের নিষ্ক্রিয়তার কথা বলেছেন,। 'যুক্তফ্রন্ট সরকার রাজ্য পুলিশের মনোবল নষ্ট করেছেন এবং পুলিশের নিষ্ক্রিয়তার জন্য দায়ী'—এ অভিযোগ বহুজনের এবং বার বার ধ্বনিত। অবশ্য প্রতিকার কিছু হয়েছে কি?

ত্রিপুরার গণহত্যা ও নারকীয় ধ্বংসকাণ্ডের আগে কিছু পুলিশ বন্দুক ও গুলী সমেত ব্যারাক ছেড়ে উধাও হয়েছিল। ত্রিপুরা সরকার সে বিষয়ে সতর্কতা অবলম্বন করেন নি। পশ্চিম দিনাজপুরের বন্দুক লুট তেমন একটা অনর্থপাতের পূর্ব প্রস্তুতি কিনা কে জানে?

বন্দুক ছিনতাই সম্পর্কে এ পর্যন্ত ৩৭ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে তাদের পরিচয় অবিদিত। তাদের জবানবন্দীতে কি তথ্য উদঘাটিত হয়েছে তা এখন সাধারণের জানার কথা নয়। বন্দুক লুটের ঘটনার সহিত নকসালপন্থীরা জড়িত বলে যে প্রচার হচ্ছে তা একান্ত ভাবে অনুমান নির্ভর। অপর কমিউনিস্ট দলের উগ্রপন্থীরা এর পিছনে আছে কিনা তাই বা কে বলতে পারে। তবে অবস্থাটা নিঃসন্দেহে আশংকা জনক এবং রাজ্যের আইন শৃঙ্খলার গুরুতর ব্যর্থতা প্রমাণ করে।

নকসালপন্থীরা সি, পি, আই (এম এল) দল ভুক্ত। এই দল সি, পি, আই (এম) এর দলছুট উগ্রপন্থীদের দ্বারা গঠিত এবং তাদের উদ্ভবও ১৯৬৭ সালের সি, পি, আই (এম) প্রভাবিত যুক্তফ্রন্ট সরকারের শাসনকালে। ত্রিপুরা, তেলেঙ্গনা ও কাকদ্বীপ অভ্যুত্থানের ব্যর্থতার পর, কমিউনিস্টদল যখন গণতান্ত্রিক পন্থায় ক্ষমতা দখল এবং ক্ষমতায় বসে ভিতর থেকে গণতন্ত্র ধ্বংস এবং দলীয় একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠার কৌশল গ্রহণ করে তখন থেকেই উগ্রপন্থী কমিউনিষ্টরা বিকল্প পন্থার অনুশীলনে তৎপর হয়। প্রয়াত চারু মজুমদার ছিলেন তাদের নায়ক। নকসাল আন্দোলন বহু প্রতিভাবান তরুণকে প্রভাবিত করেছিল। তাঁদের নিষ্ঠা, সাহস, আদর্শবাদ এবং আত্মত্যাগ নকসাল আন্দোলনের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করলেও, দূরদৃষ্টি ও ইতিহাসের শিক্ষার অনবহিত নেতৃত্বের কারণে সহস্রাধিক তরুণ বিপ্লবীর আত্মবিসর্জন জনমনে স্থায়ী প্রভাব রাখতে ব্যর্থ হয়।

এই ব্যর্থতার পর সি. পি. আই (এম. এল) গোষ্ঠীতে ভাগ হয়ে যায় এবং কোন কোন গোষ্ঠী সি. পি. আই ও সি. পি. আই (এম)-এর ন্যায়

গণতান্ত্রিক পন্থাকে ক্ষমতা দখলের হাতিয়ার করার নীতি গ্রহণ করে। পশ্চিম দিনাজপুরে বন্দুক লুটের পিছনে নকসাল তৎপরতার যে তথ্য প্রচার করা হচ্ছে তাতে নকসালদের কোন গোষ্ঠী সক্রিয় সে কথা কিন্তু বলা হয় নি। বিষয়টি তদন্ত সাপেক্ষ তাই মন্তব্য করা অযৌক্তিক।

বিপ্লব বাইরে থেকে আমদানী করা তখনই সম্ভব যখন তার পিছনে থাকে বাইরের সশস্ত্র হস্তক্ষেপের নিশ্চয়তা। আভ্যন্তরীণ কারণে বিপ্লব ঘটে প্রশাসনিক অরাজকতা এবং সেনা বাহিনীর বিদ্রোহকে কেন্দ্র করে। ভারতের রাজনৈতিক পরিস্থিতি এ দুটি কারণের কোনটিরই অনুকূল নয়, পক্ষান্তরে ভারত এক দৃঢ় ও শক্তিশালী প্রশাসনের আশ্রয়ে অলক্ষ্যে জাতীয় বিপ্লবের পথে দ্রুত এগিয়ে চলেছে। শিল্প কৃষি শিক্ষা সংস্কৃতি এবং সামাজিক জীবনে এই বিপ্লবের ছাপ প্রতিনিয়তই উপলব্ধি হচ্ছে। হানাহানি, খুনোখুনি এবং ঘর জ্বালানি দিয়ে কর্মকাণ্ড না করলে বিপ্লব হবে না, এ ধারণা সত্য নয়।

বিপ্লব মানে বিরাট পরিবর্তন অহিংস গণতান্ত্রিক পথেও সম্ভব এবং গণতান্ত্রিক পথে যে বিপ্লব অর্জিত হয় তার গভীরতা ও স্থিতিশীলতাও অধিক। কারণ জীবনের ধর্ম সমন্বয়, মানব সভ্যতার অন্তর্নিহিত শক্তি সহমর্মিতা এবং বিবর্তন সৃজনশীল প্রেরণা বাহিত। অবশ্য শ্রেণী সংগ্রামের নব ইহুদী তত্ত্বে যারা দীক্ষা নিয়েছে তাদের কথা স্বতন্ত্র। এদের সম্পর্কে দেশ বাসীর সতর্ক হবার সময় এসে গেছে। দেশ সশস্ত্র বিপ্লবের পথে যেতে চায় না জেনে শুনেও, যারা বিক্ষোভ বন্ধ ও হামলার দ্বারা জন জীবনকে বিপর্যস্ত করতে সচেষ্ট, ক্রমাগত অবরোধ, ধর্মঘট ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে উৎপাদন ও বিকাশের পথে বাধা জন্মায় এবং শ্রেণী সংগ্রামের উস্কানি দিয়ে গৃহবিবাদ বাধিয়ে তুলতে চায় তারা কি দেশের শত্রু নয়? যারা শ্রেণী সংগ্রাম ওয়ালাদের নেতৃত্ব করেন তারা সমাজের কোন শ্রেণীর মানুষ, তাদের জীবন ধারণ মানই বা কোন ধরণের জনসাধারণকে তার বিচার অবশ্যই করতে হবে। তাহলে দরিদ্র ও সর্বহারা মানুষের তথাকথিত বহু নেতার ভাঁওতবাজি সহজেই ধরা পড়বে।

পৃথিবীর বিভিন্ন রাষ্ট্রে স্থিতিশীলতা ও শান্তির পরিবেশ ধ্বংসের একাধিক আন্তর্জাতিক চক্র যে সক্রিয়, সে খবর সকলেই জানে। ভারতের উন্নতি ও স্বনির্ভরতা লাভ কোন কোন রাষ্ট্রের দৃষ্টিতে প্রশংসার বস্তু তো নয়ই বরং অবাঞ্ছিত। সুতরাং ভারতের অভ্যন্তরে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির পিছনে আন্তর্জাতিক চক্র কলকাঠি নাড়ছে কিনা বলা শক্ত। বন্দুক লুটের পরবর্তী অধ্যায় কি হতে পারে তা ভেবে অনেকের মনে এরূপ একটি চক্রান্তের ধারণাও দেখা দিয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন, বন্দুকগুলি সম্ভবতঃ মালদা জেলার গোপন ঘাঁটিতে পাচার করা হয়েছে এবং সেজন্য পশ্চিম দিনাজপুর ও মালদা জেলার পুলিসকে একযোগে তল্লাসি অভিযান চালাবার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। পুলিসের খাতায় সমাজবিরোধী এবং রাজনৈতিক উগ্রপন্থীদের নাম ঠিকানা এবং গোপন ঘাঁটির খবর না থাকার কথা নয়। আশা করা যায় যে অনতিবিলম্বে পুলিস বন্দুকগুলি উদ্ধার করতে সমর্থ হবে, নতুবা স্বাভাবিক কারণেই জন সাধারণ সন্দেহ করবে—পাইকারী ভাবে এই বন্দুক লুটের সহিত বামফ্রন্ট রাজনীতি ও রাজ্য পুলিশের স্থানীয় কর্তাদের অবশ্য যোগাযোগ আছে। জন সাধারণ জানতে চায় বন্দুক লুট কারা করেছে।

চিঠিপত্র

মহাশয়,

আপনার বহুল প্রচারিত 'বিপ্লবী বাংলার' গত ২১শে ফেব্রুয়ারীর সংখ্যা আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। এই সংখ্যায় প্রকাশিত আমার প্রয়াত পিতা ৺ক্ষিতীশচন্দ্র দাস মহাশয়ের প্রতি যে সম্মান প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহার জন্য আপনাদের প্রতি আমাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি।

তবু, কিছু তথ্য আপনাদের বিদগ্ধ পাঠকের জ্ঞাতার্থে নিম্নে সংযোজন করিলাম। প্রয়োজনবোধে প্রকাশ করিতে পারেন।

(১) বিপ্লবী মহানায়ক রাসবিহারীর জীবনী নিয়ে প্রথম 'ট্ গ্রেট ইণ্ডিয়ান ইন জার্নাল' প্রকাশ করেন।

(২) তারপর মহানায়কের জীবনী বাংলা, হিন্দী ভাষায় প্রকাশ করেন।

(৩) বাঙ্গালোর থেকে কানাড়ী ভাষায় একখানা বই প্রকাশ করেন।

(৪) ৺সাবিত্রী প্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় ও রাধানাথ রথ মহাশয়ের সম্পাদনায়, 'Rash Behari Basu's life and his Struggles in Indian Independence' প্রকাশ করেন।

(৫) ১৯৬০ সালে জাপ যুবরাজের ভারত ভ্রমণকালে প্রয়াত রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্র প্রসাদের আমন্ত্রণে সম্বর্ধনা সভায় যোগদান করেন—নতুন দিল্লীর মোগল গার্ডেনসে।

(৬) ১৯৭০ সাল থেকে ১৯৭৭ সাল পর্যন্ত কানকাস (আমেরিকা) বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের সহিত যোগদান করেন।

উপোরক্ত তথ্য ছাড়াও ১৯৭০ সালে ২০শে মে মহানায়ক রাসবিহারীর সম্বন্ধে বেতার ভাষণ দেন। কলিকাতা বেতার কেন্দ্র থেকে। ১৯৭৭ ৪ঠা জুলাই 'ক্ষমতা হস্তান্তর' (রাসবিহারী বসু কর্তৃক নেতাজী সুভাষচন্দ্র নিকর্ষ) দিবস উপলক্ষে কলিকাতা বেতার কেন্দ্র থেকে বেতার ভাষণ দেন।

পঃ বঙ্গ সরকার যে পূর্ণাঙ্গব মূর্তি স্থাপনের সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন এবং সে প্রতিকৃতির উপর ভিত্তি স্থাপন করে, কৃষ্ণনগরের কার্তিক পালের উপর মূর্তি স্থাপনের ভার অর্পন করেন, সেই প্রতিকৃতিও প্রয়াত ক্ষিতীশচন্দ্র দাস মহাশয়ের প্রকাশিত পুস্তত হইতে গৃহীত হয়।

ইতি—

বিনীত

শ্রীমাখনলাল দাশ

উৎপাদন বৃদ্ধি ব্যতিত মুদ্রাস্ফীতি রোধ অসম্ভব

বংশীধর বন্দ্যোপাধ্যায়

কেবলমাত্র ভারতেই নয় পৃথিবীর অন্যান্য দেশেও মুদ্রাস্ফীতি অধুনা বিদ্যমান। এমনকি বহু উন্নত দেশেও মুদ্রাস্ফীতির প্রবণতা বর্তমান দেখা যায়। ভারত একটি উন্নয়নশীল দেশ এবং যেকোনও উন্নয়নশীল দেশ প্রাথমিক স্তরে শত প্রচেষ্টা সত্বেও মুদ্রাস্ফীতির প্রবণতা এড়াতে পারে না। উক্ত কারণে ভারতে পাঁচশালা পরিকল্পনা রচনা ও সেই পরিকল্পনাকে রূপদানের সময় থেকেই মুদ্রাস্ফীতির প্রবণতা দেখা যায়। বর্তমানে কেন্দ্রীয় সরকার মুদ্রাস্ফীতিকে সীমিত করার কাজে বহু উপায় উদ্ভাবনেও নানারকম কার্যকরী পন্থা গ্রহণে তৎপর দেখা যায়। প্ল্যানিং কমিশন মুদ্রাস্ফীতি রোধের জন্য সকল সম্ভাব্য প্রচেষ্টা চালাতে বদ্ধপরিকর। সরকারও বিশেষ সচেতন ঐ ব্যাপারে।

তবুও এদেশে মুদ্রাস্ফীতির ঝোঁক বাড়তির পথে। তাকে রোধ করা সম্ভব হয়নি এখনো, বরং তা দিন দিন বেড়েই চলছে। ফলে টাকার মূল্যমান কমতে কমতে কোথায় এসে দাঁড়িয়েছে তা ভাবলেও সঠিক ভাবে নির্দ্ধারণ করলে মন স্বতই বিষন্ন হয়। আধুনিক এক টাকার মূল্য প্রায় চার নয়া পয়সার সমতুল্য অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছে, ১৯৩৯ সালের মূল্যমানের হিসাবে। লোকে বলে যে, জিনিস পত্রের দাম অত্যন্ত বেশী বেড়েছে, চাই কি তা আকাশ ছোঁয়া বললে অত্যুক্তি হবে না। এর আসল কারণ হচ্ছে যে, টাকার মূল্যমান কমেছে, আর মুদ্রাস্ফীতি এর মূলে।

দেশে মুদ্রাস্ফীতি ঘটলেই এরূপ অবস্থা হয়। এর প্রতিকারের পথ কি? পথ অনেক, কিন্তু বড়ই কঠিন। দেশের কৃষিক্ষেত্রে, শ্রমশিল্পে, খনিজদ্রব্য আহরণে ও প্রতিটি কর্মোদ্যোগের ক্ষেত্রে উৎপাদন মাত্রা ক্রমান্বয়ে বর্দ্ধিত করে চলতে হবে। উৎপাদনের হার যত অধিক মাত্রায় বর্দ্ধিত হবে, শ্রমশিল্পে, খনিজ দ্রব্য উত্তোলনে, বিভিন্ন কর্মোদ্যোগে এমন কি খেতে খামারে পর্য্যন্ত এক কথায় সর্ব্বোদ্যোগে উৎপাদনের হার উল্লেখযোগ্য পর্য্যায়ে মোটেই বাড়েনি। অপর পক্ষে দেখা যায় শ্রমশিল্পে সংগঠিত শ্রমিক সংস্থা অর্থাৎ ট্রেড ইউনিয়নগুলি কেবল শ্রমিকদের জন্য বেতন ও নানাধরণের ভাতা বাড়াবার ও শ্রমজীবিদের ব্যক্তিগত সুখ-সুবিধা বাড়াবার জন্য সদা ব্যস্ত, কিন্তু উৎপাদন বাড়াবার কথা শ্রমিকনেতারা ভুলেও বলেন না।

শ্রমিক নেতাদের মধ্যে অনেকেই শিল্পের ক্ষতি সাধন করেও শ্রমিক মঙ্গলের চিন্তায় মশগুল থাকেন অবাস্তব ও অদ্ভুত সব ধারণার বশবর্ত্তী হয়ে। শ্রমিক মঙ্গল করার সদিচ্ছা নিয়ে অগ্রসর হওয়ার পথে অনেক নেতাই কিন্তু নিজের ভুলে অথবা আত্মস্বার্থ সংরক্ষণের তাগীদে দেশেরও শিল্পের ক্ষতি অর্থাৎ উৎপাদন ব্যাহত করে বসেন। যে ক্ষতি শুধু শিল্পের নয়, আসলে তা জাতীর ক্ষতিও বটে, কারণ উৎপাদন ব্যাহত হলে জিনিসের দাম বাড়ে এবং সাধারণ ক্রেতার ক্রয়ক্ষমতার উর্দ্ধে তা থাকে। ফলে শ্রমিকরাও পরিশেষে তার কুফলের ভাগীদার হতে বাধ্য

হয় নিজের অজ্ঞাতসারে। ভারতে ট্রেড ইউনিয়ন সংস্থাগুলি জাতীয় লাভ ক্ষতির কথা একেবারেই চিন্তা করে না, তা যদি করতো, তবে দিনের পর দিন প্রত্যাত শিল্প সংস্থাগুলি এভাবে ধর্মঘটের বা লক্‌আউটের ফলে উচ্ছন্নে যেত না এবং তথায় কর্মরত এক বিরাট সংখ্যক শ্রমিক ভাইয়েরা আকস্মিকভাবে কর্মহীন বেকারে পরিণত হতো না। কি শ্রমশিল্পে, কি খনিজ উত্তোলনে, কি বিভিন্ন কর্মোদ্যোগে, কি কৃষিক্ষেত্রে সর্বত্রই উৎপাদন মাত্রাতিরিক্ত হারে নিম্নমুখী হচ্ছে শ্রমিকনেতাদের স্বেচ্ছাচারের ফলে। শ্রমশিল্পে শ্রমিক বিরোধ ও অশান্তি প্রতিনিয়ত লেগেই আছে এবং এর কারণ জাতীয় চেতনার অভাব সর্বত্র বিদ্যমান।

এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে বিচার বিবেচনা করে দেখলে বোঝা যায় যে, ট্রেড ইউনিয়ন আইনগুলির প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে যথাসম্ভব সংস্কার, সংশোধন ও নূতনভাবে পত্তন একান্ত আবশ্যকীয়, জাতীয় স্বার্থে ও মুদ্রাস্ফীতি রোধে। মুদ্রাস্ফীতির শিকার দেশের জনগণ মায় সরকারও। কাজেই মুদ্রাস্ফীতি রোধের একান্ত প্রয়োজনে কেন্দ্রীয় সরকারকেই শ্রম আইন নূতন দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে জাতীয় স্বার্থে সত্বর প্রণয়ন ও তা কার্যকরী করতেই হবে।

কৃষিক্ষেত্রেও আজকাল ক্ষেতমজুর বা কৃষকরা সংগঠিত সংস্থার আওতায় এসে কাজে গাফিলতি বা ফাঁকি দিতে শিখেছে কিষণনেতাদের প্ররোচনায় পড়ে। কৃষিক্ষেত্রে পূর্বের তুলনায় উৎপাদন অনেক গুণ বর্দ্ধিত হয়েছে ঠিকই, কিন্তু কৃষককুল পূর্বেরমত কঠিন শ্রমস্বীকার করলেও এর চেয়ে অনেক অধিক গুণ ফসল ফলান বাস্তবে সম্ভব হতো, কারণ বর্তমানে জমিতে সার, উন্নত মানের বীজ, উন্নত প্রথায় সেচ প্রভৃতি ব্যবস্থার পত্তনের সরকার বহুলাংশে সাহায্য করায় ফলন এমনিতেই বেড়েছে। ভূমি সংস্কার আইনের সাহায্য কৃষককুলের অতীতের অনেকখানি ক্লেশ ও গ্লানি দূরীভূত হয়েছে বর্তমানে। কৃষকগণ আরো একটু যত্নশীল হলে এবং যথোচিত কষ্ট স্বীকার করলে খেতে খামারে ফসলের ফলন আরো বেড়ে যাবে এবং তা মুদ্রাস্ফীতিরোধে সহায়ক হবে, কারণ কৃষি জাত পণ্যের মূল্যমান কমে যাবে, পড়তা খরচ কম হবার জন্যই।

কৃষিক্ষেত্রে অধিক সফল ফলাবার ব্যাপারে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারগুলির বাস্তবভিত্তিক প্রচেষ্টা সত্যই প্রশংসার দাবী রাখে। এর উপর যদি কৃষক কুল ট্রেড ইউনিয়ন নেতাদের ভাঁওতায় না ভুলে আগের মত কঠিন শ্রমস্বীকারে বর্তমানেও অভ্যস্ত থাকে, তবে বিভিন্ন রাসায়নিক ও পচা (Decomposed) সার জমিতে প্রয়োগের ফলে, উন্নতমানের বীজ বপনের ফলে, ডীপ টিউবওয়েলের দ্বারা বা স্যালোনলকূপের দ্বারা অথবা সেচ খালের জল জমিতে সময় মত সেচ দেবার ফলে নিশ্চয় আরো বেশী ফসল ফলান সম্ভব হবে।

কৃষিজাত পণ্য বিদেশের বাজারে রপ্তানী করে আরো অধিক পরিমাণে বিদেশী মুদ্রা অর্জন করা সম্ভব হবে। তাছাড়া পড়তা খরচ কম হবার ফলে বিদেশের প্রতিযোগিতামূলক বিভিন্ন বাজারে ভারতীয় কৃষিজাত পণ্যের ভাল রকম কাটতি হবার মত অবস্থার সৃষ্টি হবে, যা বর্তমান মুদ্রাস্ফীতি যুগে খুবই আকাঙ্খিত।

অনুরূপ পন্থায় যদি বিভিন্ন শ্রমশিল্পে, খনিগর্ভে ও অন্যান্য কর্মোদ্যোগে নিয়োজিত শ্রমিক ও কর্মচারীরা কাজে ফাঁকি না দিয়ে বা কর্মধারাকে স্তিমিত না করে দিয়ে যথোচিত নিষ্ঠার সঙ্গে করণীয় কাজ [illegible]

ফলে কারখানায়, খণিগর্ভে উৎপাদিত বা উত্তোলিত ও অন্যান্য কর্মকাণ্ডের প্রস্তুত দ্রব্য সামগ্রীগুলিও বিদেশের প্রতিযোগিতা মূলক বাজারে সুবিধাদরে বিক্রীত হবে বহুল পরিমানে। ফলে বিদেশী মুদ্রা অর্জনে ভারত সক্ষম হবে উল্লেখযোগ্যভাবে। বিদেশী মুদ্রা অধিক পরিমাণে অর্জনের ফলে এদেশের মুদ্রাস্ফীতির নিম্নগামী হতে শুরু হবে এবং পরিশেষে তা মুদ্রাস্ফীতির কণ্ঠ রোধেও সক্ষম হবে অনেকখানি। দেশের প্রতিটি উৎপাদন কেন্দ্রে যদি ন্যায় সঙ্গত পন্থায় উৎপাদনের হার ক্রমবর্দ্ধিত হয় ও উৎপাদিত মালের মান সঠিক ও সমাঞ্জস্যপূর্ণ হয়, তবে দেশের অভ্যন্তর ভাগে ও বহির্বাণিজ্যের ক্ষেত্রে মালের দাম নিশ্চয় উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পাবে। ফলে বহির্বাণিজ্যের ক্ষেত্রে অনেক সুবিধা হবে এবং প্রয়োজনীয় বিদেশী মুদ্রালাভের পক্ষে তা প্রকৃতই সহায়ক হবে।

ফলে মুদ্রাস্ফীতির বহু কারণের মধ্যে একটি কারণ অন্তত দূরীভূত হবে সহজেই। এদেশে সরকার পরিচালিত বা অধিকৃত শিল্প সংস্থাগুলিতে উৎপাদনের হার বর্ত্তমানে আশানুরূপ নয়, বরং তা বেশ মন্দীভূত শ্রমিক বিরোধ ও অশান্তির কারণে প্রধানত:। তাছাড়া পরিচালনার ক্ষেত্রে পরিচালকদের ত্রুটি বিচ্যুতি এর জন্য অনেকাংশে দায়ী। কিন্তু বেসরকারী শিল্পসংস্থাগুলিতে উৎপাদনের হার বর্ত্তমানে যে মারাত্মক ধরণের কম হয় তার প্রধান কারণ শ্রমিক অসন্তোষে, স্লো-ডাউন, ধর্মঘট, ঘেরাও লকআউট ইত্যাদি।

এছাড়া ঐ সব সংস্থায় সময়মত ও সঠিক প্রয়োজনমত প্রায়শ্চই কাঁচামালের যোগানের অভাব উৎপাদনকে ব্যাহত করে অযথা। এর প্রতিকার জাতীয় স্বার্থে করা অত্যাবশ্যক। ভারতের অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় পশ্চিমবঙ্গ শ্রম-বিরোধ, শ্রমিক অশান্তি, কৃষি ক্ষেত্রে দাঙ্গা-হাঙ্গামা, বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানে ঘন ঘন ধর্মঘট, ব্যাঙ্কিং ব্যবসায়ে শ্লথগতিতে কাজ ও নিয়ম মাফিক কাজ, খনিতে কম উত্তোলন, রাসায়নিক শিল্পে উৎপাদন হার স্বেচ্ছায় মন্দীভূত করণ প্রভৃতি ব্যাপার অনেক বেশী নিত্যনৈমিত্তিক সংঘটিত হচ্ছে মারাত্মক আকারে এবং তা বর্ত্তমানে মাত্রাতিরিক্ত।

সেকারণ পশ্চিমবংগ ধীরে ধীরে কি কৃষিক্ষেত্রে কি শিল্প ক্ষেত্রে সর্ব্বত্র অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় খুবই পশ্চাদপদ হয়ে পড়ছে। পশ্চিমবঙ্গের সর্বত্র কর্ত্তব্যকর্মে সীমাহীন অনিহা ও শ্লথগতি আজ এত প্রকট যে এ রাজ্যের ভবিষ্যত সত্যই ভীতিপ্রদ। রাজ্যবাসী প্রতিটি মানুষকে এখনে কর্তব্যকর্মে অবহেলা ও গাফিলতি পরিহার করে কঠিন পরিশ্রম করতেই হবে, নচেৎ আমরা সবার নিচে, সবার পিছে পড়ে যাব, নিজেদের অবিমৃষ্যকারীতায় যা আমাদের সকলেরই পক্ষে চরম ক্ষতির প্রধান কারণ হবে। এ রাজ্যের সকল প্রয়োজনীয়, বিশেষ করে নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের উৎপাদন বাড়াতেই হবে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি রোধের নিমিত্ত, অন্যথায় দ্রব্যমূল্যবৃদ্ধি উত্তরোত্তর ক্রমবর্দ্ধমান হতেই থাকবে, যা মোটেই শুভ নয়।

কাজেই সারা ভারতের সর্ব্বত্র আরো অধিক উৎপাদনের প্রয়োজন আছে মুদ্রাস্ফীতিকে সীমিত করার জন্য। অধিক উৎপাদনের দ্বারা রপ্তানী বাণিজ্য অধিক বিদেশীমুদ্রা অর্জন যেমন একদিকে একান্ত দরকার, ঠিক তেমনিই দরকার আমদানি হ্রাস, নচেৎ মুদ্রাস্ফীতি রোধ হবে কি উপায়ে? ক্রমবর্দ্ধমান উৎপাদন হার মুদ্রাস্ফীতিকে সম্পূর্ণভাবে রোধ করতে সক্ষম না হলেও, তা যে মুদ্রাস্ফীতিকে সীমিত পর্যায়ে

রেখে তার ঊর্দ্ধগতিকে রুখতে পারবে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই এবং সেটাও কম লাভ নয় বর্তমান ভারতের অর্থনীতির ক্ষেত্রে। এছাড়া ঘাটতি বাজেট (কেন্দ্রীয়) মুদ্রাস্ফীতি ঘটায়। তবুও তা জেনেও কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী ঘাটতি বাজেট লোকসভায় উত্থাপন করেন কেন - উন্নয়নশীল দেশে উন্নয়ন খাতে ও দেশরক্ষাখাতে ব্যয় উত্তরোত্তর বাড়তেই থাকে, কারণ ঐ খাতদে যা যা সামগ্রীর একান্ত প্রয়োজন তা এদেশে উৎপন্ন হয় না। ফলে বিদেশের বাজার থেকে আমদানি মারফৎ তা আনতে হয় ও বিদেশী মুদ্রায় তার মূল্য পরিশোধ করতে হয়।

এর ফলে যে মুদ্রাস্ফীতি ঘটে তা রোধ করার উপায় হচ্ছে একটাই এবং তা হচ্ছে আমদানি হ্রাস ও রপ্তানি বৃদ্ধি। কিন্তু এপেকেয় তেলের (পেট্রোল ডিজেল ও পেট্রোলিয়াম জাত দ্রব্যের) দাম দফে দফে যেরূপ বর্দ্ধীত হচ্ছে ও তার ফলে ভারত ও পৃথিবীর অন্যান্য দেশেও যে হারে বিদেশী মুদ্রার অভাব ঘটছে আমদানিকৃত ঐ তেলের দাম মেটাতে গিয়ে, তাতে মুদ্রাস্ফীতির আশংকা বাড়ছে স্বাভাবিক কারণেই। দেশের সর্বক্ষেত্রে উৎপাদন বর্দ্ধিত হলেই তবে ঐ বহির্বাণিজ্যের দেনা অধিক রপ্তানী দ্বারা পরিশোধ করার ব্যবস্থা করতে পারে সরকার এবং তার ফলে দেশের অভ্যন্তর ভাগে মুদ্রাস্ফীতির বিপদ অনেকাংশ কেটে যায়।

কেন্দ্রীয় বাজেট ঘাটতি হলে পূরণের জন্য জনগণের উপর প্রত্যক্ষ ও অপ্রত্যক্ষ করের বোঝা চাপিয়ে দিতে সরকার বাধ্য হন। যদি সরকার কর বাড়াতে না চান, তবে ঐ ঘাটতি পূরণের জন্য তখন রিজার্ভ ব্যাঙ্ককে বাড়তি নোট ছাপাতে হুকুম দিতে সরকার বাধ্য হন, কারণ উক্ত দুইটি ছাড়া আর তৃতীয় পথ কিছু নেই। বাড়তি যে নোট ছাপাতে সরকার অবস্থার চাপে পড়ে বাধ্য হন, তাহাই দেশে মুদ্রাস্ফীতি ঘটায়। ফলে জিনিস পত্রের দাম ঊর্দ্ধ-মুখী হতে বাধ্য হয়। মূল্য বৃদ্ধি রোধের একমাত্র উপায় তাই ক্ষেতে-খামারে, কলে-কারখানায় ও প্রতিটি উৎপাদনের হার বর্দ্ধীত করা একান্ত দরকার, জাতীয় স্বার্থ সংরক্ষণে ও মুদ্রাস্ফীতি রোধ অবাস্তব ও অসম্ভব ব্যাপার হবে।

●

পরলোকে প্রবীণ বিপ্লবী নরেন্দ্র চাটার্জি

অনুশীলন সমিতির প্রথম যুগের একনিষ্ঠ কর্মী ফরিদপুরের নরেন্দ্র চ্যাটার্জী ৮৮ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করেন। স্বাধীনতা সংগ্রামে তার অবদান স্মরণীয়, আমরা তাঁর অমর আত্মার শান্তি কামনা করি।

একটি যুগের অবসান

—শ্রীসতীভূষণ সেন

কলেজ জীবন শেষ করে রুজি রোজগারের আশায় তখন ঘুরে বেড়াচ্ছি। ঘাটে ঘাটে ঠোকর খেয়ে, ঠেকলাম এসে একটা অদ্ভুত দেশে। মনে হল, কে যেন গোটা শিলং সহরটা, তুলে এনে বসিয়ে দিয়েছে সাগরের উপকূলে। পাহাড় অনেক দেখেছি, সাগরও যে দেখিনি, তা নয়। কিন্তু উভয়ের এমন অপূর্ব্ব সমন্বয় ইতিপূর্ব্বে আর চোখে পড়েনি।— একটা বাড়ীও পাওয়া গেল, অল্প চেষ্টাতেই। বন্ধ হয়ে যাওয়া একটা ইস্কুলের খানিকটা অংশ ভাড়া করে, আমাদের খেলাপাতির সাবান কারখানা, পেতে বসলাম।

এখন সেটাকে 'খেলাপাতি' বলে তাচ্ছিল্য করছি, তখনকার কল্পনায় সেটাই অদৃশ্য শাখা প্রশাখা মেলে বিরাট মহীরুহে পরিণত হয়েছিল। পাড়ার প্রবীন ব্যক্তিরাও আমাদের সেই ক্ষুদ্র আয়োজনকে তুচ্ছ করেন নি। আমরা যে নিজের হাতে সাবান বানাতাম, সাইকেলে চাপিয়ে দোকানে দিয়ে আসতাম। সাবানের গুনাগুণের চেয়ে সেটা তেই তাঁরা মুগ্ধ হয়েছিলেন বেশী। নানাভাবে আমাদের সাহায্য করতেন। কৌতূহলী ছেলেরাও এগিয়ে এসেছিল। উৎসাহের অতিশয্যে, পদে পদে বাধা দিয়ে, গণ্ডগোল করে মাতিয়ে রাখত।

"এখনো কাজ করছেন? আজ যে ছুটি। অপিশ কাছারী সব ছুটি হয়ে গেছে। আজ আব্দুল করিমের বলিখেলা। দেখতে যাবেন না?"

'বলিখেলা' সে আবার কি রকমের খেলা?

'বলিখেলা জানেন না? পটিয়ার হানিফ বলি আসবে, তার সঙ্গে বলি ধরবে 'সাতকানিয়ার ইব্রিশ বলি। দু পক্ষেই অনেক লোক থাকবে। মারামারি হতে পারে'।

বলিখেলা বস্তুটি যে কি, তা বুঝি না বুঝি, বেরিয়ে পড়তে হত। ইস্কুল কলেজ, অফিস কাছারী সব যখন ছুটি দিয়েছে, তখন আর না বেরিয়ে পারা যায় না। মারামারিও হতে পারে যখন।

আমাদের কারখানার অন্য পাশে ইস্কুলের জিমনাশিয়াম। ইস্কুল বন্ধ হলেও সেটি চালু ছিল। সকালে বিকালে কয়েকজন যুবককে দেখতাম এক-সারসাইজ করতে। তাদের মধ্যে চোখে পড়েছিল অনন্তু। স্বল্প বাক, সর্ব্বদা ব্যস্ত, সুগঠিত দেহ। সব কাজেই ছেলেদের সার্দার।

পরিচয় হল যথা সময়ে। এবং পৌঁছে গেলাম একটা চক্রব্যূহের একেবারে কেন্দ্রে। —যেখান থেকে বেরিয়ে আসা কঠিন।

বাংলার বিপ্লববাদ ডিম ফুটে বাইরে এসেছিল, স্বদেশী আন্দোলনের তাপ পেয়ে। তখন সে নিতান্ত অসহায়, অতিশয় দুর্ব্বল। শক্তি নেই—সংগঠন মাত্র শুরু,—হাতিয়ারের সন্ধান চলছে। পাশে দুলছে দু চারটি সবুজ পাতার আশ্রয়। — মাথার উপরে উন্মুক্ত নীল আকাশ, অসংখ্য শুভ্র তারধারে।

মাবেই তাকে উড়তে শিখতে হবে : দুই পাখা মেলে উড়তে হবে আকাশে।— তার স্বপ্ন কি সফল হবে?

নিশ্চয়ই হবে। তবে, তার জন্য চাই সাধনা, চাই সুযোগ, চাই প্রস্তুতি। চাই উপযুক্ত পরিবেশ। শাসক সর্বদাই শাসিতের চেয়ে শক্তিমান এবং অভিশয় নিষ্ঠুর। তবু পরাধীন জাতি স্বাধীন হয়। কাজটা সহজ হয়, যখন বাইরের পরিবেশ অনুকূল হয় তখনই।— যখন শাসকজাতি কোন বৈদেশিক যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে। অন্য সময়ে তার নাগপাশ থেকে মুক্তি অসম্ভব।

সেই সুযোগ এল প্রথম মহাযুদ্ধের সময়। বাংলার বিপ্লবী গোষ্ঠীগুলি বাঘা যতীনের নেতৃত্বে সঙ্ঘবদ্ধ হল। দেখতে দেখতে বর্ষার লতার মত ফলকলিয়ে বেড়ে উঠল, শাখা প্রশাখা ছড়িয়ে দিল দেশ দেশান্তরে। খোদ জার্মানীতে প্রতিষ্ঠিত হল বার্লিন কমিটি, স্বীকৃতি লাভ করল জার্মাণ জেনারেল স্টাফের। ফোর্ট উইলিয়ামের দেশী পল্টনের সিপাহীরা বিপ্লবী নেতার নেতৃত্ব স্বীকার করল। গোপনবার্তা নিয়ে দূত চলে গেল বাটাভিয়া, অস্ত্র বোঝাই 'ম্যাভেরিক' জাহাজকে পথ চিনিয়ে আনবার জন্য। পূর্ব ভারতের উপকূলের বাড়িতে বাড়িতে সবচেয়ে হতে লাগল বিপ্লবী ক্যাডেট। — কিন্তু হায় প্রত্যাশিত 'জিয়ো আওয়ার' আর এলো না।

কেন যে এলো না তার আসল ইতিহাস কোন দিনই জানা যাবে না। কাইসার কি শেষ পর্যন্ত 'বিট্রে' করলেন? সাংহাই এর জার্মান দূতাবাস কি ম্যাভেরিকের খবরটা ব্রিটেনের কাছে বিক্রি করল? নইলে আমেরিকার চার্টার করা ম্যাভেরিক ধরা পড়ে কি করে?—

জার্মান অস্ত্র বোঝাই জাহাজ আর আসবে না, সেই নিদারুন সংবাদ যখন নেতার কাছে পৌঁছালো, তখন তিনি বালেশ্বরের উপকূলে। বনে বনে আত্মগোপন করতে করতে ক্লান্ত।— 'এর চেয়ে মৃত্যু ভালো'। সঙ্গীদের সকলকে নিয়ে সম্মুখ সমরে মৃত্যু বরণ করাই স্থির করলেন।— বাঙ্গালী বিপ্লবীর, প্রথম মুক্তি সংগ্রামে, স্তব্ধ হয়ে গেল বুড়ি বালামের তীরে।—

এর পর একটা ষ্টীম রোলার চলতে লাগল বাংলার বুকের উপর দিয়ে। যারা ধরা পড়ল, তারা মরল। যারা জালের ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে গেল, তাদেরও তাতে মারবার আয়োজন হল। সেই অত্যাচারে দেশের চেহারাই বদলে গেল। আকৃতিতে ততটা নয়, প্রকৃতিতে তার বেশী। যে সব মাথা উঁচু ছিল এতদিন, তারা সব নুইয়ে পড়ল। যারা চলতো পথের পাশ দিয়ে, সন্তর্পনে, তারা বুক ফুলিয়ে জুড়ে চলল পথের সবখানি।—সরকারি উদ্যোগে জাগিয়ে তোলা হল 'কলাবাগান ও রাজাবাজার'। কলকাতার রাজপথে, শুরু হল সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা। তারপর মহামারীর মত ছড়িয়ে পড়ল সারাদেশে।

অন্তরীক্ষে দেবতা বললেন, বৎস, হিন্দুর ঘরে যদি জন্মে থাকো, তবে এখন সরকারী চাকরীর আশা ছেড়ে দেও। দেশটা মুসলিম্ মেজরিটি, কথাটি প্রনিধান কর। দরখাস্ত নিয়ে যে আফিসেই যাবে, আগে দেখবে নাম। মুসলিম্ নয় দেখবে, আর পত্রপাঠ বিদায় করবে। তার পরেও লেগে থাকলে, তলব করবে পুলিশ রিপোর্ট। দেখবে বিপ্লবী দমনে কতটা সাহায্য করছে। যদি সাহায্য করে থাকো, তখন আর কোন যোগ্যতা না থাকলেও ঠেকে থাকবে না। কিন্তু তা না হলে, কোন আশাই

নেই।—তখন খোলা একমাত্র পথ ছোট খাট কোন স্বাধীন ব্যবসার হাড়ি ঠেলা।

চাটগাঁ সহরের দক্ষিণ গগণ জুড়ে বিশাল দৈত্যের মত দাঁড়িয়ে ছিল fairy hill। তার চূড়ায় লাল টুকটুকে কোর্ট বিল্ডিংটি দূর থেকে ভারি সুন্দর দেখাতো। পাহাড়ের উপর থেকে নীচের দৃশ্য ছিল আরও সুন্দর। পায়ের নীচ দিয়ে কর্ণফুলী বয়ে যেতো সবুজ ক্ষেতের সারির উপর, সাদা মুক্তার হারের মত। এঁকে বেঁকে মিশে গেছিল বঙ্গোপসাগরের বুকমকে বিশাল দরিয়ায়। অতীত যুগে এই পাহাড়টিই ছিল ত্রিপুরার মহারাজার রাজ্যের দক্ষিণ সীমার প্রহরী। এরই অধিকার নিয়ে কত যুদ্ধ, কত সন্ধি, কত রক্তপাতই না হয়ে গেছে! দক্ষিণ থেকে পাহাড় ডিঙ্গিয়ে এসেছেন আরাকান রাজ, সাগর বেয়ে এসেছে তার রণতরিবহর। এসেছে দরিয়ার ওপার থেকে আরব বণিক, সঙ্গে নিয়ে ইসলামের বাণী। পিছু পিছু এসেছে আরব 'মুর' দের চিরশত্রু পর্তুগীজ হার্মাদ। সকলেই চেয়েছে এই 'ফেয়ারী হিলে' শক্ত ঘাঁটি গড়তো সংঘাতের মাঝ দিয়ে মিশ্রিত হয়েছে, তিনটি মহাদেশের সভ্যতা। গড়ে তুলেছে বিচিত্র এক দেশ।

ঝড়ের দেশ চাটগাঁ। সে ঝড় শুধু মাত্র জড় প্রকৃতিকে আন্দোলিত করত না, মানব প্রকৃতিতেও তার দোলা লাগত। নইলে বি, ও, সির ধর্ম্মঘট, সেটা তো বর্ধায় হওয়ার কথা, সে কেন এসে চাটগাঁকে তোলপাড় করে? কেন আসামের বাগিচার কুলি, দলে দলে বাগান ছেড়ে চাঁদপুরের পথ ধরে? কুলিদের উপর পুলিশ জুলুমের প্রতিবাদে কেন ক্ষেপে ওঠে আসাম বেঙ্গল রেলওয়ের কর্মচারী? কেন জেনারেল ষ্ট্রাইক ঘোষিত হয়? থেমে যায় রেলের চাকা?—এবং অবশেষে পরাধীন ভারতের প্রথম Industrial strike, তবে দুর্জয় শক্তি ও অপরিসীম রাজনৈতিক সম্ভাবনা নিয়ে, রক্তচক্ষু মেলে, ঘুম ভেঙ্গে উঠে দাঁড়ায় চাটগাঁরই মাটিতে?

এই রকম একটি রাজনৈতিক অস্থিরতার সন্ধানে ছিলেন গান্ধীজি, ভারতব্যাপী অসহযোগ আন্দোলন আরম্ভ করার জন্য। তিনি একবছরে স্বাধীনতা আনবার প্রতিশ্রুতি দিলেন। ইস্কুল কলেজ বর্জ্জন করে ছেলেরা নামল পথে। কোর্ট কাছারীর মায়া কাটিয়ে বেরিয়ে এলেন আইনজীবি। চরকার গুঞ্জন উঠল ঘরে ঘরে, ছড়িয়ে পড়ল গ্রামে গঞ্জে।—আন্দোলনের চাকা দ্রুততর গতিতে আবর্ত্তিত হতে লাগল। এবং অবশেষে ঘুম ভাঙ্গলো কুম্ভকর্ণের। আগুনে বাংলার বিপ্লবী যখন নতুন পথের সন্ধান পেয়েছে, অপেক্ষা করছে নেতার আদেশ 'attack, তখনই এলো তাঁর আন্দোলন প্রত্যাহারের নির্দেশ। হিমালয় সদৃশ প্রমাদের [Blunder] জন্য প্রায়শ্চিত্ত করতে বসলেন, অনশন অবলম্বন করে। আর বিনা বিচারের বেড়াজালে বিপ্লবীদের ছেঁকে তুলল সরকার বাহাদুর।

যবনিকা উঠল ত্রিশের দশকে।—জনহীন প্রান্তর, প্রাচীন দেবী মন্দির। অমাবস্যার তিথি যখন জগৎ সংসার গ্রাস করে, মাথার উপর থেকে চন্দ্রসূর্য্য লোপ পেয়ে যায়, তখন মন্দিরের ঘন্টা বেজে ওঠে। প্রচণ্ড আলোয় রাত্রির আঁধার টলমল করে ওঠে। যাজকের কণ্ঠে ধ্বনিত হয় মহাদানের আহ্বান।

'সর্ব্বস্ব যে দান করবে সে এগিয়ে এসো!'—ভক্ত নতজানু হয়ে দেবীর চরণ স্পর্শ করে।

'তোমার বিত্ত দেশের জন্য উৎসৃষ্ট হল! তোমার কর্ম্ম দেশের জন্য উৎসৃষ্ট হল!! তোমার দেহ দেশের উৎসৃষ্ট হল!!!'

এই একটি মাত্র সমর্পণে, দূর হয়ে যায় সকল

দুর্বলতা, আগুনের তেজে আঁধার যেমন দূর হয়ে যায় বাড়ী ঘর, ইস্কুল কলেজ, পিতামাতা, সব ছাড়িয়ে ওঠে তার মহাদানের সত্য। তার মাতাল মন বলে ওঠে, এনে দেব। দেহ কিছুই নয়। কিন্তু কি করে পাব; সে কি একটা কথা? পারব পারব, সব দিতে পারব।

মানুষের এ এক অদ্ভুত ব্যাপার, একের স্বপ্ন অতি সহজে অপরের মনে সংক্রামিত হয়। একজনের আদর্শ যখন জাগে, সেই সোনার কাঠির স্পর্শে, অন্যের অন্তরের ঘুমানো আদর্শ জেগে ওঠে; এক নতুন তেজ নিয়ে। এই জাগরণই দীক্ষা। যিনি জাগিয়ে তোলেন তিনিই দীক্ষাগুরু।

ছেলেরা বেরিয়ে আসে ঘরের আশ্রয় ছেড়ে, ঝড়ের দোলায় ঘর বাঁধে। সারাদিন পড়াশোনার ভান করে। গভীর নিশিথে নিঃশব্দ পদসঞ্চারে কোথায় যায়, তারাই জানে। আইনের ধরা ছোঁয়ার বাইরে দিয়ে আসতে থাকে বিস্ত। গুপ্তচরের চোখ বাঁচিয়ে চলতে থাকে শিক্ষা। আঁধার পথে আসতে থাকে হাতিয়ার। কঠোর মন্ত্রগুপ্তির ফলে দিশে হারা হয় ডি. আই. বি। —তখন জেলা কংগ্রেসের সম্পাদক সূর্য্যসেন ইস্তাহার প্রচার করেন, তিনি আইন অমান্য আন্দোলন আরম্ভ করবেন। ভারতের পশ্চিম উপকূলে গান্ধীজি লবন সত্যাগ্রহ আরম্ভ করেছেন, তারই প্রতিধ্বনি উঠবে পূর্ব উপকূলে।

নিশ্চিন্ত হলেন পুলিশের বড়কর্তা।—এরই জন্য এত আয়োজন? এতো ড্রিল, মার্চ্চ, মিলিটারী পোষাক দল বেঁধে পাহাড়ে জঙ্গলে শিকার করে বেড়ানো? মোটর নিয়ে ছুটোছুটি? —বাঁচা গেল।

এলো ১৮ই এপ্রিল ১৯৩০ সাল। আগুনের পতাকা জ্বলে উঠল। তার দীপ্তি, তার বিচিত্র death programme, তার আধুনিক যুদ্ধের বিস্ময়কর টেকনিক, চোখের নিমেষে শত্রুকে নিরস্ত্র করে, একটা বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডের স্বাধীনতা ঘোষণা; নিঃশ্বাস রোধ করে নিল শাসকের, এবং কর্মের পরিধি ও ব্যাপকতায়, ঘটনার শৃঙ্খলা ও সম্পাদনার, সমগ্র বিশ্বের চোখ ধাঁধিয়ে দিল।

এর থেকে শিক্ষা গ্রহণ করল ইলরোপ। সমর বিজ্ঞানীরা বসে গেলেন কাগজ কলম নিয়ে, ভাবি সম্ভাবনা খুঁজতে। দশটি বছরের মধ্যে পরিবর্ত্তিত হয়ে গেল পশ্চিমী যুদ্ধবিদ্যার পুরাতন Text Book প্রকাশিত হল এক অপূর্ব্ব টেক্‌নিক। একটি দুটি Key point অধিকার করে, শত্রুর যোগাযোগ ব্যবস্থা ভণ্ডুল করে দেওয়া, যেন সে আর প্রতিরোধ করতেই সক্ষম না হয়। বিনা রক্তপাতে অধিকার করা যায়, এক একটি বিশাল রাজ্যখণ্ড।—এই নূতন রণকৌশলের উপর নির্ভর করেই হিটলারের বাহিনী জয় করে নিয়েছিল ইউরোপ।—

আর আমাদের দেশে, বিপ্লবের দীক্ষার সেই অক্ষর death programe, সেই মহাদানের প্রতিষ্ঠা ছেঁটেকেটে শোধন করে, করা হল একটা নিরামিষ লড়াইয়ের ততোধিক নিরীহ স্লোগান, করেঙ্গে-ইয়া মরেঙ্গে।

—এর পর, এই সামান্য কয়েকটা বছরের মধ্যেই,—শ্লেটের পিঠে খড়ির দাগের মত, বাংলার বিপ্লবী মুছে গেল ইতিহাসের পাতা থেকে। কত দুর্যোগের বর্ষাধারা, কত চোখের জল, কত সাফল্যের স্মৃতি ধুয়ে মুছে নিঃশেষ হয়ে গেল।

●

চট্টগ্রাম পরিষদ আয়োজিত,—
চট্টগ্রাম সশস্ত্র অভ্যুত্থানের স্বর্ণ জয়ন্তী উৎসবে পঠিত স্থান বালিগঞ্জ শিক্ষাসদন,—১২শে ফেব্রুয়ারী ১৯৮১

বিপ্লবী বাংলার মালিকানা ও অন্যান্য তথ্যের ঘোষণা

(৪নং ফর্ম ৮নং ধারা অনুযায়ী বিজ্ঞপ্তি)

প্রকাশকের স্থান — ৪, বল্লভ দাস ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৭

প্রকাশকের কাল — সাপ্তাহিক

মুদ্রকের নাম — শ্রীঅনিল কুমার সেনগুপ্ত

জাতি — ভারতীয়।

ঠিকানা — ৪, বল্লভ দাস ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৭

প্রকাশকের নাম — শ্রীঅনিল কুমার সেনগুপ্ত

জাতি — ভারতীয়

ঠিকানা — ৪, বল্লভ দাস ষ্ট্রীট কলিকাতা-৭

সম্পাদকের নাম — শ্রীশান্তি শরণ রায় চৌধুরী সম্পাদক

জাতি — ভারতীয়

ঠিকানা — ৪, বল্লভ দাস ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৭

সত্বাধিকারী "বিপ্লবী পরিষদ" ৪, বল্লভ দাস ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৭

আমি শ্রীঅনিল কুমার সেনগুপ্ত, এতদ্বারা ঘোষণা করিতেছি যে, উপরে লিখিত তথ্য সমূহ আমার বিশ্বাস ও জ্ঞান মতে সত্য।

প্রকাশকের স্বাক্ষর : শ্রীঅনিল কুমার সেনগুপ্ত

১লা মার্চ ১৯৮১

কৃষি সমাচার—

পশ্চিমবঙ্গ কৃষি তথ্য বিনোদন সংস্থার নাট্যানুষ্ঠান

গত ২৮শে ফেব্রুয়ারী ৮১ চেতলার অহীন্দ্র মঞ্চে পশ্চিমবঙ্গ কৃষি তথ্য বিনোদন সংস্থা 'কর্ণিক' নাটকটি মঞ্চস্থ করেন। কৃষিমন্ত্রী, অধিকর্তা ও সচীবের উপস্থিতিতে সংস্থার ৫ম বার্ষিক মিলনোৎসব উপলক্ষে এই নাট্যাভিনয়। অভিনয়াংশে বিভিন্ন ভূমিকায় যাঁরা দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন, তাঁদের মধ্যে সূর্যী ও লখিয়া চরিত্রে যথাক্রমে সমীর বসু ও মঞ্জুশ্রী রায় বিশেষ প্রশংসার দাবী রাখেন। এছাড়া চিদানন্দ গোস্বামী, কনককমল চ্যাটার্জী, সুকুমার দে, নিমাই মুখার্জী, সুনীল দত্ত, এবং তারাপদ রায়চৌধুরী উল্লেখযোগ্য অভিনয় করেছেন। পরিচালক হিসাবে চিন্ময় চট্টোপাধ্যায় মোটামুটি সফল কিন্তু আলোক-সম্পাত ও আবহসঙ্গীত যথাযথ হয়নি। নাটকের শেষ দৃশ্যটি দর্শকের মনে দাগ কেটেছে, এই অংশের আলোর কাজেও সুধীরানা দেখা গেছে। নাটকের আগে ইন্ডোর গেমসে কৃষি প্রতিযোগীদের পুরস্কার দেন কৃষিমন্ত্রী, সমগ্র অনুষ্ঠানটির স্মারকপত্রটি আমাদের ভাল লেগেছে।

কৃষি সাংবাদিক সংস্থা গঠিত

এগ্রিকালচারাল জার্নালিষ্ট এসোসিয়েশন নামে এই প্রথম একটি কৃষি সাংবাদিক সংস্থা গঠন করা হয়েছে। সংস্থার সভাপতি আনন্দবাজার পত্রিকার শান্তিকুমার মিত্র, সহসভাপতি যুগান্তর পত্রিকার নিরঞ্জন সেনগুপ্ত, বসুমতী পত্রিকার সমর চট্টোপাধ্যায় এবং সুভাষ রায়চৌধুরী, সম্পাদক বরুণ মাইতি, যুগ্ম সম্পাদক মুকুল বাগচী ও কামরুদ্দীন আহমদ এবং কোষাধ্যক্ষ জ্যোতির্ময় ঘোষ।

সংস্থার পক্ষে বিজয় অধিকারী ও কনককমল চট্টোপাধ্যায় জানান যে সুস্থ সাংবাদিকতার মাধ্যমে কৃষি ও আনুসঙ্গিক বিষয়ে সার্বিক উন্নয়নের জন্য এই সংস্থা আন্তরিক প্রচেষ্টা চালাবে, কৃষি বিষয়ে যাঁরা লেখেন কেবল তাঁরাই এ সংস্থার সদস্য হতে পারবেন। সংস্থার সদর দপ্তর ৬০ এ, শ্রীঅরবিন্দ সরণী কলকাতা-৫।

	Dist—MIDNAPORE			
Das Nirod Chandra	Vill Kalikakhali		200	13 7 83
	P. O. Mathchandipur		300	1 8 80
	Dist—NADIA			
Chakraborty Smt Reba	Wd/L. Arbinda Chakraborty	100	5 3 80 to 31 7 80	
		Rs. 200		1 8 80
	Dist—MALDA			
Chandra Sudhansu Kumar	Puratali Lane, P. O. Malda		300	1 8 80
	Dist—WEST DINAJPUR			
Mondal Promotha Nath	Subhas Colony, P. O Balurghat		300	1 8 80

পরলোকে প্রবীণ বিপ্লবী সুধাংশু ব্যানার্জী

প্রবীণ বিপ্লবী এবং অনুশীলন সমিতির একনিষ্ঠ কর্মী সুধাংশু ব্যানার্জী (টুনি) গত ৮ই মার্চ কলিকাতা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৪ বৎসর। অকৃতদার, বন্ধুবৎসল এবং স্নেহময় সুধাংশু ব্যানার্জী তাঁর মধুর ব্যবহারে পরিচিত জনের হৃদয় জয় করেছিলেন এবং তাঁর বিয়োগ বন্ধু-বর্গকে শোক স্তব্ধ করেছে।

সুধাংশুবাবুর আদি নিবাস ছিল রাজসাহী জেলায় রাজনৈতিক কর্ম জীবনের শুরুও সেখানে। বহু বৎসর তিনি কারা দুঃখ ভোগ করেছিলেন। উৎসর্গীকৃত জীবনে অবশ্য নির্যাতন ও কারাবাস বিন্দু-মাত্র ক্লান্তি ছায়া ফেলতে পারে নি। তাঁর অভাব আমরা প্রতিক্ষণ অনুভব করব এবং কোনদিন তাঁকে ভুলতে পারব না।

জীবনের শেষে মৃত্যু আছে, এ সত্যকে মেনে নিয়েও অন্তরে সান্ত্বনা মিলে না এ এমনই এক আপনজনের মৃত্যু। সুধাংশু ব্যানার্জী 'বিপ্লবী বাংলার' সহিত ঘনিষ্ট ভাবে যুক্ত ছিলেন। আমরা তাঁর আত্মার চির শান্তি কামনা করছি এবং তাঁর অমর স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করছি।

Regd. No. [illegible] 511 71
Biplabi Bangla
Phone : 34-1795
Regd. WB/NC 77
[illegible]—টাকা
বার্ষিক ১—৮.০০ টাকা
মূল্য—৩০ পয়সা

MAR 1981

বিপ্লবী পুস্তকমালা

নেতাজীর সিক্রেটসার্ভিস—ডাঃ পবিত্রমোহন রায়—৯·০০
বিপ্লবী নায়ক রাসবিহারী—সুবোধ মজুমদার
অনুশীলন সমিতির বিপ্লবী প্রচেষ্টা—ব্রজেন দাস
—ক্ষীরোদ কুমার দত্তের—

১। বাংলার অগ্নিযুগ—১·৫০, ২। অভিভারতে ভারতীয় বিপ্লব প্রচেষ্টা—৮·০০ ৩। অনুশীলন সমিতির পি, মিত্তির—২·০০, ৪। গেরিলা সংগ্রাম কাহিনী—১·০০, ৫। আন্তোরী গঙ্গোপাধ্যায়—১·২৫, ৬। কলকাতা বাজার সংগ্রাম কাহিনী—৭৫, ৭। রাসবিহারী ও অনুশীলন সমিতি—৬০ ৮। স্বামীজীর পত্রাবলী ও ভোরে—৭৫, ৯। বিবেকানন্দ ও সমাজবাদ—৮০ ১০। শিবাজী বিবেকানন্দ—৫০, ১১। মহারাজ ও সভাবচন্দ্র—৮০ ১২। ভারতের মুক্তিসংগ্রাম ও কবিনী নিবেদিতা—১·৫০, বেশ বাসের ডোজেমি (১)—১·৫০, ১৪। বেশ বাসের ডোজেমি (২)—২·০০ ১৫। শহীদ ক্ষুদিরামের আত্মকথা—৫০, ১৬। ১৯শে এপ্রিল জাতীয় শহীদ দিবস—১·০০, ১৭। হাজির হত্যা প্রচেষ্টা—১৫, ১৮। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে অনুশীলন সমিতি—৪·০০, ১৯। ভারতের জাতীয় পতাকার ইতিহাস—৪০, ২০। লাট হত্যা প্রচেষ্টা—১·৫০

প্রাপ্তিস্থান— ৪নং বঙ্কিম চাটার্জী স্ট্রীট কলিকাতা-৭০০০৭৩

চৈতালী—১৯১/১/A বঙ্কিম চাটার্জী স্ট্রীট কলিকাতা-৭৩

সম্পাদক—
শ্রীশান্তিপদ রায়চৌধুরী

॥ সম্পাদকমণ্ডলী ॥

শ্রীজগদীশ চট্টোপাধ্যায় (সভাপতি)

শ্রীভবেশচন্দ্র নন্দী
পুষ্প চ্যাটার্জী
মলয় ঘোষ

প্রকাশক ও মুদ্রক—
শ্রীঅনিল সেনগুপ্ত

দিল্লীর বিশেষ প্রতিনিধি—
শ্রীধীরেন ঘোষ

বেহালা—
শ্রীনন্দলাপাল পাল

মূল কার্যালয়—৪নং বঙ্কিম দাস ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০০৭ শ্রীঅনিল সেনগুপ্ত কর্তৃক প্রকাশিত এবং তৎকর্তৃক প্রিন্টিং পাবলিসিটি, ১১৭, কেশবচন্দ্র সেন ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০০৯ হইতে মুদ্রিত।

বিপ্লবী বাংলা

॥ বিপ্লবী পরিষদের সাপ্তাহিক মুখপত্র ॥
স্থাপিত—১৯৫৬, 'বিপ্লবী বাঙ্গালী' নবকলেবরে—১৯৭১

দশম বর্ষ	শনিবার ৭ই চৈত্র, ১৩৮৭ ২১শে মার্চ ১৯৮১	২২ সংখ্যা

'দেশ উঠবে কি করে? দেশের জন্য কি কেউ প্রাণ দিতে চায়? ত্যাগ স্বীকার করতে চায়? আবার যেদিন দেশে নগরে স্বার্থত্যাগী সন্তান জন্মাবে, সত্যিকার দেশের কাজ সেইদিন সম্ভব হবে'।

—শরৎচন্দ্র।

সম্পাদকীয়

বামফ্রন্ট সরকার ও স্বাধীনতা সংগ্রামী

দীর্ঘদিন ধরে পরদেশী ইংরেজ শাসকেরা ভারতবর্ষ নামক পুণ্যভূমিকে যখন সাম্রাজ্যবাদী শাসন ও শোষণের মাধ্যমে হৃত সর্বস্ব করে দেবার ব্যবস্থা করছিল পাকাপাকিভাবে তখন তাদের সঙ্গে জীবন-মৃত্যুকে পায়ের ভৃত্য করে, ভাবনাহীন চিত্তে তার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিল, সেই কায়েমী স্বার্থের বনিয়াদকে ভেঙ্গে চুরমার করে দিতে সংবদ্ধ অহিংস আন্দোলন গড়ে তুলেছিল, প্রধানতঃ এই বাংলাদেশের যুবক ছাত্র ও সাধারণ মানুষেরা আর এই সন্তানেরাই জীবন পণ করে সারা ভারতে সাধারণ মানুষ ও সৈনিকদের মধ্যে বিদ্রোহের আগুন জ্বেলে দিয়ে ইংরেজ শক্তিকে পরাভূত করতে সচেষ্ট হয়েছিল। অন্যের অবদানকে তুচ্ছ না করে এই কথা দ্বিধাহীন চিত্তে বলা যায়, যে মুক্তি-সংগ্রামের অগ্র-পথিক ছিল বাঙালীরাই। অবশ্য একথাও সঙ্গে সঙ্গে স্বীকার করতে হবে যে বাঙালী কোনদিন প্রাদেশিক স্বার্থ সাধনের জন্য কাজ করেনি। তারা যা কিছু করেছে, গোটা দেশের বন্ধন মুক্তির জন্যই করেছে। ভারতবর্ষের নবজাগরণের প্রধান ঋত্বিক বাঙালী।

রামমোহন, বঙ্কিমচন্দ্র, স্বামী বিবেকানন্দ, শ্রীঅরবিন্দ, রবীন্দ্রনাথ, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রাসবিহারী বসু ও নেতাজীর মত মহামানবদের সাধনা ও তপস্যার ফলেই ভারতবাসী তার আত্ম-সম্বিৎ ফিরে পেয়েছে এবং দেশে-বিদেশে ভারতকে সম্মানের আসন পুনঃ প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছে। ভারত তার আত্ম-মর্যাদা, সম্মান ও হৃত গৌরব পুনঃ প্রতিষ্ঠার সময় বিশ্বের মানুষকেও ভোলেনি। রবীন্দ্রনাথের বিশ্ব-ভৌমিকতার বাণী তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। আজকের দিনে যারা 'দুনিয়া'র মজদুর এক হও ধ্বনিটাকে তাদের নিজস্ব কীর্তি বলে জাহির করেন, ভারতের ইতিহাস পড়লে তারা জানতে পারবেন যে ভারতবর্ষের ইতিহাস মানব-দরদের চেতনায় উদ্বুদ্ধ। এই দেশের মানুষই সর্বপ্রথম বলেছিলেন 'ভাতরো মনুজাঃ সাধ, স্বদেশো ভুবন ত্রয়ম্'। তারা হৃদয়ঙ্গম করেছিল যে ত্রিভুবনই—স্বর্গ-মর্ত-পাতাল—তাদের দেশ এবং সমস্ত দেশের মানুষই তাদের ভাই। এর থেকে উদারতর দৃষ্টিভঙ্গী আর কোথাও নেই একথা দৃপ্তকণ্ঠে বক্ষ নির্দ্বিধায় বললে সত্যের অপলাপ করা হবে না।

স্বাধীনতা সংগ্রামের ক্ষেত্রে পূর্বসূরী আলোর দিশারীরা অন্ধকারের মধ্যে আলোর জ্যোতি জ্বেলেছিলেন। কিন্তু সেই আলোর মশাল প্রজ্জ্বলিত রেখে বহন করেছিলেন অনেক অনেক ছাত্র ও যুবকেরা। তাদের মধ্যে কেউ কেউ রণক্ষেত্রে জীবন দান করে শহীদ হয়েছেন। বহু সংখ্যক স্বাধীনতা সংগ্রামী কল্পনাতীত দুঃখ কষ্ট ও নির্যাতন ভোগ করে, দেশের সেবা-ব্রতে নিজেদের উৎসর্গ করেছিলেন। সেই সময়কার অবশিষ্ট দীপগুলি একটি একটি করে নিভে যাচ্ছে। কিন্তু এ সত্য অনস্বীকার্য যে তাদের আত্মদান ও আত্মনিবেদনের ফলে দেশ আজ স্বাধীন। কিন্তু তারা কোন কিছু পাওয়ার লোভে এই দেশ সেবার কাজে নিযুক্ত থাকেন নি। কিন্তু অর্থনীতির স্বাভাবিক নিয়মানুসারে যৌবনে দেশের সেবা করেননি বলে আজ তারা দুরবস্থার মধ্যে আছেন। দেশের মানুষের বিশেষ কর্তব্য আছে এই স্বাধীনতা সংগ্রামীদের প্রতি। জাতির প্রতি দেশের মানুষের তরফ থেকেই তারা সারাজীবন সংগ্রাম করেছেন। তাই দেশের সরকার ও মানুষদের দেখতে হবে যে জীবন সায়াহ্নে তারা যেন অনাহারে না থাকেন

অসংখ্য ধন্যবাদ প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধীকে এই জন্যে তিনিই এইমাত্র লোক যিনি এ সম্বন্ধে দেশের হয়ে যথাকর্তব্য পালন করেছেন। তিনি এজন্য কোন রাজনৈতিক ফয়দা তুলতে চাননি। পূর্বসূরীদের প্রতি উত্তরসূরীদের যে কর্তব্য, তাই তিনি পালন করেছেন। তাঁর ক্ষমতাচ্যুত হবার পর যে অকৃতজ্ঞের দল এই পরিকল্পনাকে বানচাল করে দেবার ব্যর্থ প্রয়াস করেছিল, তাদের অনুসরণও তিনি করেননি। পুনরায় ক্ষমতায় আসার পরই, টাকার মূল্যমানের অধোগতির কথা হৃদয়ঙ্গম করে, আর্থিক সমস্যার মধ্যেও, তিনি স্বাধীনতা সংগ্রামীদের সম্মানভাতা (যাকে তিনি পেনসান সংজ্ঞা দেননি) বাড়িয়েছেন। তাঁর মনের মণিকোঠায় এই ধারণাই বদ্ধমূল আছে যে এ কর্তব্য না করলে, ঋণ পরিশোধ না করলে, অকৃতজ্ঞতার প্রত্যবায় ঘটবে।

কেন্দ্রের এই দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে, বিভিন্ন রাজ্য সরকারগুলি ও এ সম্বন্ধে তাদের যথাকর্তব্য পালন করেছেন। তাঁরা এই স্বাধীনতা সংগ্রামীদের নানাভাবে সম্মানিত করেছেন। অর্থ সাহায্য ত দিয়েছেনই, চিকিৎসা ব্যবস্থারও সুন্দর নীতি প্রবর্তন করেছেন। এবং এ ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সাহায্যের পরিমাণের দিকে তাকিয়েও কোন কাজ করেননি। তারা তাদের সাধ্যমত সহায়তা দান করতে ত্রুটি করেননি।

কিন্তু পশ্চিমবাংলাই একমাত্র রাজ্য যেখানে প্রায় কিছুই করা হয়নি। কোন সুষ্ঠু পরিকল্পনাও গ্রহণ করেননি। দশটাকা পনর টাকায় সাহায্যের পরিমাণ সীমিত রাখতে লজ্জাবোধ করেননি। যে প্রদেশে স্বাধীনতা সংগ্রামীদের সংখ্যা সর্বাধিক, যে প্রদেশ জাতীয় আন্দোলনের পথিকৃৎ, সেখানকার এই জঘন্য ঔদাসীন্য মর্মান্তিক। পূর্বতন কংগ্রেস সরকারও এই দোষে দুষ্ট। বর্তমান সরকারের নীতিও কিন্তু এ ব্যাপারে একই এবং অভিন্ন।

বর্তমান সরকারের মুখ্যমন্ত্রী এবং বামফ্রন্টের দলীয় কমিটির চেয়ারম্যানকে এ সম্বন্ধে একটি প্রতিবেদন দেওয়া হয়েছিল কিছু করার জন্য। কিন্তু কিছু করা ত দূরে থাক্, পত্রপ্রাপ্তি স্বীকার করবার মত সৌজন্যও দেখাননি। এই প্রতিবেদনে এই সরকারকে নতুন কিছু করতে বলা হয়নি। কোন প্রদেশ কি করেছে, সে সম্বন্ধে বিস্তারিত তথ্য পরিবেশন করা হয়েছিল। এ সম্বন্ধে যে বিভাগীয় মন্ত্রীর উপর ভার দেওয়া আছে, তাকে ব্যক্তিগতভাবে সব কথা বলাও হয়েছিল। কিন্তু এরা ব্যবহার করলেন সেই প্রকারের লোকদের মত যারা নাকি ধর্মের কাহিনী শুনতে চায় না।

বর্তমান সরকারের এই সম্বন্ধে কি কৈফিয়ৎ আছে, সেটা জানবার দাবী দেশের মানুষ করতে পারে নিশ্চয়ই। টাকার অভাবের প্রশ্ন অচল, কারণ টাকার ত বৃষ্টি হচ্ছে নানা খাতে। লোকে বলে দলীয় স্বার্থে অর্থব্যয় করে রাজকোষ শূন্য প্রায়। তাহলে, এই উদাসীনতা বিশেষ কোন মানসিকতার ফলশ্রুতি ?

সম্প্রতি স্বাস্থ্যমন্ত্রী ঘোষণা করেছিলেন যে স্বাধীনতা সংগ্রামীদের জন্য বিনামূল্যে একটু সুচিকিৎসার ব্যবস্থা করবেন। কিন্তু বিশ্বস্ত সূত্রে শোনা যাচ্ছে যে এখানকার মন্ত্রী পরিষদ সে পরিকল্পনা বাতিল করেছেন। হৃদয়হীনতার এমন জঘন্য নজীর খুঁজে পাওয়া শক্ত। জনদরদের স্বর্ববজ যাদের একচেটিয়া বলে দাবী করেন, এই তাদের জনদরদের নমুনা ?

আলেকজাণ্ডার ও দারায়ুসের পত্রালাপ

কালীপদ সরকার :

বিশ্বের প্রাচীনতম বিখ্যাত এক পত্রালাপ বর্তমান প্রবন্ধের বিষয়বস্তু। পত্রালাপ ঘটেছিল খৃঃ পূঃ ৩৩৪ অব্দে পারস্য সম্রাট দ্বিতীয় দারায়ুস এবং ম্যাসিডন নৃপতি আলেকজাণ্ডারের মধ্যে। দারায়ুস তখন প্রৌঢ় এবং আলেকজাণ্ডার তরুণ যুবক।

পিতা ফিলিপ আততায়ীর হস্তে নিহত হলে আলেকজাণ্ডার মাত্র বিশ বছর বয়সে ম্যাসিডনের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। গ্রীক দার্শনিক মহাপণ্ডিত অ্যারিস্টেটল ছিলেন আলেকজাণ্ডারের শিক্ষক। তিনি ছাত্রকে রাজনীতি, ধর্মনীতি, সমাজনীতি, গণিত, ইতিহাস প্রভৃতি বিষয়ে উপযুক্ত শিক্ষাদান করেছিলেন। সিংহাসন আরোহণের পর দু-বৎসর কাটতে না কাটতেই আলেকজাণ্ডার এক বিশাল বাহিনী নিয়ে দিগ্বিজয়ে বের হন

গ্রীক সৈন্যদল হেলেসপণ্ট (বর্তমান দরদানেলিস) অতিক্রম করে এশিয়া মাইনরে প্রবেশ করলে স্থানীয় ক্ষুদ্র রাজ্যগুলি বিনা যুদ্ধেই আলেকজাণ্ডারের অধীনতা স্বীকার করে। এ অঞ্চলের সার্বভৌম অধিপতি ছিলেন পারস্য সম্রাট। প্রাচীন পারশীকরা ছিল সূর্য উপাসক এবং আর্যজাতীয়। গ্রীকরাও ছিল আর্য ও দেবদেবী উপাসক। তবুও পারশীকগণ নিজেদের অধিকতর সভ্য ও উন্নত বলে মনে করত এবং গ্রীকদের ম্লেচ্ছ যবন বলে ঘৃণা করত।

এশিয়া মাইনরে পারস্য সম্রাটের সামন্ত রাজা প্রশাসকের পরাজয়ের সংবাদ পেয়ে দারায়ুস ক্রুদ্ধ হলেন এবং আলেকজাণ্ডার যাতে পূর্বদিকে আর অগ্রসর না হন তার জন্য তাঁকে সতর্ক করে এক পত্র লিখলেন। পত্রটি ছিল এই রকম।

পৃথিবীর অধীশ্বর রাজাধিরাজের এই পত্রে তোমাকে জানানো হচ্ছে যে, যতকাল সূর্যদেব দস্যু ইস্কান্দারের (আলেকজাণ্ডার) মস্তকের উপর দেদীপ্যমান আছেন ততকাল মহান স্বর্গের অধিপতি আমাকে পৃথিবী শাসনের অধিকার দিয়েছেন। ভাগ্যবলে আমি অশেষ গৌরব, সম্মান, রাজত্ব এবং অগণিত যোদ্ধা ও সামন্তগণের আনুগত্য লাভ করেছি।

সম্প্রতি আমরা সংবাদ পেয়েছি যে, তুমি বেশ কিছু সংখ্যক দস্যু, তস্কর ও হীনমতি পাপাত্মাদের সঙ্ঘবদ্ধ করে একটা দল গড়েছ এবং তাদের সাহায্যে পারস্যের রাজমুকুট ও সিংহাসন লাভ করতে চাও। তোমরা আমাদের রাজ্যের শান্তি বিনষ্ট করে দেশ ও জনগণকে ধ্বংসের পথে ঠেলে দিতেও উদ্যত। রোমের শিক্ষা দীক্ষায় প্রভাবিত তোমাদের ন্যায় জড়বুদ্ধি মানুষের পক্ষে এটাই স্বাভাবিক! এই পত্রের বিষয় অবগত হয়ে তুমি যতদূর অগ্রসর হয়েছ সে স্থান ত্যাগ করে অবিলম্বে দেশে ফিরে যাবে। তোমার এই দুরভিসন্ধিমূলক অভিযানের সংবাদে পারস্যের সম্রাট ভীত নন। তাঁর দৃষ্টিতে তুমি প্রতিশোধ কিংবা দণ্ডবিধানের যোগ্য প্রতিদ্বন্দ্বী নও।

আমার অপরিমিত শক্তি ও সম্পদের নিদর্শন স্বরূপ আমি তোমাকে এক বস্তা স্বর্ণমুদ্রা ও গাড়ি বোঝাই তিল পাঠালাম। সেই সঙ্গে একখানি তরবারি ও একটা বল তোমাকে পাঠাচ্ছি। বলটা নিয়ে তুমি তোমার বালকোচিত বয়সের খেলা করে আমোদ পেতে পার, আর তরবারিটি তোমার শাস্তির প্রতীক।

এই পত্র পাঠ করেই আলেকজাণ্ডার পত্রবাহক দূতদের বন্দী করলেন এবং তাদের শিরোচ্ছেদের আদেশ দিলেন। দূতরা বহু অনুনয় বিনয় করে তাদের প্রাণভিক্ষা চাইল। আলেকজাণ্ডার শেষ পর্যন্ত তাদের মুক্তি দিলেন এবং তাদের হাতে পত্রের জবাব পারস্যসম্রাটের নিকট পাঠালেন। পত্রটি হল এই।

যে ব্যক্তি নিজেকে রাজাধিরাজ বলে জাহির করে এবং ভাবে জগতবাসী তার ভয়ে কম্পমান এবং সে বিশ্বের জ্ঞানবিজ্ঞান শিক্ষাদাতা, তাকে আলেকজাণ্ডার এই পত্র দিচ্ছে। সে যদি সত্যই তেমন প্রবল পরাক্রান্ত হত, তাহলে ক্ষুদ্র নগণ্য আলেকজাণ্ডারকে সে ভয় করবে কেন?

দারায়ুস, তুমি কি জান না যে, রাজত্ব ও ক্ষমতালাভ সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের ইচ্ছাধীন? এবং যে ক্ষুদ্র মানব নিজেকে ঈশ্বরের প্রতিভূ বলে মনে করে এবং পৃথিবী শাসন করতে চায়, সে মহান পরমেশ্বরের কোপানলে পড়ে এবং রাজ্যসহ বিনষ্ট হয়?

যে ব্যক্তির বিনাশ বিধি নির্দিষ্ট এবং যার রাজত্ব ও মর্তলোকের আনন্দ উপভোগ শেষ হতে চলেছে সে কি করে ঈশ্বরের প্রতিভূ হতে পারে?

দেখ, আমি যুদ্ধক্ষেত্রেই তোমার সহিত সাক্ষাতের সিদ্ধান্ত করেছি এবং সেই উদ্দেশ্যে তোমার রাজধানীর দিকে এগিয়ে যাব। আমি নিজেকে পরমেশ্বরের ক্ষুদ্র দীন সেবক বলেই মনে করি এবং জয় ও সাফল্যের জন্য তাঁর উদ্দেশ্যে ভক্তি ও প্রণাম জানাই।

তোমার পত্রের সহিত তোমার প্রতাপের নিদর্শন স্বরূপ তুমি যে তরবারি, বল, মোহর ও তিলের বস্তা পাঠিয়েছ সে গুলি সবই শুভ লক্ষণেরই চিহ্ন। আমি তোমার শান্তি বিধায়ক, শাসক, শিক্ষাগুরু ও পরিচালক হব তার জন্য তরবারি পাঠিয়েছ। বলটা হল ভূ-গোলকের প্রতীক, আর তার অর্থ হল আমার সেনানীরা পৃথিবী শাসন করবে। মোহরগুলো আমাকে পাঠানোর অর্থ হল তোমার ধনসম্পদ অচিরে আমার অধিকারে আসবে। অনেকগুলি তিল পাঠিয়েছ, শস্যদানাগুলি বেশ নরম ও মসৃণ। খাদ্যের মধ্যে এগুলি সবচেয়ে কম ক্ষতিকর এবং প্রীতিপদ বলে মনে হচ্ছে।

প্রতিদানে আমি তোমাকে বস্তা ভরা সর্ষে বীজ পাঠাচ্ছি, এ গুলি আস্বাদন করে তুমি বুঝতে পারবে আমার জয়লাভের প্রতিক্রিয়াটি কেমন মধুর। তুমি আত্মাভিমানে নিজেকে প্রবল প্রতাপান্বিত বলে মনে কর এবং সাম্রাজ্যের গর্বে পৃথিবীর অধীশ্বর বলে ভাব। এমন কি নিজেকে দেবতার আসনে বসাতেও কুণ্ঠিত নও। কিন্তু জেনে রেখ, আমিই তোমার ভাগ্য নিয়ন্তা প্রভু।

বহু সহস্র সৈন্য, বিরাট রণপ্রস্তুতি ও অস্ত্রভাণ্ডার গড়ে তুমি আমার ভীতি উৎপাদন করতে চেয়েছ, কিন্তু আমি বিশ্বাস রেখেছি ভাগ্যবিধাতার উপর যিনি অহংকারীকে শাস্তি দেন এবং যে পরিমাণে তোমার গর্ব হয়েছে ঠিক তদোধিক পরিমাণে তিনি তোমাকে হতমান করবেন। আমার জয় সুনিশ্চিত। আমি পরমেশ্বরের উপর আমার সকল বিশ্বাস ও নির্ভরতা স্থাপন করেছি। ইতি—

অল্পদিনের মধ্যেই গ্রীস ও পারস্যের দুই বিশাল বাহিনী পরস্পর সম্মুখীন হল। প্রচণ্ড সংগ্রাম হল। উভয় পক্ষের হতাহতের দেহে রণক্ষেত্র আবৃত হল। সবুজ তৃণক্ষেত্রে রক্তের স্রোত বইল। শেষ পর্যন্ত জয়ী হলেন আলেকজাণ্ডার, দারায়ুস ইউফ্রেতিস নদীর পূর্বপারে সরে এসে বৃহত্তর সৈন্যবাহিনী

সমাবেশের চেষ্টায় আত্মনিয়োগ করলেন।

দারায়ুস তার সাম্রাজ্যের অর্ধাংশ আলেকজাণ্ডারকে ছেড়ে দিয়ে সন্ধির প্রস্তাবও করলেন। আলেকজাণ্ডারের সেনাপতিরা সন্ধির প্রস্তাব গ্রহণ করতে আগ্রহী হলেও, আলেকজাণ্ডার কিন্তু সন্ধি করতে সম্মত হলেন না। তিনি তখন সমগ্র পারশীক সাম্রাজ্য অধিকার করতে কৃতসংকল্প। তাই বিরাট ঝুঁকি নিয়ে দিগবিজয়ী পূর্ব মুখে সৈন্য চালনার আদেশ দিলেন।

সন্ধি প্রস্তাবের উত্তরে আলেকজাণ্ডার লিখলেন :

দারায়ুস,

তোমার পূর্ববর্তী প্রথম দারায়ুস অনেককাল আগে গ্রীস আক্রমণ করে হেলেসপন্টের সৈকতভূমি থেকে শুরুকরে গ্রীদের নগরগুলি ধ্বংস করেছিল। সকল গ্রীক উপনিবেশ ভস্মীভূত হয়েছিল। এতেও তার হত্যা ও ধ্বংসের নেশা নিবৃত্ত হল না। সে সমুদ্রপথে এক বিশাল বাহিনী এনে পুনরায় গ্রীস আক্রমণ করল। নৌ-যুদ্ধে তাকে কিন্তু পরাজয় স্বীকার করতে হয় এবং তোমার পূর্ববর্তী সেই পারশ্য রাজ প্রত্যাবর্তন করে। কিন্তু সে ফিরে গেলেও তার সেনাপতি মার্দোনিস গ্রীসের নগর, কানন ও শস্যক্ষেত্র ধ্বংস করার জন্য গ্রীসে থেকে যায়।

এ প্রসঙ্গে আমি আরো বলতে চাই যে, আমার পিতা রাজা ফিলিপের মৃত্যুর জন্য তোমরা অংশত দায়ী। তার আততায়ীদের তোমরা অর্থ দিয়ে এবং পুরস্কারের লোভ দেখিয়ে বিপথ চালিত করেছিলে। এইভাবে এক অন্যায় যুদ্ধ বাধিয়ে তোমরা যাদের রণক্ষেত্রে মোকাবেলা করতে অসমর্থ তাদের চূড়ান্য গুপ্ত হত্যার দ্বারা সরাতে চাও। ভুলে যেও না, যখন তুমি আমার বিরুদ্ধে বিশাল সৈন্যবাহিনী নিয়ে উপস্থিত, তখনও আমাকে হত্যা করার জন্য এক হাজার স্বর্ণমুদ্রা পুরস্কার ঘোষণা করেছিলে।

সুতরাং যে যুদ্ধে আমি এখন লিপ্ত তা হল আমার প্রতিরক্ষা সংগ্রাম। আমি যে তোমার অর্ধ সাম্রাজ্য অধিকারের সাফল্য গৌরব লাভ করেছি তা দেবতাদের আশীর্বাদেই সম্ভব হয়েছে। এ থেকেই আমার অভিযানের নায্যতা প্রমাণিত। যুদ্ধে তুমি পরাজিত, তোমার কোন অনুরোধ রক্ষা করতে আমি ধর্মত: বাধ্য নই, তথাপি আমি বিশ্বস্ততার সহিত এই আশ্বাস দিচ্ছি যে, তোমার অভিরুচিমত তুমি যদি আমার নিকট আত্ম সমর্পণ কর, তাহলে বিনা ক্ষতি পূরণেই আমি তোমার পত্নী ও শিশু সন্তানদের তৎক্ষণাৎ মুক্তি দেব।

আমি কিভাবে যুদ্ধ জয় করি তুমি তা দেখেছ। কি ভাবে বিজিতের সহিত সম্মানের সঙ্গে আমি আচরণ করি তাও তুমি দেখতে পাবে। যদি ব্যক্তিগত নিরাপত্তা সম্বন্ধে তোমার মনে সন্দেহ থাকে তবে তুমি দেহরক্ষী সঙ্গে আনতে পারো, তারা তোমার পিছনেই অবস্থান করবে। ইত্যাবসরে যখনই তুমি আলেকজাণ্ডারের কাছে পত্র পাঠাবে, মনে রেখো, তাকে শুধু রাজা বলেই অভিভাষণ করবে না, তোমার রাজা বলেও লিখবে।

খৃ: পূ: ৩৩১ অব্দের ২১ শে সেপ্টম্বর চন্দ্রগ্রহণের সুযোগ নিয়ে আলেকজাণ্ডার সসৈন্যে তাইগ্রিস নদী পার হয়ে পারশীক বাহিনীকে আকস্মিকভাবে আক্রমন করলেন। আরবেলার গ্রীক ও পারশীক বাহিনীর মধ্যে যে তুমুল রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ হল পৃথিবীর ইতিহাসে তা চূড়ান্ত পরিবর্তনকারী যুদ্ধগুলির অন্যতম।

এ যুদ্ধেও বিজয়লক্ষ্মী গ্রীক দিগবিজয়ীর কণ্ঠে বরমালা পরিয়ে দিলেন। বিশাল পারশ্য সাম্রাজ্য

(এর পর ১২ পাতায় দেখুন)

ইন্দিরা কংগ্রেসের সামনে সবচেয়ে বড় সমস্যা কি !

—মলয় ঘোষ

নিঃসন্দেহে—বিকল্প নেতৃত্বের অভাব। এইদলের মূল ও একমাত্র নেত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর অবিসংবাদিত নেতৃত্ব ও তাঁর উপর দলের জেলা নেতা থেকে কনিষ্ঠকর্মী পর্যন্ত প্রত্যেকটি সদস্যের অগাধ আস্থা এই কথাই প্রমাণ করে যে, অন্ততঃ বর্তমানে, দলে ইন্দিরা গান্ধীর কাছাকাছি যোগ্যতাসম্পন্ন নেতা কেউই নেই। এবং এই অবস্থাটাই সমগ্রভারতীয় একটি রাজনৈতিক দলের পক্ষে অত্যন্ত মারাত্মক।

ইন্দিরা কংগ্রেসে এই বিকল্প নেতৃত্বহীনতার কারণ হলো, এই দলে যে সব নেতারা আছেন, কয়েকজনকে বাদ দিলে তাঁদের কারুরই নিজস্ব কোন ইমেজ নেই। এবং এ মুষ্টিমেয় কয়েকজনেরও প্রভাব প্রতিপত্তি মূলতঃ আঞ্চলিক, প্রাদেশিক অথবা সম্প্রদায় বিশেষের মধ্যে কেন্দ্রীভূত—সর্বভারতীয় ভিত্তিতে জনমনে এঁদের কোন পরিচিতিই নেই। এমতাবস্থায়, সমগ্র ইন্দিরা কংগ্রেস দলটি দাঁড়িয়ে আছে শ্রীমতী গান্ধীর জাতীয় তথা আন্তর্জাতিক ভাবমূর্তীর উপর। চন্দ্র ও অন্যান্য গ্রহের যেমন নিজস্ব আলো নেই, সূর্যের আলোকে তারা আলোকিত, ইন্দিরা কংগ্রেস দলের ছোটবড়ো মাঝারী অসংখ্য নেতার কারুরই নিজস্ব কোন ইমেজ নেই—দলনেত্রীর ভাবমূর্তির আলোকেই তাঁরা আলোকিত।

বাস্তবিক পক্ষে, '৭৭ সালে জনতা শাসনের প্রবর্তন থেকে' ৮০-র সরকার পরিবর্তন পর্যন্ত দীর্ঘ তিন বছর ইন্দিরা গান্ধী একাই তাঁর দলকে টেনে নিয়ে গেছেন—অনিশ্চয়তার চোরা বালি এড়িয়ে পৌঁছে দিয়েছেন নিরাপত্তার শক্তমাটিতে। জরুরী অবস্থা ও তথাকথিত কংগ্রেসী অপশাসনকে কেন্দ্র করে জনতা সরকার তাঁর বিরুদ্ধে একাধিক কমিশন বসিয়েছে, সংবাদপত্র রেডিও টেলিভিশন মাধ্যমে অবিরাম প্রচার চালিয়েছে তাঁর তথাকথিত অপকীর্তির বিশদ বিবরণ দিয়ে, কোটি কোটি টাকা খরচ করা হয়েছে তথাসং গ্রহের নামে শুধুমাত্র তাঁকে লোকচক্ষে হেয় করার উদ্দেশ্যে। চরণ সিং-এর প্রধানমন্ত্রীত্বে তাঁকে জেলেও যেতে হয়েছে। কিন্তু এতো কাণ্ড করেও ইন্দিরার দুর্বার গতিকে রুদ্ধ করা যায়নি। একটা এলোমেলো, বিবাদমান, বিশৃঙ্খল গোষ্ঠিকে আঁচলে বেঁধে তিনি ঝটিকাগতিতে পরিক্রমা করেছেন কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারিকা। অমিতবিক্রমে মুখোমুখি হয়েছেন কৌরববাহিনীর। তাঁকে সবচেয়ে বেশী সমালোচনা করেছেন তাঁরাই, যাঁরা সুখের দিনে তাঁর সঙ্গে ছিলেন আর বিপর্যয়ের সঙ্গে সঙ্গে শত্রুপক্ষ অবলম্বন করেছিলেন নিজেদের শিঁকে বাঁচাতে, ক্ষমতা আঁকড়ে থাকতে। শ্রীমতী গান্ধী বিচলিত হননি এঁদের আচরণে, বিরূপ মন্তব্যও করেননি। কারণ তিনি জানতেন, এরকমই হয়। পৃথিবীতে যাঁরা আসেন অনেক বেশী ওজন বইতে, অপমান সইতে হয় তাঁদের অনেক বেশী। তাই সর্বশক্তি নিয়োগ করলেন তিনি সাধারণ মানুষের দরবারে পৌঁছতে—যাঁরা মাত্র কিছুদিন আগে তাঁকে ত্যাগ করেছিলেন।

ইন্দিরা জানেন এঁদের অভিমানের ভাষা, জানেন ভারতবর্ষের দরিদ্র মানুষ শিশুর মতো সরল, বনস্পতির মতো ক্ষমাশীল। রুদ্ররোষে যেমন তাঁরা আগুন জ্বালেন, ভালবাসার বারিসিঞ্চনে তেমনি নির্বাপিতও করেন সব দাহ। ইন্দিরা গেলেন এই

জনগণের কাছে। বললেন, যা কিছু অন্যায়, আমারই। শুধু আর একবার সুযোগ দাও তোমাদের সেবা করার। এইখানেই তাঁর বৈশিষ্ট্য। ভ্রান্তির বোঝা অপরের ঘাড়ে চাপিয়ে নিজেকে দায়মুক্ত করার যে ট্রাডিশন ভারতীয় জননেতাদের সহজাত, ইন্দিরা তার সুস্পষ্ট ব্যতিক্রম। কোন প্রতিকূল পরিস্থিতিই তাঁকে বিচলিত করতে পারেনা—বরং চ্যালেঞ্জ নেওয়ার প্রেরণা জোগায়।

৮০-র নির্বাচন প্রমাণ করে দিল ভারতবর্ষের আপামর জনসাধারণ ইন্দিরারই অনুরক্ত। পূর্ববর্তী কংগ্রেস আমলের শেষদিকে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ক্ষমতাসীন কংগ্রেসীদের মধ্যে স্বেচ্ছাচার আর দুর্নীতি যে সর্বনাশা আবহননের পথে সমগ্র দলকে পরিচালিত করেছিল, যার ফলশ্রুতি হিসাবে ভারতবর্ষের অধিকাংশ মানুষ ত্যাগ করেছিল কংগ্রেস নেত্রী ইন্দিরাকে—পরবর্তী জনতা জমানার ব্যর্থতা তাঁদের সামনে আরও একবার এই সত্যকে তুলে ধরলো, সমগ্র ভারতবর্ষে ইন্দিরা গান্ধীর নেতৃত্বের কোন বিকল্প নেই। ইন্দিরা ক্ষমতায় এলেন সংসদে বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে; আগের বারেও তাঁর এতো গরিষ্ঠতা ছিল না। বিরোধী দলগুলি, যারা সাতাত্তরে জনতা নামক চাঁদোয়ার তলায় সমবেত হয়েছিল সরকার গঠনকরে, ছিন্নবিচ্ছিন্ন ও হতমান হয়ে পড়লো। বাস্তবিক পক্ষে দেশের গরিষ্ঠতম ভোটারের আশীর্বাদে ইন্দিরার জয়যাত্রার পথে বড়ো-ধরনের আর কোন বাধার সম্ভাবনা রইল না।

কিন্তু, ১৯৮০-র জানুয়ারী থেকে ৮১-র মার্চ—এই কিকি দাবিক এক বছরে আমরা কি দেখলাম? দেখলাম, সরকার ও মন্ত্রীমণ্ডলী গঠনের সময় থেকেই ক্ষমতালিপ্সা ও অন্তর্দ্বন্দ্ব কিভাবে ইন্দিরা কংগ্রেসের ভিত্তিমূলকে দুর্বল করে দিতে লাগল, দেখলাম শুধু পশ্চিমবঙ্গ, ত্রিপুরা বা কেরলের মতো অকংগ্রেসী সরকারাধীন প্রদেশগুলিতেই নয়, উত্তর প্রদেশ, বিহার, রাজস্থান প্রভৃতি কংগ্রেসী শাসনাধীন রাজ্যগুলিতেও দলের অন্তর্দ্বন্দ্ব কি ভয়ানকভাবে মাথা চাড়া দিয়ে উঠলো। পশ্চিমবঙ্গ, ত্রিপুরা বা কেরলে ইন্দিরা কংগ্রেসীদের ঘরোয়া কোন্দলে রাজ্যের ক্ষমতাসীন বামফ্রন্ট তথা সি, পি, এম-এর পরোক্ষ মদতের সম্ভাবনাকে হয়তো উড়িয়ে দেওয়া যায় না, কিন্তু উত্তরপ্রদেশ, বিহার, রাজস্থান বা অতি সাম্প্রতিক আসামে হাইকম্যাণ্ড অনুমোদিত দলীয় সরকারের বিরুদ্ধে দলেরই বিক্ষুব্ধ গোষ্ঠির অসন্তোষ ও ক্রমায়িত নালিশ সামগ্রিক ভাবে এই দলের অন্তঃসার শূন্যতাকেই স্পষ্ট করে তুলেছে। এর ফলে, জনসেবা ও নির্বাচন প্রাককালীন প্রতিশ্রুতিরক্ষার কাজে ব্যাহত হয়েছে এবং জনগণের চোখে দলের নেতৃবৃন্দ অত্যন্ত ছোট হয়ে যাচ্ছেন। পশ্চিমবঙ্গে বা ত্রিপুরায় মূলতঃ সি. পি, এম নেতৃত্বাধীন সরকারের প্রচণ্ড দুর্নীতি ও অকর্মণ্যতা সত্ত্বেও রাজ্যের মানুষ তাদের সহ্য করতে বাধ্য হচ্ছেন, যেহেতু এই রাজ্যগুলির ইন্দিরা কংগ্রেস নেতাদের চরম কোন্দল ও পারস্পরিক প্রতিদ্বন্দ্বিতার মধ্যে তাঁদের সমস্যার কোন সমাধানসূত্র তাঁরা খুঁজে পাচ্ছেন না। অবস্থাটা শুধু ইন্দিরা কংগ্রেস দলের পক্ষেই নয়, গণতন্ত্রের পক্ষেও মারাত্মক ভাবে ক্ষতিকারক।

তবে একটা বিষয়ে ছোটবড়ো সমস্ত ইন্দিরা কংগ্রেসী নেতাই সমমনোভাবাপন্ন সে পশ্চিমবঙ্গেই হোক, ত্রিপুরায় হোক, উত্তরপ্রদেশ, বিহার বা রাজস্থানেই হোক অথবা ভারতবর্ষের যে কোন রাজ্যেই হোক। সেটি হলো, দলনেত্রী ইন্দিরা গান্ধীর প্রতি নিঃসর্ত আনুগত্য। কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারিকা—ইন্দিরা কংগ্রেস সংগঠনের যদে-

বড়ো নেতাই হোন, ইন্দিরার নির্দেশ অমান্য করার দুঃসাহস কারও নেই—সেকথা তাঁরা চিন্তাই করতে পারেন না। এর অর্থ এই নয় যে, তাঁদের প্রত্যেকেই ইন্দিরা গান্ধীর প্রতি সেন্টপার্সেন্ট বিশ্বস্ত, কারণ হলো এই যে ইন্দিরা ছাড়া এঁদের কোন উপায় নেই। নিজস্ব ইমেজ দূরে থাক্ যেটুকু জনসমর্থন তাঁরা পান সে শুধু ইন্দিরার নাম ভাঙিয়েই। সামান্যতম ধৃষ্টতা দেখিয়ে এই দুর্মূল্য সুবিধাটুকু তাঁরা হারাতে রাজী নন। বিশেষতঃ নিজের ক্ষমতা দেখাতে গিয়ে সম্প্রতি বহুগুণাজী এবং তিন বছর আগে দেবরাজ আর্সের অধঃপতনের ঘটনা তাঁদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে যে, মাইনাস ইন্দিরা এঁদের কানাকড়িও দাম নেই মানুষের কাছে।

এবং এই কারণেই, ইন্দিরাজী কারুর উপর বিরক্ত হয়েছেন শুনলে তিনি যুগপৎ তটস্থ ও আতঙ্কিত হয়ে পড়েন। তাই পশ্চিমবঙ্গের ঘরোয়া কোন্দলের ব্যাপারে দলনেত্রীর রূঢ় সমালোচনা রাজ্য সংগঠনে আপাত শান্তি নিয়ে আসে, কর্ণাটকের বিক্ষুব্ধরা ইন্দিরাজীর উষ্মায় তাঁদের অনাস্থা প্রস্তাবের কথা বেমালুম ভুলে যান, আসামের সদ্য গঠিত তৈমুর মন্ত্রীসভাকে বিরোধীপক্ষের চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করার উপযুক্ত করতে বিক্ষুব্ধরাই কোমর বেঁধে লেগে যায়. উত্তরপ্রদেশ, বিহার, রাজস্থান, অন্ধ্রে দলীয় সংগঠনকে জোরদার করার বিষয়টিই প্রাধান্য পায়। এসবই হয় প্রধানমন্ত্রীর ইচ্ছায়। পছন্দ হোক বা না হোক, তাঁর সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে কথা বলার চিন্তাই করতে পারেন না কেউ। সরকার হোক আর সংগঠনই হোক, ইন্দিরাজীর সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হয়।

এই সিস্টেম দলীয় সংহতি রক্ষার ক্ষেত্রে যতো সুফলপ্রসূই হোক না কেন, সংগঠনের ভবিষ্যত সম্পর্কে যাঁরা চিন্তা করেন তাঁদের কাছে আজ সব চেয়ে বড় প্রশ্ন হলো—কিভাবে এই মুখাপেক্ষী অবস্থা থেকে উত্তীর্ণ হওয়া যায়। গণচেতনার জাগরণ যাঁরা করবেন আগে তাঁদেরই জাগ্রত হতে হবে! মানুষের কাছে যাওয়ার আগে নিজেদের পরিশুদ্ধ করতে হবে ত্যাগ আর সেবার আগুনে। সঠিক ও মাঙ্গলিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে পারদর্শী হতে হলে স্বার্থবুদ্ধিকে ত্যাগ করতে হবে—নাহলে ক্রমবর্দ্ধমান গতিতে দলের বর্তমান কাঠামো ভেঙেচুরে তছনছ হয়ে যাবে। একেই এর মধ্যে শত ছিদ্র, সহস্র ফাটল। চোরাগলি দিয়ে অনেক শুদ্ধিনের বন্ধু ইতিমধ্যেই দলে স্থান পেয়েছেন, আরও অনেকে প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন অপরিসীম ধৈর্য্যে। যদিও সংগঠনকে শক্তিশালী করার চেয়ে নিজস্ব ক্ষমতাবৃদ্ধিই এঁদের মূল লক্ষ্য। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে সাম্প্রদায়িকতা, প্রাদেশিকতা ও বর্ণবিদ্বেষের আগুনে ধূনি জ্বালিয়ে ইন্দিরা মারণযজ্ঞে বসেছেন ধুরন্ধর রাজনীতিবিদরা।

সমগ্র উত্তর পূর্বাঞ্চল জুড়ে চরম অস্থিরতার সৃষ্টি করা হচ্ছে বিচ্ছিন্নতাবাদী উদ্দেশ্যসাধনে, ভারত মহাসাগরকে কেন্দ্র করে একাধিক বিদেশী শক্তি মেতে উঠেছে সাম্রাজ্যবাদী ক্রিয়াকলাপে তার অনিবার্য প্রতিক্রিয়ায় এশিয়া মহাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে দেখা যাচ্ছে ক্রমবর্দ্ধমান অস্থিরতা ও স্থিতিহীনতা। ইন্দিরাজীর সামনে এখন অনেক কাজ। একদিকে তাঁকে লড়তে হচ্ছে দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে, বৈষম্য অন্যায় ও শোষণের বিরুদ্ধে, পিছিয়ে পড়া অর্থনীতির বহুবিধ অভিশাপের বিরুদ্ধে; অন্যদিকে, দেশের সংহতি ও নিরাপত্তার জন্য, বৈদেশিক ক্ষেত্রে ভারতের মর্যাদাবৃদ্ধির জন্য, সমগ্র বিশ্বে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের অনিবার্য পদধ্বনিকে ঠেকিয়ে রাখার জন্য

তাঁকে সংগ্রাম করতে হচ্ছে। এ সংগ্রামে তাঁর সাথে দেশের আপামর জন সাধারণ—অপদার্থ, ক্ষমতাকেন্দ্রীক স্তাবককুল নয়। দেশগঠনের সমস্যার চেয়ে আজ এই সমস্যাই তাঁর কাছে বড়ো হয়ে উঠেছে। এই আত্মবিস্মৃত, ক্ষুদ্রস্বার্থান্বেষী স্তাবকদের নিয়ে কোন্ সংগঠন তিনি গড়বেন? জাতির স্বার্থে, দেশের উন্নয়নের কাজে এঁদের ভূমিকা কি হবে? আত্মগত্যের শপথে বিশ্বস্ত হলেও কর্মক্ষমতার মূল্যায়ণে এঁরা কতোদূর সফল হতে পারবেন? নিম্নতম থেকে উচ্চতম স্তর পর্যন্ত যে পরিকল্পিত শৃংখলা ও সফল নেতৃত্ব সংগঠনকে সুদৃঢ় করে, তার একান্ত অভাব ইন্দিরা কংগ্রেস দলকে কোন্ যাদুতে জনমুখী করবে? এই সব প্রশ্নই আজ ইন্দিরা কংগ্রেস তথা দলনেত্রী শ্রীমতী গান্ধীর সামনে সবচেয়ে বড়ো হয়ে দাঁড়িয়েছে এ সমস্যার সমাধান হবে তখনই, স্বার্থ আর অহংকে বিসর্জন দিয়ে দলের ছোটবড়ো নেতারা যখন সংহত হবেন, একত্রিত হবেন। শুধু বিশ্বস্ততা নয় চাই উদার দৃষ্টিভঙ্গী, স্বচ্ছ ও আন্তরিক দেশ-ভাবনা। নেতাদের কাছে দেশ ও দলের আকাঙ্খা এইটুকুই। নীচের তলার কর্মীদের মধ্যে এই সংহতির অভাব নেই, অভাব আছে সুস্থ নেতৃত্বের। যদিও নেতা অসংখ্য, স্বার্থ-চিন্তায় তাঁরা আচ্ছন্ন। সংগঠনকে শক্তিশালী করার চেয়ে নিজস্ব গোষ্ঠীকে জোরদার করার কাজেই তাঁরা আত্মনিবেদিত। যে কারণে এই গোষ্ঠীবিরোধ। এই আত্মহননের কি শেষ হবেনা? অন্ততঃ দেশের স্বার্থে দলনেত্রীর অপরিসীম ত্যাগ আর নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রামের দিকে তাকিয়েও কি নেতারা নিজেদের তুলতে পারেন না?

বালেশ্বর আত্মোৎসর্গ স্মারক সমিতি

রেজিষ্টার্ড নং—এস/১১৯৩৮

৪ নং বল্লভদাস ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৭ ফোন : ৩৪-১৭৯৫

বার্ষিক সাধারণ সভার নোটিশ

মহাশয়,

বালেশ্বর আত্মোৎসর্গ স্মারক সমিতির সাধারণ সভার আগামী অধিবেশনে যোগদানের জন্য আপনাকে আমন্ত্রণ জানাইতেছি।

সভার তারিখ ও সময়—

২৮শে মার্চ্চ ১৯৮১ ইং শনিবার বিকাল ৪ ঘটিকা

স্থান—সেমিনার হল-মহাজাতি সদন, কলিকাতা-৭

আলোচ্য বিষয় :—

১। বিগত সভার কার্য্যবিবরণী অনুমোদন

২। ১৯৮০ সালের পরীক্ষিত হিসাব, সম্পাদকের বিবরণী, ১৯৮১-১৯৮২ সালের কর্মকর্তা নির্বাচন।

৩। কর্মসূচী রূপায়ণ ও পরিচালন ব্যবস্থা

৪। বিবিধ

ইতি নিবেদক—

প্রভাংশু ধর চৌধুরী (যুগ্ম সম্পাদক)

রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্র নাথের স্মৃতি কথা

["A Nation In Making" গ্রন্থ থেকে অনুবাদ]

অনুবাদক—অধ্যাপক নলিনীমোহন দাশগুপ্ত

মিউনিসিপ্যাল আইন

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

আমার মন্ত্রীত্বের সময় মিউনিসিপ্যালিটি সম্পর্কে যে আইন প্রণয়নের ব্যবস্থা করি তার মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আইনটি হল কলকাতা মিউনিসিপ্যাল আইন, স্থানান্তরে এই আইন প্রণয়নের বিবরণ দিয়েছি এবং এটাও দেখিয়েছি যে এই আইন প্রণয়নে বহু বিলম্ব হয়ে গেছে. অনেক আগেই এটা করা উচিৎ ছিল আমি যা করেছি বলে দাবি করছি, তা হল এইযে আমি ইতিপূর্বেকার আইনের গঠন পদ্ধতির সম্পূর্ণ সংশোধন করেছি এবং নতুন আইনকে নতুন শাসন সাম্রাজ্যের সঙ্গে মিল রেখে ঢেলে সাজিয়েছি। বলতে কি, এই আইনে করদেয় মিউনিসিপ্যালিটির কাজ কর্মের নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা করদাতাদের প্রতিনিধি মণ্ডলীর হাতে সমর্পণ করা হয়েছে। প্রতিনিধিগণের অনেকাংশে ব্যাপকতর ভোটাধিকারের ভিত্তিতে নির্বাচিত হওয়ার ব্যবস্থাও এতে আছে। এখানে উল্লেখযোগ্য বিষয় হচ্ছে এইযে মিউনিসিপ্যাল আইনের এই গঠন পদ্ধতির পরিবর্তন সম্পূর্ণরূপে জনমতের দাবী অনুযায়ী করা হয়েছে। এই নতুন আইনের এমন কতগুলি বিশেষ দিক আছে যা সুস্থ সময়ে এবং আবেগও পূর্ব সংস্কারের আচ্ছন্নতা থেকে মুক্ত পরিবেশে সাধারণের সাগ্রহ স্বীকৃতি লাভ করত। স্বরাজ কথাটি সম্পর্কে আজকাল অনেক কথাই আমরা শুনে থাকি। আমি বলতে পারি, আজ যারা খুব বেশী স্বরাজ, স্বরাজ বলে চিৎকার করছেন তাঁরা যখন শৈশবের দোলনায় দোল খেতেন, আমি সেই সময় থেকেই একজন স্বরাজিষ্ট। ভারতীয় রাজনীতিকদের মধ্যে আমি প্রথমে 'ডোমিনিয়ম ষ্ট্যাটাস' এর দাবী উত্থাপন করি। আর নতুন আইন অনুযায়ী যেভাবে কলকাতা মিউনিসিপ্যাল আইন প্রণয়ন করা হয়েছে তাতে সাম্রাজ্যের দ্বিতীয় বৃহৎ নগরী কলকাতার মিউনিসিপ্যালিটির শাসনকার্যে প্রকৃত স্বরাজই আমরা পেয়েছি। একথা স্মরণে রাখা প্রয়োজনেঃ কলকাতা মিউনিসিপ্যালিটিতে যে কর আদায় হয় তা বাংলার মোট রাজস্বের পাঁচ ভাগের একভাগ এবং এখন নতুন আইন অনুযায়ী জনগণেরই প্রতিনিধিরাই তার উপর কর্তৃত্ব করবেন, কর্পোরেশনের মোট সদস্য সংখ্যার ৫ ভাগের ৪ ভাগই হবে করদাতাগণ কর্তৃক নির্বাচিত এবং কর্পোরেশনে তাদেরই পূর্ণ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হবে। কর্পোরেশনের প্রধান কর্মসচিবকে তারাই নির্বাচিত করবেন অবশ্য তা সরকারের অনুমোদন সাপেক্ষ হবে। যেহেতু—যিনি হবেন কর্পোরেশন হাউসের স্পিকার, তিনিও নির্বাচিত হবেন। ভোটাধিকার প্রসার করে, এযাবৎ কেত্রে ভোটদানের ক্ষমতা বিলুপ্ত করে এবং মহিলাদের নির্বাচক মণ্ডলীতে স্থান দিয়ে কর্পোরেশনের গঠন পদ্ধতিকে গণতান্ত্রিক করা হয়েছে।

এসব কাজেই উল্লেখযোগ্যভাবে অগ্রগতির সূচক। কিন্তু চরম পন্থী সংবাদপত্রগুলির পক্ষ থেকে এর স্বীকৃতি স্বরূপ একটি কথাও প্রকাশিত হয়নি তারা কর্পোরেশনের নির্বাচনে সাম্প্রদায়িক পদ্ধতি প্রবর্তন হয়েছে বলে অভিযোগ করে সমালোচনা করে থাকেন, প্রকৃত ঘটনাকে আদৌ না দেওয়ার অতিমাত্রিক কোঁক বশতঃ তারা এটাও লক্ষ্য করলেন না যে মূল বিলে—যে বিল আমি উপস্থাপিত করেছিলাম, তার মধ্যে এই সাম্প্রদায়িক পদ্ধতি ছিল না (যদিও ১৯১৭ সালে লর্ড সিংহ যে বিল প্রণয়ন করেছিলেন তার মধ্যে তা ছিল যা আমি ইচ্ছা করেই বাদ দিয়েছি) এবং সাম্প্রদায়িক নির্বাচন পদ্ধতির বিরুদ্ধে আমি আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়েছি এবং যাতে এই নীতি স্থায়ীভাবে মিউনিসিপ্যাল আইনে বলবৎ না হয়, সে জন্য আমি কেবলমাত্র অস্থায়ীভাবেই এতে স্বীকৃতি জানিয়েছি। কিন্তু চরমপন্থী পত্রিকাগুলি সে কথা বিবেচনার মধ্যে আনলেন না। এটা যেমন অদ্ভুত তেমন নিন্দার পরিচায়ক বটে। সে

অধ্যক্ষিতেরা এর বিরূপ সমালোচনা করে আসছিলেন তারাই শেষ পর্যন্ত তাদের হিন্দু মুসলিম প্যাকটে সারা বাংলার একশত মোলটি মিউনিসিপ্যালিটির সব কটিতেই এই সাম্প্রদায়িক নির্বাচন পদ্ধতি প্রবর্তনের প্রস্তাব করলেন, তারা হিন্দু মুসলিম ঐক্য চান, আর সে ঐক্য সম্পাদন করতে চান মিউনিসিপ্যালিটিগুলিকে এমনভাবে ভিন্ন ভিন্ন বীরব খণ্ডে ভাগ করে যাতে সে কক্ষে জলও প্রবেশ করতে না পারে এবং ফলে হিন্দু মুসলমান তাদের নির্বাচন অধিকার ভোগ করে একত্রে কাজ করতে না পারে। কর্পোরেশনের চাকরীতে নিয়োগের ব্যাপারে তাঁরা সাম্প্রদায়িক নীতি অনুসরণ করতে শুরু করে দিয়েছেন। সমস্ত জাতীয়তা-বাদী ভারতীয়ের কাছে এই নীতি নিন্দনীয় কারণ এই নীতি ভারতীয় জাতির বিকাশের পক্ষে অতি মারাত্মক বাধা।

সে যাইহোক কলকাতা মিউনিসিপ্যাল আইন আমার জীবনের একটি স্বপ্ন সফল করেছে। ১৯২১ সালের নভেম্বর মাসে যখন আমি বিলটি উপস্থাপিত করি, তখন বলেছিলাম :

"১৮৯৯ সালের ২৭শে সেপ্টেম্বর মাসে শেষ বারের মত এই কথাগুলো বলেছিলাম, তারপরে আজ বাইশটি বছর এল ও চলে গেল। আমি তখন আশা প্রকাশ করেছিলাম এবং কবিদের বাণীও করেছিলাম যে অতি অল্প দিনের মধ্যেই আমার জন্মভূমি এই নগরীতে স্বদেশীর স্বায়ত্ত শাসনের অধিকারের আশীর্বাদ পুনঃ স্থিতি লাভ করবে। সে সময় এসে গেছে। সেদিন আজ সমাগত। সে দিনটি দেখার জন্য আমি বেঁচে আছি। আমি নতজানু হয়ে ঈশ্বরের নিকট আমার কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। আমি বলব না যে এখানেই সব কাজের শেষ, কারণ আমি মনে করি যে আমার জীবনের কাজ এখনও শেষ হয়নি। আমি দাবী করছি, এতদিন ধরে যে আশা যে বিশ্বাস পোষণ করে আসছি (যা এখনও অনির্বাণ দীপশিখার মত জ্বলছে) তা, আজকের দিনের এই কার্যাবলীর গতি দেখেই বলতে পারা যায় যে, সফল হয়েছে। আমি চাই আমার সেই আশা, সেই বিশ্বাস আমার লক্ষ লক্ষ দেশবাসীর মধ্যে সঞ্চারিত হয়ে তাদের নিয়মতান্ত্রিক পথে, অবাধগতিতে, বর্তমান সমাজ জীবনের রাজনৈতিক কাঠামোর মধ্যে কোন প্রকার বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি না করে সেই স্বাধীনতা লাভের জন্য কণ্ঠে উচ্চ রব যে স্বাধীনতার প্রতিশ্রুতি আমরা সম্রাট ও যুক্তরাজ্যের পার্লামেন্টের কাছ থেকে পেয়েছি এবং যে স্বাধীনতা বিধির বিধানে মানব সমাজের ক্রমোন্নতির স্তরে আমাদের অবশ্য প্রাপ্য।"

বিলটি গ্রহণ করার জন্য প্রস্তাব করে আমার বক্তৃতার উপসংহারে আমি যা বলেছিলাম, তা উদ্ধৃত করছি :—

"মহাশয়, ব্যক্তিগতভাবে আমার নিকট এই বিলটি একটি সান্ত্বনার বেশ একটি পরিতুষ্টির বিষয়। আমার নিকট এটি আমার সারা জীবনের সকল স্বপ্নের একটি সাফল্য। সেই ১৮৯৯ সাল থেকে এই আশা নিয়ে আমি বেঁচে আছি যে আমি আমার নিজের নগরীকে স্বাধীনতার বেদীমূলে সজ্জিত করে নব-আলোকের রূপে দেখতে পাব। সেই চরিতার্থতা সম্পাদনে আমি আমার পক্ষ থেকে যেটুকু দিতে পারার মত অনুকম্পা ঈশ্বরের কাছ থেকে পেয়েছি সেজন্য তাঁকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। যে মূলনীতিগুলির কথা আমি বলে এসেছি, যে মূলনীতি-গুলির দিকে লক্ষ্য রেখে আমি বেঁচে আছি ও কাজ করেছি, সেগুলি এই বিলের অন্তর্ভুক্ত করতে আমি প্রয়াস পেয়েছি। এখন আমি এক অনির্বচনীয় আনন্দ লাভ করছি। আমার নিন্দা, আমার নামে দুর্নাম রটান, আমাকে গালিগালাজ করার যে চিঠি প্রতিদিনের ডাকে আমার সেই আনন্দই আজ কাজ করছে। বিতর্ককালে অনেক কড়া কড়া মন্তব্য করা হয়েছে, অনেক শক্ত ধাক্কাও দেওয়া হয়েছে। আমি আশা করি সেগুলি সবাই ভুলে যাবেন। সব ভুলে গিয়ে, সব ক্ষমা করে, আমাদের যারা সমালোচনা করেছেন তাদের প্রতি সহমর্মীতা সৌহার্দ প্রদর্শন করে, আসুন আমরা সকলে আজ যে

কাজ সম্পন্ন করলাম তার জন্য হর্ষোৎফুল্ল চিত্তে এই কাউন্সিল কক্ষ থেকে বিদায় গ্রহণ করি (শুনুন, শুনুন) এই বিলের সাফল্যের জন্য সংযোগিতা করার কলকাতার নাগরিকদের প্রতি আমি আবেদন জানাচ্ছি। এর সাফল্য লাভ হলে তা হবে আমাদের নাগরিক দায়িত্ব-বোধের একটি গৌরবময় কীর্তি স্তম্ভ; আর আমরা যে পূর্ণ দায়িত্বশীল সরকার চাচ্ছি তার পক্ষেও তা সবচেয়ে শক্তিশালী যুক্তিরূপে দাঁড়াবে এবং তাই হবে এই সভার ও পরবর্তী লেজিস্লেটিভ কাউন্সিল সমূহের সর্বোত্তম পুরস্কার (হর্ষ ধ্বনি)। কোন দলীয় ভেদ-বুদ্ধি যেন আমাদের মহান উদ্দেশ্যের সফল পরিণতিকে রুদ্ধ না করে।'

এই বিলের একটা প্রধান বিষয় ছিল সহরতলীর এক বিরাট অংশকে এর আওতার মধ্যে এনে কলকাতার আয়তন বৃদ্ধি করা। আমার নির্বাচন ক্ষেত্রের মধ্যেও এর এক অংশ পড়ে যায়। তাতে আমি আমার ক্ষেত্রের জন্য একটা বড় রকমের সুবিধাও পেয়ে গেলাম। এই সুবিধা পাওয়ার ব্যাপারটা এরকম ক্ষেত্রে পূর্ব নজিরের একটা ব্যতিক্রম। নতুন সংযোজিত অঞ্চলের কর দাতাদের পক্ষে কিছু কালের জন্য পাওয়া সম্ভব নয়। সুতরাং কলকাতার সঙ্গে সমান হারে তাদের করভার বহন করবেন, তা সঙ্গত নয়। সরকার এই যুক্তির সারবত্তা বুঝতে পারলেন এবং তা মেনে নিলেন। লেজিস্লেটিভ কাউন্সিলও তাতে মত দিলেন। সহরতলীর করদাতাদের প্রথম বছরে কোন ধার্য হারে কর দিতে হবে না এবং পরবর্তী চার বছরে কর্পোরেশন তাদের বিচার বিবেচনা অনুযায়ী করদাতাদের অনুকূলে একটা পৃথক হারে কর নির্ধারণ করবেন।

একটা সুনির্দিষ্ট নীতির অনুসরণ করেই আমি একটা সহরতলীর অঞ্চলকে কলকাতা কর্পোরেশনের সীমার মধ্যে নিয়ে এসেছি, মূল বিলে সহরতলীর একটি ক্ষুদ্র অঞ্চলকে কর্পোরেশনের মধ্যে আনা ছাড়া অন্য কোন প্রস্তাব ছিল না। কারণ আমি এই গণতান্ত্রিক নীতিই গ্রহণ করেছিলাম যে নীতিই জনগণের পূর্ণ ইচ্ছা ও সম্মতের বিরুদ্ধে এরকম সীমা সম্প্রসারণ করা উচিত হবে না। তাদের স্থানীয় প্রশাসনের ব্যাপারে তাদের সঙ্গে যুক্ত তাড়িয়ে নেওয়া পশুর মত ব্যবহার করা চলবে না। যদ জন্য অপদেশে আমি যে অভিজ্ঞতা লাভ করেছি তাতে জনগণের ইচ্ছার বিরুদ্ধে সীমার পরিবর্তন ঘটালে তা যে কি পরিমাণ বিক্ষোভের সৃষ্টি করতে পারে তাও আমি জানি। কিন্তু এই সমস্ত অঞ্চলের জন স্বাস্থ্যের কথা বিবেচনা করেই এই দাবী তোলা হয়েছিল। অতঃপর এডভোকেট জেনারেলকে প্রেসিডেন্ট করে আমি একটি সীমানা কমিশন গঠন করলাম। এই কমিশনে আরও দুজন সদস্য ছিলেন। তার মধ্যে একজন ছিলেন ইয়োরোপীয় যার নিরপেক্ষ বিচার বুদ্ধি ও স্বাধীন চিন্তা ছিল প্রশ্নের অতীত। এই কমিশনের কর্মীগোষ্ঠী ও তাদের দেওয়া রিপোর্ট জনগণ অনুমোদন করেন আমি সে রিপোর্ট গ্রহণ করলাম।

(চলবে)

(৫ম পাতার শেষাংশ)

আলেকজাণ্ডারের অধিকারে এল। তখন তাঁর বয়স মাত্র পচিশ বছর। দ্বিতীয় দারায়ুস-সিংহাসন ত্যাগ করে পলায়ন করলেন এবং তার এক বিদ্রোহী সামন্তের হাতে নিহত হলেন। পারস্য সম্রাটের অধিকার গান্ধার পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল, পারস্য জয়ের ফলে আলেকজাণ্ডারের রাজ্যসীমা পাঞ্জাবের সমীপ-বর্তী হয় এবং তিনি ভারত আক্রমনে উদ্যোগী হন।

এম. লিংকন স্টার সম্পাদিত দি ট্রেজারী অব দি ওয়ার্ল্ডস গ্রেট লেটারস থেকে অনূদিত।

RegdNo.R. N .24511/71 | Biplabi Bangla Phone : 34-1795 | Regd. W B/NC 77

বার্ষিক :—ডাক ১৫.০০ টাকা | ষাণ্মাষিক :—৮.০০ টাকা | মূল্য—৩০ পয়সা

37

সম্পাদক—
শ্রীশান্তিপদ রায়চৌধুরী

॥ সম্পাদকমণ্ডলী

শ্রীজগদীশ চট্টোপাধ্যায় (সভাপতি)

শ্রীঅবেশচন্দ্র নন্দী
পুষ্প চ্যাটার্জী
মলয় ঘোষ

প্রকাশক ও মুদ্রক—
শ্রীঅনিল সেনগুপ্ত

বিপ্লবী [illegible]—৮

স্কেচিং—
শ্রীনিবেদোপাল পাল

বিপ্লবী পুস্তকমালা

নেতাজীর সিক্রেটস্যাভিস—ডাঃ পবিত্রগাহন রায়—৯'০০
বিপ্লবী মহানায়ক রাসবিহারী—সুবোধ মজুমদার
অনুশীলন সমিতির বিপ্লবী প্রচেষ্টা—ব্রজেন্দ্র দাস

—ক্ষীরোদ কুমার দত্তের—

১। বাংলার অগ্নিযুগ—১'৫০, ২। বহির্ভারতে ভারতীয় বিপ্লব প্রচেষ্টা—৮'০০ ৩। অনুশীলন সমিতির পি, মিত্তির—১'০০, ৪। দেওঘাটী সংগ্রাম কাহিনী—১'০০, ৫। কাকোরী শহীদবৃন্দ—১'২৫, ৬। কলকাতা বাজার সংগ্রাম কাহিনী—'৪০, ৭। রাসবিহারী ও অনুশীলন সমিতি—'৬০ ৮। স্বাধীনতাসংগ্রামী মা ও মেয়ে—'৪০, ৯। বিবেকানন্দ ও সমাজবাদ—'৬০ ১০। বিপ্লবী বিবেকানন্দ—'৫০, ১১। মহারাজ ও সুভাষচন্দ্র—'৪০ ১২। ভারতের নবজাগরণ ও ভগিনী নিবেদিতা—'১৫, ১৩। বেশ বাদের তোলেনি (১)—১'০০, ১৪। বেশ বাদের তোলেনি (২)—২'০০ ১৫। শহীদ চন্দ্রশেখর আজাদ—'৫০, ১৬। ১৯ই এপ্রিল জাতীয় শহীদ দিবস—১'০০, ১৭। হাতিয়ার তুলো প্রচেষ্টা—'১৫, ১৮। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও অনুশীল সমিতি—৪'০০, ১৯। ভারতের জাতীয় পতাকার ইতিহাস—'৪০, ২০। লাট হত্যা প্রচেষ্টা—১'৫০

প্রাপ্তিস্থান :— ৪নং বঙ্কিম ঘোষ ষ্ট্রীট কলিকাতা-৭০০০০৭

টাইপরাইটার—১/১/১/A বঙ্কিম চ্যাটার্জী ষ্ট্রীট কলিকাতা-৭৩

মূল কার্যালয়—৪নং বঙ্কিম ঘোষ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০০৭ শ্রীঅনিল সেনগুপ্ত কর্তৃক প্রকাশিত এবং তৎকর্তৃক প্রিন্টিং পাবলিসিটি, ১১৭, কেশবচন্দ্র সেন ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০০৯ হইতে মুদ্রিত।

বিপ্লবী বাংলা

॥ বিপ্লবী পরিষদের সাপ্তাহিক মুখপত্র ॥
স্থাপিত—১৯৫৬, 'বিপ্লবী বাঙ্গালী' নবকলেবরে—১৯৭৯

দশম বর্ষ	শনিবার ১৪ই চৈত্র, ১৩৮৭ ২৮শে মার্চ ১৯৮১	২৩ সংখ্যা

প্রতাপ যখন চেঁচিয়ে করে
দুঃখ দেবার বড়াই,
জেনো মনে তখন তাহার
বিধির সঙ্গে লড়াই।
দুঃখ সহার তপস্যাতেই
হোক বাঙালীর জয়,
ভয়কে যারা মানে তারাই
জাগিয়ে রাখে ভয়,
মৃত্যুকে যে এড়িয়ে চলে
মৃত্যু তারেই টানে,
মৃত্যু যারা বুক পেতে লয়
বাঁচতে তারাই জানে।

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

সম্পাদকীয়

জাতীয় সংহতি ও সংরক্ষণ

গুজরাট প্রদেশে দীর্ঘদিন ধরে আসন সংরক্ষণের ব্যাপার নিয়ে সেখানকার ছাত্ররা যে আন্দোলন শুরু করেছিল, তার রং ও রূপ আজ ছাত্রদের একিয়ারে সীমাবদ্ধ নেই। যেমন সাধারণতঃ ঘটে থাকে, আন্দোলন যারা আরম্ভ করে ক্রমে ক্রমে আন্দোলনের নেতৃত্ব তাদের হাতছাড়া হয়ে যায়। এই অসন্তোষের সুযোগ নিয়ে রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হয়, বিচ্ছিন্নতাবাদী ও রাজনৈতিক সুযোগ সন্ধানীর দল। পোষ্ট গ্রাজুয়েট মেডিকেল কোর্সে মেধাবী ছাত্রদের স্বাভাবিক অধিকার সংকুচিত করে, সংখ্যালঘু এবং অনগ্রসর শ্রেণীর জন্য আসন সংরক্ষিত করা উচিৎ কিনা এটা অবশ্যই বিতর্কিত বিষয়। সাধারণ স্তর পর্য্যন্ত এই বিশেষ অধিকার সীমিত সময়ের জন্য সংরক্ষিত করার ব্যবস্থা ভারতের সংবিধান সম্মত। সেখানে কোন আপত্তি নেই অগ্রসর শ্রেণীর মধ্যে। কিন্তু তারা প্রশ্ন তুলেছিল যে মেধাবী ছাত্রদের নাকচ করে যদি সাধারণ বুদ্ধি সম্পন্ন মানুষদের জন্য, তা তারা যে শ্রেণীভুক্তই হোক না কেন, যদি এই ব্যবস্থা চালু থাকে দীর্ঘদিন ধরে, তবে সেটা দেশের পক্ষেই ক্ষতিকারক হয় শেষ পর্য্যন্ত। ডাক্তার যদি মেধাবী না হয়, তবে চিকিৎসা ব্যবস্থার অপকর্ষ সাধিত হতে বাধ্য। আইনের বিশিষ্ট জ্ঞান না থাকলেও তাকে যদি হারাহারিভাবে অনগ্রসতার দোহাই দিয়ে, সার্বোচ্চ আদালতের বিচারক নিযুক্ত করা হয়, তবে বিচার ব্যবস্থার অবনতি ঘটবেই। আজ যদি সৈন্যবিভাগে, পারমানবিক গবেষণা ক্ষেত্রে, মনীষা ও উচ্চস্তরের মেধাসম্পন্ন মানুষকে সুযোগ না দেওয়া হয় ঐ একই কারণে তবে ত দেশের ভবিষ্যৎ অন্ধকারাচ্ছন্ন হতে বাধ্য। তা ভিন্ন এতে দেশের ঐক্য ও সংহতি নষ্ট হয় পরিণামে। এক সম্প্রদায়ের লোক ক্ষুব্ধ হয়, সুযোগ লাভকারী সম্প্রদায়ের লোকদের উপর। তারাও মনে করে, জ্ঞানলাভ যাই হোক না কেন, সুযোগ তাদের মিলবেই। প্রতিযোগিতা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে না পারলে, আখেরে তাদের লাভের থেকে লোকসান হবে অনেক বেশী। সমগ্রভাবে বিচার-বিবেচনায় এটাও প্রতিভাত হবে, কেউ এই ব্যবস্থায় লাভবান হবে না।

দেশের মানুষের জ্ঞান ও গুণের সমাদর না হলে, বিশ্ব প্রতিযোগিতায় তা হলে ভারতবাসীরা কোনদিনই সম্মানের আসনে প্রতিষ্ঠিত হতে পারবে না। এমন সমূহ ক্ষতি হয় যে ব্যবস্থায়, সে ব্যবস্থা শুধু চালু না রাখাই উচিৎ নয়, তার বদলবদল হওয়া একান্ত প্রয়োজন। প্রধানমন্ত্রী নিজেই বলেছেন যে সংরক্ষণ হল এক রকমের Crutch (ক্রাচ্), এই Crutch (বা অন্ধের যষ্টি) দীর্ঘদিন ব্যবহার করা মঙ্গলজনক নয়। একথা চিন্তাশীল মানুষ মাত্রেই জানেন যে সংরক্ষণের ব্যবস্থা দেখে, নতুন নতুন সংগঠন গড়ে উঠছে এই প্রকার সুযোগ সুবিধালাভের জন্য। তারা নজিরে উৎসাহিত হয়ে আন্দোলন শুরু করে। যার ফলশ্রুতি দেখা যায় দেশব্যাপী দাঙ্গাহাঙ্গামা। ইন্ধন দেবার দেশী বিদেশী কিছু লোকেরও অভাব হয় না। সব ভারতবাসীরই সমান সুযোগ লাভের অধিকার আমাদের সংবিধানে আছে। দেশটা যে সবারই, সমস্ত দেশের মানুষই যে ভাই ভাই, এই মানসিকতা বিনষ্ট হয়েছে অতীতে এবং ভবিষ্যতেও হবে যদি এই পৃথক অধিকারের ব্যবস্থা বাতিল করা না হয়। ইংরেজ এই নীতি অনুসরণ করেই হিন্দু ও মুসলমানের

মধ্যে বিভেদের বীজ বপন করেছিল. যেটা এতদিন ফলে ফুলে পরিণত হয়ে দেশবিভাগ অনিবার্য করেছে। এই বিচ্ছিন্নতামুখী মানসিকতাকে প্রশ্রয় দিলে, ভারতবর্ষ কি শিখস্থান, পার্লিস্থান, দ্রাবিড়স্থান প্রভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ডে বিভক্ত করার পথ প্রশস্ত করা হবে না? একথা আজ ভেবে দেখার সময় এসেছে এবং একদিনও দেরী না করে জাতির অঙ্গ থেকে এই বিষফোড়াকে কেটে বাদ দেওয়া সমগ্র ভারতের ভবিষ্যতের জন্য একান্ত প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। একথা সমগ্র দেশের মানুষ যদি দেশপ্রেমের আদর্শ থেকে চ্যুত হবে, সম্প্রদায়গত প্রেমে বিভোর হয়, তবে তার ফল যে মারাত্মক হয়, একথা অনস্বীকার্য। একথা অজানা নেই যে একদল রাজনৈতিক ব্যবসায়ী নির্বাচনে সাধারণ প্রতিযোগিতার সম্মুখীন না হয়ে এই রন্ধ্রপথে নিজ নিজ ফায়দা তুলতে অশোভন ভাবে আগ্রহী। রাজনৈতিক দলগুলিও এই দোষ থেকে মুক্ত নয়। এই অধিকারকে স্থায়ী করার জন্য অনেকেই শুধু আগ্রহীই নন, এমন কি 'রণং দেহি' হুঙ্কারও দিয়েছেন।

দেশপ্রেমিক মানুষ মাত্রেই মনে করেন যে, প্রয়োজন হলে সমগ্র বিষয়টি একটু রদবদল করা যেতে পারে। কোন নীতি নির্ধারণ করার পর বাস্তব ক্ষেত্রে যদি দেখা যায় যে তার পুনর্মূল্যায়ন প্রয়োজন, তবে সেকাজ করতে কোন দ্বিধা থাকা উচিৎ নয়।

আনন্দের কথা প্রধানমন্ত্রী বিরোধী দল নেতাদের সঙ্গে এই সমস্যা নিয়ে আলোচনা করেছেন এবং সুষ্ঠু সমাধানের জন্য তাদের সহযোগিতা ও কার্যকরী সাহায্যও চেয়েছেন। আরো আনন্দের কথা, যে বিরোধী দলেরা এতে উৎসাহজনক সাড়া দিয়েছেন এবং গুজরাটের অন্যায্য আন্দোলনের বিরুদ্ধতা করেছেন। ভারতবর্ষের আধুনিক কালের ইতিহাসে বিরোধীরা এমন দায়িত্বপূর্ণ ও নির্ভুল পন্থা অনুসরণ করেছেন বলে মনে হয় না। এই প্রকার কাজই সব দেশের বিরোধী দলগুলি করে থাকেন জনসমর্থন লাভের জন্য। তাদের সাধুবাদ অবশ্যই প্রাপ্য।

দেশ চায় পরিণত বুদ্ধি, শুভ দৃষ্টি সম্পন্ন মানুষ, যারা দেশকে প্রগতির পথে নিয়ে যাবে এবং জগৎসভায় শ্রেষ্ঠ আসন লাভ করতে সাহায্য করবে। একদল 'রাম-খোকা' বানাবালক চিরদিনের জন্য সৃষ্টি করতে চায় না। অনগ্রসর শ্রেণীর মানুষদের মধ্যে ঢালাওভাবে শিক্ষা বিস্তারের ব্যবস্থা করতে হবে। সেজন্য সব রকম সুযোগ সুবিধা দিতে হবে। তাদের বুঝিয়ে দিতে হবে যে প্রতিযোগিতার সম্মুখীন তাদের হতেই হবে একদিন এবং সেদিন অনাদি অনন্তকাল অবধি বিস্তৃত থাকতে পারে না। তাদের মধ্যে আমেদ করের মত প্রতিভা সৃষ্টি হোক এটাই কাম্য। তা ভিন্ন, প্রকৃত শিক্ষালাভ করলে সবাই অনগ্রসর বলে চিহ্নিত হতে অপমানজনক বলে মনে করবেন।

গুজরাটের আন্দোলন যখন এদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করছে, তখন এই সুযোগ গ্রহণ করতে হবে দেশনায়কদের। সঙ্গে সঙ্গে গুজরাটের ছাত্রদের নিকটও আবেদন করি, পাথর ছুঁড়ে, মানুষ খুন করে, ঘর বাড়ি জ্বালিয়ে কোন সমস্যার সমাধান হয় না। নেতৃবৃন্দের নিকট তাদের বক্তব্য রাখুন, আলাপ আলোচনার মাধ্যমে সন্তোষজনক সমাধান খুঁজে বের করুন, এটাও তাদের নিকট প্রত্যাশা করে দেশের মানুষ। নাস্তপন্থা বিদ্যতে অয়নায়, এছাড়া কোন পথ নেই। প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে এ কাজ সমাধা হবে, এটাই প্রত্যাশা করে সবাই।

সংরক্ষণ ব্যবস্থার ভালমন্দ

কালীপদ সরকার

ডাক্তারি ছাত্রদের সংরক্ষণ বিরোধী আন্দোলনকে কেন্দ্র করে গুজরাটে যে ব্যাপক অশান্তি ঘটল তার পিছনে বিচারযোগ্য অভিযোগ থাকতে পারে, কিন্তু আন্দোলন যখন গণতান্ত্রিক আচরণ সীমা ছেড়ে রাষ্ট্র বিরোধী ধ্বংসাত্মক খণ্ডযুদ্ধের রূপ নেয় তখন তা সর্বৈব নিন্দনীয়। এ অবস্থায় সরকারের পক্ষে কঠোর হওয়া ছাড়া উপায়ান্তর থাকে না।

গুজরাটের আগে বিহারেও সংরক্ষণ বিরোধী আন্দোলন হয়েছিল। অপর রাজ্যগুলিতেও এ সম্পর্কে যে অসন্তোষ নেই এমন কথা বলা যায় না। সংরক্ষণ সম্পর্কে সংবিধানের নির্দেশ মেনে চলাই আমাদের জাতীয় নীতি, তবে এ বিষয়ে প্রধানমন্ত্রীর উদ্যোগে সম্প্রতি যে সর্বদলীয় আলাপ আলোচনা শুরু হয়েছে তাকে আমরা স্বাগত জানাই।

সংবিধানের ১৫ অনুচ্ছেদে জাতি ধর্ম শ্রেণী নির্বিশেষে সকল ভারতবাসীর সমান অধিকার স্বীকৃত। ২০ (২) অনুচ্ছেদে নির্দেশ আছে যে জাতি ধর্ম ও শ্রেণীর কারণে কোন ভারতবাসীর সরকারী ও সরকারী সাহায্যপ্রাপ্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তির অধিকার ক্ষুণ্ণ হতে পারবে না। ১৬ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে যে সরকারী চাকুরীর ক্ষেত্রে সকল নাগরিক সমান অধিকার পাবে। যোগ্যতাই নিয়োগের একমাত্র মাপকাঠি। এই হল ভারতীয় সংবিধানের মৌল নির্দেশ। এই নির্দেশাবলীর শেষে একটি অস্ত্রবিধিতে তপশিলী ও আদিবাসী হিন্দুদের জন্য লোকসভা, বিধানসভা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি এবং সরকারী চাকুরিতে নিয়োগের ক্ষেত্রে আসন সংরক্ষণের বিধান লিপিবদ্ধ আছে।

১৯৫০ সালে সংবিধান গ্রহণ কালে সংরক্ষণ ব্যবস্থা দশ বছরের জন্য নির্দিষ্ট হয় এবং তাতে বলা হয় যে দশ বছর অন্তে লোকসভা প্রয়োজনবোধে সংরক্ষণের মেয়াদ বৃদ্ধি করতে পারবে। তপশিলী ও আদিবাসীদের অনগ্রসরতা এবং তারা যাতে দ্রুত মূল সমাজের সহিত একীভূত হতে পারে সেই উদ্দেশ্যে এই সংরক্ষণ ব্যবস্থা করা হয়। এই ভাবে সংরক্ষণ চলতে থাকে এবং ১৯৮০ সালে লোকসভা আরও দশ বছরের জন্য সংরক্ষণ ব্যবস্থা চালু রাখার নির্দেশ দেয়। আজ প্রশ্ন উঠেছে যে সংরক্ষণ ব্যবস্থার ফলে তপশিলী ও আদিবাসী সম্প্রদায়ের উন্নতি কতটা ত্বরান্বিত হয়েছে এবং কতকাল এই সংরক্ষণ ব্যবস্থা চালু থাকবে।

এ সম্পর্কে যে সকল বিষয় সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে সে গুলি হল, (১) সংরক্ষণের প্রয়োগ ক্ষেত্র কতদূর সম্প্রসারিত করা যুক্তিসঙ্গত, (২) সংরক্ষণ কি প্রতিভা বিকাশের অন্তরায় সৃষ্টি করছে না এবং (৩) সংরক্ষণ ব্যবস্থা সময়ের পরিবর্তে একটি নতুন জাতিগত শ্রেণী স্বার্থ গড়ছে কিনা।

গুজরাটের ছাত্র বিক্ষোভের কারণ স্নাতকোত্তর উচ্চ মেডিকেল ডিগ্রী কোর্সে আসন সংরক্ষণকে কেন্দ্র করে। ছাত্রদের দাবি, স্নাতকোত্তর মেডিকেল কোর্স গবেষণামূলক বিশেষ শিক্ষা ক্ষেত্র, সেখানে

ছাত্র ভর্তি যোগ্যতার মানদণ্ডে নির্ণীত হওয়া উচিত এবং আদিবাসী ও তপশিলীদের জন্য সংরক্ষিত আসনে প্রার্থী না থাকলে, সে আসনগুলি অপর মেধাবী ছাত্র প্রার্থীদের দেওয়া হোক। গুজরাট রাজ্য সরকার ছাত্রদের দ্বিতীয় দাবি মেনে নিয়েছেন।

তপশিলী ও আদিবাসী ছাত্রদের জন্য বিশেষ বৃত্তি, অনুদান এবং সরকারী খরচে বিদেশে শিক্ষা-লাভের ব্যবস্থা আছে। সাধারণ শিক্ষার ক্ষেত্রে এ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে তেমন অভিযোগ নেই, কিন্তু ডাক্তারি, ইনজিনিয়ারিং, গবেষণামূলক বিদ্যা এবং প্রশাসনিক উচ্চ পদে নিয়োগের ক্ষেত্রে আসন সংরক্ষণের ব্যবস্থা নিঃসন্দেহে প্রতিভার প্রতি অবিচার এবং জাতীয় জ্ঞান বিজ্ঞান বিকাশের প্রতিকূল। নিম্নমানের ছাত্রদের ডাক্তারি ইনজিনিয়ারিং প্রভৃতি শিক্ষাকেন্দ্রে এইভাবে জাতি শ্রেণী এবং আঞ্চলিক ভিত্তিতে ভর্তির ব্যবস্থা বস্তুতঃ সংবিধানের মৌল নির্দেশেরও বিরোধী। এ প্রসঙ্গে পশ্চিমবঙ্গে মেডিকেল কলেজে ছাত্রভর্তির ব্যাপারে যে জেলা ভিত্তিক আসন সংরক্ষণের ব্যবস্থা ছিল তা মনে পড়ে। এ ব্যবস্থা দেশের পক্ষে ক্ষতিকর এবং বিচ্ছিন্নতাবোধ সৃষ্টি করে। প্রতিভার অবক্ষয় তো আছেই।

সুতরাং সংরক্ষণ নীতির প্রয়োগক্ষেত্র সীমাবদ্ধ করা একান্তভাবে সঙ্গত।

অনেকের অভিমত যে সংরক্ষণের সুযোগ আদিবাসী ও তপশিলীদের সকলে ভোগ করতে পারছে না, যারা আর্থিক দিক দিয়ে সুপ্রতিষ্ঠিত তাদের পরিবারের লোকই এই সুযোগ নিয়ে চলেছে এবং আদিবাসী ও তপশিলীদের মধ্যে একটি সুবিধাভোগী পৃথক শ্রেণী গড়ে তুলছে। এ অভিযোগ সম্পর্কে সমীক্ষার প্রয়োজন আছে নতুবা সংবিধান নির্দিষ্ট সংরক্ষণ নীতির উদ্দেশ্যই বিফল হবে।

অনগ্রসরতার মূলে দারিদ্র্য। তপশিলী ও আদিবাসী সম্প্রদায়ের লোক ছাড়া, তথাকথিত বর্ণহিন্দু মুসলমান ও খৃষ্টানদের মধ্যেও দারিদ্র্য পীড়িত লোকের সংখ্যা প্রচুর। যে দেশের অধিবাসীদের শতকরা ৬০ ভাগ নিরক্ষর এবং দরিদ্র, সেখানে সংরক্ষণ ব্যবস্থা বিশেষ সম্প্রদায়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে আর্থিক দিক দিয়ে অনুন্নত সকল সম্প্রদায়ের লোকের জন্য নির্দিষ্ট করা কি যুক্তিযুক্ত নয়? এমনি জাতপাতের বিচার আমাদের জাতীয় জীবনে এক দুরারোগ্য ব্যাধি হয়ে আছে, তার ওপর আর একটা নতুন শ্রেণীগত কায়েমী স্বার্থ গড়ে তোলা কি সুবিবেচনার কাজ? তিন বছর ধরে সংরক্ষণ নীতি চালু রাখার ফলে তপশিলী ও আদিবাসীরা শিক্ষা ও সরকারী চাকুরির ক্ষেত্রে বেশ কিছু স্থান সংগ্রহ করেছে ঠিকই, কিন্তু তার ফলে সমাজ সমন্বয় কি সত্যই কিছু ঘটেছে, না সুবিধাভোগীরা একটি বিশেষ স্বার্থ সচেতন গোষ্ঠীতে পরিণত হচ্ছে? এমন বহু প্রশ্ন ও সমস্যা আছে জাতীয় স্তরে যাদের সমাধান প্রয়োজন।

সংবিধানপ্রণেতাগণ সমাজ সমন্বয় ও উদার মনের যে লক্ষ্য নিয়ে তপশিলী ও আদিবাসীদের জন্য সংরক্ষণ ব্যবস্থা চালু করেছিলেন কালক্রমে সেই লক্ষ্য যে নির্বাচনে তপশিলী ও আদিবাসীদের ভোট সংগ্রহের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের মধ্যে তোষণের অশুভ প্রতিদ্বন্দ্বিতায় পরিণত হয়েছে সে কথা কি কেউ অস্বীকার করতে পারেন? বর্তমানে লোকসভার ১১০ জন এবং রাজ্য বিধান সভাগুলিতে ৮২৫ জন তপশিলী ও আদিবাসী সদস্য দ্বারা শাসকদল সমৃদ্ধ। অন্য দলেও তাদের কিছু সদস্য আছেন। এই সদস্যদের তুষ্টি সাধনের উদ্দেশ্যেই যে সংরক্ষণ

নীতির প্রয়োগক্ষেত্র সম্প্রসারিত হয়েছে সে কথা কি অমূলক ?

নির্বাচন জয়ের জন্য সাম্প্রদায়িক এবং আঞ্চলিক দলগুলিকে যেমন স্বীকৃতি দেওয়া হয় এবং সংকীর্ণ দাবি দাওয়া পূরণের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়, উপজাতি ও তপশিলী সম্প্রদায়ের লোকদেরও সেই ভাবে তোষণের চেষ্টা হয়। রাজনৈতিক দলগুলির এই ধরনের কাজ শুধু নিন্দনীয়ই নয়, জাতীয় সংহতির পক্ষেও বিপদের কারণ। তাই ঐ বিষয়ে জাতীয় স্তরে রাজনৈতিক দলনেতাদের মধ্যে একটা বোঝাপড়া ও জাতীয় নীতি নির্ধারণ অত্যাবশ্যক। সংরক্ষণ সম্পর্কে আলোচনা যখন শুরু হয়েছে তখন এই সুবিধাবাদী নীতির ফয়সালা হয়ে যাওয়া ভাল।

প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী সংবিধান নির্দিষ্ট সংরক্ষণ নীতি সমর্থন করলেও তিনি বলতে দ্বিধাবোধ করেননি যে, সংরক্ষণ ব্যবস্থা অনন্তকাল চলতে পারে না। এই ব্যবস্থা প্রতিযোগী ব্যক্তির যষ্টির তুলা এবং প্রকৃত প্রস্তাবে তপশিলী ও আদিবাসীদের আত্মোন্নয়ন প্রয়াসের পথে বাধার মত কাজ করে। প্রকৃত প্রতিভার বিকাশের ক্ষেত্রে সংরক্ষণ ব্যবস্থা যাতে কোনরূপ অন্তরায় না ঘটায় তা দেখবার কথাও তিনি বলেছেন। বলা বাহুল্য যে প্রধানমন্ত্রী দেশবাসীর ভাবনাকে উপলব্ধি করেছেন এবং যথাযোগ্য সিদ্ধান্ত গ্রহণে অগ্রসর হয়েছেন। মোরারজী দেশাই অথবা চরণ সিং-এর ন্যায় ইন্দিরা গান্ধী ক্যাড বা বেতালের শিকার নন, তাঁর মানসিকতা সংবেদনশীল, যুক্তি নির্ভর এবং বাস্তব ধর্মী। এ ব্যাপারে বিশ্বের রাষ্ট্রনায়কদের মধ্যে শ্রীমতী গান্ধী অনন্য ও তুলনারহিত।

সংরক্ষণ ব্যবস্থা যে একটি কায়েমী স্বার্থের রূপ নিয়েছে সম্প্রতি সংরক্ষণনীতির পরিবর্তন আশংকায় হরিজন নেতা জগজীবন বাবুর শ্রেণী সংগ্রামের হুমকি থেকে তা বোঝা যায়। সংরক্ষণ একটি সাময়িক ব্যবস্থা, একদিন সংরক্ষণকে তুলে দিতেই হবে, তখন কি একটা মহামারী কাণ্ড ঘটবে না তাই অচিরে সংরক্ষণের ভিত্তি জাতি জন্মগত না রেখে অর্থনৈতিক ভিত্তিতে স্থির করা উচিৎ এবং তা হবে প্রকৃত গণতন্ত্র সম্মত।

তপশিলীদের মধ্যে হরিজনরাই বেশি অনগ্রসর, অপর তপশিলীদের তপশীল (তালিকা) থেকে খারিজ করাও যেতে পারে। মনে রাখা দরকার, হিন্দুদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে ব্রিটিশ একদা তপশিলী হিন্দু সম্প্রদায় সৃষ্টি করেছিল। তখন এমন অনেক শ্রেণীকে তপশিলে ঢোকানো হয়েছিল যারা তথাকথিত বর্ণহিন্দুদের চেয়ে আর্থিক সঙ্গতিতে ন্যূন ছিল না। স্বাধীন ভারতে সংহতি বিনাশী ব্রিটিশ ব্যবস্থাকে অধিক কাল বহাল রাখাও ঠিক নয়।

পশ্চিমবঙ্গের ন্যায় অনেক রাজ্যেই মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত শিক্ষা অবৈতনিক সুতরাং তপশিলী ও আদিবাসীদের জন্য বিশেষ ছাত্রবৃত্তিও অপ্রাসঙ্গিক। জাতি ও জন্মগত অনগ্রসরতার ভিত্তিতে যে সংরক্ষণ ব্যবস্থা চালু আছে তার সময়সীমা বেঁধে দেওয়া ভাল, তাহলে যেমন সংরক্ষণ তুলবার সময় হাঙ্গামার সম্ভাবনা হ্রাস পাবে, তপশিলী ও আদিবাসীরা অবস্থা বুঝে দ্রুত অগ্রগতি ঘটাতে সচেষ্ট হবে।

গণতন্ত্রের নামে দলতন্ত্র বলবৎ

বংশীধর বন্দ্যোপাধ্যায়

বামফ্রন্টের প্রধান শরিক সি, পি, এম, দল সম্প্রতি নিজ দলের বাস্তব অবস্থা বর্তমানে কিরূপ, তা খতিয়ে দেখার কালে স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছে যে; শহরাঞ্চলের মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মানুষ, বুদ্ধিজীবি, নিম্নবিত্তরা, স্বনিয়োজিত মানুষ, শিক্ষক সম্প্রদায় ও অফিস আদালতে নিযুক্ত কর্মচারীবৃন্দ এবং বিভিন্ন কলে-কারখানায় কর্মরত শ্রমিকগণ সি, পি, এম দলের রাজ্যশাসন ব্যবস্থায় অসন্তুষ্ট ও বীতশ্রদ্ধ। ফলে সামগ্রিক ভাবে শহরাঞ্চলে সি. পি, এম দলের প্রভাব প্রতিপত্তি পূর্বের তুলনায় অনেকাংশে ক্ষীয়-মান. কারণ শহরে জনগণ থাকেন দুঃখ-কষ্টে পতিত বামফ্রন্ট শাসনে।

শহরের অধিকাংশ মানুষ সি. পি. এম দলের কথা ও কাজের মধ্যে পর্বত প্রমাণ ব্যবধান, মারাত্মক দলবাজী, শিক্ষাব্যবস্থায় নির্লজ্জ হস্তক্ষেপ, সর্বসাধারণকে বঞ্চিত করে দলীয় লোকদের চাকুরী দান, সর্বত্র দলীয় প্রাধান্য বাড়াবার জন্য জনগণের উপর অযথা অত্যাচার, শরিকদলগুলির স্বাধিকার হরণ, পদে পদে মিথ্যাচার, সর্ব-ব্যাপারে সীমাহীন মিথ্যা প্রচার, অকারণ বিভ্রান্তি সৃষ্টি, পুলিশ প্রশা-সনকে নিষ্ক্রিয় রেখে তাকে দলের আজ্ঞামত পরি-চালন, আইন-শৃঙ্খলার চরম অবনতি সাধন, ট্রেড-ইউনিয়ন ক্ষেত্রে জোরজবরদস্তি-মূলক পন্থায় অন্যান্য দলের চালু ইউনিয়নকে সিটুর খন্নরে তুলে দেওয়া, দলীয় স্বার্থে কো-অরডিনেশন কমিটির সাযাযো নিরপেক্ষ সরকারী কর্মচারী ও অফিসারদের শাসানো ও যত্রতত্র বিনাদোষে তাদের শাস্তিমূলক বদলির জমি তৈরী ও ঘন ঘন বদলি করণ সাধারণ প্রশাসনকে কো অরডিনেশন কমিটির নেতা ও কর্মীদের আজ্ঞাবহ সংস্থায় পরিণত করণ, প্রাথমিক শিক্ষার স্তর থেকে মাধ্যমিক—কলেজী স্তর বিশ্ববিদ্যালয় স্তর পর্যন্ত সর্বত্র দলীয় প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার জন্য হীন ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে পশ্চিমবঙ্গের সমগ্র শিক্ষা ব্যবস্থায় অকারণ অবিবেচনা প্রসূত এলাহী হস্তক্ষেপ, নিত্য প্রয়োজনীয় অত্যাবশ্যক সামগ্রী বিক্রয়ের প্রাত্যহিক স্বেচ্ছাকৃত ঘাটতি সৃষ্টি, কলেকারখানায় বিশেষ করে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পে, রি-রোলিং শিল্পে, পাওয়ার লুম পরিচালিত বস্ত্র শিল্পে, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রসায়ণ শিল্পে, রঞ্জন শিল্পে ও অন্যান্য ক্ষুদ্রায়তন নিত্যব্যবহার্য্য দ্রব্য প্রস্তুত-কারী সংস্থায় প্রতিনিয়ত সিটুর জুলুম ও অশান্তি সৃষ্টির হুমকি ও মাঝে মাঝে মারদাঙ্গার অবস্থা সৃষ্টির প্রয়াস দেখে সদা সন্ত্রস্ত ও বিরক্ত।

মানুষ শান্তি চায়, কাজেই সি, পি, এম দলের সৃষ্ট সদা অশান্তি, দাঙ্গাহাঙ্গামা, জুলুম, জবরদস্তি, খুন, জখম, গৃহদাহ, ডাকাতি প্রভৃতি হীন কাজকে মানুষ দূরে সরিয়ে রাখতে চায়। কিন্তু সি. পি, এম দল সরকার চালনাও করবে, আবার দেশে অনবরত হিংসার উস্কানি দেবে বা হিংসার ইন্ধন যোগাবে দল স্বার্থে—এটা কোন মানুষ আশা করেনি ইতিপূর্বে। তাই ঐ সব জঘন্য ক্রিয়াকলাপ দেখে বহু মানুষ সি, পি, এম দলের উপর পূর্বেন্যস্ত আস্থা বর্তমানে হারিয়ে ফেলতে বাধ্য হচ্ছে অবস্থার চাপে পড়ে।

এছাড়া গ্রাম বাংলায় সি পি, এম ঘরে ঘরে যে এশান্তির, বকমারি, হিংসার, পক্ষপাতিত্বের ও দল বাজীর দৃষ্টান্ত বাস্তবে স্থাপন করেছে তা চাক্ষুস দেখে এলে মানুষ শিহরিত, বিচলিত ও দারুন ক্রোধান্বিত হবেই।

অনাচার, অবিচার গৃহদাহই খুন জখম, রাহাজানি, ডাকাতি নারী হরণ ও ধর্ষণ, ক্রমাগত জোর-জবরদস্তি, পরস্ব অপহরণ, অগ্নি সংযোগ প্রভৃতি নক্কারজনক কাজ গ্রাম বাংলায় নিত্য সংঘটিত হচ্ছে। যেন উক্ত ঐ অন্যায় কাজই স্বাভাবিক! ফলে গ্রামের মানুষ পূর্ব পুরুষের ভিটা ছেড়ে দিয়ে অন্যত্র পালাতে সচেষ্ট।

গ্রামাঞ্চলে সি. পি. এম দল যে ভয়ঙ্কর সন্ত্রাসের রাজত্ব সৃষ্টি করে সাধারণ মানুষের অশেষ ক্ষতিসাধনে এবং রক্ত পক্কায়তের মাধ্যমে, তা সি, পি, এম দলের শহুরে নেতারাও সম্যকরূপে অবগত, তবুও তারা গ্রামে গ্রামে সি, পি, এম দলবিরোধী এক প্রবল জনশক্তি যে গর্জে উঠে সি. পি, এম দলকে ধরাশায়ী করার জন্য বর্তমানে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ছে বিপুল বেগে, সেকথা চেপে যাচ্ছে। শহরের মানুষ জানেই না যে, গ্রামে গ্রামে সি, পি, এম দলের কি দুরবস্থা এবং কেন গ্রামীণ মানুষ আজ সি, পি, এম কর্মীদের উপর দারুণ ভাবে আস্থাহীন। গ্রামবাংলার সি. পি, এম তার নিজের হীন কাজের ফলেই এভাবে দ্রুত পতনোন্মুখ। চালাকি দ্বারা আর কতদিন জনগণকে বৃথা স্তোক দিয়ে ভুলিয়ে রাখা সম্ভব?

সেটা বাস্তবে সম্ভব নয় বলেই সি. পি, এম দল খোজই জনচোকে হেয় প্রতিপন্ন হচ্ছে। বর্তমানে এ দলের নাম শুনলেই গ্রামবাংলার নিরপেক্ষ সাধারণ স্তরের মানুষ থেকে শুরু করে জ্ঞানী গুণীরা পর্যন্ত সকলেই বিশেষ ক্রোধ প্রকাশ করেন। তাঁরা সি. পি, এম দলের হীন কর্মের চাক্ষুস সাক্ষী। গ্রামে গ্রামে যে হিংস্রতার প্রকাশ ঘটেছে তার মূলে যে, সি, পি; এম দলের চক্রান্ত কার্যকরী তা গ্রামের সরল মানুষজনেরা জেনে গেছে। বলে তারা আগামী নির্বাচনে সি, পি, এমকে পরাস্ত করার জন্য সম্ভাব্য সকল ব্যবস্থাই গ্রহণ করছে গোপনে গোপনে অত্যন্ত বিচক্ষণতার সঙ্গে। তাওয়া ছড়িয়ে পড়ে দ্রুত বেগে এবং তাদের ক্ষমতায় থাকা বা পুনরায় ক্ষমতা লাভের তা প্রতিবন্ধক হয়। গ্রামে কি ভীষণ মারাত্মক দলবাজী চলছে তা না দেখলে কেউ অনুমানই করতে পারবে না।

সি, পি, এম কর্তারা গ্রামেই অধিক জুলুম চালিয়ে দল বাড়াতে গিয়ে এখন মহা ফাঁপড়ে পড়েছে, অন্তত: গ্রামবাংলার মানুষ তাই বলে। প্রতিটি গ্রামে সি, পি, এম দলবিরোধী এক দৃঢ় চেতা তরুণ গোষ্ঠি নূতন করে দল শক্তি গড়ে তুলতে তৎপর দেখা যায়। তারা কোন বিশেষ রাজনৈতিক দলের সমর্থক নয়, তারা মূলত: সি, পি, এম বিরোধী। এর আসল কারণ তারা যা বলে তা হচ্ছে এই যে; সি, পি, এম দল হঠাৎ ক্ষমতায় এসে ধরাকে সরা জেবে নিজ দলের আখের গোছাতে সদা ব্যস্ত।

দেশের লোক বাঁচুক বা মরুক তাতে ঐ দলের কিছুই যায় আসে না। তারা কেবল দলটাকে সব দিক দিয়ে এই তালে বড় ও শক্ত পোক্ত করে ফেলতে চায় ক্ষমতার সুযোগ নিয়ে। ওদের কাছে দলই বড়, দেশ নয় বা দেশের মানুষ নয়। ওদের দলের লোক যত বদ পাজী, অগ্নিসংযোগকারী, চোর ছ্যাঁচোড়, গুণ্ডা-ডাকাত, খুনে-নুটেরা, হিংস্র বিকৃতমস্তিষ্ক প্রকৃতির হোক না কেন, তবু তারাই প্রশংসনীয়,

আর অপরদলের লোক যত বড় জ্ঞানী বা গুণী বা মানব প্রেমিক বা দেশভক্ত হোক না কেন তবুও তারাই সি, পি, এম দল বিরোধী বলে প্রতিক্রিয়াশীল সি, পি, এম দলের ব্যাখ্যানুসারে। কি বিচিত্র শয়তানী ঐ সি, পি, এম দলের এবং তা সর্ব্বত্র প্রায় একই রকম জন ক্ষতিকারক আকার গ্রহণ করেছে বর্তমানে। ক্ষমতার এরূপ অপব্যবহার ইতিপূর্বে আর কোথায়ও দেখা যায়নি কম্যুনিষ্ট অধিকৃত দেশগুলি ছাড়া।

এরা আবার অপরকে স্বৈরতন্ত্রী বলে আনন্দ পায়। নিজেরা যে কি ভীষণ জন-বিরোধী সব নোংরা কাজে গোপনে গোপনে লিপ্ত, তা ভাবলে ঘৃণা হয় মানুষের মনে, তবু এরা গলাবাজী করে মিথ্যার পর মিথ্যা তথ্য পরিবেশন করে চলেছে জনগণের কাছে হীন ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়ে, যা আজ গ্রাম বাংলার মানুষ সরল হলেও অতি সহজে ধরে ফেলেছে বারবার ঘা খেয়ে খেয়ে! নির্লজ্জরা কিন্তু সমানে সেই একই নোংরামি চালাতে সচেষ্ট সর্বদা। কি বিচিত্র এদের ঐরূপ সব আচরণ? শহর থেকে বহু দূর দূরান্তরের গ্রামগুলিতে সি, পি, এম দল পুলিশকে সঙ্গে নিয়ে বা পুলিশকে সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয় রেখে সাধারণ নিরপেক্ষ মানুষ জনের উপর যে অকথ্য অত্যাচার রোজ চালাচ্ছে তা মর্মান্তিক দুঃখজনক। সেখানকার মানুষ সি, পি, এম কর্মী ও সমর্থকদের ভয়ে সদা সশংকিত ও প্রাণ ভয়ে দারুণ ভীত। অনেকেই গ্রাম ছেড়ে পালাতে সচেষ্ট, যারা অপারগ তারা ঐ অত্যাচার সহ্য করতে বাধ্য হচ্ছে ও অশ্রু বিসর্জন তাদের নিত্যকার ঘটনা।

ঐ সব এলাকায় ডাকাতি লেগেই আছে। প্রায় প্রতিদিনই ডাকাতির কারণে মানুষ ক্ষিপ্ত হয়ে উঠতে বাধ্য হচ্ছে স্বভাবতই, তবু তারা পুলিশ প্রশাসনের কাছ থেকে সময় মত সাহায্য বা সহযোগিতা পাচ্ছে না, উক্ত দলের কর্তাব্যক্তিদের নির্দেশ। কি অসহনীয় অমানুষিক অবস্থা তথায় বিরাজ করছে তা সরজমিনে তদারক না করলে কেউ-ই শহরে বসে অনুমান করতে পারবে না। বামফ্রন্টের অন্যান্য শরিকদলের কর্মী ও সমর্থকরাও একই ধরনের অত্যাচারের জ্বালায় মাঝে মাঝে সি, পি, এম দলের বিরুদ্ধে সোচ্চার হচ্ছে, তবে পুলিশ বা সাধারণ প্রশাসন একমাত্র সি, পি, এম দলের কথা ছাড়া আর কারো কোন অভিযোগে কর্ণপাত করছে না, এমনই সংবিধান বিরোধী অবস্থা আজ গ্রাম বাংলায় সর্বত্র প্রকট। এই জঘন্য মানবতা বিরোধী অবস্থার প্রতিকার করে যে কেউ অগ্রণী হচ্ছে, সেই দেখা যায় যে, খুন হচ্ছে নৃশংস ভাবে কয়েকদিন পরেই গুপ্ত ঘাতকের হস্তে। আর কতদিন ঐ সব অরাজকতা চলবে গ্রাম বাংলায়? আইন শৃঙ্খলা ভেঙ্গে পড়েছে পশ্চিমবঙ্গের প্রায় সর্বত্র, বিশেষ করে গ্রামবাংলায়। মানুষের সহ্যের সীমা বহু পূর্বেই ছাড়িয়ে গেছে, তবু এর কোন প্রতিকার নেই কেন?

শাসক যেখানে শোষকের ভূমিকায় অবতীর্ণ সেখায় জনগণের শান্তি বিঘ্নিত সর্বদাই। পশ্চিমবঙ্গে শাসকদল গ্রাম-বাংলায় অরাজকতা সৃষ্টিতে সিদ্ধহস্ত। হালে পশ্চিমদিনাজপুরে ব্যাপকহারে বন্দুক লুটের ঘটনা সেই সাক্ষই বহন করে। নকশালদের ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে শাসকদল সাধু সাজবার চেষ্টা করলেও উপদ্রুত এলাকার মানুষ জানে যে, নাটের গুরু আসলে কে বা কারা। শাক্ দিয়ে মাছ ঢাকবার সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থ করে সত্য আপন মহিমায় সেথায় ভাস্বর বলে সংবাদে প্রকাশ। পুলিশ নীরব দর্শকের ভূমিকায় ছিল কেন?

বামফ্রন্ট তথা সি, পি, এম শাসকরা উক্ত অরা-

জক ঘটনার বিন্দু-বিসর্গও কি পূর্বাহ্নে জানতো না? জেগে যে ঘুমায় তাকে জাগান বড়ই কঠিন। গ্রামাঞ্চলে সি, পি, এম কর্মীদের অজান্তে ঐ ভাবে অতগুলি বন্দুক লুট হয় কোন বিশেষ মন্ত্রবলে? নকশালরা কি জাদু জানে? যদি সত্যই তাই হয়, তবে শাসকদলের অযোগ্যতাই এর জন্য সম্পূর্ণ দায়ী, অপদার্থ শাসকের শাসন ক্ষমতায় থাকবার কোন অধিকার নেই—একথা কি সি, পি, এম স্বীকার করে না? জনগণকে রক্ষা করার যার ক্ষমতা ও বুদ্ধি নেই সে শাসক হবার স্পর্দ্ধা রাখে কোন সাহসে? নির্বোধ ও শক্তিহীন শাসক জনগণের পক্ষে দারুণ ক্ষতিকারক ও বিপদজনক। কাজেই উক্ত বন্দুক লুটের ঘটনার পর রামচট্টের পদত্যাগ করা সমীচীন ছিল।

কিন্তু এরা যে গণতন্ত্রের নামে দলতন্ত্র বলবৎ রাখতেই সদা যত্নশীল। এদের মুখ আর মন পরস্পর বিরোধী, তাই চরম অরাজকতাকে গ্রামবাংলায় প্রশ্রয় দিয়েও এরা আত্মপ্রসাদ লাভ করে। এরা হয় বোকা, আর না হয় বদমাইস—কি এরা? এরা ছলনার আড়ালে গা ঢাকা দিয়ে থাকতে চায় কেন?

কৃষি-সমাচার—

চাষের খবর জানাচ্ছি :

—শ্রীসাংবাদিক

দমদম জংশন ষ্টেশনের কাছে বীরপাড়া লেনে আভাদেবীর বাড়ীর ছাদে লাউ-এ ছড়াছড়ি। এত লাউ হয়েছে যে পাড়ায় বিলি করেও শেষ করা যায়নি। সম্প্রতি ছাদে লাউ দেখে অবাক হোতে হয়েছে; পাশের বাড়ীর ছাদে অনুরূপ লাউ চাষ দেখে। ঐ তল্লাটে অনেকে উৎসাহিত হ'য়ে ছাদে লাউ চাষ করবেন বলে ঠিক করেছেন।

এবার আম গাছে স্প্রে করার দিকে সকলের নজর পড়েছে। বারাসাত ২নং ব্লকের বাদু গ্রামের মোস্তাকিন্ মণ্ডল নিজের ছাড়াও অন্যের আম বাগান কিনে কীটনাশক ওষুধ প্রতিবছরের মত এবারও স্প্রে করার ব্যবস্থা করেছেন। তিনি মোট চারশো গাছে স্প্রে করার জন্য পরিমাণ মত সেভিন ৫০% ও হিলডান্ ৩৫% জোগাড় করে রেখেছেন। বারাসাত ১নং ব্লকের ছোট জাগুলিয়া গ্রামীন কৃষি-উন্নয়ন সংস্থার তরফ থেকে ডঃ চৌধুরীর ব্যবস্থাপনায় আমগাছে স্প্রে করার ব্যবস্থা করা হয়। প্রথম স্প্রে পর্ব শেষ হয়েছে। ২য় স্প্রে চলছে। সংস্থা কৃষকদের মধ্যে বিনা পয়সায় হিলডান্ ৩৫% কীটনাশক ওষুধ বিলি করেন। এ সব এলাকায় তারা ২০৯, হিলডান্, সেভিন সাম্বিধিন অনেকেই আমগাছে স্প্রে করেছেন।

মুর্শিদাবাদ জেলার কৃষি-বিভাগ থেকে জানান হচ্ছে :—

আলু তুলে নিয়ে ঐ জমিতে তিল বোনা ভাল। তিল চাষ করতে কোনো সার দিতে হবে না। তা না হলে, একরে ১৫ কেজি নাইট্রোজেন, ১৫ কেজি ফসফেট ও ১৫ কেজি পটাশ দিতে হবে। একরে বীজ লাগবে ৩ থেকে ৪ কেজি। বোনার আগে প্রতি কেজি বীজে তিন গ্রাম এ্যাগ্রোসেন জি এন্ অথবা ডায়াথেন্ এম্—৪৫ দিয়ে বীজ শোধন করে নিতে হবে। উন্নতজাত হোল বি—৬৭।

জাতীয় সংহতিতে সমলিপিব্যবস্থান

—জীবানন্দ ভট্টাচার্য

দেবনাগরী লিপি প্রচারের চেষ্টা উঠেছিল বাঙলাতেই। স্বর্গত সারদা চরণ মিত্র 'লিপি বিস্তার পরিষদ' গঠন করেছিলেন এবং পরিষদের মুখপত্র রূপে 'দেবনাগরী' নামে একটি সাময়িক পত্রিকাও প্রকাশ করেছিলেন। তার এক সংখ্যায় লিখেছিলেন,

'জগতে মহাদেশতুল্য বিশাল ভারতে জাতপাত, রীতি আচার, ধর্মমত পথের ভিন্নতা দৃষ্ট হয়। ভাব জগতে একটি মিল থাকা সত্ত্বেও ভিন্ন ভিন্ন ভাষার জন্য এক প্রদেশের বিচার বিবেচনার জন্য প্রদেশ-বাসীর লাভ কিছুই হয় না। আমাদের এমন একটি বৃক্ষরোপণ করা উচিত হবে যাতে একভাষারূপী সর্ব প্রিয় ফল ফলতে পারে। ভারতের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের ভিন্ন ভাষা একই লিপিতে লেখাই এ আশানুরূপ ফলদায়ক বৃক্ষের অঙ্কুর।'

প্রস্তাবটি এক লিপির এক ভাষার নয়। ভারতের রাষ্ট্রভাষা হিন্দী, রাষ্ট্র পর্যায়ে তার ব্যবহার ও প্রচারের চেষ্টা হচ্ছে এবং কালক্রমে সারাভারতে স্ব স্ব মাতৃভাষার সাথে হিন্দী ভাষার প্রচলন অবশ্যই সম্ভব হবে। হিন্দী প্রচারের সাথে নাগরী লিপি প্রচারকে এক করা ঠিক নয়। নাগরী বা দেবনাগরী হিন্দী লিপি নয়, বরং বলা চলে হিন্দী নাগরী লিপিতে লেখা হয় যেমন সংস্কৃত পালিও লেখা হয়। আদি ব্রাহ্মী লিপিই আর্য ভাষাগোষ্ঠীর বিভিন্ন ভাষার ভিন্ন ভিন্নরূপে পরিণত হয়েছে। প্রাকৃত থেকে ক্রমবিকাশের পথে ভিন্ন ভিন্ন রূপ নিয়েছে। নাগর ব্রাহ্মণরা যে লিপিতে সংস্কৃত লিখতেন তার নাম হয় নাগরী লিপি। অনুমতও আছে, —ভারতের শিক্ষা সংস্কৃতি ও ধর্মচর্চার প্রাণ কেন্দ্র কাশীকে বলা হত দেবনগর; এই দেবনগরের লিপিই দেবনাগরী, আর ভাষা দেবভাষা।

সুপ্রাচীন কাল হতেই ভারতের সর্বত্র পালি ও সংস্কৃত ভাষার পঠন পাঠনের প্রচলন চলে আসছে। নাগরী লিপিই এই ভাষার বাহন। এই প্রাচীন ভাষার দার্শনিক বিচার, মহাকাব্য ও সাহিত্যের উচ্চ ভাবকে বহন করে প্রবাহিত সর্বত্রই এই নাগরী লিপি। আর এই ভাব ধারায় অবগাহন করে সুন্দর সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছে ভারতের সমগ্র আঞ্চলিক ভাষাগুলি।

সংস্কৃতের পঠন পাঠন বাঙলায় অধিকাংশ ক্ষেত্রে বাংলা লিপিতে হয়, এইরূপ গুজরাটী মারাঠী লিপি-তেও হয়। সংস্কৃতে মূল গ্রন্থ গুলি দেবনাগরী লিপিতে লেখা ও পরে ছাপা। বাঙলায় গীতা, ষড়দর্শন ও সংস্কৃত সাহিত্যের প্রায় সব গ্রন্থই বঙ্গাক্ষরে মুদ্রিত। অন্যান্য ভাষার ক্ষেত্রেও একথা প্রযোজ্য।

এই ভাবে দেখা যায় নাগরী লিপির সাথে আঞ্চলিক লিপির সহাবস্থান। অনুরূপ বিভিন্ন ভাষা ভাষী শ্রেষ্ঠ চিন্তানায়কদের গ্রন্থও নাগরী লিপিতে মুদ্রিত হবার বাধা নেই। বস্তুত দীর্ঘ দিন ধরেই এ চেষ্টা চলে আসছে। মহাত্মা গান্ধীর আত্মচরিত 'সত্যনো প্রয়োগ' গুজরাতী ভাষায় কিন্তু নাগরী লিপিতেও প্রকাশ করিয়ে ছিলেন। তাঁর আশ্রম ভজনাবলীতে মারাঠী, গুজরাতী ও বাংলা ভজনগুলি নাগরী লিপিতে মুদ্রিত। মারাঠা কেশরী বাল গঙ্গাধর তিলক এই শতাব্দীর প্রারম্ভে নাগরী প্রচা-রিণী সভায় ভারতের সমগ্র ভাষার লিপি ও বর্ণমালা বিশ্লেষণ করে এই সিদ্ধান্ত প্রকাশ করেছিলেন যে

(এর পর ১২ পৃঃ দেখুন)

রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্র নাথের স্মৃতি কথা

["A Nation In Making" গ্রন্থ থেকে অনুবাদ]

অনুবাদক—অধ্যাপক নলিনীমোহন দাসগুপ্ত

মিউনিসিপ্যাল আইন

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

লেজিস্লেটিভ কাউন্সিলও তা গ্রহণ করলেন। তবে কাউন্সিল একটা বেশী অঞ্চলকে কর্পোরেশনের আওতার মধ্যে আনবেন যেটি কমিশন সুপারিশ করেন নি। জনমত এবং স্থানীয় মনোভাব মোটামুটি ভাবে সেই অতিরিক্ত অংশটিকে কর্পোরেশনের মধ্যে আনা সমর্থন জানাল। সীমা বাড়ানোর প্রশ্ন নিয়ে আমি লেজিস্লেটিভ কাউন্সিলে আমার নীতির ব্যাখ্যা করলাম এবং আশা প্রকাশ করে বললাম যে ভবিষ্যতে আমার পরে যারা আমার পদে আসীন হবেন তারা এবং তৎকালীন সরকারও এই নীতির অনুসরণ করবেন। আমি বললাম :

"আমার ধারণা খুবই স্বল্প সময়ে কলকাতা মিউনিসিপ্যালিটির সীমা ভবানীপুর পর্যন্ত বেড়ে যাবে এবং ক্রমশঃ প্রসারিত হবে, এমনকি বালিগঞ্জ পর্যন্ত এবং সীমানার মধ্যে যা আসা পর্যন্ত তা প্রসারিত হবে। ভারতের মধ্যে সুন্দরতম সড়কগুলির মধ্যে একটি হচ্ছে গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড। আমার ধারণা এই গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোডের দুপাশে ছোট ছোট মিউনিসিপ্যালিটি, স্বায়ত্ত শাসন মূলক প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠবে যেগুলির পরিচালন ভার গ্রহণ করবে স্থানীয় সমিতিগুলি। এই সমিতিগুলি পয়ঃ প্রণালী, স্বাস্থ্য ও পানীয় জল সরবরাহ সংক্রান্ত ব্যাপারের কাজের ভারপ্রাপ্ত বৃহত্তর সমিতিগুলির নির্দেশ ও নিয়ন্ত্রণানুসারে কাজ করবে। এটাই হচ্ছে ভবিষ্যত কলকাতা সম্পর্কে আমার ধারণা এবং আমি বিশ্বাস করি, আমি এখন যে পথে আছি, পরে যারা এই পথে আসীন হবেন তাদের মধ্যে কেউ না কেউ এই স্বপ্ন সফল হয়েছে দেখে পরিতৃপ্তি লাভ করবেন। আজ আমরা এই কাউন্সিল কক্ষে মিলিত হয়েছি ভবিষ্যতের সেই ইমারতের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করতে যা আগামী দিনে অবশ্যই গড়ে উঠবে, তবে সেই গড়ে ওঠার কাজকে অবশ্যই যাদের ধৈর্য এবং দূরদর্শিতা এই গড়ে তুলবে

মিউনিসিপ্যাল বিল নিয়ে আলোচনা শেষ করার আগে এ কথাটি উল্লেখ করার হয়ত প্রয়োজন যে এটাই এখন দেশের আইন হয়ে আছে এবং এই আইনই আজ কলকাতা মিউনিসিপ্যালিটির শাসনকার্য পরিচালনা করছে। আর এ কথাটিও স্মরণ রাখার কোন দাম নেই যে এই আইনটির প্রয়োগ একটা মস্ত অনুষ্ঠানের সহিত গ্রহণ করা হয়েছে। এই আইনটি এক শ্রেণীর লোকের মধ্যে কিছুটা উদ্বেগ এমনকি আতঙ্ক সৃষ্টি করেছে। কলকাতার সঙ্গে এদের নানা দিক থেকে নানা রকমের স্বার্থ জড়িয়ে আছে এবং কলকাতার সমৃদ্ধির ক্ষেত্রেও এদের যথেষ্ট অবদান রয়েছে। এদেরই মধ্যে কলকাতা হল একটি বড় ব্যবসা বাণিজ্যের কেন্দ্র। নানা দেশের নানা জাতি ও সম্প্রদায়ের স্বার্থ এখানে জড়িয়ে আছে। তা ছাড়া কলকাতা এক বিশাল সংখ্যক বিদেশী বাসভূমি। তাদেরও মনে কর্পোরেশনের এই প্রথম সাম্প্রদায়িক নীতির ভিত্তিতে কর্মচারী নিয়োগের ব্যবস্থা হওয়ার নীতির সম্বন্ধে হয়েছে। মিউনিসিপ্যালিটিকে রাজনৈতিক যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত করা কখনো উচিত নয়। একটি মহানগরীর সৌধ শাসনকে যখন রাজনৈতিক বা দলীয় স্বার্থের উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হয় তখন তাকে ঘোর বিপদের সম্মুখীন হতে হয়। তখন সৌধ কাজকর্মে জনসেবা অপেক্ষা দলীয় আক্রমণই লক্ষ্য হয়ে দাঁড়ায়। জনসাধারণ মনোভাব হচ্ছে এই রকম যে নতুন আইনের উদ্দেশ্যকে বিসর্জন দিয়ে দলের স্বার্থে সমস্ত কল্যাণমূলক কাজকর্মের পরিকল্পনায় অপব্যবহার করা হচ্ছে।

স্বরাজিষ্ট পার্টি কর্পোরেশনের নির্বাচনে সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করেছে এবং তাদের সেই আধিপত্যকে দলের স্বার্থে কাজে লাগানো হচ্ছে বলে লোকে মনে করে। এ অভিযোগটা খুবই স্বাভাবিক। আমরা দুজন ছাড়া আর সব [illegible]

কিন্তু এ কাজটি ঠিক নয়। মনুষ্য সমাজে প্রশাসনিক কার্যের ভার ও সুবিচারই প্রতিষ্ঠা লাভ করে সেই ন্যায় ও সুবিচারের পথ পরিত্যাগ করলে তা সাধারণের স্বার্থের পক্ষে মারাত্মক হয়ে পড়ে, এবং শেষ পর্যন্ত তার ধাক্কা সেই হাতের উপরই এসে পড়ে। তাই পরাধীনদের হাতেই ক্ষমতা দেওয়া হয় এবং তার পরাধীনদের হাতেই ততক্ষণ পর্যন্ত সে ক্ষমতা থাকে যতক্ষণ পর্যন্ত তারা সেই ন্যায়ের সুপথ থেকে সরে না যান। এটাই ইতিহাসের শিক্ষা। এটাই দেওয়ালের লিখন, ভবিষ্যতের কথা। যারা ক্ষমতায় থাকেন তারা হয়ত ক্ষমতার নেশায় সে ভবিষ্যতের বাণী পাঠ করতে পারেন না। কিন্তু ভবিতব্য ঠিকই আছে। সেখানে কোন নড়চড় নেই। জৌতিক জগতের মৌলিক নিয়মের মতই সে তার অপরিবর্তনশীল গতিতে আপন কার্য্য নির্বাহ করে চলছে।

কর্পোরেশনের নয়া শাসন ব্যবস্থায় সবচেয়ে বড় ভুল হয়েছে মিঃ সি, আর দাসকে মেয়র করা। মিঃ দাসের যোগ্যতা, কর্ম-কৌশল এবং বিচার-বিবেচনা সম্পর্কে আমার যথেষ্ট শ্রদ্ধা আছে এবং সেই জন্যই আমার কাছে এটা আরও ব্যাখ্যার অযোগ্য বলে মনে হয় যে তাকে কেন এই ভুল পথে চালিত করা হল। সুস্থ সংস্কারযুক্ত যে কোন দর্শকের কাছেই মনে হবে যে এটা ক্ষমতার নেশার মারাত্মক ফল ছাড়া আর কিছুই নয়। মেয়রের পদটি একটি দায়িত্ব ও মর্য্যাদার পদ! সাধারণতঃ করপোরেশনের কাজে যারা অভিজ্ঞ হয়েছেন এই রকমের বয়োবৃদ্ধ সম্মানিত নাগরিকগণই এ যাবৎ এই পদ অধিকার করেছেন। গ্লাডস্টোন, পামারস্টোন অথবা চিকরেইলির মত লোককে কখনও মেয়রের পদ দেওয়া হয়নি। কারণ এই পদটি সৌধ শাসনের ক্ষেত্রে যারা যশ এবং বৈশিষ্ট্য অর্জন করেছেন তাদেরই দেওয়া হয়। মিঃ সি, আর দাস তার রাজনৈতিক জীবনে মিউনিসিপাল অভিসের কয়েক লাইন ব্যাখ্যানের মধ্যেও কখন যাননি। কিন্তু হঠাৎ, যেহেতু তার দল ক্ষমতায় গিয়েছে এবং যেহেতু তিনি তার দলের নেতা, সেই হেতু তাকেই এনে মেয়রের পদে বসান হল যদিও তার মিউনিসিপাল শাসনের কোন অভিজ্ঞতাই নেই। মিঃ দাসের অপেক্ষা যোগ্যতার বহু নাগরিকের মধ্য থেকে মেয়র নির্বাচন করলে তা কি অধিকতর অনুমোদযোগ্য বা অভিপ্রেত হত। সুবিচার ও রাজনীতির স্বার্থে এই রকম একটা প্রতিষ্ঠানের উচ্চ পদে নিয়োগের ব্যাপারে কোনটা বিবেচ্য, যে প্রতিষ্ঠান থেকে রাজনীতিকে আলাদা করে রাখতে হবে বলে মিঃ দাস নিজেই বলেছেন।

কর্পোরেশনের পরিচালন ব্যবস্থায় আইন প্রণয়ন ও প্রশাসন এই দুটি বিভাগকে সম্পূর্ণরূপে পৃথক করার নীতির উপর সাধারণ নাগরিকগণ এবং কর্পোরেশনের যিল প্রেমীরা সকলেই সবচেয়ে বেশী গুরুত্ব দিয়ে আসছেন। কিন্তু মিঃ দাস এবং সরাজিষ্ট সংখ্যা গুরুর হাতে পূর্বের একটা পরিত্যক্ত নীতিকে পুনঃ প্রবর্তন করার ভার ছেড়ে দেওয়া হল।

(চলবে)

(দশম পৃষ্ঠার পর)

নাগরী লিপিই বিভিন্ন ভাষা ও ভাষাভাষীকে এক সূত্রে গ্রথিত করতে পারে। ঐ মহারাষ্ট্রেরই আচার্য বিনোবাজীর প্রখ্যাত 'গীতা প্রবচন' বহু ভারতীয় ভাষায় অনুবাদ হয়ে মুদ্রিত হয়েছে নাগরী লিপিতে। রবীন্দ্রনাথের বাংলা গীতাঞ্জলীও নাগরী লিপিতে ছাপা হয়েছে। একজন অবাঙালী বাংলা বললে বুঝতে পারেন এবং পরিষ্কার বাংলা বলতে পারেন অর্থাৎ কানে শুনে বুঝতে পারেন ও মুখে বলতে পারেন। চোখে দেখে বুঝবার জন্য নাগরী লিপিতে ছাপা হলে রবীন্দ্রনাথ পড়তে বাংলা লিপি শেখবার অপেক্ষা করতে হয় না। রবীন্দ্র সঙ্গীতের আধ্যাত্মিক আবেদন তাকে আকৃষ্ট করে ফিল। তাই গীতাঞ্জলী পড়বার আগ্রহ জাগে। পেয়েও গেলেন নাগরী লিপিতে ছাপা গীতাঞ্জলী।

●

RegdNo.R. N .24511/71 Biplabi Bangla Regd. WB/NC 77
Phone : 34-1795
বার্ষিক :—ডাক ১৫.০০ টাকা ষাণ্মাসিক :—৮.০০ টাকা মূল্য—৩০ পয়সা

C/30
APR 19

বিপ্লবী পুস্তকমালা

নেতাজীর সিক্রেটসার্ভিস—ডাঃ পবিত্রগোহিনী রায়—৬.০০
বিপ্লবী মহানায়ক রাসবিহারী—সুবোধ মজুমদার
অনুশীলন সমিতির বিপ্লবী প্রচেষ্টা—ব্রজেন্দ্র দাস

—ক্ষীরোদ কুমার দত্তের—

১। বাংলার অগ্নিযুগ—১.৫০, ২। বহির্ভারতে ভারতীয় বিপ্লব প্রচেষ্টা—৮.০০
৩। অনুশীলন সমিতির বি, মিত্তির—২.০০, ৪। গৌহাটী সংগ্রাম কাহিনী—১.০০, ৫। [illegible]—১.২৫, ৬। কলকাতা বাজার সংগ্রাম কাহিনী—.৪০, ৭। রাসবিহারী ও অনুশীলন সমিতি—.৬০
৮। স্বাধীনতাসংগ্রামে না ও মেয়ে—.৪০, ৯। বিবেকানন্দ ও সমাজবাদ—.৩০
১০। বিপ্লবী বিবেকানন্দ—.৫০, ১১। মহারাজ ও সুভাষচন্দ্র—.৪০
১২। ভারতের রণসাজরণ ও ভগিনী নিবেদিতা—.৭৫, ১৩। দেশ যাদের তোলেনি (১)—১.০০, ১৪। দেশ যাদের তোলেনি (২)—২.০০
১৫। শহীদ চন্দ্রশেখর আজাদ—.৫০, ১৬। ১০ই এপ্রিল জাতীয় শহীদ দিবস—১.০০, ১৭। হাডিঞ্জ হত্যা প্রচেষ্টা—.৭৫, ১৮। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও অনুশীল সমিতি—৪.০০, ১৯। ভারতের জাতীয় পতাকার ইতিহাস—.৪০, ২০। লাট হত্যা প্রচেষ্টা—১.৫০

প্রাপ্তিস্থান :— ৪নং বল্লভ দাস ষ্ট্রীট কলিকাতা-৭০০০০৭

টৈপালী—১/১/১/A বঙ্কিম চ্যাটার্জী ষ্ট্রীট কলিকাতা-৭৩

সম্পাদক—
শ্রীশান্তিশরণ রায়চৌধুরী

॥ সম্পাদকমণ্ডলী ॥

শ্রীজগদীশ চট্টোপাধ্যায় (সভাপতি)

শ্রীভবেশচন্দ্র নন্দী
পুষ্প চ্যাটার্জী
মলয় ঘোষ

প্রকাশক ও মুদ্রক—
শ্রীঅনিল সেনগুপ্ত

দিল্লীর বিশেষ প্রতিনিধি—
শ্রীযতীন ঘোষ

ব্যবস্থাপনা—
শ্রীনন্দগোপাল পাল

মূল কার্যালয়—৪নং বল্লভ দাস ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০০৭ শ্রীঅনিল সেনগুপ্ত কর্তৃক প্রকাশিত এবং তৎকর্তৃক প্রিন্টিং পাবলিসিটি, ১১৭, কেশবচন্দ্র সেন ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০০৯ হইতে মুদ্রিত।

বিপ্লবী বাংলা

॥ বিপ্লবী পরিষদের সাপ্তাহিক মুখপত্র ॥
স্থাপিত—১৯৫৬, 'বিপ্লবী বাঙ্গালী' নবকলেবরে—১৯৭১

দশম বর্ষ	শনিবার ২১শে চৈত্র, ১৩৮৭ ৪ই এপ্রিল ১৯৮১	২৪ সংখ্যা

প্রিয়াকে আমার কেড়েছিস তোরা
ভেঙ্গেছিস ঘরবাড়ি।
সেকথা কি আমি—জীবনে মরণে
কখনও ভুলিতে পারি ?
আদিম হিংস্র মানবিকতার যদি আমি কেউ হই
স্বজন হারানো শ্মশাণে তোদের—চিতা আমি তুলবই।

—সুকান্ত।

সম্পাদকীয়

কলকাতার রাজপথে হত্যার জবাব চাই

ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ও সামাজিক জীবনে যে জিনিসটা খুব সস্তা হয়ে গিয়েছে, সেটা হল মানুষের জীবন। ছোট বড় যেকোন অজুহাতেই মানুষকে খুন করতে অনেকেই বিবেকের দংশন অনুভব করে না, খুনীদের হাতটাও কেঁপে ওঠে না। আদর্শহীনতা, চরিত্রহীনতা, নির্লজ্জ রাজনৈতিক লোভ মমত্বহীনতা প্রভৃতির মত জানোয়ার সুলভ প্রবৃত্তির সৃষ্টি ও প্রসারই হল এর মৌল কারণ। রাষ্ট্রে আইন শৃঙ্খলার অবনতি ঘটলে এই ধরনের অপকর্ম চলে, কারণ দুষ্কৃতিরা জানে যে জঘন্য অপরাধ করলেও তাদের কিছুই হবে না। সর্বোপরি, রাজনৈতিক দলেরও দলীয় এবং ব্যক্তিগত স্বার্থের জন্য এই ধরনের কাজকর্মে প্রশ্রয় ও আশ্রয় দেন এদের। দিনে দিনে এই সামাজিক ব্যাধি গুরুতর আকার ধারণ করে, তখন তাকে আর সামলোনা যায় না। যাদের হাতে আইন শৃঙ্খলার দায়িত্ব থাকে, তারাও পরদেশী শাসন আমলের ঐতিহ্য অনুসারে, মানুষ খুন করতেও দ্বিধাবোধ করেনা।

৩১শে মার্চের কংগ্রেস (আই) এর সমাবেশে উপলক্ষ্য করে কলকাতার রাজপথকে রাঙিয়ে দিল পুলিশেরা তিনটি তাজা প্রাণের রক্ত দিয়ে। গণতন্ত্রে বিরোধী দলগুলির প্রতিবাদ মিছিল বা সমাবেশ করার অধিকার সর্বজনসীকৃত। জনারণ্যের পথে 'এজেন্ট প্রোভোকেটার'দের উপস্থিতির কথা কারো অবিদিত নেই। ক্ষমতাসীন দলের লোকেরাও সমাবেশকারীদের বে-ইজ্জত করার জন্য অনেক সময়ই দাঙ্গা-হাঙ্গামা সৃষ্টি করে দোষটা তাদের উপর চাপিয়ে দিতে সচেষ্ট এটাও কোন নতুন সংবাদ নয়। ৩১ মার্চের মর্মন্তুদ ঘটনার পেছনে এর মধ্যে কারা, অথবা যোগসাজসে একাধিক শক্তি ক্রিয়াবান ছিল কিনা তা নিশ্চিতভাবে বলা শক্ত। সবচেয়ে পরিতাপের বিষয় হল যে পুলিশের গুলিতে নিহতদের কেহই হাঙ্গামার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন না। সোমবার তারা ট্রাম বা বাসের মুখোমুখি করেছিলেন বলে এখনও পর্যন্ত কেউ বলেন নি। সমাবেশের মধ্যে ছিলেন নিহতদের মধ্যে দুইজন, অন্যজন ও ট্রামের মধ্যে বসেছিলেন। প্রত্যক্ষদর্শীদের অভিমত হল যে একজন ডি, সি,র মাথায় ইট পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই সেই পুলিশ পুঙ্গব সঙ্গে সঙ্গে 'ফায়ার, ফায়ার, বলে চিৎকার করে ওঠেন। পুলিশ বিভাগের একজন পদস্থ অফিসারের কোমল অঙ্গে আঘাত লাগলেই পুলিশের

উন্মাদের মত ব্যবহার করার অধিকার আছে ? যে নিরপরাধ (এখনও পর্যন্ত তাদের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ করা হয়নি।) তিনটি মানুষ নিহত হলেন যার হুকুমে বা যাদের অবিমৃষ্যকারীতার ফলে, তাদের খুনী বলে আদালতে অভিযুক্ত করা হবে না ? সম্প্রতি মানুষের মনে ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে যে পুলিশের মধ্যে রাজনীতির অনুপ্রবেশ ঘটাবার ফলে, একদল পুলিশ নিরপেক্ষভাবে তাদের কর্তব্যপালন না করে, সরকারীদলের লোকজনদের এবং প্রশাসকের খুশী করার জন্য বহু অন্যায় অত্যাচার চালাচ্ছে। এতে তাদের পদোন্নতি বা বাড়তি কোন সুযোগ সুবিধালাভ হবে কিনা জানা যায় না। তবে ইংরেজদের শাসনকালে এমন ঘটনা ঘটত, বর্তমান সরকারও সেকাজ করবেন কিনা, সেটা দ্রষ্টব্য।

এই নারকীয় ঘটনা সম্বন্ধে নিরপেক্ষ তদন্ত হলে প্রকৃত সত্য উদঘাটিত হতে পারে। দোষটা কার মিছিলকারীদের বা পুলিশের বা সরকারের, সেটা নির্ণয় করা সম্ভব হত। কিন্তু তাজ্জব বনে যেতে হয়, পশ্চিমবাংলার মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্য পড়ে। সংবাদে প্রকাশ যে তিনি বলেছেন পুলিশের গুলি চালানো সম্পর্কে বিশেষ কোন তদন্তের প্রয়োজন আছে বলে তিনি মনে করেন না। তিনি আরো বলেছেন 'সব খবর আসুক, এখনও পর্যন্ত যা খবর তাতে মনে হয় না যে গুলি চালানোর জন্য কোনরকম তদন্ত দরকার।' কিমাশ্চর্য্যম অতপরম্। কেন তদন্ত করতে এই অনীহা ? তদন্তের মাধ্যমে ত এ সত্যও প্রমাণিত হতে পারত যে মৃতদের বা সমাবেশ কারীদের দোষেই এই শোচনীয় ঘটনা ঘটেছে। তদন্তের দাবী না মেনে নেওয়ার জন্য যদি কেউ মনে করে যে সরকারের তরফ থেকে মানুষ খুন করবার ঢালাও হুকুম ছিল বা বেপরোয়া পুলিশদের তিনি দলীয় স্বার্থেই বেকসুরে খালাস দিতে চান, তবে কি খুব ভাল হবে ? এটা অতীব দুর্ভাগ্যজনক যে এই দেশের কিছু কিছু রাজনীতিবিদরা ক্ষমতার বাইরে থাকলে এক রকম কাজকর্ম করেন এবং কথাবার্তা বলেন, ক্ষমতায় এসেই তাদের চরিত্র ও রূপের বেদনাদায়ক পরিবর্তন ঘটে। অতীতে যখন এমন ঘটনা ঘটেছে, তখন ত তারা আকাশ বাতাস মুখরিত করে তুলেছেন প্রতিবাদের আওয়াজ তুলে। বর্তমান মুখ্যমন্ত্রীর রাজনৈতিক জীবনে এমন দৃষ্টান্ত ভূরি ভূরি মিলবে। তখন ত নরহত্যার ব্যাপারে, যেমনটা ঘটেছিল, বসির হাটে গুলি চালনা সম্পর্কে, সাধারণ মানুষ ত তাদের সমর্থনই জানিয়েছিল। ক্ষমতা কি তাদের অন্ধ করে দিয়েছে ? ক্ষমতার লোভ কি তাদের বিচার বিবেচনা শক্তিকে পঙ্গু করে দিয়েছে ? পুলিশের লোকেরা মানুষ খুন না করে, অন্য লঘু ব্যবস্থা গ্রহণ করে অবস্থার মোকাবিলা করতে পারত কিনা, এই প্রশ্নও মানুষের মনে জেগেছে। অবস্থা দেখে মনে হয় যে পুলিশ গুলি চালাবার জন্য আগে থেকেই প্রস্তুত ছিল। নতুবা এত বিরাট সমাবেশের সম্মুখীন হবার জন্য মাত্র ৫১ রাউণ্ড টিয়ার গ্যাস সেল নিয়ে উপস্থিত ছিল কেন ? তাদের মনে কি এই ধারণাই বদ্ধমূল ছিল যে তারা যা খুসী করুক না কেন, প্রশাসকদের সমর্থন তাদের মিলবেই ?

রাজনৈতিক দিক দিয়ে বিচার করলে দেখা যাবে যে প্রশাসকদের এই জিদ্ তাদের পক্ষে মারাত্মক হবে। তবে সে তাদের বিচার বিবেচনার বিষয়। কিন্তু মানুষের দাবী এই জঘন্য নরহত্যাকারীদের বিচার করতে হবে। একবার ভোট দিয়েছ বলে, তারা যা খুসী তাই করবেন, মানুষের জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলবেন,

এ অধিকার তাদের দেয়নি। সরকারী তরফে কোন তদন্ত না হলে, বেসরকারীভাবে কোন তদন্ত করা সম্ভব কিনা, সেটা বিশেষভাবে ভেবে দেখতে হবে।

ইতিহাসের পাতায় এই সত্য চিরদিনই প্রতিভাত হয়েছে যে জরাসন্ধ থেকে হিটলার পর্যন্ত অবিচার, অত্যাচার করে কেউ রেহাই পায়নি। রক্তগঙ্গা বহাবার চেষ্টা করে যে মেকী ভগীরথের দল নিষ্কৃতি পাবেন বলে মনে করছেন। জনতা-রূপ কপীলমুনির অভিশাপে উদ্ভত মগধ রাজার বংশধরদের মত ধ্বংস তারা হবেই, এই ইতিহাসের শিক্ষা। রক্ত নিয়ে নয়, রক্ত দিয়েই যারা ভারতের ইতিহাস রচনা করে গিয়েছেন, তাদের অবদানই কালের কপোলতলে শুভ্র সমুজ্জল হয়ে চিরভাস্বর হয়ে থাকবে। সেই শাশ্বত অবদানকে বিনষ্ট করতে পারবে কোন দুর্যোধন দুঃশাসনের দল?

সবশেষে এই দাবী করে মানুষ যে তিনটি যুবক পশ্চিম বাংলা সরকারের অপদার্থতা ও অযোগ্যতা ও বাংলার কৃষ্টি, শিক্ষা গৌরবোজ্জ্বল পারম্পর্য্য রক্ষার জন্য নিজেদের জীবনদান করে শহীদ হয়েছেন, তাদের আরব্ধ কর্মপ্রচেষ্টাকে সাফল্য মণ্ডিত করে তাদের স্মৃতিকে সমুজ্জ্বল করে তুলুন। সারা বাংলাদেশের গ্রামে, গঞ্জে, শহরে প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে তুলে এই সরকারকে হয় সঠিক পথে চলতে নতুবা পদত্যাগ করতে বাধ্য করুন। বিদেশী তরুণদের মর্মবেদনা, সংগঠনের মাধ্যমে রূপায়িত করে, দেশের মানুষকে সকল প্রকার বাধাবিপত্তির বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়তে অনুপ্রাণিত করুন।

অত্যন্ত ক্ষোভের কথা, তিনটী তাজা প্রাণকে বিনা প্রয়োচনায় গুলির শিকার হতে হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রীর বিবৃতি ভুল তথ্যের, হৃদয়হীনতার এবং তৃতীয় শ্রেণীর রাজনৈতিক কৌশলের উপর প্রতিষ্ঠিত নিজেদের কৃতকর্মের জন্য সুকৌশলে অন্যের উপর দোষ চাপিয়ে দেবার একটি হাস্যস্পদ নমুনা। একটি সুদৃঢ় সুপরিকল্পিত পরিকল্পনার মাধ্যমে এর মোকাবিলা না করতে পারলে, বাংলার বিপ্লবী এবং সংগ্রামী ঐতিহ্যের অবমাননা করা হবে। প্রত্যেক বঙ্গদেশবাসীর এটা মনে রাখা প্রয়োজন। শহীদদের এই নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করাই হবে একমাত্র কর্তব্য। শহীদের আত্মদান যেন ব্যর্থ না হয়।

গল্প হলেও সত্যি

সেদিন উড়িষ্যার যাজপুর শ্মশান ঘাটে বড় ভীড়। সুন্দর একটি ১৮ বৎসরের যুবককে বৈতরণীর জলে অন্তর্জলি করে রেখেছে। সাদা কাপড় দিয়ে তাকে ঢেকে রেখেছে। এদিকে সৎকারের জন্যও সকল আয়োজন ঠিক করা আছে।

সন্দেহ হয়, প্রাণ বায়ু এখনও বুঝি সম্পূর্ণ বার হয় নি। নিকটে অন্য একটি যুবক বসে কাঁদছিল—"মামাকে গিয়ে কি বলব"। বুঝা গেল বাঙ্গালী। আর যাঁকে অন্তর্জলি করে রেখেছেন, চিতায় তোলার জন্য তিনি ঐ ছেলেটির মামাত ভাই।

ঐ ১৮ বৎসরের যুবকটি বড় চাকরী করতেন। তাঁহার সুন্দর ব্যবহারে ও অতুলনীয় রূপে, যাজপুরের সকলকেই তিনি মুগ্ধ করেছিলেন। তাই আজ শ্মশান ঘাটে একটি বাঙ্গালীর জন্য উড়িষ্যার লোকের এত মর্মবেদনা। হঠাৎ এই দারুণ কোলাহলের মাঝে কোথা থেকে এক তেজস্বী সন্ন্যাসী এসে উপস্থিত হলেন। সন্ন্যাসী ঐ মৃত দেহের ঢাকা চাদরখানি তুলে নিয়ে তিনি অপলক দৃষ্টিতে দেখিতে লাগলেন। পরে বললেন, কি সুন্দর পুরুষ, কিন্তু এখনো মরে নাই। যেমনি সন্ন্যাসীর মুখ থেকে একথা শুনা, অমনি পাশে বসে যে ছেলেটি কাঁদছিল, সে সন্ন্যাসীর পায়ে লুটিয়ে পড়লেন। সন্ন্যাসী তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, "একটু গরম দুধের ব্যবস্থা কর।" সন্ন্যাসী মৃত যুবকের মাথায়, মুখে হাত বুলাতে লাগলেন। কিছুক্ষণ পরে ঐ যুবক জোরে একটি নিঃশ্বাস ফেলিল। এই দৃশ্য দেখে সকলে জয় ধ্বনিতে শ্মশান ঘাট মুখরিত করে তুলল। তার পরে সেই অন্তর্জলি করা সুপুরুষ যুবককে নিয়ে সন্ন্যাসী ঠাকুর যাজপুরের বাসায় চলে গেলেন। এই ১৮ বৎসরের সুপুরুষ যুবক ছিলেন যাদবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—আমাদের ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের পিতা। তাঁহার বড় ভাই যাজপুরে চাকরী করতেন। ছোট ভাইকে নিজের চাকরীতে বসিয়ে, কিছু দিনের জন্য ছুটিতে দেশে এসেছিলেন। যাদবের সঙ্গে তার পিসতুতো ভাইও গিয়েছিলেন।

যাদবের কাছ থেকে যখন সন্ন্যাসী ঠাকুর বিদায় নিতে যান, তখন যাদব সন্ন্যাসীর পা জড়িয়ে ধরেন—ও বলেন "কৃপা করে আমাকে দীক্ষা দিয়ে যান।" অনেক অনুনয় বিনয়ের পরে তবেই সন্ন্যাসী রাজী হলেন—"অমুক দিন স্নান করে অপেক্ষা করো।" এই আদেশ করে তিনি চলে গেলেন। সেই শুভ দিনটি যাদবের আসিল। যাদবচন্দ্র স্নান করে শুদ্ধ ভাবে অপেক্ষা করতে লাগলেন।

দেখা গেল যথা সময়েই সন্ন্যাসী ঠাকুর এলেন এবং যাদবচন্দ্রকে আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করে বললেন—"হয় নাই।" তার পরে নিজের হাতে ধরে তাকে আবার বৈতরণীর জলে স্নান করিয়ে তবেই মন্ত্র দিলেন। বিদায়ের সময় সন্ন্যাসী ঠাকুর বলে যান,—তার সঙ্গে আর দুইবার দেখা হবে। প্রথমবার তীর্থ দর্শনের সময় শেষবার যাদবের মৃত্যুর কিছুদিন আগে। সন্ন্যাসী ঠাকুর তার পায়ের খড়ম ও একটি গাছের ছালের পৈতা যাদবচন্দ্রকে দিয়ে গেলেন। যাদবচন্দ্র জীবনের শেষ দিনটি পর্যন্ত ঐ

পাদুকা ও পৈতার পূজা করে গেছেন। সর্বদার জন্য ঐ দুটি বস্তু তিনি অমূল্য সম্পদের মত নিজের কাছে কাছে রাখতেন। আর একটি কথাও সন্ন্যাসী ঠাকুর যাদবচন্দ্রকে বলে গিয়েছিলেন যে যাদবচন্দ্র প্রপৌত্রের মুখ দেখেই ইহলোক ত্যাগ করবেন। এই ঘটনার অনেক দিন পরে, কাঁঠালপাড়ায় এক সন্ন্যাসী এলেন। কোন্ সন্ন্যাসী কে তার খবর রাখে, কত সন্ন্যাসী আসেন যান। কিন্তু দেখা গেল যে, যাদবচন্দ্র তাঁকে নিয়ে খুব ব্যস্ত হয়েছিলেন। সন্ন্যাসী চলে যাওয়ার কিছুদিন পরেই যাদবচন্দ্রের এক প্রপৌত্র জন্ম গ্রহণ করে এবং যাদবচন্দ্রও স্বর্গলাভ করলেন। তার পরেও কয়েক বৎসর চলে গেল। একদিন বঙ্কিমচন্দ্র বাড়ীর বার হচ্ছিলেন। তিনি দেখতে পেলেন একটি নবীন সন্ন্যাসী বসিয়া আছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের সহিত সন্ন্যাসী নীরব স্থানে কথা বলতে চাইলেন। বঙ্কিমচন্দ্রের জন্যই সন্ন্যাসী অপেক্ষা করছিলেন। তাঁহারা নীরব স্থানে অনেক কথা বললেন। বাড়ীতে এই খবর পেয়ে সকলেই অস্থির হলেন। কোথা থেকে এই সন্ন্যাসীর আবির্ভাব হল। আর কি এমন কথা সকলের অগোচরে বলছেন। বঙ্কিমচন্দ্র ঐ সন্ন্যাসীর কথা কখনও কাহাকেও বলেন নি। জিজ্ঞাসা করলে, কেবল হাসতেন। পরে এইটুকু জানা গিয়েছিল যে, তার পিতার প্রাণ দাতা গুরুই ঐ চেলাকে পাঠিয়েছিলেন। বন্দে মাতরম্—মন্ত্রের সম্বন্ধে অনেক কথা আছে। আনন্দমঠ লেখার আগেই বঙ্কিমচন্দ্র ঐ গান রচনা করেছিলেন। কোথা থেকে তিনি এই অপূর্ব মন্ত্র পেয়েছিলেন। তিনি লিখেছেন যে ইহা সন্তান সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসীদের মূল মন্ত্র ছিল। এই সব কথা শুনে অনুমান করা যায় যে বঙ্কিমচন্দ্রের পিতা ও বঙ্কিমচন্দ্রের উপর সন্ন্যাসীদের কতদূর প্রভাব ছিল।

১৯৭৮ সালে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে নানা প্রাচীন পত্রিকা পড়ার সময় একটি পত্রিকা হইতে এই মূল উপাদান সংগ্রহ করেছি।

—পুতুলদেবী

(চারণ কবি মুকুন্দদাসের দৌহিত্রী)

পাকিস্তানে মার্কিনী অস্ত্র প্রবাহ কিসের জন্য ?

কালীপদ সরকার

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পাকিস্থানকে ৫০ কোটি ডলার মূল্যের অস্ত্র দেবার সিদ্ধান্ত করেছে। অস্ত্রগুলি সর্বাধুনিক এবং আক্রমনকারী বাহিনীর দ্রুত আঘাত হানার উপযোগী। গত দশ বছরে পাকিস্থান নানা দেশ থেকে প্রচুর বিমান ও অস্ত্র সংগ্রহ করেছে। আন্তর্জাতিক সমরাস্ত্র বিশেষজ্ঞ সংস্থার মতে ১৯৭১ সালের তুলনায় পাকিস্থান তার সামরিক শক্তি দ্বিগুণ করেছে। প্রস্তাবিত মার্কিন অস্ত্র সাহায্য হবে তার অতিরিক্ত। আণবিক বোমা তৈরির ব্যাপারেও পাকিস্থান অনেক এগিয়ে গেছে এবং ওয়াকিবহাল মহলের ধারণা পাকিস্থান এক বছরের মধ্যে বিস্ফোরণ ঘটাবে।

পাকিস্থানের এই বিপুল সমরায়োজন ভারতের উদ্বেগের কারণ না হয়ে পারে না। আঞ্চলিক ভারসাম্যও এতে বিঘ্নিত হবে এবং অস্ত্র প্রতিযোগিতা বৃদ্ধি পাবে। পাকিস্থান অস্ত্র পাবে বিনামূল্যে শক্তিধর মার্কিনী দয়ায়, আর ভারতকে প্রতিরক্ষার তাগিদে অস্ত্র সংগ্রহ করতে হবে নগদ মূল্যে। যে জাতীয় সম্পদ জন কল্যাণের জন্য বরাদ্দ আছে তাকে কেটে তার কিছু অংশ টানতে হবে অস্ত্রের দাম মেটাতে। এ অবস্থা বিকাশশীল রাষ্ট্রের পক্ষে মর্মান্তিক এবং সঙ্গত কারণেই সে জন্য ভারত অস্ত্র সাহায্যের বিষয়টি নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে উচ্চ পর্যায়ে কথাবার্তা শুরু করেছে।

আফগানিস্থানে সোভিয়েত বাহিনীর প্রবেশকে কেন্দ্র করে যে ঝড় উঠেছিল তা অনেকখানি এখন শান্ত, তবে সেখানে সোভিয়েত বাহিনীর অবস্থান পাকিস্থান তথা অপর প্রতিবেশী দেশগুলির পক্ষে কারণ হয়ে আছে। আফগানিস্থান থেকে লক্ষাধিক শরনার্থী এসে পাকিস্থানে আশ্রয় নিয়েছে, তাদের স্বদেশে ফেরৎ পাঠাবার কাজও পাকিস্থানের অন্যতম সমস্যা। সোভিয়েত সরকার অবশ্য সুস্পষ্ট ভাবে জানিয়ে দিয়েছে যে পাকিস্থানকে আক্রমণ করার কোন ইচ্ছা তার নেই এবং আফগানিস্থানের নবগঠিত কমিউনিস্ট সরকারের নিরাপত্তা নিশ্চিত হলেই সোভিয়েত তার সেনাদলকে দেশে ফিরিয়ে নিয়ে যাবে।

সুতরাং উত্তেজনা জিইয়ে না রেখে সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রগুলির উচিত আলোচনার মাধ্যমে সমঝোতায় আসা এবং বিরোধের নিষ্পত্তি করা। আফগান সরকারের প্রধান মিঃ বারবাক কারমাল ইতিমধ্যে পাকিস্থানের সহিত আলোচনার প্রস্তাবও দিয়েছেন। পাকিস্থান এই প্রস্তাবে সাড়া দেয়নি, এমন কি বারবাক সরকারকে কূটনৈতিক স্বীকৃতি দিতেও অনিচ্ছুক। পাকিস্থানের কথা হল, আগে সোভিয়েত সৈন্যদল আফগানিস্থান ছেড়ে যাক এবং আফগানিস্থানে পূর্বাবস্থা ফিরে আসুক, তারপর আলাপ আলোচনা। যে জল কাবুল [illegible] দিয়ে

চলে গেছে তাকে কি আর ফেরানো যায়? ইতিহাসের গতিপথকে পুরাতন খাতে ফিরিয়ে আনা চলে না। মুক্তমনে নতুন অবস্থার মোকাবেলা করা হল বাস্তব রাজনীতি।

যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক পাকিস্তানকে সমরাস্ত্র সরবরাহ পাক-আফগান বিরোধ নিষ্পত্তির সহায়ক নয়—কারণ কমিউনিস্ট আফগান সরকারের পাশে দাঁড়িয়ে আছে যে সোভিয়েত রাশিয়া তার গায়ে আঁচড়টুকু লাগে এমন কিছু করার হিম্মৎ পাকিস্থানের নেই। অন্যদিকে ১৯৭২ সালে সম্পাদিত সিমলা চুক্তিতে পাকিস্তান ও ভারতের মধ্যে অমীমাংসিত সকল বিষয় শান্তিপূর্ণ দ্বি-পাক্ষিক আলোচনার মাধ্যমে নিষ্পত্তির নির্দেশ আছে। সিমলা চুক্তি 'নো ওয়ার প্যাক্টের' তুল্য। ভারত কিংবা পাকিস্তান কেউই সিমলা চুক্তি নাকচ করে নি।

সোভিয়েত রাশিয়া এবং ভারতের দিক থেকে যখন কোন আক্রমণের আশংকা নেই এবং চীন পাকিস্থানের মিত্র রাষ্ট্র, তখন পাকিস্থানের কেন এই বিরাট রণপ্রস্তুতি? কমিউনিজম প্রতিরোধ? কখনই না। কমিউনিজম প্রসারে বাধা দেওয়াই যদি পাকিস্থানের রণসজ্জার কারণ হত, তাহলে পাকিস্থান কখনো কমিউনিস্ট চীনের সঙ্গে এত মাখামাখি করত না। একদা পাকিস্থান মার্কিনী সামরিক জোট সিয়াটো ও সেন্টো যোগ দিয়েছিল। জোট দুটি ছিল কমিউনিস্ট আগ্রাসন রোধের কেন্দ্র স্বরূপ। পাকিস্থান জোট দুটির সদস্য হলেও ভিয়েতনাম যুদ্ধে মার্কিনযুক্ত রাষ্ট্রের কোন সহায়তা করেনি অথবা কমিউনিস্ট বিরোধী মার্কিনী তৎপরতায় সোসর হয়নি।

পাকিস্থান সিয়াটো ও সেন্টো জোটে ঢুকেছিল মার্কিনী সমরাস্ত্র সংগ্রহের ফন্দিতে এবং যুদ্ধ কালে যদি জোটের অপর সদস্যদের সাহায্য আদায় করা যায় সেই আশায়। ১৯৫৪ সালে সিয়াটো জোট গঠিত হয় এবং পাকিস্তান জোটের সদস্য হয়ে পড়ে। ১৯৫৪ থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পাকিস্তানকে যুদ্ধাস্ত্র দিয়ে সাজাতে থাকে। বিপুল সমরাস্ত্র পাকিস্তানের হাতে তুলে দেবার সময় যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ভারতের প্রধানমন্ত্রীকে আশ্বাস দিয়েছিলেন, যে সকল অস্ত্র পাকিস্তানকে দেওয়া হচ্ছে কমিউনিস্ট প্রসার প্রতিরোধের উদ্দেশ্যে, পাকিস্তান সে অস্ত্র ভারতের বিরুদ্ধে ব্যবহার করবে না।

প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র পেয়েই ১৯৬৫ সালে পাকিস্থান ভারত আক্রমণ করে এবং যুক্তরাষ্ট্র প্রদত্ত মারণাস্ত্রগুলি ভারতের বিরুদ্ধে ব্যবহার করে। সে সময় অসহায়ের ন্যায় তা দেখে এবং কৌতুক উপভোগ করে। ১৯৬৫ সালের যুদ্ধের পর পাকিস্তান আবার সমর সজ্জার নামে এবং পরাজয় হতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তাকে কামান, বিমান, ট্যাঙ্ক ও রণতরী দেয়। যার প্রতিক্রিয়া হল ১৯৭১ সালে পাকিস্তান কর্তৃক ভারত আক্রমণ। সেই কারণেই পাকিস্তানের আক্রমণমূলক সমরাস্ত্র সংগ্রহ ভারতকে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত করে।

সিমলা চুক্তির বাধ্যবাধকতা অস্বীকার না করে পাকিস্তান কিন্তু কিছুদিন আগে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ পরিষদে পুরাতন রীতিতে কাশ্মীর প্রসঙ্গ তুলেছিল এবং উত্তর প্রদেশের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার ব্যাপারে নাক গলিয়েছিল। দুটি বিষয় নিয়েই পাকিস্তান সিমলা চুক্তির শর্ত লঙ্ঘন করে এবং চিরাচরিত ভারত-বিদ্বেষ প্রচারে লেগে যায়। কথায় বলে স্বভাব যায় না মলে, জন্মলগ্ন থেকে পাকিস্থান যে ভারত বিদ্বেষ মানসিকতা অন্তরতলে পুষে রেখেছে, মহাত্মা গান্ধীর জীবনদান এবং ভারতের মৈত্রী সাধনা তাকে আজও দূর করতে সক্ষম হয় নি।

ভারতীয় উদ্বেগের আর একটি কারণ হল পাকিস্থানের বর্তমান আভ্যন্তরীণ শাসন সংকট। অভিজ্ঞতা থেকে দেখা যায় যখনই পাকিস্থানে গণ-অসন্তোষ তীব্র হয়ে বিদ্রোহের আকার নেয়, তখনই পাকিস্থানের শাসকদল জনতার দৃষ্টি ভিন্নমুখী করার উদ্দেশ্যে, ভারত বিরোধী প্রচারে মেতে ওঠেন এবং জেহাদের শ্লোগান তুলেন। যার পরিণতি ঘটে ভারত আক্রমণে, ফল তার যাই হোক না কেন পাকিস্থানের শাসকশ্রেণী কিছুদিনের মত মূল জাতীয় সমস্যাকে চাপা দিতে সমর্থ হন। বস্তুতঃ এই হল বিগত চৌত্রিশ বছরের ভারত-পাকিস্থান রাজনৈতিক সম্পর্কের ইতিহাস।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ব্রিটেন ও পশ্চিম ইউরোপের রাষ্ট্রগুলির মত সাম্রাজ্যগুলির অধিগিরি নিয়েছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। কমিউনিষ্ট সম্প্রসারণ প্রতিরোধের নেতৃত্বও যুক্তরাষ্ট্র স্বেচ্ছায় নিজের কাঁধে চাপিয়েছিল। এই দুই মহা অধিগ্রহণ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে সমগ্র পৃথিবীর ওপর আধিপত্য বিস্তারে উদগ্র করে তুলে। দ্বিতীয় যুদ্ধশেষ পরিস্থিতি তার অনুকূল থাকলেও পরবর্তী এক দশকে অবস্থার পরিবর্তন ঘটে। সোভিয়েত রাশিয়ার বিশ্বশক্তিরূপে উদ্ভব মার্কিনী পরিকল্পনাকে কঠিন আঘাত দেয়। ক্ষমতার নেশায় যুক্তরাষ্ট্র তার মহান ঐতিহ্য বিপরীত কাজে লিপ্ত হতে থাকে এবং একটির পর একটি ব্যর্থতা তাকে গ্লানিযুক্ত করে। সোভিয়েত রাশিয়া এই ব্যর্থতার পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করে চলেছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হেরেছে পূর্ব এশিয়ায় ভিয়েতনামে, হেরেছে পশ্চিম এশিয়ায় ইরাণে ও আফ্রিকার নানা দেশে। বিশ্বের জাগ্রত নব চিন্তাধারার সহিত যুক্তরাষ্ট্র কেন যে সমতা রেখে চলতে পারছে না বোঝা শক্ত।

গণতন্ত্রের উপাসক যুক্তরাষ্ট্র যখন গণবিরোধী সামরিক শাসক ও স্বৈরাচারী শাসকদের পিছনে মদত দেয় তখন স্বভাবতঃই এই জিজ্ঞাসা প্রবল হয়ে উঠে এবং মনে হয় অতীত সাম্রাজ্যবাদের প্রেতাত্মা তার স্কন্ধে এখনও বুঝি ভর করে আছে। ভারতের বিরুদ্ধে পাকিস্থানকে তা না হলে কেন যুক্তরাষ্ট্র এভাবে মদত দিতে থাকবে? গণতন্ত্রের পবিত্র উদয়াচলে মুক্তি সূর্যের এই মেঘম্লানতা অতীব দুঃখদায়ক।

ইরান এবং পাকিস্থান সমভাবাপন্ন রাষ্ট্র নয়, যুক্তরাষ্ট্র ইরানে যে সোভিয়েত বিরোধী ঘাঁটি করেছিল, তেমন কিছু করা সম্ভব নয় পাকিস্থানে। ইরানের রুশ বিরোধী মনোভাবের পশ্চাতে যে ঐতিহাসিক কারণ বিদ্যমান, পাকিস্থানের ক্ষেত্রে তার কিছুই নেই। সুতরাং পাকিস্থানের সহায়তায় কমিউনিজম তথা সোভিয়েত রাশিয়ার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলার মার্কিনী পরিকল্পনাও বাস্তব বর্জিত। এ অবস্থায় যদি যুক্তরাষ্ট্র পাকিস্থানকে অঢেল অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে মারমুখী করে তুলে, তাহলে বুঝতে হবে যুক্তরাষ্ট্র জেনে শুনে মিত্র স্থানীয় বিশ্বের বৃহত্তম একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের ক্ষতিসাধন করছে।

ভারতবাসী একদিন আমেরিকার স্বাধীনতা সংগ্রাম এবং গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা থেকে প্রেরণা লাভ করেছিল। স্বাধীন ভারতের প্রথম দুই দশকে যুক্তরাষ্ট্রে উদার সাহায্যের কথাও ভারতবাসী কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করে। বর্তমানে ভারতবাসী আশা করে, যুক্তরাষ্ট্র সরকার পাকিস্থানকে প্রচুর অস্ত্র সম্ভরবাহের বিষয়টি ভারতীয় দৃষ্টিভঙ্গির দিক দিয়ে বিচার করে দেখে এবং উপ মহাদেশে নতুন একটি অনর্থপাতের সম্ভাবনা সৃষ্টি করা থেকে বিরত হয়।

ওঁরা কি সন্ত্রাসবাদী ?

—জিজ্ঞাসু

অগ্নিযুগ ভারতের সুদীর্ঘ স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। ঐ যুগের রোমাঞ্চকর কাহিনী গুলি বিস্মৃতির জমাট জঞ্জালের গাদার নীচে প্রায় চাপা পড়ে আছে তবুও একে নিয়ে যে সব কিম্বদন্তী গড়ে উঠেছিল, তার কিছু কিছু আজও আবর্জনা রাশির তলায় কুড়িয়ে পাওয়া কোন দুষ্প্রাপ্য জিনিষের মত চমক লাগিয়ে দেয়। আজও কখনও কখনও গাঁয়ের ভিখারীর কণ্ঠে 'একবার বিদায় দেনা ঘুরে আসি" গান সাধারণ মানুষের মনকে, ক্ষণিকের জন্য হলেও, নাড়া দিয়ে যায়; প্রাণ চঞ্চল কিশোর মনে তাথৈ নৃত্যের ছন্দ জাগায়।

অগ্নিযুগের আলোর শিখা নিতে এসেছিল ত্রিশ এর দশকের প্রথম দিকেই, তবে সে নিভু নিভু আগুন চট্টলের বুকে জ্বলে ওঠে সারা দেশের ঘুম ভাঙ্গিয়ে দিয়েছিল। বিস্ময়ে গর্বে আওয়াজ উঠেছিল 'সাবাস চট্টগ্রাম'।

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস লেখকেরা এই যুগটির প্রতি কতখানি গুরুত্ব দিয়েছেন, আগামী দিনের ইতিহাস তার হিসাব নিকাশ করবে। প্রখ্যাত ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদার, তারা চাঁদ প্রভৃতি অনেকেই অগ্নিযুগের বহু ঘটনার উল্লেখ করেছেন, কিন্তু এই আন্দোলনের বিজ্ঞান সম্মত কোন বিশ্লেষণ আজও পর্যন্ত হয়েছে কি ? ঐ যুগেরই বিশিষ্ট কয়েকজন নেতা বিভিন্ন ঘটনাবলী সমন্বিত বিবৃতি মূলক কিছু সংখ্যক বই লিখেছেন, কিন্তু তাদের মধ্যে কেনে কোন বিষয়ে পরস্পর বিরোধী বিবৃতি লক্ষ্য করা যায়, দল গত সংকীর্ণ দৃষ্টি ভঙ্গিও অত্যন্ত বেদনাদায়ক ভাবে প্রকট হয়ে ওঠে। অবশ্য একথাও মানতে হবে যে তখনকার দিনের কঠোর দমন নীতির অবস্থার জন্য সদা সতর্ক গোপনীয়তার ফলে বিভিন্ন বিবৃতির মধ্যে গরমিল থাকা মোটেই অস্বাভাবিক নয়, বৃটিশ সরকারের গোপন দলিল গুলিও যে কতখানি নির্ভর যোগ্য, সে সম্বন্ধেও প্রচুর প্রশ্নের অবকাশ থেকে যায়। তবে অসুবিধা যতই হোক, একদিন অবশ্যই অগ্নিযুগের সংগ্রামের বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ ও মূল্যায়ন হবেই। অগ্নিযুগের সাধিক সাধনার কি লক্ষ্য ছিল সে সম্বন্ধে গবেষণা ও পর্যালোচনা প্রত্যেক দেশ প্রেমিকের পবিত্র কর্তব্য।

বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের কুৎসা প্রচারক দল উদ্দেশ্যমূলকভাবেই অগ্নিযুগের রাজনৈতিক আন্দোলনকে "সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন" এর ছাপ মেরে দিয়ে কলঙ্কিত করেছে, ইংরেজ এদেশের শাসন ভার ছেড়ে দিয়ে যাওয়ার পরেও তাদের অনেককিছুই যেমন আমরা এখনও আঁকড়ে ধরে আছি, তেমনি 'সন্ত্রাসবাদ অপবাদটিও আমরা পকেটস্থ করেছি। চট্টগ্রাম মুক্তিযুদ্ধের বীরসেনানী এবং বর্তমানে সর্বপল্লী দলের কমুনিষ্ট নেতা গণেশদা (গণেশ ঘোষ) অনন্ত সিং এর লেখা একখানি বইয়ের ভূমিকায় এর জন্য দুঃখ

প্রকাশ করেছেন।

অগ্নিযুগ সম্বন্ধে অনেকেরই ধারণা যে কিছু সংখ্যক ভাবপ্রবণ স্বাধীনতা পাগল বেপরোয়া ছেলে বয়সোচিত হটকারী উত্তেজনার বশে বোমা, পিস্তল প্রভৃতি অস্ত্র নিয়ে ইংরেজ ও তাদের এদেশী পাচাটা দেশদ্রোহী চেলা চামুণ্ডাকে হত্যা করার জন্য উদ্যত হয়ে উঠেছিল, ঐ সব সর্বস্বত্যাগী স্বাধীনতা সংগ্রামীদের দেশপ্রেমের উচ্ছসিত প্রশংসা করা হয়, শহীদদের উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধাঞ্জলিও দেওয়া হয়। সাধারণ মানুষের মনে আজও ওঁরা ভাস্বর হয়ে আছেন, কিন্তু এ যুগের আন্দোলনের অবদানকে যথাযোগ্য মূল্য দিতে এত 'কিন্তু কিন্তু' কেন? বোঝা ভার।

অগ্নিযুগের বীরযোদ্ধারা কি 'সন্ত্রাসবাদী' ছিলেন? শাসক শক্তির মনে সন্ত্রাস সঞ্চার করার মত কাজ তাঁরা অবশ্যই অনেক সময় করেছেন। অনেক উচ্চ পদস্থ ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদী প্রশাসক ও তাদের পোষা কুকুর দেশদ্রোহী ভারতীয় সন্তানকে তাঁরা হত্যা করেছেন: একথা কেউই অস্বীকার করবে না। কিন্তু এই ধরণের হত্যাকাণ্ড চালিয়ে যাওয়াই কি তাঁদের নীতি ছিল? মোটেই তা নয়, বিপ্লবীরা দেশের মানুষের মনে স্বাধীনতার প্রেরণা জাগাতে, তাদের মন থেকে দাসত্ব জনিত কাপুরুষতা হীনমন্যতা দূর করে সাহস ও উদ্দীপনা যোগাতেই শত্রুর সন্ত্রাস সঞ্চারক কাজ করেন। প্রবল পরাক্রমশালী ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদী শক্তি যে বোমা আর পিস্তলের ভয়ে এদেশ থেকে পাততাড়ি গুটিয়ে পালাবেনা, সেটুকু বোঝার মত রাজনৈতিক বিচার শক্তি তাদের ছিল। প্রখ্যাত বিপ্লবীনেতা ৺যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায় তাঁর "আমার বিপ্লবী জীবন" নাম তথ্য সমৃদ্ধ বইয়ে বলেছেন যে সে যুগে এদেশে একমাত্র সন্ত্রাসবাদী ছিল ইংরেজ সরকার। ১৯৩৮ সালে একবার তাঁর রাঁচির বাড়ীতে এক সাক্ষাৎকারে অগ্নিযুগ নিয়ে আলোচনা প্রসঙ্গেও খুব স্পষ্ট করেই অনুরূপ কথাই বলেছিলেন।

সুতরাং সন্ত্রাসবাদী ইংরেজ সরকারের সন্ত্রাসবাদের সন্ত্রাসভয়ে ভীত জনগণকে সন্ত্রাসমুক্ত করার জন্যই বিপ্লবীরা কখনও কখনও, কৌশল হিসাবে সন্ত্রাস সঞ্চারক পদ্ধতি গ্রহণ করতেন, আত্মাহুতি দিয়েও। তাঁদের আত্মহুতি ব্যর্থ হয়নি।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়ে অগ্নিযুগের বিপ্লবীরা ভারতে এবং ভারতের বাইরে দুঃসহ কষ্ট সহ্য করে; দুরতি ক্রম্য বাধা বিপত্তি তুচ্ছ করে যে অসাধারণ সাংগঠনিক ও কূটনৈতিক (বিদেশী) দক্ষতার পরিচয় দিয়েছিলেন, অনুরূপ কাজের জন্য যে কোন দেশ গৌরব বোধ করবে। প্রয়াত ডাঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত তাঁর 'অপ্রকাশিত রাজনৈতিক ইতিহাস' এ বলেছেন, ভারতীয় বৈপ্লবিকরা ছিলেন বুর্জোয়া 'ন্যাশানালিষ্ট' তাঁরা ভারতের বৈদেশিক কূটনীতি স্থাপনের অগ্রদূত। এক সময়ে জার্মান প্রবাসী ৺অবিনাস ভট্টাচার্যও (মুরারি পুকুর বোমার মামলার আসামী) তাঁর বিদেশে ভারতীয় বিপ্লবীদের কার্যকলাপ সম্বন্ধে লেখা বইয়ে একই কথা বলেছেন যে যুগে ভারতীয় বিপ্লবীরা (এদের মধ্যে অধ্যাপক বরকতুল্লা প্রভৃতি মুসলমান বিপ্লবী নেতাও ছিলেন) জার্মানী ও মধ্যপ্রাচ্যে (তুরস্কে) যুদ্ধ বন্দী ভারতীয় সৈন্যদের নিয়ে মুক্তিবাহিনী গঠন করেছিলেন, বিদেশে স্বাধীন ভারত সরকার গঠন করেছিলেন কোন কোন রাষ্ট্র তাদের স্বীকৃতি ও সামরিক সাহায্যও দিয়ে ছিল) এবং বিদেশ থেকে জাহাজ ভর্তি অস্ত্র শস্ত্র আমদানি করার ব্যবস্থাও করেছিলেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়ে সিঙ্গাপুরে ভারতীয় সিপাহীরা যে বিদ্রোহ করেছিল, তার জন্য সংগঠনের কৃতিত্ব

ও ভারতীয় বিপ্লবীদের দেশের অভ্যন্তরে, প্রায় সারা উত্তর ভারত ব্যাপী সৈনিক বিদ্রোহের সুপরিকল্পিত প্রস্তুতি ছিল, বিশ্বাসঘাতক কৃপাল সিং যদি বিদ্রোহের আসন্ন মুহূর্তে সমস্ত পরিকল্পনা ফাঁস করে না দিত তবে ভারতের ইতিহাস হয়ত অন্যরূপ নিতেও পারত। ভ্রাতৃঘাতী সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় রক্তে কলঙ্কিত না হয়ে, হিন্দু মুসলমান, শিখ, ডাচ প্রভৃতি নানা সম্প্রদায়ের সৈনিকদের, শহীদদের রক্তে পূর্ণ স্বাধীনতা, অথও ভারত বিশ্বে তার বিশেষ স্থান অধিকার করতে পারত। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে নেতাজী সুভাষচন্দ্রের নেতৃত্বে আজাদ হিন্দ ফৌজ যে গৌরবময় ভূমিকা পালন করেছেন, অগ্নিযুগের বিপ্লবীরা ব্যর্থ হ'লেও, তার পথ নির্দেশ করে গিয়েছিলেন।

তাই আবার প্রশ্ন করি 'ওঁরা কি সন্ত্রাসবাদী ছিল?

——

"স্বাধীনতা বলতে শুধু রাজনৈতিক
স্বাধীনতা থেকে মুক্তি বোঝায় না,
বোঝায় সম্পদের সুসম বণ্টন,
জাতিভেদ প্রথা ও সামাজিক
অন্যায়ের বিলোপ সাধন
এবং সাম্প্রদায়িকতা ও
ধর্মীয় গোঁড়ামী নির্মূল করা।"
"সুভাষ চন্দ্র বসু"

বিপ্লবী ডাঃ ভূপাল চন্দ্র বসুর সংক্ষিপ্ত জীবন কথা

—রথীন রায়

জন্ম : ২৮শে এপ্রিল, ১৯০১

মৃত্যু : ২৬শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৮১

বিপ্লবী নেতা ডাঃ ভূপালচন্দ্র বসু একটি স্মরণীয় নাম। যে সকল মহান দেশসেবকের দুঃসাধ্য সাধনা অসীম ত্যাগ, নির্যাতন ও দুঃখ বরণের ফলে ভারত স্বাধীনতা লাভ করেছে, ডাঃ বসু তাঁদের অন্যতম। ১৯০১ খৃষ্টাব্দের ২৮ শে এপ্রিল ঢাকা বিক্রমপুরের অন্তর্গত বহর গ্রামের বিখ্যাত বসু রায় চৌধুরী পরিবারে ভূপালচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম ৺কামিনীকুমার বসু। তিনি পিতা-মাতার সপ্তম সন্তান ছিলেন।

কিশোর বয়সেই ভূপালচন্দ্র বিখ্যাত বিপ্লবী নেতা হেমচন্দ্র ঘোষ, অনিলচন্দ্র রায় প্রমুখের সংস্পর্শে আসেন এবং বৈপ্লবিক সংগঠনের ভাবধারায় দীক্ষিত হন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কৃতিত্বের সহিত বি, এস, সি, পাশ করে কিছুদিন বেনারস ইনজিনিয়ারিং কলেজে অধ্যয়ণ করেন এবং তারপর কলিকাতায় আইন পড়েন। কিন্তু তরুণ বিপ্লবী সাধকের নিকট এর কোন পাঠক্রমই মনোমত হয় না এবং তিনি ভর্তি হন আর, জি, কর মেডিকেল কলেজে এবং সেখান থেকে কৃতিত্বের সহিত এম, বি, পাশ করেন।

ভাল ডাক্তার হলেও ডাক্তারি ব্যবসার দ্বারা প্রচুর অর্থোপার্জনে সাংসারিক শ্রীবৃদ্ধিলাভের প্রতি বিপ্লবী মন সাড়া জাগাল না। ভূপালচন্দ্র বেছে নিলেন বিপ্লবী সংগ্রামের বিপদ সংকুল কঠিন কর্তব্যের পথ। তিনি শুনলেন তাঁর অন্তরে জীবন দেবতার অমোঘ আহ্বান। আত্মোৎসর্গের দীপ্ত প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হলেন তরুণ পথিক।

"—যে শুনেছ কানে

তাঁহার আহ্বান গীত, ছুটেছে নির্ভীক পরাণে সঙ্কট আবর্তমাঝে, দিয়েছে সে বিশ্ব। বিসর্জন, নির্যাতন লয়েছে সে বক্ষপাতিও, মৃত্যুর গর্জন শুনেছে সে সঙ্গীতের মত।"

অহিংস অসহযোগ আন্দোলনের ব্যর্থতার পর দেশে নবোদ্যমে যে সশস্ত্র সংগ্রামের গোপনত আয়োজন শুরু হয়েছিল, ডাঃ ভূপালচন্দ্র তার সাথে নিজেকে যুক্ত করলেন। কলিকাতায় তিনি একটি বিপ্লবী গোষ্টি গড়লেন এবং সহকর্মী নিলাদ্রি চক্রবর্তীর পিতার কারখানায় বোমা তৈরির কাজ আরম্ভ করলেন।

কলিকাতার পুলিশ কমিশনার মিঃ টেগার্ট ছিলেন বিপ্লবীদের পরম শত্রু। ১৯৩০ সালের ২৫শে আগষ্ট, মিঃ টেগার্টকে লক্ষ্য করে ডালহৌসি স্কোয়ারে বোমা নিক্ষিপ্ত হল। এবারও টেগার্ট অল্পের জন্য প্রাণে বেঁচে গেলেন। ঘটনা সম্পর্কে অন্যদের সঙ্গে গ্রেপ্তার হলেন ডাঃ ভূপালচন্দ্র। অভিযুক্তদের স্পেশাল ট্রাইবুনাল আদালতে বিচার হল এবং ১৯৩০ সালের ২৭শে নভেম্বর ডাঃ ভূপালচন্দ্র বসু ২০ বছরের দ্বীপান্তর দণ্ডে দণ্ডিত হলেন। হাইকোর্টে আপীলে তাঁর দণ্ডাদেশ ১৫ বছর দ্বীপান্তর হল।

দ্বীপান্তর আদেশের সঙ্গে সঙ্গে ডাঃ বসুর যাবতীয় স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি সরকার বাজেয়াপ্ত করল এবং তাঁর পরিবারের প্রতিটি মানুষ সরকারী নির্যাতনের শিকার হলেন। বাজেয়াপ্ত সম্পত্তি অদ্যাবধি প্রত্যার্পিত হয় নি।

ডাঃ বসুকে প্রথমে ব্রিটিশ সরকার অবরুদ্ধ করল রাওয়ালপিণ্ডি জেলের একটি নির্জন সেলে। ক্ষুদ্র

কারাকক্ষটি ছিল অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর এবং মনুষ্যবাসের অযোগ্য। ১৯৩১ থেকে ১৯৩২ সাল পর্যন্ত তিনি এই নির্জন কারকক্ষে কাটালেন। তারপর তাঁকে পাঠান হল আন্দামান সেলুলার জেলে। ১৯৩৩ সালে সেলুলার জেলের বন্দীগণ সরকারী অবিচার, কদর্য আহার এবং অমানুষিক আচরণের বিরুদ্ধে যে দীর্ঘ অনশন ধর্মঘট করেন ডাঃ ভূপালচন্দ্র তাতে অংশ নেন। এই অনশনের ফলে কর্তৃপক্ষ বন্দীদের দাবী মেনে নিতে বাধ্য হয়।

১৯৩৭ সালে আন্দামান জেল থেকে স্বদেশের জেলে স্থানান্তরের দাবি নিয়ে বন্দীগণ পুনরায় যে অনশন ধর্মঘটে নামেন, ডাঃ ভূপাল বসু তাতে বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করেন এবং একক্রমে ৩৭ দিন অনশন পালন করেন। আন্দামানের বন্দীদের এই আন্দোলনের ফলে দেশব্যাপী বিক্ষোভ ও প্রতিবাদ দেখা দেয় এবং ১৯৩৮ সালের জানুয়ারি মসে ব্রিটিশ সরকার সেলুলার জেলে অবরুদ্ধ সপ্তম রাজবন্দীদের স্বদেশের জেলে ফিরিয়ে আনতে স্বীকৃত হয়।

ডাঃ বসুর কাজকর্ম ছিল গভীর রহস্যবৃত, তাঁর ঘনিষ্ঠ সহকর্মীরাও তার সকল সংবাদ রাখতেন না। আন্দামান থেকে ফিরে এসে বকসা বন্দী নিবাসে কারাবাসকালে তিনি জলপাইগুড়ির নাগরিকদের সহিত গোপন যোগাযোগ স্থাপন করেন এবং তাঁর প্রেরণা ও পরামর্শে জলপাইগুড়ি শহরে আজাদ হিন্দ পাঠাগার গঠিত হয়।

কারামুক্তির পর, ডাঃ বসু সুভাষচন্দ্রের অনুবর্তী হন এবং ফরোয়ার্ড ব্লকে যোগদান করেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ কালে ভারতরক্ষা বিধানে পুর্ণবার কারারুদ্ধ থাকেন।

স্বাধীনতার পর, ডাঃ ভূপালচন্দ্র বসু সমাজবাদী আন্দোলনের সহিত যুক্ত হন এবং কিছুকাল পশ্চিমবঙ্গ সংযুক্ত সোস্যালিষ্ট পার্টির চেয়ারম্যান ছিলেন। রাজনৈতিক কাজে ব্যাপৃত থাকলেও কি বন্দীদশায়, কি মুক্ত অবস্থায়, তিনি সুচিকিৎসক হিসাবে সর্বদা আর্তের সেবায় নিজেকে নিযুক্ত রাখতেন। মেজর জেনারেল এ, সি, চ্যাটার্জির সহযোগিতায় তিনি জনসেবার উদ্দেশ্যে ইণ্ডিয়ান ন্যাশেনাল এম্বুলেন্স কোর গঠন করেন এবং দীর্ঘকাল ইণ্ডিয়ান মেডিকেল এসোসিয়েশনের কলিকাতা শাখার সহ সভাপতি ছিলেন।

অকৃতদার, বন্ধুবৎসল এবং নিষ্ঠাবান ডাঃ ভূপাল চন্দ্রের লেখনী শক্তিও কম প্রখর ছিল না। সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণের পূর্ব পর্যন্ত বসুমতী সংস্থা এবং ইণ্ডিয়ান কলেজ অব আর্টসের সভাপতি ছিলেন।

আদর্শের দিক দিয়ে ডাঃ বসু ছিলেন মনে প্রাণে সুভাষবাদী এবং চরিত্রে কিছুটা অনমনীয়। মনে হয়, এই কারনে স্বাধীন ভারতে ডাঃ ভূপালচন্দ্র বসু তাঁর যথাযোগ্য স্থান লাভ করতে পারেননি। এটি নিঃসন্দেহে দুর্ভাগ্যজনক। তাতে অবশ্য তাঁর ভাবমূর্তি ম্লান হয়নি।

একজন সুবক্তা, নিঃস্বার্থ এবং নির্ভীক সংগ্রামী নেতারূপে ডাঃ বসুকে চিরদিন দেশবাসী স্মরণ করবে।

১৯৮১ সালের ২৬শে ফেব্রুয়ারী সুফলাল ভারনানি হাসপাতালে ডাঃ ভূপালচন্দ্র বসু এ জীবনের হিসাব নিকাশ, সাফল্য ও ব্যর্থতার মোহ আবরণ ছিন্ন করে পরম শান্তিতে ঘুমিয়ে পড়লেন মহা যাত্রায়, সেদিন বিপ্লবী সংগ্রামের একটি সমুজ্জল অধ্যায়ের তারকা নিভে গেল চিরতরে।

জীবনের শেষে মৃত্যু আছেই, তবে মরণের পরেও যাঁরা মানব স্মৃতিলোকে অমরত্ব লাভ করেন ডাঃ বসু তাঁদেরই একজন হয়ে চিরদিন বেঁচে থাকবেন।

——

রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্র নাথের স্মৃতি কথা

["A Nation In Making" গ্রন্থ থেকে অনুবাদ]

অনুবাদক—অধ্যাপক নলিনীমোহন দাশগুপ্ত

মিউনিসিপ্যাল আইন

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

বিশেষ বিবেচনা করেই সেই রীতিটি পরিত্যাগ করা হয়েছিল। মিউনিসিপ্যাল আইনে কর্পোরেশনের সভাপতির দিকে প্রধান কর্মকর্তার পদ থেকে আলাদা করে রাখার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। কিন্তু মিঃ বাদ কার্যত দুটি পদকেই একাধারে এনে ফেললেন। পদাধিকার বলে তিনি কর্পোরেশন হাউসের স্পিকার, কিন্তু কার্যত তিনি সর্বাংশে প্রশাসন বিভাগেরও প্রকৃত প্রধান কর্মকর্তারূপে কাজ করছেন, এবং তিনি এই যে রেওয়াজের সৃষ্টি করলেন তার ফলে তার অনুপস্থিতি কালে সেই রীতির অনুসরণ করে ডেপুটি মেয়র সেই ক্ষমতা বলে এক কমিটির দুতৃতীয় কলকাতা মিউনিসিপ্যালিটির নেতা মার্কেটটিং বাড়ীর মধ্যেই কবর দিতে নির্দেশ দেন। কে কখন শুনেছে যে হাউস অব কমন্সের স্পিকার প্রধানমন্ত্রীর কাজ স্বয়ং করে বসেছেন। আর একটি মাত্র দৃষ্টান্ত দিয়েই এ সম্পর্কে আলোচনা শেষ করব। এ আলোচনা আমাকে বাধ্য হয়েই করতে হচ্ছে। কারণ, এমন কতগুলো অবাঞ্ছিত ঘটনা সম্প্রতি ঘটে গিয়েছে যা নিয়ে আলোচনা না করে পারা যায় না।

মিউনিসিপ্যাল আইন অনুযায়ী পাঁচজন অলডারম্যান নিয়োগ করার ব্যবস্থা আছে। কর্পোরেশনের নির্বাচিত কমিশনারগণ ও সরকার মনোনীত সদস্যগণই সেই অলডারম্যানদের বাছাই করে নেন। ইংল্যাণ্ডের দৃষ্টান্ত এই নিয়মটি এখানেও প্রবর্তন করা হয়েছে। উদ্দেশ্য হল কয়েকজন বয়োবৃদ্ধ নাগরিকের জন্য কর্পোরেশনের কয়েকটী আসনের ব্যবস্থা রাখা। কারণ যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও এঁরা নির্বাচনের অনিশ্চিত ফলাফলের ঝুঁকি নিতে আগ্রহশীল হন। অথচ এঁদের উপদেশ সব মূল্যবান এবং কর্পোরেশন সভায় এঁদের উপস্থিতি কর্পোরেশনের গৌরব বৃদ্ধি করবে।

কিন্তু বিলের উপর কমিটি তার যে রিপোর্ট প্রস্তুত করল তাতে সুপারিশ করা হল যে যারা ইতিপূর্বে মিউনিসিপ্যাল কমিশনার হয়েছেন তাদের মধ্য থেকেই অলডারম্যান বাছাই করতে হবে। আমারই ইচ্ছানুসারে অলডারম্যান বাছাই করার পদ্ধতিকে একটু প্রসারিত করা হয়েছিল এবং কর্পোরেশন তার ইচ্ছামত যে কোন লোককেই 'অলডারম্যান' নিয়োগ করার অনুমতি দেওয়া হয়। আলোচনা প্রসঙ্গে আমি বলেছিলাম যে কর্পোরেশনের সুপারিশ মত এই পদটি পরিষদের মধ্যে অলডারম্যান নির্বাচন হলে স্যার জগদীশ বোস, ডাঃ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং তাদের মত খ্যাতনামা ব্যক্তিরা বাদ পড়ে যাবেন। আমার সহকর্মীরা আমার মত গ্রহণ করলেন। বিলটি উত্থাপন কালে আমি বলেছিলাম :

"সব সমাজের মধ্যেই এমন এক শ্রেণীর বিশিষ্ট ব্যক্তি থাকেন যারা নিজেদের প্রকৃতি এবং জীবনের অভ্যাস বশতঃই কোন প্রকার নির্বাচনের ঝামেলা পোহাতে বা তার অনিশ্চিত ফলাফলের ঝুঁকি নিতে ইচ্ছুক নন। অথচ কর্পোরেশনের সভায় তাদের উপস্থিতি কর্পোরেশনের মর্যাদা বৃদ্ধি করবে এবং কোন বিষয়ে আলোচনার সময় তাদের বুদ্ধি-পরামর্শের শক্তি কাজে লাগবে। আমাদের সমাজের এই রকম যোগ্যতা সম্পন্ন ব্যক্তিদের আমি প্রায় নামও করতে পারি। কিন্তু যুক্তিকে আরও জোরদার করার জন্য ব্যক্তিগত ভাবে তাদের নামোল্লেখের কোন প্রয়োজন নেই। যুক্তির সারবত্তা এমনিতেই এই খোলাখুলি আলোচনারই প্রতিষ্ঠিত। এই শ্রেণীর লোকদের জন্য কর্পোরেশনে স্থান থাকা উচিত। এজন্য কো-অপশন প্রভৃতি গ্রহণ করলেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়। কোন নির্বাচন মণ্ডলী যেমন কর্পোরেশনের নির্বাচিত

ও অবৈতনিক সদস্যগণের দ্বারা এই কো-অপারেশনের কাজ চলতে পারে।"

এতথা আমিতাভাবেই আমি যে লেজিস্লেটিভ কাউন্সিলে আলোচিত বিষয়ের সূত্র ধরে কোন আইনের ব্যাখ্যা করা চলতে পারে না। তবে আইন প্রণেতারা কি উদ্দেশ্য নিয়ে আইন প্রণয়ন করেছেন, অন্ততঃ সে সম্পর্কে একটা নির্দেশ এই আলোচনা সূত্রে পাওয়া যায়। পরন্তু আমি যা বলেছি, তাই হচ্ছে সব দেশের দস্তুর। কিন্তু স্বরাজিস্টরা সব নস্যাৎ করে দিয়েছেন। তারা তরুণ ব্যারিস্টারদের যারা অনায়াসেই নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারতেন, তাদের এনে অলঙ্কারস্বরূপ নির্বাচন করলেন। এর প্রত্যক্ষ কারণ একমাত্র এইযে তারা স্বরাজিষ্ট পার্টির মেম্বার। এর চেয়ে যোগ্যতার লোক পাওয়া যেত এবং সেক্ষেত্রে করদাতাদের স্বার্থ এবং আইন সভার উদ্দেশ্য, দুইই বিশ্বস্ততার সহিত রক্ষা পেত। কারণ আমি সেরূপ হতাশ হচ্ছি না, কারণ একটি চাতকের ডাকই নিদাঘ আনেনা। একটি মাত্র ঘটনাই একটা সাধারণ নিয়ম নির্দেশ করে না। গণতান্ত্রিক কলকাতা একটি নতুন কীর্তি। যে পরিবেশে গণতন্ত্র সাফল্য মণ্ডিত হয় সে পরিবেশ গড়ে উঠছে এবং তার ক্রমবিকাশও হবে। বর্তমানের এই বৈরতন্ত্রের কৃতিত্ব সাময়িক ব্যাপার মাত্র। আজকের দিনের সব জিনিষ কৌশলের দ্বারা নিজেকে সজ্জিত করে এই বৈরতন্ত্র আশা দিয়ে নিজেকে যতই গণতন্ত্র বলে জাহির করুক না কেন, জনগণের অপ্রতিরোধ্য জাগ্রত চেতনার স্রোত মুখে তা ভেসে যেতে বাধ্য।

কোন চালাকি, কোন ধাপ্পাবাজি, কোন ধনীর কিনিয়ই সেই চেতনাকে রুদ্ধ বা ধ্বংস করতে পারবে না। কলকাতা কর্পোরেশনের প্রশাসনে গণতন্ত্র পুনরুজ্জীবিত হয়েছে। অনেক ঝড় এর উপর আসবে। কিন্তু সব বিপদকেই সে কাটিয়ে উঠবে। এই গণতন্ত্র এখন শৈশবের যন্ত্রণায় ভুগছে। এক বৈরতন্ত্রের অন্তিমকালীন সর্দার হয়ে এখন আবির্ভূত হয়ে আছে। কিন্তু এই অবস্থার মধ্যেই গণতন্ত্র আর প্রাণকোষের ভয়কে আরও সতেজ ও শক্তিশালী করে তুলবে এবং ভবিষ্যৎ সাফল্যের উপযোগী হয়ে গড়ে উঠবে। সে সাফল্য প্রতিষ্ঠিত হবে কলকাতার এমন এক পৌর শাসন প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলে যেখানে কোন দল বা ক্ষুদ্র স্বার্থের জোট ধামা ধরতে পারবে না, যেখানে জনগণের মাধ্যমেই জনগণের স্বার্থ রক্ষিত হবে।

কলকাতা মিউনিসিপ্যাল বিল লেজিস্লেটিভ কাউন্সিলে পাশ হয় ১৯২৩ সালের ৭ই মার্চ তারিখে। কিন্তু সেই বিলের উপর চূড়ান্ত আলোচনার পূর্বেই আমি বেঙ্গল মিউনিসিপ্যাল অ্যাক্ট সংশোধনের জন্য একটি বিলের খসড়া প্রস্তুত করি। সেটি ১৯২৩ সালে ১৬ই আগষ্ট লেজিস্লেটিভ কাউন্সিলে উপস্থাপিত করা হয়। এই বিলটি এমনভাবে রচনা করা হয়েছিল যে সেই সময় যে আইন কার্যকর ছিল তার চেয়ে অনেক বেশী পরিমাণে তা উন্নত ছিল। এই বিলে প্রশাসনিক বিধি বিধান যা প্রণয়ন করা হয় তাতে মিউনিসিপ্যালটি দফুরকে অনেক বেশী ক্ষমতা দেওয়া হয়। অবশ্য সে ক্ষমতা প্রয়োগ ক্ষেত্রে স্থানীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা রাখা হয়েছিল। তবে স্থানীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে যে বিধান করা হয়েছিল তা ইংল্যাণ্ডের লোকাল গভর্নমেন্ট বোর্ডের ক্ষমতার মত এত বেশী কঠোর নয়। বিলটি উন্নত ধরনের হলে ঠিক বৈপ্লবিক পরিবর্তনের ব্যবস্থা এতে নেই। সেকথা আমি লেজিস্লেটিভ কাউন্সিলে বলেছি। আমরা পুরানো ভিত্তির উপরই গঠনকার্য করি, কিন্তু সেই গঠনকে আরও প্রসারিত ও আরও বাধামুক্ত করি। পরন্তরা হিসাবে সেটা মিউনিসিপ্যাল প্রতিষ্ঠান বর্তমানে নির্বাচন সদস্যের সংখ্যা ছিল তিন ভাগের দুই ভাগ, আমরা তার পরিবর্তন করে চার ভাগের তিন ভাগ, কোন কোন ক্ষেত্রে পাঁচ ভাগের চার ভাগ করি। শিল্প কেন্দ্রের মিউনিসিপ্যালিটি ছাড়া অন্যত্র চেয়ারম্যান বা সমস্ত কমিশনার মনোনয়নের ব্যবস্থা বাতিল করা হয়। এমন কি শিল্প কেন্দ্রগুলির ক্ষেত্রেও যেখানে কোন সংশ্লিষ্ট নিকটবর্তী অঞ্চলে শিল্পের সঙ্গে সংযুক্ত নয় এরূপ কোন জনসমষ্টি আছে সেখানে তাদের জন্য বিশেষ প্রতিনিধি নির্বাচনের জন্য আলাদা নির্বাচন কেন্দ্র ব্যবস্থা করা হয়

বিলটি যে নীতির উপর রচিত হয় তা হল মিউনিসিপ্যাল কমিশনারদের প্রকৃত ক্ষমতা ও দায়িত্ব হ্রাস করা এবং জিলার নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতাকে শিথিল করে বাইরে থেকে নিয়ন্ত্রণ কর্তৃত্ব প্রয়োগ করা। ১৮৮২ সালে লর্ড রিপনের প্রস্তাব এবং লর্ড মর্লের ১৯০৮ সালের ডেসপ্যাচের নীতি ছিল তাই। কিন্তু আমি দেখতে পাচ্ছি এই ব্যবস্থা প্রগতিশীল হওয়া সত্ত্বেও একে প্রতিক্রিয়াশীল বলে বর্ণনা করা হচ্ছে এই কারণে যে এতে জনস্বার্থের খাতিরেই প্রয়োজন বোধে সরকারী নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। কোন কোন মিউনিসিপ্যাল অঞ্চলে স্থানীয় বিবাদ বিসম্বাদের ফলে অনেক সময় এমন কঠিন ও জটিল সমস্যা দেখা দেয় যে তখন কোন উচ্চতর কর্তৃপক্ষের সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে হস্তক্ষেপ করা প্রয়োজন হয়ে পড়ে। মনে হয় যেন এই সমালোচকরা ভুলে গেছেন যে ইংল্যাণ্ড যেখানে স্থানীয় বিরোধী অনেক কম জটিলতাপূর্ণ সেখানে এর চেয়ে আরও বেশী ক্ষমতা লোকাল গভর্নমেণ্ট বোর্ডের হাতে ন্যস্ত আছে।

এছাড়া অন্য এক ধরনের সমালোচনা করেও বিলটিকে আক্রান্ত করা হয়েছে। কাউন্সিলের একজন মুসলমান সদস্য বিলটিতে আপত্তি করলেন এবং তার বিরোধিতার কারণ সম্পর্কে তিনি বললেন যে "এই বিলে সাম্প্রদায়িক প্রতিনিধিত্বের নীতি গৃহীত হয়নি।" এ অভিযোগ আমি স্বীকার করে নিচ্ছি। কিন্তু মুসলিম প্যাকট করে এই সাম্প্রদায়িক নীতির সমর্থন ও সম্প্রসারিত করার দায়িত্বভার এই প্যাকট দ্বারা বাংলার মিউনিসিপ্যালিটীগুলিতে সাম্প্রদায়িক নীতি প্রয়োগের সিদ্ধান্তে নেওয়া হয়। আমার নিজের কথা আমি বলতে পারি যে আমার মনোভাবের কোন পরিবর্তন হয়নি এবং স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন মূলক প্রতিষ্ঠানগুলি গঠনে সাম্প্রদায়িক পদ্ধতির দূর বিরোধিতা করার যে পথে আমি চলে এসেছি সেই পুরানো পথে চলাই আমি শ্রেয় মনে করি।

মিউনিসিপ্যাল বিলগুলি সম্পর্কে আলোচনা থেকে বিরাম গ্রহণ কালে আমি মনে করি যে আমার সেক্রেটারী মিঃ গুহ একাজে যে শ্রম স্বীকার করেছেন তার উল্লেখ করা উচিত। মিউনিসিপ্যালিটির কাজে তার প্রচুর ও নানা ধরনের অভিজ্ঞতা ছিল। তিনি কয়েকবছর যাবৎ কলকাতা কর্পোরেশনের ডেপুটি চেয়ারম্যানের কাজ করেছেন, কিছুদিনের জন্য চেয়ারম্যানের কাজ করেছেন। ২৪ পরগণার জিলা ম্যাজিষ্ট্রেট এবং মিউনিসিপ্যালিটির ডেপুটী কমিশনার রূপেও তার যথেষ্ট অঞ্চলের মিউনিসিপ্যালিটীর কাজকর্ম সম্পর্কে ভাল জ্ঞান ছিল এবং মিউনিসিপ্যাল কাজের বিস্তারিত খুঁটিনাটী বিষয় এবং আইনের প্রয়োগ কৌশল ও তার বেশ দখলে ছিল। আমাদের মিউনিসিপ্যাল বিল প্রণয়নের তার এই সমস্ত জ্ঞান প্রচুর পরিমান সাহায্য করেছে।

(চলবে)

Regd No. R. N. 24511/71 | Biplabi Bangla | Regd. WB/NC 77
Phone : 34-1795
বার্ষিক :—ডাকমাশুল সহ ১৫.০০ টাকা | ষাণ্মাসিক :—৮.০০ টাকা | মূল্য—৩০ পয়সা

বিপ্লবী পুস্তকমালা

নেতাজীর সিক্রেটসার্ভিস - ডাঃ পবিত্রমোহন রায়—২·০০
বিপ্লবী মহানায়ক রাসবিহারী—সুবোধ মজুমদার
অনুশীলন সমিতির বিপ্লবী প্রচেষ্টা—ব্রজেন্দ্র দাস

—ক্ষীরোদ কুমার দত্তের—

১। বাংলার অগ্নিযুগ—১·৫০, ২। বহির্ভারতে ভারতীয় বিপ্লব প্রচেষ্টা—৮·০০
৩। অনুশীলন সমিতির পি, মিত্তির—২·০০, ৪। পৌরাণী সংগ্রাম কাহিনী—১·০০, ৫। কাকোরী শহীদবৃন্দ—১·২৫, ৬। কলকাতা বোমার সংগ্রাম কাহিনী—·৪০, ৭। রাসবিহারী ও অনুশীলন সমিতি—৮·০০
৮। স্বাধীনতাসংগ্রামে নারী ও মেয়ে—·৪০, ৯। বিবেকানন্দ ও সমাজবাদ—·৬০
১০। বিপ্লবী বিবেকানন্দ—·৫০, ১১। মহারাজ ও সুভাষচন্দ্র—·৪০
১২। ভারতের নবজাগরণ ও ভগিনী নিবেদিতা—·১৫, ১৩। দেশ বন্ধুর ডায়েরি (১)—১·০০, ১৪। দেশ বন্ধুর ডায়েরি (২)—২·০০
১৫। শহীদ চন্দ্রশেখর আজাদ—·৫০, ১৬। ১৯শে এপ্রিল জাতীয় শহীদ দিবস—৯·০০, ১৭। হার্ডিঞ্জ হত্যা প্রচেষ্টা—·৭৫, ১৮। [illegible] স্বাধীনতা সংগ্রাম ও অনুশীলন সমিতি—৪·০০, ১৯। ভারতের [illegible] পত্রিকার ইতিহাস—·৪০, ২০। লাট হত্যা প্রচেষ্টা—১·৫০

প্রাপ্তিস্থান :— ৪নং বল্লভ দাস ষ্ট্রীট কলিকাতা-৭০০০০৭

শৈলশ্রী—১/১/১/A বঙ্কিম চ্যাটার্জী ষ্ট্রীট কলিকাতা-৭৩

সম্পাদক—
শ্রীশান্তিপদ রায়চৌধুরী

॥ সম্পাদকমণ্ডলী ॥

শ্রীজগদীশ চট্টোপাধ্যায় (সভাপতি)

শ্রীভবেশচন্দ্র নন্দী
পুষ্প চ্যাটার্জী
মলয় ঘোষ

প্রকাশক ও মুদ্রক—
শ্রীঅনিল সেনগুপ্ত

দিল্লীর বিশেষ প্রতিনিধি—
শ্রীবাবীন ঘোষ

স্কেচ—
শ্রীনন্দগোপাল পাল

মূল কার্যালয়—৪নং বল্লভ দাস ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০০৭ শ্রীঅনিল সেনগুপ্ত কর্তৃক [illegible] এবং তৎকর্তৃক প্রিন্টিং পাবলিসিটি, ১১৭, কেশবচন্দ্র সেন ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০০৯ হইতে মুদ্রিত।

বিপ্লবী বাংলা

॥ বিপ্লবী পরিষদের সাপ্তাহিক মুখপত্র ॥
স্থাপিত—১৯৫৬, 'বিপ্লবী বাঙ্গালী' নবকলেবরে—১৯৭১

দশম বর্ষ	শনিবার ২৮শে চৈত্র, ১৩৮৭ ১১ই এপ্রিল ১৯৮১	২৫ সংখ্যা

নীতি একটি আপেক্ষিক কাজ। জগতে বিশুদ্ধ নীতি বলিয়া কোন পদার্থ আছে কি? ঐ ধারণা কুসংস্কার মাত্র। প্রত্যেক যুগের প্রত্যেক ব্যাক্তিকে একই আদর্শের দ্বারা বিচার করিবার অধিকার আমাদের নাই। অবস্থার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ভাবের পরিবর্তনও অপরিহার্য্য।

—স্বামী বিবেকানন্দ

বিঃ দ্রঃ—আগামী সংখ্যা ২৫শে এপ্রিল প্রকাশিত হইবে। —সম্পাদক

এ কি গৃহ যুদ্ধের পদধ্বনি

দিনের পর দিন, একটির পর একটি ব্যবস্থা গ্রহণ করে, পশ্চিমবঙ্গের শাসক দলগুলি এ রাজ্যের মধ্যে যে ধরনের পরিবেশ গড়ে তুলছেন, তার পরিণতি হবে ভয়ঙ্কর। নিজেদের একটি ভুল সিদ্ধান্ত যখন জনমানসে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করছে, তখন কৃতকর্মের পর্যালোচনা না করে, নতুন করে পরিস্থিতিকে আরো ঘোরালো করে তুলছেন। গত তিন চার দিনের মধ্যে প্রশাসক দল যে মানসিকতার পরিচয় দিয়েছেন, তার দ্বারা মনে হয় তারা যেন একটা গৃহযুদ্ধের সম্ভাবনাকে ত্বরান্বিত করতে চাইছেন। ধূমায়িত অসন্তোষ যদি দেশের মধ্যে অশান্তির আগুন জ্বালিয়ে দেয় কলকাতায় বা বিশেষ কোন স্থানে, তবে সে আগুন যে রাজ্যের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে সব ছারখার করে দিতে পারে, সেটা বুঝবার মত সামান্য বুদ্ধিরও কি আজ অভাব ঘটেছে রাজ্যের বর্তমান রাষ্ট্রনায়কদের? কয়েকটি দলের সমন্বয়ে গঠিত পশ্চিমবাংলা সরকার। কোন দলেরই কেউ কি ভেবে দেখছেন যে তারা আগুন নিয়ে খেলা করছেন?

৩০শে মার্চের পুলিশের গুলিচালনার মধ্য দিয়ে জনরোষ প্রজ্বলিত হয়েছে। নিরপেক্ষ তদন্তের পরিবর্তে আগেভাগেই পুলিশের সাফাই গাওয়ায় মানুষের মনের ক্ষোভকে আরো ঘনীভূত করছে। নিছক পরাধ, শান্তি মিছিলে অংশগ্রহণ করার জন্য কয়েকটি তাজা প্রাণকে হত্যা করার কাজকেও, তারা দলীয় দৃষ্টি ভঙ্গী দিয়ে ঢাকা দিতে চাইছেন, প্রকৃত অপরাধীদের কোন বিচার না করে। আন্দোলন সংগঠনকারীদের উপরই সবদোষ চাপিয়ে নিজেদের অযোগ্যতাই শুধু প্রমাণ করেননি, হৃদয়হীনতার চরম স্বাক্ষরও রাখছেন। এই হত্যার বিরুদ্ধে বনধ প্রতিবাদ জানাবার অধিকার সব রাজনৈতিক দলেরই আছে। এক্ষেত্রে বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করার ব্যাপার হল যে সব বিরোধীদলগুলিই, অন্যান্য ক্ষেত্রে মতবিরোধ থাকা সত্ত্বেও, নারকীয় নরহত্যার বিরুদ্ধে সকলেই সমানভাবে সোচ্চার এবং অকুণ্ঠ সমর্থন জানিয়েছেন বনধ পালনের জন্য। এতেও কিন্তু চেতনার উদ্রেক ঘটেনি প্রশাসক দলগুলিতে। তারা অন্যায়কে স্বীকার না করে, আরো অমঙ্গলজনক সম্ভাবনাকে ডেকে আনছেন।

এ সত্য আজ পরিস্ফুট যে এবারকার 'বনধ' স্বতস্ফূর্ত ও আন্তরিক। অধিকাংশ খেটে খাওয়া মানুষেরাও এর সামিল হয়েছেন। তাদের প্রতিবাদ ক্ষোভকে প্রতিফলিত করার জন্য খুব একটা প্রচেষ্টা করতে হয়নি তাদের, যারা বনধ পালনের ডাক দিয়েছিলেন। এটা আজ দেওয়ালে লিখনের মত পরিষ্কার যে বর্তমান সরকারের জনপ্রিয়তা আশঙ্কাজনক হারে হ্রাস পেয়েছে ও পাচ্ছে। দেওয়ালের লিখন যারা পড়তে চায় না, তাদের ভবিষ্যৎ যেমন নষ্ট হয় এক্ষেত্রেও তাই ঘটছে। মুখে প্রশাসক দলেরা যতই চিৎকার করুক না কেন, বনধ বিরাটভাবে সফল হয়েছে এবং পশ্চিমবাংলার মানুষ তাদের বিরুদ্ধে অনাস্থা জ্ঞাপন করেছে। গ্রাম গঞ্জের খবর যা পাওয়া যাচ্ছে, তাতে জানা যায় দোকানপাট, স্কুল কলেজ, কলকারখানায় কোন পিকেটিং বা চাপ সৃষ্টি করতে হয়নি। মানুষ নরহত্যার বিরুদ্ধে সুস্পষ্ট রায় দিয়েছে।

তিন তারিখে বনধ তোলার জন্য বামফ্রন্ট তাদের হাজার হাজার কাডারদের নির্দেশ দিয়েছিল বলে সংবাদে প্রকাশ। এটা অত্যন্ত দুঃখ ও বিস্ময়কর। বনধের বিরুদ্ধে প্রচার অভিযান চালাবার অধিকার তাদের ছিল। কিন্তু ঘটনার [illegible] পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষে যাওয়ার নির্দেশ দিয়ে [illegible] অধিকার তাদের নেই। [illegible] মানুষই হবে, সরকারী পুলিশ [illegible] ভন্ন [illegible] [illegible] [illegible]

জন্য সৈন্য দলের সাহায্য নিতে পারতেন। তার জায়গায় তাদের ঠেঙ্গাড়ে বাহিনীকে নিয়োগ করা সংবিধান বিরুদ্ধ ও রীতিমত অগণতান্ত্রিক। আজ কোন দল যদি নিজেদের হাতে আইন তুলে নেয়, একদিন যে সেটা বুমেরাং হয়ে তাদের উপরই ফিরে আসতে পারে, এটা ভেবেও তাদের এ পথে পা বাড়ানো নিতান্ত নির্বুদ্ধিতার পরিচায়ক। বস্তুতপক্ষে তিন তারিখের দাঙ্গাহাঙ্গামার জন্য এই নীতিই দায়ী, এই অভিমত ভিন্ন দলের নেতৃবৃন্দের। তারা আরো মনে করেন যে সকালের দিকে বিশেষ কোন গণ্ডগোল ছিল না। পুলিশকে শান্তিপূর্ণ মিছিল ভেঙ্গে দেবার নির্দেশ দিলে পুলিশ ও দলীয় লোকেরা মিছিল ও বিরোধীদলের লোকদের উপর বলপ্রয়োগ করেন। সংবাদে প্রকাশ, প্রশাসক দলের লক্ষ লক্ষ কাডাররা তাদের খুশীমত ভাবে অবস্থার মোকাবিলা করতে যাওয়ার ফলেই চারিদিকে অশান্তির আগুন জ্বলে ওঠে।

তা ভিন্ন এই পরিস্থিতির অন্য দিকও ভেবে দেখতে হবে। পুলিশ মিছিলকারীদের সঙ্গে মোকাবিলা করতে নৃশংস বলপ্রয়োগ করেছিল কি না। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর নিকট খবর আছে বলে প্রকাশ যে পুলিশকে খুন করার জন্যই গুলি করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। এ সম্বন্ধে বহু টালবাহানার পর জনমতের চাপে সরকার তাদেরই ইচ্ছামত একটি তদন্তের জন্য আদেশ দিয়েছেন পুলিশের ব্যবহার সম্পর্কে। কিন্তু এই সঙ্গে আরো একটি বিষয় তদন্ত করা প্রয়োজন। প্রশাসকদলের লোকদের আচার আচরণ ও তদন্তের বিষয়ীভূক্ত হওয়া দরকার, কারণ এটা রাজ্যের স্বার্থে অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। কোন দলীয় লোকদের উপর আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার ভার দেওয়া হয়ে থাকে, তবে সেটা গৃহযুদ্ধ বাধাবার পরিকল্পনা প্রসূত বলেই স্বীকার করতে হবে। এ সম্বন্ধে সন্দেহ জাগাবার অবকাশ আছে দলীয় নেতাদের কথাবার্তার মধ্যে। কয়েকদিন আগে রামফ্রন্টের সভায় নাকি (খবরের কাগজে সংবাদ) এটা অনুভূত হয়েছিল যে দলীয় লোকদের চাঙ্গা করে তুলতে হবে, লোকের সেদিনের মোকাবিলা করার জন্য। এই অনুভূতির সঙ্গে দলের কার্যকলাপের প্রভূত সঙ্গতি আছে বলেই যদি মানুষ মনে করে, তবে কি খুব ভুল হবে?

এখনও চারিদিক থেকে অত্যাচার, গ্রেপ্তার ও খুন খারাপির খবর আসছে। পরিবেশকে শান্ত করার কোন প্রচেষ্টাই হচ্ছে না! বরং এমন সব কাজ করা হচ্ছে যাতে অশান্তকর পরিবেশে সৃষ্টি হচ্ছে। এসপ্লানেড ইষ্ট-এ ৬টা করে পোড়া ট্রাম বাসের (যদিও কিছু দায়িত্বশীল মানুষ মনে করে যে এর মধ্যে বহুদিনকার অকেজো ট্রাম বাসও আছে) প্রদর্শনী করা হাস্যকর, ট্রামে বাসে পোড়ানো, বোমা ছোড়া কোন সুস্থ মস্তিষ্ক মানুষ সমর্থন করে না। কিন্তু প্রসঙ্গত যে প্রশ্নটা ট্রামে বাসে বসে মানুষেরা তুলে ধরছে সেটা হল এইসব দলের পোড়ান ট্রাম বাসের সংখ্যা কত সেটাও মানুষ জানতে চায়? এই প্রদর্শনীর মাধ্যমে কি নিহত মানুষদের জীবনহানির কৈফিয়ৎ মিলবে? তা ভিন্ন, তাজব ব্যাপার হল যে মুখ্যমন্ত্রী এই প্রদর্শনী স্থলেই ঘোষণা করেছেন যে তাদের আন্দোলন শুরু হবে। মুখ্যমন্ত্রী বিশেষ কোন দলের লোক হলেও, তিনি পশ্চিমবাংলার সব মানুষেরই প্রতিনিধিত্ব করেন সাংবিধানিক ভাবে। আন্দোলনের ঘোষণাটা তার মুখে মানায় না, এটাকে যদি কেউ কেউ থ্রেটনিংস্থাপনা বলে, তবে তিনি কি বলবেন? আমরা শুধু বলতে চাই যে মারদাঙ্গা করে সব মানুষকে শায়েস্তা করে যদি কেউ মনে করেন যে শুধুই তারা নিরাপদে থাকবেন, তবে তিনি মূর্খের স্বর্গে বাস করছেন।

●

আমরা কি চেয়েছিলাম

গুণদা মজুমদার

স্বাধীনতার পর ৩৩ বছর কেটে গিয়েছে। স্বাধীনতার জন্য আমরা লড়াই করেছিলাম দেশবাসীদের দুঃখ দুর্দশা ঘোচাতে, দেশে জনসাধারণের সমৃদ্ধি ফিরে আনতে। কিন্তু তা হয়নি। দেশের ৭৫ ভাগ লোক এখনও সামান্য কাজের সুফল সারা বছর পাননা। স্বাধীনতার সৈনিকরা নিম্ন মধ্যবিত্ত শ্রেণী হতেই বেশি এসেছেন। তাঁদের অনেকে দারিদ্র ও অভাবের তাড়নায় স্বাধীনতার পর বিপন্ন জীবন যাপন করছেন, অনেক বন্ধু দারিদ্রের সঙ্গে লড়াই করে প্রাণত্যাগ করেছেন। দেশকে নতুন ভাবে লড়ার জন্য তাঁরা বিশেষ কোন সুযোগ পাননি। যে সব বন্ধু সে চেষ্টা করেছেন, তাঁরাও সম্মানের সঙ্গে তাঁদের কাজ করতে পারেন নি, হতাশায় কাজ ছেড়ে দিয়েছেন। কিন্তু তাঁদের স্বপ্ন ও দেশগড়ার আগ্রহ এখনও পূর্ণ মাত্রায় আছে। ৩৩ বছর পরে যাঁরা জীবিত আছেন, তাঁরা বৃদ্ধ হয়েছেন বটে, তবে দেশ সেবার আগ্রহ কমেনি।

সর্ব্বভারতীয় ক্ষেত্রে এই অবস্থা মোটামুটি এক। তবুও বাংলা দেশের কথা ধরা যাক। কারণ অগ্নি বিপ্লবীর সংখ্যা এখানে সব প্রদেশ হতে অনেক বেশি। অবশ্য বিপ্লবী বলতে শুধু সশস্ত্র বিপ্লবে যাঁরা দীর্ঘ দিন বিপন্ন জীবন যাপন করেছেন তাঁদের ধরলে হবে না। অহিংস সংগ্রামও যাঁরা স্বাধীনতা পাবার দিন পর্যন্ত সংগ্রাম করেছিলেন তাঁদেরও ধরতে হবে। তবু অগ্নি বিপ্লবদের একটা বড় অবদান ছিল বলে তাঁদের কথা উল্লেখ করছি। এ কথা হয়ত কিয়দংশে ঠিক যে সশস্ত্র গণ-বিপ্লব সংগঠন করেন নি তবে গণ আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন। চট্টগ্রাম বিপ্লবীরা এক বিরাট সশস্ত্র সংগ্রামের ভূমিকা নিয়েছিলেন। ইতিহাসে তার কাহিনী সোনার অক্ষরে লেখা থাকবে। সেই সংগ্রাম নেতাজীর সশস্ত্র ঐতিহাসিক স্বাধীনতার সংগ্রামকে পুষ্ট করেছে। এক কথায় বলা যায় চট্টগ্রামের সশস্ত্র বিপ্লব বীজ হিসাবে দেশের মাটিতে নিহিত হয়েছিল এবং নেতাজির বিরাট সশস্ত্র সংগ্রামকে মহীরুহে পরিণত করেছিল এবং ভারতের স্বাধীনতাকে সফল করেছিল। অগ্নিবিপ্লবীরা অহিংস জন-সংগ্রামকে সম্ভব করেছিল। তাঁদের আত্মত্যাগ, বীর্য ও সাহস সাধারণ মানুষের মনে প্রেরণা এনে দিয়েছিল। ক্ষুদিরাম, বাঘা যতীন হতে আরম্ভ করে ৩০ ও ৬০ দশক পর্য্যন্ত যত সশস্ত্র এ্যাকশন হয়েছে তার প্রভাব জন-মানসে সামান্য নয়। সেই প্রভাবের ফলেই গণ-আন্দোলন সম্ভব হয়েছিল। গোড়া থেকে সশস্ত্র বিপ্লবীরা পূর্ণ স্বাধীনতা চেয়েছিলেন। কংগ্রেস বহুদিন পর্য্যন্ত ইংরেজদের সঙ্গে একটা রফা করতে চেয়েছিল। ১৯৩০ এর পরও সে রফার রেশ সবটা কাটেনি। ১৯৩১ এর চট্টগ্রাম সংগ্রাম ১৯৪৬ এর নৌ-বিদ্রোহকে উজ্জীবিত করেছে। তারপর নেতাজির আজাদ হিন্দ বাহিনীর বৃহৎ সংগ্রাম পৃথিবীতে বোধ হয় এ রকম বৃহৎ সশস্ত্র স্বাধীনতার সংগ্রাম এরকম ঐক্য শৃঙ্খলা নিষ্ঠা ও বীর্যের সঙ্গে কোথাও হয়নি। এই সংগ্রাম যেমন [illegible] পৌঁছিয়ে দিতে বিরাট ভূমিকা গ্রহণ [illegible] ও দেশ

যায়নি। ভিয়েতনামের সংগ্রামের ইতিহাস-এর পরিপ্রেক্ষিতে আলাদা। নেতাজির সংগ্রামের সঙ্গে বা ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের সঙ্গে ভিয়েতনামের সংগ্রামকে ঠিক তুলনা করা যায় না। তবুও ভারতের স্বাধীনতা আমাদের পূর্ণতা কেন এনে দিতে পারলনা, এ আলোচনা দরকার।

কংগ্রেসের নেতৃত্ব গোড়া হতে বিত্তবান ও জীবনে প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিদের হাতে ছিল। অনেক বিপ্লবী কংগ্রেসের আন্দোলনে যোগ দিয়েও সেই নেতৃত্বের প্রভাব নষ্ট করতে পারেন নি। গান্ধীজিকেও তা মেনে নিতে হয়েছিল। যার ফলে তিনি ১৯২৭ এর পর নেতৃত্ব হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লেন এবং বলতে বাধ্য হলেন—একলা চলবে। কিন্তু যে সব বিপ্লবীরা কংগ্রেসের বাইরে ও ভিতরে আপোষহীন সংগ্রাম চালাবার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন এবং ব্রিটিশ শাসিত দেশ ও সমাজের মূল পরিবর্তন করতে চেয়েছিলেন, তাঁরা কেন স্বাধীনতার পর আরও সরব হলেন না? দেশভক্ত এবং দেশের জন্য উৎসর্গকৃত প্রাণ বিপ্লবী-দের কথা বলা হচ্ছে। যারা অন্য দেশের নেতৃত্বকেই একমাত্র চালক বলে মনে করেন, তাঁদের কথা হচ্ছে না যদিও তাঁদের ত্যাগ বা জনগণের জন্য আদর্শকে আমরা শ্রদ্ধা দেখাতে পারি। আসল কথাটা অন্য ভাবে দেখা যাক।

দেশ স্বাধীন হবার পর একদল দেশকর্মী বিধান-সভায়, পার্লামেন্টে ঢুকলেন। কেউ কেউ মন্ত্রী হলেন। অনেকে অবস্থা ফেরালেন। এঁদের মধ্যে ২/৪ জন ছাড়া সামগ্রিকভাবে দেশের সমস্যা সমাধান করতে নতুন উৎসাহ উদ্দীপনা দেখাননি, তাঁদের অধিকাংশ সময় আইনসভা ও নির্বাচনের তোড় জোড় ইত্যাদি কাজে কেটে যায়। নির্বাচনের জন্য উহার সাধু বা অসাধু বিচার করারও সময় তাঁদের নেই। কোটি কোটি ক্ষুধিত দরিদ্র জনসাধারণ তাঁদের দৃষ্টি ও মনকে টানেনা। দেশের আবহাওয়া, শিক্ষা দীক্ষা, কৃষ্টি ও সংস্কৃতিতে লোভী স্বার্থপর রাজনৈতিক নেতারা দুষ্ট প্রভাব ফেলেছেন। এই সব নেতাদের মূল আদর্শ হল—চাচা আপন প্রাণ বাঁচা। আইন সভার ক্ষমতার জন্য লড়াই এত প্রবল হয়ে উঠেছে যে দেশের আসল সমস্যা সমাধানে এঁদের নজর নেই। এই প্রভাব শুধু কংগ্রেসী রাজনৈতিক নেতাদের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। একদা আপোষ-বিহীন কমুনিস্টরাও আইন সভার প্রতিষ্ঠা পাবার জন্য লালায়িত হয়ে উঠেছেন—সেটাও ঐ প্রভাবের ফল। জনসাধারণ হতে আজ কংগ্রেস ও কমুনিষ্ট এবং অন্যান্য দলও অনেক দূরে সরে গিয়েছে। কলকাতায় শোভাযাত্রা বা জুলুস করে প্রমান হয়না যে জনসাধারণের সমস্যা সমাধানে এঁরা খুব আগ্রহী। কলকাতায় বাজারে (যাকে বলে ফ্যাশান) পাতাল রেল করতে খরচ পড়বে এবার একহাজার কোটী টাকা। হয়ত আরও বেশি পড়ে যাবে। সি, এম, ডি এ কলকাতার রাস্তা ঘাট বাড়াতে ও কলকাতাকে সুন্দরী তিলোত্তমা করতে ইতিমধ্যে ৫০০ কোটী টাকা খরচ করেছে। অথচ ১০ লক্ষ বস্তিবাসী পশুর মত জীবন যাপন কল-কাতাতেই করছেন। কয়েক লক্ষ ফুটপাতে বাস করছেন। গ্রামে গরিবের কাজ নেই, সব গ্রামে পানীর জল পরিষ্কার নয়। রোগে চিকিৎসা করার কথা ছেড়েই দিলাম। কলকাতার ডাক্তার সাহেবরা গ্রামেও যাবেন না এবং কম বেতনে পাশ করা ডাক্তারবাবু তৈরী হতে দেবেন না। মুষ্টিমেয় সমৃদ্ধ ব্যক্তি বিকৃত সাহেবিয়ানা, বিকৃত রুচি ও দেশভক্তি শূন্য পরদেশ প্রেম এমন ভাবে ছড়িয়েছেন যে দেশের মূল কথাটা বা দেশের ৭৫-৮০ শতাংশ লোকেদের

প্রয়োজনের বিষয়টা মনে রাখেন না।

বিপ্লবীদের এখানে ত' একটা বড় কাজ ছিল। তাঁদের স্বদেশপ্রীতি জনগণের জন্য দরদ, কর্মে নিষ্ঠা, সাহস ও স্বাধীন চিন্তা দেশকে বড় করার, দেশের মানুষের দুঃখ ঘোচাবার এক বড় হাতিয়ার। সে হাতিয়ারকে দেশের নেতারা ব্যবহার করেন নি। কথা হচ্ছে শুধু নেতাদের দোষ দিয়ে কি আমরা নিজেদের দায়ীত্ব ভুলে যাব? এ সম্পর্কে একটা কথা মনে আসছে। সময়টা বোধ হয় ১৯৪৮-৪৯। বিপ্লবী বাঙলা অফিস বন্ধুবর শ্রীজগদীশ চট্টোপাধ্যায়ের আমন্ত্রণে অনেকে মিলিত হতেন। সেখানে সর্বদা স্বাধীনতা সংগ্রামীদের ভিড়। কোন কোন সময় বিশেষ আলোচনা হয়। একদিন আলোচনা প্রসঙ্গে কথা উঠল পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেসে বিপ্লবীদের প্রভাব কিভাবে বাড়ান যায়। এদেশে কংগ্রেসের সাংগঠনিক নির্বাচনে কিভাবে বেশি সংখ্যক প্রগতিবাদী ব্যক্তিদের জয়ী করা যায়। সে কথাও উঠল। একজন চির-স্বপ্নদর্শী বললেন, ওরা ক্ষমতা পেয়েছে, হাতে প্রচুর অর্থ কংগ্রেসের সাংগঠনিক নির্বাচনে ওদের কখনই হারাতে পারবেন না। যদি প্রভাবই ফেলতে চান তাহলে গ্রামে গ্রামে, শহরের প্রান্তে মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ুন। দেশবাসীকে উজ্জীবিত করুন; স্বাধীনতা সংগ্রামের কথা, স্বাধীনতার আদর্শের কথা, জনসাধারণের অধিকারের কথা বলুন। তাদের সঙ্ঘবদ্ধ করার চেষ্টা করুন। নিশ্চয়ই, নিজের স্বার্থে বা পার্টির স্বার্থে নয়। বন্ধুরা চুপ করে শুনলেন। কিন্তু এই স্বপ্নদর্শীকে অনেকে বাস্তববাদী বলে মনে করেন নি। কিন্তু আজ ত মনে হয়, সেই বাস্তবতাবাদী মুক্ত সংগ্রামী মানুষটির কথার দাম ছিল। বিপ্লবী কবে বিষয় বুদ্ধি পেয়েছেন? তিনি ত' নিজের কথা চিন্তা করতে শেখেন নি। যা হওয়া দরকার তার জন্য সংগ্রাম করাই ত' তাঁর জীবন। তাঁরা প্রাণ পণ করে সংগ্রাম করেছেন। কারও কাছে মাথা নোওয়াননি। সেই বিপ্লবী চিন্তা কি ফুরিয়ে গিয়েছে? নিশ্চয়ই নয়। তবুও বিপ্লবের নামে এখন আমরা কি দেখছি?

কংগ্রেস বা অন্যান্য ঐ জাতীয় প্রতিষ্ঠানের কথা ছেড়েই দিলাম। যাঁরা জন-গণের নামে দিবারাত্রি শপথ নেন, তাঁরা কি করছেন? তাঁরাও ক্ষমতার লড়াইতে নেমেছেন। কিসের ক্ষমতা? কাদের জন্য ক্ষমতা? ক্ষমতা এখন দাঁড়িয়েছে, বিধানসভা কেন্দ্রীয় পার্লামেন্টে যাবার জন্য নানা ফন্দি ফিকির, নানা সমঝোতা অন্য পার্টির সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধা। কাদের জন্য? পার্টির জন্য অর্থাৎ মুষ্টিমেয় নেতারা জনসাধারণের বা সর্বহারাদের নাম নিয়ে ডিক্টেটরী চালাবেন। দেশের মানুষদের কতটা তাঁরা চেনেন জানেন? দেশের যে বিরাট উদার ঐতিহ্য রবীন্দ্রনাথ তুলে ধরেছিলেন, তা তাঁরা গ্রহণ করেন না। তাঁদের একটিই কথা আমাদের ক্ষমতায় বসাও, তাহলেই তোমাদের দুঃখ ঘুচবে। ক্ষমতায় এসে অন্যকে দোষারোপ। কেন্দ্র বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে—এই তাঁদের যুক্তি। যেটুকু ক্ষমতা আছে, তা ব্যবহার করে গরিবের মূল সমস্যার কিছুটা সমাধান করতে তাঁরা এগিয়ে যাবেন না। ঐ এক কথা ক্ষমতায় বসাও। অর্থাৎ পূর্ণ ক্ষমতা না পাওয়া পর্যন্ত গরীব লোক পচে মরুক। অর্থাৎ ক্ষমতা যত বাড়বে, গণ-বিপ্লবের সুযোগও তত বাড়বে। এই অদ্ভুত যুক্তিতে দেশপ্রীতি বা গরিবের জন্য কোন দরদ নেই। সমস্যা সমাধানে কোন আগ্রহ নেই। পূর্ণ ক্ষমতা, অর্থাৎ ক্ষমতা তাঁরা পেলে সেই এক দশা হবে—গরিব পিছনে পড়ে থাকবে। এখন যেমন আছে, তার পরিবর্তন যা হবে তা হল ডিক্টেটরী, সাধারণ মানুষ

আর মন খুলে কথা বলতে পারবেন না।

আর এক নিষ্ঠুর বৃত্তান্ত যা এখন ঘটছে, দেখা যাক। শ্রমিক শ্রেণীকে সংগ্রামী বলা হয়। কিন্তু সে সংগ্রামকে কোথায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে? পাইয়ে দেবার রাজনীতিতে সব ট্রেড ইউনিয়ন মেতে উঠেছেন। সাম্যবাদীরা এই ৬০ বছরে শ্রমিক আন্দোলন কোন পথে চালিয়ে নিয়ে গিয়েছেন? তাঁরা স্বাধীনতা সংগ্রামে যোগ দেননি, শুধু তাই নয়। বারবার এর বিরোধ করেছেন। নেতাজিকে দেশদ্রোহী বলার স্পর্দ্ধা (এবং মূর্খতার) পরিচয় দিয়েছেন। ৬০ বছর শ্রমিক শ্রেণী শিক্ষা দীক্ষা ও দেশপ্রেমে দীক্ষিত হয়ে যোগ্যতা অর্জন কেন করলনা? কেন নেতৃত্ব নেবার জন্য তাঁদের প্রস্তুত করা হলনা? কেন তাঁরা তাঁদেরই গরিব মা বাবা ভাইবোন যাঁরা গ্রামে বাস করেন—তাঁদের জন্য কিছু করলেন না? যে দেশে শতকরা ৭৫ জন লোক দরিদ্র সীমার নীচে (অর্থাৎ মাসে ২০০ টাকা উপায় করেন না) সেখানে এক হাজার দু হাজার টাকা পেয়েও আরও বাড়তি টাকার জন্য আন্দোলন হয়। কিন্তু সেই বাড়তি টাকার সামান্য অংশ গরিব গ্রামবাসীদের সঙ্ঘবদ্ধ করতে, তাদের চেতনা ও সাহস বাড়াতে কি সেই ভাগ্যশালী শ্রমিকরা দিতে পারেন না? সমাজ-চেতনা কোথায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে। ভিক্ষা দেবার কথা বলা হচ্ছে না। একাত্মবোধের কথা হচ্ছে, একীকরণের কথা হচ্ছে। সমাজ-চেতনায় জাগ্রত করার বদলে সাম্যবাদীরা ক্ষুদ্র স্বার্থ অর্জনের জন্য সংগ্রাম করতে বলছেন। তার ফলে সমাজ স্বার্থ-সর্বস্ব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে বিভক্ত হচ্ছে। এক দেশ এক আত্মার কথা এঁরা ভুলিয়ে দিচ্ছেন। দেশে তাই আজ বিচ্ছিন্নতার প্রবল জোয়ার এসেছে। এ জোয়ার রুখবে কে?

বিচ্ছিন্নতাবাদী জোয়ার দেশের সর্বনাশ ডেকে আনবে। এটা কয়েকটি প্রগতিবিরোধী দল সৃষ্টি করেছে বললে ভুল হবে। দেশের আবহাওয়া অনেক কারণে পরিবর্তন হয়। আমাদের দেশে এই অবনতির মূলে এই স্বার্থ-সর্বস্ব চিন্তা ও আপন ভাইয়ের প্রতি অবহেলা মস্ত বড় কারণ। এই পাইয়ে দেওয়া রাজনীতিও একটা বড় কারণ। দেশের শিক্ষিত ও বণিক শ্রেণী (বিদেশী শিক্ষা ও বিদেশী উপার্জন নীতি যাঁরা গ্রহণ করেন) সর্বদাই স্বার্থ-সর্বস্ব। দেশী জমিদার ও অত্যাচারী ছিলেন। সেই জমিদারী প্রথা উঠে গিয়েছে। কিন্তু এখন রাজনীতি ও অর্থনীতি আর এক রকম জমিদারের সৃষ্টি করেছে। এ সাংঘাতিক জমিদারী নামাবলি গায়ে রঘুডাকাত সব। এদের উচ্ছেদ না করতে পারলে দেশ বাঁচবেনা। কি করে হবে? কারা করবে? তার এক মস্ত জবাব সাধারণ মানুষ ক্রমশ সচেতন হচ্ছেন। যেদিন সংঘবদ্ধ হয়ে এক জাতি এক প্রাণ এক দেশ একতা হয়ে গরিবেরা রুখে দাঁড়াবেন তখনই এই সাংঘাতিক চক্র হতে দেশকে মুক্ত করা যাবে।

বিপ্লবীদের, স্বাধীনতা সংগ্রামীদের একটা বড় ভূমিকা এখানে আছে। বঙ্কিমচন্দ্র আনন্দমঠে একটি মহাসত্য আমাদের দিয়ে গিয়েছেন। 'প্রাণ দিতে পার। সে ত' তুচ্ছ, ভক্তি দিতে পার।' সেই বিতর্কহীন ভক্তি মায়ের পায়ে দেশের পায়ে কি আমরা এখনও দিতে পারি না। নিশ্চয় পারি। চৈতন্যদেব মানবমুক্তির জন্য যে অভেদভাব এনেছিলেন, ভক্তির বন্যা বইয়ে দিয়েছিলেন, হিন্দু মুসলমান চণ্ডালকে এক সূত্রে বেঁধেছিলেন, তার জন্য কি আমরা প্রস্তুত বাংলাদেশে বিপ্লবের হাওয়া

(এর পরের পৃষ্ঠায় দেখুন

অতঃপর বামফ্রন্ট সরকার কি পদত্যাগ করবেন ?

কালীপদ সরকার

গত ৩০শে মার্চ বিধানসভা অভিযানকে প্রারম্ভ সূচী করে প্রদেশ কংগ্রেস (ই) বামফ্রন্ট সরকারের অপশাসনের বিরুদ্ধে যে বিক্ষোভ আন্দোলনে নেমেছে তা হল বস্তুতঃ মার্কসবাদী দলতন্ত্রের বিরুদ্ধে গণতন্ত্র পুনঃ প্রতিষ্ঠার জাতীয় সংগ্রাম। সেই কারণে এই সংগ্রাম কেবল কংগ্রেস (ই) দলের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে নি, আন্দোলনের সামিল হয়েছে রাজ্যের সকল অ-কমিউনিষ্ট রাজনৈতিক দল, ছাত্র যুব সংগঠন, শহর ও পল্লীর মেহনতী মানুষ, প্রবীণ স্বাধীনতা সংগ্রামী এবং জ্ঞানী গুণী শিক্ষক অধ্যাপক ও শিল্পী সম্প্রদায়। এই আন্দোলনে যোগ দিয়েছে হিন্দু ও মুসলমান হাতে হাত ধরে। দেরিতে হলেও এই প্রত্যাশিত আন্দোলন পশ্চিমবঙ্গবাসীকে গভীরভাবে নাড়া দিয়েছে এবং সমগ্র ভারতের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। ঘটনাটিকে তাই ঐতিহাসিক না বলে উপায় নেই।

৩০শে মার্চের গণ সমাবেশে পুলিশের গুলি বর্ষণে মৃত্যু হয়েছে তিনটি তরুণের। পাচ লক্ষ লোকের এই বিরাট সমাবেশ প্রায় বিনা প্রস্তুতিতে ঘটেছিল এবং বামফ্রন্ট সরকারের নিকট ছিল অভাবিত। স্বাভাবিক কারণেই তাই সরকার কিছুটা বে-সামাল হয়ে পড়েন। নতুবা লাল বাজার পুলিশ অফিসের গেটগুলি বন্ধ করে দেওয়া হত না। শান্তিপূর্ণ জন-সমাবেশকে বিক্ষুব্ধ করে তোলেন সরকার নিজে, আইন অমান্যকারীদের বিরুদ্ধে আইন সম্মত ব্যবস্থা গ্রহণ না করে লাঠি চালিয়ে, সরকারই হাঙ্গামা বাঁধান এবং গুলী চালনার সুযোগ সৃষ্টি করেন। আবার গুলীও চলেছিল হত্যার উদ্দেশ্যে—একথা বলেছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী স্বয়ং। ঘটনা স্থলে উপস্থিত অনেকের নিকট গুলী চালনা অনাবশ্যক, উদ্দেশ্যমূলক এবং মর্মান্তিক বলে মনে হয়েছে।

৩০শে মার্চের গুলী চালনা ও তিন ব্যক্তির মৃত্যু সম্পর্কে বিধানসভায় এবং বিধানসভার বাইরে বিচার বিভাগীয় তদন্তের দাবি উঠলে মুখ্যমন্ত্রী তদন্তের দাবি প্রথমে সরাসরি অগ্রাহ্য করেন এবং পরে সম্ভবতঃ ঘটনার গুরুত্ব উপলব্ধি করে একজন প্রশাসকের দ্বারা তদন্তের নির্দেশ দেন। গুলী চালনার স্বপক্ষে বক্তব্য জোরালো থাকলে সরকার নিশ্চয়ই বিচার বিভাগীয় তদন্তের প্রস্তাব গ্রহণ করতেন না। ন্যায় সঙ্গত দাবি অগ্রাহ্য হলে প্রতিবাদ আপন ধারা বিক্ষুব্ধ জন সাধারণের জন্য অন্য কোন পথ খোলা থাকে না। তাই কংগ্রেস (ই) এর এপ্রিল রাজ্যব্যাপী বন্ধ ডাকল। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় বন্ধের মাধ্যমে গণ অভিমত প্রকাশের অধিকার স্বীকৃত। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় যে বামফ্রন্ট সরকার নাগরিকদের শান্তিপূর্ণ ভাবে এই অভিমত প্রকাশের অধিকারটুকু পর্যন্ত দিতে অনিচ্ছুক। সরকার ঘোষণা করে বসলেন, তারা বন্ধের বিরোধিতা করবেন এবং বন্ধ বানচাল করতে দলীয় ক্যাডারদের পথে নামাবেন। অদ্ভুত এই সরকারী মনোভাব।

যে দলই সরকার চালান না কেন, সরকারটি সমগ্র রাজ্যবাসীর, কোন দল বিশেষের খাস তালুক নয়। বন্ধ যাতে শান্তিপূর্ণ ভাবে পালিত হয়, কারো ওপর জোর জুলুম না চলে, তা দেখার জন্য প্রশাসন

ও পুলিশ আছে। বামফ্রন্ট সরকার পুলিশের দায় দায়িত্বের উপর বাধা সৃষ্টি করে, বনধ ঠেকাতে রাস্তায় নামিয়ে দিলেন তাদের ক্যাডার বাহিনী। বামফ্রন্টের এই ভুল সিদ্ধান্ত এক নিমেষে বনধের রঙ পালটে দিল। ফ্রন্ট ক্যাডার ও বনধ উদ্যোক্তাদের মধ্যে হানাহানি বেধে গেল এবং প্রস্তাবিত যে বনধ সফল অথবা ব্যর্থ হত শান্তিপূর্ণ ভাবে, তা রক্তাক্ত করল রাজপথ, কারখানা, বাস ট্রাম এবং লোকালয়। ভুল সিদ্ধান্তের বলি হলেন পনের বিশজন নারী পুরুষ।

উপযুক্ত পুলিশ প্রহরায় সরকারী বাস ট্রাম চালাবার ব্যবস্থা না করে, সরকার বনধের দিন কেন সেগুলিকে রাস্তায় বের করে জানমালের ক্ষতি করলেন সে প্রশ্ন জন সাধারণ নিশ্চয়ই করতে পারে। প্রাইভেট বাস এবং রেলগাড়ি বনধের দিন না চালিয়ে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষগণ বুদ্ধিমানের ন্যায় কাজ করেছিলেন; কারণ তারা বুঝেছিলেন যথেষ্ট প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা না থাকলে বিপদের ঝুঁকি নেওয়া সঙ্গত নয়। তাদের কাজকে কোনমতেই অন্যায় বলা চলে না।

বনধের দিন যারা প্রাণ হারিয়েছেন এবং আহত হয়ে হাসপাতালে আছেন তাদের জন্য সকলেই আন্তরিকভাবে দুঃখিত। এমন ঘটনার পুনরাবৃত্তি যাতে না হয় তার জন্য সরকার পক্ষীয় এবং বিরোধী দলগুলির মধ্যে আলোচনার দ্বারা একটি গণতান্ত্রিক আচরণ বিধি মেনে চলার ব্যবস্থা হওয়া একান্ত আবশ্যক। বামফ্রন্ট রাজনীতি মার্কসীয় ধরনের একটা গৃহযুদ্ধ পশ্চিমবঙ্গে বাধিয়ে তুলতে যাতে না পারে তা অ-কমিউনিষ্ট জনগণের অবশ্যই দেখতে হবে।

বামফ্রন্ট সরকার হামলাবাজির কারণ না ঘটিবে, যথাস্থানে পুলিশ মোতায়েন রেখে, অনায়াসে পরিস্থিতি করতে পারতেন কংগ্রেস (ই)র ডাকে অনুষ্ঠিত বনধে জন সাধারণ কেমন সাড়া দেয়। ফ্রন্ট সরকার প্রায়ই বলেন তাদের পিছনে জনগণ আছে—তারও একটা পরিমাপ সেই সঙ্গে হয়ে যেত। তা করলে বামফ্রন্ট রাজনৈতিক বিচক্ষণতার পরিচয় দিতে পারতেন। দুর্ভাগ্যের বিষয় ফ্রন্ট সরকার তা না করে, নিজেই হাঙ্গামায় জড়িয়ে পড়লেন এবং নানা দুঃখজনক ঘটনার পটভূমি তৈরী করলেন যার জের এখনো চলছে। এর নামই প্রশাসনিক অযোগ্যতা।

পক্ষান্তরে বামফ্রন্ট সরকারের বিরোধিতা, পুলিশের গুলী এবং ফ্রন্ট ক্যাডারদের সন্ত্রাস সৃষ্টির চেষ্টাকে অগ্রাহ্য করে রাজ্যবাসী যে ভাবে ৩রা এপ্রিলের বনধকে সফল করেছেন তাকে শুধু স্বতঃস্ফূর্ত বললেই সবটুকু বলা হয় না, তাকে বলতে হয় অভূতপূর্ব, বিস্ময়কর। যে সাহস এবং মনোবল সাধারণ মানুষের মধ্যে দেখা গিয়েছে তা নিঃসন্দেহে বৈপ্লবিক। প্রকৃত প্রস্তাবে ৩রা এপ্রিলের বনধ বামফ্রন্ট সরকারের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রকাশের সমতুল্য। জনগণের সেই রায় ফ্রন্ট সরকার মেনে নেবেন কিনা সে সরকারের বিবেচ্য বিষয়।

তবে বামজোটের পায়ের তলা থেকে মাটি যে দ্রুত সরে যাচ্ছে তা তারা বুঝতে পেরেছেন নতুবা ফ্রন্ট সরকার নিজের অক্ষমতা ঢাকতে পুলিশ প্রশাসক এবং রেল কর্তৃপক্ষকে সাবোতেজের দায়ে দায়ী করতেন না, অথবা ভাঙ্গা পোড়া বাস ট্রামের প্রদর্শনী বসিয়ে হালকা প্রচারে নামতেন না। বাস ট্রাম পোড়ানো এবং হামলা বাজির নিন্দা করবে সকলেই কংগ্রেস (আই) তো এ সকল দুষ্কর্মে জড়িত ব্যক্তিদের আদালতে তুলে শাস্তি দানের প্রস্তাবও দিয়েছে।

কংগ্রেস (আই)-এর ক্রমবর্ধমান

শক্তিবৃদ্ধিতে বামফ্রন্ট সরকার রীতিমত উদ্বিগ্ন বোধ করছেন এবং তাদের আচরণে ও কথায় যতই এই আতঙ্ক ও অনিশ্চয়তা প্রকাশ পাচ্ছে, ততই সরকারের আভ্যন্তরীণ অবস্থা নড়বড়ে হয়ে উঠছে এবং প্রশাসন ধ্বসে পড়ছে। এমন পরিস্থিতিতে কোন দলের পক্ষেই সঠিক ভাবে সরকার চালানো সম্ভব নয়।

বামফ্রন্ট ভালভাবেই জানেন যে বিগত নির্বাচনে প্রদত্ত ভোটের মাত্র এক তৃতীয়াংশের সামান্য কিছু বেশি ভোট পেয়ে তারা ক্ষমতায় বসেছিলেন। সে সুযোগ আর তারা পাবেন না। এমন কি বহু যত্নে ও অর্থব্যয়ে গড়া ভোট কারচুপির অভিকায় বাহিনীও হয়ত নিরপেক্ষ কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রণে অনুষ্ঠিত নির্বাচন যুদ্ধে তাদের তেমন সহায়ক হবে না। ফ্রন্ট শিবিরে তাই দুর্ভাবনার ছায়া গভীর হয়ে উঠেছে এবং নতুন স্ট্রাটেজির সন্ধানে ঘন ঘন বৈঠক বসছে।

জন সাধারণ বুঝে ফেলেছে যে গত চার বছরে বামফ্রন্ট সরকার একটিও কাজের কাজ করতে পারেন নি। রাজ্যের এক কোটি বেকারের জন্য একটি বড় শিল্প সংস্থা গড়তে উদ্যোগী হন নি। বে-সরকারী কর্ম সংস্থায় উল্লেখযোগ্য উৎপাদন বৃদ্ধি এবং নতুন নতুন কাজ সৃষ্টি করতে পারেন নি। মহারাষ্ট্র, গুজরাট, পাঞ্জাব প্রভৃতি রাজ্য যে পথে রাজ্যের শিল্প বিকাশ ও কৃষি উন্নয়নে তৎপর হয়েছে বামফ্রন্ট সে পথ পরিহার করে, সীমিত সামর্থের কথা বলেও কেন্দ্রের সমালোচনা করে নিজেদের ব্যর্থতা ঢাকবার চেষ্টা করেছেন।

বত্রিশ দফা কর্মসূচী এবং দীর্ঘ নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি শুধুমাত্র কথার কথা রয়ে গেছে। যা কিছু এই সরকার করেছেন তার সবই চমকসৃষ্টি ও প্রচারধর্মী, সমস্যা সমাধানে সাহসের সঙ্গে কোথাও এগোন নি। মাঝখানে শিক্ষানীতির আমূল সংস্কারের নামে রাজ্যের শিক্ষা ব্যবস্থাকে ধ্বংস করতে বসেছেন। বাঙালী অনেক অন্যায় অনেক অবিচার সহ্য করেছে কিন্তু বাঙালী কোনদিন সহ্য করেনি তার শিক্ষা সংস্কৃতি বিনাশের চক্রান্ত। বামফ্রন্ট বাঙালীর মর্মকেন্দ্রে শলাকা বিদ্ধ করতে গিয়ে যে বিপদ ডেকে এনেছেন তা থেকে পরিত্রাণের পথ তারা খুঁজে পাচ্ছেন না। এক ব্যক্তিকেন্দ্র শাসিত দলতন্ত্রের প্রত্যাবর্তন পথ গমন পথের চেয়ে অধিকতর কঠিন।

অন্তঃসারহীন বামফ্রন্ট সরকার কি এখন নানা ব্যর্থতা ও অবক্ষয়ের চূড়ায় বসে ঘৃতান্ন ভোজনে বাকি সময়টা কাটাতে চান, না পদত্যাগ করে স-সম্মানে সরে পড়বেন—জন সাধারণ তাই জানতে চায়।

●

পাক সেনাপতি ইয়াহিয়া খানের জল্লাদবাহিনী যে গ্রন্থ পুড়িয়ে ছাই করে দিয়েছিল বিপ্লব তাপস মহারাজ ত্রৈলোক্যনাথের সেই অবিস্মরণীয় গ্রন্থ "জেলে ত্রিশ বছর ও পাক ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম" পুনর্মুদ্রিত হল।

আগামী ১লা বৈশাখ (১৪ই এপ্রিল '৮১) বিশেষ রিবেট দিয়ে (ত্রিশ টাকার বই বিশ টাকায়) বিক্রয় করা হচ্ছে।

: প্রাপ্তিস্থান :

খাদি প্রতিষ্ঠান

১৫, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা-১২

একই অঙ্গে এত রূপ

বংশীধর বন্দ্যোপাধ্যায়

বেশীদিন হয়নি, এই সেদিনের কথা, মাত্র প্রায় চারমাস গত হয়েছে ইতিমধ্যে। পশ্চিম-বাংলার মানুষ ২৭শে নভেম্বরের চব্বিশ ঘণ্টা ব্যাপী বাংলা বনধের ঘটনা নিশ্চয় এত শীঘ্র ভুলে যায়নি; কারণ সেই বনধ ডেকেছিল পশ্চিমবাংলার শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত কয়েকটি রাজনৈতিক দল সমষ্টি, যাদের নাম বামফ্রন্ট। বামফ্রন্টের প্রধান শরিক সি. পি. এম কাজেই সেই বনধ ডাকার ব্যাপারে প্রধান ভূমিকা ছিল সি. পি. এম নেতা মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুর। ঐ বনধ ডাকার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে পশ্চিমবাংলার শান্তিপ্রিয় নাগরিকদের উত্তেজিত করা মিথ্যা প্রচারের মাধ্যমে ও বাঙ্গালীরা যে সর্বভারতীয় রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বকে অমান্য দেয় না বা গ্রাহ্য করে না তা প্রমাণ করা। সেই বনধকে সফল করার জন্য মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতিবাবু সেদিন বনধ পালনের জন্য কি কি ব্যবস্থা নিয়েছিলেন তা সাধারণ মানুষ আজো ভোলেনি। মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে তিনি বনধকে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার জোরে কি ভাবে পুলিসকে সম্পূর্ণ নিষ্ক্রীয় করে রেখে বন্ধ সফল করার জন্য চেষ্টা চালিয়েছিলেন তা এ রাজ্যের মানুষ এখনো বিস্মৃত হয়নি। মুখ্যমন্ত্রীর বিবৃতি সেই সময়কার সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয় বনধের সাফল্য কামনায়। রাজ্য-সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের ঘোষিত অর্ডিন্যান্সের বিরুদ্ধে পরে যা বিল হিসাবে লোকসভায় গৃহীত ও সংসদে স্বীকৃত হয়, তার সমালোচনা করেন তীব্র ভাষায় এবং এই বিলের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জ্ঞাপনের জন্যই বামফ্রন্ট সরকার উক্ত বনধের ডাক দেন, যদিও তাঁদের আরো অনেক কারণে প্রতিবাদ জানাবার জন্য ভিতরে ভিতরে প্রস্তুতি চলছিল বহু পূর্ব থেকেই। জাতীয় নিরাপত্তার যাতে বিঘ্ন না হয় সেই উদ্দেশ্য নিয়েই ঐ বিলটি জাতীয় নিরাপত্তা বিল নামে পাস হয় সংসদে, কিন্তু বামফ্রন্ট অকারণ ভূতের ভয়ে ঐ বিলটিকে কার্যকরী করার পরিবর্তে বিরোধীতা করা শুরু করে দেয় প্রথম থেকেই।

রাজ্য-সরকারের প্রতিবাদ ঐ বনধের দ্বারা পালন করা হয় কেন্দ্রীয় সরকারের বিলের ও কার্যের বিরুদ্ধে এবং তখন ঐ বনধকে জ্যোতিবাবু বা তাঁর দলের অন্যান্য দলপতিরা কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে 'চক্রান্ত' বলে মনে করেননি কেন? ঐ বনধকে চক্রান্ত বলে তাঁরা কেউই অভিহিত করেন নি কেন? জ্যোতিবাবুরা বাংলা-বনধ ডাকলে, তা হয় তাঁদের কাছে বিরোধীদের সংবিধান সম্মত গণতান্ত্রিক অধিকার; আর অপর কোন রাজনৈতিক দলের নেতারা বাংলা-বনধ ডাকলে সেটা হয় বামফ্রন্টের বিরুদ্ধে জ্যোতিবাবুর মতে চক্রান্ত। একই কাজের দুরকম ব্যাখ্যা কি বুদ্ধিতে জ্যোতিবাবুরা করেন তা বোঝা ভার, কারণ জ্যোতিবাবুরা অপরের ওপর মিথ্যা দোষারোপে সিদ্ধহস্ত বহুদিন ধরেই। অপরেরা জ্যোতিবাবুদের পন্থা অনুসরণ বা অনুকরণ করলেই জ্যোতিবাবুরা ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেন কেন! কি এর আসল কারণ? নিজের বিভৎস-

তার ছায়াছবি দেখলে অনেক প্রাজ্ঞের মাথা খারাপ হয়ে যায়। ইতিহাসে এরূপ অনেক ঘটনার উল্লেখ দেখা যায়। তাই কি ওঁদের ঐরূপ অবস্থা হয়? যার ফলে জ্যোতিবাবুদের দ্বারা বহু আবোল তাবোল উক্তি ঐভাবে বিবৃত হয়? নিজের ছায়া দেখে মানুষ ভয় পায় কখন? যখন উন্মাদ হতে আর বেশী দেরী থাকে না। কিন্তু রাজনীতিকদের ঐ অবস্থা হয় কখন? যখন ক্ষমতাচ্যুত হবার আর বেশী বিলম্ব থাকে না। ক্ষমতা মদমত্ত জ্যোতিবাবু পশ্চিমবাংলার মানুষের মতি-গতির বর্তমান অবস্থা হয় জানেন না, আর না হয় জানবার মানসিকতা তিনি হারিয়েছেন আপন দম্ভে মত্ত হয়ে। কোনটা সঠিক তিনি স্থির মস্তিষ্কে একবার অন্ততঃ ভেবে দেখুন। তাতে তাঁরও মঙ্গল দেশেরও মঙ্গল। ওরা এপ্রিলে কংগ্রেস (ই) দলের ডাকা বাংলা-বন্ধ কি নিরীহ বিক্ষুব্ধ জনগণের ওপর বিনা প্ররোচনায় অসতর্ক মুহূর্তে হঠাৎ পুলিসের গুলি চালনা ও তার ফলে তিন তিনটি তাজা তরুণের মৃত্যুর প্রতিবাদে নয়? পুলিসের গুলি চালাবার কোন কারণই ছিল না এবং বিচার বিভাগীয় তদন্তে তা সঠিকভাবে প্রকাশ পেত।

তথাপি মুখ্যমন্ত্রী উক্ত তিনজনের পুলিসের গুলিতে গত ৩০শে মার্চে মৃত্যুর জন্য বিচার বিভাগীয় তদন্ত করতে কেন রাজি হলেন না? যখন তিনি এরাজ্যের বিরোধী দলনেতা ছিলেন তখন তো প্রতিটি গুলি চালনার ক্ষেত্রেই তিনি সর্বদাই বিচার বিভাগীয় তদন্তের দাবী তুলেছিলেন তদানীন্তন সরকারের কাছে বেশ জোরের সঙ্গেই। তাঁর সেদিনের জন দরদী সেই মনোবৃত্তি কি ক্ষমতায় বসার সঙ্গে সঙ্গেই অন্তর্হিত? মানুষ নিজের অতীত জীবনকে এত তাড়াতাড়ি ভুলে যায় কি ভাবে এবং কেন? বোধহয় মদ যেমন সুস্থ ও সবল মানুষকে মত্ত করে মনুষ্যত্ব-বিহীন করে, সেইরূপ ক্ষমতার মোহ ও দম্ভ একই ভাবে দরদী মনকে নিষ্ঠুর করে তোলে এবং মানুষকে অমানুষ ও বিবেক বর্জিত করে। বিচার বিভাগীয় তদন্তের ব্যবস্থায় যদি রাজ্য-সরকার সম্মতি দিত, তবে নিশ্চয় এতগুলি প্রাণ বন্‌ধের দিনে নষ্ট হতো না, সরকার ও বিরোধীদের চ্যালেঞ্জ ও পাল্টা চ্যালেঞ্জের ফলে। রাস্তায় রাস্তায় লড়াই হয়, আর নিরীহ ও শান্তিপ্রিয় নাগরিকদের অকারণ প্রাণ নষ্ট হয়। জ্যোতিবাবু কি জানতেন না যে, পুলিসের গুলি চালনার ফলে তিনজন তরুণ প্রাণ হারান ও ফলে জনগণের বৃহত্তম অংশ বেশ ক্ষুব্ধ ও জনগণই স্বতঃস্ফূর্তভাবে কংগ্রেস (ই) দলের ডাকা বাংলা বন্‌ধ সফল করার জন্য হয় বদ্ধ-পরিকর? নিশ্চয় তিনি জনগণের মনের অবস্থা গত ৩১শে মার্চ কি খাতে প্রবহমান ছিল তার খবর রাখবার চেষ্টা করেন নি, অথবা তার প্রয়োজন মনে করেন নি।

তাঁর মাথায় তখন নিজ দলের পঞ্চাশ হাজার ঠ্যাঙারে ক্যাডারের ছবি ঘুরপাক খাচ্ছিল। তিনি বোধহয় তখন ভাবছিলেন যে, কংগ্রেস (ই) দল যারা ত্রিধা বিভক্ত তারা কি করবে? কাজেই আস্ফালন দেখিয়ে তিনি পশ্চিমবঙ্গের নাগরিকদের হুমকি দিয়ে বিবৃতি দিলেন যে, তাঁর পঞ্চাশ হাজার ক্যাডার ও পুলিশবাহিনী লাঠি, টিয়ার গ্যাস ও গুলির জোরে জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলনকে স্তব্ধ করে দেবে। পুরাণ দিনের কথা কি একবারও তখন তাঁর মানসপটে উদিত হল না? তিনি নিজে তো বহু ঐরূপ আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছেলেন সুদূর অতীতে এবং পুলিসের গুলি চালনার পরে সারাদেশ [illegible] কি

উত্তেজিত ও বিক্ষুব্ধ হয় তাও তো তিনি জীবনে বহুবার প্রত্যক্ষ করেছেন। তবে কেন এই গোঁয়ার-তুমি ও দ্বিধা আস্ফালন ও জনগণকে পুলিস, গুলি ও ক্যাডারদের ভরসায় ভীতি প্রদর্শন? কো-অর্ডিনেশন কমিটির চাঁইরা রাইটার্স বিল্ডিংস্ ও বিভিন্ন জেলা কালেক্টরেটের দফতরে দফতরে বাংলা বন্‌ধের বিরুদ্ধে জ্যোতিবাবুর নির্দেশ মত সভা-সমাবেশে ভাষণ দিয়েও গত ৩রা এপ্রিলের বাংলা-বন্‌ধ ব্যর্থ করার শত চেষ্টা করেও কেন নিজেরা ব্যর্থ হলেন? অপর পক্ষে সরকারী কর্মচারীদের ফেডারেশন কেমন কৌশলে এ রাজ্যের জনগণের সহায়তায় ও সাহায্যে কত সুন্দরভাবে বাংলা-বন্‌ধ আশাতীতভাবে সফল করলেন।

এ রাজ্যে কংগ্রেস (ই) দলই প্রধান বিরোধীদল, কাজেই জনগণের দাবী দাওয়া সরকার কর্তৃক বারে বারে উপেক্ষিত হওয়ায় ও সি. পি. এম দলের গ্রামাঞ্চলে দলবাজীর অত্যাচার থেকে জনগণকে রক্ষা করার পবিত্র দায়িত্ববোধে ঐ দল অগ্রসর হওয়ার জন্যই সম্পূর্ণ সংবিধান সম্মত উপায়ে গণতান্ত্রিক অধিকার প্রতিষ্ঠাকল্পে গত ৩০শে মার্চ বামফ্রন্ট সরকারের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শনের নিমিত্ত এক বিরাট শান্তিপূর্ণ গণ মিছিল পরিচালনা করে এসপ্লানেড ইষ্ট ও তৎসন্নিহিত এলাকাগুলিতে। ঐ গণতান্ত্রিক মিছিল যখন অগ্রসরমান তখন বামফ্রন্ট সরকারের পুলিশ ঐ মিছিলকারীদের ছত্রভঙ্গ করার অভিপ্রায়ে উক্ত শান্তিপূর্ণ জনগণের উপর লাঠি কাঁদনে গ্যাস ও গুলি চালায় বিনা প্ররোচনায়। ফলে বহু মিছিলকারী ও নিরীহ মানুষ লাঠির ঘায়ে ও কাঁদানে গ্যাসের সেল ফেটে মারাত্মকভাবে জখম হয়, আর গুলির আঘাতে তিনজন যুবক ঘটনাস্থলেই প্রাণ হারান।

উক্ত গুলি চালনার ফলে তিনটি অমূল্য প্রাণ বিনষ্ট হওয়ায় বাংলার মানুষ সমস্বরে বিচার বিভাগীয় তদন্তের দাবী তোলে বামফ্রন্ট সরকারের কাছে এবং সে দাবী জ্যোতিবাবু সদম্ভে প্রত্যাখান করায় বাংলা বন্‌ধের ডাক দেয় কংগ্রেস (ই) দল। জ্যোতি বাবু ঐ বনধের স্বপক্ষে সম্মতি দেয় জনতা দল, কংগ্রেস (আ) দল, খৃষ্টান ডেমোক্রেটিক দল, মুসলিম লীগ ও অন্যান্য ছোট বড় রাজনৈতিক দল। জ্যোতি বাবু ঐ বনধের ডাককে বামফ্রন্ট সরকারের বিরুদ্ধে চক্রান্ত বলে অভিহিত করেন ও বনধকে ব্যর্থ করার জন্য কোমর বেঁধে আসরে নামেন তাঁর দলের ক্যাডারদের ভরসায়।

তবুও জ্যোতিবাবুর ও তাঁর সরকারের, সিটুর ও কো-অর্ডিনেশন কমিটির শত চেষ্টা এবং তাঁদের যৌথ শাসানিকে উপেক্ষা করে পশ্চিমবাংলার সাধারণ মানুষ আরো একবার দেখিয়ে দিল যে, শাসকের রক্তচক্ষু ও পুলিশের গুলি এবং সি, পি, এম ক্যাডারদের বোমাবাজী ৩রা এপ্রিলের বাংলা বনধকে ব্যর্থ করতে অপারগ, বরং সরকারের এমন্বিধ হিংস্র আচার ও আচরণই ঐ বনধকে অভূতপূর্ব উপায়ে সফল করল।

ইতিপূর্বে বিরোধীদলনেতা হিসাবে জ্যোতিবাবুর যে রূপ, যে কার্যাকলাপ ও যে ভূমিকা পশ্চিমবাংলার মানুষ দেখেছিল তা বর্তমানে শাসকের চেয়ারে বসে তিনি সম্পূর্ণ ভাবে পাল্টে ফেলেছেন। তাঁর এই ভয়াবহ পরিবর্তন কিন্তু কোন কারণেই শুভ নয়, কারণ অদূর ভবিষ্যতে তাঁকে হয়তো পুনরায় বিরোধী দলে নেতৃত্ব দিতে হবে এবং যখন তাঁর বর্তমান শাসকের ভূমিকা নিশ্চয় পরিবর্তিত হবে। তাঁকেও বিক্ষোভ মিছিল তখন পরিচালনার দায়িত্ব নিতে হবে। অবস্থাটা যে কি ভীষণ সাংঘাতিক আকার তখন

এবার ঘনঘন ভাঙ্গনের মাত্রা বাড়ে। ফলে শাসন ক্ষমতায় থাকা কালীন যে বাড়াবাড়ি তিনি করলেন অর্থাৎ তাঁর নগ্ন স্বরূপ যে ভাবে সাধারণ মানুষ প্রত্যক্ষ করল উক্ত দুইটি বনধের সময়ে, তাতে তাঁর রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ বেশ বিপন্ন বলে সন্দেহ হয় এখন থেকেই।

তাঁর মন্ত্রীসভার কোন কোন সদস্যও বিচার বিভাগীয় তদন্তের পক্ষে রায় দিতে আগ্রহী ছিলেন, কিন্তু তাঁর ফ্যাসিস্ট মনোভাব দেখে তাঁরা পেছিয়ে যান বলে সংবাদে প্রকাশ। গ্রামাঞ্চলের একজন প্রবীণ মোড়ল কানাই গত ৪ঠা এপ্রিল সভান্তে আমাদের সামনে মন্তব্য করলেন মুখ্যমন্ত্রীর ক্রিয়া কলাপের উল্লেখ করে 'একই মানুষ হাতে ক্ষমতা পেলে এমন মারাত্মক ভাবে যে অমানুষ হয়ে যেতে পারে তা আগে কোন দিন ভাবতে পারিনি। কি আশ্চর্য্য একটা লোকের এরকম চেহারা ও ব্যবহার? বড় বিচিত্র ব্যাপার এটা, নয় কি?'

সত্যই একই অঙ্গে এত রূপ প্রত্যক্ষ করা আমাদের পক্ষেও ইতিপূর্বে সম্ভব হয় নি বা বর্তমানে বামফ্রন্ট সরকার ও তার মুখ্যমন্ত্রী বাংলার জনগণকে মিথ্যাপ্রচার ও দম্ভ উক্তির মাধ্যমে দেখালেন। দলীয় ক্যাডারদের হাতে শাসন ক্ষমতা তুলে দিলে পুলিশ বন্ধ হবে বটে, তবে গৃহযুদ্ধের আহ্বাওয়া বা পরিবেশ কি তাতে রচিত হবে না?

(৬ এর পাতার শেষাংশ)

চিরকাল ছিল, মানব-দরদী মনের অভাব হয়নি। যুগ পালটিয়েছে, কিন্তু সত্য পালটায়নি। চৈতন্যদেবের যুগ এখন নেই সত্যি। কিন্তু তাঁর নিঃস্বার্থ মানবপ্রেম এখনও শুদ্ধ বিপ্লবীর অন্তরে আছে। আমরা নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে কি দেশের অধঃপতন শুধু দেখতেই থাকব? প্রতিটি বিপ্লবী এই পতনের জন্য নিশ্চয় মানসিক যন্ত্রণা পান। কিন্তু তাঁদের অগ্নিমন্ত্র ত' অমর। সেই মন্ত্রবলে আবার কি আমরা জনসাধারণের সেবায় তাদের দুঃসহ যন্ত্রণার মুক্তিতে আমাদের নিয়োজিত করতে পারিনা? ক্ষমতার লড়াইয়ে নয়, জনসাধারণের ক্ষমতা ও মানবতা বাড়ানই আমাদের কাজ হবে। মনে হয় আমরা সবাই একত্র হয়ে জীবনের শেষ লগ্নে সেই শুভ কাজে নামতে পারি। যে সব নবীন যুবক স্বাধীনতার পর জন্মেছেন তাঁদেরও আমরা আহ্বান করতে পারি। শিক্ষা ও কর্মের মধ্যে যে সব যুবক আছেন, তাঁদেরও সঙ্গে নিতে পারি, একটা নতুন পথের নির্দেশ দিতে পারি। যেটা এই যুবকরা বহন করবেন, বিস্তৃত করবেন। আশা করি বন্ধুরা একথা ভেবে দেখবেন।

পরলোকে প্রবীণ স্বাধীনতা সংগ্রামী দীনেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

খুলনা জেলার ঘাটভোগ গ্রামের বিখ্যাত চট্টোপাধ্যায় বংশের প্রবীণ স্বাধীনতা সংগ্রামী দীনেশ চট্টোপাধ্যায় গত ৪ঠা এপ্রিল তার আলিপুরস্থিত নিজস্ব বাসভবনে দেহত্যাগ করেছেন। দীর্ঘদিন ধরে দীনেশ বাবুর শরীর ভাল যাচ্ছিলনা, তবে তার এমন আকস্মিক ভাবে মৃত্যু হবে, এটা কেউ ভাবতে পারেনি। তাঁর মৃত্যু সংবাদে আমরা খুবই ব্যথিত। তিনি বিপ্লবী বাংলার একজন অকৃত্রিম সুহৃদ ছিলেন।

১৯৩০ সালের স্বাধীনতা সংগ্রামে দীনেশ বাবু যোগ দেন এবং সেজন্য দীর্ঘদিন কারাদণ্ড ভোগ করেন। দীনেশ বাবু বি, পি, এস-এর একজন বিশিষ্ট সভ্য ছিলেন। প্রথম যৌবনেই তিনি নেতাজী সুভাষ-চন্দ্রের সংস্পর্শে আসেন। দীনেশ বাবু স্বনামধন্য প্রখ্যাত বাগ্মী ও ইংরেজী সাহিত্যের কৃতী অধ্যাপক প্রয়াত জে, এল, ব্যানার্জির বিশেষ স্নেহধন্য ছিলেন এবং বেশ কিছুদিন তার সেক্রেটারী হিসাবে কাজ করেন। আলিপুর জেলে থাকার সময় তিনি নেতাজী, দেশপ্রিয় সেনগুপ্ত, হরিকুমার চক্রবর্তী ও শ্রীঅশ্বিনী কুমার গাঙ্গুলী মহোদয়দের মত প্রখ্যাত দেশনেতাদের সান্নিধ্যলাভ করার সৌভাগ্য অর্জন করেন।

পরবর্তী জীবনে তিনি এ্যাডভারটাইজিং ব্যবসায়ে লিপ্ত হন। প্রায় বিনা মূলধনে এবং শূন্যহাতে একজন মানুষ কি ভাবে নিজের অধ্যবসায়, সততা নৈরাশ্য বিজয়ী নিষ্ঠা নিয়ে ব্যবসায় জগতে প্রভূত কৃতিত্ব লাভ করতে পারেন। দীনেশ বাবু ছিলেন তার একটি উজ্জলতম দৃষ্টান্ত। তার প্রতিষ্ঠিত 'প্রিনটাডেকস্' নামক ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানটি তার প্রধান কীর্তি ও গৌরব বহন করবে, দীনেশ বাবু অনেক দুস্থ ও নিঃস্ব পরিবারকে সাহায্য করতেন আর্থিক ও অন্যান্য ভাবে। তার মৃত্যু এই সব পরিবারকে বিশেষভাবে বিপন্ন করবে।

আমরা তার বিদেহী আত্মার শান্তি কামনা করি ও তার শোকসন্তপ্ত পরিবার পরিজনদের সমবেদনা জানাই।

রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্র নাথের স্মৃতি কথা

["A Nation In Making" গ্রন্থ থেকে অনুবাদ]

অনুবাদক—অধ্যাপক নলিনীমোহন দাশগুপ্ত

মন্ত্রীরূপে আমার কাজকর্ম [পূর্বানুবর্তন]

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন বিভাগের মন্ত্রীরূপে আমি নিরবচ্ছিন্ন ভাবে আমার অধীনস্থ দপ্তরকে ক্রমশঃ ভারতীয় করার নীতি অনুসরণ করে এসেছি, দক্ষতার বিচারকেই আমার প্রশাসনকে আদর্শরূপে সামনে রেখে এ কাজে আমি এগিয়েছি। অন্য সমস্ত বিষয়ে কোন অমিল না থাকলে নিয়োগের ক্ষেত্রে ভারতীয়-দেরই অগ্রাধিকার দিয়েছি। এ বিষয়ে খুব বেশী কিছু না করতে পারলেও নীতিটি ঠিকই ছিল, এবং যখনই কোন সুযোগ উপস্থিত হয়েছে সেই নীতির অনুসরণ করা হয়েছে। কখন কখনও অসুবিধা, এমন কি বিরোধিতাও দেখা দিয়েছে, কিন্তু গভর্ণরের সমর্থনের জোরে সে অসুবিধা কাটিয়ে উঠতে পেরেছি। এই ধরনের সবচেয়ে বড় যে অসুবিধার সম্মুখীন হয়েছি; তা হল মিঃ এস, এন, মল্লিককে কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান পদে নিয়োগ করা নিয়ে। ১৯২১ সালে কর্পোরেশনের স্থায়ী চেয়ারম্যান মিঃ গাইন ছুটিতে গেলে তার স্থলে আমি মিঃ জে, এম, গুপ্তকে অস্থায়ীভাবে নিয়োগ করি। সেই সময় মিঃ গুপ্ত বর্ধমান বিভাগের কমিশনার ছিলেন এবং সেই পদে তিনি খুব ভাল কাজ দেখিয়েছিলেন। এখানে একটি লক্ষ্য করার মত বিষয় হচ্ছে এই যে এই সর্ব প্রথম একজন ভারতীয় সিভিল সার্ভিসের লোককে এত উচ্চ একটি পদে নিয়োগ করা হয়েছিল।

নিয়োগের ব্যাপারে এর চেয়েও বড় রকমের উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রমের দৃষ্টান্ত আছে। স্বাস্থ্যের কারণে মিঃ গুপ্ত ছুটি চাইলেন। আমাকে তার স্থলে একজনকে নিয়োগ করতে হবে। আমি পূর্বানুসৃত পথচালার নির্দিষ্ট রেখা পরিত্যাগ করলাম এবং মিঃ সুরেন্দ্রনাথ মল্লিককে সেই পদে নিয়োগের প্রস্তাব করলাম। মিঃ মল্লিক তখন কর্পোরেশনের একজন নির্বাচিত বেসরকারী সদস্য ছিলেন। কিন্তু এই আপত্তি দেখা দিল। দুইটি ভিন্ন ধরনের যুক্তির ভিত্তিতে এই বিরোধীতা উপস্থিত হল। বিরোধিতার প্রথম যুক্তিটি হল এই মিঃ সুরেন্দ্রনাথ মল্লিক লেজিস্ লেটিভ কাউন্সিলে প্রায়ই সরকারের বিরোধিতা করেছেন। তাকে নিয়োগ করলে কি তাহলে উৎকোচ দেওয়া বলে মনে করা হবে না। উত্তরে আমার জবাব ছিল, "ইংল্যাণ্ডে তারা কী করেন, তারা কি একাজ করেন না? সেই ইংল্যাণ্ডইতো এ সবক্ষেত্রে আমাদের আচরণের দৃষ্টান্ত দেখাচ্ছে। তারা তো এ কাজ করে আসছেন।" আমার বিবেচনায়, আমি যে উত্তর দিয়েছি তা আমার পক্ষে যথেষ্ট বলা হয়েছে বলেই আমি মনে করি। কিন্তু আমার কাজে যিনি আপত্তি করেছিলেন, তার পক্ষে হয়ত তা যথেষ্ট হয়নি। কিন্তু আমি তাতে কোন উদ্বেগ বোধ করিনি।

দ্বিতীয় আপত্তি হল এই রকম: মিঃ সুরেন্দ্রনাথ মল্লিক একজন উঁচু দরের আইনজ্ঞ এবং যুক্তি তর্ক বিশারদ ব্যক্তি ঠিকই, কিন্তু মিউনিসিপ্যাল শাসনের খুঁটি-নাটি ব্যাপক ক্ষেত্রের সঙ্গে তার পরিচয় নেই এবং কর্মচারীরা মিউনিসিপ্যালিটির আভ্যন্তরীণ কাজ কর্ম কি ভাবে করে থাকে তাও তার জানা নেই।

এই আপত্তির উত্তরে আমি বলি, 'মিঃ লয়েড জর্জ যখন ইংল্যাণ্ডের চ্যান্সেলার অব একসচেকার হয়েছিলেন তখন তার ইংল্যাণ্ডের অর্থনীতি সম্পর্কে কোন জ্ঞান ছিল, বলুন তো. কর্পোরেশনে স্থায়ী পদস্থ কর্মচারী আছেন, তারাই মিঃ মল্লিককে তিনি বিস্তারিত ভাবে যা জানতে চাইবেন, তা জানাবেন।' কর্পোরেশনের মত এত বড় একটা বৃহৎ প্রতিষ্ঠানের প্রধান কর্মকর্তার কাছ থেকে যা আশা করা উচিত তাহল প্রখর দৃষ্টিভঙ্গী, নীতি নির্ধারণের ক্ষমতা ও বিস্তারিত কাজ কর্মগুলিকে নিয়ন্ত্রণে রাখা যাতে তিনি স্থায়ী পদস্থ কর্মচারীদের পরিচালিত করতে ও নির্দেশ দিতে পারেন। আমার এই কথাগুলো মাননীয় গভর্নর বাহাদুরের খুব ভাল লাগল। সুতরাং এ নিয়োগের ব্যাপারে আমি তার পূর্ণ সমর্থন পেয়ে গেলাম।

প্রথম দিকে এই নিয়োগ ছিল অস্থায়ী, এবং এ সম্পর্কে আর যা কিছু বিধি বিধানের কাজ বাকী ছিল, তাহল কেবলমাত্র ভারত সরকারের অনুমোদন, কিন্তু কয়েকমাস পরে স্থায়ী চেয়ারম্যান মিঃ পাইন পদত্যাগ করায় তার স্থলে স্থায়ী নিয়োগের প্রশ্ন দেখা দিল। এইখানেই একটা খটকা দেখা গেল। কাজটা সহজ ছিল না। কর্পোরেশনের স্থায়ী চেয়ারম্যানের পদটি ছিল অন্য আরও কয়েকটি পদের মত আই সি এস্‌এর লোকদের জন্য সংরক্ষিত। সুতরাং আমাকে সংরক্ষিত বিষয়ের আওতা থেকে এই বিধানটিকে তুলে নেওয়ার জন্য ভারত সরকার ও ভারত সচিবের সঙ্গে লেখালেখি করতে হল। তাদের অনুমোদন পেতে আমার কোন অসুবিধা হয়নি। প্রকৃত পক্ষে এই নিয়োগ ব্যবস্থাকে সংরক্ষিত বিষয় থেকে আলাদা করতে হয়েই, কারণ নতুন মিউনিসিপ্যাল আইন অনুযায়ী এই ব্যবস্থাকে ভেঙ্গে দুটি পৃথক নিয়োগের ব্যবস্থা করা হয়েছে এবং সে দুটি নিয়োগেই কর্পোরেশনের কর্তৃক নির্বাচন মূলক নিয়োগ।

চেয়ারম্যান হিসাবে মিঃ মল্লিক অসামান্য সাফল্য প্রদর্শন করেছেন। ফলে তার নিয়োগে চূড়ান্তভাবে অনুমোদন লাভ করতে কোন অসুবিধা হল না। প্রাদেশিক ক্ষেত্রে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ যতগুলি পদ আছে, কর্পোরেশণের চেয়ারম্যান পদটি তার মধ্যে অন্যতম। মিঃ মল্লিক তার কাজের দ্বারা প্রমাণ করলেন যে এদেশের লোকেরা উচ্চ প্রশাসনিক কাজের দায়িত্ব ভালভাবেই পালন করতে পারে। এজন্য কর্পোরেশনের জেনারেল কমিটি আমাকে ধন্যবাদও জানিয়েছেন। কেবল তাই নয়, এই নিয়োগ সকলেরই প্রশংসা অর্জন করেছিল, এবং কম বেশী পরিমাণে একটু চাপা গলায় চরমপন্থী পত্রিকাগুলিও সে প্রশংসায় যোগ দেন। তারা আমার সাহসকে তারিফ করেন এবং এও স্বীকার করতে প্রস্তুত ছিলেন যে আমার এই কাজ প্রচলিত প্রথার মধ্যে একটা ব্যতিক্রম ঘটিয়েছে। তবে তাদের প্রশংসা একটা সাময়িক প্রলাপ মাত্র। কারণ, তাদের স্থায়ী মনোভাবই ছিল আমার যা কিছু কাজ সবটারই বিরোধিতা করা। তাই শীঘ্রই তাদের সেই প্রলাপ মূর্ছার ভাব কেটে গেল। আবার তারা সেই পুরাতন রোগের পথটাই ধরলেন। তাদের সেই রোগটা হল, আমার বা আমার প্রশাসনিক কাজের মধ্যে বা সরকারের মধ্যে কোন কিছু ভাল আছে বলেই স্বীকার না করা।

[চলবে]

Regd.No.R. N. 24511/71 | Biplabi Bangla | Regd. WB/NC 77
Phone : 34-1795
বার্ষিক :—সডাক ১৫.০০ টাকা | ষাণ্মাসিক :—৮.০০ টাকা | মূল্য—৩০ পয়সা

সম্পাদক—
শ্রীশান্তিশরণ রায়চৌধুরী

।। সম্পাদকমণ্ডলী ।।

শ্রীজগদীশ চট্টোপাধ্যায় (সভাপতি)

শ্রীভবেশচন্দ্র নন্দী
পুষ্প চ্যাটার্জী
মলয় ঘোষ

প্রকাশক ও মুদ্রক—
শ্রীঅনিল সেনগুপ্ত

দিল্লীর বিশেষ প্রতিনিধি—
শ্রীবাবীন ঘোষ

বেহালা—
শ্রীনন্দগোপাল পাল

বিপ্লবী পুস্তকমালা

নেতাজীর সিক্রেটসার্ভিস—ডাঃ পবিত্রমোহন রায়—১০'০০
বিপ্লবী মহানায়ক রাসবিহারী—সুবোধ মজুমদার
অনুশীলন সমিতির বিপ্লবী প্রচেষ্টা—ব্রজেন্দ্র দাস

—ক্ষীরোদ কুমার দত্তের—

১। বাংলার অগ্নিযুগ—১'৫০, ২। বহির্ভারতে ভারতীয় বিপ্লব প্রচেষ্টা—৮'০০ ৩। অনুশীলন সমিতির পি, মিত্তির—২'০০, ৪। পৌহাটী সংগ্রাম কাহিনী—১'০০, ৫। কাকোরী শহীদবৃন্দ—১'২৫, ৬। কলকাতা বাঙ্গার সংগ্রাম কাহিনী—'৪০, ৭। রাসবিহারী ও অনুশীলন সমিতি—'৬০ ৮। স্বাধীনতাসংগ্রামে মা ও মেয়ে—'৪০, ৯। বিবেকানন্দ ও সমাজবাদ—'৬০ ১০ বিপ্লবী বিবেকানন্দ—'৫০, ১১। মহারাজ ও সুভাষচন্দ্র—'৪০ ১২। ভারতের নবজাগরণ ও ভগিনী নিবেদিতা—'৭৫, ১৩। দেশ বাঙ্গের ডোজেনি (১)—১'০০, ১৪। দেশ বাঙ্গের ডোজেনি (২)—২'০০; ১৫। শহীদ চন্দ্রশেখর আজাদ—'৫০, ১৬। ১৬ই এপ্রিল জাতীয় শহীদ দিবস—৯'০০, ১৭। হার্ডিঞ্জ হত্যা প্রচেষ্টা—'৭৫, ১৮। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও অনুশীল সমিতি—৪'০০, ১৯। ভারতের জাতীয় পতাকার ইতিহাস—'৪০, ২০। লাট হত্যা প্রচেষ্টা—১'৫০

প্রাপ্তিস্থান :— ৪নং বল্লভ দাস ষ্ট্রীট কলিকাতা-৭০০০০৭

শৈলশ্রী—১/১/১/A বঙ্কিম চ্যাটার্জী [illegible]

মূল কার্যালয়—৪নং বল্লভ দাস ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০০৭ শ্রীঅনিল সেনগুপ্ত কর্তৃক প্রকাশিত এবং তৎকর্তৃক প্রিন্টিং পাবলিসিটি, ১১৭, কেশবচন্দ্র সেন ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০০৯ হইতে মুদ্রিত।

বিপ্লবী বাংলা

॥ বিপ্লবী পরিষদের সাপ্তাহিক মুখপত্র ॥
স্থাপিত—১৯৫৬, 'বিপ্লবী বাঙ্গালী' নবকলেবরে—১৯৭১

দশম বর্ষ	শনিবার ১২ই বৈশাখ, ১৩৮৮ ২৫শে এপ্রিল ১৯৮১	২৬ সংখ্যা

শ্রেষ্ঠ আচরণ বিধি হইল পরমত সহিষ্ণুতা। কারণ আমরা সকলে একভাবে কখনই চিন্তা করিবনা এবং সত্যকে খণ্ড খণ্ড ভাবে, বিভিন্ন দৃষ্টিকোন হইতে দেখিব। বিবেক কথাটির অর্থ সকলের নিকট সমান নয়, ব্যক্তিগত আচরণের নির্দেশ মানিয়া চলা ভাল বটে, কিন্তু ওই নির্দেশ অন্যের ওপর চাপাইলে অন্যের স্বাধীনতার ওপর অসহনীয় হস্তক্ষেপ করা হইবে।

—মহাত্মা গান্ধী।

CALCUTTA UNIVERSITY

Freedom fighters whose pension has been sanctioned

MARCH—1981

Name	Address	Amount Rs.	with effect from
	CALCUTTA		
Banerjee Haridas	1/1, Pedda Pukur Square Kidderpore, Calcutta (amount overdrawn to be recovered Rs. 100 monthly)	300	1 8 80
Bose Smt Heña Rani w/o Late Nripendra Nath	70/4 Palm Avenue, Calcutta—19	200	1 8 80
Burman Smt Sudha Rani	w/o Late Nareshchandra Burman	250	1 8 80
Chakraborty Bimalendu	57/1 B B. Ganguly St. Cal—12	300	1 8 80
Chakraborty Haripada c/o Chakratirtha	170/1A Rani Branch Road Calcutta—2	300	1 8 80
Chakraborty Smt Manisha (Self Freedom Fighter)	wife of Subodh Ranjan Qr. No. L/C-5 East Barishahat Housing Estate Calcutta—53	300	1 8 80
Chakraborty Sasanka Bijoy	25 Jannagar Road (Amount overdrawn to be recovered in monthly instalments of Rs. 100)	300	1 8 80
Das Gupta Smt Niva w/o Late Satyendra Nath	1, Crooked Lane, Calcutta—69	200	1 8 90
Dutta Smt Ila w/o Late Ashim Kumar	225E Rash Behari Avenue Calcutta—19	200	1 8 80
Dutta Smt Kanak Mukl w/o Prafulla Kumar Dutta	6 Vidyayatan Sarani Calcutta—35	200	1 8 90
Dutta Khagendra Chandra	11 Umesh Mukherjee Rd., Cal—56	300	1 8 80
Dutta Nirmal Chandra	42 Garden Reach Rd, Cal—25	300	1 8 80
Dhunna Nand Lal	11 Harish Mukherjee Rd. Cal—25	300	1 8 80
Lala Sunit Kumar	35/3 Beadon Street, Calcutta—6	300	1 8 80
Majumder Sudhindra Ch.	19 Greek Church Row, Cal—14	300	1 8 80
Mallik Subodh Chandra	83 1/1 Prem Chand Boral Street (Amount overdrawn to be recovered at Rs, 100 monthly)	300	1 8 80

—contd. on 3rd cover

সম্পাদকীয়

বিচিত্র এই বিরোধী দলের রাজনীতি

আসামের রাজনৈতিক আকাশে ঈশান কোণে আবার মেঘের গর্জন শোনা যাচ্ছে। দুই একটা কালবৈশাখীর ঝাপটাও দেখা যাচ্ছে। বোমাবাজি শুরু হয়েছে, যার ফলে জাতীয় সম্পদের ক্ষতি হয়েছে এবং একজন দক্ষ, সৎ, প্রশাসকের জীবন হানিও ঘটেছে।

এই পরিস্থিতির জন্য আসামের বিরোধী দলগুলির দেউলিয়া রাজনীতিই যে বহুলাংশে দায়ী, সেটা অনস্বীকার্য্য। আসামের শ্রীমতী তৈমুরের মন্ত্রী সভার বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব উপলক্ষে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের যে দৃষ্টিভঙ্গীর প্রমাণ মিলছে, তার প্রশংসা করার কোন কারণ নেই। সেই পুরাণো, যে কোন ভাবেই হোক, সুযোগ সুবিধা লাভের প্রবণতাই পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। এর মধ্যে দূরদৃষ্টি, সুস্থ মানসিকতা এবং দেশের দুর্দিনে ক্ষুদ্র দলীয় স্বার্থ ও ব্যক্তিগত স্বার্থের উর্দ্ধে, একটা সর্বভারতীয় স্তরের উপযুক্ত বিচার বিবেচনার স্বাক্ষর মেলে না। কোন মতে যেন একটা গোঁজামিল দিয়ে সাময়িক একটা নীতি অনুসরণ করা হয়েছে। তুরুপের তাস হাতেই রেখে দেওয়া হয়েছে। ধরি মাছ না ছুঁই পানি গোছের একটা কৌশল অবলম্বন করে বেড়ার উপর অবস্থান করেছেন কয়েকটী দলের বিধায়কেরা। এটাই যেন এ দেশের রাজনৈতিক দলগুলির অভ্যাসে পরিণত হয়েছে।

আসামের মন্ত্রী সভার বয়স তিনচার মাসের কিছু বেশী। যে অরাজকতার মধ্যে বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী ও তার সহযোগীরা আসাম রাজ্যে একটা সুস্থ পরিবেশ স্থাপন করার দায়দায়িত্ব নিয়ে এগিয়ে এসেছিলেন, সেজন্য অকৃপণ সাধুবাদ তাদের প্রাপ্য। একথাও সত্য যে তারা কংগ্রেস (ই) দলভুক্ত হওয়ার জন্য কেন্দ্রীয় সাহায্যের উপর ভরসা করতে পেরেছিলেন। কিন্তু তারা নিজেদের ব্যক্তিগত জীবন ও ধনসম্পত্তি বিনাশের ঝুঁকিও নিয়েছিলেন, এ সত্যকেও অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু মন্ত্রীত্ব গ্রহণ করার পর তারা শুধুই 'ডামি' হিসাবে কাজ করেন নি। আইনশৃঙ্খলার পরিবেশের তারা উন্নতি সাধন করেছেন। সংখ্যা-লঘু সম্প্রদায়ের লোকেদের মনে একটা আস্থার ভাব ফিরিয়ে আনতে পেরেছেন, স্কুল কলেজগুলিতে পড়াশুনা ও ছাত্রদের পরীক্ষার ব্যবস্থা করেছেন, প্রশাসন যন্ত্রে বিভীষণদের সায়েস্তা করেছেন, স্বাভাবিক

কাজ কর্মের ধারার উৎসাহদান করেছেন, সীমান্ত ব্যবস্থা জোরদার করেছেন, ষাট হাজার বহিরাগতদের চিহ্নিত করে বহিষ্কার করেছেন। এবং অন্য কিছু কাজও করেছেন। অর্থাৎ বলা যায় যে রাজ্যে কাজের অলস চাকাগুলি ঘুরবার ব্যবস্থা করেছেন। একথা কেউ বলবেনা যে এই মন্ত্রীসভা সব ব্যবস্থাই করেছেন। সঙ্গে সঙ্গে একথাও মানতে হবে কাজটা সবে সুরু হয়েছে এবং এরা দীর্ঘ সময়ও পাননি।

প্রায় দেড় বছর ধরে একটা সর্বনাশা আন্দোলন শুধু আসাম নয়, সারা ভারতবর্ষের যে বিরাট ক্ষতি সাধন করেছে কয়েকদিনেই তা পূরণ করতে পারেনা কোন মন্ত্রী সভাই, যদি না তাদের হাতে আলাদিনের প্রদীপ থাকে। ঠিক পথে যখন তারা চলেছেন, তখন তাদের সাহায্য ও সহায়তা দান না করে, টপ্‌কে দেওয়ার নীতি যারা অবলম্বন করেছিল, তাদের চরিত্র রীতিনীতি বিস্ময়কর ও স্বার্থহীন ভাবে নিন্দার যোগ্য।

হঠাৎ এই অনাস্থা প্রস্তাব পাশ করার হীন প্রচেষ্টা কেন করা হল? পাঁচমিশালী কয়েকটী দল, ক্ষমতার আসনে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হবার হাস্যকর অবিবেচনা-প্রসূত ক্ষমতালোভ, তাদের অশোভনভাবে আগ্রহী করেছিল, এতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু তারা ভেবে দেখতে চাননি যে আন্দোলনের ফলে আসাম রাজ্যের এই দুরবস্থা অবস্থা সৃষ্টি হয়েছে তাদেরই মন্ত্রীত্বের আমলে। আন্দোলনের পর কেন্দ্রীয় সরকার যখন তাদের সরিয়ে দিয়ে, গভর্ণরের শাসন প্রবর্ত্তন করতে বাধ্য হয়েছিলেন, তখনও তারা এই আন্দোলনকারীদের সমর্থন করে, কেন্দ্রীয় সরকারকে দুর্বল করার অপকর্মে নিযুক্ত ছিলেন। আজ যখন অবস্থাওয়া একটু অনুকূল হতে দেখা যাচ্ছে, অমনি রাজনৈতিক লোভ মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে তাদের মধ্যে। এই মন্ত্রীলোভীর দল কি একবারও ভেবে দেখেছেন যে তারা বর্তমান মন্ত্রীসভার পতন ঘটিয়ে, এক সপ্তাহও রাজ্যের কাজ কর্ম চালাতে পারবেন না? যেটা তারা পারেন সেটা আন্দোলনকারীদের মদত দিয়ে, সমগ্র আসাম ও তথা গোটা ভারতবর্ষের সমূহ সর্বনাশ ঘটাতে। এই বিরোধীদের রাজনীতি? দেশ ডুবে যায় যাক্, দলবিশেষের মন্ত্রীত্ব বজায় থাকলেই হল, এই ত তাদের মানসিকতা। একে রাজনৈতিক উন্মত্ততা ভিন্ন অন্য কিছু বলা যায় না।

অন্য বিরোধী দলগুলির ভূমিকা খুব প্রশংসার নয়। সত্য বটে, তারা নিরপেক্ষ থেকে বর্ত্তমান মন্ত্রী সভার পতন রোধ করেছেন। কিন্তু তারা রাজনৈতিক বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দেননি। সি. পি. আই (এম) আসামে কেন্দ্রীয়নীতিকে সমর্থন করেছেন, আসামের বিশেষ অবস্থা বিবেচনা করে। কিন্তু বর্ত্তমান মন্ত্রী সভাকে তাদের পরিচ্ছন্ন ভাবে সমর্থন করার বাধা কোথায় সেটা দুর্বোধ্য। যারা মন্ত্রীলাভের জন্য অনাস্থা প্রস্তাব এনেছিলেন, যদি এদের উপর তাদের বিশ্বাস থাকতো যে এরা রাজ্যের কাজকর্ম চালাতে পারতেন সফলভাবে, তবে ত এদের সমর্থন করাই উচিৎ ছিল সোজাসুজি। বর্ত্তমান মন্ত্রী সভাকেও সমর্থন করলেন না, অনাস্থা প্রস্তাব উত্থাপকদেরও সমর্থন করলেন না, এটা কোন নীতি? জল আরো ঘোলা হলে তবে মৎস্যশিকারে অগ্রসর হবেন? অথবা এই চাপে পশ্চিমবাংলার জন্য কেন্দ্র থেকে প্রতিশ্রুতি আদায়ের জন্য? অথবা দুদলকেই সন্তুষ্ট রাখার সুযোগ সন্ধানী নীতির ফলশ্রুতি? এটা তারা ভুলে গেলেন যে বিচ্ছিন্নমুখী দুটী দলকে সমর্থন করা একটা শুভারজনক অপচেষ্টা ব্যতীত কিছুই নয়?

সমগ্র দেশের ঐক্য ও সংহতি বিনষ্টকারী, আসামের ও দেশের অর্থনৈতিক সর্বনাশ সাধনকারী দলকে যারা প্রশ্রয় দিয়ে এসেছে, তাদের বিরুদ্ধতা করা সব দেশপ্রেমিক দল ও মানুষের পবিত্র কর্তব্য এটা কি দলীয় স্বার্থের উপরেই স্থান পাবার যোগ্য বলে তারা মনে করেন না ?

সংবাদে প্রকাশ, ডিগবয়, বারাউনি, গৌহাটী ও বনগাইগাঁর তৈল শোধনাগারগুলি বন্ধ থাকার জন্য দেশের প্রায় নয়শত বত্রিশ কোটী টাকার মত ক্ষতি হয়েছে। আসাম রাজ্যের সমস্ত উন্নয়নমূলক পরিকল্পনাগুলি স্তব্ধ হয়ে আছে। তার ক্ষতির পরিমাণ কি বিরাট, তা বুঝতে সাধারণ বুদ্ধিসম্পন্ন লোকেরাও পারেন। পারেন না কেবল ধান্দাবাজি, সুযোগ সন্ধানী রাজনীতিজ্ঞ-ব্যবসায়ীরা।

অনাস্থা প্রস্তাবের সময় আন্দোলনকারীদের সঙ্গে তথাকথিত বিদেশীদের বহিষ্কার করার ব্যাপারে প্রাদেশিক সরকার কোন ব্যবস্থা নেন নি বলে অভিযোগ করা হয়েছে। এই অভিযোগ অবিশ্বাস্য। পরিস্থিতি যেমন জটিল আকার নিয়েছে, তাতে কেন্দ্রীয় সরকার ভিন্ন এককভাবে কেউ এ সমস্যার সমাধান করতে পারবেন না আলোচনার সময়ে অনাস্থা প্রস্তাব আনয়নকারী দের অতীতকে কেউ তুলে ধরেন নি। ভবিষ্যতের জন্য তাদের সহযোগিতার প্রতিশ্রুতিও কেউ দাবী করেন নি ! দেশের স্বার্থের কথাও উচ্চারণ করেন নি কোন বিরোধী দলই।

একটা সরকার তা সে যে দলেরই হোক্ যখন সুস্থ পরিবেশ ফিরিয়ে আনার জন্য সচেষ্ট এবং কিছু পরিমাণে সফলও বটে, তখন তার পতন ঘটিয়ে একটা এলোমেলো অবস্থার সৃষ্টি করে, আসাম রাজ্য, তথা সমগ্র দেশের স্বার্থহানি ঘটালে, কারো মঙ্গলজনক হবে না, এ সত্য হৃদয়ঙ্গম করে কাজ করতে এত দ্বিধা কেন ? অন্য কোন দলই বিকল্প সরকার গঠন করতে পারবেনা, অথচ যারা কাজ করছে তাদেরও কাজ করতে দেবেন না সুস্থভাবে এটা কোন ধরণের নীতি ? দলীয় স্বার্থের প্রাধান্য দিতে হবে দেশের স্বার্থের উপরে ? তাজ্জব ব্যাপার হল, এই প্রকার নীতি হীনতার নীতি অনুসরণ করে তারা দেশের মধ্যে প্রগতিশীল ও জনদরদী ভাবমূর্তি গঠন করতে চান এবং আগামী দিনে ভারতরাষ্ট্রের দায়িত্ব গ্রহণ করার খোয়াবও দেখেন।

সি. পি. এম ও সি. পি আই অনাস্থা প্রস্তাবের বেলায় নিরপেক্ষ ছিলেন। তার কয়েকদিন পরেই বাজেট প্রস্তাবের বিরুদ্ধে ভোট দিয়ে বর্তমান সরকারকে একটা অস্থিরতার মধ্যে ফেলেছে। তারই ফলে আসামে আবার দুষ্কৃতকারীরা মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে। দুজন অফিসার খুন করেছে, তেলের পাইপ-লাইন উড়িয়ে দিতে চেষ্টা করেছে। নিজেদের সামর্থ বা সাহস নেই এই সঙ্কটকালে বিকল্প নেতৃত্ব দেবার। এরা পারে শুধু বাচালের মত নিষ্ফল আস্ফালন করতে সত্যিই বিচিত্র এই দেশ, বিচিত্র এই দেশের বিরোধী দলের রাজনীতি।

———

ঔরংজেবের গুরু দক্ষিণা

কালীপদ সরকার

১৬৫৮ খৃষ্টাব্দে ভ্রাতাদের হত্যা এবং পিতাকে কারারুদ্ধ করে সিংহাসন অধিকার করার পর, ঔরংজেব যখন নিশ্চিন্ত মনে রাজ্যশাসন করছেন তখন বাদশাহের বাল্য শিক্ষক মোল্লা শাহে কিছু মসোহারা এবং এককালীন কিছু দক্ষিণা প্রার্থনা করে বাদশাহের নিকট একটি আবেদন পেশ করেন। আবেদনের উত্তরে বাদশাহ বাল্য শিক্ষকের নিকট যে পত্রটি দেন তা পৃথিবীর বিখ্যাত পত্রাবলীর অন্যতম। পত্রটি হল এই—

মোল্লাশাহে সমীপেষু

মৌলভী সাহেব, আমার কাছে আপনি কি আশা করেন? আপনি কি সত্যই মনে করেন যে, আমি আপনাকে মুঘল দরবারের একজন প্রধান ওমরাহের পদে নিযুক্ত করব? অবশ্য আপনি যদি আমাকে উপযুক্ত শিক্ষা দিতেন তাহলে এমন কিছু করা সঙ্গত হত, কারণ শিক্ষক পিতৃতুল্য।

কিন্তু ভেবে দেখুন, আপনি আমাকে কি শিক্ষা দিয়েছিলেন? আপনি আমাকে শিখিয়েছিলেন, তামাম ফিরিঙ্গিস্থান (ইউরোপ) একটা দ্বীপমাত্র, সেখানকার বড় রাজ্য হল পর্তুগাল, তারপরে হল্যাণ্ড ও ইংলণ্ডের স্থান। ফ্রান্স ও আন্তালুসিয়া খুবই ছোট। সেখানকার রাজারা হিন্দুস্থানের রাজাদের তুলনায় নগণ্য। হিন্দুস্থানের সম্রাট পৃথিবীর অধীশ্বর। পারস্য, উজবেক, কান্দাহার, তুর্কস্থান, পেগু ও চীন হিন্দুস্থানের সম্রাটের নামে ভয়ে সদা কম্পমান। চমৎকার আপনার ভূগোল শিক্ষাদান!

এর পরিবর্তে আপনার উচিত ছিল আমাকে শেখানো—পৃথিবীর বিভিন্ন রাষ্ট্রের শক্তি-সামর্থ্য, যুদ্ধ-প্রণালী, আচার-আচরণ ও ধর্মের কথা। ইতিহাস সম্যকভাবে বলা উচিত ছিল রাষ্ট্রের উত্থান, শ্রীবৃদ্ধি ও পতনের কারণ এবং কোথায়, কি কারণে ও কিসের ভুলে রাষ্ট্র বিপ্লবগুলি ঘটেছিল। আপনি আমার পূর্বপুরুষদের ইতিবৃত্ত, তাঁদের ঘরোয়া জীবন, যুদ্ধজয় এবং সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার বিবরণও বলেন নি।

আরবী শেখাতে আপনি আমার বহু মূল্যবান সময় নষ্ট করেছিলেন, যে ভাষা ভালভাবে লিখতে পড়তে দশ বার বছরের কম সময়ে হয় না। একজন সম্রাট পুত্রের ক্ষেত্রে বিদেশী আরবী ভাষার ব্যাকরণ-বিদ অথবা মোল্লা হওয়ার চেয়ে তার প্রতিবেশীদের ভাষা ও আচার আচরণ সম্বন্ধে কি অধিকতর ওয়াকিবহাল হওয়া যুক্তিযুক্ত ছিল না? সে সব শিক্ষাই তো তার জীবনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা বহন করে। কতকগুলি দুরূহ, বিরক্তিকর, অনাবশ্যক শব্দ তর্জমা করতে হয়েছিল তা আমার নিকট এক শক্তিহানিকর দুর্বহ মনস্তাত্ত্বিক চাপের মতই মনে হত।

আপনি কি জানতেন না যে, শৈশবের সুশিক্ষার স্মৃতি সারা জীবনকে মাধুর্যে ভরে রাখে এবং মানুষকে মহত্তর কাজে অনুপ্রাণিত করে? মোল্লাতন্ত্র সমাজ

পাঠ ও জ্ঞান চর্চা কি আরবীর বদলে মাতৃভাষায় সম্ভব নয়? আপনি আমার পিতা শাহাজানকে বলেছিলেন যে, আপনি আমাকে দর্শনশাস্ত্র শেখাবেন, ভাল কথা। আমার মনে আছে, বেশ কয়েক বছর ধরে আপনি আমাকে শূন্যগর্ভ তাত্ত্বিক প্রশ্ন আলোচনায় নিযুক্ত রেখেছিলেন যাতে না ছিল মানসিক আনন্দ, না ব্যবহারিক সমাজ সচেতনতা বোধ। সে সব শূন্যগর্ভ তত্ত্ব কথা যেমন ছিল শক্ত, তেমনি বিস্মৃতি প্রবন।

আমার বেশ মনে আছে, বহুদিন ধরে যে শাস্ত্র আপনি আমাকে পড়িয়েছিলেন তার একরাশ বর্বর দুর্বোধ্য, জটিল ও বিভ্রান্তিকর শব্দ ছাড়া কিছুই এখন আমার মনে নেই। এগুলি রচিত হয়েছে আপনার ন্যায় একদল মানুষের অজ্ঞতা ও দেমাক বাড়াবার জন্য, যারা অন্যদের বুঝাতে চায় যে তারা সবজান্তা এবং ঐ সব অপ্রচলিত দুরূহ ব্যর্থবোধক শব্দের মধ্যে কি যেন রহস্য লুকিয়ে আছে, যার মর্ম শুধু তারাই বুঝতে সক্ষম।

আপনি যদি আমাকে যুক্তিনির্ভর দর্শনশাস্ত্র শেখাতেন, সুন্দর সুন্দর উপদেশ ও ধর্মতত্ত্ব সম্বন্ধে বলতেন, যা ভাগ্যবিড়ম্বনাকে অগ্রাহ্য করার শক্তি যোগায়, অভাবকে নিয়ন্ত্রণ করে, জয়ে গর্বানুভব এবং পরাজয়ে হতমান না করে তাহলে তা হত সত্যিকার দর্শনশিক্ষা। একটু খেয়াল করে যদি ছাত্রকে মানুষ, জীবজগৎ, বিশ্বের অসীমত্ব, প্রকৃতির মহান নিয়ম ও শৃঙ্খলা সম্পর্কে কিছু শিক্ষা দিতেন তাহলে তার প্রকৃত দর্শনশাস্ত্রের জ্ঞানলাভ ঘটত। তখন আলেকজাণ্ডার তাঁর শিক্ষক এরিস্টেটলের কাছে যতটা ঋণী ছিলেন, আমি আপনার কাছে তার চেয়ে বেশী ঋণ স্বীকার করতাম এবং আলেকজাণ্ডার এরিস্টেটলের জন্য যা করেছিলেন আমি আপনার জন্য তার শতগুণ করতাম।

স্তুতিবাদের পরিবর্তে, আপনি কি আমাকে রাষ্ট্রনীতি, প্রজার প্রতি রাজার এবং রাজার প্রতি প্রজার কর্তব্য এবং একদিন যে আমাকে প্রাণ ও রাজমুকুটের জন্য ভাইদের সঙ্গে লড়তে হবে, সে সম্বন্ধে কিছু শিক্ষা দিতে পারতেন না? আপনি কি কোনদিন আমাকে শিখিয়েছিলেন কিভাবে দুর্গ ও নগর অবরোধ, অথবা যুদ্ধকালে সেনা সমাবেশ করতে হয়? এ সব বিষয়ের শিক্ষার জন্য আমি অন্য অনেকের নিকট ঋণী, আপনার নিকটে নয়।

আপনি আপনার গ্রামে ফিরে যান এবং দেখবেন কেউ যেন কোনদিন না জানে আপনি আমার শিক্ষক ছিলেন এবং আপনার আবেদনের কি উত্তর পেলেন। ইতি—

বাদশাহের আদেশ মোল্লাশাহে মেনে নিয়েছিলেন কিনা জানা যায় না। শাহানশাহের নিকট থেকে এই পত্রখানি পেয়ে তাঁর মনের অবস্থা কেমন হয়েছিল তাও তিনি প্রকাশ করতে সাহসী হন নি নিশ্চয়ই। তাঁর জীবনে নেমে এসেছিল এক অতলস্পর্শী অন্ধকার এবং তার মাঝেই মৌলভী মোল্লাশাহের জীবনদীপ নিভে গিয়েছিল অগোচরে।

[লিংকন স্টেফটার সংকলিত দি ওয়ার্ল্ডস গ্রেট লেটারস থেকে অনুবাদ]

শাসকের রক্তচক্ষু জনরোষে ভস্মীভূত

বংশীধর বন্দ্যোপাধ্যায়

সাম্প্রতিক বাংলা-বন্ধের অভূতপূর্ব সাফল্যেও কংগ্রেস (ই) দলের রাজনৈতিক দূরদর্শিতায় এবং রণকৌশলের প্রচণ্ড দাপটে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত বামফ্রন্ট তথা সি, পি, এম নেতৃত্ব দিশেহারা অবস্থায় পুলিস প্রশাসনের একটা বিশেষ অংশকে অকারণ সন্দেহের বশবর্তী হয়ে মিথ্যা দোষারোপে ব্যস্ত বলে সংবাদে প্রকাশ। আরো প্রকাশ যে, সি, পি, এম নেতৃত্ব এই ব্যাপারে এখন থেকে আর প্রশাসন ও পুলিসের উপর তেমন ভরসা রাখবে না। বন্‌ধের সময়ে বিভিন্ন মফস্বল এলাকা থেকে পুলিসের ভূমিকা সম্পর্কে সি, পি, এম দল যে বাস্তব অবস্থার সংবাদ সংগ্রহ করেছে তা নাকি নৈরাশ্যজনক তাদের কাছে ও কলিকাতার চেয়েও তা নাকি অনেক বেশী খারাপ। সি, পি, এম তাই পুলিসকে আর বিশ্বাস করতে নারাজ, দলীয় শাসনব্যবস্থা চালু রাখার ক্ষেত্রে ঐ সংবাদে প্রকাশ যে, মফস্বল এলাকায় বন্‌ধের দিন পুলিস নাকি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই জোত-দারদের উস্কানিতে সমাজ-বিরোধীদের সাহায্য করেছে আক্রমণাত্মক ভূমিকা সফল করতে আর সরকারের বিরোধী শক্তিকে পুলিস নাকি কোথাও তেমন বাধা দেয়নি। সি, পি, এম নেতারা তাঁদের উক্ত ধারণার বশবর্তী হয়ে নিজ দলের গোপন শাখাকে মজবুত করে তুলতে এখন থেকেই উঠে পড়ে লেগেছেন। সি, পি, এম দল সরকারে থাকবে অথচ সাধারণ প্রশাসন বা পুলিস প্রশাসনের উপর আস্থা রাখবে না, কি অদ্ভুত আবদার! একই সাথে দুধ ও তামাক খেতে চায় ওরা কোন দুর্বুদ্ধির খপ্পরে পড়ে? ওরা যা চায় তা তো আর সম্ভব নয়, কারণ ভারতীয় সংবিধানকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে ওরা যেভাবে দলীয় ক্যাডারদের দিয়ে সুশাসনের নামে মানুষকে উৎপীড়ন ও উৎখাত করছে গ্রাম-বাংলায় প্রায়ই, তা আর কতদিন মানুষ সহ্য করবে?

গ্রামবাংলায় সি, পি, এম ক্যাডাররা যে হারে নিরপেক্ষ ও বিরোধী দলভুক্ত মানুষের উপর অকথ্য অত্যাচার, বিচারের নামে প্রহসন ও সদম্ভে দল-বাজী চালিয়ে চলেছে বিগত কয়েক বছর ধরে, সে তুলনায় শহরাঞ্চলে তারা ততটা মারাত্মক অবস্থা সৃষ্টি করতে চেষ্টা করেনি এতদিন। কিন্তু দল নেতৃত্বের প্রশ্রয়ে এবার তারা শহরাঞ্চলেও ঐ একই বিপদজনক হিংস্র অবস্থার সৃষ্টি করবে বলে আশংকা হয়। সরকারী দল তাদের দলীয় লোকদের হাতে এখন থেকে সংবিধান বহির্ভূত উপায়ে যে বিশেষ ক্ষমতা দিতে উদ্যত তা এ রাজ্যের জনজীবনে দারুণ উৎকণ্ঠা ভোগের প্রধান কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে, তথাপি জনগণ ধৈর্য্য ধারণ করে দেখতে চায় যে সি, পি, এম দল আরো কত অভিনব উপায়ে এ রাজ্যবাসীর ক্ষতি সাধনে এখনো তৎপর। রাজনীতির কূট কৌশলে সি, পি, এম দল যদিও এখনো শিশু কংগ্রেস (ই) দলের তুলনায়; তথাপি তারা মারদাঙ্গায় বিশেষ পটু, আর মিথ্যা প্রচারে তারা সবার উপরে—একথা এরাজ্যের কে না জানে। সি, পি, এম দলের গোপন শাখা যে আরো উগ্র ও বিশেষ হটকারীতা

পশ্চিমবঙ্গের মানুষ বিগত ১৯৬৯ থেকেই লক্ষ্য করে আসছে। বর্তমানে সেই গোপন শাখাকে পুনরুজ্জীবিত করে তাকে শক্তিশালী করে গড়ে তোলার যে ব্যাপক চেষ্টায় দলনেতৃত্ব বর্তমানে আত্মনিয়োগ তা তাদের বিবৃতি থেকেই পরিষ্কার ভাবে বোঝা যায়।

ফলে এরাজ্যের জনজীবনে যে হিংস্রতার পুনরাবির্ভাব ঘটবে সে বিষয়ে আর কোন সংশয় নেই। শাসন ক্ষমতায় থেকেও যারা জনজীবনকে সবদিক দিয়ে বিপর্যস্ত করতে উৎগ্রীব, তাদের কি আর এরপরের শাসন ক্ষমতায় থাকতে দেওয়া সমীচীন ভারত রাষ্ট্রের পক্ষে? দুরাচারী দলবাজের দলকে কি কোন প্রকৃত গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের পক্ষে এভাবে সংবিধান লঙ্ঘনকারীদের ভূমিকায় প্রতিনিয়ত শাসন চালাতে দেওয়া যায়সঙ্গত হবে?

জীবন-ধারণের প্রতিটি ক্ষেত্রেই এরাজ্যবাসীর বাস্তব অবস্থা চরম শোচনীয় 'সি, পি, এম দলের দলীয় চক্রান্তের ফলে; আর এর থেকে কারোরই নিস্তার নেই, যেহেতু বামফ্রন্টের নামে সি, পি, এম নেতৃত্বই সরকার চালায় পশ্চিমবঙ্গে। বামফ্রন্টের শরিকদলগুলিও যখন তখন বিপদগ্রস্ত হয় সি, পি, এম দলের অবিচারে ও অত্যাচারে, অথচ তারা প্রতিবাদ করেও কোন প্রতিকারের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে না সি, পি, এম নেতৃত্বের চাপে পড়ে। একমাত্র বিরোধী দলের শক্তিশালী অংশ হিসাব কংগ্রেস (ই) দলই এই সরকারের অন্যায় কার্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে ও প্রতিকার মানসে আন্দোলনের কর্মসূচী গ্রহণ করে জনগণেরপাশে দাঁড়িয়ে আন্দোলন পরিচালনা করে। অবশ্য অন্যান্য বিরোধী দলগুলিও কংগ্রেস (ই)র সঙ্গে সহযোগীতায় এগিয়ে আসে দেশের বৃহত্তর বিপদাশংকায়। বিরোধীরা সংঘবদ্ধ ভাবে যখনই আন্দোলনে নামে সরকারের সংবিধান বহির্ভূত অন্যায় কার্যের প্রতিবন্ধক হয়ে তখনই এই সরকার ব্যাসিষ্ট কায়দায় বিরোধীদের ওপর লাঠি, টিয়ারগ্যাস ও গুলি চালায় সম্পূর্ণ বিনা প্ররোচনায়। পশ্চিমবঙ্গে পুলিসী শাসন বামফ্রন্ট ইতিপূর্বেই কায়েম করেছে। এখন আবার তারা দলীয় ক্যাডারদের দিয়ে বিরোধীদের শায়েস্তা করার ব্যবস্থা কায়েম করতে উদ্যত দেখা যায়। সংবিধানকে ছেঁড়া কাগজের পর্যায়ে যারা নামিয়ে আনতে সদা সচেষ্ট, তাদের কি এর পরেও রাজ্য শাসনের অধিকার থাকা উচিত? মনে হয় সি, পি, এম দলের স্বৈরতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা আর কিছুদিন এভাবে চলতে দিলে অরাজক পশ্চিমবঙ্গে গৃহযুদ্ধের অবস্থাকে স্বাগত জানান হবে। সেটা নিশ্চয়ই এরাজ্যের জনগণের পক্ষে চরম অমঙ্গলের বিশেষ কারণ হবে, বা বাঞ্ছনীয় নয় কেন্দ্রের বা ভারতীয় জনগণের কাছে। কেন্দ্রীয় সরকারকে সজাগ দৃষ্টি নিয়ে এ রাজ্যের শাসনব্যবস্থায় যে মারাত্মক দলবাজী, অবিচার, তুষ্টিপোষণ দুর্নীতি, পক্ষপাতিত্ব, শিক্ষাসংহার ও স্বেচ্ছাচার অহরহ চলছে তা লক্ষ্য রাখতে হবে এবং এইসব অনাচারের প্রতিবিধানও করতে হবে কেন্দ্রীয় সরকারকে অনতিবিলম্বে।

অন্যথায় এ রাজ্যের মানুষ বামফ্রন্ট সরকারের হটকারী রাজনীতির শিকারে পরিণত হয়ে অপূরণীয় ক্ষতিগ্রস্ত হবে, আর তাছাড়া গণতন্ত্রও বিপন্ন হবে সি, পি, এম দলের সন্ত্রাস সৃষ্টির ফলে। বিগত প্রায় চার বছর বামফ্রন্ট শাসনে পশ্চিমবঙ্গ যেভাবে সামনে চলার পরিবর্তে পিছন ফিরে উল্টা পথে হাটছে, তাতে সামগ্রিকভাবে এরাজ্যের অগ্রগতি তো হয়ই নি, বরং অধোগতি হয়েছে উল্লেখযোগ্য

ভাবে। বিদ্যুতের নিয়মিত অভাবে শিল্প সংস্থার উন্নতির বদলে অবনতি হয়েছে ও তা আরো অবনতির পথে ধাবমান সিটুর প্রভাবিত শ্রমিকদের ঘন ঘন অশান্তির বা অসন্তোষের ফলে। বর্গা চালু করতে গিয়ে গ্রামাঞ্চলে যে পারস্পরিক অবিশ্বাস, মারদাঙ্গা ও পক্ষপাতিত্ব দেখা গেছে তা কৃষিকার্য্যের উন্নতি না ঘটিয়ে বরং অবনতিকে স্থিতিশীল করেছে।

ব্যবসা ও বাণিজ্যের প্রসার ঘটেনি কারণ কৃষিজাত পণ্য উৎপাদনের হার বেশ কমেছে এই সরকারের অবিমৃষ্যকারীতায় ও ঢপা দলবাজীর ফলে। সামগ্রিকভাবে পশ্চিমবঙ্গ বামফ্রন্টের শাসনকালে বেশ মারাত্মক ধা খেয়েছে অর্থনীতিতে, শিক্ষাপ্রসারে সমাজকল্যাণে, কৃষিফলনে, বাণিজ্যিক সম্প্রসারণে, নূতন নূতন ধরণের শিল্প সৃষ্টির কাজে ও সামাজিক ন্যায় বিচারে এবং বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে সমবণ্টনের ক্ষেত্র প্রসারণে। কাজেই এই বামফ্রন্ট বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গের সমূহ অমঙ্গলের, অশান্তির ও অসন্তোষের প্রধান কারণ স্বরূপ। তাই বামফ্রন্টের গালভরা বড় বড় কাল্পনিক মিথ্যা বুলিতে মানুষ আর ভুলে থাকতে চায় না। এ রাজ্যের অধিকাংশ মানুষ শান্তিপ্রিয়, তাই তারা ৩রা এপ্রিলের বন্‌ধ ভাঙ্গার অভিনব কৌশল দেখে এবং সে কৌশল স্বয়ং সরকারী দলেরও তা মুখমন্ত্রীর পরামর্শ মত জেনে ক্ষিপ্ত হয়েও ক্রোধের বশবর্তী হয়ে যে সরকার বিরোধী উদ্যোগনের তা সবার পক্ষেই ক্ষতিকর হয়।

বন্‌ধের দিন বামফ্রন্ট সরকার তথা সি. পি এম দল নেতৃত্ব ও তাদের জঙ্গী পঞ্চাশ হাজার ক্যাডারগণ যদি চালেঞ্জ দিয়ে কংগ্রেস (ই) দলকে লোকচক্ষে হেয় প্রতিপন্ন করার দুরভিসন্ধি নিয়ে জোরজবর দস্তি করে ট্রাম ও সরকারী বাস চালাবার চেষ্টায় মদৎ না দিত তবে নিশ্চয় এতগুলি নিরীহ নাগরিকের হঠাৎ অকালমৃত্যু ঘটতো না। যে ত্রিশ বা বাইশজন মানুষ ঐ বন্‌ধের দিনে ট্রামে-বাসে চেপে নিজ নিজ কর্মস্থলে যাবার পথে আক্রান্ত হয়ে আহত বা নিহত হয় তারা তো মুখ্যমন্ত্রীর কথায় বিশ্বাস করেই বাড়ীর বাইরে পা দিয়েছিলেন। তাঁদের প্রায় সবারই ধারণা ছিল যে মুখ্যমন্ত্রী তাঁদের রক্ষার ব্যবস্থা করবেন পুলিস ও ক্যাডারদের সাহায্যে। কিন্তু নির্মম নিষ্ঠুর যে প্রাণঘাতি চরম দুঃখজনক ঘটনা সে দিন জনরোষে ঘটে গেল মুহূর্তের অসাবধানতায় তার তুলনা বিরল। মুখ্যমন্ত্রীর বৃথা আস্ফালনের জবাবে জনরোষ যে এত প্রবল আকার ধারণ করবে সেদিন তা কেউ-ই পূর্বাহ্নে আন্দাজ করতে পারেনি। ফলে যে সাংঘাতিক বিপদ ও বহু মৃত্যু ঘটে গেল, কে তার জন্য দায়ী?

পশ্চিমবঙ্গে জ্যোতিবাবুরাও ইতিপূর্বে বহুবার দুতায় নাতায় বন্‌ধ ডেকে জনজীবনকে স্তব্ধ করে দিয়েছিলেন। কিন্তু কোন ক্ষেত্রেই তো কোন বন্‌ধ-বিরোধী শক্তি এবারের মত মুখ্যমন্ত্রীর ভূমিকা নিয়ে বন্‌ধ ভাঙ্গার চেষ্টা করেনি ইতিপূর্বে। জ্যোতিবাবু ক্ষমতার দম্ভে দিশেহারা হয়ে বন্‌ধ ভাঙ্গার যে ষড়যন্ত্রে ২রা এপ্রিল রাত্র থেকে ৩রা এপ্রিল সন্ধ্যা ৬টা পর্য্যন্ত লিপ্ত ছিলেন তা নাকি বহুলোকই জানেন এবং তাঁরা নাকি এই হীন কার্য্যের প্রত্যক্ষ দর্শী। এ ঘটনা যদি প্রকৃতই সত্যে পরিণত হয়ে থাকে, তবে বড়ই মনস্তাপের কারণ। বহু অমূল্য জীবন অকালে ঝরে গেল রাজনৈতিক দ্বন্দ্বের ফলে।

বড়ই আফশোষের কথা ঐ মৃত্যু বরণকারীদের কেউই জানতো না যে ঐরূপ বিধ্বংসী কাণ্ডকারখানা

পথে ঘটবে। সরকার তার সমর্থকদের, কো-অর্ডিনেশন কমিটির সদস্যদের ও অন্যান্যদের সেদিন কাজে আসার পথে রক্ষার জন্য কোন ব্যবস্থাই করেনি। কেবলমাত্র পঞ্চাশ হাজার ক্যাডার ঐ দিন পথে নামবে ও বনধ বিরোধীদের রক্ষা করবে এবং কংগ্রেস ই দলের সঙ্গে মোকাবেলা করবে বলেই কি মুখ্যমন্ত্রী তাঁর কর্তব্যও দায়দায়িত্ব পালন করে খালাস হলেন? তাঁর কি আর কিছুই করণীয় ছিলনা? ঘৃতে যে অগ্নি তিনি সেদিন নিক্ষেপ করে জনগণকে কষ্ট করলেন তার তেজ মাত্রা যে কতদূর পর্য্যন্ত দগ্ধ করবে তা কি তিনি জানতেন না? নাকি জেনে শুনেই তিনি ঐ রূপ রাজনৈতিক দাবার চাল দিলেন প্রতিপক্ষকে পরোক্ষে ঘায়েল করার ও নিজে তার বিনিময়ে রাজনৈতিক মুনাফা লোটার আশায়- যাই হোক্ ঘটনাটা বড়ই মর্মান্তিক। মানুষের মহামূল্য জীবন নিয়ে এরূপ রাজনৈতিক গেওয়া খেলা হৃদয় বিদারক কাণ্ড। এরাজ্যের ক্ষতি বা বৃদ্ধিতে যাদের কিছুই এসে যায়না, তারা এর গুরুত্ব নিশ্চয় বুঝবেনা। কিন্তু যারা এ রাজ্যের স্থায়ী ও শুভবুদ্ধি সম্পন্ন অধিবাসী তারা তো মর্মে মর্মে এর ব্যথা ও বেদনা অনুভব করবে, কারণ এরূপ অবধা আত্মীয় বিয়োগ তো তাদেরই ঘটছে অতি তুচ্ছ কারণে বা সরকার মনে করলে বা সাবধান হলে আদৌ ঘটতো না। বামফ্রন্ট মুখে যত বড় বড় কথাই বলুক না কেন, আসলে এই সরকার অপদার্থ এক বচন বাগীশ, মিথ্যাচারী ও স্বৈরাচারী সরকার। দেশের জনগণের ওপর এদের না আছে শ্রদ্ধা, না আছে দরদ, না আছে কৃতজ্ঞতা, না আছে বিশ্বাস, তাই এরা জন কল্যাণের ফতোয়া লাগিয়ে জনগণের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করে নিজ নিজ দলস্বার্থে, আর রাজনৈতিক মুনাফা তোলে তারই ফাঁকে ফাঁকে

তুহাতে বামফ্রন্ট বলতে এরাজ্যের মানুষ সি, পি, এমকেই বোঝে, কারণ অন্যান্য শরিকদলগুলির অনেকেই কৃতদাসের মত নতজানু হয়ে সি, পি, এম নেতৃত্বের পদলেহন করে মন্ত্রীত্ব চলে যাবার ভয়ে। হালে এরূপ অনেক ঘটনা ঘটেছে যাতে দেখা যায় যে, হয় আর এস, পি আর না হয় ফরওয়ার্ড ব্লক অথবা অন্য শরিকদলের কর্মীরা সি, পি, এম দলের কর্মীদের অন্যায় কাজের প্রতিবাদ করতে গিয়ে গ্রামাঞ্চলে প্রায়ই মার খায় এবং এর কোন প্রতিকারের জন্য কোন নেতাই সচেষ্ট নয়। বাঁশের চেয়ে কঞ্চি দড়। সি, পি, এম ক্যাডারদের দৌরাত্মে পুলিশ পর্য্যন্ত ভয়ে জড়সড় হয়ে ন্যায়কে অন্যায় বলতে বাধ্য হয় অথবা ঘোর অন্যায়ের পৃষ্ঠপোষকতা করতে রাজি হয় বলি ঠেকাবার তাগিদে।

সি, পি, এমদের ভয়ে গ্রামাঞ্চলের প্রতিষ্ঠাবান-গণ্য-মান্য মানুষ পর্য্যন্ত সদা সর্বদা তটস্থ অবস্থায় বাস করতে বাধ্য হয়। কোন ঘোরতর অন্যায়ের বিরুদ্ধে কোন কথা বলতে পর্য্যন্ত তারা সাহস করে না। এরা দিন দিন মানুষকে অমানুষের পর্য্যায়ে নামতে বাধ্য করছে ভয় দেখিয়ে। বিরোধীদের বিচার বিভাগীয় তদন্তের দাবী মুখ্যমন্ত্রী কর্তৃক অস্বীকার ও তার প্রতিবাদে বনধের ডাক এবং সেই বনধকে বানচাল করার জন্য মুখ্যমন্ত্রীর দলীয় ক্যাডারদের সাহায্যের ওপর নির্ভর পশ্চিমবাংলার বুকে হিংসার প্রলয় নাচনকে স্বাগত করে বাইসটি প্রাণের মৃত্যু ঘটাল অকারণ। এর জন্য মুখ্যমন্ত্রীর অন্যায় জিদ্ ও অবিমৃষ্যকারীতাই নৈতিকভাবে দায়ী বলে মনে হয় আমাদের। মৃত ব্যক্তিদের পরিবারবর্গকে এর জন্য ন্যায্য ক্ষতিপূরণ দেওয়া সরকারের অবশ্য কর্তব্য। বাংলার ইতিহাস ও ঐতিহ্যের কথা স্মরণে

(এর পর ১১ পৃঃ দেখুন)

রাজ্যের শিল্প সংস্থাগুলির ভবিষ্যৎ কোন পথে ?

রাজ্যের সাধারণ মানুষ আশা করেছিলেন বর্তমান রাজ্য সরকারের আমলে শিল্প সংস্থাগুলি উৎপাদনমুখী হয়ে উঠবে। কারণ তারা বরাবরই দাবী করে এসেছেন শ্রমিক কৃষক মেহনতী মানুষ তাদের সঙ্গে আছেন, অতএব এ রাজ্যের ভাগ্য সুপ্রসন্ন হবেই। অন্ততঃ কলে কারখানায় উৎপাদনের বাতাবরণ সৃষ্টির মাধ্যমে। কিন্তু প্রশ্ন দাড়িয়েছে বর্তমান সরকারের প্রায় সাড়ে তিন বছরের রাজত্বকালে কারখানাগুলি কি আদৌ উৎপাদনমুখী হয়ে দাড়িয়েছে ? কেবল মাত্র রাজনীতির বুলি এবং দলীয় স্বার্থের চিন্তা ছাড়া কি কিছু করেছেন ? রাজ্যের মানুষ লক্ষ্য করে আসছেন, শ্রমিক কৃষকের গণতান্ত্রিক আন্দোলনে রাজ্য সরকার মদত দিয়ে আসছেন, কিন্তু কি স্বার্থে বা কিসের বিনিময়ে ? রাজ্যের সামাজিক, বৈষয়িক বা অর্থনৈতিক স্বার্থ কি এই বিপদগামী আন্দোলনে দেউলিয়া হতে বসে নি। তদানীন্তন বিরোধীদল থাকা কালীন উদ্বাস্তুদের নিয়ে যে আন্দোলন করেছিলেন তার ফলে তাদের পুনর্বাসন সুষ্ঠুভাবে হয়ে উঠতে পারেনি। অপরদিকে পাকাবে যে সকল উদ্বাস্তুরা আশ্রয় নিয়েছিলেন, তারা নিজের পায়ে দাড়িয়ে সরকারী সাহায্যে স্বনির্ভর হয়ে উঠেছেন। কারণ তাদেরকে নিয়ে রাজনীতি করা হয় নাই। তৎকালীন পরলোকগত মুখ্যমন্ত্রী তথা এ রাজ্যের রূপকার ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় আন্দামানে এইসব উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসন দিয়ে বাঙালী অধ্যুষিত এলাকা করার যে পরিকল্পনা নিয়েছিলেন, তখন বিরোধী দল হিসেবে থাকাকালীন তারাই এই পরিকল্পনা নস্যাৎ করে দিয়েছিলেন।

এবারের নুতন সূচনা বেকারদের ভিক্ষাবৃত্তির মাধ্যমে 'ডোল' দান করা চলেছেন। এবং প্রকৃত বেকারদের বাদ দিয়ে দলীয় লোকদের বিভিন্ন শিল্প সংস্থায় নিযুক্ত করে চলেছেন। কাজেই রাজ্যটিকে দলীয়স্বার্থে চিরস্থায়ী জমিদারী করার অর্থ দাড়িয়েছে রাজ্যের বৃহত্তর স্বার্থকে জলাঞ্জলি দেওয়া। শিল্প, পরিবহন সর্বত্রই ক্ষতির বহর হু হু করে বেড়েই চলেছে। আর যার বোঝা বয়ে চলেছেন রাজ্যের সাধারণ মানুষ। শ্রমিক আন্দোলনের নামে কলে কারখানায় অশান্তি, উৎপাদন হ্রাস, অচল অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। সরকারী অফিসগুলি দুর্নীতি ও অব্যবস্থায় ভরে গিয়েছে। অপরদিকে কাজ বন্ধ। বোনাস সহ বিভিন্ন সুযোগ বৃদ্ধির তাগিদে রাজ্য সরকার উৎপাদনের কথা মনে না রেখে এ হেন কাজ করে চলেছেন। রাজ্যের সরকারী দপ্তরগুলিতে যে ঢিলেমী চলছে, তাতে মন্ত্রী তথা তাবড় তাবড় দলীয় নেতারাও কোভে ফেটে পড়েছেন। অথচ এই ঢিলেমী দুর্নীতি এবং অব্যবস্থার জন্য দায়ী তারাই, যারা শ্রমিক বিপ্লবের মহড়া দিয়ে আসছিলেন। রাজ্যের বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রগুলিতে উৎপাদন হচ্ছে না বললেই চলে। রাজনীতি এবং মস্তুক সৃষ্ট কারণই এর জন্য দায়ী। বিভিন্ন শিল্পসংস্থায় এই বিপদগামীতার কি ভয়াবহ ফল হতে পারে, তাই প্রকৃষ্ট প্রমাণ রাজ্যের শিল্পসংস্থাগুলি দিয়ে যদি উৎপাদন না হয়ে থাকে ক্ষতির বোঝা বেড়েই চলে, তাহলে সে ব্যর্থতা নিঃসন্দেহে ক্ষমতাসীন রাজ্য সরকারের রাজনীতি। এমন কি রাজনীতির কালোহাত এর ঘুর পর্যন্ত প্রসারিত যে কোন যোগ্য পরিচালক সরকারী শিল্পে আসতে চাইছেন না। কারণ পরিচালকদের ধারণা হয়েছে যে রাজ্য সরকারের অতি মাত্রায় রাজনীতিতে তাদের মান বাঁচবে না।

কোন দূরচেতা পরিচালক নিয়ে সরকার শিল্প সংস্থাগুলি চালাতে পারবেন না। কেউ কেউ অবসরপ্রাপ্ত পরিচালকগণ স্বীকার করলেন যে শ্রমিক প্রতিনিধিদের নিয়ে যে পরিচালক মণ্ডলী গঠিত হয়েছে তাতে উৎপাদন চরম নাভিশ্বাস উঠেছে। রাজ্যের বৃহত্তর স্বার্থকে উপেক্ষা করে এরা ইউনিয়ন রাজনীতির মাধ্যমে রাজ্যের অর্থনীতিকে পঙ্গু করে চলেছেন। কোটি কোটি টাকা বিনিয়োগের পরও উৎপাদন না হলে ক্ষতির বোঝা রাজ্যের সাধারণ মানুষকেই বহন করতে হবে। এর বিরুদ্ধে শহর থেকে গ্রামাঞ্চলেও প্রতিবাদের ঝড় উঠেছে।

বেকার ভাইরা বুঝতে পারছেন দিন দিন শিল্প সংস্থাগুলির এই হাল হলে তাদের ভবিষ্যৎ সম্পূর্ণ রূপে অন্ধকার। রাজ্য সরকারের কোন শিল্প সংস্থাতেই উৎপাদনের বাতাবরণ নাই। দুর্নীতি বিশৃঙ্খলা বিভিন্ন সংস্থায় ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ছে, অথচ কারও বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা গ্রহণের অধিকার নাই। রাজনীতির ছত্রছায়ায় সব একাকার। অপর দিকে এই সর্বনাশা রাজনীতি ভয়েই কোন শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠছে না। বিদ্যুৎ বিপর্যয়ের ফলে বর্তমান শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলিও বিপর্যস্ত। শিল্প শ্রমিকরা এর জন্য দায়ী একথা সর্বত্র প্রযোজ্য নয়। সরকার এবং তাদের নিযুক্ত অযোগ্য পরিচালকরাই এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ দায়ী। সরকারের অপদার্থতার নীচফলের লোকসানের বোঝা রাজ্যবাসীরা কেন বহন করতে যাবেন? রাজ্যের ভিক্ষাবৃত্তির ভাগ ভোগ প্রাপ্ত বেকাররা এই সব ইউনিয়নবাজী রাজনীতির পাবরে দেওয়ার নীতির বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধভাবে সশস্ত্র পথে পা বাড়াবেন না তো। রাজ্য সরকার কি এদের হাতে থেকে তখন রেহাই পাবেন?

সৌজন্য—দুর্গাপুর বাণী

(৯ এর পাতার শেষাংশ)

থাকলে নিশ্চয় মুখ্যমন্ত্রী এভাবে আপন জিদ্ বজায় রাখার জন্য বন্ধের দিনে দলীয় ক্যাডারদের নামিয়ে কংগ্রেস (ই) দলের ডাকা বন্ধ ভাঙ্গার মারাত্মক চেষ্টা চালাতেন না এবং এতগুলি নিরীহ নাগরিকের অযথা প্রাণনাশের প্রত্যক্ষ না হলেও পরোক্ষ কারণ হতেন না। তাঁর এই অবিবেচকারীতাই উক্ত সকল প্রকার বিপদের মূলে ছিল সেদিন, যা যে কোনও যুক্তি নির্ভর ও শুভবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষ নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে স্বীকার করবেই। দেশ ও দেশের মানুষের জন্যই রাজনীতির প্রয়োজন, কিন্তু সেদিনের রাজনীতিই বাইশটি তরুণ তাজাপ্রাণ সংহার করল অকারণ।

●

ফাঁসির মঞ্চে গেয়ে গেল যারা
জীবনের জয় গান....

সেই শহীদদের পুণ্য স্মৃতির উদ্দেশ্যে বোড়াল হাসপাতালে একটী শহীদ Block স্থাপন করার উদ্দেশ্যে অকুণ্ঠ দেশবাসীর সাহায্য প্রার্থনা করছি। সকলেই সাধ্যমত মুক্ত হস্তে সাহায্য করুন।

ঠিকানা
বিপ্লবী বাংলা
৪, বল্লভদাস ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০ ০০৭

রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্র নাথের স্মৃতি কথা

["A Nation In Making" গ্রন্থ থেকে অনুবাদ]

অনুবাদক—অধ্যাপক নলিনীমোহন দাশগুপ্ত

মন্ত্রীরূপে আমার কাজকর্ম [পূর্বানুবর্তন]

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

মিঃ মল্লিক কিন্তু তার কাজের দ্বারা সর্বজনের কাছে এক দেব বিগ্রহের মত হয়ে উঠলেন। এখানে সেখানে সর্বত্র তাকে সম্মান দেখাবার জন্য পার্টি দেওয়া হতে থাকে। হঠাৎ যেন তন্দ্রাচ্ছন্ন রূপে প্রতীয়মান নাগরিকগণ আবিষ্কার করে বসলেন যে তাদের মধ্যে এমন একজন উচ্চ ধীশক্তি সম্পন্ন পুরুষ আছেন যাকে এযাবৎ কাল তারা চিনতেই পারেন নি, যিনি এ যাবৎকাল তাদের কাছে অজ্ঞাতই থেকে গেছেন, যার মূল্য তারা বুঝতে পারেন নি এবং যাকে তারা যথেষ্ট পরিমাণে সমাদর করতে বা মর্য্যাদা দিতে পারেন নি। "গাঁয়ের বৈরাগী ভিখ্ পায় না। নিজ দেশে পয়গম্বরও সম্মান পান না। এ প্রবাদ বাক্যটি বহুকাল ধরে স্বীকৃতি পেয়ে আসছে এবং স্মরণাতীত কালের অভিজ্ঞতার সত্য বলে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কিন্তু মিঃ মল্লিকের বাস ভবনের এক মহল ব্যবধানের মধ্যে সাউথ সুবারবন স্কুলে অনুষ্ঠিত তার সম্বর্ধনার জন্য আয়োজিত বিরাট জন-সমাবেশ প্রমাণ করেছিল যে ঐ প্রবাদ বাক্যটি ঠিক নয়। কিন্তু আজ? আজ তার কী পরিবর্তন? আর সে পরিবর্তন কত দ্রুতই না ঘটে গেল? মনে হচ্ছে যেন একটা প্রবল ঘূর্ণিঝড় এসে স্থানীয় জন-মনের প্রবল উচ্ছ্বাসের উপর দিয়ে বয়ে গিয়ে সব কিছু ঝেড়ে পুছে ফেলে দিয়েছে। এমনভাবে তা ঝেড়ে দিয়েছে যে আগেকার দিনের আর কিছুই রইল না। এমন পরিবর্তন ঘটল যে পূর্বের জন্ মত কি রকম ছিল তা চিনবার কোন চিহ্নই আর থাকল না। গতকালের দেব-বিগ্রহ আজ দৈত্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। নির্মম ভাবে সে বিগ্রহকে ধূলায় দলিত করা হল, তার বিচক্ষণতা তার ধীশক্তি, তার জন সেবায় কীর্তি, সব কিছুই দেশের লোক হঠাৎ ভুলে গেল। ভুলে গেল যে তিনি একথা প্রমাণ করে দেখিয়েছেন যে প্রশাসনিক ক্ষেত্রে এ দেশের লোক যোগ্যতা প্রদর্শনে সক্ষম। সে সব কথাই আজ তাদের স্মৃতির পাতা থেকে মুছে ফেলা হয়েছে। তাই আজ দেখতে পাচ্ছি বেঙ্গল লেজিস্ লেটিভ কাউন্সিলের নির্বাচনে একজন স্বরাজিষ্ট পার্টির মনোনীত প্রার্থীর সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় তিনি হেরে গেলেন। এর কারণ কি? আপাত-দৃষ্টিতে এর একমাত্র কারণ হচ্ছে এই যে সম্প্রতি গঠিত নতুন বাংলা সরকারে তিনি একটি মন্ত্রীত্বের পদ গ্রহণ করেছিলেন।

স্বরাজিষ্টদের বিবেচনায় নতুন শাসন সংস্কারের সাফল্যের জন্য কাজ করা বা সরকারের সদস্য হওয়া একটা ক্ষমতার অযোগ্য অপরাধ। যুক্তি যুক্ততার দিক থেকে তাদের এই মনোভাবের বিচার করলে বলতে হয় যে তা হলে লেজিজ লেটিভ কাউন্সিলের মেম্বার হওয়াটাও অপরাধ। সেক্ষেত্রে হয়ত অপরাধের মাত্রাটা একটু কম হতে পারে। কিন্তু অপরাধ তো বটেই। কারণ, লেজিজ লেটিভ কাউন্সিল শাসন ব্যবস্থার একটি অংশ এবং সেই কারণেই লেজিজ লেটিভ কাউন্সিলের এক একজন সদস্য সেই সরকারেরই এক একটি অঙ্গ বিশেষ। কিন্তু যুক্তির বিচার, সাধারণ বিচার বুদ্ধি কিংবা স্বদেশের হিত সাধনে বাস্তব অবস্থার পর্য্যালোচনা—স্বরাজবাদে এসবের কোন মূল্য নেই। (চলবে)

● রবীন্দ্র সংখ্যা ৯ই মে প্রকাশিত হইবে। —সঃ বিঃ বাংলা

(contd. from 2nd cover)

Name	Address	Amount Rs.	with effect from
	CALCUTTA—contd.		
Niyogi Sailendra Mohan	4B Bondel Road, Calcutta—19	300	1 8 80
Roy Chowdhury Smt Bela	35. Adhar Chandra Das Lane	250	1 8 80
w/o Late Prafullamoy Roy Chowdhury	Cal—4		
Sengupta Satyendra Lal	6/1 Naktala Road, Calcutta—47	300	1 8 80
Sengupta Sukumar	Flat I : Block L/J, Kusthia,	300	1 8 80
	Housing Estate, Calcutta—39	300	1 8 80
Sil Ramani Mohan Bhowmik	1/84 Bijoygarh, Calcutta—32	300	1 8 80
	Dist—24 PARGANAS		
Acharya Monoranjan	79/5 Kalyangarh	300	1 8 80
Bera Hare Krishna	Vill Khejuri P. O. Bhagwanpur	300	1 8 80
Chakraborty Bankim Lal	Vill Haribarpur P. O. Nabapally (Basirhat)	300	1 8 80
Chakraborty Sudhir Kumar	Vill Bhabanipur P. O. Puratan Bongaon	300	1 8 80
Chatterjee Dwijendra Lal	South Santa Dighi P. O. Rahara	300	1 8 80
Ghosal Smt Asharani	Nasurda (Chanditola)	300	1 8 80
w/o Late Dhirendra Nath	P. O. New Barrackpore		
Goswami Kamal Krishna	c/o Pramatha Kumar Dutta Dinabandhunagar P. O. Bongaon	300	1 8 80
Guha Roy Smt Renuka w/o Late Amaresh Guha Roy	124, R. D. C. Road P. O, Naihati	200	1 8 80
Mukherjee Sushil Kumar	2, Mahajotinagar P.O. Agartala	300	1 8 80
		(Amount overdrawn to be recovered Rs. 100 monthly)	
Nandi Smt Suchama w/o Late Nripendra Nath	Amtapara P. O, Bongaon	200	1 8 80
Roy Monoranjan	P. O. Titagarh		
	Dist—HOOGHLY		
Ghosh Smt Gouri Bala w/o Late Radha Kanta	Vill Biraty P.O. Ambal Harikhola	250	1 8 80

Regd No. R. N. 24511/71 | Biplabi Bangla | Regd. WB/NC 77
Phone : 34-1795
বার্ষিক :—সডাক ১৫.০০ টাকা | ষাণ্মাসিক —৮.০০ টাকা | মূল্য—৩০ পয়সা

পাক সেনাপতি ইয়াহিয়া খানের জল্লাদবাহিনী যে গ্রন্থ পুড়িয়ে ছাই করে দিয়েছিল বিপ্লব তাপস মহারাজ ত্রৈলোক্যনাথের সেই অবিস্মরণীয় গ্রন্থ "জেল ত্রিশ বছর ও পাক ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম" পুনর্মুদ্রিত হল।

মূল্য—ত্রিশ টাকা

প্রাপ্তিস্থান
বাণী প্রতিষ্ঠান
১৫, কলেজ রো, কলিকাতা-৯

সম্পাদক—
শ্রীশান্তিস্বরূপ রায়চৌধুরী
॥ সম্পাদকমণ্ডলী ॥
শ্রীজগদীশ চট্টোপাধ্যায় (সভাপতি)
শ্রীভবেশচন্দ্র নন্দী
পুষ্প চাটার্জী
মলয় ঘোষ
প্রকাশক ও মুদ্রক—
শ্রীঅনিল সেনগুপ্ত
দিল্লীর বিশেষ প্রতিনিধি—
শ্রীবাণীন ঘোষ
বেহালা—
শ্রীনন্দগোপাল পাল

মূল কার্যালয়—৪নং বেন্টিঙ্ক ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০০৭ শ্রীঅনিল সেনগুপ্ত কর্তৃক প্রকাশিত এবং তৎকর্তৃক নিউ এজ প্রিন্টিং এসোসিয়েশন, ৩, হেমেন্দ্রচন্দ্র সেন ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০০৯ হইতে মুদ্রিত।

বিপ্লবী বাংলা

॥ বিপ্লবী পরিষদের সাপ্তাহিক মুখপত্র ॥

স্থাপিত—১৯৫৬, 'বিপ্লবী বাঙ্গালী' নবকলেবরে—১৯৭১

দশম বর্ষ	শনিবার ২৬শে বৈশাখ, ১৩৮৮ ৯ই মে ১৯৮১	২৮ সংখ্যা

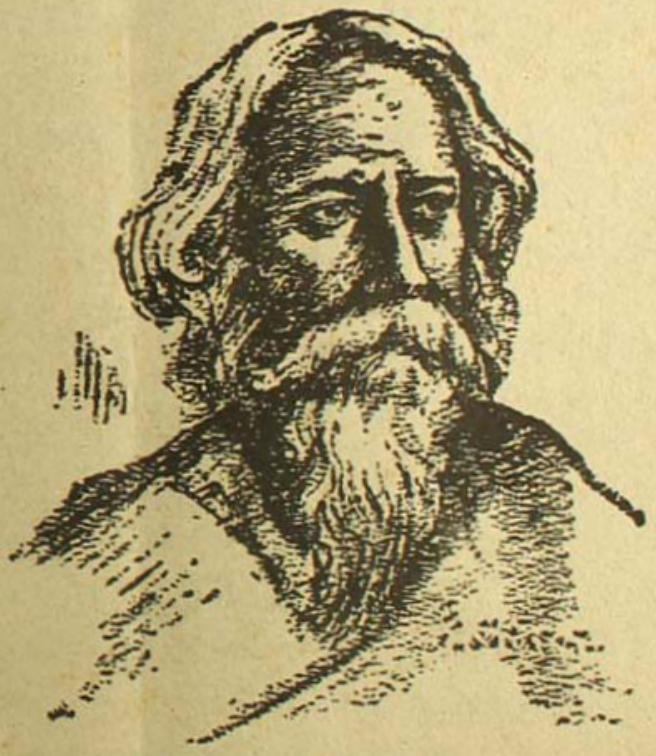

চির নবীনের দিল ডাক

পঁচিশে বৈশাখ

সম্পাদকীয়

রবীন্দ্রনাথ

মানব জাতির ইতিহাসে কখনও কখনও এমন এক আধজন মহামানব ধূলার ধরণিতে আবির্ভূত হন্ যাদের অবদানের ও মহত্ত্বের যথাযথ মূল্যায়ণ ও পরিমাপ করা সম্ভব হয় না। প্রকৃতপক্ষে কোন বিশেষ ভৌগলিক সীমানার অধিবাসী হলেও তারা কোন বিশেষ দেশের বা জাতির মানুষ বলে খ্যাত হন না। তারা প্রতিনিধিত্ব করেন সর্বদেশের সর্বকালের। এরা সমসাময়িক কালের, এমন কি, পরবর্তী কালের নিকটস্থ মানুষদের থেকেও এতই অগ্রবর্তী থাকেন, যে তাদের সম্যকভাবে উপলব্ধি করা সম্ভব হয় না। রবীন্দ্রনাথ ছিলেন মানব ইতিহাসে এমনই এক ব্যক্তিত্ব।

রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা সর্বতোমুখী ছিল যে সমগ্রভাবে তাকে প্রতিফলিত করা দুঃসাধ্য। রবীন্দ্রনাথ ছিলেন অনন্যসাধারণ কবি, বিশিষ্ট দার্শনিক, অকৃত্রিম মানব-প্রেমিক, বিশিষ্ট জাতীয়তাবাদী, তথা বিশ্ব প্রেমিক। বলা যায়, তিনি ছিলেন অতি দুর্লভ জাতের মানুষ। চারিদিকের পরিমাপে তৈরী নয়, তিনি ছিলেন শেওলার মধ্যে একটি বিশেষ শতদল পদ্ম।

রবীন্দ্রনাথকে তার জীবদ্দশায় স্বপ্নবিলাসী কবি মাত্র বলে অনেক নিন্দাভাজন হতে হয়েছে। কবি তিনি নিশ্চয়ই, কিন্তু তার চিন্তা ভাবনার রাজ্যে কখনও অন্যমনস্কতা ছিল না, ছিল দৃঢ় মনস্কতা। নিজের সম্বন্ধে যা তিনি বলেছেন সেটাই তার কবি চরিত্রের শ্রেষ্ঠ পরিচয়।

আমি পৃথিবীর কবি, যেথা তার যত ওঠে ধ্বনি,
আমার গানের সুরে, সাড়া তার জাগিবে তখনি।

চিন্তার রাজ্যে রবীন্দ্রনাথ ছিলেন অসীমের পথের যাত্রী, এ সত্য সন্দেহাতীত। কিন্তু সাধারণ মানুষের দুঃখ দুর্দশা তাঁর প্রাণে অনুরণিত হত সর্বক্ষণ। এই উচ্চতম শিখরে ও নিম্নতম ধরণী এর মধ্যে করার অভূতপূর্ব সামঞ্জস্য বিধান—এর তুলনা নেই বলিলেই চলে। আর তাঁর চরিত্রে এই সামঞ্জস্য ঘটেছিল বলে তাঁর পক্ষে যুগপৎ শান্তিনিকেতন ও শ্রীনিকেতন স্থাপন করা সম্ভব হয়েছিল। মানুষের মানসলোকে তাই শুধু তুরীয় চিন্তা ভাবনা জাগ্রত করার কাজেই নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখেন নি। দুর্দশা-গ্রস্ত, নিপীড়িত, অবহেলিত মানুষদের জাগতিক মুক্তির পথ খুঁজে বের করেছিলেন কতকাল আগে, হলকর্ষণ

বৃক্ষরোপণ, কুটির শিল্প, উন্নত ধরণের চাষবাসের পদ্ধতির প্রচলন করার মাধ্যমে। যে পথ আজ স্বাধীন ভারত আবিষ্কার করেছে এতদিন পরে, রবীন্দ্রনাথ এই দেশে তার অন্যতম প্রধান পথিকৃৎ ছিলেন।

রবীন্দ্রনাথ মানব দরদী ছিলেন বিশেষভাবে। পৃথিবীর যে কোন প্রান্তে যখনই মানুষের উপর অত্যাচার করা হয়েছে, তখনই তার লেখনী গর্জ্জন করে উঠেছে।

জালিয়ানওয়ালাবাগের অত্যাচারের বিরুদ্ধে তাঁর ক্ষোভ, তাঁর বলিষ্ঠ প্রতিবাদ তিনি ঘোষণা করেছিলেন নিজের নাইট খেতাব ছুড়ে ফেলে দিয়ে। পৃথিবী যখন হিংসায় উন্মত্ত, মানুষ যখন হতাশাগ্রস্ত, তখন তিনি বলিষ্ঠ কণ্ঠে আশার বাণী শুনিয়েছেন। তিনি বলেছিলেন,

.....মানুষের দেবতারে
ব্যঙ্গ করে যে অপদেবতা বর্বর মুখ বিকারে,
তারে হাস্য হেনে যাব, বলে যাব এই প্রহসনের
মধ্য অঙ্কে অকস্মাৎ হবে লোপ দুষ্ট স্বপনের।
বলে যাব দ্যুতচ্ছলে দানবের মূঢ় অপব্যয়,
গ্রন্থিতে পারে না কভু ইতিবৃত্তে শাশ্বত অধ্যায়।

ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামে তাঁর অবদান অবিস্মরণীয়। রবীন্দ্রনাথের লেখা ও কবিতা থেকে অনুপ্রেরণা লাভ করেছেন অগ্নিযুগের অগ্নিশিশুরা। তারা বহু স্বাধীনতা সংগ্রামীকে ক্রিয়াবান করে তুলেছেন চরিত্রের ক্রিয়া প্রভাবে। তাঁদের মনে সৃষ্টি করেছেন ইস্পাত কঠিন সঙ্কল্প, অমিত বল, আঘাত সহিষ্ণুতা ও মানব প্রেমে অবিচল বিশ্বাস। তাঁর কবিতা ও বাণী তাদের বহুলাংশে নৈতিকবলে বলীয়ান করেছিল, যার ফলে তারা জীবন তুচ্ছ করে পারের ভৃত্য করে, চিত্ত ভাবনাহীন করে অসীম দুঃখ কষ্ট হাসি মুখে সহ্য করেছিল এবং অকম্পিত চিত্তে ফাঁসির রজ্জু গলায় পরে শহীদ হতে পেরেছিল।

ভারতীয় সৃষ্টির ও ঐতিহ্যের যাকিছু মহৎ, যাকিছু সুন্দর, যা সত্যম্ এবং শিবম্, রবীন্দ্রনাথ ছিলেন তার জীবন্ত প্রতীক। কিন্তু এই সব সদ্‌গুণ তাঁকে অরণ্যবাসী মোক্ষকামী সন্ন্যাসী করে তোলে নি। মানুষের মধ্যে থেকেই মানুষের সেবাকেই তিনি ঈশ্বর সেবা বলে মনে করেছেন। স্বামীজীর কথায়, যাকে বলা হয়, জীবকে শিবজ্ঞানে সেবা করেছেন। এমন দুর্লভ চরিত্র জগতের ইতিহাসে কোটিতে একটিক মাত্র।

আদর্শ ভারতীয় হিসাবে রবীন্দ্রনাথ ছিলেন ঈশ্বর বিশ্বাসী। কিন্তু তাঁর ভগবৎ বিশ্বাস তাঁকে পৃথিবীর অন্যায় অবিচারকে ললাট লিখন বা অদৃষ্ট বলে মেনে নেননি। হিজলীর বন্দীশালায় যখন স্বাধীনতা সংগ্রামীদের উপর গুলি চালান হল এবং নিহত হলেন সন্তোষ মিত্র ও তারকেশ্বর সেন। তিনি অসুস্থ শরীরে প্রতিবাদ সভার পৌরহিত্য করেছিলেন। সোজাসুজি ভগবান্‌কে প্রশ্ন করেছিলেন,

তাই তো তোমায় শুধাই অশ্রুজলে,
যাহারা তোমার বিষাইছে বায়ু নিভাইছে তব আলো,
তুমি কি তাদের ক্ষমা করিয়াছ, তুমি কি বেসেছ ভালো

মানুষের মনে এই চিরন্তন প্রশ্ন তিনি তুলে ধরেছিলেন জগৎ সভায় নির্ভীক ভাবে।

রবীন্দ্রনাথের একশ একুশতম জন্মজয়ন্তী অতিক্রান্ত হওয়ার পরেও দুঃখের সঙ্গে একটা কথা মানুষের মনে জাগছে। তাঁকে ভোলাবার একটা রাজনৈতিক কৌশল প্রকাশ পাচ্ছে। কিন্তু তাঁর কথাতেই বলা যায়, "মধ্য অহে অকস্মাৎ হবে লোপ এই দুঃস্বপনের।" ভারতবর্ষের মানুষের জীবনে রবীন্দ্রনাথ এমন ভাবে জড়িয়ে আছেন যে রবীন্দ্রনাথকে বাদ দিয়ে প্রকৃত ভারতকে চেনা যায় না। রবীন্দ্রনাথ দেশ কালের উর্দ্ধে নিরবধি কালের কপোলতলে চিরভাস্বর হয়ে থাকবেন।

দেশের মানুষের তথা সমগ্র মানব জাতির উপর তাঁর দরদ, তাঁর শ্রদ্ধা কত গভীর ছিল, তার পরিচয় তিনি নিজেই প্রকাশ করে গিয়েছেন। কবি, দার্শনিক, সমাজসেবী, দেশপ্রেমিক বা তাঁর অসাধারণ গুণাবলীর জন্য কোন খ্যাতি চাননি। তিনি সকল মানুষের মধ্যে একজন এই পরিচয়কেই তিনি একান্তভাবে কামনা করেছিলেন। তাঁর কথাতেই বলি,

মোর নাম এই বলে খ্যাত হোক্,
আমি তোমাদেরই লোক—
আর কিছু নয়—
এই হোক মোর শেষ পরিচয়।

আজকের দিনে যখন পৃথিবীর ভাগ্যাকাশে দুর্যোগের ঘন মেঘ জমে উঠছে হিংসা ক্ষমতা মদমত্ততা দম্ভ, আসুরিক শক্তির প্রমত্ততা মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে মানবীয় মূল্যবোধ ও মানব প্রেমের অবক্ষয় ঘটছে, লিপ্সায় উন্মত্ত হয়ে কোন জাতি বিশ্ব থেকে যা কিছু মহান, যা কিছু সুন্দর এবং বহুযুগ ধরে সাধনালব্ধ সম্পদকে বিনষ্ট করতে উদ্যত, তখন রবীন্দ্রনাথের মত ব্যক্তিত্বের এবং পথ প্রদর্শকের অভাব আজ প্রবলভাবে অনুভূত হচ্ছে। প্রত্যাশা করল এটা ধ্বংসের প্রলয়ের সূচনা নয়। প্রত্যাশা করব এটা নতুনের জন্মের পূর্বেকার 'সৃজন-বেদন'। বিশ্বাস রাখব রবীন্দ্রনাথের আশ্বাসবাণীর উপর। হৃদয়ঙ্গম করব, কালের প্রয়াণ পথে।

আসে নির্দ্দয় নবযৌবন ভাঙ্গনের মহারবে

তাঁর এবারকার জন্মজয়ন্তীর দিনে আমরা অন্তরের গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করি। মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা করি তাঁকে আমরা ভুলি নাই, ভুলতে পারি না, ভুলব না। তাঁর প্রজ্বলিত পথে পরিক্রমা করে তাঁর নিকট আমাদের ঋণিগণ পরিশোধ করতে সচেষ্ট থাকব।

জয়তু রবীন্দ্রনাথ।

জাতীয় জাগরণে রবীন্দ্রনাথ

কালীপদ সরকার

আজ পঁচিশে বৈশাখ, কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের শুভ জন্মদিন, বঙ্গ মনীষার এক বিশ্ব জয়যাত্রার অধিবাস লগ্ন। একশত বিশ বছর আগে কলিকাতার মহর্ষি ভবনে এই দিনটিতে যে রবির উদয় হয়েছিল তাঁর কনকরশ্মি জাল কি ভাবে ভারত ভূমিকে উদ্ভাসিত করে, এক সময় দেশের সীমা অতিক্রম করে, বিশ্ব ভুবনে ছড়িয়ে পড়েছিল তা ভাবলে বিস্ময় জাগে। বাল্মীকি ব্যাস আমাদের নিকট পুরাণ পুরুষ এবং ধ্যান দৃষ্টি গোচর, রবীন্দ্রনাথ আমাদের অনেকের নিকট প্রত্যক্ষ প্রকাশ, স্বপ্ন ও বাস্তবে মেশানো এক অলোক সামান্য কল্প পুরুষ।

রবীন্দ্রনাথ শুধু বিশ্ব কবিই নন, একাধারে তিনি কবি, সাহিত্যিক, নাট্যকার চিত্রশিল্পী, অভিনেতা, গায়ক, শিক্ষক, সংগঠক এবং সমাজ চিন্তাবিদ। তিনি যে কি ছিলেন না সে কথাই বলা কঠিন। মানব হৃদয়ের এমন একটি ভাবতন্ত্রী নেই যেখানে কবির সম্মোহনী স্পর্শে সুরের ঝাঙ্কার বহে নি। অথচ প্রতিটি ক্ষেত্রেই রবীন্দ্রনাথ অনন্য প্রতিভা ও সাবল্যের স্বাক্ষর রেখেছেন। এমন বিস্ময়কর বহুমুখী প্রতিভার বিকাশ কোথাও দেখা যায় না। কবির জীবন ব্যাপী সাধনা—গানে, কবিতায়, কথায় এবং কর্মে বাঙ্গালী জাতির সংস্কৃতি চেতনার উৎস হয়ে থাকবে এবং মানব সমাজকে বহুকাল প্রভাবিত করবে।

রবীন্দ্রনাথের রচনা সম্ভার এত বিরাট এবং বিচিত্র যে বহু বছরের সযত্ন অনুশীলনেও তা আয়ত্ত করা প্রায় অসম্ভব। তবে তাঁর কাব্য ও সাহিত্যের মূল সুর মানবতাবাদ। সংসারকে অস্বীকার করে নয়, সংসারের অসংখ্যবন্ধন মাঝে কবির মুক্তি বাসনা মহানন্দময় অধ্যাত্ম উপলব্ধিতে উত্তরিত। কবি যে অমৃতত্বাদ পেয়েছেন তার পরম অনুভূতির পরশ তিনি ছন্দায়িত করে রেখে গেছেন তাঁর রচনায়।

দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে কবির অবদান কতটা ছিল তা নিয়েই আজকের আলোচনা। কবি ছিলেন সংগ্রামের ভাবদ্রষ্টা মন্ত্র ঋষি।

বিংশ শতকের আদিতে ছিল সংগ্রামের উদ্বোধন কাল। এই উদ্বোধন শুরু হয় শিবাজী-উৎসবকে কেন্দ্র করে, প্রথমে মহারাষ্ট্রে এবং পরে বাংলায়। রবীন্দ্রনাথ শিবাজী উৎসব উপলক্ষ্যে ১৩১১ সালে যে কবিতাটি রচনা করেন তাকে জাগরণী সঙ্গীত বলা যেতে পারে।

'হে রাজা শিবাজী,
তব ভাল উদ্ভাসিয়া এ ভাবনা তড়িৎ প্রভাবৎ
এসেছিল নামি—
'এক ধর্মরাজ্য পাশে খণ্ড ছিন্ন বিক্ষিপ্ত ভারত
বেঁধে দেব আমি।'
সেদিন শুনি নি কথা আজ মোরা তোমার আদেশ
শির পাতি লব
কণ্ঠে কণ্ঠে বক্ষে বক্ষে ভারতে মিলিবে সর্বদেশ
ধ্যান মন্ত্র তব।
ধ্বজা করি উড়াইব বৈরাগীর উত্তরী বসন
দরিদ্রের বল।

'এক ধর্মরাজ্য হবে এ ভারতে' এ মহাবচন
করিব সম্বল ॥

স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রারম্ভ কালে স্বাধীনতার আদর্শ কি ছিল শিবাজী মহারাজের বাণীর মাধ্যমে তার আভাস আছে কবিতাটিতে। এই সময় আর একটি দেশাত্মবোধক কবিতা 'বন্দী বীর' রচনা করেন রবীন্দ্রনাথ। কবিতার পটভূমি শিখ অভ্যুত্থান এবং শিখবীর বান্দার শহীদের ত্যাগবরণ।

'পঞ্চনদীর তীরে
বেণী পাকাইয়া শিরে
দেখিতে দেখিতে গুরুর মন্ত্রে জাগিয়া উঠেছে শিখ—
নির্মম নির্ভীক।
এসেছে সে একদিন
লক্ষ পরাণে শঙ্কা না জানে, না রাখে কাহারো ঋণ—
জীবন মৃত্যু পায়ের ভৃত্য, চিত্ত ভাবনাহীন।
পঞ্চনদের ঘিরি দশ তীর এসেছে সে একদিন ॥

গঙ্গাবতরণের সময় দীর্ঘ তপঃশুষ্ক ভগীরথ আগে শঙ্খ বাজিয়ে চলেছিলেন এবং তাঁর পিছনে গঙ্গার উচ্ছল জলরাশি দুর্দম বেগে 'কূল প্লাবিয়া দেশ ভাসাইয়া' কলুষ নাশে সাগর মুখে ছুটেছিল। রবীন্দ্রনাথ জাগরণী শঙ্খধ্বনি তুলেছেন নির্ভীক বাণীর ঝঙ্কারে, প্লাবনের সঙ্কেত জাগিয়েছেন ইতিবৃত্তের আবরণে।

তারপর এল সেই স্মরণীয় ১৯০৫ সালের ২৭শে অক্টোবর। বড়লাট কার্জন বঙ্গভঙ্গের আদেশ জারী করলেন। রবীন্দ্রনাথ সরকারী আদেশের প্রতিবাদ জানালেন—কালো দিনটিকে ঐক্য ও মৈত্রীর রাখী বন্ধন উৎসবে পরিণত করে। বঙ্গভঙ্গ রদের উদ্দেশ্যে যখন আন্দোলন শুরু হল, কবি নেমে এলেন রাজপথে, মিছিলের পুরোভাগে থেকে জনতার সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে স্বরচিত দেশপ্রেমমূলক গান গাইতে গাইতে শহর পরিক্রমা করলেন। স্বদেশী মেলা প্রতিষ্ঠা করে দেশী জিনিসের উৎপাদন ও ব্যবহার বাড়াবার কাজে উৎসাহ দিলেন। গাইলেন—

'আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালবাসি
চিরদিন তোমার আকাশ তোমার বাতাস
আমার প্রাণে বাজায় বাঁশী ॥'

'ও আমার দেশের মাটি, তোমার পরে ঠেকাই মাথা।
তোমাতে বিশ্বময়ীর, তোমাতে বিশ্বমায়ের আঁচল
পাতা ॥'

'এবার তোর মরা গাঙে বান এসেছে, 'জয় মা' বলে
ভাসা তরী।'

ক্রমে আন্দোলন শহর থেকে গ্রামে গঞ্জে ছড়িয়ে পড়ল। বিলেতী দ্রব্য বর্জন, স্বদেশী গ্রহণ এবং মুক্তিমন্ত্র সাধনা চলল অপ্রতিরোধ্য বেগে। আন্দোলন দমনে সরকার কঠোর নীতি গ্রহণ করল। মারাধের জেল, জরিমানা প্রভৃতি দণ্ড আরোপ করে সরকার আন্দোলন ভাঙতে তৎপর হল। রবীন্দ্রনাথ তখন তরুণদের মনে শক্তি ও সাহস সঞ্চারের উদ্দেশ্যে অনেকগুলি গান রচনা করলেন। গানগুলি স্থান ও কালের সীমা অতিক্রম করে চিরন্তন হয়ে আছে। যেমন—

'আমি ভয় করব না, ভয় করব না।
দুবেলা মরার আগে মরব না ভাই মরব না ॥
তরীখানি বাইতে গেলে মাঝে মাঝে তুফান মেলে
তাই বলে হাল ছেড়ে দিয়ে, কান্নাকাটি ধরব না।
বিপদ যদি এসে পড়ে সরব না, ঘরের কোণে
সরব না ॥

বঙ্গভঙ্গ রদের আন্দোলন কেমন করে জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের রূপ নিল, অথবা শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদ ও বিলেতী জিনিস বর্জন আন্দোলনের ব্যর্থতা একদল নির্ভীক তরুণকে কি ভাবে রুদ্রনীতি গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করল তার ঐতিহাসিক গুরুত্ব না বুঝলেন

বিদেশী ইংরাজ সরকার, না দেশের বহু নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি। কবি মানসে কিন্তু যুগ পরিবর্তনের সবুজ সংকেত এবং ভবিষ্যত ভারতের রূপরেখা ইতিমধ্যেই আঁকা শুরু হয়ে গেছে। এই সময় রবীন্দ্রনাথ স্বদেশ সম্পর্কে যে সকল কবিতা ও গান রচনা করেন তা যে কেবল রবীন্দ্র কাব্যের একটি শ্রেষ্ঠ অধ্যায় তাই নয়, ভারতীয় ঐতিহ্য ও আদর্শের জীবন্ত আলেখ্য। কবি এখানে ভাবীকালের ভারতের রূপকার।

১৯১০ সালে কবি রচনা করেন 'ভারততীর্থ' এবং 'ভারত ভাগ্য বিধাতা' সঙ্গীত। দুটিই কবির অমর সৃষ্টি।

'হে মোর চিত্ত পুণ্য তীর্থে জাগোরে ধীরে
এই ভারতের মহামানবের সাগর তীরে।'

অপরটি স্বাধীন ভারতের জাতীয় সঙ্গীত। ১৯১১ সালে কংগ্রেস অধিবেশনে গাওয়া হয়। গানটি সকলেরই জানা।

'জনগণমন অধিনায়ক জয় হে ভারত ভাগ্যবিধাতা।'

রবীন্দ্রনাথ বাংলার বিপ্লব আন্দোলন সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন এবং বিপ্লবীদের নির্ভীক আত্মদানের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানাতে কখনো কুণ্ঠাবোধ করেন নি। কবির অনেক গান বিপ্লবীদের দুঃসাধ্য সাধনার পথে গভীর আত্মিক শক্তি জুগিয়েছে এবং হতাশার অন্ধকারে আত্মবিশ্বাস জাগিয়েছে। যেমন—

'নিশিদিন ভরসা রাখিস, ওরে মন হবেই হবে।
যদি পণ করে থাকিস সে পণ তোমার হবেই হবে।
ওরে মন হবেই হবে।"

সঙ্গীরা ছেড়ে গেছে। আত্মীয় স্বজন সম্পর্ক কাটাতে চায়। বিপ্লবীর সামনে আঁধার পিছনেও আঁধার। ধ্যান দৃষ্টিতে বিপ্লবীর দেখা পেয়েছেন কবি। তিনি তাঁর হাতে হাত রেখে যেন বলছেন—

'তোর আপন জনে ছাড়বে তোরে
তা বলে ভাবনা করা চলবে না।
বন্ধ দুয়ার দেখলি বলে অমনি কি তুই আসবি চলে—
তোরে বারে বারে ঠেলতে হবে
হয়তো দুয়ার টলবে না।
তা বলে ভাবনা করা চলবে না।'

তারপর সেই গানটা—বিপ্লবীর একলা চলার গান—যে গানটি মহাত্মা গান্ধীর ছিল অতি প্রিয়।

'যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে
একলা চলো রে।
একলা চলো, একলা চলো, একলা চলো, একলা
চলো রে।'

রবীন্দ্রনাথ দেশকে ভালবেসেছেন। দেশের দীন দরিদ্র অনাথ আতুর নিগৃহীত অপমানিতদের বেদনা তাঁর লেখায় মূর্ত হয়ে উঠেছে। তিনি তাদের মৌন ম্লান মুক মুখে বিদ্রোহের ভাষা ফুটিয়ে তুলেছেন।

তিনি সবুজের অভিযানে নবীনদের শিকলদেবীর পূজাবেদি ভাঙ্গার ডাক দিয়েছেন এবং বিদ্রোহের অন্তরে আত্মবলিদানের অভয় মন্ত্র এঁকে দিয়েছেন।

বলো জয় বলো জয় বলো জয়
বলো নির্মম জ্যোতির জয় বলো ভাই।
হও মৃত্যু তোরণ উত্তীর্ণ,
যাক, যাক ভেঙ্গে যাক যাহা জীর্ণ।
চলো, অভয় অমৃত লোকে, অজর অশোকে,
বলো জয় বলো, জয় বলো জয়—
অমৃতের জয় বলো ভাই॥

কবি মৃত্যুকে অমৃতের মাধুরী মেশায়ে মোহনীয় করেছেন, জীবন মরণ তাঁর কাছে এক অখণ্ড অস্তিত্বের রূপান্তর ছাড়া আর কিছু নয়। মৃত্যু তাই অমৃত লোকে যাত্রা।

রবীন্দ্রনাথ কেবলমাত্র কাব্য-সাহিত্যের মাধ্যমে জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের পোষকতা করেছিলেন তাই

নয়, যখনই বিদেশী শাসকের অন্যায় কাজ জাতির আত্মমর্যাদায় আঘাত হেনেছে, কবি তাঁর শান্ত তপোবন থেকে বেরিয়ে এসে অন্যায়ের বিরুদ্ধে কঠোর প্রতিবাদ জানিয়েছেন।

জালিয়ানাবাগ হত্যাকাণ্ডের বিরুদ্ধে কবি ১৯১৯ সালের ৩০শে মে তাঁর রোষক্ষুব্ধ প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন 'স্যার' উপাধি সরকারকে ফিরিয়ে দিয়ে। ১৯৩১ সালে হিজলী জেলে রাজবন্দীদের ওপর গুলী চালনার বিরুদ্ধে কলিকাতায় সুভাষচন্দ্রের উদ্যোগে যে বিরাট প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয়, কবি-গুরু অসুস্থতা সত্ত্বেও সেই সভায় উপস্থিত হয়ে সরকারের বিরুদ্ধে দৃঢ় প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন, যার প্রতিধ্বনি ব্রিটিশ পার্লামেন্ট এবং পাশ্চাত্য জগতের অনেক দেশে উঠেছিল।

শেষ জীবনে রাজনৈতিক চিন্তাক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথকে সুভাষ অনুরাগী হতে দেখা যায়। সুভাষ চন্দ্রের মধ্যেই কবি তাঁর আদর্শ দেশনায়ককে বুঝি খুঁজে পেয়েছিলেন। তখনো কিন্তু সুভাষচন্দ্র নেতাজী রূপে তাঁর শিখর গৌরবে পৌঁছান নি। কবিগুরু ১৯৩৯ সালে সুভাষচন্দ্রকে শান্তিনিকেতনে আবাহন করে এক সুন্দর প্রশস্তিতে তাঁকে দেশনায়কের পদে বরণ করেন। প্রশস্তি পত্রখানি অমূল্য জাতীয় সম্পদ।

মহাজাতি সদনের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন কালে কবিগুরুকে সুভাষচন্দ্রের পাশে দেখি আর একবার। ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করে কবি বলেছিলেন—এখান থেকে এই প্রার্থনামন্ত্র যুগ যুগ উচ্চারিত হতে থাক—

'বাঙালির পণ বাঙালির আশা
বাঙালির কাজ বাঙালির ভাষা
সত্য হউক সত্য হউক, হে ভগবান।
বাঙালির প্রাণ বাঙালির মন
বাঙালির ঘরে যত ভাইবোন
এক হউক এক হউক এক হউক, হে ভগবান।'

এই হলেন আমাদের রবীন্দ্রনাথ, বঙ্গকবি, বিশ্বকবি, কবিগুরু। যারা রবীন্দ্রনাথকে বুর্জোয়া কবি, জাতীয় সংগ্রাম সম্পর্কে উদাসীন এবং কল্পনাবিলাসী অভিজাত বলে কবির প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনের ঔদ্ধত্য দেখান তারা ক্ষমার অযোগ্য এবং যারা মনে করেন যে, রবীন্দ্রনাথের স্বদেশ, সমাজ, শিক্ষা ও জাতীয় সংস্কৃতিমূলক চিন্তাধারা একান্তভাবে সময় সীমিত এবং তার প্রয়োজন কাল ফুরিয়ে গেছে তারা ভ্রান্ত, বিপথ চালিত। রবীন্দ্রনাথ ভবিষ্যৎ দ্রষ্টা ঋষি।

রবীন্দ্রনাথ বাঙ্গালী জাতির অপর অংশ বাঙ্গলাদেশেও অশেষ সম্মানের অধিকারী। রবীন্দ্রনাথের 'সোনার বাংলা' বাঙ্গলাদেশের জাতীয় সঙ্গীত। বিভেদ বিচ্ছিন্ন দুই বাংলার মাঝে রবীন্দ্রনাথই অক্ষয় মিলন সেতু এবং ভবিষ্যৎ ঐক্যের স্বপ্ন বিহারী। কবির উদ্দেশ্যে জানাই গভীর শ্রদ্ধা ও শত কোটি প্রণাম।

কবি-প্রণাম

সংক্ষিপ্ত

জীবন

পঞ্জী

ধরণীর তলে গগনের গায়
সাগরের জলে অরণ্য ছায়
আরেকটু খানি নবীন আভায়
রঙিন করিয়া দিব।
সংসার মাঝে দুয়েকটী সুর
রেখে দিয়ে যাব করিয়া মধুর
দুয়েকটি কাঁটা করি দিয়া দূর
তার পরে ছুটী নিব॥

কবি সকলের জীবনকে রঙিন করিয়াই ছুটি নিয়াছেন—আজ থেকে ৪০ বছর আগে ৭ই আগষ্ট ১৯৪১ সালে। (২২শে শ্রাবণ, ১৩৪৮)।

১৮৬১ সালে ৭ই মে মঙ্গলবার (২৫শে বৈশাখ, ১৩৬৮)—কবি কলকাতার জোড়াসাঁকো ঠাকুর-বাড়ীতে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের চতুর্দ্দশ সন্তান। মাতা সারদা দেবী।

১৮৬৩ সালে দেবেন্দ্রনাথ বোলপুর ভুবনডাঙ্গার কাছে ৩ একর জমি সংগ্রহ করেন—শান্তিনিকেতন এই জমিতেই প্রতিষ্ঠিত।

১৮৬৯-৭০—(বয়স ৮-৯) বালক রবীন্দ্রনাথ ওরিয়েন্টাল সেমিনারী ও পরে কলিকাতা নর্মাল স্কুলে ভর্ত্তি হন।

১৮৭১-৭২—(বয়স ৯-১০) বেঙ্গল একাডেমী (Angio Indian School)-তে ভর্ত্তি হন কিন্তু স্কুলে যাওয়া মোটেই পছন্দ করতেন না।

১৮৭৩—(বয়স ১২) পিতার সঙ্গে প্রথম শান্তি-নিকেতনে যান। ঐ বছরই পিতার সঙ্গে উত্তর ভারত ভ্রমণ করেন এবং অমৃতসর ও ডালহৌসীতে পিতার কাছে সংস্কৃত, ইংরাজী ও জ্যোতির্বিজ্ঞার প্রাথমিক পাঠ নেন।

১৮৭৪—(বয়স ১৩) কলকাতা প্রত্যাবর্ত্তনের পর St Xaviers School-এ ভর্ত্তি হন। এই সময় তিনি Macbeth এর বাংলা অনুবাদ করেন—পরে 'ভারতী'তে প্রকাশিত হয়।

১৮৭৫—(বয়স ১৪) কলকাতার বার্ষিক হিন্দু মেলাতে স্বরচিত দেশাত্মবোধক কবিতা পাঠ করেন।

৮ই মার্চ রবীন্দ্রনাথের মাতৃবিয়োগ হয়।

১৮৭৬ (বয়স ১৫) মাসিক পত্রিকা 'জ্ঞানাঙ্কুর' এ দীর্ঘ কবিতা 'বনফুল' প্রকাশিত হইতে থাকে।

১৮৭৭—(বয়স ১৬) দারুণ দুর্ভিক্ষের দিনে তদানিন্তন ভাইসরয় Lord Lynton এর দিল্লীর দরবারে জাঁকজমককে ব্যঙ্গ করিয়া হিন্দু মেলায় কবিতা পাঠ করেন। জোড়াসাকোর ঠাকুর বাড়ীতে 'অলীকবাবু' নাটকে 'অলীকবাবুর'র ভূমিকায় প্রথম যোগ দেন। দ্বিজেন্দ্রনাথ সম্পাদিত 'ভারতী' পত্রিকাতে ভানু সিংহ ঠাকুর ছদ্মনামে গল্প 'ভিখারিণী', কবিতা 'কবি কাহিনী' ও অন্যান্য নানা প্রবন্ধ প্রকাশ করিতে থাকেন।

১৮৭৮ (বয়স ১৭) অগ্রজ সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর এর কাছে আমেদাবাদ যান। এবং তাঁরই সঙ্গে মার্চ মাসে ইউরোপ যাত্রা করেন। Brighton এ School এ ভর্তি হন পরে University College, London এ prof. Henry Morlaya কাছে ইংরাজী সাহিত্যের পাঠ নেন।

১৮৮০—(বয়স ১৯) ভারতে প্রত্যাবর্তন করেন।

১৮৮১—(বয়স ২০) প্রথম গীতিনাট্য 'বাল্মীকি প্রতিভা' রচনা করেন। 'ভারতী'তে চীনে মরণের ব্যবসা নামে আফিং ব্যবসায়ীদের তীব্র আক্রমণ করেন। মেডিকেল কলেজের বক্তৃতা মঞ্চে প্রথম সঙ্গীত সম্বন্ধে বক্তৃতা দেন। সত্যপ্রসাদ গাঙ্গুলী ও আশুতোষ চৌধুরীর সঙ্গে দ্বিতীয়বার ইংলণ্ডে ব্যারিষ্টারি পরীক্ষার জন্য রওনা হন কিন্তু মাদ্রাজ হতেই ফিরে আসতে হয়।

পিতার সঙ্গে দেখা করবার জন্য মুসৌরী যান। 'সন্ধ্যা সঙ্গীত এই সময় রচনা করেন। 'ভারতী'তে বৌ-ঠাকুরাণীর হাট' প্রকাশিত হতে থাকে।

১৮৮২—(বয়স ২১) গীতিনাট্য 'কাল মৃগয়া' রচনা করেন। এই সময় তিনি ৯০, সদর ষ্ট্রীটে বাস করতেন। এই বাড়ীতেই তিনি তার বিখ্যাত কবিতা 'নির্ঝরের স্বপ্ন ভঙ্গ' রচনা করেন। অগ্রজ জ্যোতিরিন্দ্রনাথের 'বারত্বক সমাজ' প্রতিষ্ঠার কাজে বিশেষ সহায়তা করেন।

১৮৮৩—(বয়স ২২) বোম্বাই এর কারওয়ারে কিছুদিন বাস করেন। 'ভারতী'তে প্রকৃতির প্রতিশোধ প্রকাশিত হয়। মৃণালিনী দেবীর সঙ্গে বিবাহ (৯ই ডিসেম্বর)।

১৮৮৪—(বয়স ২৩) আদি ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদকের পদে ব্রতী হন। ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী রচনা করেন।

১৮৮৫—(বয়স ২৪) 'মুকুট' রাজর্ষি এবং অন্যান্য বহু গান, প্রবন্ধ রচিত হয়। অগ্রজ সত্যেন্দ্রনাথের সঙ্গে শোলাপুর ও বান্দ্রায় কিছুকাল বাস করেন।

১৮৮৬—(বয়স ২৫) ডিসেম্বর মাসে দাদাভাই নওরোজীর সভাপতিত্বে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের দ্বিতীয় অধিবেশন কলকাতায় অনুষ্ঠিত হয়। রবীন্দ্রনাথ এই অধিবেশনে স্বরচিত উদ্বোধনী সঙ্গীত (আমরা মিলেছি আজ মায়ের ডাকে ঘরের হয়ে পরের মতন ভাই ছেড়ে ভাই কদিন থাকে)।

১৮৮৭—(বয়স ২৬) মানসী, চিঠিপত্র, আলস্য ও সাহিত্য, ও অন্যান্য রচনা প্রকাশিত হয়।

১৮৮৮—(বয়স ২৭) জ্যেষ্ঠপুত্র রথীন্দ্রনাথের জন্ম, 'মায়ার খেলা' প্রকাশিত হয়।

১৮৮৯—(বয়স ২৮) 'রাজা ও রাণী' রচিত হয়।

১৮৯০—(বয়স ২৯) 'বিসর্জন' নাটক রচিত হয় —রঘুপতির ভূমিকায় ঠাকুরবাড়ীতে অভিনয় করেন। Tagore Estate এর দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং কিছুদিন শিলাইদহ বাস করেন। অগ্রজ সত্যেন্দ্রনাথ

ও লোকেন পালিতের সঙ্গে দ্বিতীয়বার বিদেশ ভ্রমণে যান—ইটালী, ফ্রান্স ও ইংলণ্ড। দ্বিতীয় কন্যা রেণুকার জন্ম।

১৮৯১—(বয়স ৩০) ইয়োরোপ যাত্রীর ডায়েরী প্রকাশিত হয়—'সাধনা' মাসিক পত্র প্রকাশ করেন।

১৮৯২—(বয়স ৩১) 'চিত্রাঙ্গদা' ও 'সোনার তরী' রচিত হয়। মাতৃভাষায় শিক্ষার যুক্তিপূর্ণ প্রবন্ধ শিক্ষার হের ফের সাধনায় প্রকাশিত হয়। তৃতীয় ও কনিষ্ঠা মীরার জন্ম।

১৮৯৩—(বয়স ৩২) বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে চৈতন্য লাইব্রেরীতে ইংরাজ ও ভারত-বাসী প্রবন্ধ পাঠ করেন।

১৮৯৫—(বয়স ৩৪) ক্ষুদিত পাষাণ।

১৮৯৬—(বয়স ৩৫) চিত্রা, নদী, জীবন দেবতা, মানিনী।

১৮৯৭—(বয়স ৩৬) নাটোরে বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলনে যোগ দেন। ইংরাজী ভাষার পরিবর্তে বাংলা ভাষায় সম্মেলনের কাজ চালানোর চেষ্টায় ব্যর্থ হন।

বৈকুণ্ঠের খাতা, গান্ধারীর আবেদন, সতী, নরক বাস, রচিত হয়।

১৮৯৮ - (বয়স ৩৭) কারমাটারে (সাঁওতাল পরগণা) বায়ু পরিবর্তনে যান। ভারতী সম্পাদনার ভার নেন। New Sedition Act 1898 এর বিরুদ্ধে কলকাতা টাউন হলে প্রতিবাদ সভায় কণ্ঠরোধ রচনার মাধ্যমে তীব্র আক্রমণ করেন।

বাল গঙ্গাধর তিলকের গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে একাধিক প্রবন্ধ লেখেন ও তিলকের মামলা পরি-চালনার অর্থ সংগ্রহ করেন। লক্ষ্মীর পরীক্ষা রচনা করেন।

১৮৯৯—(বয়স ৩৮) কলকাতায় প্লেগ মহামারী রূপে দেখা দেয়—ভগিনী নিবেদিতার সহযোগিতা করেন। চাকায় বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলনে যোগ দেন এবং রে: কালীচরণ ব্যানার্জীর ইংরাজী ভাষণের বাংলা অনুবাদ করেন।

১৯০০—(বয়স ৩৯) কণিকা, কথা, চিরকুমার সভা রচিত হয়।

১৯০১—(বয়স ৪০) বঙ্কিমচন্দ্রের 'বঙ্গ দর্শন পুনঃ প্রকাশ করেন। 'চোখের বালী' প্রকাশিত হতে থাকে। নৈবেদ্য এই সময়ই লিখিত হয়। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ নৈবেদ্যর কবিতায় বিশেষ সন্তোষ প্রকাশ করেন এবং ছাপাইবার ব্যয় বহন করেন।

সপরিবারে শান্তিনিকেতনে বাস করিবার জন্য আসেন। ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম স্কুল উদ্বোধন করেন এবং নিজে শিক্ষকতা সুরু করেন এবং ছাত্রদের সকল কর্মে সাহচর্য্য দেন। এই স্কুলের প্রথম শিক্ষকগণের মধ্যে জগদানন্দ রায়, William Lawrence, রেওরা চাঁদ, পণ্ডিত শিবধন বিদ্যার্ণব প্রমুখ উল্লেখযোগ্য। পরে ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়, হরিচরণ ব্যানার্জী ও কবি সতীশচন্দ্র রায় যোগ দেন।

১৯০২—(বয়স ৪১) অত্যন্ত আর্থিক অনটনে পুরীর বাড়ী বিক্রয় করে দেন এবং শ্রী মৃণালিনী দেবীও তার স্বর্ণালঙ্কার বিক্রয় করে ঋণ ও অন্যান্য দেনা শোধ করেন।

কলকাতা ইউনিভারসিটির convocation-এ Lord Curgon কর্তৃক প্রাচ্য দেশীয়দের সম্বন্ধে কটূক্তির প্রতিবাদ বঙ্গদর্শনে প্রকাশ করেন।

২৩শে নভেম্বর শ্রীমৃণালিনী দেবীর মৃত্যু হয়।

১৯০৩—(বয়স ৪২) বঙ্গদর্শনে, নৌকাডুবি, প্রকাশ হইতে থাকে।

১৯০৪(বয়স ৪০) গঠনমূলক জাতীয়তাবাদ, গ্রাম সংগঠন এবং নানা রাজনৈতিক প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হয়।

কলকাতা টাউন হলে 'শিবাজি উৎসব' বিখ্যাত কবিতা পাঠ করেন।

১৯০৫—(বয়স ৪৪) মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের দেহত্যাগ (19 January 1905/৬ই মাঘ; ১৩৯১)। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা দ্বিজেন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে বাস করতে আসেন। মাসিক পত্রিকা "ভাণ্ডার" প্রকাশ করেন। অর্থ-নৈতিক ও রাজনৈতিক প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হতে থাকে। ত্রিপুরা রাজের আমন্ত্রণে আগরতলা যান— New Bengal School of Art এর সংগঠনে Count okakura ও ভগিনী নিবেদিতাকে সক্রিয় সাহায্য দেন।

১৯০৫—(বয়স ৪৪) Lord Curgon বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন, রাখী বন্ধন. উৎসব পালনে বিরাট শোভাযাত্রার নেতৃত্ব করেন। কলকাতা টাউন হলে বিশাল জনসভায় ভাষণ দেন। এই উপলক্ষে তিনি একাধিক গান রচনা করেন—

বিধির বিধান কাটবে তুমি এমন শক্তিমান
তুমি কি এমনি শক্তিমান
আমাদের ভাঙ্গা গড়া তোমার হাতে এমন অভিমান
তোমাদের এমনি অভিমান।
চিরদিন টানবে পিছে—চিরদিন রাখবে নীচে
এত বল নাইক তোমার সবে না সেই টান॥
শাসনে যতই বড় আছে বল দুর্বলেরও
হওনা যতই বড়ো আছেন ভগবান।
আমাদের শক্তি মেরে তোরাও বাঁচবি নারে
বোঝা তোর ভারী হলেই ডুববে তরীখান॥

রাখী বন্ধনের আর একটি বিখ্যাত গান—

বাংলার মাটী বাংলার জল
বাংলার বায়ু, বাংলার ফল
পূণ্য হউক, পূণ্য হউক, পূণ্য হউক হে ভগবান
বাংলার ঘর, বাংলার হাট
বাংলার বন, বাংলার মাঠ
পূর্ণ হউক, পূর্ণ হউক, পূর্ণ হউক হে ভগবান॥
বাঙালীর পণ, বাঙালীর আশা
বাঙালীর কাজ, বাঙালীর ভাষা
সত্য হউক, সত্য হউক; সত্য হউক হে ভগবান।
বাঙালীর প্রাণ, বাঙালীর মন
বাঙালীর ঘরে যত ভাইবোন
এক হউক, এক হউক, এক হউক হে ভগবান॥

ইংরেজ সরকার ছাত্রদের "বন্দেমাতরম্" সঙ্গীত নিষিদ্ধ করে দেন। বহু জনসভায় রবীন্দ্রনাথ এর প্রতিবাদ করেন।

১৯০৭ (বয়স ৪৬) প্রবাসীতে গোরা উপন্যাস প্রকাশিত হতে শুরু হয়। বোমার মামলায় অভিযুক্ত অরবিন্দের উদ্দেশ্যে লেখেন—

অরবিন্দ, রবীন্দ্রের লহ নমস্কার।
হে বন্ধু, হে দেশবন্ধু স্বদেশ আত্মার
বাণী মূর্তি তুমি। তোমা লাগি নহে মান,
নহে ধন, নহে সুখ, কোনো ক্ষুদ্র দান
চাহ নাই কোন ক্ষুদ্র কৃপা, ভিক্ষা লাগি
বাড়াওনি আতুর অঞ্জলি। আছ জাগি
পরিপূর্ণতার তরে সর্ববাধাহীন।

●

দেবতার দীপ হস্তে যে আসিল ভবে
সেই দূত, বলো, কোন রাজা কবে
পারে শাস্তি দিতে। বন্ধন শৃংখল তার
চরণ বন্দনা করি করে নমস্কার।

●

দুঃখ কিছু নয়
ক্ষত মিথ্যা, ক্ষতি মিথ্যা, মিথ্যা সর্বভয়।
কোথা মিথ্যা রাজা, কোথা রাজদণ্ড তার
কোথা মৃত্যু, অন্যায়ের কোথা অত্যাচার।
ওরে ভীরু, ওরে মূঢ়, তোল তোল শির
আমি আছি, তুমি আছ, সত্য আছে স্থির।
জনগণমন-অধিনায়ক জয় হে ভারতভাগ্যবিধাতা
পাঞ্জাব সিন্ধু গুজরাট মারাঠা দ্রাবিড় উৎকল বঙ্গ
বিন্ধ্য হিমাচল যমুনা গঙ্গা উচ্ছল জলধি তরঙ্গ
তব শুভ নামে জাগে
তব শুভ আশিষ মাগে
গাহে তব জয় গাথা।

১৯০৮—(বয়স ৪৭) পাবনায় বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন। 'পথ ও পাথেয়' প্রবন্ধে তিনি মানিকতলার বোমার কারখানা, মুজাফ্ফরপুরের বোমা বিস্ফোরণ, বারীণ ঘোষ ও অন্যান্যদের গ্রেপ্তার সম্বন্ধে আলোচনা করেন। ইংরাজের অমানুষিক অত্যাচারেই আদর্শবাদী বাঙালী যুবক হিংসার পথ অনুসরণ করতে বাধ্য হচ্ছে।

১৯০৯ – বয়স ৪৮) প্রায়শ্চিত্ত, শব্দতত্ত্ব, 'ধর্ম'। 'তপোবন' শান্তিনিকেতন আশ্রম বিদ্যালয়ের আদর্শ ব্যাখ্যা। গোরা, রাজা, শান্তিনিকেতন, গীতাঞ্জলী ও প্রবাসীতে জীবনস্মৃতি প্রকাশিত হয়।

১৯১১—(বয়স ৫০) জাতীয় কংগ্রেসে 'জনগণমন অধিনায়ক জয় হে' গানটী গীত হয়। এই প্রসিদ্ধ গানটী রবীন্দ্রনাথ প্রথমে ব্রাহ্ম সমাজে মাঘোৎসবে গান।

জনগণমঙ্গলদায়ক জয় হে ভারতভাগ্যবিধাতা।
জয় হে, জয় হে জয় হে, জয় জয় জয় জয় হে।
অহরহ তব আহ্বান প্রচারিত, শুনি তব উদার বাণী
হিন্দু বৌদ্ধ শিখ জৈন পারসিক মুসলমান খৃষ্টানী
পূরব পশ্চিম আসে. তব সিংহাসন পাশে,
প্রেমহার হয় গাঁথা।
জনগণ ঐক্য বিধায়ক জয় হে, ভারতভাগ্যবিধাতা।
জয় হে, জয় হে, জয় হে, জয় জয় জয়, জয় হে।
পতন-অভ্যুদয়-বন্ধুর পন্থা—যুগ যুগ ধাবিত যাত্রী
হে চির সারথি, তব রথ চক্রে মুখরিত পথ দিনরাত্রি
দারুন বিপ্লব মাঝে তব শঙ্খধ্বনি বাজে
সংকট দুঃখ ত্রাতা।
জনগণ পথ পরিচায়ক জয় হে ভারতভাগ্যবিধাতা।
ঘোর তিমির ঘন নিবিড় নিশীথে পীড়িত মূর্চ্ছিত দেশে
জাগ্রত ছিল তব অবিচল মঙ্গল নত নয়নে অনিমেষে।
দুঃস্বপ্নে-আতঙ্কে রক্ষা করিলে অঙ্কে
স্নেহময়ী তুমি মাতা।
জনগণ দুঃখত্রায়ক জয় হে ভারতভাগ্যবিধাতা।
জয় হে, জয় হে, জয় হে, জয় জয় জয়, জয় হে।
রাত্রি প্রভাতিল, উদিল রবিচ্ছবি পূর্ব-উদয়গিরিভালে
গাহে বিহঙ্গম. পুণ্য সমীরণ নব জীবন রস ঢালে।
তব করুণারুণ রাগে নিদ্রিত ভারত জাগে
তব চরণে নত মাথা।
জয় হে, জয় হে, জয় রাজেশ্বর ভারতভাগ্যবিধাতা।
জয় হে, জয় হে, জয় হে, জয় জয় জয়, জয় হে।

১৯১২— (বয়স ৫১) বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ বিরাট সম্বর্ধনা জানায়। ২৭ মে পুত্র রথীন্দ্রনাথ ও পুত্রবধূ প্রতিমাদেবীকে সঙ্গে নিয়ে তৃতীয়বার বিদেশ যাত্রা করেন। তাঁর কিছু কবিতা ইংরাজীতে তর্জমা করে Rothenstein কে দেখান। পরে W. B. Yeats বিদ্বজ্জন সমক্ষে পাঠ করেন। C. F. Andrews এর সঙ্গে এই সভাতেই পরিচয় হয়। এই কবিতাগুচ্ছই 'গীতাঞ্জলী' নামে প্রকাশিত হয়

এবং বিশেষ ভাবে সমাদৃত হয়।

১৯১৩— (বয়স ৫২) ১৩ই নভেম্বর সাহিত্যে Noble prize এর কথা ঘোষিত হয়। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় পূর্ব্ব সঙ্কল্পিত D, Litt উপাধি প্রদান করেন।

১৯১৪—(বয়স ৫৩) ২৯শে জানুয়ারী বাংলার গভর্ণর Lord Carmichael বিশেষ সম্বর্দ্ধনা সভায় Noble prize ও পদক প্রদান করেন। W. W. Person শান্তিনিকেতনে আসেন। প্রমথ চৌধুরী সম্পাদিত 'সবুজ পত্রে' অজস্র গান, কবিতা প্রবন্ধ রচনা করেন। এলাহাবাদ অবস্থান কালে বিখ্যাত 'শা-জাহান' কবিতা লেখেন।

১৯১৫—(বয়স ৫৪) গান্ধীজী প্রতিষ্ঠিত Transval-এর Phoenix School-এর ছাত্র শিক্ষকগণ শান্তিনিকেতনে আসেন। গান্ধীজী ও শ্রীমতী কস্তুরী বাঈ শান্তিনিকেতনে আসেন এবং রবীন্দ্রনাথ তাঁদের বিশেষ সভায় সম্বর্দ্ধিত করেন। ওরা জুন ভারত সম্রাট তাঁকে Knighthood প্রদান করেন।

'ঘরে বাইরে', 'চতুরঙ্গ', 'ফাল্গুনী' 'বলাকা' রচনা করেন। বাংলা ভাষাই শিক্ষার মাধ্যম হওয়া উচিত এই মর্মে তিনি রামমোহন লাইব্রেরী হলে "শিক্ষার বাহন" নামক প্রবন্ধ পাঠ করেন।

১৯১৬—(বয়স ৫৫) C. F. Andrews, Pearson ও মুকুল দে-কে সঙ্গে লইয়া জাপান ভ্রমনে যান। জাপানে Tokyo ও Keio Gijiku বিশ্ববিদ্যালয়ে ভাষণ প্রসঙ্গে জাপানের চীনের উপর আগ্রাসী নীতির নিন্দা করেন। পরে আমেরিকার ভ্রমণে Yale University ও অন্যান্য শহরে অনেক বক্তৃতা দেন। পুনরায় তিনি জাপান হইয়া দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

১৯১৭— (বয়স ৫৬) সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ আচার্য্য ব্রজেন শীলের সভাপতিত্বে বিশেষ সম্বর্দ্ধনা জানান। অ্যানি বেসান্টের গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে 'কর্তার ইচ্ছায় কর্ম' প্রবন্ধটি জনসভায় পাঠ করেন। সেই সভাতেই তিনি স্বরচিত গানটি করেন—

দেশ দেশ নন্দিত করি মন্দ্রিত তব ভেরী
আসিল যত বীর বৃন্দ আসন তব ঘেরি।
দিন আগত ওই, ভারত তবু কই?
সেকি রহিল লুপ্ত আজি সব জন পশ্চাতে?
লউক বিশ্বকর্ম্মভার মিলি সবাকার সাথে
প্রেরণ কর ভৈরব তব দুঃসহ আহ্বান হে
জাগ্রত ভগবান হে॥

বিঘ্ন বিপদ দুঃখ দহন তুচ্ছ করিল যারা
মৃত্যু গহন পার হইলো, টুটিল মোহ কারা।
দিন আগত ওই, ভারত তবু কই?
নিশ্চল নির্ব্বীর্য্য বাহু কলঙ্কহীন
ব্যর্থ শক্তি নিরানন্দ জীবনধন হীন
প্রাণ দাও, প্রাণ দাও, দাও দাও প্রাণ হে
জাগ্রত ভগবান হে!

নূতন যুগ সূর্য উঠিল, ছুটিল তিমির রাত্রি
তব মন্দির অঙ্গন ভরি মিলিল সকল যাত্রি।
দিন আগত ওই, ভারত তবু কই?
গত গৌরব ভ্রষ্ট আসন, নত মস্তক লাজে—
গ্লানি তার মোচন করো নরসমাজ মাঝে।
স্থান দাও, স্থান দাও, দাও দাও স্থান হে
জাগ্রত ভগবান হে॥

১৯১৯ (বয়স ৫৮) দক্ষিণভারত ভ্রমণে যান।

১৩ই এপ্রিল জালিয়ানবালবাগের হত্যাকাণ্ডে কবি বিচলিত হইয়া অসুস্থ শরীরে কলকাতায় আসেন এবং বিক্ষোভ সভার আয়োজন করেন।

এই হত্যার প্রতিবাদে তিনি Knightood ত্যাগ করেন। ৩০শে মে ভাইসরয়কে লেখেন।

'The very least that I can do for my countryis to take all conseqnences upon myself in giving voice to the protest of the millions of my countrymen, surprised into a dumb anguish of terror. The time has come when badges of honour make our shame glaring in the iucongnoys context of humilation, and I for my hart wish to stand, shorn of all special distinctions, by the side of those of my countrymen who for then so called insignificance are liable to suffer degradation not fit for human beings.'

১৯২০ (বয়স ৫৯) উত্তর ভারত ভ্রমণে যান। গান্ধীজীর সবরমতি আশ্রমে একদিন বাস করেন। পঞ্চমবার বিদেশ যাত্রা করেন। ইউরোপের বিভিন্ন দেশ ভ্রমণ করেন—পরে আমেরিকায় যান। Rome in Rolland, Bergson, Sylvian Levy প্রমুখ মনীষীদের সাহচর্যে আসেন। আমেরিকা একাধিক বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা দেন।

১৯২১ (.বয়স ৬০) গান্ধীজী জোড়াসাঁকোর বাড়ীতে নিভৃতে অসহযোগ আন্দোলন সম্বন্ধে আলোচনা করেন।

২২শে ডিসেম্বর আচার্য্য ব্রজেন্দ্র শীল আনুষ্ঠানিক ভাবে বিশ্বভারতী উদ্বোধন করেন। শান্তিনিকেতনের সকল সম্পত্তি 'বিশ্বভারতী'র নামে দান (trust deed) করিয়া দেন।

১৯২২ (বয়স ৬১) দক্ষিণ ভারত ও সিংহল পরিভ্রমণ, 'শিশু ভোলানাথ' সুতধারণ, লিপিকা প্রকাশ।

১৯২৩ (বয়স ৬২) 'রক্ত করবী' প্রকাশিত হয়। বিশ্বভারতীকে প্রথমত দান। পশ্চিম ভারত পরিভ্রমণ।

১৯২৪ (বয়স ৬৩) চীন ভ্রমণে যান এবং পথে জাপান হয়ে দেশে প্রত্যাবর্তন করেন। চীনের সর্বত্র তিনি বিপুলভাবে সম্বর্ধিত হন।

১৯২৫ (বয়স ৬৪) দক্ষিণ আমেরিকা ও অন্যান্য দেশ ভ্রমণে যান। গান্ধীজীর শান্তিনিকেতনে আগমন। দেশবন্ধুর মৃত্যুতে কবি মর্মাহত হয়ে লেখেন।

'এনেছিলে সাথে করে মৃত্যুহীন প্রাণ
মরণে তাহাই তুমি করে গেলে দান ॥'

১৯২৬ (বয়স ৬৫) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আমন্ত্রণে ঢাকায় যান। পরে কুমিল্লায় অভয় আশ্রমের বার্ষিক সম্মেলনে যোগ দেন। ত্রিপুরা রাজের আমন্ত্রণে আগরতলা হয়ে কলকাতায় ফেরেন। ইতালির আমন্ত্রণে অষ্টমবার বিদেশ যাত্রা। মুসোলিনী কর্তৃক রাজকীয় সম্বর্ধনা।

১৯২৭ (বয়স ৬৫) রোমাঁ রোঁলার আমন্ত্রণে সুইজারল্যাণ্ড গমন। ফ্যাসিষ্ট সরকারের পক্ষিকর লাভ এবং প্রতিবাদে ম্যাঞ্চেষ্টার গার্ডিয়ানে পত্র প্রেরণ। অষ্ট্রিয়া ও ইংলণ্ড হইয়া নরওয়ে ও সুইডেন যাত্রা। নরওয়ে রাজার অভ্যর্থনা। ডেনমার্ক হইয়া জার্মানী আগমন এবং ভারতীয় দর্শন সম্বন্ধে বক্তৃতা। চেকোস্লোভাকিয়া, যুগোস্লোভিয়া

হাঙ্গেরী, যুগোস্লাবিয়া, রুমানিয়া, গ্রীস ও মিশর হয়ে ৭ মাস পরে দেশে প্রত্যাবর্তন।

'লেখন,' 'বৈকালী', 'নারীর পূজা'. 'চিরকুমার সভা', 'শোধবোধ'।

১৯২৭ (বয়স ৬৬) ভরতপুর, আগ্রা, জয়পুর ও আমেদাবাদ ভ্রমণ। শিলংএ 'যোগাযোগ' উপন্যাসের সূচনা। 'নটরাজ', 'মৃত্যুঞ্জয়'। নবমবার বিদেশযাত্রা। মালয়, বালী, জাভা, শ্যামদেশ হয়ে প্রত্যাবর্তন। বসুমতিতে শেষ রচনা

১৯২৮ (বয়স ৬৭) পণ্ডিচেরীতে শ্রীঅরবিন্দের সঙ্গে সাক্ষাৎ। সিংহল ও বাঙ্গালোর ভ্রমণ। 'শেষের কবিতা' রচনা।

১৯২৯ (বয়স ৬৮) কানাডার আমন্ত্রণে দশমবার বিদেশ যাত্রা। জাপান হয়ে ভ্যানকুভারে বক্তৃতা। যুক্তরাষ্ট্রের নানা শহরে বক্তৃতা। জাপান ও ইন্দো-চীন হয়ে প্রত্যাবর্তন। তপতী, মহুয়া।

১৯৩০ (বয়স ৬৯) পুনরায় বিদেশ ভ্রমণ। রাশিয়া হয়ে ইংলণ্ডে অক্সফোর্ড হিউবার্ট লেকচার— পরে জার্মানীতে আইনষ্টাইনের সঙ্গে সাক্ষাৎকার। ডেনমার্ক হয়ে রাশিয়ার বিপুল সম্বর্ধনা।

১৯৩১ (বয়স ৭০) হিজলীর বন্দী শিবিরে গুলি বর্ষণের প্রতিবাদে ১লা অক্টোবর জনসভায় বক্তৃতা। প্রশ্ন কবিতা রচনা।

ভগবান, তুমি যুগে যুগে দূত পাঠায়েছ বারে বারে
দয়াহীন সংসারে—
তারা বলে গেল 'ক্ষমা করো সবে,
বলে গেল 'ভালবাস'—
অন্তর হ'তে বিদ্বেষ বিষ নাশো।'
বরণীয় তারা, স্মরণীয় তারা, তবুও বাহির দ্বারে
আজি দুর্দ্দিনে ফিরানু তাদের ব্যর্থ নমস্কারে॥
আমি যে দেখেছি, গোপন হিংসা কপট রাত্রি ছায়ে
হেনেছে নিঃসহায়ে।
আমি যে দেখেছি, প্রতিকারহীন শক্তির অপরাধে,
বিচারের বাণী নীরবে নিভৃতে কাঁদে।
আমি যে দেখিনু, তরুণ বালক উন্মাদ হ'য়ে ছুটে
কি যন্ত্রণায় মরেছে পাথরে নিষ্ফল মাথা কুটে।
রুদ্ধ আমার রুদ্ধ আজিকে. বাঁশী সংগীত হারা,
অমাবস্যার কারা।
লুপ্ত করেছে আমার ভুবন দুঃস্বপনের তলে।
তাই তো তোমায় শুধাই অশ্রুজলে—
যাহারা তোমার বিষাইছে বায়ু নিভাইছে তব আলো,
তুমি কি তাদের ক্ষমা করিয়াছ, তুমি কি বেসেছ ভালো?

রাশিয়ার চিঠি. বঙ্গবাণী, সহজ পাঠ।

১৯৩২ (বয়স ৭১) গান্ধীজির কারাদণ্ড, বৃটিশ মন্ত্রীকে প্রতিবাদ জ্ঞাপন। আমন্ত্রিত হয়ে পারস্যে গমন। রেজা শা পহলবী ও পারস্যবাসীর বিপুল সম্বর্ধনা। ইরাক হয়ে দেশে প্রত্যাবর্তন। মদন মোহন মালব্যের শান্তিনিকেতন আগমন।

১৯৩৩ (বয়স ৭২) কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বিভিন্ন উপলক্ষে বক্তৃতা। রামমোহন মৃত্যু শত-বার্ষিক অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব।

দুই বোন বিচিত্রিতা. চণ্ডালিকা, তাসের দেশ. বাঁশরী।

১৯৩৪ (বয়স ৭৩) জহরলাল নেহেরু শান্তি-নিকেতনের ছাত্রছাত্রীদের সিংহল ও দক্ষিণভারত পরিক্রমা।

১৯৩৫ (বয়স ৭৪) কাশীহিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় সমাবর্তনে ভাষণ এবং ডি, লিট উপাধী লাভ। জাপানী কবি নোগুচির শান্তিনিকেতন আগমন।

১৯৩৬—(বয়স ৭৫) অর্থ সংগ্রহে উত্তর ভারত যাত্রা। গান্ধীজির সাহায্যে ৬০,০০০ টাকাসংগ্রহ।

সাম্প্রদায়িক বাটোয়ারের প্রতিবাদে বক্তৃতা।

পত্রপুট, ছন্দ, শ্যামলী সাহিত্যের পথে, জাপানে পারস্যে পাশ্চাত্য ভ্রমণ।

১৯৩৭—(বয়স ৭৬) কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তনে সর্ব্বপ্রথম বাংলায় অভিভাষণ। শান্তিনিকেতনে চীনা ভবনের উদ্বোধন।

১৯৩৮—(বয়স ৭৭) এনড রুজ কর্তৃক হিন্দি ভবনের ভিত্তি স্থাপন। গান্ধীজীর সঙ্গে সাক্ষাৎ।

১৯৩৯—(বয়স ৭৮) ২৯ জানুয়ারী জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি সুভাষচন্দ্রের শান্তিনিকেতনে আগমন। ১৯ এ আগষ্ট মহাজাতি সদনের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন।

১৯৪০—(বয়স ৭৯) ১৭ই ফেব্রুয়ারি গান্ধীজীও কস্তুরবাই আশ্রমে আগমন।

১৯৪১—(বয়স ৮০) ৯ই বৈশাখ তারিখের শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথের অশীতম বর্ষপূর্তী উৎসব। জন্মদিনের ভাষণে 'সভ্যতার সঙ্কট' লেডি রাণবোনের খোলা চিঠির উত্তরে রোগ শয্যা হতে বিবৃতি। ৩০শে জুলাই অন্ত্রপ্রচারের পূর্বে মুখে মুখে সর্বশেষ রচনা 'তোমার সৃষ্টির পথ রেখেছ আকীর্ণ করি'।

৭ই আগষ্ট ১৯৪১ (২২শে শ্রাবণ ১৩৪৮) রাখী পূর্ণিমার দিন বেলা বারোটার কিছু পরে ৮০ বৎসর ৩ মাস বয়সে জোড়াসাঁকোর পৈতৃক বাড়ীতে দেহত্যাগ।

প্রতাপ যখন চেঁচিয়ে করে
দুঃখ দেবার বড়াই,
জেনো মনে তখন তাহার
বিধির সঙ্গে লড়াই।
দুঃখ সহার তপস্যাতেই
হোক বাঙালীর জয়,
ভয়কে যারা মানে তারাই
জাগিয়ে রাখে ভয়,
মৃত্যুকে যে এড়িয়ে চলে
মৃত্যু তারেই টানে,
মৃত্যু যারা বুক পেতে লয়
বাঁচতে তারাই জানে।

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

রবীন্দ্রনাথের স্বাদেশিকতা

বংশীধর বন্দ্যোপাধ্যায়

রবীন্দ্রনাথ একাধারে বিশ্ববরেণ্য কবি-সাহিত্যিক ও জাতীয় শিক্ষাগুরু ছিলেন। তিনি জাতীয়তাবাদের পাদপীঠতলে দৃঢ়তার সাথে দণ্ডায়মান থেকে আন্তর্জাতিকতার সুউচ্চশীর্ষ উত্তরণে সক্ষম হয়েছিলেন, তাঁর নিজস্ব চিন্তাধারায় মানবিকতাবাদকে আশ্রয় করে। স্বাদেশিক রবীন্দ্রনাথ স্বীয় অসামান্য প্রতিভা ও চারিত্রিক সৎ-গুণের মাধ্যমে সারা বিশ্বকে একান্তভাবে আপনজন করে নিতে কুণ্ঠিত হন নি।

তাঁরই হাতে গড়া শান্তিনিকেতন বিশ্বের বহুজ্ঞানী ও গুণীজনকে আকৃষ্ট করেছিল তাঁর বিশ্বজনীন আবেদনের ফলে। শান্তিনিকেতন প্রকৃত অর্থেই বিশ্বভারতীতে রূপান্তরিত হয়েছিল তাঁর জীবদ্দশাতেই। এই বিশ্বভারতীকে সুন্দর ও সুচারুরূপে গড়ে তুলতে তিনি স্বীয় শ্রম ও স্বকীয় অর্থ দান করেছিলেন অজস্রভাবে। তাঁর রচিত পুস্তকের রয়ালটির প্রায় সমুদয় অর্থ-ই তিনি বিশ্বভারতীর তহবিলে দান করেছিলেন, সারা বিশ্বের জ্ঞান-বিজ্ঞানের ও শিল্প কলার পঠন-পাঠন এবং অনুশীলনের জন্য। তিনি তাঁর যুগের বিশ্ববিখ্যাত মণিষীদের পরামর্শ ও সাহচর্য্যে বিশ্বভারতীকে বিশ্ববিদ্যালয়ের মর্য্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়েছিলেন, যদিও একাজে তাঁকে প্রচুর কষ্ট স্বীকার করতে হয়।

সি, এফ এণ্ড্রুজ, পিয়ারসন প্রমুখ ইংরেজরা বিশ্বকবির অত্যন্ত কাছের মানুষ হিসাবে শান্তিনিকেতনে আসেন ও তথায় অবস্থান করেন। ভারতের জাতীয় আন্দোলনে অহিংসবাদি নেতা মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী শান্তিনিকেতনের কর্মকাণ্ড দেখতে গিয়ে মুগ্ধ বিস্ময়ে রবীন্দ্রনাথকে গুরুদেব বলে সম্বোধন করেন, আর গান্ধীজীর মতবাদ ও কর্ম প্রচেষ্টায় আস্থাশীল হয়ে কবি শ্রদ্ধাভরে গান্ধীজীকে সম্বোধন করেন 'মহাত্মন্' বলে। পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথ গান্ধীজির সম্বন্ধে তাঁর প্রকৃত মনোভাব ব্যক্ত করতে গিয়ে বলেন :—

'এতদিনে আমার আকাঙ্খিত পুরুষের আবির্ভাব সম্ভব হয়েছে, আমি তাঁর (গান্ধীজীর) পদপ্রান্তে বসে, তাঁর উপদেশ মত কর্মে ব্রতী হতে প্রস্তুত'। রবীন্দ্রনাথ নিজেকে রাজনীতির মধ্যে কোনদিনই জড়িত করতে চান নি, আর গান্ধীজিও তাঁর গুরুদেবকে সক্রিয় রাজনীতিতে টেনে আনেন নি। গান্ধীজি জানতেন যে জাতীয় কবির প্রয়োজন এক জন দক্ষ রাজনীতিবিদের চেয়ে অনেক বেশী মূল্যবান।

রবীন্দ্রনাথ কিন্তু মানুষের বিপদের দিনে বা মনুষ্যত্বের অবমাননার দিনে কারো নিজে বা কারো পিছে পড়ে থাকেন নি কখনো। তাই ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের পুরো ভাগে তাঁকে দেখতে পেয়ে সবাই বড় প্রীত হন। রবীন্দ্রনাথই সেদিন নিজে হাতে সর্বপ্রথম অপর প্রতিবেশীদের হাতে রাখি বেঁধে দেন। সারা বাংলার অরন্ধনের ব্যবস্থায় তিনিও সায় দেন ও স্বরচিত গান—

'বাংলার মাটি, বাংলার জল।
বাংলার বায়ু, বাংলার ফল।
পুণ্য হউক, পুণ্য হউক হে ভগবান॥
বাংলার ঘরে যত ভাইবোন,
এক হউক, এক হউক হে ভগবান। ইত্যাদি

গাইতে গাইতে তিনিও নগর পরিক্রমা করেন সর্বসাধারণের সঙ্গে। স্বাদেশিক চিন্তায় ও কর্মে

সেদিন রবীন্দ্রনাথকে আমরা দেখতে পাই একান্ত আপনজনের মত অত্যন্ত নিকটের মানুষ হিসাবে। দেশের ও দেশবাসীর কল্যাণের চিন্তায় তিনি সতত নিমগ্ন থাকতেন, যদিও বইয়ে থেকে তা বোঝা অত্যন্ত দুঃসাধ্য ব্যাপার ছিল। আবার ১৯১৯ সালে ইংরাজ রাজশক্তি যখন জেনারেল ওডায়ারের নেতৃত্বে নিরস্ত্র ভারতবাসীর ওপর ঝাঁকে ঝাঁকে মেসিনগান থেকে গুলি বর্ষণ করে জালিয়ানওয়ালা বাগের প্রান্তরে ও তার ফলে বহুনারী শিশু ও বয়স্করা মৃত্যুবরণ করতে বাধ্য হয়, তখন সেই পৈশাচিক হত্যালীলার প্রতিবাদে রবীন্দ্রনাথ ইংরাজ রাজের দেওয়া 'নাইট' উপাধি ও কে. সি, আই, ই, উপাধি বর্জন করেন মনুষ্যত্বের দারুণ অবমাননার কারণেই। এর পর আর কোনদিনই তিনি ইংরাজের উপাধিই ব্যবহার করেন নি।

স্বাদেশিক রবীন্দ্রনাথ স্বদেশ ও সাহিত্য নামে যে প্রবন্ধের বই রচনা করেন তা বিশ্ববাসীর কাছে রবীন্দ্র নাথের স্বদেশ চিন্তা যে গভীর ও কত বাস্তববাদী ছিল তা সহজেই বোধগম্য হয়। পরবর্তীকালে তাঁর রচিত 'মুক্তধারা' নাটকে ধনঞ্জয় বৈরাগীর কণ্ঠে যে গীত শুনা যায় তা অহিংস সত্যাগ্রহী নির্ভীক গান্ধীজির চিন্তাধারা ও কর্মপ্রচেষ্টার কথা বলেই জনমনে আন্দোলন সৃষ্টি করে। ধনঞ্জয় বৈরাগী গেয়েছিল :—

'আমি মারের সাগর পাড়ি দেব বিষম ঝড়ের বায়ে
আমার ভয়-ভাঙ্গা এই নায়ে।
মাভৈঃ বাণীর ভরসা নিয়ে
ছেঁড়া পালে বুক ফুলিয়ে.....ইত্যাদি।

জাতীয় আন্দোলনে গান্ধীজির ভূমিকায় যে অভয়মন্ত্রের সুর ধ্বনিত হয়েছিল যে অহিংসার এবং সত্যাগ্রহের আদর্শে দেশবাসী উদ্বুদ্ধ হয়েছিল তা ঐ ধনঞ্জয় বৈরাগীর কল্পিত চরিত্রে ও ভয়হীন ভাষণের মধ্য দিয়ে রবীন্দ্রনাথ এক অনবদ্য নাটক রচনা করেন গান্ধীজির প্রতি তাঁর অগাধ বিশ্বাস ও শ্রদ্ধাকে রূপ-দানের মানসে। 'মুক্তধারায়' রবীন্দ্রনাথ সৃষ্ট ধনঞ্জয় বৈরাগী যেন স্বয়ং গান্ধীজি, যিনি নিজে অহিংস ও সত্যাশ্রয়ী বলেই রাজভয়ে বা রাজ অত্যাচারে কখনই ভীত নন, বরং তিনি সকলপ্রকার ভয় যথা রাজভয়, লোকভয়, মৃত্যুভয় ইত্যাদি সবারই উর্দ্ধে।

গান্ধীজিকে চাক্ষুষে না দেখলে বা তাঁর নির্ভীক দেশকর্মের সঙ্গে বাস্তব পরিচয় না থাকলে ধনঞ্জয় বৈরাগীর চরিত্র চিত্রন সম্ভব হতো না। গান্ধীজির প্রেরণার ও আদর্শবাদের প্রতিরূপ হচ্ছে নাটকের ধনঞ্জয় বৈরাগীর চরিত্র। রবীন্দ্রনাথের স্বদেশপ্রীতির আরো বহু নিদর্শন তাঁর বিভিন্ন রচনায় পাওয়া যায়। 'গোরা' উপন্যাসে রবীন্দ্রনাথ গোরার মুখ দিয়ে ব্যক্ত করেছেন :—

'গোরা কহিলেন, মা, তুমিই আমার মা! খুঁজে বেড়াচ্ছিলুম, তিনিই আমার ঘরের মধ্যে এসে বসেছিলেন। তোমার জাত নেই, ঘৃণা নেই—শুধু তুমি কেবল কল্যাণের প্রতিমা। তুমিই আমার ভারতবর্ষ।'

রবীন্দ্রনাথের জন্ম ও বৃদ্ধি স্বাদেশিক আবহাওয়ায়, ফলে তাঁর তের বছর বয়স কাল থেকে শেষদিন আশিতে এসেও তিনি স্বদেশচিন্তা ছাড়তে পারেননি, কারণ তাঁর রক্তে স্বাদেশিক ছিল তার চিন্তায় ও তাঁর মননে সব সময়েই স্বদেশ স্বজাতির কল্যাণ ভাবনায় তিনি বিভোর থাকতেন। রবীন্দ্রনাথও গান্ধীজির মতই স্বরাজের স্বপ্ন দেখতেন। রবীন্দ্রনাথ কামনা করতেন সর্বমানবের কল্যাণ, তাই তিনি বিশ্বরাষ্ট্রের পক্ষপাতি ছিলেন। তাঁর কল্পিত বিশ্বরাষ্ট্রে জাতি

ধর্ম নির্বিশেষে যাতে প্রতিটি মানুষ সত্যনিষ্ঠ, অহিংস, ধার্মিক, স্বকর্মনিষ্ঠ, সমদর্শী ও পরস্পর নির্ভরশীল হয়—এটাই তিনি আশা করতেন; যদিও তাঁর বিচারশীল মন এরূপ চিন্তায় মাঝে মাঝে ছেদ সৃষ্টি করতো, ফলে তিনি বাধা পেতেন।

চিন্তার জগতেই তাঁর বিচরণ ছিল, বাস্তবতার কঠিন সংঘাতেই তিনি সচকিত হয়ে উঠতেন মাঝে মাঝে। ইতিহাসের রূপও যেকালের নিয়মে পরি-পরিবর্তিত হচ্ছে সে সম্বন্ধে তিনি যথেষ্ট সজাগ ও সচেতন ছিলেন, ফলে সনাতন প্রথা ও বিধি নিষেধের গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ থাকা তাঁর পক্ষে কোনদিনই সম্ভব হয় নি। প্রকৃতির পট পরিবর্তনের সাথে সাথেই এসেছে নূতন কাল, নূতন সমাজ, নূতন সবকিছু, তাই সেই নূতনকে বরণ করতে কবি মন উল্লসিত আবেগে আত্মহারা হয় ক্ষণকাল। পরক্ষণেই তিনি গেয়ে ওঠেন : হে নূতন দেখা দাও—ইত্যাদি। রবীন্দ্রনাথ তাঁর স্বদেশ ভারতকে সমুখ সন্ধানী দৃষ্টিতে দেখে ছিলেন, তাই বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য স্থাপনে সিদ্ধহস্ত ভারতীয় আদি সভ্যতার স্বরূপ উপলব্ধি করেছিলেন তিনি নিষ্ঠার সঙ্গে।

প্রাচীন ভারত তার ভাব ও সংস্কৃতি বিনিময় করেছিল অপরাপর দেশের সঙ্গে, তাই কবিও চেয়ে-ছিলেন যে ভবিষ্যতে ভারতেও যেন সেইরূপ একই পথ অনুসরণ করে অর্থাৎ 'দিবে আর নিবে মিলাবে যাবেনা ফিরে। এই ভারতের মহামানবের মিলিবে সাগর তীরে।' রবীন্দ্র চিন্তায় এটাই ছিল স্বাভাবিক ব্যাপার। রবীন্দ্রনাথ সব সময়েই যুক্তিবাদী সিদ্ধান্ত নিয়ে এগিয়ে চলতে ভালবাসতেন তাঁর পূর্বসূরী রাজা রামমোহনের মতই। তাঁর ধর্মও ছিল তাই 'সবার ওপরে মানুষ সত্য', ফলে তিনি প্রকৃত স্বাদেশিক ও যথার্থ আন্তর্জাতিক তথা বিশ্ব নাগরিক হতে পেরে-ছিলেন একই সাথে এবং এখানেই তাঁর নিজস্ব বৈশিষ্ট্য বা বিশ্বের মনীষিদের শ্রদ্ধা ও ভালবাসা আকর্ষণ করেছিল।

রবীন্দ্রনাথ মধ্যযুগীয় ইউরোপ নম্রতায় ব্যথিত হলেও আধুনিক ইউরোপের মহত্ত্বকে স্বীকার করে নেন, আর বর্তমান ইউরোপ তাঁকে সমযোগ্যতায় চিনেছিল, গ্রহণ করেছিল ও রবীন্দ্র ভাবনার উদার-তায় মুগ্ধ হয়ে তাঁরই মাধ্যমে চিরায়ত ভারতীয় বিশুদ্ধ সত্যকে জেনেছিল পরম কৌতূহল ভরে। পাশ্চাত্যের যা কিছু ভাল তা তিনি গ্রহণ করতে কুণ্ঠাবোধ করেন নি, আবার পাশ্চাত্যের মনীষিরাও তাঁর মত ভারতের যা কিছু ভাল তা তিনি গ্রহন করে ধন্য হয়েছিলেন। তাই বিশ্বকবি সার্থক ডাক দিতে পেরেছিলেন এই লিখে যে, পূরব পশ্চিম আসে ইত্যাদি।

একেই বলে সর্বমানবিক সমন্বয় বা বিশ্ব সংহতি যা বর্তমানে হিংসায় উন্মত্ত পৃথিবীতে একান্ত দরকার আনবিক অস্ত্রগুলির ধ্বংস সাধনে ও মানব সভ্যতার ক্রম বিকাশকে নিশ্চিন্ত করণে।

ইংরাজ জাতিকে রবীন্দ্রনাথ দেখেছিলেন দুভাবে, এক সাধারণ ইংরাজ, যারা ছিল শাসন ও শোষণে পটু ও সংকীর্ণমনা। আর অন্য এক ইংরাজ যারা সর্বমানবের কল্যাণ চিন্তায় সদাব্যস্ত ও উদার চরি-ত্রের। ইংরাজি ভাষা ও সাহিত্যকে রবীন্দ্রনাথ পরম আদরে একান্তভাবে গ্রহণীয় বলে বিশ্বাস করেন। বর্তমান যুগেও সমৃদ্ধ ইংরাজি ভাষা ও সাহিত্যকে অপাংক্তেয় বা বয়কট করে বেদে-বিশ্ব-জ্ঞান বিজ্ঞানের ভাণ্ডারের চাবিকাঠি জলে ফেলে দেবার মূর্খামি তিনি কল্পনা করতেও পারেন নি। বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ ভাষা-গুলির অন্যতম ইংরাজি ভাষা, তাই রবীন্দ্রনাথ ইংরাজি ভাষা তাঁর বাল্যকাল থেকেই পড়তে শুরু

করেন ও তাঁর শেষ জীবনেও তিনি শেলী, কীটস, বায়রণ, ওয়ার্ড-ওয়ার্থ, টেনিসন, মিলটন, বার্ণাডস, বারটাণ্ডরাসেল প্রভৃতি ইংরাজ কবি ও সাহিত্যিকদের লেখা মূল পুস্তক সঙ্গে সঙ্গে রাখতেন ও অবসর বিনোদনের জন্য বেশ গভীর মনোনিবেশ সহকারে ঐ পুস্তকগুলি পড়তেন। ইংরাজী ভাষা ও সাহিত্যের উপর তাঁর বিশেষ অনুরাগ পরিকল্পিত হয়। তিনি গীতাঞ্জলি ইংরাজীতে অনুবাদ করেছিলেন নিজেই।

শিক্ষক রবীন্দ্রনাথ অতি অল্প বয়সেই ইংরাজি ভাষা শিক্ষা শুরু করেন তাঁর গৃহশিক্ষক রাখাল দাস দত্ত মহাশয়ের কাছে। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের তৎকালীন হিসাবের খাতায় দেখতে পাওয়া যাবে যে, শিশু রবি তার সাত বছরের পাঁচ মাস বয়স কাল থেকেই উক্ত রাখাল বাবুর কাছে প্রথমে ইংরাজি পাঠাভ্যাস আরম্ভ করে। পরে তার ৭ (সাত) বছর ৯ (নয়) মাস ২৯ (উনত্রিশ) দিন বয়সের সময়ে অঘোরবাবু কড় জল মাখায় করে প্রতি সন্ধ্যায় শিশু রবীন্দ্রনাথকে পড়াতে আসতেন ইংরাজি ভাষা। বাল্যকাল থেকে ইংরাজি ভাষা শিক্ষার ফলেই রবীন্দ্র নাথ ইংরাজি ভাষা ও সাহিত্যে বুৎপত্তি লাভ করেন এবং ভবিষ্যৎকালে সেই ইংরাজি জ্ঞানের জন্যই গীতাঞ্জলির ইংরাজি অনুবাদ তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়। গীতাঞ্জলির সঠিক ইংরাজী অনুবাদ কবির পক্ষেই সহজ হয় এবং নোবেল পুরস্কার বিজয়ী হন তিনি অনায়াসেই। রবীন্দ্রনাথ মাতৃভাষাকে শিক্ষার বাহন করার পক্ষপাতি ছিলেন সত্যই, তবে তার মানে এই নয় যে এদেশের শিশুরা বাল্যকাল থেকে ইংরাজি ভাষা একেবারেই শিখবে না।

তাঁর যুগে ইতিহাস, ভূগোল, দর্শন, প্রাণীবিদ্যা, উদ্ভিদ বিদ্যা, রসায়ণ, জ্যামিতি, অঙ্কশাস্ত্র প্রভৃতি নানা জ্ঞান-বিজ্ঞানের বই ইংরাজী ভাষায় ছেলেরা পড়তে বাধ্য হতো এবং সেকারণ ঐ সব জ্ঞান-বিজ্ঞান বিদেশী ভাষায় শেখাবার ব্যবস্থা থাকায় তিনি ঐ গুলিকে বাংলাভাষায় বা যার যার মাতৃভাষায় পঠন-পাঠনের ব্যবস্থা করার মহৎ উদ্দেশ্য নিয়েই মাতৃ-ভাষাকে শিক্ষার বাহন করতে উদ্যোগী হয়েছিলেন। ইংরাজী ভাষার জ্ঞান যে ছেলেমেয়েদের বাল্যকাল থেকেই প্রয়োজন তা তিনি স্বীকার করতেন এবং সেকারণেই পুত্র রবীন্দ্রনাথকে ইংরাজি ভাষা উত্তম-রূপে শেখাবার জন্য ইংরাজ লরেন্স সাহেবকে শিলাই-দহে নিয়োগ করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ দশ-এগার বছর বয়স থেকেই লরেন্স সাহেবের কাছে ইংরাজী পড়া শুরু করেন স্বীয় পিতার ইচ্ছানুসারে, কারণ তাঁর পিতা ইংরাজী ভাষার বিশ্বজনীনতা স্বীকার করতেন।

রবীন্দ্রনাথ প্রগাঢ় ভাবে ইংরাজী ভাষার অনুরাগী ছিলেন। তাঁর ধারণা ছিল যে, তাঁর নিজের ইংরাজী ভাষায় সুগভীর জ্ঞান থাকার জন্যই বিশ্বপরিক্রমায় ও বিশ্বসাহিত্যচর্চায় কোনদিনই তিনি কোন অসুবিধা বোধ করেন নি। রবীন্দ্রনাথের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, যে কোনও ভারতীয় ইংরাজী ভাষা ভালভাবে না জানলে বিশ্বের জ্ঞান-বিজ্ঞান ও উচ্চাঙ্গের সাহিত্যের ভাণ্ডার থেকে প্রয়োজনীয় রত্নরাজি আহরণে ব্যর্থ হবে। ইংরাজীভাষার উৎকর্ষতা ও সার্বজনীনতা সারা বিশ্বে তাকে এক বিশেষ মর্যাদার আসনে প্রতি-ষ্ঠিত করেছিল। সেকারণ ইংরাজীভাষা অতি যত্নের ও ধৈর্য্যের সহিত বাল্যকাল থেকেই এদেশীয় প্রত্যেক মানুষের শিক্ষা করা অত্যাবশ্যক যদি জীবনে প্রতি-ষ্ঠিত জ্ঞানী বলে বিশ্বের দরবারে পরিচয় দেবার আকাঙ্খা থাকে তার।

(এর পর ২৪ পৃঃ)

জন্মদিন

"শুনি তাই আজি
মানুষ-জন্তুর হুহুংকার দিকে দিকে উঠে বাজি।
তবু যেন হেসে যাই যেমন হেসেছি বারে বারে
পণ্ডিতের মূঢ়তায়, ধনীর দৈন্যের অত্যাচারে,
সজ্জিতের রূপের বিদ্রূপে। মানুষের দেবতারে
ব্যঙ্গ করে যে অপদেবতা বর্ব্বর মুখবিকারে
তারে হাস্য হেনে যাব। বলে যাব-এ প্রহসনের
মধ্য-অংকে অকস্মাৎ হবে লোপ দুষ্ট স্বপনের ;
নাট্যের কবর-রূপে বাকি শুধু রবে ভস্মরাশি
দগ্ধদেশ মশালের, আর অদৃষ্টের অট্টহাসি
বলে যাব, দ্যূতচ্ছলে দানবের মূঢ় অপব্যয়
গ্রন্থিতে পারে না কভু ইতিবৃত্তে শাশ্বত অধ্যায়।"

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

কবিগুরু

—হলয় ঘোষ

তুমি কি কেবলই ছবি ?
ফ্রেমে বাঁধা কাঁচের আড়াল !
শুধু বছর বছর ফিরে আসা, মাল্যশোভা !
বিশ্লেষণে, বিশ্লেষণে, সুচারু বাক্যবিন্যাসে
ক্লান্তির মশাল জ্বেলে ফেরা !
তুমি কি কেবলই সেই পঁচিশে
আর বাইশের অনুবর্তন,
বৈশাখের ঝড় আর শ্রাবণের অঝোর বর্ষণ !

তবে কেন সাড়া পাই প্রতিটি দুর্দিনে ?
শুধু দিনযাপনের, শুধু প্রাণধারণের গ্লানি
যখন দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর করে
আমার অদৃষ্ট ক্ষণ,
যখন নিরাশ্বাসে ফিরে আসি ক্লান্ত অবেলায়
নিজেকেই প্রশ্ন ক'রি গূঢ় অভিমানে
"বেঁচে থাকা এতো কি দরকার-ই !"
তোমার অলখ দৃষ্টি জ্বেলে দেয় আশ্বাসের আলো,
রক্তের কল্লোলে বাজে আনন্দ-ভৈরবী
'এখনো কোথাও আছে বিশ্বাসের নদী !

হে বৃদ্ধ পিতামহ,
ভেঙে দাও অলীক পঞ্জর,
খুলে যাক্ বন্ধ দুয়ার,
শতবর্ষ পার হ'য়ে তোমার অমৃত কর
আশীর্বাদে জন্ম দিক্
নতুন বাংলার।

বিশ্বকবির অবিস্মরণীয় চিঠি

'নাইট' উপাধি ত্যাগ ক'রে ভাইসরয়কে লেখা

[ভারতে ইংরেজ শাসনের সব থেকে কলঙ্কময় ঘটনা হ'ল জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ড ও পাঞ্জাবে সামরিক শাসনের প্রবর্তন। ১৯১৯ সালের ১৩ই এপ্রিল তারিখে, এই হত্যাকাণ্ড ও সামরিক শাসন জারী করার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাবার জন্য পাঁচিলঘেরা ছোট্ট একটি পার্কে শান্তিপূর্ণভাবে সভা অনুষ্ঠিত হচ্ছিল, তখন জেনারেল ওডায়ার অত্যন্ত সংকীর্ণ গলিপথে কামান বন্দুক নিয়ে প্রবেশ করল। কোন প্রকার সতর্কবাণী উচ্চারণ না ক'রে সমবেত জনতাকে সভাভঙ্গ করে চলে যাওয়ারও কোন সুযোগ দেওয়া হল না। মুহূর্তের মধ্যে পুরুষ-স্ত্রী-শিশু নির্বিশেষে ষোলশ বার গুলি নিক্ষেপ করা হল। নির্গমনপথ রুদ্ধ, সভাস্থল পাঁচিল ও অট্টালিকা-পরিবেষ্টিত শত শত মানুষ হতাহত হলেন। একান্ত অসহায় ভাবে নিরস্ত্র জনতা ইংরেজ পুলিশের গুলিতে প্রাণ হারাল। এই হত্যাকাণ্ডের জল্লাদ ওডায়ার এজন্য একটুও অনুতপ্ত হল না, বরং প্রবেশপথ সংকীর্ণ হওয়ায় তার বৃহত্তম কামানটি অকুস্থলে নিয়ে যেতে না পারার জন্য দুঃখপ্রকাশ করল। ঊর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের কাছে প্রতিকার চেয়েও লাভ হল না, তাঁরা ওডায়ারকেই সমর্থন করলেন। জাতীয় নেতৃবৃন্দ এই অপমান সহ্য করতে রাজী ছিলেন না। সমস্তরকম ঝুঁকি নিয়েও তাঁরা দেশবাসীকে সঙ্ঘবদ্ধ করলেন ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য বিদ্রোহ ঘোষণার উদ্দেশ্যে। দেশব্যাপি অসহযোগ আন্দোলন রাওলাট-সত্যাগ্রহ ও ভারত ছাড় আন্দোলন শুরু হলো। সমগ্র দেশ ফেটে পড়লো বিদ্রোহে, বিক্ষোভে। গান্ধীজী প্রথম যুদ্ধে আহত সৈনিকদের সেবাকার্যের জন্য প্রাপ্ত কাইজার-ই-হিন্দ মেডেল প্রত্যার্পণ করে সারাদেশ জুড়ে আন্দোলন সৃষ্টি করলেন। এই জঘন্যতম হত্যাকাণ্ড বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের মনের উপরেও বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করলো। রবীন্দ্রনাথ চিরদিনই অন্যায়ের বিরুদ্ধে সোচ্চার প্রতিবাদ জানিয়েছেন। দেশবাসীর প্রতি তাঁর গভীর ভালবাসা, প্রখর আত্মমর্যাদা জ্ঞান এবং অত্যাচারিতের উপর তাঁর অসীম মমতা তাঁকে ইংরেজ প্রদত্ত খেতাব ছুঁড়ে ফেলে দিতে অনুপ্রাণিত করেছিল। সেই ঐতিহাসিক সন্ধিক্ষণে, রবীন্দ্রনাথ এই চিঠির মাধ্যমে তাঁর প্রতিবাদ ও মনোবেদনা সমগ্র পৃথিবীর সামনে রেখেছিলেন দ্বিধাহীন চিত্তে।]

প্রিয় মহাশয়,

পাঞ্জাবে স্থানীয় কিছু গণ্ডগোল দমন করবার জন্য সরকার কর্তৃক যে অতিশয়তাপূর্ণ ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন, তাতে ভারতবর্ষে বৃটীশ প্রজা হিসাবে আমাদের অবস্থা যে কত অসহায়, সেটাই প্রবল মানসিক আঘাতের ভিতর দিয়ে প্রতিভাত হয়েছে। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, হতভাগ্য মানুষের উপর শাস্তির এই সামঞ্জস্যহীন কঠোরতা এবং যে পদ্ধতিতে এই শাস্তিবিধান করা হয়েছে, সভ্য সরকারগুলির নিকট বা দূর ইতিহাসে, তার নজীর খুঁজে পাওয়া যাবে না। যখন চিন্তা করি, নিরস্ত্র ও সহায়হীন মানুষের উপর মানুষ নিধন করবার ভয়ংকর সংগঠনের অধিকারী একটি শক্তি এই প্রকার ব্যবহার করেছে তখন সর্বশক্তি দিয়ে বলতে চাই, নৈতিক সমর্থন তো দূরের কথা, রাজনৈতিক যুক্তি-যুক্ততার দাবীও করতে পারেনা এই নৃশংস ব্যবহার। আমাদের পাঞ্জাবের ভাইদের উপর অপমান ও নির্যাতনের যে বিবরণ নিদ্রিত নিস্তব্ধতার ভিতর

দিয়েও সারা ভারতে কিছুটা প্রকাশিত হয়েছে ও সেজন্য মানুষের মনে ঘৃণামিশ্রিত ক্রোধ ও ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে, আমাদের শাসকবর্গ তাকে উপেক্ষা করেছেন হয়তো উপযুক্ত শিক্ষা দেবার আনন্দে আত্মপ্রসাদ অনুভব করে। এই উদাসীনতাকে প্রায় সমস্ত এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান কাগজের মালিকেরা তারিফ করেছেন। কোন কোন ক্ষেত্রে আমাদের নির্যাতন ভোগকে তামাসা করবার মতো বর্বরতার সীমা পর্যন্ত যেতেও দ্বিধা করেননি এঁরা। আর্তের ক্রন্দন ও বিবেচনা প্রসূত সিদ্ধান্ত প্রকাশকারী নির্যাতিতের মুখপত্রগুলিকে শ্বাসরুদ্ধ করে মারার জন্য নিয়ত সতর্ক যে সরকার, সেই কর্তৃপক্ষ থেকে একটুও বাধাপ্রাপ্ত হয়নি এই কাগজগুলি। আমাদের আবেদন ব্যর্থ হয়েছে এবং সরকারের প্রতিশোধের প্রবল মানসিকতা রাজনৈতিক বিচারবোধের দৃষ্টিকে আচ্ছন্ন করে রাখছে—অথচ যে সরকার সহজেই তাঁর শারীরিক শক্তি ও নৈতিক ঐতিহ্যের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে উদার হতে পারতেন—এই কথা হৃদয়ঙ্গম করে আমি যে সামান্য কাজ করতে পারি সেটা হচ্ছে, আতঙ্কে, বেদনায় মূক আমার অগণিত দেশবাসীর প্রতিবাদকে ভাষা দেবার দায়িত্ব নেওয়া ও তজ্জনিত ফলভোগ করতে নিজেকে প্রস্তুত রাখা। আজ সময় হয়েছে, যখন সম্মানের প্রতীক অসংগত অবমাননার পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের লজ্জাকে উজ্জ্বল করে তোলে। সমস্ত বিশেষ সম্মানকে পরিত্যাগ করে আমি আমার সেই সমস্ত দেশবাসীর পাশেই দাঁড়াতে চাই, যারা তাদের তথাকথিত ক্ষুদ্রতার জন্য মানুষের অযোগ্য অপমানভারে জর্জরিত। এই সমস্ত কারণেই বাধ্য হয়ে গভীর মর্মবেদনার সঙ্গে, দুঃখের সঙ্গে আমি আপনাকে অনুরোধ করি, ইংল্যাণ্ডের রাজা-কর্তৃক প্রদত্ত এই নাইট উপাধী ধারণ করার যন্ত্রণা থেকে আমাকে মুক্তি দিন।

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

(২০ পৃঃ পর)

রবীন্দ্রনাথ তাঁর জীবন প্রভাতে ইংরাজ জাতিকে বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা করতেন, কিন্তু জীবন সায়াহ্নে তিনি সে বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা হারাতে বসেন। মিস র‍্যাথবোনকে লেখা পত্রে তিনি সে কথা নির্ভীকভাবে ব্যক্ত করেন এবং উক্তোপত্রোত্তরে তাঁর খাঁটি ও নির্ভাজাল স্বদেশ স্বজাতির কল্যাণ চিন্তা প্রকাশ পায়। তাঁর সভাতার সঙ্কট প্রবন্ধে স্বদেশ প্রীতির পরাকাষ্ঠা পরিলক্ষিত হয় বিশদভাবে। কাব্য-সাহিত্য রচনার মাধ্যমে তিনি সমগ্র জাতিকে জাগ্রত করার সাধনায় চিরব্রতী ছিলেন। 'ওরে নবীন ওরে আমার কাঁচা, আর মরাদের ঘা মেরে তুই বাঁচা' প্রভৃতি কবিতা স্বতই তাঁর স্বদেশ অনুরাগের অমোঘবার্তা বহন করে। এই সব ম্লান মূক মুখে দিতে ভাষা' যা তিনি 'এবার ফিরাও মোরে' কবিতায় লেখেন তা সত্যই তাঁর স্বদেশ চিন্তার গভীরতার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়, পাঠক মনে।

স্বাদেশিক রবীন্দ্রনাথ তাঁর স্বদেশ ও স্বজাতির বৈশিষ্টের কথা মনে রেখে কাব্য-সাহিত্য, ললিতকলা, রূপনাটক, গান, প্রবন্ধ, ছোটগল্প, উপন্যাস, গদ্য-কবিতা, প্রহসন প্রভৃতি রচনা ও অঙ্কন করে যশস্বী হন। তিনি সত্যদ্রষ্টা ঋষি হিসাবে বিশ্বে বন্দিত হন।

Regd No. R. N. 24511/71 | Biplobi Bangla | Regd. W B/NC 77
Phone : 34-1795
বার্ষিক :—পঞ্চাশ ১৫.০০ টাকা | ষাণ্মাষিক :—৮.০০ টাকা | মূল্য—৩০ পয়সা

পাক সেনাপতি ইয়াহিয়া খানের জল্লাদবাহিনী যে গ্রন্থ পুড়িয়ে ছাই করে দিয়েছিল বিপ্লব তাপস মহারাজ ত্রৈলোক্যনাথের সেই অবিস্মরণীয় গ্রন্থ "জেলে ত্রিশ বছর ও পাক ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম" পুনর্মুদ্রিত হল।

দাম—ত্রিশ টাকা

প্রাপ্তিস্থান
খাদি প্রতিষ্ঠান
১৫, কলেজ স্কোয়ার,
কলিকাতা-১২

সম্পাদক—
শ্রীশান্তিশরণ রায়চৌধুরী
॥ সম্পাদকমণ্ডলী ॥
শ্রীজগদীশ চট্টোপাধ্যায় (সভাপতি)
শ্রীভবেশচন্দ্র নন্দী
পুষ্প চ্যাটার্জী
মলয় ঘোষ
প্রকাশক ও মুদ্রক—
শ্রীঅনিল সেনগুপ্ত
দিল্লীর বিশেষ প্রতিনিধি—
শ্রীবারীন ঘোষ
বেহালা—
শ্রীনন্দগোপাল পাল

বিপ্লবী পুস্তকমালা

15 MAY 1971

নেতাজীর সিক্রেটসার্ভিস—ডাঃ পবিত্রমোহন রায়—১০.০০

বিপ্লবী সন্ধানায়ক রাসবিহারী—সুবোধ মজুমদার

অনুশীলন সমিতির বিপ্লবী প্রচেষ্টা—ব্রজেন্দ্র দাস

—ক্ষীরোদ কুমার দত্তের—

১। বাঘার অভিযান—১.৫০, ২। বহির্ভারতে ভারতীয় বিপ্লব প্রচেষ্টা—৮.০০ ৩। অনুশীলন সমিতির পি, মিত্তির—২.০০, ৪। গৌহাটী সংগ্রাম কাহিনী—১.০০, ৫। কাকোরী সহীদবৃন্দ—১.২৫, ৬। কলকাতা বাজার সংগ্রাম কাহিনী—.৪০, ৭। রাসবিহারী ও অনুশীলন সমিতি—.৬০ ৮। স্বাধীনতাসহীদ মা ও মেয়ে—.৪০, ৯। বিবেকানন্দ ও সমাজবাদ—.৬০ ১০। বিপ্লবী বিবেকানন্দ—.৫০, ১১। মহাবাহু ও সুভাষচন্দ্র—.৪০ ১২। ভারতের নবজাগরণ ও ভগিনী নিবেদিতা—.৭৫, ১৩। দেশ বাঘের তোলেনি (১)—১.০০, ১৪। দেশ বাঘের তোলেনি (২)—২.০০ ১৫। সহীদ চন্দ্রশেখর আজাদ—.৫০, ১৬। ১৯৩ এপ্রিল জাতীয় সহীদ দিবস—১.০০, ১৭। হার্ডিঞ্জ হত্যা প্রচেষ্টা—.৭৫, ১৮। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও অনুশীল সমিতি—৪.০০, ১৯। ভারতের জাতীয় পতাকার ইতিহাস—৪০.০০/৫০.০০ লাট হত্যা প্রচেষ্টা—১.৫০

CISU

প্রাপ্তিস্থান :— বল্লভ দাস ষ্ট্রীট কলিকাতা-৭০০০০৭

নৈশলক্ষ্মী—১/১/১/A বঙ্কিম চ্যাটার্জী ষ্ট্রীট কলিকাতা-৭৩

মূল কার্যালয়—৪নং বল্লভ দাস ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০০৭ শ্রীঅনিল সেনগুপ্ত কর্তৃক প্রকাশিত এবং তৎকর্তৃক প্রিন্টিং পাবলিসিটি, ১১৭, কেশবচন্দ্র সেন ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০০৯ হইতে মুদ্রিত।

বিপ্লবী বাংলা

॥ বিপ্লবী পরিষদের সাপ্তাহিক মুখপত্র ॥

স্থাপিত—১৯৫৬, 'বিপ্লবী বাঙ্গালী' নবকলেবরে—১৯৭১

দশম বর্ষ	শনিবার ৯ই জ্যৈষ্ঠ ১৩৮৮ ২৩শে মে ১৯৮১	৩০ সংখ্যা

'I was a fighter,
One fight more,
The last and
The best.

Rash Behari Bose
25/1/42

সম্পাদকীয়

বিপ্লবী মহানায়ক রাসবিহারী বসু

বাংলা, তথা ভারতবর্ষে উনবিংশ শতাব্দীকে বলা যায় রেনেসাঁ বা নবজাগরণের স্বর্ণযুগ। দর্শনে, সাহিত্যে, বিজ্ঞানে, স্বদেশসেবার ক্ষেত্রে বিশ্বনিয়ন্তা অকৃপণভাবে একাধিক দিক্‌পালকে পাঠিয়েছিলেন এই পুণ্যভূমিতে। বিশেষ করে বাংলাদেশের উপর যেন তাঁর একটু ছিল পক্ষপাতিত্ব। মহামানবদের এমন সমাবেশ ও সমারোহ পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল। রাজা রামমোহন (জন্ম আক্ষরিক অর্থে একটু আগে হলেও কর্মকাণ্ড এই শতাব্দীতে) ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র, পরমহংসদেব, স্বামী বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ, আচার্য্য জগদীশচন্দ্র, আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র, শ্রীঅরবিন্দ, নেতাজী সুভাষচন্দ্র এবং আরো অনেক মনীষীরা এই শতাব্দীতে অবতীর্ণ হয়ে, তাঁদের কর্মযজ্ঞের মাধ্যমে, সমগ্র ভারতবর্ষকে এমন একটি সম্মানের আসনে প্রতিষ্ঠিত করে গিয়েছেন, যে তার সম্যকভাবে মূল্যায়ণ করা শক্ত। এঁদের যে কোন একজনের মত মানুষকে নিয়ে যে কোন দেশ চিরদিন গৌরব অনুভব করতে পারে। এই সময়েই আবির্ভূত হয়েছিলেন বিপ্লবী মহানায়ক রাসবিহারী বসু।

এঁরা প্রত্যেকেই হৃদয়ঙ্গম করেছিলেন যে ভারতের কৃষ্টি, সভ্যতা ও গৌরবোজ্জ্বল ঐতিহ্যকে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে হলে, ভারতকে পরাধীনতার নাগপাশ থেকে মুক্ত করতে হবে। আর সেজন্য স্বদেশ প্রেমের বীজ বপন করে, দেশের ছেলেদের মধ্যে দিয়ে মানুষ তৈরী করতে হবে, যার ফলে তারা দেশমাতৃকার স্বাধীনতার জন্য আত্মোৎসর্গ করতে সঙ্ঘবদ্ধভাবে আগুয়ান হবে। তাঁদের সহায়সম্বল হবে অমিতবীর্য্য, আদর্শ নিষ্ঠা, চরিত্রবল, আঘাত সহিষ্ণুতা, নৈরাশ্যবিজয়ী নির্ভীকতা, আত্মত্যাগের সঙ্কল্প, প্রজ্জ্বলন্ত দেশপ্রেম। তাঁরা তাঁদের বক্তৃতা ও নিজ নিজ কর্মক্ষেত্রে এ মহৎকর্মে অনুপ্রাণিত করেছিলেন বহু যুবককে, বহু ছাত্রকে, বহু সাধারণ মানুষকে। তাদেরই উপ্ত বীজ দিনে দিনে বিরাট মহীরুহরূপে মুকুলে, ফসলে আত্মপ্রকাশ করতে শুরু করল উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশক থেকে বিশেষ করে। তাঁদেরই প্রচারিত অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত বিশ্বে চরম চমক সৃষ্টি করল, তিনটি যুবক যাদের নাম ছিল দামোদর, বালকৃষ্ণ ও বাসুদেব চাপেকার। পুণাতে অত্যাচারী ইংরেজ শাসকদের কয়েকজনকে হত্যা করে, হাঁসিমুখে ফাঁসির রজ্জু গলায় পরল এরা তিনটি ভাই অল্প-দিনের ব্যবধানে। সারা দেশে তারা স্বাধীনতার জন্য সংগ্রামী তড়িৎপ্রবাহ সৃষ্টি করে প্রসারিত করে গোটা

ভারতভূমে। এরই সাধনার ভেতর থেকে উঠেছিল বাংলাদেশ। বিংশ শতাব্দীর প্রথমদশকে শুরু হল বিপ্লব সাধনা ও তপস্যা। নানাভাবে নানাদিকে শুরু হল এই দুর্জয় অভিযান। বিপ্লবী মহানায়ক রাসবিহারী বসু ছিলেন এই মুক্তিযজ্ঞের একজন বিশিষ্ট হোতা।

রাসবিহারীকে বিপ্লবী তৈরী করতে হয়নি, তিনি বিপ্লবী হয়েই যেন জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তাঁর কথায় বলা যায় তিনি ছিলেন যন্ত্র মাত্র, বিশ্বনিয়ন্তা যন্ত্রীই তাকে যে পথে চালিয়েছিলেন, সেই পথেই চলেছেন। এমন অভিমান শূন্য, ভগবৎবিশ্বাসী মানুষ পৃথিবীতে খুব বেশী পাওয়া যায় না। রাসবিহারী ছিলেন একজন অনন্যসাধারণ ইতিহাস পুরুষ।

আঠারো শ সাতান্ন সালের জাতীয় বিপ্লবের পরে ভারতবর্ষে সঙ্ঘবদ্ধ অভ্যুত্থান ঘটিয়ে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের শৃঙ্খল মুক্ত করে; জাতীয় স্বাধীনতা অর্জনের প্রথম প্রয়াস যিনি করেছিলেন, তিনি হলেন বিপ্লবী মহানায়ক রাসবিহারী বসু। তিনিই প্রথম হৃদয়ঙ্গম করেছিলেন যে ক্ষুদ্র দল বা গোষ্ঠীর পক্ষে আয়াসলভ্য দু'চারটি বোমা বা রিভলবার সংগ্রহ করে ইংরেজদের সঙ্গে সফলভাবে লড়াই করা যাবে না। তাই তিনি প্রথম থেকে ভারতীয় সৈন্যদলে অনুপ্রবেশ করে, দলীয় সৈন্যদের স্বদেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করে, তাদের মধ্যে বিদ্রোহ ঘটিয়ে ইংরেজশক্তিকে পরাভূত করতে পারবেন। অবশ্য বোমা রিভলবারের প্রয়োজনীয়তা তিনি অস্বীকার করেন নি। এরপরেই তৈরী বোমা দিয়ে তদানীন্তন ভাইসরয়কে হার্ডিঞ্জকে আঘাত করে। দেশের মধ্যে অভূতপূর্ব সাড়া ও প্রবল দেশ প্রেমের বন্যা বইয়ে ছিলেন। সঙ্ঘবদ্ধ অভ্যুত্থানের জন্য ক্ষেত্র প্রস্তুত করতে তিনি সমগ্র ভারতে, বিশেষ করে উত্তর ভারতে উন্মাদ মত ছুটে বেড়িয়েছিলেন। আকৈশোর যে স্বপ্ন দেখেছিলেন উনি, সেটা হল সিঙ্গাপুর থেকে কাবুল পর্যন্ত বিস্তৃত মহাবিপ্লবের সংঘটন। সেজন্য তাঁর প্রস্তুতিও ছিল নিখুঁত, সংগঠন ছিল মজবুত, প্রয়াস ছিল নিরলস। সিদ্ধি যখন তাঁর প্রায় হাতের মুঠোর মধ্যে, তখন বিশ্বাস ঘাতকতার জন্য এতবড় একটা সুবর্ণ সুযোগ নষ্ট হল। মীরজাফরের বংশরক্তবীজের বংশ। তাই তারা যুগে যুগে জন্মগ্রহণ করে, এই মন্তব্য করেছিলেন রাসবিহারী দুঃখের সঙ্গে।

রাসবিহারী ব্রিটিশের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে গেছেন দীর্ঘদিন ধরে—১৯০৫ সাল থেকে ১৯৪৫ সাল পর্যন্ত। কৈশোর থেকে মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত দেশ মাতৃকার স্বাধীনতা অর্জনই ছিল তাঁর ধ্যান, তাঁর সাধনা, তাঁর তপস্যা। দেশে হোক, বিদেশে হোক, একটি দিনও তিনি ভারতমাতার সেবা না করে বেঁচে থাকেন নি। এমন আদর্শনিষ্ঠা, এমন অধ্যবসায়, এমন প্রজ্জ্বলন্ত দেশপ্রেম, এমন নিরবিচ্ছিন্ন মননশীলতা, এমন নিষ্কাম কর্ম ও পরিপূর্ণ আত্মবিলুপ্তি বরণের দৃষ্টান্ত পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল।

রাসবিহারী এই নিষ্কাম কর্মপ্রেরণার মূলে ছিল তাঁর বৈদান্তিক জীবনদর্শন। বেদান্তের শিক্ষা হল—সর্বজীবই উদ্ভূত হয়েছে ব্রহ্ম থেকে, সকল মানুষই সমভাবে ঈশ্বরের সন্তান, জীবের সেবা করতে হবে শিবজ্ঞানে। রাসবিহারীর চরিত্রে এটা বিকশিত হয়েছিল সার্থকভাবে।

রাসবিহারীর সমস্ত শক্তির উৎস ছিল গীতায় উক্ত নিষ্কাম কর্মের মন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণ। তাঁর চরিত্র থেকে আমিত্বটা বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল সম্পূর্ণভাবে। কোন বাধা বিপত্তি, কোন সাময়িক ব্যর্থতা, সহধর্মিনীর

মাতৃভূমির জীবনধারা, নিজের শারীরিক কষ্ট, কোন কিছুই তাঁর চিত্তকে বিচলিত করতে পারেনি মাতৃমুক্তি পণ থেকে। তিনি ছিলেন স্থিতধী সুখ, দুঃখ, লাভ, লোকসান, জয় পরাজয় তাঁর কাছে সমান ছিল এবং এজন্য কোন মলীনতা কোনদিন তাঁকে স্পর্শ করতে পারেনি।

রাসবিহারী নিজেকে মনে করতেন মহাযন্ত্রী বিধাতার যন্ত্ররূপে। এবং সেই জন্যই মাতৃভূমির জন্য যা কিছু তিনি করতেন, তার গৌরব বা গ্লানি কিছুই স্পর্শ করত না তাঁকে। লর্ড হার্ডিঞ্জের ওপর বোমা নিক্ষেপ, সর্বভারতীয় বিপ্লবে নেতৃত্বদান, পূর্ব এসিয়াতে মুক্তিফৌজ সংগঠন, ভারতের সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রচার, সব কিছুই তিনি করতেন বিধাতার যন্ত্ররূপে। তিনি মনে করতেন বিশ্বমানবের মুক্তির জন্য ভগবান তাঁর নিজের কাজ করিয়ে নিচ্ছেন তাঁকে দিয়ে। তাই ব্যক্তিগত আশা আকাঙ্খা, হিংসা, দ্বেষ, শোক দুঃখ কখনও তাঁকে প্রভাবিত করতে পারত না তাঁর যোগযুক্ত চিত্তকে। তিনি কর্মযুগী হিসেবে এসেছিলেন আমাদের মধ্যে। তাঁর আশাবাদ, দুঃসাহস, তাঁর আত্মবিশ্বাসের মূলেও ছিল এই পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণ। আজকের দিনের জড়বাদ প্রভাবিত মানুষের পক্ষে রাসবিহারীর নিষ্কাম কর্মের মহিমা উপলব্ধি করা দুরূহ।

রাসবিহারীর চরিত্রের অন্য একটি রূপও ছিল সাধারণ মানুষের ধারণার বাইরে। তাঁর ছদ্মনাম ও ছদ্মবেশের কাহিনী আজ পৌরাণিক গল্পের মত মনে হয়। এই দুই বিষয়েই তাঁর অসাধারণ প্রতিভা। কত বিভিন্ন নামে তিনি পরিচিত ছিলেন। কত বার তিনি পুলিশ বেষ্টনীর চোখে ধুলা দিয়ে পালিয়ে যেতে সমর্থ হয়েছিলেন, তা আজ ইতিহাসে প্রায় কিংবদন্তীর রূপ নিতে চলেছে। এর মূলেও তাঁর অটোসেশন বিয়োরীর বাস্তব প্রমাণ পাওয়া যায়।

যারা মনে করেন যে রাসবিহারীর বিপ্লব সাধনা ব্যর্থ হয়েছে, তারা ভ্রান্ত। বিপ্লবের যে হোমাগ্নিশিখা তিনি প্রজ্জলিত করেছিলেন নিজ বাসভূমিতে, তার সফল রূপায়ণ দেখতে পাওয়া যায়, তাঁর পরিকল্পিত ও সংগঠিত আজাদ হিন্দ বাহিনীর কীর্তিকলাপই ভারতের স্বাধীনতাকে নিশ্চিত ও ত্বরান্বিত করেছিল। অবশ্য এ সত্য অনস্বীকার্য যে নেতাজীর অবদান এ ব্যাপারে অপরিসীম। কিন্তু এখানেও রাসবিহারীর দূরদর্শিতার একটি প্রণিধানযোগ্য নিদর্শন পাওয়া যায়। যখন তিনি নিজের স্বাস্থ্যের ক্রমোন্নতি উপলব্ধি করলেন। তখন নেতাজীকে তিনিই এই বাহিনীর কর্তৃত্ব অর্পণ করলেন দ্বিধাহীন চিত্তে। সমস্ত ক্ষমতা তাঁর হাতে অর্পণ করে দিয়ে তিনি রাজনীতির ক্ষেত্রে একটি নজীর সৃষ্টি করলেন। স্বেচ্ছায় এমনভাবে কর্তৃত্ব হস্তান্তর করার দৃষ্টান্ত খুঁজে পাওয়া যায় না। এ কাজেও হয়ত তিনি তাঁর গুরুর নির্দেশ পালন করেছিলেন সানন্দচিত্তে, যন্ত্র হিসাবেই। রতনেই অবশ্য রতন চিনেছিলেন।

রাসবিহারী ও নেতাজী ছিলেন পরস্পরের দেব-দুর্লভ চরিত্রের পরিপূরক। দুই জনের জীবনেই দেখা যায় একই ধরনের গভীর আত্মবিশ্বাস, ইস্পাত কঠিন সঙ্কল্প, দুঃসাহস, আশাবাদ, দেশমাতৃকার সেবায় পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণ। উভয়েই একই রকম আমিত্ববোধহীন। উভয়েই দুর্গম গিরি কান্তার মরু লঙ্ঘনে

সিদ্ধহস্ত। বাধার প্রাচীরকে উভয়েই অমিতবীর্যের সঙ্গে ভেঙ্গে ফেলে চলার পথে অবিরাম গতিতে এগিয়ে গিয়েছেন। উভয়েরই চরিত্রে ছিল একই রকম দিব্য-প্রভা। 'বাগার্থমিব' যেন যেন উভয়ে সম্পৃক্ত ছিলেন। একের চরিত্রকে ফুটিয়ে তুলতেই যেন বিশ্বনিয়ন্তা সেই যন্ত্রী এই মণিকাঞ্চনযোগ ঘটিয়েছেন বেশ কিছু কালের ব্যবধানে। বিশ্ব ইতিহাসে এমন সংযোগের অভূতপূর্ব সংঘটন আজো অবিদিত।

কর্মে, চিন্তায়, জীবনদর্শনে, রাজনৈতিক নীতি অবলম্বনে মন একাত্মবোধ সমাচেতনা, সর্বত্যাগের শেষ সন্ন্যাসাধনে, এমন অভূতপূর্ব মিল দেখা যায় না। অথচ একজনের প্রতি অন্যজনের কি শ্রদ্ধা, কি সম্মানবোধ। রাসবিহারী নেতাজী সম্বন্ধে বললেন—'ভারতের যা কিছু শ্রেষ্ঠ ও মহোত্তম সম্পদ তারই প্রতিভূ সুভাষচন্দ্র। যা প্রিয়তম, পরম গতিশীল তিনি তারই প্রতীক। আর রাসবিহারীর মহা-প্রয়াণের পর শোকসভায় রাসবিহারীকে প্রাচ্যে স্বাধীনতার আন্দোলনের জনক বলে আখ্যাত করলেন ও তাঁর উদ্দেশ্যে আজাদ হিন্দ সরকারের সম্মান 'তনখা-ই আজাদ হিন্দ' যোগ করলেন। নেতাজী সর্বদাই রাসবিহারীকে 'শ্রদ্ধেয় বসু' মহাশয় বলে উল্লেখ করতেন আলাপ আলোচনার সময়।

রাসবিহারীর রাজনৈতিক প্রজ্ঞাও ছিল অসাধারণ। তিনি বুঝেছিলেন ভারতের সমস্ত শ্রেণী ও সম্প্রদায়ের মানুষকে স্বাধীনতা সংগ্রামের সামিল করতে না পারলে সফলতা লাভ ঘটবে না। আজকের দিনের রাজনীতিবিদরা উল্টো পথ বলেন। জাতিভেদ, শ্রেণীভেদ, ধর্মের ভিত্তিতে দেশের ঐক্য বিনষ্ট করে নিজেদের আখের গুছিয়ে নিতে সচেষ্ট। গত বিশ্বযুদ্ধের সুযোগ গ্রহণ করে পূর্ণ স্বাধীনতা অর্জনের জন্য আত্মনিবেদনের যে আহ্বান জানিয়েছিলেন, তা একমাত্র রাসবিহারীর পক্ষেই সম্ভব ছিল। সাগো হোটেলের ঐতিহাসিক সম্মেলনে যে ভাষণ দিয়েছিলেন, তা ক্লাসিকাল বা চিরায়ত সৃষ্টি। তিনি উদাত্ত কণ্ঠে বলেছিলেন :—

ভারতের সব ভাইয়েরা, আসুন আমরা ঋজু হয়ে দাঁড়াই, ঐক্যবদ্ধহই এবং শ্রীকৃষ্ণের নিষ্কাম কর্ম নিয়ে ভগবান বুদ্ধের নিঃস্বার্থ সেবাদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে, ইসলাম প্রচারিত আল্লার সত্য হৃদয়ঙ্গম করে, গুরু গোবিন্দ সিং; শিবাজী, মহাত্মা গান্ধীর সত্যাগ্রহের আদর্শ স্মরণ করে আমাদের সকলের একলক্ষ্য অভিমুখে অভিযান করি। সমস্যা জর্জরিত জাতির গৌরবজ্জ্বল ভবিষ্যৎ গড়ে তুলতে এই দৃষ্টিভঙ্গী আজিও অনুসরণ যোগ্য।

রাসবিহারী বসু সৃষ্টির একটি বিস্ময় যাদের সম্বন্ধে কবি গুরুর কথায় বলা যায়—

কোন্ আলোতে প্রাণের প্রদীপ জ্বালিয়ে তুমি ধরায় আস—
সাধক ওগো, প্রেমিক ওগো, পাগল ওগো ধরায় আস।

বিপ্লবী শ্রেষ্ঠ রাসবিহারীর পঁচানব্বইতম জন্মদিনে তাঁর উদ্দেশ্যে আমরা সশ্রদ্ধ প্রণাম জানাই এবং স্মরণ করি কবি গুরুর ভাষায়

মরণসাগর পারে তোমরা অমর,
তোমাদের স্মরি।
নিখিলে রচিয়া গেলে আপনারি ঘর,
তোমাদের স্মরি।
সংসারে জ্বেলে গেলে যে নব আলোক
জয় হ'ক জয় হ'ক তারি জয় হ'ক
তোমাদের স্মরি।

কিন্তু রাসবিহারী বসুর এই জন্মদিনে শুধু নিবন্ধের মাধ্যমে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা জানাইলেই যথেষ্ট হবে না। আমরা যদি উত্তরসূরী হিসাবে, দেশ থেকে আঞ্চলিকতা, প্রাদেশিকতা, জাতিভেদ; দুর্নীতি মূলবোধ-হীন রাজনীতির অবসান ঘটিয়ে তাঁদের প্রদর্শিত পথে; তাদের স্বপ্ন ও সাধনাকে বাস্তবায়িত করে; তাদের ধ্যানের ভারতবর্ষ গড়ে তুলতে পারি; তবেই তাঁদের প্রতি প্রকৃত শ্রদ্ধা জানান যাবে এবং তাঁদের নিকট আমাদের ঋণিগণ কিছু পরিমাণে পরিশোধ করা যাবে।

জয়তু রাসবিহারী!

পরলোকে বিপ্লবী নলিনীরঞ্জন ব্যানার্জি

আমরা গভীর দুঃখের সঙ্গে জানাইতেছি যে বিপ্লবী নলিনীরঞ্জন ব্যানার্জি গত ৯ই মে শনিবার তাঁর কালিঘাট বাসভবনে দেহত্যাগ করিয়াছেন।

নলিনীবাবু একজন বিশিষ্ট স্বাধীনতা সংগ্রামী ছিলেন। দেশসেবার জন্য তাকে বিদেশী শাসকদের হস্তে বিশেষ নির্যাতন ভোগ করিতে হইয়াছে। দীর্ঘদিন তিনি কারাদণ্ড ভোগ করিয়াছিলেন।

পরবর্তী জীবনে তিনি আনন্দবাজার পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত হইয়াছিলেন। বহু বৎসর স্বাধীন কর্তব্য পরায়ণ সাংবাদিক হিসাবে কাজ করার পর সম্প্রতি অবসর গ্রহণ করিয়াছিলেন।

ব্যক্তিগত জীবনে নলিনীবাবু ছিলেন বন্ধুবৎসল আদর্শনিষ্ঠ ও মানবদরদী।

আমরা তাঁর বিদেহী আত্মার শান্তিকামনা করি ও তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গকে সমবেদনা জানাই।

মহানায়কের বাণী

আমাদের দেশের হাজার ভাইবোন দেশকে মুক্ত, স্বাধীন করবার জন্য এক শতাব্দীর বেশিকাল দুঃখবরণ আত্মবলি দিয়েছেন। আসুন, আমরা জেগে উঠি এবং তাঁদের আরব্ধ প্রচেষ্টাকে জয়যুক্ত করি। আসুন আমরা এমনভাবে কাজ করি যাতে দেড়শত বা তারও বেশি যুগ ধরে মহাত্মা গান্ধীর আরব্ধ কাজ ফলপ্রসূ হয় এবং যাতে এক স্বাধীন জাতির মানুষ হিসাবে আমাদের দেশের ভবিষ্যৎ সন্তানগণ আমাদের কথা চিন্তা করে গর্ব ও শ্রদ্ধা বোধ করে।

[ঐতিহাসিক ব্যারাকপুর সম্মেলন]

● ●

ভারতের সব ভাইবোন আসুন, আমরা সোজা হয়ে দাঁড়াই, ঐক্যবদ্ধ হই এবং শ্রীকৃষ্ণের নিষ্কাম কর্ম-মন্ত্র, বুদ্ধের নিঃস্বার্থ সেবাদর্শ, ইসলামের সত্যদৃষ্টি, গুরুগোবিন্দ সিং, শিবাজী ও মহাত্মা গান্ধীর সত্যাগ্রহের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে সকলে এক লক্ষ্য অভিমুখে অভিযান করি।

[১৯৪২ সালের ১৭ই ফেব্রুয়ারীর ঘোষণা]

● ●

ঐশী প্রেরণা মহাশক্তিরূপে হৃদয়ে উদিত না হলে, অবিচার অত্যাচারের বিরুদ্ধে ব্যাপক বিদ্রোহ কেবলমাত্র মানুষের চেষ্টায় সফল হয় না। মানুষ কাজ করে অন্তরস্থিত মহাশক্তির নির্দেশে। সেই মহাশক্তিই তাকে যথা নির্দিষ্ট পথে হাত ধরে এগিয়ে নেন। আমরা তাঁর অধীনে মাত্র।

সংগ্রামকালে আমরা কোন ব্যক্তিগত, গোষ্ঠিগত এবং সম্প্রদায়গত স্বার্থকে প্রশ্রয় দেব না। তা যদি আমরা করি তাহলে আমরা কখনই সাফল্যলাভ করতে পারব না। আমরা তাহলে পরাজয়ের সম্মুখীন হব। ব্যক্তি, গোষ্ঠী স্বার্থকে দেশের স্বার্থের অনুকূলে অবশ্যই বিসর্জন দিতে হবে। পৃথিবীর ইতিহাসে বহু উদাহরণ আছে যেখানে দেশের স্বার্থের উপর ব্যক্তি অথবা গোষ্ঠী স্বার্থকে স্থান দিতে গিয়ে জাতি ধ্বংস হয়েছে, দেশ হারিয়েছে তার স্বাধীনতা।

● ●

আমাদের মন, শক্তি এবং সম্পদ সকলই দেশের স্বার্থে নিয়োজিত করাই আমাদের একমাত্র ব্রত হওয়া উচিত।

● ●

আমরা যেন স্মরণে রাখি, আমরা এক অখণ্ড ভারতীয় জাতি।···আমাদের এক উদ্দেশ্য—পূর্ণ স্বরাজ লাভ।

● ●

অন্ততঃ পাঁচ যুগ ধরে আমরা অনেক বক্তৃতা শুনেছি। অর্থহীন আলোচনা ও বাক বিতণ্ডা করে আমরা সময় নষ্ট করতে পারি না। যারা প্রকৃতই দেশসেবা করতে চান, তাদের পক্ষে বাজে কথা বলে সময় নষ্ট করার সুযোগ নেই।

শিক্ষা সংহারে উদ্যত বামফ্রন্ট

বংশীধর বন্দ্যোপাধ্যায়

দলীয় প্রভাব ও প্রভুত্ব বিস্তারের হীন ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়ে বামফ্রন্ট সরকার তথা সি, পি, এম দল প্রাথমিক শিক্ষার স্তর থেকে বিশ্ববিদ্যালয় স্তর পর্যন্ত সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির ওপর দলীয় নিয়ন্ত্রণ ইতিপূর্বেই কায়েম করেছে অত্যন্ত সুকৌশলে। প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নির্বাচিত ম্যানেজিং কমিটি বা গভর্নিং বডি বাতিল করে তৎস্থলে দলের লোক-দের নানান মিথ্যা অজুহাতে কর্তৃত্বে বসিয়েছে নির্লজ্জের মত এবং তদ্বারা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির গণতান্ত্রিক অধিকারকে নস্যাৎ করে, দলীয় স্বৈরতন্ত্রী শাসন চালু করেছে। শিক্ষক, শিক্ষিকা ও অভি-ভাবকদের স্বাধিকারকে বিলুপ্ত করে সরকারী কর্তৃত্বাধীনে শিক্ষাব্যবস্থাকে জবরদস্তিমূলক ভাবে চালু রাখার যে জঘন্য প্রচেষ্টা সরকার দিনের পর দিন চালিয়ে যেতে বদ্ধপরিকর তা শিক্ষা প্রসারের পরিবর্তে শিক্ষা সংহারের সূচনা করবে। বাস্তবে দেখা যায় যে, শিক্ষা সংহারের কাজ বেশ জোর কদমে এগিয়ে চলেছে সি, পি, এম দলের স্বেচ্ছা-চারী নীতির ফলে। ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক-শিক্ষিকা ও অভিভাবকগণ উৎকণ্ঠিত এবং ভগ্ন মনোরথ সি, পি এম দলের দাপটে।

শিক্ষাক্ষেত্রগুলি কোনদিনই কোন রাজনৈতিক দলের ক্রীড়নকে পরিণত হয়নি এতকাল। কিন্তু বামফ্রন্ট তথা সি, পি, এম সরকারের আমলে প্রতিটি শিক্ষাক্ষেত্রের সেই চিরাচরিত স্বাধিকার ও সুষ্ঠু পরিচালন ব্যবস্থা আজ দলীয় চক্রান্তের বলিতে পরিণত হতে বাধ্য হয়েছে সরকারের নিয়ম বহির্ভূত অগণতান্ত্রিক চাপে পড়ে। ফলে চরম অব্যবস্থা ও নৈরাজ্যের সৃষ্টি হয়েছে সকল শিক্ষালয়ে। পশ্চিম-বাংলার জ্ঞানী-গুণী, বুদ্ধিজীবি ও শিক্ষার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সম্প্রদায়ের উন্নতমনা মানুষ আজ বামফ্রন্টের এই সব হীন চক্রান্তকে প্রতিরোধ করার মানসে সম্মিলিত ভাবে সজাগ দৃষ্টি নিয়ে সক্রীয় আন্দোলনে ঝাপিয়ে পড়ার জন্য জনমত তৈরীর কাজে সামিল হয়েছেন। বাংলার ঐতিহ্য ও জাতীয়তাবাদকে সুরক্ষা করার একান্ত প্রয়োজনে আজ প্রখ্যাত মনীষিরা সাহিত্যিকরা শিক্ষক-শিক্ষিকারা ও শিক্ষিত জনমানস আজ বামফ্রন্ট সরকারের ভ্রান্ত শিক্ষানীতি ও ভাষা ব্যবস্থার প্রতিবাদে ও উক্ত হীনতা প্রতি-রোধে রাস্তায় নেমে এসেছেন। তাঁরা বামফ্রন্টের উক্ত ষড়যন্ত্রের মুখোস খুলে দিতে বদ্ধপরিকর। কঠিন প্রতিজ্ঞা নিয়ে তাঁরা উক্ত শিক্ষা সংকোচনের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের নিমিত্ত সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে সবে শুরু করেছেন। কলিকাতার রাজপথে তাঁরা সভা-সমিতি গড়ে ভাষণদানে ব্রতী হয়েছেন জাতির বৃহত্তর স্বার্থ সংরক্ষণে তথা শিক্ষা ব্যবস্থাকে রাজনীতি মুক্ত রাখার ঐতিহাসিক প্রয়োজনে। তাঁদের এই সাধু প্রচেষ্টাকে মুখ্যমন্ত্রী উস্কানি প্রণো-দিত বলে উল্লেখ করছেন নিজ দল স্বার্থে। জাতীয় স্বার্থ যে দলস্বার্থের অনেক উর্দ্ধে তা কি তিনি জানেন না? নাকি জেনেও চালাকি করে উক্ত মনীষাসম্পন্ন মহান ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে বিষোদ্গারে তিনি সদা ব্যস্ত কেবল নিজ দলের নির্দেশেই -

মুখ্যমন্ত্রীর ঐ ছেঁদো যুক্তিজাল ও মিথ্যা প্রচারগুলি কি শেষ পর্যন্ত টেকে? মনে হয় বাংলার বামফ্রন্ট বিরোধী মানুষেরা দলবদ্ধ ভাবে এবার সি, পি, এম দলের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবে তাদের স্বাধিকার রক্ষার একান্ত প্রয়োজনে এবং এর জন্য নেতৃত্ব দেবে বাংলার মনীষাসম্পন্ন বিখ্যাত সাহিত্যিক, সাংবাদিক, বুদ্ধিজীবি, শিক্ষক-শিক্ষিকা ও জাতীয়তাবাদী উচ্চ শিক্ষিত সম্প্রদায়ের ব্যক্তিবর্গ।

বামফ্রন্টের ভাষানীতি যে ভ্রান্ত ও উদ্দেশ্য প্রণোদিত তা আজ জনগণ সহজেই বুঝে ফেলেছে। তাই তারা সি, পি, এম সরকারের পতন ঘটাবার জন্য ঘরে ঘরে তৈরী হতে শুরু করেছে। সি, পি, এম দলের রেজিমেন্টেশনের বিরুদ্ধে আজ সকল স্তরের বুদ্ধিজীবি সম্প্রদায়ের মানুষজনেরা সক্রীয় ভাবে আন্দোলনে নামার তোড়জোড় করতে ব্যস্ত বলে দেখা যায়। বুলির মধ্যেকার বিড়াল এমন বিশ্রীভাবে বেরিয়ে পড়েছে যে, এদেশের জনসাধারণ তা দেখে অবাক বিস্ময়ে স্তব্ধ এবং সঙ্গে সঙ্গে ক্ষিপ্ত প্রায় আজ তাই সি, পি, এম দলের অপশাসন প্রতিরোধ করতে এবং সম্ভব হলে তা দূর করতে। শিশুকাল থেকেই যাতে মগজ ধোলাইয়ের মাধ্যমে বাংলার ছেলেমেয়েরা সি, পি, এম ভক্ত হয়ে ওঠে, সেই কৌশল অবলম্বন করে বামফ্রন্ট শিশু-শিক্ষার রকমফের তৈরী করতে বদ্ধপরিকর এবং তাই রবীন্দ্রনাথের বিকল্পে তারা অনিলাদেবীর লেখা বই শিশু পাঠ্য হিসাবে সর্বত্র চালাতে চায়। সহজপাঠ তাই পরিত্যাজ্য সি, পি, এম দলের কাছে কত বড় শয়তানী বুদ্ধি মাথায় থাকলে তবেই রবীন্দ্রনাথকে বিসর্জন দিয়ে দলীয় কর্মী অনিলাদেবীর লেখা বই শিশুপাঠ্য করার দুর্বুদ্ধি নিয়ে মানুষ আস্ফালন করে। নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্ত বিশ্ববরেণ্য কবি, সাহিত্যিক, প্রবন্ধকার, নাট্যকার শিল্পী ও জন শিক্ষক তরুণদের রবীন্দ্রনাথ আজ বামফ্রন্ট তথা সি, পি, এম দলের কাছে অপাংক্তেয়, আর দলীয় লোক হিসাবে অনিলাদেবী বন্দিতা। হায় বাংলা! হায় তোমার শিক্ষার মান! শার্দুলের বা সিংহের বদলে শৃগাল ভজনার দিন এসেছে আজ বাংলার সি, পি, এম দলের দুর্বুদ্ধির জোরে। ধিক, শতধিক আজ সি, পি, এম তথা বামফ্রন্ট সরকারের ভ্রান্ত ভাষা ও শিক্ষানীতিকে। জনগণ তাই কোমর বেঁধেছে এই মূঢ়তা, এই হীনতা ও এই চক্রান্তকে আজ রুখবেই রুখবে—বলে।

এই সরকারের ভাষা ও শিক্ষানীতি যে দুরভিসন্ধিমূলক, উদ্দেশ্য প্রণোদিত ও সম্পূর্ণ ভ্রান্ত তা পশ্চিমবাংলার সুশিক্ষিত জনমানস সহজেই জেনে ফেলেছে। শিক্ষাক্ষেত্রে চরম অবস্থা, দলীয় অপশাসন ও সরকারের স্বৈরতন্ত্রী স্বেচ্ছাচার প্রতিটি বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষককে প্রতিটি মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষকে ও বিশ্ববিদ্যালয়ের দল নিরপেক্ষ অধ্যাপকবৃন্দকে দারুণ দুশ্চিন্তাগ্রস্ত করেছে। শিক্ষা সংহারের এই হীন প্রচেষ্টায় তাঁরা সকলেই অতিষ্ঠ হয়ে ত্রাহি ত্রাহি রব তুলেছেন জনগণের দরবারে এর প্রতিবাদ ও প্রতিকার আশায়। সুখের কথা স্বস্তির কথা ও আশার কথা এই যে, সারা বাংলার গ্রামে গ্রামে, মহকুমা শহরে ও ছোট বড় গঞ্জে গঞ্জে এবং খোদ কলিকাতা মহানগরীর বুকে বামফ্রন্টের উক্ত ভ্রান্ত নীতির বিরুদ্ধে সবাই সোচ্চার। শিক্ষা সংকোচন বিরোধী ও স্বাধিকার রক্ষা কমিটি গঠিত হয়েছে বাংলার ঘরে ঘরে সর্বস্তরে। এই কমিটি যাঁরা পরিচালনা করছেন তাঁরা স্বনাম খ্যাত শিক্ষক, সাহিত্যিক সাংবাদিক শিল্পী, বুদ্ধিজীবি প্রভৃতি।

এঁদের সঙ্গে সারা বাংলা ছাত্র সংগ্রাম সমিতি সহযোগীতা করেছে, পথসভা করছে মিছিল সহযোগে ও সর্বপ্রকারে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে সাহায্য করছে নিরলসভাবে।

এই সাধু প্রচেষ্টার সামিল হবার জন্য তাঁরা সর্বসাধারণকে ডাক দিয়েছেন। মানুষ দলে দলে এঁদের সভা সমিতিতে যোগ দিয়ে প্রতিরোধ শক্তিকে সুদৃঢ় করার কাজে স্বেচ্ছায় এগিয়ে আসছে। লক্ষণ বেশ ভালই দেখা যায়। প্রবীণ মনীষিদের মস্তিষ্ক ও নবীন ছাত্র ও জনগণের দক্ষিণ হস্ত প্রতিরোধে এগিয়ে এসেছে বেশ সক্রীয়ভাবে। সম্প্রতি বাংলার বিশিষ্ট জ্ঞানী গুণীজন কলিকাতায় এর প্রতিবাদে গণ অনশন চালিয়েছেন এবং তাঁরা যে সুযুক্তিপূর্ণ ভাষণ দিয়েছেন, তাতে সারা বাংলায় সাড়া পড়ে গেছে। সবাই এভাবে প্রতিবাদ মুখর ও প্রতিরোধে বদ্ধপরিকর হলে সি, পি, এম দলের চেতনা ফিরে আসতে পারে। ভাষা শিক্ষার ভ্রান্ত নীতি ও শিক্ষাক্ষেত্রে দলীয় চক্রান্তের হীন প্রচেষ্টা তাতে বন্ধ হতে পারে। প্রতিবাদ যত মুখর হবে জনগণ ততই সজাগ হবে এবং প্রতিরোধ শক্তি বিপুল আকার ধারণ করে বামফ্রন্টের চৈতন্যোদয়ে সাহায্য করবে। এতদ্‌সত্ত্বেও যদি সি. পি, এম তথা বামফ্রন্ট ধনুকভাঙ্গা পণ নিয়ে শিক্ষা সংহারে আরো অগ্রসর হয়, তবে নিশ্চিতভাবে তারা গদীচ্যুত হবে জনরোষের অগ্নিময়ী জ্বালায় জর্জরিত হয়ে। কেউই তাদের আর রক্ষা করতে এগিয়ে আসবে না।

ইংরাজী ভাষা নিয়ে ছিনিমিনি খেলার অধিকার তাদের কে দিল? শাসক দলের লোকেদের ছেলেমেয়েরা ইংরাজী মিডিয়াম স্কুলে পড়বে আর সাধারণের ছেলেমেয়েরা অন্যান্য স্কুলে পড়ে ইংরাজী ভাষা শিখবে না—কি চমৎকার জনদরদী চিন্তা ও ব্যবস্থা সি, পি, এম দলের। সর্বহারার দল সর্বস্বান্তার এই অপকৌশল শিখলো কোন পাঠশালে? কি সাংঘাতিক দলবাজী চলছে?

উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে সকলে সমান অধিকার লাভে বঞ্চিত হবে বামফ্রন্টের হীন চক্রান্তে। ভারতীয় সংবিধান কিন্তু প্রতিটি নাগরিককে সমান সুযোগ সুবিধা ও জন্মগত অধিকারের গ্যারান্টি দিয়েছে। জ্যোতিবাবুরা তাতেও বাধা দিয়ে আরো নূতন নূতন শ্রেণী গঠনে উদ্যত দেখা যায়। শ্রেণী সংগ্রামীরা বাস্তবে ভণ্ড ধাপ্পাবাজ ছাড়া আর কি? শাসক শ্রেণীর মানুষরা পুত্র-পৌত্রাদি ক্রমে শাসনকার্য্য চালাবে উচ্চ শিক্ষার দৌলতে, সাধারণের ছেলে-মেয়েরা কি ক্ষেতে খামারে বা কলেকারখানায় দিন মজুরী করে খাবে চিরকাল সি, পি, এম দলের ভ্রান্ত ভাষা ও শিক্ষানীতির ফলে সাধারণ মানুষ ইংরাজী শিক্ষায় কি বঞ্চিত হবে বাধ্যতামূলকভাবে ক্লাস ফাইভ পর্য্যন্ত, বামফ্রন্টের দুর্বুদ্ধির খেসারত দেবার কারণে? তারা কি মানুষ নয়? তাদের কি ইংরাজীর উন্নত ও জ্ঞানবিজ্ঞানের পক্ষে একান্ত ভাবে অবশ্য পাঠ্য ও জ্ঞাতব্য ভাষা থেকে বঞ্চিত করার অধিকার কারো আছে? এ অধিকার সংবিধান বহির্ভূত, তাই ইংরাজী হটান চলবে না মিথ্যা ও উদ্দেশ্যমূলক দূরভিসন্ধিতে। বামফ্রন্ট তার দলীয় শিক্ষানীতি না পাল্টান পর্য্যন্ত সারা বাংলার মানুষ সংগ্রাম চালিয়ে যাবে—শিক্ষাকে সম্পূর্ণভাবে রাজনীতি মুক্ত রাখতে—তা সে যে কোন মূল্যেই হোক। বাংলার মানুষ সি. পি, এম দলের চালাকি ও হটকারী শয়তানী ধরে ফেলেছে। ফলে হুঁশিয়ার না হলে সামনের নির্বাচনে সি, পি, এম

(শেষাংশ ১১ পৃঃ দেখুন)

বিপ্লবী মহানায়ক রাসবিহারী বসুর উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধাঞ্জলী

কালীপদ সরকার

নেতাজীর অধিনায়কত্বে আজাদ হিন্দ ফৌজের সম্মুখ সমর যে ভারতবর্ষের দীর্ঘ স্বাধীনতা সংগ্রামের চূড়ান্ত অধ্যায় এবং ব্রিটিশের ভারত সাম্রাজ্য ছেড়ে চলে যাবার প্রধানতম কারণ সে বিষয়ে ঐতিহাসিকগণ একমত। দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় জাপানের আক্রমণে ব্রিটিশ শক্তির বিপর্যয়ের সুযোগ নিয়ে যিনি সেই আজাদ হিন্দ ফৌজের পরিকল্পনা এবং সংগঠনে বিশেষ ভূমিকা নিয়েছিলেন তিনি হলেন বিপ্লবী মহানায়ক রাসবিহারী বসু। সে কথা স্মরণ করে মহানায়কের পঞ্চানব্বইতম জন্ম দিবসে তাঁর পুণ্য স্মৃতির উদ্দেশ্যে আমরা গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করছি।

এই সময় রাসবিহারী বসু জাপানে নির্বাসিতের জীবন যাপন করেছিলেন। দেশ থেকে দূরে থাকলেও তিনি ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের কর্মধারা সম্পর্কে নিজেকে অবহিত রাখতেন এবং চিঠিপত্র, প্রবন্ধ ও বেতার ভাষণের দ্বারা সংগ্রামে প্রেরণা সঞ্চার করতেন।

১৮৪২ সালে সিঙ্গাপুরের পতন ঘটে এবং ৭৩ হাজার ব্রিটিশ সৈন্য জাপানের হাতে বন্দী হয়। এই সৈন্য ও সেনানীদের মধ্যে ব্রিটিশের ভারতীয় সেনা ছিল ৪৫ হাজার। সৈন্য ছাড়াও, যে বিপুল পরিমাণ অস্ত্রশস্ত্র জাপানের হস্তগত হয় তার মধ্যে ছিল ৩০০ কামান, ২০০০ মেসিনগান, ৫০,০০০ রাইফেল, ২০০ ট্যাঙ্কে, ১০,০০০ মোটর গাড়ি ও লরী, ২০০ মোটর সাইকেল এবং প্রচুর গুলী, গোলা, পেট্রোল ও যুদ্ধের সাজসরঞ্জাম। তাছাড়া জাপানের হাতে পড়েছিল এক বিরাট মজুদ খাদ্য ভাণ্ডার। এবং কয়েকটা রণপোত, গানবোট ও ট্যাংকার।

এই অস্ত্র ও খাদ্য এবং ভারতীয় যুদ্ধবন্দী সেনা নিয়ে গড়া হয়েছিল আজাদ হিন্দ ফৌজ যার আকসান কমিটির সভাপতি ছিলেন শ্রীরাসবিহারী বসু। পূর্ব এশিয়ায় যখন এইভাবে শেষ মুক্তিযুদ্ধের প্রস্তুতি চলছিল তখন ১৯৪২ সালের আগস্টে বসেছিল বোম্বাই কংগ্রেস কমিটির ঐতিহাসিক অধিবেশন। এই অধিবেশনে গৃহীত হয়েছিল 'ইংরাজ তুমি ভারত ছাড়' প্রস্তাব। যাকে মহাত্মা গান্ধী বলেছিলেন 'যুদ্ধ ঘোষণার নামান্তর'। অধিবেশন প্রাক্কালে বিপ্লবী মহানায়ক রাসবিহারী বসু ব্যাংকক বেতার কেন্দ্র থেকে স্বদেশবাসীর উদ্দেশ্যে যে তেজদীপ্ত ভাষণ দিয়েছিলেন তার অনুবাদটি মহানায়কের জন্মতিথিতে সুধী পাঠকবর্গকে উপহার দিচ্ছি। তিনি বলেছিলেন—

বন্ধুগণ, প্রতিশ্রুত সময় উপস্থিত। আমরা অবশ্যই এখন দীর্ঘ পরাধীনতার শৃংখল ভাঙব। বহু বৎসর ব্রিটিশ শাসনে আমরা যে অপরিসীম নির্যাতন ও দুঃখ ভোগ করেছি এবার তার অবসান ঘটাতেই হবে। ভারতবর্ষ স্বাধীন হবে। দু শতকের ব্রিটিশ অধিকার আমাদের মাতৃভূমিকে চরম দারিদ্র্য ও হীনতার নিমজ্জিত করেছে। ব্রিটিশ অধিকারের পূর্বে চার হাজার বছর ধরে আমাদের দেশ সারা বিশ্বে জ্ঞান ও সভ্যতার আলোক বর্তিকা ছিল। আমরা তখন মানবসমাজের শান্তি, প্রগতি এবং সম্পদ সৃষ্টির কাজে মুখ্য ভূমিকা নিয়েছিলাম। বিশ্ববাসীর দৃষ্টিতে ভারতভূমি ছিল ঐশ্বর্য ও প্রজ্ঞার কেন্দ্র, শিক্ষা ও সংস্কৃতির উৎস স্থল। ভারতের সূক্ষ্ম কারুকার্য

হস্তশিল্প বিশ্বের দরবারে সমাদৃত হত।

দুই শতাব্দীর ইংরাজ শাসন আমাদের সমৃদ্ধ শিল্পকে নির্দয় ভাবে ধ্বংস করেছে, জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাকে বিলোপ করেছে এবং প্রবুদ্ধ ভারতবর্ষকে নিরক্ষর অশিক্ষিতের দেশ করে ছেড়েছে। দেশের কোটি কোটি কৃষককে নিরন্ন ও ঋণগ্রস্ত করে দুর্দশার চরম অবস্থায় নামিয়েছে।

বন্ধুগণ, ভারত পরাধীনতার অন্ধকারে অনেক কিছু হারিয়েছে কিন্তু হারায় নি তার আত্মিক শক্তিকে। ভারতাত্মাকে ইংরাজ বিনাশ করতে পারে নি। ভারতবর্ষ তার আত্মবিস্মৃতি থেকে জেগে উঠেছে। মহাত্মা গান্ধীকে ধন্যবাদ জানাই, তাঁর আন্দোলন ও প্রচারের ফলে গত দুই দশকে ভারতবর্ষ বিস্ময়কর সচেতনতা লাভ করেছে এবং সাংস্কৃতিক দাসত্ব থেকে মুক্ত হবার জন্য সচেষ্ট হয়েছে। মহাত্মা আমাদের জাতীয় অবনতির শিকড় ধরে টান দিয়েছেন।

মহাত্মা গান্ধী আমাদের বুঝিয়ে দিয়েছেন যে আমরা ভারতীয়রা, যে পর্যন্ত না আমাদর জাতীয় সংস্কৃতিকে মনে প্রাণে গ্রহণ করি, আত্মশক্তিতে বিশ্বাসী হই এবং নিয়ম নিষ্ঠা পালন করি, আমরা প্রবল শক্তি সাম্রাজ্যবাদীকে কিছুতেই পরাভূত করতে পারব না। তিনি গত বিশ বছর ধরে ভারতের কোটি কোটি নরনারীকে এই শিক্ষা দিয়েছেন। আপনারা আমার চেয়ে এ বিষয় বেশি জানেন।

আমরা সবাই বুঝতে পারছি, ভারতবর্ষের চূড়ান্ত মুক্তিযুদ্ধ কাল সমাগত। শেষ হিসাব নিকাসের দিন এসে গেছে। মহাত্মা গান্ধী তাঁর ঐতিহাসিক চরম পত্রে অবিলম্বে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা দাবী করে ব্রিটিশ সরকারকে লিখেছেন। ইংরাজ যদি সেই দাবী মেনে নেয় তবে আনন্দের কথা। কিন্তু আমার মনে সে সম্পর্কে সন্দেহ আছে. আপনাদেরও আছে নিশ্চয়ই।

ইতিহাস এই কথায় বলে যে, ব্রিটিশ ন্যায় ও যুক্তির ভাষা বোঝে না। সুতরাং সংগ্রাম অপরিহার্য এবং তার জন্য আমাদের প্রস্তুত হতে হবে। আমরা যেন ভুলি না যে, মহাত্মাও অধিনায়কত্বে কঠোর সংগ্রামের পক্ষেই আমাদের জাতীয় মুক্তি নির্ভর করছে।

আমি আমার দেশবাসীকে এই আশ্বাস দেবার যোগ্যতা রাখি যে, ভারতবর্ষ থেকে ব্রিটিশ সমর প্রচেষ্টাকে নির্মূল করা ছাড়া জাপানের ভারত আক্রমণের অপর উদ্দেশ্য নেই। ব্রিটিশকে যে ভারত ছাড়তে হবে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। আমরা নিজেরা যদি তাদের তাড়াতে পারি তাহলে জাপ আক্রমণ ঘটবে না। পশ্চাদপসরণ কালে ইংরাজ মালয় বার্মা প্রভৃতি দেশে কিভাবে নাশকতা চালিয়ে ছিল তা আমরা দেখছি। জাপ-আক্রমণ ঘটলে ইংরাজ ভারত ত্যাগের কালে সেখানেও ধ্বংসাত্মক কাজ চালাবে।

আমি তাই আমার স্বদেশবাসী ও সহকর্মীদের উদ্দেশ্যে বলছি যে, তারা যেন মহাত্মার নেতৃত্বে ঐক্যবদ্ধ হয়ে সংগ্রামে যোগ দেন এবং ব্রিটিশকে ভারত বর্ষ ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য করেন।

আমি মহান নেতা মিঃ জিন্না এবং তাঁর অনুগামীদেরও অনুরোধ জানাচ্ছি যে, দেশের এই সঙ্কটকালে তাঁরা যেন কংগ্রেস বিরোধীতা থেকে বিরত থাকেন। সমগ্র হিন্দুস্থানের স্বাধীনতা লাভের বিচারে তাঁরা পাকিস্থান দাবির প্রশ্নটি সাময়িকভাবে মুলতবী রাখেন।

আমাদের আগামী যুদ্ধ এমন হবে যার তুলনা পৃথিবীতে নেই। যে সুবর্ণ সুযোগ এসেছে তাকে আমরা কিছুতেই হাতছাড়া করতে পারি নে। এ কথা আমরা যেন ভুলে না যাই যে, এখন আমরা যদি ঐক্যবদ্ধ হয়ে মরণ পণ সংগ্রাম না করতে পারি তাহলে বহুকাল আমাদের দুর্দৈবের শিকার হতে হবে। বন্দে মাতরম্।

সকলেই জানেন, মহাত্মা গান্ধী দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-কালে বিপন্ন ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে কংগ্রেস কর্তৃক সংগ্রামের বিরোধী ছিলেন। তিনি এ কথাও বলে-ছিলেন যে, এরূপ সংগ্রাম অহিংস সত্যাগ্রহের আদর্শ পরিপন্থী। ১৯৪২ সালের আগষ্টে এমন কি ঘটে-ছিল যাতে মহাত্মার চিন্তাধারার আমূল পরিবর্তন হল? কংগ্রেস হাই কমাণ্ডের অনেক নেতাই মহাত্মার মত পরিবর্তনে বিস্মিত হয়েছিলেন। মৌলানা আজাদ স্পষ্টই বলেছেন যে এই পরিবর্তনের মূলে ছিল সুভাষ চন্দ্রের জার্মানীতে উপস্থিতি, অক্ষশক্তিদের সাহায্যে ভারতের সশস্ত্র মুক্তিসংগ্রাম গঠনের সংবাদ এবং মিয়মিত বেতার ভাষণ।

কিন্তু সেটি মহাত্মার মতবদলের সবটুকু হেতু নয়। জাপানে অবস্থানরত এবং জাপানী নেতৃবর্গের আস্থা-ভাজন রাসবিহারী বসুর বেতার ভাষণগুলিও মহাত্মাকে নিঃসন্দেহে প্রভাবিত করেছিল। তা না হলে গান্ধীজী বলতেন না, 'জাপান যে ভারতবর্ষ আক্রমণ করবে তার নিশ্চয়তা নেই। জাপান আমাদের শত্রু নয়। আগে ইংরাজ ভারত ছাড়ুক, তারপরে জাপানের কথা ভাবা যাবে।

মহাবিপ্লবী রাসবিহারীর জীবন এক অখণ্ড বিপ্লব সাধনার মূর্ত ইতিহাস।

৯-এর পৃষ্ঠার শেষাংশ

দলের তরাডুবি হবেই হবে। শিক্ষা নিয়ে দলবাজী ও স্বেচ্ছাচার মানুষ কিছুতেই আর সহ্য করবে না। রামকৃষ্ণ মিশনের সাধুসন্তগণ সি, পি, এম-এর দলীয় চক্রান্তে ভরা ভ্রান্ত ও জঘন্য হীন শিক্ষানীতির বিরুদ্ধে গর্জে উঠেছেন। তাঁরা এর বিরুদ্ধে প্রয়োজনবোধে প্রাণদানে প্রস্তুত বলে মহাসম্মেলনে প্রকাশ্যে ঘোষণা করেছেন। বাংলার মনীষা ভ্রান্ত না সি, পি, এম দল ভ্রান্ত সংগ্রামের ক্ষেত্রে তা প্রমাণ হবে। তাই বাংলার ঘরে ঘরে এই শিক্ষা সংকোচন ও জন-বিরোধী ভাষানীতির বিরুদ্ধে সক্রীয় আন্দোলনের যে ডাক দল নিরপেক্ষ সুশিক্ষিত মানুষজনেরা দিয়েছেন ও এর বিরুদ্ধে তাঁরা বাস্তব প্রতিরোধ গড়ে তোলার যে আহ্বান জানিয়েছেন তাকে সুশৃঙ্খল উপায়ে সর্বতোভাবে সফল করার জন্য সাধারণ মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে বাংলার বিপ্লবী ও স্বাধীনতা সংগ্রামীরা সানন্দে সামিল হবেন, এই বিশ্বাস রাখি।

গ্রাহক ও পাঠক ও বন্ধুজনদের নিকট নিবেদন

একটি একটি করে 'বিপ্লবী বাংলার' জীবনের দশবছর পূর্ণ হতে চলেছে। একদিন যখন স্বাধীনতা সংগ্রামীদের মুখপত্র হিসাবে এই পত্রিকাটি আত্মপ্রকাশ করেছিল বিশেষ কর্তব্য পালনের জন্য, সেই প্রয়োজন সেদিনও যেমন ছিল, আজও তেমনি আছে। বরং দেশের বর্তমান সঙ্কটজনক পরিস্থিতিতে, তার গুরুত্ব ও দায়িত্ব আরো বেড়েছে। নির্ভীক এবং স্বাধীন পত্রিকা হিসাবে এই পত্রিকাটি যাত্রা শুরু করেছিল এবং আগামী দিনেও একই আদর্শ নিয়ে চলতে কৃতসঙ্কল্প।

সর্বস্তরেই আপনাদের সাহায্য, সহানুভূতি ও দরদ ব্যতীত এই পত্রিকা বাঁচতে এবং বাড়তে পারত না। যে আদর্শনিষ্ঠ, দেশপ্রেমিক লেখকবৃন্দ ও বিভিন্ন স্তরে বন্ধুজনেরা বিনা পারিশ্রমিকে এই পত্রিকার জীবনযুদ্ধে সহায়তা করেছেন তাদের অবদানও অনস্বীকার্য।

কিন্তু ঊর্ধ্বমুখী দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির জন্য খরচও বেড়েছে বহুল পরিমাণে। সব পত্র পত্রিকাই তাঁদের বিক্রয়মূল্য বাড়িয়েছেন ধাপে ধাপে। সেকথা বলাই বাহুল্য। এত কম মূল্যে এই পত্রিকার জীবনধারণের পথে প্রবল অন্তরায় সৃষ্টি হচ্ছে। আমরা পত্রিকা পরিচালনা করি Profession বা ব্যবসায় হিসাবে নয়। এটা করা হয় আমাদের আপনাদের একটি mission বা জীবনের উদ্দেশ্য হিসাবে। তবুও ন্যূনতম ব্যয়ভার মেটাতে না পারলে কর্তব্য পালন করা দুরূহ।

আমাদের মনে কোন সন্দেহ নেই যে আপনারাও এই পত্রিকাটিকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য সচেষ্ট হবেন এবং আপনাদের নিকট থেকে যে সাহায্য, সহানুভূতি, সমর্থন ও শুভেচ্ছা পেয়ে এসেছি, সেটা অব্যাহত থাকবে।

পত্রিকাটির মূল্যহার আমরা কিছু পরিমাণে বর্দ্ধিত করতে চাই। এ সম্বন্ধে আপনাদের মতামত জানাতে সনির্বন্ধ অনুরোধ করি।

পত্রিকার কার্য্যালয়
৪নং বল্লভদাস ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০০৭

বিনীত নিবেদক
শান্তিশরণ রায়চৌধুরী—সম্পাদক

RegdNo.R. N .24911/71 | Biplabi Bangla | Regd. WB/NC 77
Phone : 34-1795
বার্ষিক :—সডাক ১৫.০০ টাকা | বাণ্মাষিক :—৮.০০ টাকা | মূল্য—৩০ পয়সা

পাক সেনাপতি ইয়াহিয়া খানের জল্লাদবাহিনী যে গ্রন্থ পুড়িয়ে ছাই করে দিয়েছিল বিপ্লব তাপস মহারাজ ত্রৈলোক্যনাথের সেই অবিস্মরণীয় গ্রন্থ "জেলে ত্রিশ বছর ও পাক ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম" পুনর্মুদ্রিত হল।

দাম—ত্রিশ টাকা

প্রাপ্তিস্থান
বাণী প্রতিষ্ঠান
১৫, কলেজ স্কোয়ার,
কলিকাতা-১২

সম্পাদক—
শ্রীশান্তিশরণ রায়চৌধুরী
॥ সম্পাদকমণ্ডলী ॥
শ্রীজগদীশ চট্টোপাধ্যায় (সভাপতি)
শ্রীভক্তেশচন্দ্র নন্দী
পুষ্প চ্যাটার্জী
মলয় ঘোষ
প্রকাশক ও মুদ্রক—
শ্রীঅনিল সেনগুপ্ত
দিল্লীর বিশেষ প্রতিনিধি—
শ্রীবাসীন ঘোষ
বেহালা—
শ্রীনন্দগোপাল পাল

বিপ্লবী পুস্তকমালা

নেতাজীর সিক্রেটসার্ভিস—ডাঃ পবিত্রমোহন রায়—১০.০০

বিপ্লবী মহানায়ক রাসবিহারী—সুবোধ মজুমদার

অনুশীলন সমিতির বিপ্লবী প্রচেষ্টা—ব্রজেন্দ্র দাস

—ক্ষীরোদ কুমার দত্তের—

১। বাংলার অগ্নিযুগ—১.৫০, ২। বহির্ভারতে ভারতীয় বিপ্লব প্রচেষ্টা—৮.০০ ৩। অনুশীলন সমিতির পি, মিত্তির—২.০০, ৪। সৈনানী সংগ্রাম কাহিনী—১.০০, ৫। কাকোরী শহীদবৃন্দ—১.২৫, ৬। কলকাতা বোমা সংগ্রাম কাহিনী—.৭০, ৭। রাসবিহারী ও অনুশীলন সমিতি—.৯০ ৮। স্বাধীনতাসংগ্রামে মা ও মেয়ে—.৭০, ৯। বিবেকানন্দ ও সমাজবাদ—.৮০ ১০। বিপ্লবী বিবেকানন্দ—.৫০, ১১। মহাত্মাজী ও সুভাষচন্দ্র—.৫০ ১২। ভারতের নবজাগরণ ও ভগিনী নিবেদিতা—.৭৫, ১৩। দেশ বন্ধুর জেলেনি (১)—১.০০, ১৪। দেশ বন্ধুর জেলেনি (২)—২.০০ ১৫। শহীদ চন্দ্রশেখর আজাদ—.৫০, ১৬। ১০ই এপ্রিল জাতীয় শহীদ দিবস—১.০০, ১৭। হাজির হজ্জা প্রচেষ্টা—.৭৫, ১৮। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও অনুশীল সমিতি—৪.০৫, ১৯। ভারতের জাতীয় পতাকার ইতিহাস—.৫০, ২০। লাট হত্যা প্রচেষ্টা—১.৫০

প্রাপ্তিস্থান :— ৪নং বল্লভ দাস ষ্ট্রীট কলিকাতা-৭০০০০৭

নৈহাটী—১/১/১/A বঙ্কিম চ্যাটার্জী ষ্ট্রীট কলিকাতা-১০

মূল কার্যালয়—৪নং বল্লভ দাস ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০০৭ শ্রীঅনিল সেনগুপ্ত কর্তৃক প্রকাশিত এবং তৎকর্তৃক প্রিন্টিং পাবলিসিটি, ১১৭, কেশবচন্দ্র সেন ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০০৯ হইতে মুদ্রিত।

বিপ্লবী বাংলা

॥ বিপ্লবী পরিষদের সাপ্তাহিক মুখপত্র ॥
স্থাপিত—১৯৫৬, 'বিপ্লবী বাঙ্গালী' নবকলেবরে—১৯৭১

দশম বর্ষ	শনিবার ১৬ই জ্যৈষ্ঠ ১৩৮৮ ৩০শে মে ১৯৮১	৩১ সংখ্যা

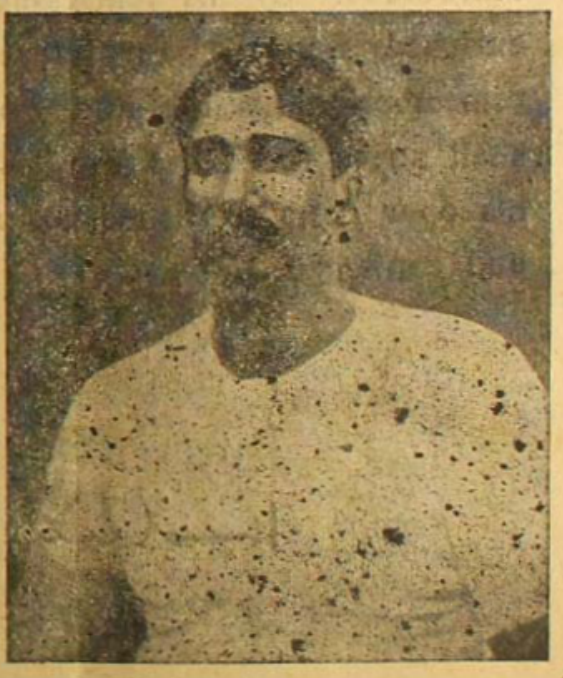

বিপ্লবীনায়ক হেমেন্দ্রকিশোর আচার্যচৌধুরী

জন্ম : ২৮শে মে, ১৮৮১ / মৃত্যু : ২৬শে জুন, ১৯৩৮

শুভ
জন্ম শতবর্ষে
বিপ্লবী পরিষদের
শ্রদ্ধাঞ্জলী
১৯৮১

PRIME MINISTER

MESSAGE

Shri Hemendra Kishore Acharya Chowdhury was one of the leading lights of the Jugantar group of patriots and a close associate of Aurobindo. By his fearlessness and sacrifice he enriched Bengal's revolutionary tradition. In remembering his life and work, I hope that we shall strive to realise the vision, which he and his co-workers cherished, of a free, courageous and contented India.

Indira Gandhi

(Indira Gandhi)

সম্পাদকীয়

বিদ্রোহী কবি নজরুল ইস্‌লাম

বাংলাদেশের সমগ্র জীবনে যখন নবজাগরণের যুগ প্রবর্তন ঘটেছিল, বিদ্রোহী কবি সেই নবযুগের একজন অনন্য সাধারণ স্রষ্টা, ধারক ও বাহক। সীমিত অর্থে তিনি রণক্ষেত্রে একজন সাধারণ সৈনিকের বেশ ধারণ করলেও, প্রকৃতপক্ষে তিনি ছিলেন মনুষ্যজাতির চিরকালের অন্যায়ের বিরুদ্ধে, অত্যাচারের বিরুদ্ধে, শোষণের বিরুদ্ধে, চিরসুন্দরের প্রতিষ্ঠার যুদ্ধে, শাশ্বত মূল্যবোধের পুনর্বাসন প্রচেষ্টার যুদ্ধে, একজন নিরলস যোদ্ধা। নজরুলের আবির্ভাব যেন একটী ধূমকেতুর আবির্ভাব, যার কাজ ছিল অগ্নিসেতু বন্ধন, 'দুর্দিনের দুর্গশিরে' বিজয় কেতন উড়িয়ে দেবার সাধনা ও তপস্যা। তিনি জাগিয়ে দিয়েছিলেন 'চমক মেরে, আছে যারা অর্দ্ধচেতন।' আজ এই অসাধ্য সাধন করেছিলেন ইতিহাসের এমন একটী সময়, যখন সমগ্র দেশ আলোকিত, উজ্জীবিত ও প্রাণচঞ্চল ছিল, রবীন্দ্র প্রতিভার চোখ-ঝলসানো, মনমাতানো আলোকচ্ছটায়।

কবি নজরুল বিধাতার এক অপূর্ব সৃষ্টি। একহাতে তাঁর বাঁশের বাঁশরী, অন্যহাতে রণতূর্য্য। তাঁর স্বকীয়তা, তার চিন্তা ভাবনার বৈশিষ্ট্য, তার কর্মধারার বৈচিত্র্য, এমন বিভিন্নগুণের অপূর্ব সমাহার মানব চরিত্রে বিরল। তাঁর কথাতেই তাঁর পরিচয় মিলবে।

বল বীর, বল চির উন্নত মমশির,
শিরনেহারি আমারি, নত-শির ওই শিখর হিমাদ্রির।

আবার

মহাপ্রলয়ের আমি নটরাজ, আমি সাইক্লোন আমি ধ্বংস।
আমি মহাভয়, আমি অভিশাপ পৃথিবীর।

আমি সৃষ্টি, আমি ধ্বংস। আমি খোদাকে ছাড়া কাহাকেও করিনাকো কুর্নিস। নজরুল ছিলেন বিশ্ব বিদ্রোহী। তাঁর বিদ্রোহী মনে বিদ্রোহী বন্দনায় এমন সুর বেজেছিল, যে জন্য তিনি বলতে পেরেছিলেন—

আমি সেইদিন হব শান্ত,
যবে উৎপীড়িতের ক্রন্দন রোল আকাশে বাতাসে ধ্বনিবেনা
অত্যাচারীর খড়্গ কৃপাণ ভীম রণভূমে রণিবেনা।
বিদ্রোহী রণক্লান্ত
আমি সেইদিন হব শান্ত।

অত্যাচার অবিচার থেমে যায় নি, নজরুলও তাই শান্ত হননি কখনও।

নজরুল অমর লেখনী কি দুর্নিবার আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল, তখনকার দিনের মানুষের মনে। নেতাজী সুভাষচন্দ্রের মত অসাধারণ মানুষকেও তাঁর কবিতা কি দারুণভাবে প্রভাবিত করেছিল, নেতাজীর কথাতেই বলা যাক্। 'বিভিন্ন প্রাদেশিক ভাষার জাতীয় সঙ্গীত শুনবার সৌভাগ্য আমার হয়েছে। কিন্তু নজরুলের 'দুর্গম গিরি কান্তার মরু'র মতো প্রাণমাতানো গান কোথাও শুনেছি বলে মনে হয় না। কবি নজরুল যে স্বপ্ন দেখেছিলেন, সেটা শুধু তার নিজের স্বপ্ন নয়—সমগ্র বাঙ্গালী জাতির স্বপ্ন।'

বাংলার বিপ্লবীরা তাদের দুরন্ত আদর্শের উদগাতারূপে তাঁকে আপন করে গণ্য করতেন, যেমন করতেন রবীন্দ্রনাথকে। নজরুল প্রকৃতপক্ষে বিপ্লববাদের চারণ কবির ভূমিকায় যাত্রা শুরু করেন। জীবনের সর্বস্তরে কুসংস্কার, অন্ধ বিশ্বাস, সঙ্কীর্ণতা চেতনাহীনতার বিরুদ্ধে দারুণ আঘাত হেনেছিলেন। তাই তিনি বলেছেন :

আমি গাহি সাম্যের গান—
মানুষের চেয়ে বড় কিছু নাহি, নহে কিছু মহীয়ান।

নজরুল ছিলেন মহাক্ষত্রিয়। তিনি ছিলেন সত্যের একনিষ্ঠ পূজারী। তিনি মানুষের মধ্যে কোন ভেদাভেদ দেখতেন না।

নাই দেশ-কাল-পাত্রের ভেদ, অভেদ ধর্মজাতি,
সব দেশ সব কালে ঘরে ঘরে তিনি মানুষের জাতি।

নজরুলের ধর্মনিরপেক্ষতা ছিল অত্যাশ্চর্য্য রকমের। কাউকে তিনি ছেড়ে কথা বলেন নি। তাই তাঁর কণ্ঠে শোনা যায়,

খোদার ঘরে কে কপাট, কে দেয় সেখানে তালা?
সব দ্বার এর খোলা হবে, চালা হাতুড়ি শাবল চালা।

কবি বড় দুঃখে আবারো বলেছেন—

মানুষেরে ঘৃণা করি,
ও কারা কোরাণ, বেদ, বাইবেল চুম্বিছে মরি মরি।

কবি নজরুল বিশ্বমানবতার প্রেমে অভিষিক্ত হৃদয়ে সমাজের ও রাষ্ট্রের নির্যাতীত নরনারীর বেদনায় আকুল কণ্ঠে গান গেয়েছেন, কবিতা রচনা করেছেন। বিদ্রোহী কবির সঙ্গীত নির্ঝর সারা দেশে,

বিশেষ করে বাংলাদেশে, মানুষের হৃদয়ে অটুট আত্মবিশ্বাস সঞ্চারিত করেছিল। সেই আত্মবিশ্বাস থেকেই বিপ্লবীর রক্তে জাগে প্রত্যয় শিখা।

আমরা সৃজিব নতুন জগৎ, আমরা গাহিব নতুন গান।

নজরুল মেয়েদের সম্বন্ধে অতি উচ্চ ধারণা পোষণ করতেন। নারি জাতির প্রতি তাঁর সম্মানবোধও ছিল প্রখর। হয়ত এক মহীয়সী মহিলা, যাঁকে তিনি মায়ের মত জ্ঞান করতেন, শ্রদ্ধা করতেন, তাঁর জীবনে অদীম সাহস প্রভাব বিস্তার করেছিলেন, এই অনুভূতিটা আরো প্রবল হয়েছিল। তিনি বলেছেন—

জগতের যত বড় বড় জয়,
বড় বড় অভিযান,
মাতা, ভগ্নি ও বধূদের
ত্যাগে হইয়াছে মহীয়ান।

অথবা

জগতে যা কিছু মহান সৃষ্টি
চিরকল্যাণ কর,
অর্দ্ধেক তার করিয়াছে নারী,
অর্দ্ধেক তার নর।

যুবকের উপরও তাঁর আস্থা ছিল গভীর। তাদের প্রতি নানাভাবে উদাত্তকণ্ঠে আহ্বান জানিয়েছেন।

অগ্রপথিক রে যুবকদল;
জোর কদমে চল।
প্রলয় নূতন সৃজন বেদন,
আসছে নবীন, জীবনহারা অসুন্দরে করতে ছেদন।

তারুণ্যের উদ্দেশ্যে নজরুলের কণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছে—

নাকের বদলে নরুণ চাওয়া এ তরুণের নাহি চাই—
আজাদ মুক্ত স্বাধীন চিত্ত যুবাদের গান গাই।
হোক সে পথের ভিখারী, সুবিধা শিকারী নহে যে যুবা
তারি জয়গাথা গেয়ে যায় চিরদিন মোর দিলরুবা।

আরও বলেছেন—

এরা দুর্জয়; এরা নির্ভয়, এরা আল্লার সেনা,
এরাই ফোটায় নিরাশার বনে আমার হাসনা হানা।

আজকের দিনে জাতি-গঠনের সময়; দেশের সঙ্কট মোচনের সময় এই ত সকল মানুষের একান্ত কামনা।

নজরুলের যৌবনের পূজারী বলে যৌবনের প্রতীক পৃথিবীর শ্রমশক্তির বিজয় সঙ্গীতে মুখর ছিলেন, শ্রমজীবীদের সম্বন্ধে তার ঘোষণা—

গাহি তাহাদের গান
ধরণীর হাতে দিল আনি ফসলের ফরমান।

নিরন্ন, পদদলিত, শোষিত লোকদের, দুঃখ কষ্ট তাঁকে অভিভূত করেছিল। কবিকে তাই দেখা যায় সর্বহারাদের প্রতিভূরূপে। তাঁর বীনাও নতুন ঝঙ্কার ধ্বনিত হয়। তাই তিনি বলেছেন—

সাম্যের গান গাই—
আমার চক্ষে পুরুষ রমণী কোন ভেদাভেদ নাই।

তিনি বুর্জোয়া সমাজের মাপকাঠি দিয়ে পাপ পুণ্যের বিচার করেন নি। তিনি বলেছেন—

যত পাপী তাপী সব মোর বোন, সব হয় মোর ভাই;
অন্যের পাপ গণিবার আগে নিজেদের পাপ গোণো।

এই তর্ক ধরিয়াই তিনি চোর ডাকাতকে সম্বোধন করে বলেছেন—

কে তোমারে বলে ডাকাত বন্ধু, কে তোমারে চোর বলে?
চারিদিকে বাজে ডাকাতি ডঙ্কা, চোরেরি রাজা চলে।
ছোটদের সব চুরি করে আজ বড়রা হয়েছে বড়।

যে জাতিভেদ আজ দেশের অভিশাপ হয়ে দাঁড়িয়েছে, বহু আগে তাঁর মানবলোকে তার ছবি ফুটে উঠেছিল। তাই তিনি বলেছিলেন—

জাতের নামে বজ্জাতি সব, জাত-জালিয়াৎ খেলছে জুয়া।
ছুলেই তোর জাত যাবে? জাত কি ছেলের হাতের মোয়া।
বলতে পারিস বিশ্বপিতা ভগবানের কোন সে জাত?
নারায়ণের জাত যদি নাই,
তোদের কেন জাতের বালাই?

নজরুল বিংশ শতাব্দীর বাংলা, তথা ভারতের, নব জাগরণের অন্যতম প্রধান ঋত্বিক। গানে, ছন্দে কারাদণ্ড ভোগের মধ্য দিয়ে সঞ্জীবনী মন্ত্র সঞ্চারিত করে গিয়েছেন। 'কারার ঐ লৌহ কপাট / ভেঙে ফেল কর্‌রে লোপাট / রক্ত-জমাট শিকল পূজার পাষাণ-বেদী / আবার দুর্গম গিরি কান্তার মরুদুস্তর পারাবার হে / লঙ্ঘিতে হবে রাত্রি নিশীথে যাত্রীরা হুসিয়ার।' কিম্বা 'ফাঁসির মঞ্চে গেয়ে গেল যারা জীবনের জয়গান/আসি অলক্ষ্যে দাঁড়ায়েছে তারা দিবে কোন বলিদান এবং এ জাতীয় বহু রচনা বহু অচেতন মানুষের মনে চেতনা উদ্বুদ্ধ করেছে, আদর্শ লাভের জন্য সঙ্ঘবদ্ধ করেছে, বহু শহীদকে নিজেদের অস্থি দিয়ে জেলেছে দেশে যজ্ঞানল। তবু তিনি চির অশান্ত। সখেদে বলেছেন—

রক্ত ঝরাতে পারি নাতো একা,
তাই লিখে যাই এ রক্ত লেখা।

যারা আমাদের মুখের গ্রাস কেড়ে খাচ্ছিল, তাদের বিরুদ্ধে তার প্রার্থনা ছিল, 'যেন লেখা হয় আমার রক্ত-লেখায় তাদের সর্বনাশ।'

নজরুল সমস্ত ধর্মের মৌল কথা শুধু অনুভবই করেন নি, তাঁর প্রতি কথায়, কাজে, গানে, রচনায় তার অলন্ত স্বাক্ষর রেখে গিয়েছেন, তাই নজরুল কোন সম্প্রদায়ের বা ধর্মের প্রবক্তা ছিলেন না। তিনি ছিলেন একজন বিশ্বমানব।

আর কতকাল থাকবি বেটী,
মাটির ঢেলায় মূর্ত্তি আড়াল,
স্বর্গ যে আজ জয় করেছে
অত্যাচারী শক্তি চাঁড়াল।

হিজলী বন্দীশালায় নিহত রাজবন্দীদের সম্বন্ধে যে প্রশ্ন তুলেছিলেন কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ, এ যেন তারই পরিপূরক।

নজরুল বিপ্লবী মহানায়ক রাসবিহারী বসুর মত বিশ্বাস করতেন, যে তিনি যন্ত্র, যন্ত্রীর নির্দেশেই চলেন। 'ধূমকেতুর' মামলায় তাঁর ঐতিহাসিক বিবৃতি এর পরিচয় দেয়।

'সত্য স্বয়ং প্রকাশ। তাকে কোন রক্ত আঁখি রাজদণ্ড নিরোধ করতে পারে না। দোষ আমারও নয়, আমার বীণারও নয়। দোষ তাঁর যিনি আমার কর্ণে তাঁর বীণা বাজান। প্রধান রাজদ্রোহী সেই বীণাবাদক ভগবান।'

নজরুলের অবদান কোন বিশেষ যুগ, বা বিশেষ কোন দেশের জন্য নয়। তার অবদান বিশ্ব-মানবের জন্য. শাশ্বত কালের জন্য। আজকের দিনে সারা বিশ্ববাসী নজরুলের অভাব বোধ করছে একান্তভাবে।

আমরা নজরুলের এই জন্মদিনে তাঁর উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা নিবেদন করি। প্রত্যাশা করি দেশের মানুষ নজরুলের প্রদর্শিত পথে, সব ক্ষুদ্রতা, মালীনতা, সঙ্কীর্ণ আবর্জনায় আগুন জ্বালিয়ে নব উদ্যমে দেশসেবায় আত্মনিয়োগ করে নজরুলকে প্রকৃতভাবে সম্মান জানাবেন এবং নিজেরা ধন্য হবেন।

জয়তু কবি নজরুল ইসলাম।

ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্কে কি চিড় ধরেছে ?

কালীপদ সরকার

স্বাধীন বাংলাদেশের প্রায় দশ বছর অতিক্রান্ত। বাংলাদেশ রাষ্ট্র গঠনে ভারতের ভূমিকা কি ছিল তা এখন বিস্মৃত প্রায় ইতিহাস। ভারতের এ ব্যাপারে যে বিরাট অবদান ছিল বাংলাদেশীরা এখন তা ভুলেও মনে করে না। সেখানকার স্কুল কলেজে যে ইতিহাস পড়ানো হয় তাতেও বিষয়টি অনুল্লিখিত।

১৯৭০ সালে পাকিস্থানে যে সাধারণ নির্বাচন হয় তাতে আওয়ামী লীগ নিরংকুশ সংখ্যা গরিষ্ঠতা লাভ করে এবং আওয়ামী লীগ নেতা শেখ মুজিবর রহমান যথানিয়মে সমগ্র পাকিস্থানের প্রধানমন্ত্রীত্ব লাভের যোগ্যতা অর্জন করেন। তখন পাকিস্থানের প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান এবং পি, পি, পার্টির নেতা মি: ভুট্টো চক্রান্ত করে, নির্বাচনের রায়কে বানচাল করতে উদ্যত হলে, ১৯৭১ সালের ২৬শে মার্চ শেখ মুজিব পূর্ব-পাকিস্থানকে স্বাধীন বাংলাদেশ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্ররূপে ঘোষণা করেন। ইয়াহিয়া খান আওয়ামী লীগকে বে-আইনী ঘোষণা করেন এবং পূর্ব-পাকিস্থানকে শায়েস্তা করতে সেনাদল নামান।

১৯৭১ সালের ২৮শে মার্চ স্বাধীন বাংলার বেতার কেন্দ্র অস্থায়ী স্বাধীন বাংলাদেশ সরকার গঠনের সংবাদ প্রচার করে। একদিকে শুরু হয় মুক্তিযুদ্ধ, অন্যদিকে চলে পাক সৈন্যদলের নৃশংস আক্রমণ, হত্যা ও ধ্বংসকাণ্ড। ছয়মাসের মধ্যে দশলক্ষের উপর বাঙালী হিন্দু ও মুসলমান প্রাণ হারান এবং এক কোটি বাঙালি শরণার্থী ভারতে আশ্রয় নেন। ১৯৭১ সালের ৩রা ডিসেম্বর পাকিস্থান ভারতের বিমান ক্ষেত্রগুলির উপর বোমা বর্ষণ করে ভারত আক্রমণ শুরু করে এবং ভারতীয় বাহিনী একযোগে পশ্চিম ও পূর্ব পাকিস্থানে পালটা আক্রমণ চালায়। ১৯৭১ সালের ৬ই ডিসেম্বর ভারত স্বাধীন বাংলাদেশের অস্থায়ী সরকারকে কূটনৈতিক স্বীকৃতি দেয় এবং মুক্তি ফৌজের সহিত পূর্ব পাকিস্থানে ইয়াহিয়া খানের জল্লাদ পাক সেনাদলকে কোণঠাসা করে। ১৬ই ডিসেম্বর বাংলাদেশে যুদ্ধরত ৯০ হাজার পাক সেনা ভারতীয় বাহিনীর নিকট আত্মসমর্পণ করে।

পশ্চিম পাকিস্থানের রণক্ষেত্রে অগ্রগামী ভারতীয় বাহিনী এক তরফাভাবে যুদ্ধ-বিরতি ঘোষণা করে এবং জলে, স্থলে এবং আকাশযুদ্ধে পরাভূত পাকিস্থান সেই ঘোষণাকে মেনে নেয়। এইভাবে ১৯৭১ সালের পাক-ভারত যুদ্ধের অবসান ঘটে এবং স্বাধীন বাংলাদেশের জন্ম হয়। ১৯৭২ সালে শেখ মুজিবর রহমান পশ্চিম পাকিস্থানের জেল থেকে মুক্তি পেয়ে ঢাকায় ফিরে আসেন এবং গণতন্ত্র, জাতীয়তাবাদ, ধর্মনিরপেক্ষতা ও সমাজতন্ত্রের আদর্শে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ রাষ্ট্র গঠন করেন। ছই বাংলার মানুষ তাঁর নাম দেয় বঙ্গবন্ধু এবং নতুন রাষ্ট্র বাংলাদেশ তাঁকে জাতির পিতারূপে সম্মানিত করে।

১৯৭৩ সালে বাংলাদেশ ভারতের সহিত মৈত্রী চুক্তি সম্পাদন করে, ঐ চুক্তির মেয়াদ না ফুরালেও বর্তমান বাংলাদেশ সরকার চুক্তিটির উপর তেমন

গুরুত্ব দেন বলে মনে হয় না। গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতার যে নীতি ভিত্তি করে বাংলাদেশ রাষ্ট্র গঠিত হয়েছিল, তাও এখন বাতিল। ১৯৭৫ সালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের হত্যার সঙ্গে বাংলাদেশের গতি-প্রকৃতি সম্পূর্ণ পালটে গেছে। বাংলাদেশকে পুনরায় ইসলামীয় ধর্মীয় রাষ্ট্র ঘোষণা করা হয়েছে এবং তার রাষ্ট্রনীতি পাকিস্থানের আসল ভারত বিরোধী খাতে বইছে।

ভারত-বিরোধিতার অপর নাম হিন্দু-বিরোধীতা। বাংলাদেশে ভারত বিরোধিতার হাওয়া জোরে বইলে বলা বাহুল্য, তার কাঙুয়ালটি হন সেখানে বসবাসকারী সংখ্যালঘু হিন্দুরা। কয়েক বছর আগে হজরত বাল খোয়া গিয়েছিল কাশ্মীরে, যদিও তা স্বমর্যাদায় ফিরে এসেছিল যথাস্থানে. তাই নিয়ে সোরগোল তুলেছিল পাকিস্থান এবং তার খেসারত দিতে হয়েছিল পূর্ব বাংলার অসহায় হিন্দু নরনারীদের জান মান দিয়ে। ৩৪ বছরের দুঃসহ জীবনে পূব বাংলার হিন্দুদের প্রতি এ ধরণের অবিচার, অত্যাচার ও নিপীড়নের অভিজ্ঞতা আরো আছে।

অপরিমিত রক্ত, অর্থ, খাদ্য ঢেলে এবং প্রচণ্ড বিপদের ঝুঁকি মাথায় নিয়ে ভারত সরকার যে স্বাধীন রাষ্ট্রের জন্মহেতু হয়েছিলেন, তার প্রতিদানে আর কিছু না মিলুক, অন্ততঃ পক্ষে বাস্তুত্যাগ বন্ধ হবে, আশা করেছিলেন। কিন্তু সে আশা পূরণ হয় নি। গত দশ বছরে পাসপোর্ট নিয়ে যারা বাংলাদেশ থেকে পশ্চিমবাংলায় এসেছেন তাদের মধ্যে আড়াই লক্ষ বাংলাদেশী ভিসার মেয়াদ শেষ হলেও, দেশে ফিরে যান নি। অবৈধভাবে সীমান্ত পেরিয়ে যে কত লক্ষ বাংলাদেশী এ রাজ্যে এসেছেন এবং এখনো আসছেন তার হিসেব নেই। এদের সংখ্যা দশলক্ষের কম নয়। বাংলাদেশ সরকার ভারতমুখী উদ্বাস্তু স্রোতকে বন্ধ করতে চান না, মুখে যাই বলুন না কেন?

স্বাধীন বাঙলাদেশ গঠনের পর বহু উদ্বাস্তু ভেবে ছিলেন যে পাকিস্থান আমলের শত্রু সম্পত্তি আইন বাতিল হবে, তারা সম্পত্তি ফিরে পাবেন এবং দেশে ফিরে যাবেন। তাদের সে ধারণা মিথ্যা প্রমাণিত হয়েছে। বাঙলাদেশ সরকার শত্রু সম্পত্তির তালিকা ভুক্ত করেছেন। যে সব হিন্দু তাদের ঘনিষ্ট আত্মীয় যেমন ভাই, ভগ্নি, পিতৃব্য, মাতুল প্রভৃতির সম্পত্তি আমলনামা বলে ভোগ দখল করছিলেন, বাঙলাদেশ সরকার তাদের অধিকারচ্যুত করেছেন। এটি বাস্তুত্যাগের অন্যতম প্রধান হেতু।

দুই প্রতিবেশী বন্ধুরাষ্ট্রের অগণিত হিন্দু-মুসলমান চেয়েছিলেন যে দুই দেশের মধ্যে যাতায়াত সহজ হবে এবং ভাগ্যবিড়ম্বিত পারিবারিক বিচ্ছিন্নতার দুঃখ কিছুটা লাঘব করা যাবে। তাদের সে আশা ব্যর্থ হয়েছে। ভিসা ব্যবস্থা কঠোরতর হয়েছে। ফলে বেড়েছে অবৈধ গমনাগমন এবং স্থায়ী ভাবে ভারতে অনুপ্রবেশ। এদের মধ্যে হিন্দু মুসলমান উভয়ই আছেন।

বাঙলাদেশের লাগোয়া পশ্চিমবাঙলার জেলাগুলিতে গত দশ বছরে অস্বাভাবিক জনসংখ্যা বৃদ্ধির প্রধান কারণ হল বাঙলাদেশীদের ক্রমাগত অনুপ্রবেশ। বিষয়টি পশ্চিমবাঙলার এক গভীরতম সমস্যা। দুঃখের বিষয়, রাজ্য সরকার এই সমস্যায় প্রত্যক্ষভাবে জড়িত হলেও, সচেতন নন।

বাঙলাদেশের রাষ্ট্রনায়ক জেনারেল জিয়াউর রহমান বর্তমানে প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির ক্রীড়নকে পরিণত হয়েছেন। বাঙলাদেশের অর্থনীতি সম্পূর্ণভাবে বৈদেশিক নির্ভর, দুর্নীতিগ্রস্ত এবং অস্বাভাবিক মুদ্রাস্ফীতি দুর্বলতর। কথায় আছে, পয়সা দেবে

যে, গাইবে গায়ক তার ফরমাসে। প্রেসিডেন্ট জিয়ার অবস্থা ঠিক তাই। গোঁড়া সাম্প্রদায়িকতাবাদী আল বদর, রাজাকর প্রভৃতি দল যারা ইয়াহিয়া খানের জল্লাদ বাহিনীর দোসর ছিল তারা সরকারের আশ্রয়ে আবার মাথা তুলেছে। মুক্তি ফৌজের সৈন্য ও সেনানীরা সরকারের বিষ নজরে পড়েছেন এবং মুজিব পন্থী আওয়ামীলীগের কর্মীগণ নানাভাবে নিষ্পেষিত হচ্ছেন। বাংলাদেশে গণতন্ত্র নির্বাসিত এবং ব্যক্তি স্বাধীনতা কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রিত। সেখানকার প্রশাসন ব্যবস্থা পাকিস্থানের স্বৈরতন্ত্রী সামরিক শাসনের মিনি সংস্করণ ছাড়া আর কিছু নয়।

ভিতরকার শোচনীয় আর্থিক অবস্থা এবং রোষক্ষুব্ধ গণ অসন্তোষের স্রোতকে ভিন্নমুখী করার উদ্দেশ্যে জেনারেল জিয়াউর রহমানের সরকার ভারত বিরোধিতায় তৎপর হয়েছেন বলে মনে হয়। গুই বছর ধরে বিলোনিয়া চর এলাকায় ভারতীয় চাষীদের উপর গুলীবর্ষণ, গঙ্গাজলের বাটোয়ারা নিয়ে সমস্যা সৃষ্টি, সুন্দরবনের দক্ষিণে ভারতীয় উপকূল এলাকায় নবগঠিত পূর্বাশা দ্বীপের উপর হামলার চক্রান্ত প্রভৃতি বাংলাদেশ সরকারের ভারতবিরোধ জিইয়ে রাখার কু মতলব বলে ধরতে হয়।

সম্প্রতি মুজিব কন্যা মিসেস হাসিনা ওয়াজেদ বাংলাদেশের আওয়ামী লীগের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হওয়ায় এবং তাঁর স্বদেশে প্রত্যাবর্তনে চাকার জিয়া সরকার রীতিমত ভীত। মুজিব হত্যার সময় শেখ হাসিনা বেগম ছিলেন পশ্চিম জার্মানীতে, তাঁর স্বামী ভারত সরকারে চাকুরি নিলে তিনি স্বামীর সহিত ভারতে বাস করছিলেন। মিসেস হাসিনার নেতৃত্বে আওয়ামী লীগের শক্তিবৃদ্ধি এবং শেখ মুজিব ও মুক্তিযুদ্ধের ঐতিহ্য প্রভাবের পুনর্জাগরণের আশঙ্কায় বাংলাদেশের প্রতিক্রিয়াশীল নেতৃত্ব নানাভাবে মানুষকে বিভ্রান্ত করতে চাইছেন। ভারতবিরোধিতা তাদের অন্যতম। বেগম হাসিনার স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের পিছনে প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধীর হাত আছে বলেও কুৎসা প্রচার করা হচ্ছে। এই ধরণের ভারত বিদ্বেষ প্রচার প্রতিবেশী দুই রাষ্ট্রের মধ্যকার দ্বিপাক্ষিক ও বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কে যে চিড় ধরাবে না সে কথা বলা কঠিন।

এ প্রসঙ্গে মনে করতে হয়, বেগম হাসিনা বলেছেন তিনি তাঁর দেশে ফিরে এসেছেন তাতে অস্বাভাবিকতার কি আছে। তিনি তাঁর পিতার রাজনৈতিক আদর্শে বিশ্বাসী এবং সেই আদর্শ অন্তরে জাগ্রত রেখে তিনি দেশের সেবা করবেন। সপরিবারে মুজিব এবং জাতীয় নেতাদের হত্যা সম্পর্কে বাংলাদেশ সরকার কোন তদন্ত বা বিচার ব্যবস্থা করেন নি। পক্ষান্তরে হত্যাকারীরা সরকারের আশ্রয়ে নিরাপদে সুখে কাল যাপন করছে। বাংলাদেশবাসীর দৃষ্টিতে তাই প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান দোষমুক্ত নন। অপরাধীদের বিচারের দাবি বেশীদিন ঠেকিয়ে রাখা সম্ভব হবে না।

অবশ্য আমরা চাই, বাংলাদেশে ভারত বিদ্বেষ প্রচার বন্ধ হোক, বাংলাদেশের জনগণ তাদের ভবিষ্যৎ নিজেরাই স্থির করুন এবং ভারত বাংলাদেশ মৈত্রী সম্পর্ক অক্ষুন্ন থাকুক।

—

বিপ্লবীনায়ক হেমেন্দ্রকিশোর

- এক অবিস্মরণীয় ব্যক্তিত্ব ॥

—মলয় ঘোষ

ঊনবিংশ শতাব্দী ছিল বাংলাদেশে রেনেসাঁ বা নবজাগরণের যুগ। একদিকে ইংরেজী শিক্ষা ও বিশ্ব ইতিহাস অধ্যয়নের মধ্য দিয়ে বাঙালীর জাতীয় জীবনে নব ভাব ও ভাবনা সঞ্চারিত হয়েছিল, যা কিছু জীর্ণ ও পুরাতন সংস্কারকে অতিক্রম ক'রে নূতনের বন্দনায় জাগ্রত হয়েছিল বঙ্গীয় বিদ্বৎসমাজ ; অন্যদিকে বহির্বিশ্বের বিভিন্ন দেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও মুক্তি লাভের ইতিহাস উদ্বুদ্ধ করেছিল জাতীয় নেতৃবর্গকে স্বাধীনতার বন্ধন মোচনে। '৫৭ এর সিপাহী বিদ্রোহ যে সংগ্রামের সূচনা, তারই পূর্ণাংগ পরিণতি শতাব্দীর শেষার্ধে এই নবজাগরণের মধ্য দিয়ে।

এই শতাব্দীতে বাঙালী জাতি তথা ভারতবাসী যেসকল মহান নেতা ও আগ্নেয় সন্তানের সংস্পর্শে আসে, যাঁদের কালজয়ী প্রতিভা ও বলিষ্ঠ নেতৃত্ব সমগ্র জাতিকে দীক্ষা দেয় অগ্নিমন্ত্রে তাঁদের মধ্যে শ্রীঅরবিন্দ ছিলেন অন্যতম। ১৯০২ সালে তাঁরই নির্দেশ ও অর্থ সাহায্যে কলকাতায় প্রথম যে বিপ্লবী-চক্র গড়ে ওঠে, তার প্রধান তিন পুরুষ ছিলেন যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (নিরালম্ব স্বামী), বারীন্দ্র কুমার ঘোষ এবং অবিনাশ চন্দ্র ভট্টাচার্য। এদের কেন্দ্র করে ধীরে ধীরে বাংলায় বৈপ্লবিক কার্যকলাপ সংগঠিত হতে থাকে, যার ফলশ্রুতিতে বাংলামায়ের বীর ও আদর্শবাদী সন্তানেরা দেশমাতৃকার বন্ধন মোচনের শপথে সমবেত হন, সশস্ত্র বিপ্লবান্দোলনের পরিকল্পনায় সামিল হন। এই একই পথের পথিক হিসাবে 'মুক্তির মন্দির সোপান তলে' শ্রীঅরবিন্দের সার্থক উত্তরসূরী বিপ্লবী নায়ক হেমেন্দ্র কিশোরের আবির্ভাব।

ময়মনসিং মুক্তাগাছার বিখ্যাত আচার্য চৌধুরী বংশে হেমেন্দ্র কিশোরের জন্ম। জেলা স্কুল থেকে এন্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হ'য়ে কলিকাতায় প্রেসি-ডেন্সী কলেজে ভর্তি হন। প্রকৃতপক্ষে সক্রিয় ও সশস্ত্র বিপ্লব আন্দোলনে এখানেই তিনি বিশেষভাবে যুক্ত হন। এর আগে, ময়মনসিংহে অবস্থানকালে তিনি তৎকালীন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট যোগেন বিদ্যা-ভূষণের সংস্পর্শে আসেন আসেন। নিজে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হলেও বিদ্যাভূষণ ছিলেন দেশসেবায় উৎ সর্গীকৃতপ্রাণ বন্দেমাতরম সংগীত শিক্ষাদান ও 'কার্বোনারী গুপ্ত সমিতি' স্থাপনে প্রধান উদ্যোক্তা হিসাবে তিনি স্বদেশমন্ত্রের আবাহন করেছিলেন ময়-মনসিংহের কিশোর ও তরুণ সমাজে। তাঁরই সক্রিয় সহযোগিতায় হেমেন্দ্র কিশোরের যে 'কার্বো নারি গুপ্ত সমাজ' স্থাপন করেন তার একনিষ্ঠ কর্মীদের মধ্যে নিখিলেশ্বর রায় মৌলিক ও পরেশ লাহিড়ীকে আমরা পরবর্তীকালে সশস্ত্র সংগ্রামের ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা নিতে দেখি। এই সমিতি শুধু স্বদেশমন্ত্র প্রচারেই নিয়োজিত ছিল না, সশস্ত্র অভ্যুত্থানেরও পরিকল্পনা করেছিল। ১৯০৬ সালের গোড়ার দিকে হেমেন্দ্র কিশোরের বাড়ি দেব নিবাস সংলগ্ন স্থানে এই সমিতির কর্মীরা মিলিটারী কেমিস্ট্রী বই অনুসারে কিছু বিস্ফোরক পাউডার তৈরী করেন

এবং তা পরীক্ষার জন্য কলিকাতার 'বিপ্লবী নায়ক ইন্দ্র নন্দীর কাছে পাঠানো হয়। পরীক্ষাকালে এর বিস্ফোরণে ইন্দ্র নন্দীর একটি হাত উড়ে গিয়েছিল বলে আমরা ভোলাগিরি আশ্রমের শ্রীমৎ শ্রীশ্রীমহাদেবানন্দ গিরি রচিত একটি বিবৃতিতে জানতে পারি। এছাড়া, গুজাদিয়া গ্রামের গুপ্তকেন্দ্রে হেমেন্দ্রকিশোরের নির্দেশে কিছু বোমা তৈরীরও চেষ্টা হয়েছিল, এই সময়টাকে কালীমায়ের বোমার কাল বলে নির্দিষ্ট করা হয় এবং বাংলার বিপ্লবী আন্দোলন তখন প্রতিনিয়ত নিত্য নূতন গবেষণার কাজে নিযুক্ত ছিল।

প্রেসিডেন্সী কলেজে অধ্যয়ন কালে হেমেন্দ্র কিশোর সতীশ মুখার্জীর 'ডন সোসাইটি' ও আত্মোন্নতী সমিতি'র সংস্পর্শে আসেন। এই আত্মোন্নতি ১৮৯৮ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়, যার উদ্যোক্তাদের মধ্যে বিপ্লবীনায়ক প্রভাস দে ছিলেন হেমেন্দ্রকিশোরের সহপাঠী। এক অদম্য কর্মোদ্দীপনা হেমেন্দ্র কিশোরকে সতত অনুসন্ধানে রত করেছিল, যার মধ্য দিয়ে তিনি প্রকৃত দোসর খুঁজে বেড়াতেন। তাঁর কল্পনায় ছিল এক অখণ্ড ও সুসংহত বিপ্লব প্রয়াস। তাই ১৯০২ সালে ব্যারিষ্টার প্রমথ মিত্রের উদ্যোগে যখন অনুশীলন সমিতির প্রতিষ্ঠা হল, তখনও হেমেন্দ্র কিশোর সর্ব্বাগ্রে যোগাযোগ করলেন ও মিত্তির সাহেবের অনিষ্ঠ সংস্পর্শে এই বিপ্লব প্রয়াসের প্রস্তুতি গড়ে তুলতে লাগলেন। ময়মনসিংহের 'সুহৃদ সমিতি'—যা মূলতঃ শরীর চর্চ্চা ও জাতীয় ভাবোদ্দীপনার জন্য সংগঠিত হয়েছিল, তারও পুরোভাগে ছিলেন হেমেন্দ্রকিশোর।

১৯০৪ সালে শ্রীঅরবিন্দ যখন স্বল্পসময়ের জন্য বরোদা থেকে বাঙলায় এসেছিলেন, সেই সময়েই হেমেন্দ্রকিশোরের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ঘটে। শ্রীঅরবিন্দের কালজয়ী ব্যক্তিত্ব তাঁকে অভিভূত করেছিল। দুই বিপ্লবীর নিভৃত আলোচনার ফলশ্রুতি হিসাবেই আমরা সাধনা সমাজের প্রতিষ্ঠা হতে দেখি। বাঙলার বিশাল বিপ্লবী আদর্শকে ব্যাপ্ত ও অভিষিক্ত করার জন্য সমাজের মুক্ত অঙ্গনের প্রয়োজন ছিল। তাই সাধনা সমিতির পরিবর্তে সাধনা সমাজ প্রতিষ্ঠাই তাঁর কাছে অধিকতর প্রেয় মনে হয়েছিল। পরবর্ত্তী কালের সুসংহত বিপ্লব আন্দোলন সংগঠনে এই সমাজের অনেক সৈনিক অগ্রণীর ভূমিকা গ্রহণ করেছে।

'Cry of the Bengalies—divide us not' ১৯০৩ সালে প্রস্তাবিত বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে ময়মনসিংহের বিপ্লবীদের এই ছিল সোচ্চার প্রতিভাষা। স্বয়ং বড় লাট লর্ড কার্জ্জন ময়মনসিংহে আসেন ১৯০৪ সালের ২০শে ফেব্রুয়ারী বঙ্গভঙ্গের অনুকূলে মহারাজা সূর্যকান্ত আচার্য চৌধুরীর সমর্থন লাভের উদ্দেশ্যে। বিপ্লবী অনাথবন্ধু গুপ্তের উদ্যোগে এই দিন সারা শহর পোষ্টারে পোষ্টারে ছেয়ে যায় যার ভাষা পূর্ব্বে উল্লিখিত হয়েছে। মহারাজা সূর্য কান্ত বঙ্গভঙ্গের প্রস্তাব দৃঢ়তার সঙ্গে প্রত্যাখ্যান করলেন। অন্যদিকে একই উদ্দেশ্যে ১৯০৫-এর এপ্রিলে ময়মনসিংহে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কনফারেন্স আহুত হয়, যার অন্যতম প্রধান হোতা ছিলেন হেমেন্দ্রকিশোর। বাগ্মীবর বিপিন পাল ও কৃষ্ণকুমার মিত্র প্রমুখের উপস্থিতিতে সেই সম্মেলনে হেমেন্দ্র কিশোর সুহৃদ সমিতি ও সাধনা সমাজের সুশৃঙ্খল কর্মীবাহিনী বন্দেমাতরম ধ্বনি সহযোগে যে সামরিক অভিবাদন জানায়, কংগ্রেসের ইতিহাসে তা এক ঐতিহ্যের সৃষ্টি করে। ঐ বছরই ১৬ই অক্টোবর যেদিন সরকারী নির্দেশে বাংলাদেশ দ্বিধা বিভক্ত হয়, সরকারী সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে সেদিন অরন্ধন, আইন

অমান্ত প্রভৃতির মাধ্যমে সমগ্র বাংলাদেশের সঙ্গে ময়মনসিংহের মানুষও ধিক্কারে ফেটে পড়েন। শাসকের দমন পীড়নে আহত ও নীগৃহীতদের যে বিশাল জন-সম্বর্ধনা জানানো হয়, তার সুষ্ঠু আয়োজন ক'রে অত্যাচারীর বিরুদ্ধে হেমেন্দ্রকিশোর তাঁর ঘৃণা ও বেগবান গণ-আন্দোলনের প্রতি স্বতঃস্ফূর্ত শ্রদ্ধা জানান। সাধনা সমাজের সমগ্র কর্মীবাহিনীকে নিয়ে তিনি এই বিশাল জাতীয় আন্দোলনের সক্রিয় শরীক হন।

১৯০৬ সালে পাকাপাকিভাবে বাংলায় এসে শ্রীঅরবিন্দ পূর্ণ স্বাধীনতার দাবি ঘোষণা করেন। আবেদন নিবেদন নয়, সমান শক্তি পরীক্ষার মাধ্যমে স্বাধীনতা অর্জন করে নিতে হবে—এই ছিল বিপ্লবীর বীজমন্ত্র। 'যুগান্তর' পত্রিকাকে কেন্দ্র করে এই সময় শ্রীঅরবিন্দের নেতৃত্বাধীন বিপ্লবী সংস্থা তার কর্মসূচীকে আট ভাগে ভাগ করে নেয় — টিচার, প্রিচার, আর্মার, হিয়ো, সায়েন্টিষ্ট, মিলিটারিষ্টী মিশনারী ও কমিউনিকেটর। এই কর্মসূচীর সার্থক রূপায়ণকল্পে স্বয়ং শ্রীঅরবিন্দ, ও তারকনাথ দাস প্রমুখ বিপ্লবীরা হেমেন্দ্রকিশোরের সঙ্গে যোগাযোগ করেন ও একাধিকবার ময়মনসিংহ পরিভ্রমণ করেন। ১৯০৬ সালে ডাঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের তত্ত্বাবধানে হেমেন্দ্রকিশোরের সাধনা সমাজ আনুষ্ঠানিকভাবে 'যুগান্তর' গোষ্ঠির মূল কেন্দ্রের সহিত যুক্ত হয়ে যায়। হেমেন্দ্রকিশোরের সহযোগিরা মণি চৌধুরী, নরেশ চৌধুরী, সঞ্জীব রায় ও পরবর্তীকালে অন্যতম দুই প্রধান শিষ্য—সুরেন্দ্রমোহন ঘোষ (মধু ঘোষ) ও ঢাকা অনুশীলন সমিতির নেতা রবীন্দ্রমোহন সেন যুগান্তরের সঙ্গে যুক্ত হন।

১৯০৮ সালের ২১শে এপ্রিল কিশোরগঞ্জে ময়মনসিংহ জেলা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। স্বয়ং শ্রীঅরবিন্দ এই সম্মেলনে উপস্থিত থেকে বক্তৃতা দেন। অন্যান্য বক্তাদের মধ্যে ছিলেন সুরেশচন্দ্র সমাজপতি, রাজা সুবোধ মল্লিক, সত্যব্রত সামশ্রমী অনাথবন্ধু গুহ প্রমুখ। এই সম্মেলনের প্রধান বৈশিষ্ট্য হল, হেমেন্দ্রকিশোরের নেতৃত্বে ১৮ মাইল দূরবর্তী রেলষ্টেশন থেকে সামরিক উর্দি পরা 'সাধনা সমাজে'র কর্মীবাহিনীর রুটমার্চ করে সম্মেলনে উপস্থিতি। এই ঘটনা উপস্থিত জনগণ ও নেতৃবৃন্দের মধ্যে প্রবল উদ্দীপনার সঞ্চার করেছিল।

১৯০৬ সালেই হেমেন্দ্রকিশোর কলিকাতায় 'আচার্য পার্টি' নামক একটি বিপ্লবী সংস্থা প্রতিষ্ঠা করেন। প্রথম দিকে নিবেদিতার বাড়ী মৌলিকের (পরবর্তীকালে শ্রীমৎ ভবানন্দ গিরি) উপর এই বিপ্লবকেন্দ্র পরিচালনার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। শ্রীঅরবিন্দের নেতৃত্বে আক্রমণাত্মক বিপ্লবান্দোলনের সহিত সরাসরি যোগাযোগ রাখার জন্যই কেন্দ্র খোলা হয়েছিল। পরে সুরেন্দ্রমোহন ঘোষ এই কেন্দ্রের দায়িত্ব নেন। সশস্ত্র সংগ্রামে ব্যবহার জন্য বিভিন্ন প্রকার আগ্নেয়াস্ত্র সংগ্রহ এই সংস্থার প্রধান কাজ ছিল। জন্ম ও বৈবাহিক সূত্রে পাওয়া সম্পদ ও সামাজিক মর্যাদার পুরোপুরি সদ্ব্যবহার করে হেমেন্দ্রকিশোর এই গুপ্ত কেন্দ্রে প্রচুর আগ্নেয়াস্ত্র সংগ্রহ করেছিলেন, তা বিপ্লব আন্দোলনের বিভিন্ন স্তরে বিপ্লবীদের প্রচুর কাজে এসেছিল। জেলের ভিতর বিশ্বাসঘাতক নরেন গোঁসাইকে হত্যা করার জন্য সত্যেন বোস ও কানাইলাল দত্ত যে রিভলবার দুটি ব্যবহার করেছিলেন, তার মধ্যে একটি ছিল হেমেন্দ্রকিশোরের সংগ্রহ থেকে প্রেরিত। এছাড়া, ১৯০৭ সালে কুচক্রী ইংরেজ সরকারের প্ররোচনায় ময়মনসিংহে

যে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সংগঠিত হয়েছিল তার প্রতিরোধেও হেমেন্দ্রকিশোরের সংগ্রহের আগ্নেয়াস্ত্র প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হয়েছিল। বঙ্গভঙ্গ প্রস্তাবকে সমর্থন না করায় ও জাতির শিক্ষা পরিষদের প্রতি উদার দাক্ষিণ্যের ফলে ময়মনসিংহের মহারাজা সূর্যকান্ত ও জমিদার ব্রজেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী সরকারের কোপানলে পড়েছিলেন, ব্রজেনবাবুর কাছারীবাড়িতে লুট করানো হয়েছিল। সেদিনের সেই সংকটময় মুহূর্তে বিপ্লবী—হেমেন্দ্রকিশোর কলকাতার বিপ্লবীগণের সহায়তায় যেভাবে অমিত-বিক্রমে দাঙ্গা প্রতিরোধের ভূমিকা নিয়েছিলেন, ময়মনসিংহের ইতিহাসে তা' স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। কিশোরগঞ্জ সম্মেলনে সাধনা সমাজ ও সুহৃদ সমিতির ঐক্যবদ্ধ কর্মীবাহিনীর সামরিক কুচ-কাওয়াজ ও কৃত্রিম যুদ্ধ কুটকৌশল দাঙ্গাবাজদের আস্ফালনকে ভীত ও সন্ত্রস্ত করে তোলে ও ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের চক্রান্তকে ব্যর্থ করে দেয়।

মাণিকতলায় বোমা তৈরীর পরিকল্পনা তখন ধীরে ধীরে রূপায়িত হচ্ছে। স্বয়ং শ্রীঅরবিন্দের নির্দেশে বারীন্দ্রকুমার ঘোষ-এর ব্যবস্থাপনায়। এই কর্মযজ্ঞে হেমেন্দ্রকিশোর প্রথম থেকে যুক্ত ছিলেন। একদিকে তিনি মূল বিপ্লব-আন্দোলনের সঙ্গে নিজেকে যুক্ত রেখেছেন, অন্যদিকে এক বিশাল অঞ্চল জুড়ে—ডিব্রুগড়সহ সমগ্র আসাম, ত্রিপুরা ষ্টেট, শ্রীহট্ট ও ব্রাহ্মণবেড়িয়ায় তাঁর সাধনা সমাজের মাধ্যমে বিপ্লবীদের আশ্রয়কেন্দ্র ও অস্ত্রচালনা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান খুলে বিপ্লবী আন্দোলনকে ক্রমবিস্তৃত করে চলেছেন।

বাস্তবিকই এ এক অপূর্ব সংগঠন ক্ষমতার পরিচায়ক। অর্থে, সামর্থ্যে, দেশপ্রেম ও দূরদর্শিতায় তাঁর এই সাংগঠনিক শক্তি ছিল অতুলনীয়। ১৯০৯ সালের ৫ই জানুয়ারী ইংরেজ সরকার যখন এক ঘোষণা বলে কয়েকটি প্রকাশ্য সমিতিকে নিষিদ্ধ করে দেন, তখন সাধনা সমাজও সেই নিষেধের অন্তর্ভুক্ত হয়। কিন্তু হেমেন্দ্রকিশোর ছিলেন আলাদা ধাতুতে গড়া, সরকারের এই নিষেধাজ্ঞায় তিনি দমলেন না তো বটেই বরং সাধনা সমাজ-এর কার্যকলাপ আরও বিস্তৃত করার কাজে উঠে পড়ে লাগলেন। বিপ্লবী নায়ক যতীন্দ্র মুখার্জী (বাঘা যতীন) যখন বিপ্লবী সংগঠনের দায়িত্ব নিয়ে সমগ্র দেশ জুড়ে এক সশস্ত্র অভ্যুত্থানের পরিকল্পনা করেন, হেমেন্দ্রকিশোর তখন সর্বশক্তি নিয়ে তাঁর পেছনে এসে দাঁড়ান। ১৯১৩ সালে দামোদর বন্যায় আর্তসেবার মাধ্যমে বাংলার প্রতি জেলার বিপ্লবীদের মধ্যে এক আদর্শভিত্তিক নিগূঢ় ঐক্যের বন্ধন রচিত হয়—যা পরবর্তীকালে বাঘা যতীনের পরিকল্পিত সশস্ত্র অভ্যুত্থান প্রয়াসকে অনেকাংশে প্রভাবিত করেছিল।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পটভূমিকায় ইন্দো-জার্মান চূড়ান্তমূলক বৈপ্লবিক প্রচেষ্টাতেও বাংলার বিপ্লবীদের এই পারস্পরিক ভাব বিনিময় অনুপ্রেরণা জুগিয়েছে, ময়মনসিংহকে কেন্দ্র করে বাংলার এক বিস্তৃত অঞ্চলে হেমেন্দ্রকিশোরের সুসংহত সংগঠন এইসব বিপ্লব প্রচেষ্টাকে ত্বরান্বিত করেছে। হেমেন্দ্র কিশোরের দেব নিবাসে বিভিন্ন সময়ে একাধিক বৈপ্লবিক পরিকল্পনার ব্লু-প্রিন্ট রচিত হয়েছে এবং আহত বিপ্লবীদের পরিচর্যা এই ঐতিহাসিক বাড়ি পরম তীর্থে পরিণত হয়েছে।

বিপ্লবীনায়ক হেমেন্দ্রকিশোরের মননে ছিল এক আশ্চর্য উদার দেশভাবনা যা সমগ্র বিপ্লবী সমাজের মধ্যে তাঁকে এক বিশেষ মর্য্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত করেছে। নির্দিষ্ট এক বিপ্লবী সংগঠনের সঙ্গে কর্ম-যোগে যুক্ত থাকলেও বাংলাদেশের প্রতিটি বিপ্লবী

সংস্থা ও তাদের অনুগামী বিপ্লবীগণ প্রতিটি প্রয়োজনে প্রতিটি সঙ্কটময় মুহূর্তে হেমেন্দ্রকিশোরের উদার ও নিঃসর্ত সাহায্য করেছেন। এদিক দিয়ে বিপ্লবীনায়ক হেমেন্দ্রকিশোর ছিলেন বাংলার বিপ্লবী সমাজের অভিভাবক স্থানীয়। তাঁর কাছে দল বা মতের কোন বিভেদ ছিল না, ছিল না কোন আত্মপর বোধ।

দেশমাতৃকার বন্ধন মোচনের লক্ষ্যকে সামনে রেখে তিনি অক্লান্ত আবেগে কাজ করে গেছেন—দল নয় মানুষ, পদ্ধতি নয় কেন্দ্রবিন্দু, মতবাদ নয় কর্মসূচিই তাঁর কাছে ছিল মুখ্য বাকি আর সবই গৌণ ও অকিঞ্চিৎকর বলে তিনি মনে করতেন। লক্ষ্যের প্রতি অভিনিবেশ স্বচ্ছ ছিল বলেই তাঁর চিন্তার ব্যাপ্তি ছিল বিশাল, মানসিকতা বিশ্লেষণধর্মী।

বাঘা যতীনের ইন্দো জার্মান ষড়যন্ত্রমূলক বৈপ্লবিকপ্রচেষ্টায় হেমেন্দ্রকিশোর ছিলেন ময়মনসিংহ উত্তরবঙ্গ ও আসামে সশস্ত্র অভ্যুত্থানের দায়িত্বে। ১৯১৫ সালের ৯ই সেপ্টেম্বর বালেশ্বরে বুড়ি বালামের তীরে ঐতিহাসিক সম্মুখযুদ্ধে বাঘা যতীন ও তাঁর তিন সতীর্থের আত্মদানের মধ্যে দিয়ে এই অধ্যায়ের পরিসমাপ্তি ঘটে। এবং তার পরেই ১৫ই অক্টোবর হেমেন্দ্রকিশোর গ্রেপ্তার হন। প্রথমে খুলনার পাইক গাছায় অন্তরীন, পরে স্টেট প্রিজনার হিসাবে মেদিনীপুর জেল এবং শেষে আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে তাঁকে বিনাবিচারে বন্দী রাখা হয়। রাজবন্দী হিসাবে এই বন্দী থাকা কালীনই, আংশিক স্বায়ত্ব শাসনের ঘোষণা করে ব্রিটিশ পার্লামেন্ট এবং ভারত সচীব মন্টেগু সাহেব ভারতে আসেন। সেটা ১৯১৭ সালের ১০ই নভেম্বর, রাজবন্দীদের বিনাবিচারে আটক রাখার প্রতিবাদে হেমেন্দ্রকিশোর তাঁর কয়েকজন সহবন্দীকে নিয়ে অনশন শুরু করেন। গুপ্তপথে এই অনশনের সংবাদ বাইরে এলে কয়েকটি পত্রপত্রিকা তা প্রকাশ করে এবং সারা ভারতের রাজনৈতিক মহলে এক প্রচণ্ড আড়োলন সৃষ্টি হয়। কারণ রাজনৈতিক প্রশ্নে ভারতবর্ষের মধ্যে এটিই সর্বপ্রথম অনশন ধর্মঘট। ব্রিটিশ সরকার—অত্যন্ত কোণঠাসা হয়ে পড়ে ও হেমেন্দ্রকিশোরকে দার্জিলিং জেলে স্থানান্তরিত করে।

সেখানেই প্রায় তিন বছর কাটিয়ে ভগ্নস্বাস্থ্য ও দুরারোগ্য হাঁপানি রোগ নিয়ে ১৯২০ সালের জানুয়ারী মাসে হেমেন্দ্রকিশোর মুক্তি পান।

জেলের অনিয়ম ও অত্যাচারে ক্ষয় ও ধ্বংসের যে করাল ছায়া এই অমিত তেজা বিপ্লববহ্নিকে ঢেকে দিয়েছিল দিনে দিনে তার অবনতি ঘটতে লাগলো। স্ত্রী রাধারাণী দেবী, দুই পুত্র ব্যোমেন্দ্রকিশোর ও নীরেন্দ্রকিশোর এবং দুই অনুজ মণীন্দ্রকিশোর ও ভূপেন্দ্রকিশোর—সমগ্র আচার্য্য চৌধুরী পরিবার মুক্তি সাধনায় নিয়োজিত প্রাণ থাকায় অসংখ্য নির্য্যাতন ও অপমানের শিকার হয়েছিলেন। কিন্তু দেশসেবার পুণ্যযজ্ঞে নিজেদের আহুতি দিতে গিয়ে এই সব নির্য্যাতন অবমাননাকে তাঁরা আঘাত বলে মনে করতেন না।

ময়মনসিংহ দেব নিবাসে যখন কোন বিপ্লবী পুলিশের চোখ এড়াতে অথবা আহত হয়ে আশ্রয় নিতেন, হেমেন্দ্রকিশোরের সুযোগ্য সহধর্মিণী রাধারাণীদেবী তখন সেই বিপ্লবীর মধ্যে নিজ পুত্রেরই প্রতিচ্ছায়া দেখতে পেতেন—স্নেহে, ভালবাসায়, পরিচর্য্যায় ভুলিয়ে দিতেন তার পর গৃহবাস দুঃখ। ভারতবর্ষ তথা বাংলার জাতীয় মুক্তি আন্দোলনে এই আচার্য পরিবারের অবিস্মরণীয় অবদান জাতীর ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে।

(বাকী ১৬ পাতায় দেখুন)

পশ্চিমবঙ্গ হৃত গৌরব ফিরে পেতে পারে

(বিশেষ সংবাদদাতা)

কলিকাতা ছিল 'ব্রিটিশ ভারতের শিল্প রাজধানী'। ভারতের প্রায় সব বড় বড় শিল্পপতিদের ঘাঁটি ছিল কলিকাতা। ১৯৫০-৫১ সালেও দেশের মোট শিল্পোৎপাদনের শতকরা ২৫ ভাগ হত পশ্চিমবঙ্গে এবং মোট জাতীয় আয়ের প্রায় ১২ শতাংশ পশ্চিমবঙ্গ থেকে হত। পাট, ইঞ্জিনিয়ারিং ভেষজ ও রাসায়নিক শিল্পে পশ্চিমবঙ্গের স্থান ছিল সবার ওপর। আজ আর সেই অবস্থা নেই।

পশ্চিমবঙ্গের শিল্পোৎপাদনের পরিমান ২৫ শতাংশ থেকে কমে ১৯৬০-৬১ সালের দাঁড়ায় ২৩ শতাংশ এবং ১৯৭৯-৮০ সালে ২১ শতাংশ। জাতীয় উৎপাদনের অংশ ১২ শতাংশ থেকে কমে বর্তমানে ৯ শতাংশ হয়েছে। ১৯৫১ সালে পশ্চিমবঙ্গে রেজিষ্ট্রী ভুক্ত কলকারখানা ছিল ১৫০০টী ঐ সময়ে মহারাষ্ট্র ও গুজরাট একত্রে কলকারখানা ছিল ১৪১৫ টী মাদ্রাজে (অন্ধ্রপ্রদেশের কিছু অংশ সহ) ছিল ১৯৭৫টী। ১৮৭৯-৮০ সালের মহারাষ্ট্রে হয়েছে প্রায় ১৫০০১ হাজার, মহারাষ্ট্র ও গুজরাট একসঙ্গে সংখ্যা দাঁড়াবে প্রায় ২৬০০ হাজার, তামিলনাড়ুতে হয়েছে প্রায় ৯০০০ হাজার, কিন্তু একই সময়ে ১৯৫১ থেকে ১৯৮০ পশ্চিমবঙ্গের শিল্প প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ১৫০০ থেকে বেড়ে হয়েছে মাত্র ৬৫০০। শিল্পোৎপাদনের মোট মূল্যের পশ্চিমবঙ্গের স্থান এখন চতুর্থ এবং শিল্প প্রতিষ্ঠান সংখ্যায় পঞ্চম। এক সময় দুটাতেই প্রথম ছিল।

ন্যাশন্যাল কাউন্সিল অব এপ্লাইড ইকনমিক রিসার্চ এর তথ্য অনুযায়ী (N. C. A. E. R) ১৯৫০-৫১ থেকে ১৯৬০-৬১ সাল পর্য্যন্ত পশ্চিমবঙ্গের উৎপাদন (শিল্প, কৃষি ও অন্যান্য সহ) বেড়েছে ৩০ শতাংশ কিন্তু ঐ সময়ে গুজরাটে উৎপাদন বেড়েছে ৫১ শতাংশ, তামিলনাড়ুতে ৪৫ শতাংশ, এর থেকে বোঝা যায় পশ্চিমবঙ্গের অর্থনীতির গতি কোন দিকে। গত দুই দশকে পশ্চিমবঙ্গে কোন বড় শিল্প গড়ে উঠে নাই। পশ্চিমবঙ্গের ১৬টী জেলার মধ্যে ১২টী জেলা অনুন্নত এলাকা বলে ঘোষণা করা হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের অবস্থা এমন হলো কেন? কি কি কারণে পশ্চিমবঙ্গ শিল্পোন্নতিতে অন্যান্য রাজ্য হতে ক্রমাগত পিছিয়ে পড়ছে সেই কারণগুলি সম্বন্ধে ১৯৭১ সালে জুনমাসে দিল্লিতে প্রেস ক্লাবে এক সভায় বিশিষ্ট শিল্পপতি শ্রীবি, এস বিড়লা জোরের সঙ্গে বলেন পশ্চিমবঙ্গের শিল্পে অধঃগতির জন্য কেন্দ্রিয় সরকার অনেকাংশে দায়ী। পশ্চিমবঙ্গ শিল্প সমৃদ্ধ এই অজুহাতে কেন্দ্র পশ্চিমবঙ্গকে কোন লাইসেন্স মঞ্জুর করেনা, কিন্তু মহারাষ্ট্র, গুজরাট, তামিলনাড়ু, শিল্পে উন্নত হলেও লাইসেন্স বা কাঁচামাল মঞ্জুর করতে কোন দ্বিধা করে না। পশ্চিমবঙ্গের শিল্পোন্নয়ন নিয়ে কলিকাতার বণিক সভাগুলি ১৯৭৮ সালে যে সেমিনারের আয়োজন করেছিলেন সেখানেও শিল্পোপতিরা উদাহরণ ও তথ্য দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছিলেন যে কেন্দ্রিয় সরকার লাইসেন্স মঞ্জুর কাঁচামাল সরবরাহ, ওয়াগন দেওয়া ইত্যাদি ব্যাপারে সুবিচার করছেন না। পশ্চিম ও দক্ষিণাঞ্চলের কতকগুলি রাজ্যের প্রতি সব ব্যাপারে পক্ষপাতিত্ব করে চলেছেন। শিল্পপতিরা তথ্যের ভিত্তিতে প্রমাণ করতে চেষ্টা করেন যে অর্থ সরবরাহ ব্যাপারে ও কেন্দ্রিয় আর্থিক সংস্থাগুলি যথা রাষ্ট্রায়ত্ব ব্যাঙ্ক, শিল্প অর্থ করপোরেশন, জাতীয় শিল্পোন্নয়ন করপোরেশন জীবন বীমা করপোরেশন পশ্চিমবঙ্গের উপর বিমাতৃসুলভ ব্যবহার করে : যেমন ১৯৬১-৭০ থেকে ১৯৭১-১৯৭৮ সাল পর্য্যন্ত আর্থিক

সংস্থাগুলি (ব্যাঙ্ক বাদে) পশ্চিমবঙ্গকে ঋণ দিয়েছে ২১৬ কোটি টাকা, ঐ সময় মহারাষ্ট্র ঋণ পেয়েছে ৫৭৫ কোটি টাকা ও গুজরাট ৩২২ কোটি টাকা। ১৯৭৭-৭৮ সালে পশ্চিমবঙ্গকে শিল্প লাইসেন্স মঞ্জুর করা হয়েছে মাত্র ২৯টা অথচ ঐ সময়ে ১২৭টি দেওয়া হয়েছে মহারাষ্ট্রকে ও ৪৬ টা গুজরাটকে। সুতরাং এটা খুবই স্পষ্ট যে পশ্চিমবঙ্গের শিল্পের অবনতির জন্য কেন্দ্রিয় সরকারের এক চোখো নীতি অনেকটা দায়ী। স্বাধীনতা লাভের পর কলিকাতা ভারতের উৎপাদনকারী কেন্দ্রের মর্যাদা হারাবেছে শুধু বিরাট বিক্রয় কেন্দ্র বা বড় বাজারের মান নিয়ে রইল।

স্থানীয় লোকদের শিল্পপতি ও ব্যবসায়ীদের প্রতি বৈরী মনোভাব ও কতকটা দায়ী, স্থানীয় লোকেরা মনে করে শিল্পপতি ও ব্যবসায়ীরা মুনাফাখোর, চোর, শোষনকারী ও সমাজের শত্রু। বাঙ্গালী শ্রমিকরা সব সময়ই মালীকদের উপর খাপ্পা হয়ে থাকে। এই কারণে বাঙ্গালী শিল্পপতিরাও পশ্চিমবঙ্গে শিল্পে বিনিয়োগ করতে খুব একটা আগ্রহী নয়।

পশ্চিমবঙ্গে যাদের কলকারখানা আছে তাদের অধিকাংশ এই রাজ্যের বাসিন্দা নয়। বেশিরভাগই মারোয়াড়ি, পারসী, গুজরাটী বা পাঞ্জাবী। ব্রিটিশ আমলে কলিকাতা বা পার্শ্ববর্তী এলাকায় বিনিয়োগ বা ব্যবসা বাণিজ্যের প্রচুর সুবিধা ছিল, তাই পশ্চিমবঙ্গে বিনিয়োগ ও ব্যবসা বাণিজ্য করতে উৎসাহ পেতেন কিন্তু স্বাধীনতার পর দেশের অন্যান্য অঞ্চলের শিল্পে বিনিয়োগের বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা পেয়েছে, এর ফলে শিল্পপতিরা যে যার রাজ্যে বা সুবিধামত দেশের অন্য কোন অঞ্চলকে কলকারখানা গড়তে শুরু করেন, ফলে পশ্চিমবঙ্গে বিনিয়োগ কমতে থাকে।

সবচেয়ে বড় কারণ পশ্চিমবঙ্গ সরকারের (কি কংগ্রেস কি বামফ্রন্ট) গাফিলাতি। পশ্চিমবঙ্গ সরকার অভিযোগ করেন যে এই রাজ্য থেকে শিল্প লাইসেন্স চেয়ে কোন দরখাস্ত দিল্লি গেলে দরখাস্ত বিবেচিত হয় না এবং বছরের পর বছর পড়ে থাকে কিন্তু রাজ্যে ক্ষুদ্র শিল্প অধিকারিকের কাছে কোন দরখাস্ত করলেও সেই দরখাস্ত বছরের পর বছর পড়ে থাকে। অন্যান্য রাজ্য সরকার নিজের রাজ্যে নূতন শিল্প গড়ে তোলার ব্যাপারে যতটা তৎপর ও আগ্রহান্বিত পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সংশ্লিষ্ট অফিসার ততটা তৎপর ও আগ্রহী নয়। দিল্লির বাঙ্গালী অফিসারদেরও পশ্চিমবঙ্গের জন্য কোন তৎপরতা বা আগ্রহ নাই। অন্যরাজ্যবাসী অফিসাররা যার যার রাজ্যের জন্য উৎসাহ সহকারে কাজ করে এবং তৎপর হয়।

অন্যান্য রাজ্যের সংসদ সদস্যরা নিজের রাজ্যের স্বার্থের জন্য দল মত নির্বিশেষে সবাই এক হয়ে দিল্লিতে কাজ করে কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের সংসদ সদস্যরা দিল্লিতে নিজেদের মধ্যে রাজনৈতিক দ্বন্দ্বে লিপ্ত থাকেন, রাজ্যের স্বার্থের দিকে লক্ষ্য করেন না।

এত বাধা বিপত্তি সত্বেও হতাশ হওয়ার কারণ নাই। পশ্চিমবঙ্গে এখনও মূলধন বিনিয়োগের যে সুযোগ আছে অনেক রাজ্যেই তা নেই, পশ্চিমবঙ্গে এখনও রয়েছে ভারতের শিল্প সম্পদের ২৩ শতাংশ ও সমস্ত দেশের কলকারখানা ১৫ শতাংশ। এইখানে দক্ষ কারিগর ও শ্রমিক পাওয়া যায় অন্য কোথাও তা পাওয়া যায় না। কলিকাতা মৃতপ্রায় হলেও মরে নাই, এই শহর এখনও সমগ্র পূর্বভারতের ব্যবসা বাণিজ্যের প্রাণকেন্দ্র। পাতালে রেল, দ্বিতীয় হুগলী সেতু এবং মি. এম. ডি. এ. সমস্ত কাজ শুরু করেছে

তা শেষ হলে কলিকাতার চেহারা পালটাবে। দুর্গাপুর, আসানসোল, হলদিয়া, সর্বস্থলে নূতন শিল্প গঠনের যথেষ্ট সুযোগ আছে। পেট্রোলের দাম আকাশ ছোয়া হওয়ায় কয়লা নির্ভরশীল শিল্প গঠনের সুযোগ পশ্চিমবঙ্গে পশ্চিমাঞ্চল ও দক্ষিণাঞ্চল হতে অনেক বেশী। বিদ্যুৎ উৎপাদনের যে সব প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছে সেগুলি ২/৪ বৎসরের মধ্যেই উৎপাদন শুরু করবে। আগামী কয়েক বৎসরের মধ্যে বিদ্যুৎ ঘাটতি থাকবে না। সুতরাং চেষ্টা করলে ও তৎপর হলেই পশ্চিমবঙ্গ শিল্পের হৃত গৌরব ফিরে পেতে পারে এবং রাজ্যের বেকার সমস্যার সমাধান হতে পারে। এই বিষয়ে দলমত নির্বিশেষে সকলের সমবেত চেষ্টার প্রয়োজন। রাজনৈতিক দলগুলির ও দলীয় কোন্দলের ঊর্দ্ধে উঠে সমবেত ভাবে একত্রে রাজ্যবাসী কেন্দ্রীয় অফিসারদের ও কেন্দ্রীয় সরকারকে পশ্চিমবঙ্গের স্বার্থের দিকে নজর দেওয়ার জন্য আন্দোলন সৃষ্টি করতে হবে।

পশ্চিমবঙ্গের জনসাধারণ পরিবর্তন চেয়েছিল, জনতার চাহিদার বাস্তবরূপ সি, পি, এম দিতে পারে এই আশায়ই সি, পি, এমকে বিপুল ভোটে জয়ী করেছিল. কিন্তু সি পি, এম ব্যর্থ হল। জনতা বিকল্প নেতৃত্ব খুঁজছে। ফ্রান্সের রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে জনতার সম্মুখে নতুন দৃষ্টান্ত তুলে ধরেছে। ফরাসী জাতীয় এসেম্বলীতে গুলপন্থীদের গরিষ্ঠতা সত্ত্বেও সমাজতন্ত্রী মিত্তেরাঁকে ফরাসী জনগন তৃতীয়বারের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় রাষ্ট্রপতি নির্বাচন করে মিত্তেরাঁকে সুযোগ দিয়েছে তাঁর সমাজতান্ত্রিক কর্মধারা রূপায়িত করে ফ্রান্সের আর্থিক দুর্দশা ও রাজনৈতিক সমস্যার সুষ্ঠু সমাধানের পথ বার করতে. গুলপন্থীদের রক্ষণশীল শাসন ব্যবস্থায় ফরাসি জনগণের সমস্যা সমাধানের কোন আলো দেখছে না।

পশ্চিমবঙ্গের জনতাকে দেখাতে হবে কিভাবে শিল্পে পশ্চিমবঙ্গের হৃত গৌরব ফিরে আনা যায়, বেকার সমস্যার সমাধানের বাস্তব পথ কি? প্রশাসন দুর্নীতিমুক্ত ও জনকল্যাণমুখী করার উপায় কি? দিতে হবে সার্বিক নিরাপত্তার নির্ভরশীল আশ্বাস যারা এই বিষয়ে সচেতন হয়ে জনতার আস্থা অর্জন করবে তাদেরই জনতা জয়ী করবে, ফাঁকা আওয়াজের দিন শেষ হয়েছে।

(১৩ পাতার পর)

দীর্ঘকালের রোগভোগের পর ১৯৩৮ সনের ২৬ শে জুন বিপ্লবীনায়ক হেমেন্দ্রকিশোরের জীবনদীপ নির্বাপিত হলো, যে মহান কর্মে তিনি নিজের ও পরিবারের সমগ্র জীবন উৎসর্গ করেছিলেন মৃত্যুর শেষদিন পর্যন্ত তার গুরু দায়িত্ব হাসিমুখে বহন করে গেছেন। নিজের সারা জীবন দিয়ে যা অর্জন করে যেতে পারেন নি, পুত্রদের আত্মোৎসর্গের মাধ্যমে সেই পবিত্র স্বাধীনতা অর্জনের স্বপ্ন তিনি দেখেছিলেন, তাঁর দুই পুত্রই স্বাধীনতা আন্দোলনের বিভিন্ন স্তরে সক্রিয় অংশগ্রহণ করে কারাবরণ ও অশেষ দুঃখ দুর্দশা ভোগ করেন।

ইহলোক থেকে পরলোকের পথে যাবার মুহূর্তে বিপ্লবী নায়ক হেমেন্দ্রকিশোরের চেতনায় শান্তি এনেছিল সেই প্রত্যয় আশ্বাস—'স্বাধীনতা শীঘ্রই আসছে'—যা স্বয়ং নেতাজী সুভাষচন্দ্র তাঁর রোগ-শয্যায় প্রণাম নিবেদন করতে এসে জানিয়ে গিয়েছিলেন। দেশবরেণ্য নেতার আশ্বাসবাণীকে পাথেয় করে অমরলোকে যাত্রা করলেন বিপ্লবীনায়ক হেমেন্দ্রকিশোর—পেছনে ফেলে গেলেন দুঃসাহসী, আত্মনিবেদনের এক অমর ইতিহাস—প্রজ্ঞা ও দূরদর্শিতার উজ্জ্বল; সাংগঠনিক ক্ষমতা ও সুদৃঢ় কর্ম-চেতনার মন্ত্রে উজ্জীবিত। স্বাধীনতা পরবর্তী আজকের বস্তুতান্ত্রিক অবক্ষয়ের যুগে সেদিনের সেই অমূল্য আত্মনিবেদনের কোন সঠিক মূল্যায়ণ আমরা করতে পেরেছি কি?

চি ঠি প ত্র

মহাশয়,

বিপ্লবী বাংলা (প্রথম বর্ষ ১২ সংখ্যা ১৬, ৫, ৮১) "আইরিশ বিপ্লবী ববি স্যানডসের আত্মাহুতি" শ্রীকালীপদ সরকার মহাশয়ের লেখাটার প্রতি আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। তথ্যগত বা দার্শনিক আলোচনার অবতারণা না-করিয়াই আমরা জিজ্ঞাসা করিতেছি যে শহীদ স্যানডসের দাবী 'আইরিশ রিপাবলিকান আর্মির দণ্ডিত কারাবন্দীদের জন্য রাজনৈতিক বন্দীর মর্যাদা ও সুযোগ সুবিধা আদায়ের' সংগ্রামের প্রত্যুত্তরে বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী মিসেস থ্যাচারের যুক্তি ও সাম্রাজ্যবাদী দৃষ্টিকোণ 'নরহত্যা, গৃহদাহ, সম্পত্তিধ্বংস প্রভৃতি হিংসাশ্রয়ী অপরাধে দণ্ডিতদের অপরাধ রাজনৈতিক কারণের জন্য লঘু বলে বিবেচিত হতে পারে না। তাদের রাজনৈতিক বন্দীর মর্যাদাও দেওয়া চলে না'—ইহার কোন দিকে আপনাদের নৈতিক সমর্থন ? মিসেস থ্যাচারের কথা বুঝি—বুঝি না কালীপদ বাবুর যুক্তি এবং লড়াইয়ে ববি স্যানডসকে আপনারা শহীদ মনে করেন কিনা।

বাংলার দধিচী শহীদ যতীন দাসের দাবী কি ছিল আর কি-ই বা ছিল সেদিনকার সাম্রাজ্যবাদী সরকারের। যতীন দাস কোন অহিংসাশ্রয়ী কর্মী ছিলেন ? হিংসা অহিংসার কথাটাই এখানে অবান্তর। আদর্শের লড়াইয়ে তাঁহার আত্মাহুতি মহত্বের চরম উত্তরণ, আর শহীদের রাজনৈতিক সংগ্রামের অফুরন্ত প্রেরণা। 'বিপ্লবী বাংলা তো এ কথা দিনের পর দিন বলিতেছে তাহার লিখায়। শহীদ কানাইলাল হইতে উধম সিং পর্যন্ত মহান বিপ্লবীদের কথা আজও যে বলা করিয়া আসিতেছে। আপনাদের এই মহৎ প্রচেষ্টার ব্যাখ্যায় কি বলা চলে, রাজনৈতিক অনুভূতি মেনে নিয়ে খুন, জখম সম্পত্তিনাশ প্রভৃতি জঘন্য অপরাধে দণ্ডিতদের বিশেষ শ্রেণীর বন্দীর মর্যাদা দিলে সমাজ-দুর্বৃত্তদের কুকর্মে উৎসাহ দেওয়াই হয়।' মহান শহীদদের চেষ্টা করিয়াও সমাজ দুর্বৃত্ত আখ্যায় ভূষিত করাটা নিদারুণ অপচেষ্টা মাত্র। এই অপ-চেষ্টাটা আজিকার সমাজ জীবনে স্পষ্ট দৃশ্যমান না হইলেও ইহার গন্ধ মাঝে মাঝে পাওয়া যায় না কি ? ইতিহাস বিকৃতি তো ঘটনা—ইহার বলে তো বিপ্লবী বাংলা ঐতিহাসিক কারণেই হইতে পারে না। দাঁড়ায় কি ?

প্রভাংশুধর চৌধুরী—২৫, ৫, ৮১

শহীদ স্যাণ্ডাস ও তার সহকর্মী এবং যারা একই উদ্দেশ্যে আত্মোৎসর্গ করেছেন। তাদের অবদান আমরা রাজনৈতিক কারণে ঘটেছে বলে মনে করি। তাঁদের আত্মদান আমরা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করি। ইংল্যাণ্ডের প্রধানমন্ত্রীর দৃষ্টিভঙ্গীকে আমরা সাম্রাজ্যবাদীর দৃষ্টিভঙ্গী বলে মনে করি এবং নিন্দা করি।

অনবধানতাবশতঃ, এই নিবন্ধটির মধ্যে কিছু বলা হয়েছে, তাতে ভুল ধারণা হওয়াই স্বাভাবিক। লেখক কিন্তু তাদের আত্মদানকে মহান ও গৌরবময় বলে স্বীকার করেছেন। যাহোক, এজন্য আমরা দুঃখিত।

—সম্পাদক।

Regd.No.R. N. 24511/71 | Biplabi Bangla | Regd. WB/NC. 77
Phone : 34-1795
বার্ষিক :—ডাক ১৫.০০ টাকা | ষাণ্মাসিক ৮—৮.০০ টাকা | মূল্য—৩০ পয়সা

পাক সেনাপতি ইয়াহিয়া খানের জল্লাদবাহিনী যে গ্রন্থ পুড়িয়ে ছাই করে দিয়েছিল বিপ্লব তাপস মহারাজ ত্রৈলোক্যনাথের সেই অবিস্মরণীয় গ্রন্থ "জেলে ত্রিশ বছর ও পাক ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম" পুনর্মুদ্রিত হল।

দাম—ত্রিশ টাকা

প্রাপ্তিস্থান
প্রতিষ্ঠান
১৫, কলেজ রোয়ার,
কলিকাতা-১২

সম্পাদক—
শ্রীশান্তিপদ রায়চৌধুরী
॥ সম্পাদকমণ্ডলী ॥
শ্রীজগদীশ চট্টোপাধ্যায় (সভাপতি)
শ্রীহরেশচন্দ্র নন্দী
পুষ্প চাটার্জী
মলয় ঘোষ
প্রকাশক ও মুদ্রক—
শ্রীঅমিল সেনগুপ্ত
দিল্লীর বিশেষ প্রতিনিধি—
শ্রীবাবীন ঘোষ
বেহালা—
শ্রীনন্দগোপাল দাস

6 JUN 1981

বিপ্লবী পুস্তকমালা

নেতাজীর সিক্রেটসার্ভিস—ডাঃ পবিত্রমোহন রায়—১০.০০

বিপ্লবী মহানায়ক রাসবিহারী—সুবোধ [illegible]

অনুশীলন সমিতির বিপ্লবী প্রচেষ্টা—[illegible]

—ক্ষীরোদ কুমার দত্তের [illegible]

Rs. 6
Date 18.9.82

১। বাংলার অগ্নিযুগ—১.৫০, ২। বহ্নিশিখা [illegible] ৩.০০
৩। অনুশীলন সমিতির [illegible], ৩য় খণ্ড—২.০০, ৪। বৈপ্লবিক সংগ্রাম কাহিনী—১.০০, [illegible] ৫। [illegible] ১.২৫, ৬। কলকাতা বাজার সংগ্রাম কাহিনী—৪০, ৭। রাসবিহারী ও অনুশীলন সমিতি—১.০০
৮। স্বাধীনতাসংগ্রামে নারী ও শিশু—৭৫, ৯। বিপ্লবাত্মক ও সন্ত্রাসবাদ—১.৫০
১০। বিপ্লবী বিবেকানন্দ—৫০, [illegible] ও সুভাষচন্দ্র—৭৫
১২। ভারতের মহাজাগরণ ও চরিত্রী বিবেকানন্দ—১৫, ১৩। দেশ গড়ের ডোকেমেন্ট (১)—১.০০, ১৪। দেশ গড়ের ডোকেমেন্ট (২)—১.০০
১৫। শহীদ চন্দ্রশেখর আজাদ—৫০, ১৬। ১৯শে এপ্রিল জাতীয় শহীদ দিবস—১.০০, ১৭। [illegible] প্রচেষ্টা—১৫, ১৮। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও অনুশীলন সমিতি—১.৫০, ২১। ভারতের জাতীয় পতাকার ইতিহাস—৫০, ২৩। কাট [illegible] প্রচেষ্টা—১.৫০

প্রাপ্তিস্থান— [illegible] ষ্ট্রীট কলিকাতা-৭০০০০৭

[illegible] ১১/১১A [illegible] ষ্ট্রীট কলিকাতা-১০

মূল কার্যালয়—৪৯, বঙ্গভ পাস ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০০৭ শ্রীঅমিল সেনগুপ্ত কর্তৃক প্রকাশিত এবং তৎকর্তৃক [illegible] পাবলিসিটি, ১১৭, বেলেঘাটা সেন ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০০২ হইতে মুদ্রিত।

বিপ্লবী বাংলা

॥ বিপ্লবী পরিষদের সাপ্তাহিক মুখপত্র ॥

স্থাপিত—১৯৫৬, 'বিপ্লবী বাঙ্গালী' নবকলেবরে—১৯৭১

দশম বর্ষ	শনিবার ২৩শে জ্যৈষ্ঠ ১৩৮৮ ৬ই জুন ১৯৮১	৩২ সংখ্যা

CALCUTTA 'MUNICIPAL'

নীতি একটি আপেক্ষিক কাজ। জগতে বিশুদ্ধ নীতি বলিয়া কোন পদার্থ আছে কি? ঐ ধারণা কুসংস্কার মাত্র। প্রত্যেক যুগের প্রত্যেক ব্যাক্তিকে একই আদর্শের দ্বারা বিচার করিবার অধিকার আমাদের নাই। অবস্থার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ভাবের পরিবর্তনও অপরিহার্য্য।

—স্বামী বিবেকানন্দ

বাংলাদেশ কোন পথে

গত ৩০শে মে হঠাৎ বাংলাদেশের পরিস্থিতির এমন একটা নাটকীয় পরিবর্তন ঘটল, সেটা সমস্ত বিশ্বে, বিশেষ করে ভারতবর্ষের মধ্যে একটা বিস্ময় সৃষ্টি করেছে। অবশ্য জনমত নির্বিশেষে সবাই বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানকে যেভাবে হত্যা করা হয়েছে, তার নিন্দা করেছে। আমাদের প্রধানমন্ত্রী এই ঘটনাকে হিংসার রাজনীতি বলে আখ্যা দিয়েছেন এবং এই ধরণের রাজনীতি নিন্দার্হ ও পরিত্যাজ্য বলে সে কথা বলেছেন। তার মধ্যে সব দেশের চিন্তাশীল মানুষদের মত প্রতিফলিত হয়েছে।

কেন এই হত্যাকাণ্ড ঘটনা হয়েছে, তার সম্বন্ধে বিস্তৃত খবর এখনো আসেনি। তাই মতামত করা দুরূহ হয়ে পড়েছে। কেউ বলছেন ব্যক্তিগত ক্ষমতা লোভেই এই কাজ করা হয়েছে। কেউ বলছেন, বাংলাদেশকে একটা মুসলিম রাষ্ট্ররূপে গড়ে তোলার জন্য, ওখানকার কোন কোন দল এবং মিলিটারী প্রধানেরা সেজন্য একান্তভাবে আগ্রহী। কিন্তু প্রয়াত রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান এই পথে চলতে খুব রাজী ছিলেন না। তাঁকে এরা পথের কাটা মনে করে, তাকে সরিয়ে দিয়েছে। সময়ে হয়ত এই হত্যাকাণ্ডের অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য প্রকাশ পাবে।

বর্তমানে আমাদের একটী প্রতিবেশী বন্ধু রাষ্ট্রে একটা অনিশ্চয়তা, অস্থিরতার অবস্থা চলতে থাকলে, আমাদের উদ্বেগের কারণ অবশ্যই থাকবে। অস্থিরতার জন্য এবং স্থিতিশীলতার অভাব ঘটলে, ভারত বৈরী কোন দেশ এবনো ফায়দা তুলতে সচেষ্ট হবে। তাদের প্রধান উদ্দেশ্য যে ভারতের স্থিতিশীলতা নষ্ট করে অগ্রগতির পথ রুদ্ধ করে, ভারতকে একটা দুর্বল রাষ্ট্ররূপে থাকতে বাধ্য করা। সেজন্য সতর্কতার যেমন প্রয়োজন, তেমনি ঘরের কাছে শত্রুরা ঘাটি গড়ে না তুলতে পারে, সেদিকে প্রখর দৃষ্টি রাখার প্রয়োজনও অনস্বীকার্য।

দুর্ভাগ্যক্রমে ভারতের প্রতি প্রকটি বিরূপ মনোভাব গড়ে তোলার আয়োজন চলছিল নানা অজুহাতে। বলা বাহুল্য, বাঙলাদেশের মানুষের এমনকি সরকারেরও, ভারতের বিরুদ্ধে কোন ন্যায়সঙ্গত অভিযোগ ছিল না। ভুলপথে জনমতকে পরিচালিত করতে যেয়ে, বাঙলাদেশ নিজেদের বিবাদ নিজেরাই ডেকে আনছিল। এই পথ অসঙ্গত পরিবেশ সৃষ্টি করার জন্য সুযোগ ক্ষুব্ধ ও অসন্তুষ্ট মিলিটারী প্রধানরা নিয়েছে কিনা সেটা নির্দ্ধারণ করা এখনই সম্ভব না হলেও, এই সম্ভাবনাকে এখনই বাতিল করে দেওয়ার কোন কারণ নাই।

আমরা জিয়াউর রহমানের হত্যাকে তীব্রভাবে নিন্দাই করি। এই হত্যার পরিণাম শেষ পর্যন্ত বাঙলাদেশকে কোথায় নিয়ে যেতে পারে সেটা ভেবেও আমরা উদ্বেগ অনুভব করি। একটা গৃহযুদ্ধের পরিস্থিতি ওখানে সৃষ্টি হয় আমরা এটা চাইনা এবং আমরা বিশ্বাস করি শুভবুদ্ধি সম্পন্ন কোন দেশ এবং মানুষও চায় না। আমরা বাঙলাদেশের রাজনৈতিক দলগুলির নিকট থেকে প্রত্যাশা করব যে তাঁরাও যেন ব্যক্তিগত লোভ ও ক্ষমতার লোভে এই গৃহযুদ্ধে ইন্ধন যোগাবেন না বাঙলাদেশের নবলব্ধ স্বাধীনতাকে বিপন্ন করে তুলবেন না। তারা বাঙলাদেশের এই সঙ্কটকালে যেন নিজ নিজ দায়িত্ব পালন করে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমিকতাকে সুরক্ষিত করেন।

পশ্চিমবাঙলার আসন্ন উপনির্বাচন ও কংগ্রেস (ই)

--কালীপদ সরকার

দুর্নীতিমুক্ত অবাধ নির্বাচন হল গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থার ভিত্তি। এই ভিত্তি সুরক্ষিত করার জন্য প্রয়োজন হল, (১) নির্ভুল ভোটার তালিকা, (২) ভোটার সনাক্তকরণ, (৩) ভোটপত্রের বিধিসম্মত ব্যবহার এবং নির্ভুল হিসাব রক্ষা, (৪) ব্যালট বাক্সের নিরাপত্তা, (৫) ব্যালট বাক্সের মুখে ভোট সমাপ্তির পর প্রার্থী-দের নিজস্ব সিলমোহর স্থাপন (৬) বাক্সবন্দী ভোটপত্রের সংখ্যা প্রদত্ত ভোটের হিসাবের সহিত মিল করা। (৭) সঠিক ভোট পত্র গণনা।

নির্বাচনে অনেক কাজের মধ্যে এই সাত দফা কাজ প্রধান। এই কাজগুলি আইন সঙ্গত ভাবে নিষ্পন্ন হলে ভোটে কারচুপির সম্ভাবনা বিশেষ থাকে না।

ভোটার তালিকা প্রণয়ণ যাতে নির্ভুল হয় তার দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের হলেও, রাজনৈতিক দলগুলি এবং নির্বাচক মণ্ডলীর এ ব্যাপারে সক্রিয় ভূমিকা নেওয়া আবশ্যক তালিকায় যোগ্য ব্যক্তির নাম উঠল কিনা, নাম, পিতা/স্বামীর নাম বয়স ও ঠিকানা ঠিকমত লেখা হল কিনা এবং ভুয়ো নাম অন্তর্ভুক্ত হল কিনা—সে সব যথা সময়ে পরীক্ষা করা অত্যন্ত জরুরী এবং এ ব্যাপারে রাজনৈতিক দলগুলিকে অগ্রণী হতে হয়। চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশের পূর্বে এ কাজ যথাযথ ভাবে সমাধা করা না হলে ভোটার তালিকা নির্ভুল হওয়া কঠিন।

এই কাজের জন্য দলের পক্ষ থেকে যথেষ্ট সংখ্যক সচেতন যোগ্য কর্মী ও পর্যবেক্ষক নিয়োগ অত্যাবশ্যক। নতুবা শেষে নির্বাচন কালে ভুয়ো ভোটার তালিকার অভিযোগ তুলে হৈ চৈ করলে লাভ কিছুই হয় না। কংগ্রেস (ই) দলনেত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী ১৯৮০ সালে সগৌরবে কেন্দ্রে ক্ষমতায় ফিরে আসার পর সকল রাজ্যে কংগ্রেস (ই) সংগঠন শক্তিশালী হয়ে উঠে। দুঃখের বিষয় পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য তার ব্যতিক্রম। এ রাজ্যে কংগ্রেস (ই) সংগঠনে এমন কোন নেতার আজও আবির্ভাব ঘটেনি যিনি দলের সকল গোষ্ঠীকে সুনির্দিষ্ট এবং ক্রিয়াশীল কর্মসূচীর মাধ্যমে সঙ্ঘবদ্ধ করতে সক্ষম। প্রকৃত প্রস্তাবে বাস্তবদৃষ্টি সম্পন্ন সংগঠন কর্মই দলকর্মীদের আভ্যন্তরীণ কলহ দূর করতে পারে। গত এক বছরে ভোটার তালিকা সংশোধনের ব্যাপারে প্রদেশ কংগ্রেস কোন ব্যাপক কার্যসূচী গ্রহণ করতে পারেন নি, যা আগত উপ-নির্বাচন অথবা ১৯৮২ সালের সাধারণ নির্বাচনের ক্ষেত্রে দলের সাফল্য লাভের পথে কঠিন বাধা জন্মাবে।

ভোটার তালিকার পরেই ভোটদান ও ভোটগণনা পর্ব, অর্থাৎ উপরোক্ত ২ থেকে ৭ দফার কাজ। এই কাজ যথার্থভাবে সম্পূর্ণ করার দায় দায়িত্ব পালন করেন প্রিসাইডিং ও পোলিং অফিসাররা। মোটামুটি ভাবে তারাই হলেন নির্বাচনের আসল কর্মকর্তা। এদের মধ্যে প্রিসাইডিং অফিসাররা হলেন আবার ভোট পর্বের সর্বাধিক ক্ষমতাসম্পন্ন ও দায়িত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত। তাদের দক্ষতা কর্তব্যনিষ্ঠা ও সততার উপর দুর্নীতিমুক্ত নির্বাচন অনুষ্ঠান প্রধানতঃ নির্ভর করে। প্রিসাইডিং ও পোলিং কর্মচারীরা মুখ্যতঃ সরকারী অফিসের লোক এবং স্থানীয় শিক্ষকদের মধ্য থেকে আসেন। ব্রিটিশ আমলে এই দুই বিভাগের মানুষ, রাজনীতি করতেন না; তাই তাদের নিকট থেকে নিরপেক্ষতা আশা করা যেত। কংগ্রেস আমলেও সেই ঐতিহ্য বজায় ছিল।

কমিউনিস্টদের সরকারে গঠন করার পর থেকে সর্বপ্রথম সরকারী অফিসে রাজনীতি ছড়িয়ে পড়ে। কর্মচারীরা কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য না হলেও, তাদের যতদূর সম্ভব পার্টির আদর্শানুগত অর্থাৎ Committed করার চেষ্টা চলে এবং বামফ্রন্ট সরকার তাতে অনেকখানি সফলও হয়েছেন। কারণ কমিউনিষ্টরা বুর্জোয়াগার্কা গণতন্ত্রে বিশ্বাসী নন এবং নির্বাচন তাদের কাছে ক্ষমতা দখলের কৌশল মাত্র। নির্বাচনের পবিত্রতা রক্ষার প্রশ্ন তাদের কাছে তাই একান্তভাবে অবান্তর। এ পরিস্থিতিতে সরকারী অফিস ও স্কুল কলেজের ছদ্মবেশী কমিউনিস্ট ক্যাডারগণ যদি নির্বাচনে প্রিসাইডিং ও পোলিং অফিসার নিযুক্ত হন তাহলে ভোটগ্রহণ ও ভোটগণনা যে অবাধ ও নিরপেক্ষ হবে, সে সম্বন্ধে সন্দেহ না জেগে পারে না। সকলেই মনে করেন যে ভোটের ব্যাপারে সাহায্য লাভের উদ্দেশ্য সামনে রেখে বামফ্রন্ট সরকারী কর্মচারী ও শিক্ষকদের তোষণে তৎপর আছেন, জনসাধারণের আর্থিক অবস্থার কথা ভেবে ধাপে ধাপে এই দুই বিভাগের কর্মীদের বেতন ও ভাতা বৃদ্ধি তার দৃষ্টান্ত। মহাকরণে কাজের সময় চেয়ারখালি দেখেও তাই মন্ত্রীরা কিছু বলেন না, শিক্ষক স্কুল-কলেজ ঠিকমত ক্লাস না নিলেও তাই তাদের কসুর হয় না, পুলিস নাগরিকের বিপদকালে নিষ্ক্রিয় থাকলে তাদের কৈফিয়ত দিতে হয় না, সাজা তো দূরের কথা।

প্রশাসনকে দলের কব্জিকরার ব্যাপারে বামফ্রন্টের অভিসন্ধি সকলেই জানে, মায় চিফ ইলেকসন কমিশনার পর্যন্ত। এখানেই বেধেছে গোল। নিরপেক্ষ ও অবাধ নির্বাচন অনুষ্ঠানের দায় দায়িত্ব এই ব্যক্তির এবং সে কারণে তিনি উপ-নির্বাচনগুলির জন্য নাকি সরকারী অফিসের ছদ্মবেশী ক্যাডারদের যতটা সম্ভব বাদ দিয়ে প্রিসাইডিং ও পোলিং অফিসার নিয়োগের ব্যবস্থা করেছেন। অর্থাৎ এতদিন ধরে তা দেওয়া শিকারী পাখির ছানাদের কোন কাজেই আসছে না তাহলে।

বামফ্রন্ট কমিটির চেয়ারম্যানের নিকট নির্বাচন কমিশনের সিদ্ধান্তটি যে জন্য গাত্রদাহের কারণ হয়েছে। ২৩।৫।৮১ তারিখের দৈনিক বসুমতীর প্রতিবেদনে বলা হয়েছে যে, 'প্রমোদ দাসগুপ্ত মনে করেন পোলিং অফিসার নিয়োগের সময় সরকারী কর্মচারীদের পার্টির ছাপ যোঁজার যে চেষ্টা হচ্ছে তা 'বিপজ্জনক পদক্ষেপ'।"

রাজ্য সরকারের এ বিষয়ে কিছু বলার নেই। নির্বাচন অনুষ্ঠানের ব্যাপারে চিফ ইলেকসান কমিশনের রায়ই চূড়ান্ত। তবে রাজ্য সরকার কমিশনের প্রতি বিরূপ হলে এ রাজ্যে কমিশনের সিদ্ধান্ত কার্যকর হওয়া খুবই কঠিন। এখানেই কমিউমিস্ট ও অকমিউনিস্ট রাজনৈতিক দলের আদর্শগত পার্থক্য ধরা পড়ে। সরকারী কর্মচারীদের বিভিন্ন রাজনৈতিক মত থাকতে পারে, কিন্তু তারা যদি নিজেদের কোন রাজনৈতিক দলের লেজুড় করে তোলেন, তাহলে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের দপ্তরে কাজ করার যোগ্য বলে বিবেচিত হতে পারেন না। পূর্বেই বলা হয়েছে যে নির্বাচন পর্বে প্রিসাইডিং ও পোলিং অফিসারদের ভূমিকা সর্বাধিক। নির্বাচন কমিশনার যে এদিকে দৃষ্টি দিয়েছেন সেজন্য তিনি-ধন্যবাদার্হ।

এ ব্যাপারে কিন্তু কংগ্রেস (ই) দলের দায়িত্ব কোন অংশে কম নয়। কারণ তাদের কাছে নির্বাচন পশ্চিমবঙ্গে গণতান্ত্রিক শাসন পুনঃস্থাপনের আদর্শগত লড়াই। এ লড়াই কেবল প্রচার ও পোস্টারের প্রতিযোগিতা নয়, সর্বাধিক সংখ্যক ভোটার যাতে ভোটকেন্দ্রে উপস্থিত হন, ভোটদান ও ভোটপত্র গণনা যাতে সঠিকভাবে অনুষ্ঠিত হয় এবং ভোটকেন্দ্র ভোট গণনা স্থানগুলিতে যাতে দলের যোগ্য প্রতিনিধি নিযুক্ত হন, প্রবল কংগ্রেস (ই) কে অবশ্যই তার ব্যবস্থা করতে হবে। এ [illegible] ও বিদেন-

সভার উপ-নির্বাচনের ফলাফলের উপর রাজ্য অথবা কেন্দ্রীয় সরকারের স্থিতির প্রশ্ন নির্ভর করছে না ঠিকই কিন্তু এক বছর পরে এ রাজ্যের বিধানসভার সাধারণ নির্বাচনে এই উপ-নির্বাচনের ফল নিঃসন্দেহে কিছু প্রভাব ফেলবেই।

প্রদেশ কংগ্রেস (ই) কর্তৃপক্ষ উপ-নির্বাচন গুলির কাজ কেমন সুসংহত ভাবে করেন জনসাধারণ তাই দেখতে চায়। নির্বাচক মণ্ডলীর শতকরা ৫০ ভাগ নিজ নিজ দল অনুবর্তী এবং বাকী ৫০ ভাগ সুনির্দিষ্ট ভাবে কোন বিশেষ দলানুগত নন। শেষোক্ত ৫০ ভাগ ভোটারের মধ্যে যে প্রতিদ্বন্দ্বী দল বেশি সংখ্যক টানতে পারবে, সেই দল জয়ী হবে। প্রধানমন্ত্রীর ভাবমূর্তী এবং বামফ্রন্ট সরকারের নানা ব্যর্থতা নিঃসন্দেহে কংগ্রেস (ই)-র প্রার্থীদের সহায়ক হবে, তবে সেই সঙ্গে অন্তর্কলহ পরিমুক্ত রাজ্য কংগ্রেস (ই)-র সাংগঠনিক শক্তিও জন সমক্ষে প্রদর্শন করতে হবে। নতুবা অনুকূল নির্বাচনী হাওয়া কাজে লাগানো যাবে না।

ভারতীয় রাজনীতিতে পোলারিজেসন আসন্ন। কংগ্রেস (আরস), জনতা ও লোকদলের পরমায়ু নিভে এসেছে। পশ্চিমবাংলায় আসন্ন পুরসভা নির্বাচন ও পরবর্তী লোকসভা ও বিধানসভার উপনির্বাচন-গুলি অনুষ্ঠানের মাঝ দিয়ে তাঁদের ওপর যবনিকা পতন অবশ্যম্ভাবী। কংগ্রেস (আরস) নেতারা সেটা বুঝে ফেলেছেন, জনতা ও লোকদল পরিণাম জেনেও জানতে চাইছেননা। নির্বাচক মণ্ডলী যথা সময়ে সে সত্য যে তাদের বুঝিয়ে দিতে অন্যথা করবে না তাও নিশ্চিত।

বিলীয়মান জাতীয় দল ও ক্ষুদে স্থানীয় দলের মধ্যে যে প্রতিভাবান রাজনীতিক নেই এমন নয়। নির্দল প্রার্থীদের মধ্যেও যোগ্য প্রার্থী থাকা সম্ভব। তবে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থায় রাজনৈতিক দলের ভূমিকাই মুখ্য. ক্ষুদে দল বা নির্দল প্রার্থী নির্বাচনে জয়লাভ করলেও কদাচিৎ কাজে আসেন।

কমিউনিস্টরা জোটবদ্ধ ভাবে যে রাজ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নেমেছেন, সেখানে, অ-কমিউনিষ্ট নির্বাচক মণ্ডলী দুর্বল রাজনৈতিক দল, কিংবা নির্দল প্রার্থীর সমর্থনে ভোট দিলে, প্রকৃত প্রস্তাবে তারা তাদের আদর্শ বিরোধী কমিউনিষ্ট জোটকেই নির্বাচন জয়ে সাহায্য করবেন—এ কথা যেন ভুলে না যান। পশ্চিম বাংলায় কংগ্রেস (ই) দল একমাত্র শক্তিশালী অকমিউনিস্ট এবং কেন্দ্র ও ভারতের অধিকাংশ রাজ্যে শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত দল। ভারতের ঐক্য, নিরাপত্তা এবং বৈষয়িক বিকাশের গুরু দায়িত্ব কংগ্রেস (ই)-র উপর ন্যস্ত। কংগ্রেস (ই) ভারতের বৃহত্তম জাতীয়তাবাদী রাজনৈতিক দল। পশ্চিমবাংলার প্রতিটি অ-কমিউনিষ্ট এবং প্রগতিবাদী কমিউনিষ্ট ভোট যাতে কংগ্রেস (ই) প্রার্থীর পক্ষে প্রদত্ত হয়, তা রাজ্যের রাজনীতি সচেতন নরনারীকে অবশ্যই দেখতে হবে।

উপনির্বাচনগুলি আগামী সাধারণ নির্বাচনে সাফল্যের পটভূমি তৈরী করবে তাই উপনির্বাচনের ভোট সম্পর্কে কারো উদাসীন হওয়া চলে না। শেষ কথা হল, নির্বাচনে কারচুপির আশঙ্কা যথেষ্ট আছে, ভোটার তালিকা থেকে ভোট গণনা অবধি। বুথ দখল প্রভৃতি হিংসাশ্রয়ী ঘটনার আশংকাও উড়িয়ে দেওয়া যায় না। বামফ্রন্ট মূলতঃ মার্কসবাদীদের জোট, মার্কসবাদ গণতন্ত্রে বিশ্বাস করে না। আশঙ্কার কারণ সেখানে। তবুও জনসাধারণের সঙ্ঘবদ্ধ সতর্ক দৃষ্টি এড়িয়ে কারচুপি করা খুব সহজ হবে না, বিশেষ করে হাওয়া যদি একবার কংগ্রেস (ই) র অনুকূলে জোরে ওঠে। তখন 'এ যৌবন জল তরঙ্গ রোধিবার সাধ্য রহিবে না কারো।'

মেজ জেলে অনশনব্রতীদের রক্ষার্থে জনরোষ গর্জে উঠুক

—জনৈক স্বাধীনতা সংগ্রামী

আয়ারল্যাণ্ড উত্তাল, বিশ্বের বিবেক আত্ম-গ্লানির কশাঘাতে জর্জরিত, চারিদিকে উঠেছে অসংখ্য হৃদয়ের হাহাকার, চোখের সামনে চলেছে মৃত্যুর মিছিল, একটির পর একটি তাজা যুবকের আত্মাহুতি।

উত্তর আয়ারল্যাণ্ডের মেজ জেলে আইরিশ রিপাবলিকান আর্মি (আই, আর, এ) নেতা ২৭ বছরের যুবক ববি স্যাণ্ডস আমৃত্যু অনশন করে ৬৬তম দিনে মৃত্যু বরণ করেছেন। তাঁকে অনুসরণ করলেন ফ্রান্সিস হিউজেস, রেমণ্ড ম্যাকক্রিশ এবং প্যাটিক ওহারা। একজন অনশনে মৃত্যুবরণ করলে তাঁর শূন্যস্থান নিচ্ছেন আর একজন অনশন-ব্রতী। সব সময়ের জন্য অনশনে থাকছেন মোট চার জন। উত্তর আয়ারল্যাণ্ডের মেজ জেলে আছেন ৪৪০ জন আইরিশ রিপাবলিকান বন্দী। এদের সবার মৃত্যু না হওয়া পর্যন্ত চলবে অবিরাম অনশন। তাঁদের দাবী জেলে বন্দীদের রাজনৈতিক মর্য্যাদা দিতে হবে। বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী থ্যাচারের দৃষ্টিতে চোর ডাকাত পর্য্যায়ভুক্ত এরা রাজনৈতিক বন্দীর মর্য্যাদা লাভের অযোগ্য।

অনশনের মধ্যেই ৪০তম দিনে স্যাণ্ডস বৃটিশ পার্লামেন্টের সদস্য নির্বাচিত হন, তবু তাঁর প্রতি কোন রকম মর্য্যাদা দেখাবার বা তাঁর দাবীতে কর্ণপাত করা কর্তব্য বোধ করেন নাই বৃটেনের প্রধানমন্ত্রী মার্গারেট থ্যাচার। শ্রীমতী থ্যাচারকে সমর্থন করেন না অনেক বৃটিশও। বৃটিশ শ্রমিকদলের বামপন্থী নেতা ওয়েজউড প্রকাশ্যে সমর্থন করেছেন আইরিশ বন্দীদের দাবী। বৃটিশ সৈন্যদের মধ্যেও বিক্ষোভ দেখা দিয়েছে। আইরিশ প্রোটেষ্ট্যাণ্টরাও বলেছেন আইরিশ রিপাবলিকান আর্মির বন্দীদের রাজনৈতিক মর্য্যাদা দিলে তাদের আপত্তি নেই। তীব্র আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছে দক্ষিণ আয়ারল্যাণ্ডে। দক্ষিণ আয়ারল্যাণ্ডের প্রধানমন্ত্রী হৈতো শ্রীমতী থ্যাচারকে অনুরোধ করেছেন বন্দীদের সঙ্গে আপোষ করার জন্য। পরে বৃটিশ ও দক্ষিণ আয়ারল্যাণ্ডের গবর্ণমেন্ট যৌথ বৈঠকে আইরিশ সমস্যা সমাধানের সূত্র খুঁজে বার করা যাবে। স্বাধীন দক্ষিণ আয়ারল্যাণ্ডে ক্যাথলিকরা উত্তেজিত। আইরিশ প্রধানমন্ত্রী দেখতে পাচ্ছেন আসন্ন ঝড়ের পূর্বাভাস। আইরিশ সমস্যার সমাধান সম্পর্কে জাতীর নির্দেশ জানার জন্য তিনি ডেকেছেন সাধারণ নির্বাচন। মেজ জেলে আত্মাহুতি চললে দলে দলে দক্ষিণ আয়ারল্যাণ্ড থেকে সশস্ত্র জনতা উত্তর আয়ারল্যাণ্ডে ঢুকবে।

দক্ষিণের রিপাবলিক আয়ারল্যাণ্ডের গবর্ণমেন্ট জনতাকে ঠেকিয়ে রাখতে পারবে না। তাই দক্ষিণ আয়ারল্যাণ্ডের প্রধানমন্ত্রী চার্লস মেজ জেলে অনশনে হিউজেসের মৃত্যুর পর বলেছেন অনশনে এক জনের পর একজন মারা যাবে এই ঘটনায় আইরিশ সরকার উদাসীন থাকতে পারে না।

আয়ারল্যাণ্ডের উত্তর ভাগের দুইটি কাউন্সিল নিয়ে উত্তর আয়ারল্যাণ্ড আয়তন ৫৪৬৩ বর্গ মাইল (১৪,১৪৮ বর্গ কি: মি:) লোক সংখ্যা ১৬ লক্ষ রাজধানী বেলফাষ্ট। আয়ারল্যাণ্ড ভাগ করা হয় ১৯২০ সালে। আয়ারল্যাণ্ড ১৯২২ সালে স্বাধীনতা লাভ করলেও উত্তর আয়ারল্যাণ্ড গ্রেট ব্রিটেনের অংশ থেকে যায়। কারণ দেখান হয় উত্তর আয়ার-ল্যাণ্ডের লোক সংখ্যার দুই তৃতীয়াংশ প্রোটেস্ট্যাণ্ট।

স্বাধীন আয়ারল্যাণ্ডের লোক সংখ্যার ৯৬ শতাংশ ক্যাথলিক ও ৩ শতাংশ প্রোটেষ্টাণ্ট। আয়ারল্যাণ্ড স্বাধীন হওয়ার পর ঐ সংখ্যালঘুদের ওপর কোন প্রকার নির্য্যাতনের সংবাদ কোন সূত্রে পাওয়া যায় নাই। তবু উত্তর আয়ারল্যাণ্ডের প্রোটেষ্টাণ্টদের বিচ্ছিন্নতা দাবী মেনে নিয়ে বৃটিশ সরকার উত্তর আয়ারল্যাণ্ডকে গ্রেট ব্রিটেনের অন্তর্ভুক্তই রেখেছে এবং ক্যাথলিকদের ওপর প্রোটেষ্টাণ্টদের আধিপত্য চালিয়েছে। উত্তর আয়ারল্যাণ্ডের সংখ্যালঘু রোমান ক্যাথলিকরা দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক। সংখ্যাগুরু প্রোটেষ্টাণ্টরা সব রকম সুযোগ সুবিধার অধিকারী। আপত্তি জানাইলেই জনমত স্তব্ধ করার জন্য অত্যাচার। ইহার প্রতিবাদ মিছিলে ১৯৭৭ সালের ৩০ জানুয়ারী ১৫ হাজার নর নারীর নিরস্ত্র শোভাযাত্রার ওপর বৃটিশ বাহিনীর ওপর সৈন্যরা গুলি চালিয়েছিল। ১৯৭৬ সালে পাশ করে সন্ত্রাস দমন আইন। আইরিশ গেরিলাদের বিচার হয় এই আইনে ও আদালতে, সেখানে যাবে না তুমি। ইউরোপের মনবাধিকার কমিশন নিন্দা করেছেন বৃটিশ জেলে আইরিশ বিপ্লবীদের ওপর অমানুষিক নির্য্যাতনের ও বিচার পদ্ধতির।

আয়ারল্যাণ্ডবাসীরা কোন সময়ই আয়ারল্যাণ্ড বিভক্তির নীতি মেনে নেয় নাই। গত দশ বছর যাবৎ এই আন্দোলনের তীব্রতা বৃদ্ধি পায়। দশ বছরে উত্তর আয়ারল্যাণ্ড বিভিন্ন সংঘর্ষে গুলি ও বোমার দুই হাজার মানুষের প্রাণ যায়, আহত হয়েছে অন্ততঃ ২০ হাজার। ১৯৭৯ সালের ২৭ আগষ্ট ঐ গণ্ডগোলের মধ্যেই প্রাণ হারায়েছেন ভারতের প্রাক্তন গবর্ণর জেনারেল লর্ড মাউন্টব্যাটেন ভারতকে বিভক্তি করা হয় তার শাসনকালে।

আইরিশ রিপাবলিক কর্মীরা ক্যাথলিক ধর্মে বিশ্বাসী হলেও পোপ দ্বিতীয় জন পলের শান্তির আবেদন প্রত্যাখ্যান করে আই. আর. এর নেতারা বলেছেন বৃটিশ উপস্থিতির অভিশাপ থেকে আয়ারল্যাণ্ডকে মুক্ত করতে আমরা বিশ্বাস করি সশস্ত্র লড়াই একমাত্র অবশিষ্ট পথ। মেজ জেলে বিপ্লবী ববি স্যাণ্ডস ও তার সহকর্মীদের আত্মদানের উদ্ঘাটন হয়েছে বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের নগ্ন হিংস্রতা ও আইনের নামে জঘন্য ব্যাভিচার। অন্তরিক্ষে সৃষ্টি হয়েছে বৃটিশমুক্ত উত্তর আয়ারল্যাণ্ড।

আয়ারল্যাণ্ডের স্বাধীনতা আন্দোলন পরাধীন ভারতকে প্রেরণা দিয়েছে। আয়ারল্যাণ্ডের বিপ্লবী দল, সিন ফিনের কর্মীরা এবং নেতা ক্লার্ক, টমাস কেলি, মাইক্যাল কলিনস, ডি. ভ্যালেরার কার্য্যকলাপের সঙ্গে আমাদের দেশের বিপ্লবীরা বিশেষ পরিচিত। বৃটিশ জেলে আয়ারল্যাণ্ডে আমরণ অনশন করে বিপ্লবী ম্যাকসুইনীর মৃত্যুবরণ আমাদের দেশের বিপ্লবীদের ও অনুপ্রেরণা দিয়েছে। মেজ জেলে আই, আর, এর বন্দীদের আমৃত্যু অনশন সংকল্প আমাদের দেশের মৃত্যুঞ্জয়ী বীর বিপ্লবী যতীন দাসের ১৯২৯ সালে লাহোর জেলে অনশনেরই সমতুল্য। রাজবন্দীদের উপযুক্ত মর্য্যাদার দাবীতে ৬৩ দিন অনশনের পর বিপ্লবী যতীন দাস এমনিভাবে মৃত্যুবরণ করেন। আইরিশ মহিলা মিস মার্গারেট (ভগিনী নিবেদিতা) এবং মিসেস্ অ্যানি বেসেণ্টের ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে ও সমাজ সংস্কারে সক্রিয় অবদান আমরা সর্বদাই স্মরণ করি ও শ্রদ্ধা জানাই। কাজেই মেজ জেলের আই. আর, এর বন্দীদের ওপর অমানুষিক অত্যাচারের নীরব দর্শক আমরা ভারতবাসীরা হতে পারিনা। বন্দীদের জীবন রক্ষার্থে আমাদের আওয়াজ তুলতে

(এর ৯ম পৃঃ দেখুন)

দক্ষিণ এশিয়ার উপর যুদ্ধের ছায়া

— রাজনৈতিক সমীক্ষা

যুদ্ধের যে কোলো ছায়াটি দক্ষিণ এশিয়াকে আবৃত করেছে তার কটিকা কেন্দ্র পারস্য উপসাগরীয় অঞ্চল থেকে ভারতের পশ্চিম সীমান্ত অবধি প্রসারিত। সম্প্রতি বাংলাদেশের প্রেসিডেন্ট জেনারেল জিয়াউর রহমানের হত্যা এবং সেখানকার অস্থির পরিস্থিতি অবস্থাকে আরো জটিল করে তুলেছে। অর্থাৎ ঝড়ের মেঘখানি ভারতের পূর্ব প্রান্তেও বিস্তৃত হয়েছে।

প্রেসিডেন্ট রহমানের হত্যার ঘটনার এখনো কোন সঠিক সংবাদ মিলে নি। মৃতের উদ্দেশ্য জানাজা নমাজ অনুষ্ঠিত হলেও মৃতদেহের হদিস হয় নি, বাংলাদেশ রেড ক্রস চেষ্টা করেও দেহটি উদ্ধার করতে পারেন নি, অথবা মৃতদেহ সমাহিত হবার কোন খবরও পাওয়া যায় নি। সুতরাং ঘটনাটি রীতিমত রহস্যপূর্ণ রয়ে গেছে। অন্যদিকে চট্টগ্রাম সেকটরের সেনা নায়ক মেঃ জেঃ মঞ্জুর আমেদ যাকে বিপ্লবী পরিষদের নেতা এবং জিয়ার হত্যার জন্য দায়ি করা হচ্ছে, তিনি কিন্তু নিহত রাষ্ট্রপ্রধানের ঘনিষ্ট সহযোগীদের অন্যতম এবং ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে জিয়াউর রহমানের নেতৃত্বাধীনে বীরত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। ১৯৭৫ সালের নারকীয় হত্যা কাণ্ডের পর, জিয়া যখন ক্ষমতার শিখরে উঠেছিলেন তখনও মেঃ জেঃ মঞ্জুর আমেদ তাঁর সমর্থক ছিলেন।

ক্ষমতালাভের দ্বন্দ্বে শত্রু মিত্রের সম্পর্ক পরিবর্তনশীল এবং বিশেষ করে সামরিক বলে গদি দখলের ব্যাপারে সেই সম্পর্ক মূলাহীন। সেনা নায়ক মঞ্জুর আমেদ চট্টগ্রামে একটি পালটা সরকার গড়েছেন এবং সেখানকার সৈন্যদল এবং নৌ-বাহিনী তাঁর নিয়ন্ত্রণে বলে দাবি করেছেন। বাংলাদেশ সরকারের সৈন্যাধ্যক্ষের নির্দেশ অনুসারে আত্মসমর্পণের পরিবর্তে বিপ্লবী পরিষদের নেতা মেঃ জেঃ মঞ্জুর উভয় পক্ষের মধ্যে একটা সমঝোতার প্রস্তাব দিয়েছেন, তবে শেষ পর্যন্ত তিনি আত্মসমর্পণ করবেন না গ্রেপ্তার হবেন কিছুই বলা যায় না। সমঝোতা না হলে বাংলাদেশ গৃহযুদ্ধের সম্ভাবনা অনিবার্য হয়ে উঠবে। লক্ষ করার বিষয় যে, চট্টগ্রামের বিপ্লবী পরিষদ ভারত-বাংলাদেশ মৈত্রীচুক্তি নাকচ করে ঘোষণা দিয়েছে, পক্ষান্তরে বাংলাদেশের অস্থায়ী প্রেসিডেন্ট আবদুস সাত্তার মৈত্রীচুক্তি অব্যাহত আছে বলে ঘোষণা করেছেন। মৈত্রীচুক্তির শর্তানুযায়ী বাংলাদেশ সরকার ভারতের নিকট সামরিক সাহায্য সহ সর্বপ্রকার সহযোগিতা পাবার অধিকারী। সেই সাহায্যের প্রস্তাব এখনো ভারতের নিকট আসে নি।

একথা স্বীকার করতে কোন দ্বিধা নেই যে, ভারতীয় উপমহাদেশের পূর্ব ও পশ্চিম অংশে যে রাজনৈতিক অস্থিরতা দেখা দিয়েছে এবং সেই সঙ্কটের সুযোগ নিয়ে বৃহৎশক্তিবর্গ সেখানে প্রবেশের পথ খুঁজছে, তার মূল কারণ দেশবিভাগ। বড়লাট লর্ড ওয়াভেল সেই কারণে ভারত-বিভাগের বিরোধিতা করে বলেছিলেন—দেশবিভাগ কেবলমাত্র বহু শতাব্দীর শ্রম, সাধনা ও রক্তের বিনিময়ে গড়া ভারতীয় ভৌগলিক ঐক্যকেই ধ্বংস করবে তাই নয়, বিভক্ত দুই অংশের লক্ষ লক্ষ অসহায় সাধারণ মানুষকে অবর্ণনীয় দুঃখ দুর্দশায় ফেলবে, দেশের অর্থনৈতিক বিকাশে নানা বাধা জন্মাবে

বিভক্ত ভারতবর্ষ দুই প্রতিবেশী বৃহৎ রাষ্ট্র রাশিয়া ও চীনের অসৎ অভিসন্ধির শিকার হবে। লর্ড ওয়াভেল ঐক্যবদ্ধ ভারতের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করার পক্ষপাতী ছিলেন এবং তার জন্য ক্ষমতা হস্তান্তর কালকে কয়েক বছর পিছিয়ে দিতে চেয়েছিলেন। ওয়াভেল হিন্দু-মুসলমান অনৈক্যের প্রশ্নকে তেমন গুরুত্ব দিতে চান নি, অথচ ভারতের সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনে যে পরস্পর নির্ভরতা এবং অভিন্ন অস্তিত্ব তিনি বিরাজমান তাকেই তিনি ঐক্যের স্থায়ী ও কালজয়ী ভিত্তি বলে বিশ্বাস করতেন। ঐতিহাসিকগণ যাকে ভারতবর্ষের "Unity in diversity" বলেছেন।

বলা বাহুল্য, লর্ড ওয়াভেলের পরামর্শ তাঁর দেশের কর্তৃপক্ষ গ্রহণ করেন নি এবং তিনি বড়লাট গিরিতে ইস্তফা দিয়ে দেশে ফিরে গিয়েছিলেন। ওয়াভেল সাহেবের ভবিষ্যবাণী নির্মম সত্য হয়ে আমাদের সামনে অভিব্যক্ত। খণ্ডিত অংশের সংখ্যা লঘুদের দুর্দশা আমাদের প্রত্যক্ষগোচর, তা নিয়ে বেশি বলা নিষ্প্রয়োজন। যে পাকিস্থানে ধর্মীয় সংখ্যালঘুরা সম্পূর্ণ নির্মূল, সেখানে সমস্যা অগ্নিগর্ভ, সংখ্যা পরিষ্ঠ পাঞ্জাবীদের আধিপত্যের বিরুদ্ধে সিন্ধী, বেলুচ ও পেশোয়ারী সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের বিদ্রোহকে কেন্দ্র করে।

পাকিস্থানে ধর্মের বন্ধন বংশ, ভাষা ও সংস্কৃতিগত স্বাতন্ত্র্য ভাবনাকে মুছে দিতে পারে নি। অ-বাঙ্গালী ও বাঙ্গালী মুসলমানদের প্রকৃতিগত অনৈক্য ইতিমধ্যেই পৃথক বাংলাদেশ রাষ্ট্রের জন্ম দিয়েছে। ধর্মের ভিত্তিতে দেশবিভাগ সিদ্ধান্তের ভ্রম প্রমাণিত হয়েছে।

এবার লর্ড ওয়াভেলের তৃতীয় আশংকার কথায় আসা যাক। পাকিস্থানের নিরাপত্তা যে কিছুটা বিঘ্নিত, সে সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ নেই। ভারত বিরোধিতা নীতি গ্রহণ করে পাকিস্তান চীনের সাহায্য লাভের উদ্দেশ্য ভারতের জম্মু ও কাশ্মীর প্রদেশের কিছু বে-আইনী ভাবে দখল করা অংশ চীনকে উপহার দিয়েছে। চীন সিনকিয়াং ও তিব্বতের সহিত সংযোগ সাধনকারী গুরুত্বপূর্ণ কারাকোরাম সড়ক তৈরী করে পাকিস্থানে প্রবেশ ও করাচী বন্দর পথে ভারত মহাসাগরে যাবার সুযোগ করে নিয়েছে। গিলগিট ও তার সন্নিহিত অঞ্চলে চীনা সেনাদল মোতায়েন আছে। চীন ও পাকিস্থানের মধ্যে এখন ভাই ভাই সম্পর্ক, কিন্তু রাজনীতিতে এ সম্পর্কের স্থায়িত্ব কত দূর তা কে না জানে? চীন বন্ধুত্বের অছিলায় পাকিস্থানে যে সামরিক সুবিধা আদায় করেছে, তা কি কখনো সে স্বেচ্ছায় ছেড়ে দেবে

চীনাদের করাচী বন্দর দিয়ে ভারত মহাসাগরে প্রবেশের পরিকল্পনা হয়ত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক কৌশল সমর্থিত এবং দক্ষিণ এশিয়ার মার্কিন আধিপত্য বিস্তারের সহিত যুক্ত। সোভিয়েত রাশিয়া চুপ করে মার্কিন-চীন চক্রান্তকে পাকতে দিতে পারে না। সে কারণে আফগানিস্তানের কমিউনিষ্ট সরকারের অনুরোধে সেখানে সৈন্য আমদানি অবস্থা আয়ত্তে আনার চেষ্টা করছে। করাচী বন্দরের উপর চীন-মার্কিন কর্তৃত্ব স্থাপিত হোক, রাশিয়া নিশ্চয়ই তা চায় না। আফগানিস্থান থেকে রুশ সেনা এই কারণেই সরিয়ে নেওয়া সম্ভব হচ্ছে না সীমান্তে শক্তিশালী রুশ বাহিনীর অবস্থিতি পাকিস্থানের দুশ্চিন্তার কারণ নিশ্চয়ই, কিন্তু তার জন্য পাকিস্থানের পররাষ্ট্র নীতিই দায়ী, যার ব্লুপ্রিন্ট ভারত বিদ্বেষ।

এ সম্পর্কে ভারতের কথা এসে পড়ে। ভারতের

সীমান্তের অদূরে বৃহৎ শক্তিগুলির সামরিক তৎপরতা নিঃসন্দেহে ভারতের উদ্বেগের কারণ। চীন ও ভারতের মধ্যে ঐতিহ্যময় সম্পর্ক বিদ্যমান। ভারত সেই সম্পর্ক দৃঢ় করার উদ্দেশ্য, ১৯৫৪ সালে তিব্বতের স্বাতন্ত্র্য রক্ষার প্রশ্নে গুরুত্ব না দিয়ে চীনের দাবি মেনে নিয়ে চীন তিব্বত অধিকার স্বীকার করে। তিব্বত ছিল ভারতে ও চীনের মধ্যে (buffer state) নিরপেক্ষ রাষ্ট্র। ১৯৫৪ সালের ভারত চীন চুক্তি সম্পাদনের ফলে চীনের সীমানা ভারতীয় পার্বত্যভূমি বরাবর এসে যায়। ব্রিটিশ আমলে তিব্বতে যে ভারতীয় কূটনৈতিক/বাণিজ্য প্রতিনিধি থাকতেন, তাকেও ফিরিয়ে আনা হয়। চীন তিব্বতের autonomy রক্ষার যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল তা নাকচ করে। তিব্বতের রাষ্ট্রপ্রধান দালাই লামা পঞ্চাশ হাজার বিপন্ন অনুগামীর সহিত তিব্বত ত্যাগ করে ভারতে রাজনৈতিক আশ্রয় গ্রহণ করেন।

ভারত ও তিব্বতের মধ্যবর্তী সীমানা ম্যাকম্যাহন লাইন অনুসারে সুনির্দিষ্ট। চীন আন্তর্জাতিক ম্যাক-ম্যাহন লাইন স্বীকার করে না। ১৯৬২ সালের চীন ভারত সীমান্ত যুদ্ধ যার পরিণতি, এই যুদ্ধের ফলে কয়েক হাজার বর্গমাইল ভারতভূমি চীনের অধিকারে চলে গেছে। কাশ্মীর প্রশ্নে চীনের সমর্থন লাভের আশায় ভারতকে এই খেসারত দিতে হয়েছে।

চীন অবশ্য কাশ্মীর প্রশ্নে ভারতকে একদা যে সমর্থন দিয়েছিল তা তুলে নিয়েছে। এমন কি ১৯৬৫ ও ১৯৭১ সালের পাক-ভারত যুদ্ধে চীন পাকিস্থানের অনুকূলে কাজ করেছে। বর্তমানে বেজিং ইসলামাবাদকে ক্ষেপণাস্ত্র, জঙ্গী বোমারু বিমান সমেত আধুনিক অস্ত্রশস্ত্র জোগান দিচ্ছে। বাংলা-দেশের ভারত বিরোধী তৎপরতার পিছনেও চীনের মদত আছে। এ সব তিক্ততা সত্ত্বেও ভারত চীনের সহিত শান্তি মৈত্রীর সম্পর্ক গড়তে আগ্রহী।

চীন বন্ধুবেশে পাকিস্থান এবং বিরোধীরূপে ভারতের ভূখণ্ড গ্রাস করেছে এবং সম্প্রসারণশীল মতলব হাসিলে সচেষ্ট আছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র গণতন্ত্র রক্ষার যে ট্রাষ্টিগিরির কথা বলে তাও প্রভুত্ব বাদ বিস্তারের ধূম্র যবনিকা ছাড়া আর কিছু নয়, নতুবা গণতন্ত্রের পতাকাবাহী যুক্তরাষ্ট্র কমিউনিষ্ট চীন ও স্বৈরতন্ত্রী উগ্র ধর্মীয় রাষ্ট্র পাকিস্থানের সহিত আঁতাত গড়বে কেন। দক্ষিণ এশিয়া ঘিরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সমর প্রস্তুতি, পাকিস্থানকে পুনরায় অত্যাধুনিক সমরাস্ত্রে সজ্জিত করা এবং চীন পাকি-স্থান যৌথ উদ্যোগ ও তিব্বতের শৈল শিখরে চীনের ক্ষেপনাস্ত্র ঘাঁটি স্থাপন উদ্দেশ্যহীন হতে পারে না।

১৯৭১ সালে পাকিস্থানের সশস্ত্র বাহিনী ছিল দশ ডিভিশন এবং তার সতের ডিভিশন ভারতের সীমান্ত বরা সমাবিষ্ট। পাকিস্থানের সমুদ্র উপ-কূল ভারতের এক দশমাংশ হলেও, পাকিস্থানের রণপোত বহর ভারতের সমান। সামরিক বিমান বহরও পাকিস্থান অনেক গুণ বাড়িয়েছে। তারপর মার্কিন অস্ত্রের বিপুলতা তো আছেই এবং এ সব অস্ত্রশস্ত্র ও বিমান পাকিস্থান পাচ্ছে যুক্তরাষ্ট্রের অনু-দান হিসাবে। পাকিস্থানের এই বিরাট সমরসজ্জা

(৬ পৃঃ পর)

হবে। স্যাণ্ডসের মৃত্যুর পর দিন কমন্স সভায় প্রধানমন্ত্রী ঘোষণা করেন অনশন থেকে যত মৃত্যুই ঘটুক স্যাণ্ডসের মত আই, আর, এর বন্দীদের রাজ-বন্দীর মর্য্যাদা দেওয়া হবে না। বৃটিশ প্রধানমন্ত্রীর এই সদর্প উক্তির পরিণতি কি হবে ইতিহাস বলবে। বীরের মৃত্যুবরণ কখনও বিফল হয় না। উত্তর আয়ারল্যাণ্ডের মুক্তি সংগ্রামীদের পাশে আমাদের দাঁড়াতে হবে। আন্তর্জাতিক মানবাধিকার কমিশন ক্ষমতা আদায়কারী আন্তর্জাতিক সংস্থা, জাগ্রত যুব সমাজ এবং বিবেকবান বিশ্ব জনতার নিকট শ্রীমতী থ্যাচারের দম্ভ চূর্ণ করার দাবীতে আমাদের সোচ্চার হতে হবে।

কি কেবল প্রতিরক্ষার তাগিদে না তার পিছনে অন্য কোন অভিপ্রায় আছে সে কথা বলা শক্ত।

ভারত অবশ্য নিশ্চেষ্ট নেই, সম্ভাব্য আক্রমণ প্রতিরোধের জন্য সকল ব্যবস্থা অবলম্বনে সক্রিয় আছে। তবু যুদ্ধ মানে প্রাণহানি, সম্পদের অপচয় এবং উন্নয়ন কর্মে ব্যাঘাত সৃষ্টি। ভারত তাই মনে করে আজ শান্তিকে সুরক্ষিত করার চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্য আর কিছু নেই। ভারতের এই শান্তি প্রচেষ্টার অকৃত্রিম সহযোগী হল সোভিয়েত রাশিয়া। প্রকৃত প্রস্তাবে এশিয়া ও আফ্রিকার সদ্য স্বাধীনতা প্রাপ্ত বিকাশকামী দেশগুলির স্বার্থ রক্ষায় সোভিয়েত রাশিয়া সর্বদা সচেষ্ট। সেই কারণেই ভারত সোভিয়েত মৈত্রী কালের পরীক্ষা উত্তীর্ণ, দৃঢ়মূল এবং ঐতিহ্যময়।

তারুণ্য ভাবনা :

বিপ্লবী নায়ক হেমেন্দ্রকিশোর স্মরণে

দীর্ঘ প্রায় দুশ বৎসরের পরাধীনতার অবসানে ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দে ১৫ই আগস্ট ভারত স্বাধীন হয়। তবে এই স্বাধীনতা শত শত তাজা প্রাণের আত্মবলির বিনিময়েই সম্ভব হয়েছিল। কিন্তু এদের মধ্যে কজনকেই বা আমরা মনে রেখেছি অথচ ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে যাঁদের ভূমিকা কোন অংশেই কম ছিল না? বিপ্লবী নায়ক হেমেন্দ্রকিশোর আচার্য চৌধুরী এঁদের মধ্যে অন্যতম। তিনি ছিলেন ময়মনসিংহের (অধুনা বাংলাদেশের) জমিদার বংশের সন্তান। শ্রীঅরবিন্দের সাক্ষাৎ মন্ত্রশিষ্যরূপে তাঁর বিপ্লবী জগতে প্রথম আত্মপ্রকাশ ঘটে। একজন সুদক্ষ সংগঠকরূপে তিনি ময়মনসিংহ, ত্রিপুরা, চট্টগ্রাম ও বাংলাদেশের বিস্তৃত অঞ্চলে বিপ্লব আন্দোলন গড়ে তোলেন। তাঁর প্রতিষ্ঠিত 'সাধনা সমাজ' পরবর্তীকালে বিপ্লবী অনুশীলনের সহিত যুক্ত হয়ে যায়। তৎকালীন ভারতের প্রত্যেক বড়ো বড়ো নেতার সঙ্গেই তাঁর নিয়মিত যোগাযোগ ছিল। প্রতিটি আন্দোলন তাঁর সক্রিয় সহযোগিতা ও সুষ্ঠু পরিকল্পনা অনুসারে সম্পন্ন হত ময়মনসিংহে তাঁর 'দেব-নিবাস' পলাতক বিপ্লবীদের প্রধান আশ্রয়স্থল ছিল।

বংশপরম্পরায় তিনি যে সম্পদের অধিকারী হয়েছিলেন তা প্রধানতঃ দেশসেবার কাজেই ব্যয়িত হয়। বিশ্বাসঘাতক নরেন গোঁসাইকে জেলের মধ্যে হত্যার জন্য যে দুটি আগ্নেয়াস্ত্র প্রেরিত হয়েছিল, তার একটি পাঠিয়েছিলেন হেমেন্দ্রকিশোর। যতীন্দ্রনাথ মুখার্জী (বাঘা যতীন) কৃত সশস্ত্র বিপ্লব পরিকল্পনায় তাঁর দান ছিল অপরিসীম।

বাঘাযতীন নিজে সাধনা সমাজের সহিত যুক্ত ছিলেন এবং বহুবার দেব-নিবাসে আশ্রয় নেন। ব্রিটিশ শাসকবর্গ তাঁকে দীর্ঘদিন জেলে অন্তরীণ রেখে 'স্লো পয়জন' করে। এর ফলে তাঁর স্বাস্থ্য ভেঙে পড়ে এবং অকালমৃত্যু বরণ করতে হয়। শেষশয্যায় তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে স্বয়ং নেতাজী সুভাষ উপস্থিত হয়ে আশ্বাস দেন 'আপনার স্বপ্নের স্বাধীনতা আর বেশী দূরে নেই।' কিন্তু তিনি না থাকিলেও তাঁর আদর্শ তাঁর শিষ্যদের যেমন সুরেন্দ্রমোহন ঘোষ (মধু) নৃপতি মজুমদার, ডাঃ যাদুগোপাল মুখার্জীর মধ্যে পরবর্তীকালে প্রতিফলিত হয়। এই মহান বিপ্লবীর পুত্র ভ্রাতা ও স্ত্রী সকলেই ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের সঙ্গে ওতঃ প্রোতভাবে যুক্ত ছিলেন। স্বাধীন ভারতে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে পার্লামেন্টের সেন্ট্রাল হলে তাঁর চিত্র রাখা হয়েছে ও তাঁর স্বাধীনতা সংগ্রামী পুত্র ও ভ্রাতাকে তাম্রপত্র ও পেনশন দেওয়া হচ্ছে। তিনি আজ এ জগতে না থাকলেও তাঁর কীর্তির স্বাক্ষর আজও আমাদের মধ্যে বিদ্যমান। এই মহান বিপ্লবী নায়কের মহৎ কীর্তিকে চির জাগ্রত রাখতে তাঁর জন্মশতবার্ষিকী উদযাপনের মাধ্যমে তাঁর যথাযোগ্য মর্যাদা দান সম্ভব।

রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্র নাথের স্মৃতি কথা

["A Nation In Making" গ্রন্থ থেকে অনুদিত]

অনুবাদক—অধ্যাপক নলিনীমোহন দাশগুপ্ত

মন্ত্রীরূপে আমার কাজকর্ম [পূর্বানুবর্তন]

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

এখানে একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় হচ্ছে এই যে রায় হারাধন দত্ত বাহাদুর লেজিস্লেটিভ কাউন্সিলের সদস্য হিসাবে প্রায়ই সরকারের বিরোধিতা করতেন। এই বিরোধিতা সুরেন্দ্রনাথ মল্লিকের ক্ষেত্রে ছিল আরও প্রবল। কিন্তু সরকারের বিরোধিতা যদি সততার সহিত করা হয়ে থাকে, তাহলে সে বিরোধিতাকে সরকারী উচ্চপদে নিয়োগের ক্ষেত্রে কোন বাধা বলে আমি মেনে নেইনি, যদি, যাকে নিয়োগ করা হবে তিনি অন্যভাবে চরিত্র ও যোগ্যতার দিক থেকে গুণী ব্যক্তি হন। এই ধরনের নিয়োগের দ্বারা দক্ষ ও গুণী ব্যক্তিদের নিকট থেকে কাজ আদায় করার আগ্রহ যে সরকারের আছে, তার প্রমাণ আছে।

যারা সরকারের কেবল সমালোচনাই করেন, যারা শাসন সংস্কারের মধ্যে কিছুই ভাল দেখেন না, তাদেরও মনোভাবের উপর এইরূপ নিয়োগের ব্যবস্থা একটা সুস্থ ও নৈতিক প্রভাব বিস্তার না করে পারে না।

আমার নিয়ন্ত্রণাধীন দপ্তরকে ভারতীয় করণের যে নীতি আমি গ্রহণ করেছিলাম, তার মধ্যে গোপন কিছু ছিল না। তবে কায়েমী স্বার্থের প্রতিও আমি সম্পূর্ণ লক্ষ্য রেখেছি, আর সরকারী কার্য্য পরিচালনার কোন ব্যাঘাত সৃষ্টি না হয় সে দিকেও লক্ষ্য রেখেছি। সরকারের সঙ্গে একমত হয়েই আমি কর্পোরেশনের ক্ষেত্রে আমি আমার এই নীতির প্রয়োগ করেছি। স্বাস্থ্য দপ্তরেও এই একই নীতি প্রসারিত করা হয়েছিল। তবে সেখানে এই নীতির প্রয়োগ সম্পূর্ণ বাধামুক্ত ভাবে হয়নি। আমি যখন স্বাস্থ্য দপ্তরের ভার গ্রহণ করি তখন আগে থেকেই চলে আসা একটি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা উপস্থিত ছিল। বাংলার স্বাস্থ্য বিভাগীয় সংস্থাপনায় ভারতীয় মেডিক্যাল সার্ভিসের ক্যাডারের সংখ্যা কী হবে সে সম্পর্কে ভারত সচিব (মিঃ মণ্টেগু। সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীর অভিমত জানতে চান। আমি তার করে জানালাম যে বাংলার যারা নিযুক্ত আছেন তাদের সংখ্যা অথবা সংরক্ষিত পদের সংখ্যা আর বাড়াবার প্রয়োজন নেই এবং সমস্ত বিষয়টি পরীক্ষা করে দেখে পরে আমি আমার বিস্তারিত অভিমত জানাচ্ছি। আমি সার্জেন জেনারেল স্বর্গত রবিনসন্ ও আরও দু-একজন বন্ধুর সঙ্গে আলোচনা করে একটা পরিকল্পনা রচনা করে তা বিবেচনার জন্য মতামত প্রকাশের জন্য আমার ষ্টাণ্ডিং কমিটির কাছে উপস্থাপিত করলাম।

ষ্ট্যাণ্ডিং কমিটি হচ্ছে একটি উপদেষ্টা কমিটি। প্রচলিত প্রথা অনুসারে সরকারের সদস্যগণ তাদের স্ব স্ব বিভাগীয় কাজের পরিধির মধ্যে যে সমস্ত বিষয় অন্তর্ভুক্ত সেই সমস্ত বিষয় সম্পর্কে এই কমিটির সঙ্গে আলোচনা করা হয়ে থাকে। এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলের কোন সদস্য বা কোন মন্ত্রীর এমন কোন বাধা বাধকতা নেই যে ষ্টাণ্ডিং কমিটির পরামর্শ তাদের মানতেই হবে। কিন্তু যেহেতু ষ্টাণ্ডিং কমিটি গঠন তান্ত্রিক বিধান অনুযায়ী মর্যাদা প্রাপ্ত একটি উপদেষ্টা পরং সেইহেতু এই কমিটির পরামর্শকে

মর্য্যাদার সঙ্গেই গ্রহণ করতে হয়। মন্ত্রী বা মেম্বারের দায়িত্ব এখানে নৈতিক, আইনগত নয়। শাসন সংস্কার পরিকল্পনা অনুযায়ী ষ্ট্যাণ্ডিং কমিটিগুলি বেশ কিছু প্রয়োজনীয় কাজ করে থাকে। মন্ত্রীদের প্রশাসনিক কাজের ব্যবস্থাকে উদার করতে সাহায্য করে এবং সেই কাজের মধ্যে জনমতের রং ও তার সঞ্চারিত করে। ষ্ট্যাণ্ডিং কমিটি আমার রচিত পরিকল্পনাটি রচনার সম্পূর্ণ দায়িত্ব আমার নিজের একার তারা পরিকল্পনাটি গ্রহণ করলেন। ভারতীয় দৃষ্টিকোণ থেকে পরিকল্পনাটি সতর্কতার সহিত রচিত হলেও এটি সুস্পষ্ট রূপে অগ্রগতি সূচক। ভারতসচিব সামান্য নিয়ন্ত্রাধীনে রেখে পরিকল্পনাটি অনুমোদন করেন।

আমার নোট পাঠাবার প্রায় দুবছর পরে সেই অনুমোদন আসে। কিন্তু এতে কোনরূপ অভিযোগ সম্মত বলে মনে হয়না। কারণ পরিকল্পনাটি বেশ গুরুত্বপূর্ণ ও বিশেষ মনোযোগ দেওয়ার মত জটিল বিষয়ের সঙ্গে জড়িত ছিল। তা ছাড়া এর বিরুদ্ধে আপত্তি যা উঠেছে সে কথা বাদ দিলেও বলা যায় যে নানা দপ্তর ঘুরে একে আসতে হয়েছে। আমার সুপারিসের সব কথা ছিল, চাকরীতে নিয়োগের জন্য ইণ্ডিয়ান মেডিকেল সার্ভিসের জন্য যে চল্লিশটি সংরক্ষিত ছিল তা কমিয়ে চব্বিশটি করা। সংরক্ষিত তালিকা থেকে মেডিক্যাল কলেজে কয়েকটি নিয়োগের যে ব্যবস্থা ছিল, তা প্রত্যাহার করে নেওয়ার বিষয়ও তার মধ্যে ধরা হয়েছিল। আমার প্রস্তাবে মেডিক্যাল ডিপার্টমেণ্টের প্রধান কর্মকর্তা তার আপত্তি জানিয়েছিলেন। আমিও তার জবাব দিলাম সেই জবাবে আমি আমার নীতির বিস্তারিত ব্যাখ্যা করে বললাম :

"সার্জেন জেনারেলের মত আমিও কলকাতা মেডিক্যাল কলেজকে একটি আদর্শ প্রতিষ্ঠান রূপে গড়ে তুলতে সমান আগ্রহী। কিন্তু আমি ভেবে দেখেছি যে সময়ের মেজাজের সঙ্গে তাল রেখে পূর্ণ গতি পথের পরিবর্তন করে চলতে পারলেই এই প্রতিষ্ঠান তার উচ্চ মর্য্যাদার আসনে থাকতে পারবে। জনমতের দাবী হল এইযে মেডিক্যাল কলেজের অধ্যাপক মণ্ডলীতে বেসরকারী স্বাধীন চিকিৎসকদের নিযুক্ত হওয়ার পথ অন্তত : আংশিক ভাবে উন্মুক্ত করা হোক। সমাজে এদের প্রভাব ও মর্য্যাদা দিন দিন বেড়ে যাচ্ছে এবং এরা প্রায় কলকাতায় চিকিৎসা ক্ষেত্রে একাধিপত্য বিস্তার করে চলেছেন। এই ভাবে সরকারী ও বেসরকারী, সরকারের প্রতিনিধি ও জনগণের প্রতিনিধিগণকে মিলে মিশে একত্রে কাজ করে কলকাতা মেডিক্যাল কলেজের প্রাচীন খ্যাতিকে ধরে রাখতে হবে এবং সারা ভারতে একে সর্বশ্রেষ্ঠ চিকিৎসা কেন্দ্র রূপে গড়ে তুলতে হবে।"

ইণ্ডিয়ান মেডিক্যাল সার্ভিসের প্রভূত দান আছে, সরকার ও জনগণ সেজন্য সেজন্য তার কাছে ঋণী। কিন্তু সে ঋণ স্বীকার করে নিয়েও আমি এইরকম একটা বিরোধিতা করেছি যে 'সার্ভিসের সর্তাবলীই তার প্রশাসনিক কাজে সাফল্যের সব চেয়ে বড় নিশ্চয়তা জ্ঞাপক।' আমি এইভাবে আমার মন্তব্য উপস্থাপিত করলাম :

"যদি আমার উক্তিতে কোন দোষ ধরা না হয়, তাহলে আমি বলব যে উহা অপরপক্ষে সঙ্কীর্ণতা এমনকি দল পাকানোর দুষ্টচক্র সৃষ্টি করে—যা প্রশস্ত দৃষ্টিভঙ্গী ও উদার সহানুভূতিশীলতার মারাত্মক পরিপন্থী হয়ে দাঁড়ায়। অথচ এই সমস্ত হল সকল প্রশাসনকে কাজের প্রধান উপাদান।"

(ক্রমশঃ)

RegdNo.R. N. 24511 71 | Biplabi Bangla | Regd. WB/NC 77
Phone : 34-1795
বার্ষিক :—সডাক ১৫.০০ টাকা | ষান্মাষিক :—৮.০০ টাকা | মূল্য—৩০ পয়সা

পাক সেনাপতি ইয়াহিয়া খানের জল্লাদবাহিনী যে গ্রন্থ পুড়িয়ে ছাই করে দিয়েছিল বিপ্লব তাপস মহারাজ ত্রৈলোক্যনাথের সেই অবিস্মরণীয় গ্রন্থ "জেলে ত্রিশ বছর ও পাক ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম" পুনর্মুদ্রিত হল।

দাম—ত্রিশ টাকা

: প্রাপ্তিস্থান :
খাদি প্রতিষ্ঠান
১৫, কলেজ স্কোয়ার,
কলিকাতা-১২

সম্পাদক—
শ্রীশান্তিশরণ রায়চৌধুরী
॥ সম্পাদকমণ্ডলী ॥
শ্রীজগদীশ চট্টোপাধ্যায় (সভাপতি)
শ্রীভবেশচন্দ্র নন্দী
পুষ্প চ্যাটার্জী
মলয় ঘোষ
প্রকাশক ও মুদ্রক—
শ্রীঅনিল সেনগুপ্ত
দিল্লীর বিশেষ প্রতিনিধি—
শ্রীবারীন ঘোষ
বেহালা—
শ্রীনন্দগোপাল পাল

C/30

বিপ্লবী পুস্তকমালা

নেতাজীর সিক্রেটসার্ভিস - ডাঃ পবিত্রমোহন রায়—১০.০০

বিপ্লবী মহানায়ক রাসবিহারী—সুবোধ মজুমদার

অনুশীলন সমিতির বিপ্লবী প্রয়াস—ব্রজেন্দ্র দাস

—ক্ষীরোদ কুমার দত্তের—

১। বাংলার অগ্নিযুগ—১.৫০, ২। অগ্নিভারতে ভারতীয় বিপ্লব প্রচেষ্টা—৮.০০
৩। অনুশীলন সমিতির সি, মিত্তির—২.০০, ৪। সৈনিক সংগ্রাম কাহিনী—১.০০, ৫। কাকোরী শহীদবৃন্দ—১.২৫, ৬। কলকাতা বাজার সংগ্রাম কাহিনী—.৫০, ৭। রাসবিহারী ও অনুশীলন সমিতি—.৬০
৮। স্বাধীনতাসংগ্রামে মা ও মেয়ে—.৫০, ৯। বিবেকানন্দ ও সমাজবাদ—.৬০
১০। বিপ্লবী বিবেকানন্দ—.৫০, ১১। মহাত্মা ও সুভাষচন্দ্র—.৫০
১২। ভারতের মহাসমরণ ও ভগিনী নিবেদিতা—.৭৫, ১৩। দেশ বাঁধের তোলেনি (১)—১.০০, ১৪। দেশ বাঁধের তোলেনি (২)—২.০০
১৫। শহীদ চন্দ্রশেখর আজাদ—.৫০, ১৬। ১৩ই এপ্রিল জাতীয় শহীদ দিবস—১.০০, ১৭। হাজির হত্যা প্রচেষ্টা—.৭৫, ১৮। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও অনুশীল সমিতি—৫.০০, ১৯। ভারতের জাতীয় পতাকার ইতিহাস—.৫০, ২০। লাট হত্যা প্রচেষ্টা—১.৫০

প্রাপ্তিস্থান :— ৪নং বল্লভ দাস ষ্ট্রীট কলিকাতা-৭০০০০৭

টৈশলশ্রী—১/১/১/A ঘতীন চ্যাটার্জী ষ্ট্রীট কলিকাতা-২৫.

মূল কার্যালয়—৪নং বল্লভ দাস ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০০৭ শ্রীঅনিল সেনগুপ্ত কর্তৃক প্রকাশিত এবং তৎকর্তৃক প্রিন্টিং করপোরেশন, ১১৭, কেশবচন্দ্র সেন ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০০৯ হইতে মুদ্রিত।

বিপ্লবী বাংলা

॥ বিপ্লবী পরিষদের সাপ্তাহিক মুখপত্র ॥
স্থাপিত—১৯৫৬, 'বিপ্লবী বাঙ্গালী' নবকলেবরে—১৯৭১

দশম বর্ষ	শনিবার ৩০শে জ্যৈষ্ঠ ১৩৮৮ ১৩ই জুন ১৯৮১	৩৩ সংখ্যা

CALCUTTA

... ত্যাগের প্রয়োজন। এই ত্যাগ নিজেকে রিক্ত করার জন্য নয়, নিজেকে পূর্ণ করার জন্য। ত্যাগ মানে আংশিককে ত্যাগ সমগ্রের জন্য, ক্ষণিককে ত্যাগ নিত্যের জন্য, অহংকারকে ত্যাগ প্রেমের জন্য, সুখ্যক ত্যাগ আনন্দের জন্য। এই জন্যই উপনিষদে বলা হয়েছে। ত্যাক্তেন ভুঞ্জীথাঃ। ত্যাগের দ্বারা ভোগ করবে, আসক্তির দ্বারা নয়।

—তপোবন, রবীন্দ্রনাথ

Freedom fighters whose pension has been sanctioned

MARCH—1981

Name	Address	Amount Rs.	with effect from
	CALCUTTA		
Basu Smt. Suniti Rani. w/o Sachindra Nath Bose	(alias Chhotka)	250	1 8 80
Chakraborty Adhir	102/C Ballygunge Place Calcutta—19	300	1 8 80
Chowdhury Dinaranjan	18 Pratabgarh, Calcutta—75	300	1 8 80
Das Amulya Bhusan	23, Santi Ghosh Street, Calcutta—3	300	
Das Dhirendra Nath	New Alipore Govt. H. E Block G/Flat 8, Cal—38.	300	1 8 80
Das Kartick ch.	1/133 Sree colony, Calcutta—47	300	1 8 80
Kumari Sikha Das Unmarried daughter of Ashrukuna	20-B Biswas Nusery Lane, Cal—10	250	21 10 80
Ghosh Kshitindra Nath	6/5, Bejoy Mukherjee Lane, Cal-25	200	15 8 72
		300	1 8 80
Majumder Smt. Putul Rani wd 1. Ramesh Ch. Majumder	299/B/1, Fatepur 2nd lane, Cal-24	200	31 7 80
		300	1 8 80
Mitra Smt. Biva Rani	w 1 Dwijendra Kr. Mitra 6/1 Bank Plot, Babu bagan, Calcutta-31	250	19 11 80
Routh Pijush Kiron	(alias Sukhendu) 2, Shamsul Huda Road, Calcutta—17	300	1 8 80
Roy Smt. Monika, Wd/1.	Naresh Ch. Roy 222, Subhanagar Bye Lane, Calcutta-65	200	17 9 80
Roy Sailendra Nath	21, Pratajaditya place Calcutta-26 overdrawals to be recovered 100 per month	300	1 8 80
Roy Subir Block No. 113/8,	(Umit No 4) old Nurses Qrs. (1st floor) Calcutta—43	300	1 8 80
	P O, Bandasbato	300	18 80

(এর পর ১৬-র পাতায়)

সম্পাদকীয়

বিগত পৌরনির্বাচন

সম্প্রতি সদ্য সমাপ্ত পুরনির্বাচনের ফলাফল লইয়া বিভিন্ন জনের বিভিন্ন মতামত অবশ্যই থাকতে পারে এবং আছে। বিপুল জয়জয়াকার বলিয়া যাহারা ঊর্দ্ধবাহু হইয়া নৃত্য করিতেছেন, তাহাদের সঙ্গে সহমত হইবেন না কোন বুদ্ধিমান কাণ্ডজ্ঞান সম্পন্ন মানুষ।

উপরে উপরে দেখিতে গেলে বলা যায়, যে বামফ্রন্ট বিরোধী দলীয় প্রার্থীরা মাত্র শতকরা সাইত্রিশ ভাগ আসন পাইয়াছেন। বাকি আসন তেষট্টি ভাগ আসন পড়িয়াছে সি, পি, আই (এম) ও তার সহযোগী দলগুলির পক্ষে। কিন্তু প্রকৃত হিসাবটা এর মধ্যে পাওয়া যাইবে না। কারণ, কংগ্রেস (ই) দলের চরম নির্বুদ্ধিতার ফলে, তাহারা কতটা লাভবান হইয়াছে, তাহার হিসাব নিকাশ কে করিবে? নির্বাচন বয়কট করিয়া, কংগ্রেস (ই) র অপদার্থ নেতৃত্ব ত তাহাদের প্রায় তিনশত আসন লাভ করাইয়া দিয়াছেন, বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায়। শেষ ফলাফল থেকে, এই পরিমাণ আসন বাদ দিলে, যে অবস্থাটা দাঁড়ায়, তাহাকে বিপুল জয় বলিয়া যদি আস্ফালন কেউ করে, তবে চরম মূর্খতা বলিয়াই চিহ্নিত হইবে।

একটু বিশদ আলোচনা করিলে, অবস্থাটা আরো একটু পরিস্ফুট হইবে। বিভিন্ন দিক হইতে বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায়, এই পুর নির্বাচনে সি, পি, এম সহ বামফ্রন্ট দলগুলির জনপ্রিয়তা যথেষ্ট হ্রাস পাইয়াছে। পরাজয়ই চোখের সামনে ভাসিয়া উঠিতেছে। প্রথম স্বাক্ষর, পশ্চিমবঙ্গের কতকগুলি নাম-জাদা ও পরিচিত শহরে ইহারা ভোটযুদ্ধে পরাজিত হইয়াছে। বহরমপুর, দমদম, বজবজ, কৃষ্ণনগর, মেদিনীপুর, আরামবাগ, কাঁথি, কান্দি, রামপুরহাট, জয়নগর, মজিলপুর প্রভৃতি শহরে শোচনীয় পরাজয়ের পরও কি করিয়া সি, পি, এম নেতারা কোন মুখে বলিতেছেন যে তাহাদের বিপুল জয় হইয়াছে? দ্বিতীয়তঃ বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয় করা আসনগুলির কথা বাদ দিলেও, লড়াই করিয়া ইহারা কতগুলি আসন দখল করিয়াছেন? কুচবিহারে সি, পি, এমের রেকর্ডও রীতিমত ম্লান। নয়টি আসনের মধ্যে বিনা লড়াইয়ে পাইয়াছেন ছয়টি, যে তিনটিতে প্রতিদ্বন্দ্বিতার সম্মুখীন হইতে হইয়াছে, সেই তিনটি আসনেই তাহারা পরাজিত। ইহার পরও যাহারা বিপুল জয়লাভের দম্ভ করেন, তাহাদের মস্তিষ্কে ধূসর পদার্থের শোচনীয় অভাব যদি কেউ বলে, তবে কি খুব ভুল বলা হইবে? সর্বোপরি এটাই সত্য যে যে দল বিকল্প নেতৃত্বদিবার

সামর্থ রাখে, তাহারা ত নির্বাচন যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন নাই। ফাঁকা মাঠে গোল দিয়া গৌরবদাবী করিতে পারে, বিচারমূর্খের দলই। অবশ্য যদি উহারা দাবী করে যে নির্বাচন বয়কটকারী দলের চেয়ে, তাহারা অধিকতর নির্বোধ নন, তবে সেটা অবশ্যই বিচার্য বিষয় হইতে পারে।

বিজয়গর্বে গর্বিত সি, পি, আই (এম) ও তার সহযোগীদলগুলির যদিও বহুক্ষেত্রে তারা অসহযোগী ছিলেন। একথা স্মরণে রাখা দরকার যে অন্ত যে সব দলের প্রার্থীদের সঙ্গে তারা লড়াই করিয়াছেন, তাদের সংগঠন মজবুত ছিল না, তাদের প্রভাবও ছিল সীমিত। দেশের মানুষ জানিয়া শুনিয়াও যে এই বিপুল পরিমাণে নির্দল প্রার্থীদের সমর্থন করিয়াছেন, সেটা প্রকৃত পক্ষে বামফ্রন্ট দলগুলির বিরুদ্ধে অনাস্থা জ্ঞাপনেরই সামিল। আর, এস, পি, ও ফরওয়ার্ড ব্লক এই জয়ে খুশী হইতে পারেন নাই বলিয়া সংবাদে প্রকাশ। অবশ্য এজন্য তারা বামফ্রন্ট সরকারের শত্রু বলিয়া পরিগণিত হইবেন কিনা জানিনা। তবে এই নির্বাচনের ফলাফল হইতে সব দলেরই শিক্ষণীয় কিছু আছে বলিয়া মনে হয়। বিশেষ করিয়া সেই দলের, যার নেতারা আহাম্মুকের মত নির্বাচনে অংশগ্রহণ না করার নীতি অনুসরণ করিয়াছেন। নির্বাচনে প্রতিটি প্রার্থী কত ভোট পাইয়াছেন, তাহার বিশদ তালিকা প্রকাশিত হইলে, নিশ্চয়ই বিজয়গর্বে গর্বিত দলগুলিও শিক্ষালাভ করিতে পারিবেন। সর্বোপরি তাহাদের মনে রাখিতে হইবে যে ভোটার তালিকায় তাহাদের দলের সব ভোটারের নাম ছিল, বহু প্রকৃত ভোটারের নাম কাটিয়া দেওয়া হইয়াছিল এবং নির্বাচন ও গণনার কাজ তাহাদের দলীয় এবং বশংবদ কর্মচারীদের তত্ত্বাবধানে সংগঠিত হইয়াছে।

কংগ্রেস (ই) দল পার্শ্বপ্রতীপের সামনে থাকিলে, নানা ভাবে লাভবান হইতে পারিত। বামফ্রন্ট সরকারের বিকল্প নেতৃত্ব দিতে যারা আগ্রহ প্রকাশ করিয়া থাকেন। দেশের মানুষের নিকটবর্তী হইবার এমন সুবর্ণ সুযোগ হারাইবার মূল্য দিতে হবে ভয়ঙ্কর ভাবে।

পরলোকে সর্বজন শ্রদ্ধেয় প্রবীণ বিপ্লবী

সতীভূষণ সেন

গত ৮ই জুন সোমবার চট্টগ্রামের বিপ্লবী নেতা শ্রদ্ধেয় সতীভূষণ সেন এস, এস, কে, হাসপাতালে ৮৫ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করেন। আমরা পরম শ্রদ্ধার সঙ্গে এই মহান বিপ্লবীর বিদেহী আত্মার শান্তি কামনা করি। তাঁর শোকে সন্তপ্ত আত্মীয় পরিজনদের সান্ত্বনা দেবার ভাষা আজ আমাদের স্তব্ধ—

এই মহান বিপ্লবী নেতার সংগ্রামী জীবনালোচনা আগামী সংখ্যায় প্রকাশিত হইবে।

কংগ্রেস কর্মীদের দাবী

— জনৈক কংগ্রেসকর্মী

আগের একটি নিবন্ধে : কংগ্রেস কর্মীদের মানসিক প্রতিক্রিয়া কত ব্যাপক ও গুরুতর তার একটা চিত্র আমরা তুলে ধরেছিলাম। নির্বাচন বয়কট করার ব্যাপারে বর্তমান কংগ্রেস (ই) নেতৃত্বের ব্যর্থতা এখন আরো পরিষ্কার হয়ে ফুটে উঠেছে।

নির্বাচনের ফলাফল সমীক্ষা করলে এটাই প্রমাণিত হবে যে বর্তমান বামফ্রন্টের উপর দেশের মানুষ কতটা বীতশ্রদ্ধ হয়ে উঠেছে। এদের শক্ত ঘাটি বলে পরিচিত, অনেক নামকরা জায়গায় এদের পরাজয় ঘটেছে। যে সংখ্যা গরিষ্ঠতার বামফ্রন্ট দল দাবী করে আকাশ বাতাস মুখরিত করছে তথাকথিত বিপুল জয়লাভ ঘটেছে বলে, প্রকৃত চিত্রটা তার থেকে আলাদা। দুইশত পয়ষট্টি আসন মুখ থুবড়ে পেয়েছে এরা, অবশ্য কংগ্রেস (ই) দলের দুরদৃষ্টিহীনতার জন্য। একথা অবশ্যই স্বীকার্য যে কংগ্রেস (ই) দলকেই মানুষ বর্তমান শাসকদলের বিকল্প দল বলে মনে করে। তা ভিন্ন, কংগ্রেস অনুরাগী। কংগ্রেসকে ভাল বেসে এসেছে, সারাজীবন ধরে এমন বহু লোক আছেন, যারা ভোটদানে বিরত থেকেছেন, অথবা বাধ্য হয়ে এমন দলের পক্ষে ভোট দিয়েছেন, যার প্রভাব নির্বাচনের উপর পড়েনি। সে ভোটগুলি প্রায় নষ্ট হয়েছে বলাই চলে। কংগ্রেস (ই) ভোটের আসরে অবতীর্ণ হলে, লড়াইটা নিশ্চয়ই প্রাণবন্ত হত এবং ভোটাদাতাদের সংখ্যাও বিশেষভাবে বেড়ে যেত। সেক্ষেত্রে অন্তপক্ষের আস্ফালনটাও অনেকাংশে ক্ষীণতর হত লক্ষ করার বিষয় এই যে নির্বাচনে ব্যক্তিগতভাবে কোন প্রার্থী কত ভোট পেয়েছেন, তার তালিকা প্রকাশ করা হয়নি। হলে দলীয় সমর্থনের চিত্রটা আরো ফুটে উঠত।

এটা একটা দিক। অন্য বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ দিকও আছে। গণতান্ত্রিক দেশে নির্বাচন বয়কট করে দীর্ঘদিন কোনদলই রাজনীতি করতে পারে না। বিশেষ করে কেন্দ্রে এবং অধিকাংশ রাজ্যে যে দল ক্ষমতাসীন আছে, তেমন দল ত কখনই তা পারে না। আমাদের বক্তব্যের সত্যতা এখনই প্রমাণিত হয়েছে। কংগ্রেস (ই) দল আসন্ন বিধানসভা ও লোকসভার নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হয়েছে। তবে পূর্ব নির্বাচন থেকে দূরে থাকার সিদ্ধান্ত যারা নিয়েছেন, তাদের কৈফিয়ৎ কি কৈফিয়ৎ দিতে তারা বাধ্য, সাধারণ কংগ্রেস কর্মীদের কাছে, দেশের জনসাধারণের কাছে। সন্তোষজনক কৈফিয়ৎ দিতে না না পারলে, আমরা জানি তারা তা পারবে না, তাদের কেন কংগ্রেস প্রতিষ্ঠান থেকে বের করে দেওয়া হবে না? এ সত্য সন্দেহাতীত ভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে কলকাতায় নিজ নিজ চেম্বারে বসে, বা খণ্ড খণ্ড গোষ্টি গঠন করে, তারা রাজনীতি করতে চায়। জন সাধারণের সঙ্গে কোন যোগাযোগ নেই, কোন সংগঠন না থাকার জন্য, কংগ্রেস কর্মী ও সমর্থকদের মনোভাবের সঙ্গে তাদের পরিচয় নেই। সে কাজ করতেও বিশেষ আগ্রহ দেখা যায় না। তাদের অস্তিত্ব আছে পরস্পর বিরুদ্ধ বিবৃতি দেওয়ার মাধ্যমে (খবরের কাগজে) এবং তাতেই তাদের কর্তব্য শেষ বলে অদ্ভুত আত্মতুষ্টিতে গদীয়ান থাকার চেষ্টা করছে, এরা। আজও তারা আত্মকলহে মত্ত, সংগঠন মজবুত করার কাজে নিস্পৃহ, দেশের মানুষের দুঃখ দুর্দশা সম্বন্ধে উদাসীন। এদের কোন ক্ষমা থাকতে পারে না। এই কর্মধারার আমূল পরিবর্তন করতে না পারলে, [illegible] নেই।

কিন্তু দেশের মানুষ কংগ্রেস দলকে সমর্থন করতে আগ্রহী। বামফ্রন্টের অত্যাচার নিপীড়ন থেকে কংগ্রেস (ই) তাদের রক্ষা করতে পারে, এই বিশ্বাসেই তারা কংগ্রেসকে চায়। দুহাত বাড়িয়ে আলিঙ্গন করার জন্য দাঁড়িয়ে আছে, অথচ অপদার্থ নেতারা সেখানে অনুপস্থিত। এই শোচনীয় অবস্থার আমূল পরিবর্তন সাধারণ কংগ্রেস কর্মী ও কংগ্রেস সমর্থকেরা দাবী করে। এবারকার পুরনির্বাচনের মধ্য দিয়ে এই চিত্রই ফুটে উঠেছে। সুযোগ উপস্থিত, অথচ তার সদ্ব্যবহার করতে বর্তমান নেতৃত্ব অসমর্থ, এমনকি অনিচ্ছুক গোষ্ঠিগতস্বার্থের তাগিদে। কিন্তু মুষ্টিমেয় কয়জন লোক আর কতদিন জনস্বার্থকে পদদলিত করে চলবে? কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব কি এতই অসহায় যে পশ্চিমবাংলার কংগ্রেস প্রতিষ্ঠান থেকে আগাছা নির্মূল করতে পারেন না?

এরাজ্যের মানুষেরা ও কংগ্রেস কর্মীরা ক্রমেই হতাশ হয়ে পড়ছেন অতি সঙ্গত কারণে। ফলশ্রুতি কত মারাত্মক হবে, তা বুঝবার মত সাধারণ বুদ্ধি সম্পন্ন মানুষ কি কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানে নেই? তবে কি ধরে নিতে হবে অমিত বলশালী স্বদেশপ্রেমিক নেতৃবৃন্দ ও স্বাধীনতা সংগ্রামীদের জন্মস্থান পশ্চিমবাংলা আজ বন্ধ্যা হয়ে পড়েছে একথা বিশ্বাস করতে মন চায় না।

দলনেত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর কাছে অসংখ্য কর্মীদের আবেদন আছে। কংগ্রেস প্রতিষ্ঠান আগের দিনের মত সব স্বাধীনতা সংগ্রামীদের ও বিভিন্ন দলের মিলন ক্ষেত্র নয়। বহুদল এর থেকে আলাদা হয়ে গেছে। কংগ্রেসের রূপ আজকের দিনে বদলেছে এবং কংগ্রেস প্রতিষ্ঠান একটা বিশেষ দলে পরিণত হয়েছে। লড়াই করতে হবে রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জনের জন্য নয়। লড়াই করতে হবে দেশ থেকে বেকারী, দারিদ্র ও জনগণের অন্যান্য অভিযোগ দূর করতে। সেজন্য সংগঠনকে মজবুত করতে হবে। এখানকার নেতৃত্ব সেকাজে শোচনীয়ভাবে ব্যর্থ হয়েছে। তারা গদী দখল করার কাজে ব্যস্ত, এবং সেটা যোগ্যতার পরিচয় দিয়ে নয়, সেটা পেতে চায় দলনেত্রীর প্রভাব প্রতিপত্তির জোরে। এদের সততা, শ্রমশীলতা, দেশপ্রেমের কোন মূল্যায়ন নেই। নিজ স্বার্থে-ই এরা গোষ্ঠিগত রাজনীতিকে সৃষ্টি, প্রশ্রয়, লালন পালন করছে। এদের সুস্পষ্টভাবে বলে দিতে হবে, মূল্য না দিলে, যোগ্যতার স্বাক্ষর না রাখলে কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানে কারো স্থান থাকবে না, নেতৃত্ব ত দূরের কথা। নতুন নেতৃত্ব গড়ে তুলতে হবে, অন্যথায় দলের সমূহ ক্ষতি অনিবার্য।

আমরা মনে করি, দেশকে যারা ভালবাসেন, কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানকে যারা এতদিন প্রেম দিয়ে, রক্ত দিয়ে, অশেষ নির্যাতন ভোগ করে লালন পালন করে শক্তিদান করেছেন, তাদের এই সন্ধিক্ষণে বিশেষ কর্তব্য আছে। উপরতলায় যদি চেতনাবোধের সঞ্চার না হয়, তবে গণতান্ত্রিক দেশের নাগরিক হিসাবে, গণতন্ত্রকে সফল রূপ নিতে হলে, প্রয়োজনমত বিদ্রোহ করতে হবে সব অন্যায়, অবিচার, ক্ষমতালিপ্সা, আদর্শহীনতার বিরুদ্ধে। তবে সেটা করতে হবে অন্যান্য কিছু দেশের মত বন্দুকের নল দিয়ে নয়, করতে হবে গণতান্ত্রিক পথে, সংবিধান সম্মত উপায়ে। এমন প্রবল জনমত সংগঠিত করতে হবে যার ফলে সব আবর্জনা, মলিনতা, ব্যর্থতা জনজীবন থেকে চিরদিনের মত লুপ্ত হবে। এই ডাকে সাড়া দিয়ে, সমস্ত নিষ্ঠাবান কংগ্রেস কর্মীদের, পশ্চিমবাংলা, তথা সারাভারতে, অগ্রপথিকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হবে। বিরাট বৈপ্লবিক ঐতিহ্যের উত্তরসূরী হিসাবে তাদের স্বাক্ষর রাখতে হবে। সাধু বাদের সঙ্কল্প, ভগবান তাদের সহায়. এই কবিকাব্য স্মরণে রেখে, সেই অগ্রপথিক দলকে আমরা স্বাগত জানাই।

সুষ্ঠু নির্ব্বাচন গণতন্ত্রের বুনিয়াদ

বংশীধর বন্দ্যোপাধ্যায়

অবাধ, নিরপেক্ষ ও সুষ্ঠু নির্ব্বাচন ব্যবস্থা সঠিক ভাবে পরিচালিত হবে, এটাই গণতন্ত্রের স্বীকৃত নীতি। নির্বাচন আধিকারিক উক্ত দায়িত্ব যথাযথ ভাবে পালনের জন্যই ভারতীয় সংবিধান সম্মত কতকগুলি বিশেষ ক্ষমতার অধিকারী। নিরপেক্ষতা অবলম্বনের জন্যই কেন্দ্রীয় বা কোন রাজ্য সরকারের ইচ্ছা বা হুকুম মত তাঁকে নির্বাচনের ব্যবস্থা বা নির্বাচনকার্য্য পরিচালনা করতে হয় না। তিনি নিরপেক্ষভাবে স্বয়ং যেমন উচিৎ বিবেচনা করেন সেই মতই নির্বাচনের দিন স্থির করেন ও তৎকর্তৃক স্থিরিকৃত দিনেই নির্বাচন পরিচালনা করেন। তবে যে রাজ্যে নির্বাচন অনুষ্ঠানের তিনি ব্যবস্থা করেন, সে রাজ্যে আইন ও শৃঙ্খলার বর্তমান অবস্থা নির্বাচন প্রহসনে পরিণত হতে পারে এই আশংকায় তিনি পূর্বেই এ বিষয়ে যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করেন। এ ব্যাপারে তাঁর দায়িত্ব সর্বাধিক, আর সেই জন্যই তাঁকে সমস্ত জিনিসটা উত্তমরূপে খতিয়ে দেখতে হয় আগে ভাগেই।

ভোটার তালিকা প্রতি বছরই সংশোধিত হয় নিয়মিত ভাবে, তবুও সেই সংশোধিত তালিকায় এত ভুল নাম থাকে, এত মৃত ব্যক্তির নাম থাকে ও এত ভিন্ন এলাকার ব্যক্তিবর্গের নাম থাকে যে সুষ্ঠু নির্ব্বাচনের পক্ষে অন্তরায় হয়। এ নিয়ে প্রায় বহু অভিযোগ নির্ব্বাচন আধিকারিকের নিকট বিভিন্ন দলের পক্ষ থেকে উত্থাপিত হয়। এর যথাযথ প্রতিকার সব সময়ে হয় না, ফলে নির্ব্বাচন বহুক্ষেত্রেই প্রহসনে পরিণত হতে বাধ্য হয়, বিভিন্ন রাজ্য সরকারের স্থায়ী বা ঐ কাজে নিযুক্ত অস্থায়ী কর্মচারিদের গাফিলাতিতে বা উদ্দেশ্য প্রণোদিত পক্ষপাত দোষে।

ভোটার তালিকা বিশুদ্ধ ও পক্ষপাতহীন হলেই তবে অবাধ নিরপেক্ষ নির্বাচন বাস্তবে সম্ভব হয়, অন্যথায় নির্বাচনের প্রকৃত উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয় বা গণতন্ত্রের মূলে কুঠারাঘাত করে ও এর ফলে সাধারণ মানুষ নির্ব্বাচনের উপর আস্থা হারাতে বাধ্য হয়। যে কোনও গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে যদি নির্ব্বাচনে কারচুপি বা শঠতা অবলম্বিত হয়, তবে সে রাষ্ট্রের জনগণ ঐরূপ অসৎ উপায়ে অনুষ্ঠিত নির্বাচনের উপর আস্থা হারায় স্বাভাবিক কারণেই।

ফলে সে রাষ্ট্রে গণতন্ত্র বিপন্ন হয় মারাত্মকভাবে এবং জনগণ তথায় হিংসাশ্রয়ী পথে অগ্রসর হতে প্ররোচিত হয় অনায়াসেই যা রাষ্ট্র ও জনগণ উভয়ের পক্ষেই প্রচণ্ড ক্ষতিকারক হয়। রাষ্ট্র ও জনগণের নিরাপত্তা, সততা ও শুভবুদ্ধি সংরক্ষণের জন্যই সর্বদেশে সর্বকালে নির্ব্বাচনকে অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে সদ্ভাবে পরিচালিত করা একান্ত দরকার, অন্যথায় সশস্ত্র বিপ্লবের পথে যাবার ঝোঁক জনমনে সংক্রামিত হওয়ার আশঙ্কা থাকে। যথা সময়ে নির্ব্বাচন অনুষ্ঠান একটা গুরুত্বপূর্ণ কাজ।

সে কাজ কোন ভাবেই গাফিলতি করা বা অযথা কালহরণ করাও সমীচীন ব্যবস্থা নয়। সংবিধানের বর্ণিত ব্যবস্থা মতই নির্বাচনের কাজকে সর্বদা ত্বরান্বিত করা নির্বাচন অধিকারিকের মুখ্য কাজ,

অবশ্য তাঁকে অন্যান্য আর সব দিকই সঠিকভাবে বিবেচনা করে তবে ঐ কাজে এগোতে হবে অত্যন্ত ধীর স্থির ভাবে যাতে নির্বাচন অবাধ, নিরপেক্ষ ও সুষ্ঠু হয় সব সময়েই।

কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারগুলির দায়িত্বও এ বিষয়ে নিহাত কম নয়। কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারগুলি বা বিশেষ কোন রাজ্য সরকার যদি কোন কারণে নির্বাচন আধিকারিক বা তাঁর নিম্নস্থ কোন অফিসারের সহিত যথাসম্ভব সহযোগীতা না করে বা নির্বাচনী প্রয়োজনে ঠিক যতটা সাহায্যের একান্ত প্রয়োজন ততটা সাহায্য না করে তবে নির্বাচন আধিকারিকের পক্ষে প্রকৃত প্রস্তাবে অবাধ, নিরপেক্ষ ও সুষ্ঠু নির্বাচন পরিচালনা করা বাস্তবে সম্ভব হয় না। ফলে দেশে গণতন্ত্র দারুণ বিপর্যয়ের মুখে পতিত হয় যা কলঙ্কজনক কেন্দ্রীয় বা রাজ্যসরকারের পক্ষেও। এর হাত থেকে দেশ ও জনগণকে মুক্ত রাখতে হলে কেন্দ্রীয় ও প্রতিটি রাজ্য সরকারকে সর্ব্ববিষয়ে ও সর্ব্ব সময়ে নির্বাচন আধিকারিকের সহিত সক্রীয় সহযোগিতা করতেই হবে, গণতন্ত্রের স্থায়িত্বকে রক্ষা করার পবিত্র কর্তব্যবোধে, অন্যথায় সমূহ ক্ষতির কারণ হবে উক্ত অসহযোগীতাই প্রধানত :

ভোটার তালিকা সম্পূর্ণ নির্ভুলভাবে প্রণয়ন করা যদিও বেশ কঠিন কাজ, তবুও তা নির্ভুল না হলে ভোটার তালিকা নির্বাচনের সময়ে এত বেশী অনভিপ্রেত অশান্তির সৃষ্টি করে যে পোলিং অফিসার ও প্রিসাইডিং অফিসাররা অকারণ জনরোষে আক্রান্ত হয়ে অযথা কষ্ট পান, যদিও তাঁদের এ ব্যাপারে করণীয় তখন কিছুই থাকে না। যৎসৃষ্টং তল্লিখিতং ছাড়া তাঁদের হাতে তখন কোন ক্ষমতাও থাকে না পোলিং বুথের মধ্যে বা বাইরে। ফলে ভরা ভোটার তালিকার তাঁরা নীরব দর্শক হতে বাধ্য হন।

ভোটার তালিকা সংশোধন ও পুনর্নবীকরণ করার সময়ে যে সব কর্মীরা রাজ্যসরকারের অধীনে কার্য্য করেন তারা সাধারণত: দলীয় প্রভাবাধীন হতে বাধ্য হয়, কারণ তাদের নিয়োগ কর্তারা যে রাজনৈতিক দলভুক্ত সেই দলের ক্যাডার ও গোঁড়া সমর্থকরাই ঐ কাজের ভারপ্রাপ্ত হয় সাময়িকভাবে নিয়োগের মাধ্যমে এবং পারিশ্রমিক পায় তারা ঐ নিয়োগ কর্তাদের কাছ থেকেই। যে রাজনৈতিক দল বা দলজোট যখন সরকারী ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকে তখন তারাই তাদের হাতের লোক দিয়ে ভোটার তালিকা তৈরী করায়। ফলে উক্ত ভোটার তালিকা কখনই পক্ষপাতহীন সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ হয় না, আর ঐরূপ ভোটার তালিকার ভিত্তিতে যে নির্বাচন হয় তা কখনই নিরপেক্ষ ও সুষ্ঠু ব্যবস্থায় অনুষ্ঠিত অবাধ নির্ব্বাচন বলে গণ্য হয় না।

সেকারণ বর্তমানে অনুসৃত গলদযুক্ত ও পক্ষপাত দুষ্ট ভোটার তালিকা যদি প্রকৃতই নিরপেক্ষ, পক্ষপাতহীন ও নির্ভুল ভাবে প্রণয়ণের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হয়, তবে নির্ব্বাচন আধিকারিকের দ্বারা নিযুক্ত একটা স্বতন্ত্র স্থায়ী সংস্থায় বিভিন্ন রাজ্যের যোগ্যতা সম্পন্ন কর্মীদের দ্বারা তা কার্যকর করা বিশেষ প্রয়োজন। সেক্ষেত্রে যে রাজ্যের ভোটার তালিকা তৈরী হবে সে রাজ্যের কোন কর্মীদের দিয়ে উক্ত কাজ না করিয়ে অন্য কোন ভিন্ন রাজ্যের কর্মীদের দিয়ে ভোটার তালিকা তৈরী করালে তা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নির্ভুল ও নিরপেক্ষ হবে বলে আশা করা যায়। সেই একই ভাবে ভিন্ন রাজ্যের সরকারী অফিসার ও কর্মীদের দিয়ে যদি নির্বাচনের দিনে পোলিং ও প্রিসাইডিংএর কাজ করান হয় তবে নিশ্চয় অবাধ-নিরপেক্ষ ও

সুষ্ঠু নির্বাচনের কাজে প্রকৃতই সহায়ক হবে। অনুরূপভাবে নির্বাচনের সময়ে প্রতিটি পোলিং বুথে পুলিসী ব্যবস্থা যদি সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ করতে হয়, তবে স্থানীয় পুলিশ কর্মচারী বা পুলিশ বাহিনীর উপর নির্ভর না করে বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্স কেন্দ্রীয় রিজার্ভ পুলিশ বা মিলিটারির উপর নির্ভর করলে নিশ্চয় তা নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানে সহায়তা করবে, কারণ শেষোক্ত ব্যবস্থায় নিয়োজিত কর্মীরা যে রাজ্যে নির্বাচন হবে সে রাজ্যের সঙ্গে কোনদিক দিয়েই স্বার্থ সংশ্লিষ্ট নয় বা ভবিষ্যতেও তাদের এ ব্যাপারে কোন সম্পর্ক থাকবে না কোনদিনই।

কাজেই নিরপেক্ষতা এক্ষেত্রে সুনিশ্চিত হবে বলে আশা করা যায়। ভোটপত্র গণনার সময়েও বহু কারচুপি পক্ষপাত সাধারণতঃ দেখা যায়। গণনাকে নির্ভুল ও পক্ষপাতহীন করতে হলে উপরোক্ত একই উপায়ে ভিন্নরাজ্যের সরকারী কর্মীদের বা নির্বাচন আধিকারিকের অধীনস্থ কর্মীদের দিয়ে গণনা করান ভাল।

ভোটপত্র গণনা সঠিক প্রায়ই হয় না, কারণ যে রাজ্যে বা যে জেলায় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় সে রাজ্যের বা জেলার সরকারী কর্মচারীরাই সাধারণতঃ ভোটপত্র গণনা করে থাকেন এবং যেরূপ দ্রুত তালে গণনাকার্য চলে তাতে ভুল ভ্রান্তির বা পক্ষপাতিত্বের সম্ভাবনাই সমাধিক। বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে একথা সহজেই বলা যায়। যাদের এই বিষয়ে অভিজ্ঞতা নেই তারা হয়তো বা ভিন্ন মত পোষণ করতে পারেন, কিন্তু নির্বাচনের পরে ভোটপত্র গণনা একটা মূল্যবান কাজ যার ওপর নির্বাচনের ফলাফল নির্ভর করেও তা বোঝিত হয় রিটার্নিং অফিসারের দ্বারা। কাজেই উক্ত গণনার কাজও ভিন্ন রাজ্যের অথবা খোদ্ নির্বাচন আধিকারিকের অধীন সংস্থায় নিযুক্ত সর্বসময়ের কর্মীবৃন্দকে দিয়ে করান সমীচীন। নিরপেক্ষতা রক্ষার উহাই একমাত্র পথ যা নির্বাচন আধিকারিকের সুনাম রক্ষায় ও সহায় হয় সর্বদা গণতন্ত্র রক্ষার প্রাথমিক কাজটিই হবে লোকসভার বা বিধানসভার নির্বাচনকে সর্বদিক নিরপেক্ষ রাখা। সেই নিরপেক্ষতা অবলম্বনের জন্য নির্বাচন আধিকারিকের সঙ্গে কেন্দ্রীয় বিভিন্ন রাজ্য সরকারগুলির যথেষ্ট সহযোগীতার প্রয়োজন জনস্বার্থে।

অন্যথায় নির্বাচনকে সংগঠনক্ষম ও সুষ্ঠু করা প্রায় একটা অসম্ভব রকমের দুরূহ কাজ হয়ে দাঁড়াবে। নির্বাচনের পবিত্রতা রক্ষায় ভারতের প্রতিটি রাজনৈতিক দলের সক্রীয়ভাবে সহযোগীতা ও সাহায্য একান্ত দরকার। কিন্তু পরিতাপের বিষয় এইযে কোন রাজনৈতিকদল মুখে নির্বাচনের পক্ষে ওকালতি করলেও কার্যকালে 'যেন তেন প্রকারেণ' নির্বাচনে জয়লাভের জন্য অসৎপথ অবলম্বনে বিরত হয় না। জালভোট দেবার প্রবণতা বা জালভোট দেবার জন্য একটা মারাত্মক প্রচেষ্টা প্রায়ই এদেশে দেখা যায়। জালভোট বন্ধ করার একমাত্র পথ হচ্ছে যে ভোটারের ফটো (Pohto) সরকারী খরচে তোলা ও তা ইলেকসন কমিশনের সীল ও স্বাক্ষর যুক্ত করে ভোটারকে প্রদান করা যাতে ভোটের দিনে পোলিং বুথে উক্ত ফটো সমেত ভোটার হাজির না হলে তাকে ভোটদানে বিরত করা।

এই কঠিন ও ব্যয়বহুল ব্যবস্থা একবার করলেও পরে নূতন ভোটারের (বয়ঃপ্রাপ্তির ফলে) অনুরূপভাবে ফটো তৈরী করে দিলে জাল ভোট দেওয়া একেবারেই বন্ধ হয়ে যাবে ভবিষ্যতে। ফটো দেবার ব্যাপারে সরকারকেই অগ্রণী হতে হবে, গণতন্ত্র সুরক্ষার অত্যাবশ্যকীয় কারণেই; অন্যথায় জালভোট বন্ধ

তো হবেই না, বরং তা উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হতেই থাকবে।

রাষ্ট্রের ও জনগণের কল্যাণের জন্যই জালভোট দেবার পথ চিরতরে বন্ধ করে দেওয়াই একান্ত প্রয়োজন। বর্ত্তমানে জালভোটের চাপে নির্ব্বাচনী ফলাফল অবিশ্বাস্য ধরণের হয় বা কোনমতেই আর অবহেলা করা চলে না। পবিত্র নির্ব্বাচন প্রহসনে পরিণত হয় উক্ত জালভোটের সীমাহীন দাপটে। সেকারণ নির্ব্বাচনকে অবাধ, নিরপেক্ষ ও সুষ্ঠু করার জন্যই উপরোক্ত ব্যবস্থা ও পন্থা গ্রহণ অবিলম্বে আবশ্যক, জাতীয় স্বার্থে ও গণতন্ত্রের স্থায়ীত্বকে সুদৃঢ় করণে, অন্যথায় অদূর ভবিষ্যতে গণতন্ত্রের সমাধি রচনায় ভারতীয় এক নায়কতন্ত্রী ও হটকারী রাজনৈতিক দলগুলি জোটবদ্ধ হয়ে এগিয়ে আসবে এবং সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমে এ দেশের রাষ্ট্র ক্ষমতা দখল করে নির্ব্বাচন চিরতরে বন্ধ করে দেবে।

●

আইরিশ স্বাধীনতা সংগ্রামী বন্দীদের রাজনৈতিক বন্দীর মর্য্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করার দাবীতে ও বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী মিসেস মার্গারেট থ্যাচারের উক্তির প্রতিবাদে

জ ন স ভা

আগামী ১৬ই জুন, ১৯৮১, মঙ্গলবার বিকাল ৬ ঘটিকায় প্রজ্ঞানন্দ হলে (মৌলালী) সকল স্বাধীনতা সংগ্রামী বন্ধুগণকে এবং ঐতিহ্যময় বাংলার বিপ্লবী জনগণকে সভায় উপস্থিত হওয়ার জন্য আবেদন জানাইতেছি।

সভাপতি—

অগ্নিযুগের বিপ্লবী নেতা শ্রীপূর্ণানন্দ দাশগুপ্ত

আহ্বায়ক—সর্ব্বশ্রী তারাপদ লাহিড়ী, গণেশচন্দ্র ঘোষ, অমর চক্রবর্তী (এম,পি), জগদীশ চ্যাটার্জী, ডঃ বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য্য, নলিনী গুহ, শিবনাথ ব্যানার্জি, অধ্যাপক সমর গুহ, অধ্যাপক নলিনী মোহন দাশগুপ্ত নয়নারঞ্জন দাশগুপ্ত, প্রফুল্লকুমার সেন, শচীন গুহ ঠাকুরতা, কানাই রুদ্র।

● অনুশীলন বিপ্লবী স্মৃতিসংরক্ষক সমিতি—
জ্ঞানরঞ্জন গুপ্ত, পবিত্র ঘোষদস্তিদার।

● রয়েল ইন্ডিয়ান নেভি আপরাইজিং কমিটি— সৌরেন নাগ।

● আই, এন, এ, এসোসিয়েশন (পশ্চিমবঙ্গ)—
সুশীল মাস্তগীর।

● ফ্রিডম ফাইটারস্, রিভলিউশনারী ওয়ার্কার্স, আই, এন, এ এণ্ড নেভাল মিউটিনি সেইলার্স কো-অর্ডিনেশন কমিটি
—ডাঃ স্নেহময় চৌধুরী, শ্যামাদাস চক্রবর্তী।

● বিপ্লবী স্বাধীনতা সংগ্রামী সমিতি—সুধাংশু রায়

● সারাভারত বিপ্লবী স্বাধীনতা সংগ্রামী পরিষদ—
পুষ্পরঞ্জন চ্যাটার্জী।

● সারা বাংলা জাতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামী সংঘ—
নলিনী সেনগুপ্ত।

● নিখিল ভারত স্বাধীনতা সংগ্রামী সংগঠন (পশ্চিমবঙ্গ)— ধীরেন ভৌমিক।

'বিপ্লবী বাংলা' সাপ্তাহিকের

সম্পাদকমণ্ডলীর মাননীয় সভাপতি মহাশয় সমীপেষু,

ববি স্যাণ্ডস্ ও হারা

তোমাদের প্রণাম করি

মাননীয়েষু,

আপনার পত্রিকার দশমবর্ষ ২৯ সংখ্যা (শনিবার ২রা জৈষ্ঠ ৮৮) প্রকাশিত কালিপদ সরকার মহাশয় লিখিত প্রবন্ধ আইরিশ বিপ্লবী ববি স্যানডসের আত্মাহুতির প্রতি অত্যন্ত ব্যথিত চিত্তে সবিনয়ে আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। এখানে বলে রাখা ভালো এই পত্রিকাটির আমি একজন নিয়মিত পাঠক এবং যেহেতু আমাদের স্বাধীনতার যুদ্ধে আমার ক্ষুদ্র সামর্থ অনুযায়ী নিজেকে একজন বলিষ্ঠ বিপ্লবী সৈনিক হিসাবে যুক্ত রাখবার সৌভাগ্য হয়েছিলসেই হেতু এই পত্রিকাটিতে প্রকাশিত মতামত সর্বক্ষেত্রে ঐক্যমত্য না হলেও মোটামুটি আমাদের সামুহিক চিন্তাধারার অভিব্যক্তি হিসাবেই গ্রহণ করে আসছিলাম। কিন্তু দুঃখের বিষয় উল্লেখিত প্রবন্ধের বিসয়ে নিস্পৃহ থাকা অথবা এর প্রতিবাদ না করা শুধু কর্তব্য অবহেলাই নয়, একজন বিপ্লব পন্থি সৈনিক হিসাবে অমার্যানীয় অপরাধ হিসাবে মনে হওয়াতেই আপনাকে এই পত্র লিখিতে বাধ্য হচ্ছি। আশাকরি আমার ভাষার দৈন্য আমার মানসিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করবেন।

প্রবন্ধের লেখক শ্রীসরকার প্রবন্ধের প্রথমাংশে আয়ারল্যাণ্ডের ইতিহাস সম্পর্কে তাঁর ইতিহাস পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিয়েছেন। এই অংশে তিনি সুকৌশলে যে ইঙ্গিত দিয়েছেন সে সম্পর্কে কোনও মতামত ব্যক্ত না করলেও তত ক্ষতি হয় না যত ক্ষতি হয় তার পরবর্তি অংশ সম্পর্কে চুপ থাকার ভাব অবলম্বন করলে। তিনি ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী মিসেস্ থ্যাচারের অমানবীয় অনমনীয় মনোভাব যুক্তি সম্মত মনে করেছেন, ব্রিটিশের ভূতপূর্ব প্রধানমন্ত্রীদের আমলে আমরা যখন ঐ আইরিশ বীরেরই মত স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য মানবিক অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য অথবা রাজনৈতিক অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য জেলের মধ্যে বার বার অনশন করেছি, আমাদের শহীদ যতীন দাস তিলে তিলে আত্মাহুতি দিয়েছেন তখনও তো সাম্রাজ্যবাদী মন্ত্রীগণ বা আমলাতন্ত্র আমাদের সম্পর্কে ঐ একই ভাষায় একই যুক্তির অবতারণা করেছে। আজ যদি আমরা ঐ যুক্তির মধ্যে ন্যায় বিচারের সুগন্ধ পাই তাহলে কি নিজেদের অতীত বিশ্বাস, ক্রিয়া-কলাপ তথা যাঁরা শহীদ হয়ে আমাদের অন্তর রাজ্যে শ্রদ্ধার স্বর্ণ-সিংহাসনে আজও বসে আছেন, এর সবটা নিয়েই এই জীবন সায়াহ্নে নূতন মূল্যায়ণের অঙ্ক কষতে বসবো ? মাননীয় সম্পাদক মহাশয়, ক্ষমা করুণ, আমার প্রার্থনা, এই অধঃপতন আমাদের না হয়। আমরা যদি অতখানি অধঃপতিত হই তবে তার প্রায়শ্চিত্তের আর কোনও পন্থা থাকবে বলে ভাবতেও পারি না। যারা যেখানেই স্বাধীনতার জন্যে সংগ্রাম এবং আত্মত্যাগ করেছে, করছে বা করবে, আমরা তাঁদেরই সহযোদ্ধা হিসাবে নিজেদের গৌরবান্বিত মনে করবো এটাই এতকাল ভেবে এসেছি, এবং এই বিশ্বাস এই ভাবনা থেকে বিচ্যুতি স্বধর্মত্যাগেরই সমান অমার্জনীয় বলে মনে করি। স্বাধীনতা তা সে সাম্রাজ্যবাদীর কবল থেকেই হোক অথবা সাম্যবাদী ঔপনিবেশিকদের কবল থেকেই হোক, তাঁদের শ্রদ্ধা প্রদর্শন করতে, ভালবাসতে তথা ভ্রাতৃত্বের আসনে বসাতে আমরা যেন বিমুখ না হই।

যেসব ব্যক্তি দেশের বৃহত্তর স্বার্থে, জাতির স্বার্থে আত্মোৎসর্গ করেন তাঁদের মূল্যায়ণ শ্রীসরকার হয়তো করে উঠতে পারেন নি, সে জন্য তাঁর প্রতি শুধু করুণাই প্রকাশ করতে পারি। স্বাধীনতা সংগ্রামে পন্থার ও পদ্ধতির বিভিন্নতা থাকতেই পারে, যার যেমন বিচার বিশ্বাস তেমনই, সহিংসে অথবা অহিংস পথকে গ্রহণ করতে পারে। তার জন্য সে স্বাধীনতা হরণকারীর আরোপিত আইন এর বিরুদ্ধে যেতে পারে এবং উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য আপাত দৃষ্টিতে নৃশংসও হতে পারে। আইন অমান্য যদি অপরাধ হয় তবে মহাত্মা প্রদর্শিত পদ্ধতিও সেই অপরাধের তালিকায় পড়ে। আমার দেশে চাপেকার ভ্রাতৃদ্বয় খুদিরাম, বাঘাযতীন, ভগৎসিং, সূর্যসেন ইত্যাদি সর্বোপরি নেতাজীর ক্রিয়াকলাপ ঐ একই দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে এঁরা প্রত্যেকেই এবং আরও অসংখ্য শহীদ তো ঐ একই ক্রিমিন্যাল তালিকার বাইরে থাকতে পারেন না। এবং শ্রীসরকার যদি দেশের ইতিহাস একটুও দেখে থাকেন তবে দেখবেন তদানিন্তন শাসকবর্গ ঐ একই ভাষায় একই আইনের দোহাই দিয়ে এদেরও হত্যা করেছে। তবে কি আমরা সেই 'ক্রিমিনালদেরই' এতকাল ধরে দেবতা জ্ঞানে পূজা করে আসছি ? সেই মন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণ করে আমরাও ক্রিমিন্যাল সমাজভুক্ত হয়েছি। ক্রিমিন্যাল আখ্যা দিয়ে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী B. C. L. A. এর নাগপাশে আমাদের আবদ্ধ করেছিল।

আমরা যখন বিপ্লব মন্ত্রে দীক্ষা নিই, আইরিশ বিপ্লবীরা তখন আমাদের আদর্শ ছিলেন এবং আমি মনে করি যাঁরা বিপ্লব মন্ত্রে বিশ্বাস এখনও করেন তাঁরা কখনই তাঁদের ঐ বিশ্বাস বা আদর্শ থেকে চ্যুত হননি। সাধারণ চোর, ডাকাত, হত্যাকারীরা যে সব লুণ্ঠন, হত্যা বা অন্য অপরাধ করে তার পিছনে থাকে তার ব্যক্তিগত ভোগ লালসা বা আত্ম স্বার্থ চরিতার্থ করবার কামনা। কিন্তু এ একই কাজ যখন কোন দেশ-প্রেমিক দেশের বৃহত্তর জনসাধারণের স্বার্থে, ভবিষ্যত বংশধরদের স্বার্থে মানব সমাজের কল্যাণ চিন্তায় করেন তখন তার রূপ অন্য।

যে জাতি মরতে শেখেনি, সে বাঁচতেও জানেনা। আইরিশ জাতি মরতে শিখেছে—সুতরাং আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি—সে জাতি বাঁচবেই। ব্রিটিশ সিংহ আজ নখদন্তহীন সারমেয়তে রূপান্তরিত প্রায়। এখনও যদি দেয়ালের লিখন তাঁরা পড়তে না পেরে থাকেন—তবে বুঝতে হবে তাদের ভবিষ্যৎ অন্ধকারাচ্ছন্ন।

তাদের ঘরের প্রজ্বলিত প্রদীপের শেষ তৈল বিন্দুটি নিঃশোষিত শেষ শলিতাটি ভস্মীভূত প্রায়ান্ধকার ও ঘর অন্ধকার হতে আর বেশী দেরি নেই।

রবি স্যানডস, ও হারা। আমরা তোমাদের প্রণাম করি। আমরা গভীর আন্তরিকতার সঙ্গে বিশ্বাস করি তোমাদের এই মহান আত্মদান ব্যর্থ হতে পারে না। হবে না। আমরা জানি, তোমাদের হৃদয়ের মাপ অনেক অনেক বড়, তোমাদের আত্মদানের এই উজ্জ্বল প্রদীপ সারা বিশ্বের উৎপীড়িত নির্যাতীত স্বাধীনতাকামীকে পথ দেখাবে।

তোমাদের আবারও আমরা প্রণাম করি।

সমীক্ষা ঃ

লোকসভা উপনির্বাচন ঃ শ্রীরামপুর

(শ্রীরামপুর থেকে—মলয় ঘোষ)

সাতটি বিধানসভা কেন্দ্র—জাঙ্গীপাড়া, চণ্ডীতলা, উত্তরপাড়া, চাপদানী, শ্রীরামপুর এবং হাওড়া জেলার অন্তর্ভুক্ত জগৎবল্লভপুর ও পাঁচলা—এই নিয়ে শ্রীরামপুর লোকসভা কেন্দ্র। মূলতঃ শ্রমজীবি মানুষ ও কৃষিনির্ভর জনসমষ্টি ছাড়াও সাধারণ মধ্যবিত্ত সমাজের এক গরিষ্ঠ অংশ এই কেন্দ্রের ভোটার তালিকার মধ্যে রয়েছেন। স্বাধীনতা পরবর্তীকালে ১৯৫৭ ও ১৯৬৭তে এই কেন্দ্রে কংগ্রেস প্রার্থী নির্বাচনে জয়লাভ করলেও এ পর্যন্ত এটি সি-পি-এম-এর নিজস্ব সীট হিসাবে পরিচিত হয়ে এসেছে এবং সি, পি, এম-এর দীনেন ভট্টাচার্যের মৃত্যুতেই এই আসনটি শূন্য হয়—১৯৮০র নির্বাচনেও দীনেনবাবু এই আসনে জয়লাভ করেছিলেন।

এবারের উপনির্বাচনে শ্রীরামপুর কেন্দ্রে মোট চারজন প্রার্থী—শান্তিমোহন রায় (কং-ই), অজিত বাগ (সি, পি, আই-এম) অমরনাথ চৌধুরী (লেবার পার্টি) ও সাগরচন্দ্র মাহাতো (নির্দল) প্রতিযোগী থাকলেও মূল প্রতিদ্বন্দ্বিতা হচ্ছে কং-ই ও সি, পি, এম প্রার্থীর মধ্যেই। বিভিন্ন স্থানীয় ও বিশেষ ইস্যুর ভিত্তিতে এঁদের নির্বাচনী প্রচার ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা তীব্রতা লাভ করেছে।

প্রথমেই ধরা যাক, ইন্দিরা কংগ্রেস প্রার্থী শান্তিমোহন রায় এর কথা। ঊনবিংশ শতাব্দীতে বাংলায় রেনেসাঁস নবজাগরণের পথিকৃৎ রাজা রামমোহন রায় এর বংশধর হিসাবে সমগ্র হুগলী জেলায় তাঁর প্রতি মানুষের বিশেষতঃ বাংলার সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের প্রতি আস্থাবান মানুষের মনে একটি শ্রদ্ধার আসন আছে। এছাড়া নিষ্ঠাবান কংগ্রেসকর্মী হিসাবেও তাঁর পরিচিতি ব্যাপক। ১৯৬৯ ও ৭৮ সালের জাতীয় কংগ্রেসের নেতৃত্ব নিয়ে টালবাহানা ও দলের চরম সঙ্কটের সময় যেভাবে তিনি শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর প্রতি পূর্ণ আনুগত্য রেখে দলবদল ও বিশ্বাসঘাতকতা থেকে বিরত ছিলেন, তা বর্তমান রাজনৈতিক স্থিতিহীনতার যুগে বিশেষ প্রশংসার দাবী রাখে। এই অনন্যসাধারণ দৃঢ়তা ও রাজনৈতিক দূরদর্শিতা উপনির্বাচনে শান্তিমোহন রায়ের সাফল্যের সহায়ক হবে। এছাড়া ব্যাপক সমাজসেবা, একাধিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন এবং প্রাক স্বাধীনতা যুগে মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে স্বাধীনতা আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে অসংখ্যবার কারাবরণের মাধ্যমে স্বদেশপ্রেম ও জনহিতৈষণার যে অমোঘ পরিচয় তিনি রেখেছেন, নির্বাচনের ময়দানে তাও বিশেষ ফলপ্রসূ হবে বলে ধরে নেওয়া যায়। ঐতিহ্য ও আত্মত্যাগের কষ্টিপাথরে যাচাই হবে শান্তিমোহন রায়ের ব্যক্তিত্ব শ্রীরামপুর তথা হুগলী জেলার মানুষের কাছে তাঁর একটি নিজস্ব ইমেজ তৈরী করেছে।

অন্যদিকে প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী সি, পি, আই এম প্রার্থী অজিত বাগ শ্রীরামপুর ভোটারদের কাছে তেমন পরিচিত নন। কোতরং এর এই স্কুল শিক্ষকটি শিক্ষক আন্দোলনের মাধ্যমে শিক্ষক সংগঠন এ বি টি

এ-এর সঙ্গে ঘনিষ্টভাবে যুক্ত। জেলার শিক্ষাকর্মী ও দলীয় মানুষের মধ্যে তাঁর ব্যাপক পরিচিতি থাকলেও সাধারণভাবে ভোটাররা তাঁকে চেনেন, একথা বলা যায় না। অবশ্য সি, পি, আই (এম) দলের প্রার্থী যেই হোন, সাধারণতঃ সংগঠনের জোরে তাঁরা নির্বাচনে সফল হন, যদিও প্রাক্তন প্রার্থী দীনেন ভট্টাচার্যের দলীয় সংগঠনের বাইরেও, নিজস্ব ইমেজে কিছু ভোট ছিল, অজিতবাবুর যা নেই। এই দিক দিয়ে দীনেনবাবুর মৃত্যু সি, পি, এম দলকে বিশেষ ধাক্কা দিয়েছে এবং সংগঠনেরও ক্ষতি করেছে বলা যায়।

শ্রীরামপুর শহরকে কেন্দ্র করে সাতটি বিধানসভা কেন্দ্রে উভয় দলেরই ব্যাপক নির্বাচনী প্রস্তুতি শুরু হয়েছে। প্রথমদিকে কংগ্রেস (ই)-র নির্বাচনী কাজকর্মে তেমন জোয়ার দেখা না গেলেও নির্বাচনের দিন যতো এগিয়ে আসছে, প্রচার কাজের গতিও উত্তম ততোই তীব্র হচ্ছে। সবচেয়ে বড়োকথা, এই নির্বাচনকে কেন্দ্র করে জেলার কংগ্রেস (ই) নেতৃবৃন্দের মধ্যে মতবিরোধ অন্ততঃ সহাবস্থানের ভাবেও, মিটে গেছে বলা যায়। ব্যক্তিগত পছন্দ অপছন্দকে পেছনে ফেলে কংগ্রেস (ই) র প্রতিটি নেতা ও কর্মী একটিই লক্ষ নিয়ে নির্বাচনের কাজে আত্মনিয়োগ করেছে—যে করেই হোক্ বামফ্রন্টকে হারাতে হবে। প্রার্থী শান্তিমোহন রায় অসুস্থ শরীর নিয়েও প্রচণ্ড পরিশ্রম করে চলেছেন। শেওড়াফুলিতে তাঁর নির্বাচনী কার্যালয়ে সব সময়েই অসংখ্য কর্মীর উপস্থিতি ও কর্মব্যস্ততা লক্ষ্য করেছি। নির্বাচনী প্রচারে শান্তিবাবু শহরাঞ্চলের চেয়ে গ্রামের উপরেই বেশী জোর দিয়েছেন। কেন্দ্রের অন্তর্ভুক্ত প্রতিটি গ্রামে তাঁর পদযাত্রা ও জনসভা অব্যাহত গতিতে চলেছে—তা কংগ্রেস সম্পর্কে অপপ্রচারে বিভ্রান্ত গ্রামীণ মানুষের অনেক ভুলবোঝাবুঝির অবসান ঘটাচ্ছে। গান্ধীজীর শিষ্য শান্তিমোহন রায়, গান্ধী প্রদর্শিত পথে প্রাসাদের সারি নয়, কুটিরের সংখ্যা দিয়ে ভারতের সমৃদ্ধির পরিমাপ করতে চেয়েছেন—তাঁর দৃষ্টিভঙ্গী মাটির মানুষদের অনুপ্রেরণা জুগিয়েছে। কংগ্রেসের যুব, ছাত্র, শ্রমিক, কৃষক ও সাংস্কৃতিক ফ্রন্টের কর্মীরাও অক্লান্ত পরিশ্রমে সমাজের প্রতিটি স্তরের মানুষের কাছে তাঁদের আবেদন পৌঁছে দিচ্ছেন।

সি, পি, এম তার সংগঠনের সর্বশক্তি নিয়োগ করেছে শ্রীরামপুরে জয়লাভের জন্য। এটি তাঁদের প্রেস্টিজ ইস্যু, পৌর নির্বাচনে নির্দল প্রার্থীরা এবং আর সি কংগ্রেস ও জনতা কিছু আসন ছিনিয়ে নেওয়ায় বামফ্রন্ট কর্মীরা কিছুটা ধাক্কা খেয়েছেন, যা সামলাতে নেতাদের বিশেষ বেগ পেতে হচ্ছে। এছাড়া প্রার্থী অজিত বাগ এর মনোনয়ন নিয়েও পার্টির কর্মী মহলে কিছু গুপ্ত বিক্ষোভ আছে—শ্রীরামপুরের মতো শ্রমিক ভিত্তিক অঞ্চলে কোন ট্রেড ইউনিয়ন লিডার অথবা প্রার্থী না দিয়ে অজিতবাবুকে মনোনয়ন দেওয়া হল কেন বিক্ষোভ এই নিয়ে।

সাতটি বিধানসভার বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে অসংখ্য মানুষের সঙ্গে কথা বলেছি। বামফ্রন্ট ও সি পি এম এবং কংগ্রেস (ই)-র 'কমিটেড ভোটারদের বাদ দিলে সাধারণ নিরপেক্ষ মানুষ, তাঁরা একদিকে যেমন চরম বিদ্যুত সংকট, আইন শৃঙ্খলার অবনতি, শিক্ষাক্ষেত্রে বামফ্রন্ট সরকারের স্বেচ্ছাচার, দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি শিল্পক্ষেত্রে নৈরাজ্য প্রভৃতি কারণে সি, পি, এম প্রার্থীর প্রতি বীতশ্রদ্ধ, অন্যদিকে কংগ্রেস (ই) সংগঠনের অন্তর্দ্বন্দ্বের জন্যও অত্যন্ত ক্ষুব্ধ। তবু ইন্দিরা কংগ্রেস প্রার্থী

(এর পর ১৪ পাতায় দেখুন)

রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্র নাথের স্মৃতি কথা

["A Nation In Making" গ্রন্থ থেকে অনুবাদ]

অনুবাদক—অধ্যাপক নলিনীমোহন দাশগুপ্ত

মন্ত্রীরূপে আমার কাজকর্ম [পূর্বানুবর্ত্তন]

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

আমার এই নীতিরই এক আংশিক প্রয়োগ হিসাবে আমি মেডিকেল কলেজে স্যার কৈলাসচন্দ্র বোসকে অনারেরি ফিজিসিয়ান এবং মেজর হাসান সুরওয়ার্দিকে অনারেরি সার্জেন রূপে নিয়োগ করলাম, এর অল্প কয়েকমাস আগে আমি ডাঃ ইউ, এন ব্রহ্মচারী ও ডাঃ কে, কে, চ্যাটার্জিকে মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে যথাক্রমে অতিরিক্ত ফিজিসিয়ান ও অতিরিক্ত সার্জেন রূপে নিয়োগ করে আর একটি ব্যতিক্রম সংঘটিত করেছিলাম।

মেডিক্যাল কলেজের ইতিহাসে এসিষ্ট্যাণ্ট সার্জেন গ্রেডের ভারতীয় মেডিক্যাল অফিসারগণ এই প্রথম এই সমস্ত পদে নিযুক্ত হলেন। এই ঘটনাগুলির উল্লেখ করে একটি প্রভাবশালী ইংরেজী পত্রিকা সেই সময় মন্তব্য করল :

"সে যা হোক, এটা স্পষ্ট হয়েছে যে ভারত জন্যই ভারত', এই আদর্শকে রূপ দিতে স্যার সুরেন্দ্র নাথ বানার্জি তার যথাসাধ্য করতে চান।"

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের প্রত্যেক নাগরিকেরই সেটা আদর্শ হওয়া উচিত। স্থানিক দেশাত্মবোধের মধ্যেই থাকবে সেই সাম্রাজ্যের নাগরিক বোধের শিকড়। সেই স্বদেশ প্রেমের কেন্দ্র হচ্ছে নিজের গৃহ, নিজের প্রদেশ, নিজের দেশ। সেই দেশ প্রেমই ক্রমে বিস্তৃত হয়ে, বৃহত্তর ও ব্যাপকতর হয়ে তার পরিধির মধ্যে সাম্রাজ্যের ব্যাপক স্বার্থকে টেনে আনে। সাম্রাজ্য বলতে কী বুঝায় ? কয়েকটি স্বায়ত্তশাসনশীল জাতির জমাট বাধা সমষ্টিগতভাবে ভোগ সাধারণ সম্পদের অধিকার ক্ষেত্র ছাড়া আর কিছুই নয়। সেই স্বায়ত্তশাসনশীল জাতিগুলির প্রত্যেকটিই নিজ-নিজ বিশেষ স্বার্থকে সংরক্ষণ করে চলে ; কিন্তু প্রত্যেকের প্রতি প্রত্যেকে সুবিচার করে এবং গোটা সাম্রাজ্যের সংহতির প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখে। আমি যে দলে আছি এটাই হচ্ছে সেই দলের নীতি। এই দল গৃহের স্বাধীনতা, স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের নিরাপত্তায় নিশ্চিত বিশ্বাস রাখে, তবে তার সঙ্গে সাম্রাজ্যের ঐক্যকেও মেনে চলে। এটাই হচ্ছে গৃহের শান্তি রক্ষার এবং বাইরের সম্পত্তি রক্ষার উপায়।

এ বিষয়ে আলোচনা শেষ করার আগে আর একটি গুরুত্বপূর্ণ নিয়মতান্ত্রিক প্রশ্নের দিকে মনোযোগ আকর্ষণ করতে চাই। প্রশ্নটি বাংলাদেশে ইণ্ডিয়ান মেডিক্যাল সার্ভিসের লোকদের নিয়োগ প্রসঙ্গ আমিই তুলেছিলাম : এ যাবৎকাল এই সমস্ত কর্মচারীদের বেতন যদিও বাংলাদেশ সরকারই দিতেন, কিন্তু তাদের নিয়োগ করতেন ভারত সরকার। আমি বললাম, এই পদ্ধতি আমার নিয়মতান্ত্রিক অধিকার লঙ্ঘন করছে। আমি জানালাম, আমার দপ্তরাধীন হস্তান্তরিত বিষয়গুলির প্রশাসনিক কাজের জন্য লেজিসলেটিভ কাউন্সিলের নিকট আমি দায়ী। সেই প্রশাসনিক কাজগুলি যে সমস্ত কর্মচারীদের দ্বারা করান হবে তাদের নিয়োগের ব্যাপারটা একটা প্রধান বিষয়। সেই কর্মচারীদের উপর যদি আমার কোন নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা না থাকে

তাহলে তাদের কোন কাজের জন্য আমার কোন দায়িত্ব থাকে না। আমি দাবি করলাম, এদের আমিই নিয়োগ করব, অবশ্য ভারত সরকারের সঙ্গে পরামর্শ করেই তা করা হবে এবং এ ব্যাপারে প্রত্যেকটি বিষয় ভারত সরকারকে জানান হবে। আমার দাবি মেনে নেওয়া হল এবং সে দাবি যে ন্যায় নীতির দাবি তা প্রতিষ্ঠিত হল।

আমি বলতে পারি যে মন্ত্রীরূপে আমি বাংলায় মেডিক্যাল স্কুল স্থাপনে উৎসাহ দিয়েছি। উচ্চ শিক্ষার জন্য কলা বিভাগীয় কলেজ সম্পর্কে বলতে গেলে বলতে হয় যে তা আমাদের যথেষ্ট আছে। বিপণ কলেজ স্থাপণ করে আমি নিজেই উচ্চ শিক্ষা বিস্তারের আন্দোলনকে সাহায্য করেছি। কিন্তু এই প্রদেশে চিকিৎসা শাস্ত্র শিক্ষা দেওয়ার ব্যাপারে উদ্যোগের এক দুঃখজনক অভাব পরিলক্ষিত হচ্ছে। চিকিৎসা শাস্ত্র শিক্ষা দেওয়া খুব ব্যয় সাপেক্ষ। প্রাথমিক স্তরে এবং পৌঃপুনিক ক্ষেত্রে—দুভাবেই আরও অধিক পরিমাণে অর্থব্যয় প্রয়োজন। কিন্তু ব্যয় যা-ই হোক না কেন, এর আশু প্রয়োজনের কথা কেউ অস্বীকার করতে পারেন না। আমাদের এই বাংলা দেশে চল্লিশ হাজারেরও বেশী লোকের জন্য মাত্র একজন করে ডাক্তার আছেন। পক্ষান্তরে ইংল্যাণ্ডে আছেন প্রতি আটশ জনে একজন করে ডাক্তার।

অন্যান্য সভ্য দেশের মত ভারতেও চিকিৎসা ব্যবস্থা সমাজসাধণের কাছ থেকে চট করে সে রকম কোন সাহায্য পাওয়া যায় না। কিন্তু সে জন্য একথা বললেও অন্যায় হবে যে এদেশে জনগণের দুঃখ কষ্টের প্রতিকারও দৃষ্টি নেই অথবা এদেশে দানশীল লোকের অভাব আছে। অতীতের দিকে তাকালেই দেখা যায় কত বড় বড় দাতা জন হিতকর কাজের জন্য কী বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যয় করে গেছেন যার দ্বারা অন্নসত্রগুলি চলছে, পণ্ডিত ব্যক্তিদের বৃত্তি দেওয়া হচ্ছে। আসলে জনমতকে এদিকে নির্দেশিত ও পরিচালিত করা দরকার। সরকারেরও উচিত চিকিৎসা শাস্ত্র শিক্ষা দানের জন্য যে সকল বিশিষ্ট বদান্য ব্যক্তি অর্থ সাহায্য করে আসছেন, তাদের সম্মানিত করা। সাম্প্রতিককালে সরকার সর্বক্ষেত্রে তা করেছেন বলে আমার মনে হয় না। ফলে এই রূপ উৎসাহদানের ব্যবস্থার অভাবে এই প্রয়োজনীয় খাতে দানের স্রোত রুদ্ধ হয়ে গেছে।

আমার সময়ে অর্থ সংস্থানে টানাটানি থাকা সত্ত্বেও ময়মনসিংহে একটি মেডিকেল স্কুলের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপিত হয়েছে এবং সরকার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে চট্টগ্রাম, বহরমপুর ও জলপাইগুড়িতেও এই রকম আরও একটি পর একটি করে স্থাপিত হবে। কাজের স্পন্দন একটা জেগে উঠেছে। তবে সে স্পন্দনকে সতেজ করে তুলতে হবে। আমি আবারও বলছি, যা করা হয়েছে প্রয়োজনের তুলনায় তা খুবই সামান্য। অসহযোগ আন্দোলন সত্ত্বেও সরকারী খেতাবের এখনও মূল্য আছে. এখনও তাকে মর্য্যাদা দেওয়া হয়ে থাকে। মফঃস্বলে 'রাজা' খেতাব এখনও খুব গৌরব বহন করে। 'রায়বাহাদুর'ও তাই যদিও একটু কম পরিমাণে। এই সমস্ত সম্মান ধনী ব্যক্তিদের বদান্যতায় উৎসাহ দান করে। তাছাড়া এর দ্বারা তাদের সুনির্দিষ্ট ভাবে সরকারের পক্ষেও টেনে আনা যায়। 'সরকার খুশী হয়েছেন'—এ রকম কোন কথা তাদের বলার প্রয়োজন নেই। সরকারকে তাদের খোস মেজাজের কথা প্রমাণ করতে হবে কাজের মধ্য দিয়ে। কথা কম, কাজ চাই।

মন্ত্রীদের আক্রমণ করার একটা মামুলি পদ্ধতি হচ্ছে এই কথা বলা যে তারা কোন কাজ করছেন

না, বা যে কাজের জন্য তারা দায়ী নন সে কাজের দায়িত্ব ঘাড়ে চাপান। ইতিপূর্বে আমি টাউন হলের সভার কথা উল্লেখ করেছি। সেই সভায় নেতাদের নির্বাসিত করার কাজ মন্ত্রীরা সমর্থন করেছেন বলে অভিযোগ এনে তাদের প্রতি আক্রমণ করা হয়েছিল। প্রকৃত পক্ষে তারা কিন্তু এ ব্যাপারে কিছুই জানতেন না। নির্ব্বাসনের আদেশ দিয়েছিলেন সরকারের প্রশাসনিক ক্ষমতা বলে। আর একটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছি। পূর্ববঙ্গে একটি বড় রেল ষ্টেশন চাঁদপুর। আসামে কুলিরা ধর্মঘট করে চাঁদপুর হয়ে নিজ নিজ দেশে ফিরে যাবার সময় এক উদ্বেগজনক পরিস্থিতি দেখা দেয়। আমার কতিপয় বন্ধু আমাকে তাড়াতাড়ি করে চাঁদপুরে যেতে বলল যদিও চাঁদপুরে যা ঘটেছে তা আমার এক্তিয়ার ভুক্ত দপ্তরের বিষয় নয়, এবং সেখানে যা কিছু করার গভর্ণমেণ্টই ইতিপূর্ব্বে তার ব্যবস্থা করছিলেন, আমি সেখানে গেলাম এবং স্যার হুইলারের সঙ্গে দেখা করলাম। হুইলার সাহেব (পরে তিনি বিহারের গভর্ণর হন) সংশ্লিষ্ট বিভাগের ভারপ্রাপ্ত ছিলেন। স্যার হুইলার মনে করেছিলেন যে তিনি নিজে যখন চাঁদপুরে যাচ্ছেন তখন আমার আর সেখানে যাওয়ার কোন প্রয়োজন নেই।

স্যার হেনরি হুইলার চাঁদপুরে গেলেন। সেখানে তিনি ক'দিন থেকে এক বিস্তারিত রিপোর্ট দিলেন।

(১২ পাতার পর)

শান্তিমোহন রায়ের তহবিলে এবারে এক বিপুল পরিমাণ ভোট জমা পড়বে, যাকে নেগেটিভ ভোট বলা হয়—যে ভোট পেয়েছিলেন সি পি এম ও অন্যান্য বিরোধী দলগুলি ১৯৭৭-এ—কংগ্রেস শাসনের অবসান ঘটানোর উদ্দেশ্যে। বামফ্রন্ট সরকারের ব্যর্থতা ও প্রকৃত জনকল্যাণে ঔদাসীন্য গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্যদের চরম দুর্নীতি ও সর্বস্তরে প্রকটিত দলবাজী ভোটারদের অনুপ্রাণিত করবে তাঁদের বিরুদ্ধে ভোট দিতে। আর এই ভোট আসবে মূলতঃ মধ্যবিত্ত, নিম্নবিত্ত ও গ্রামীণ মানুষের কাছ থেকে।

শ্রীরামপুর কেন্দ্রের ফলাফল সম্পর্কে এখনই কোন ভবিষ্যদ্বাণী করা ঠিক নয় তবে সামগ্রিকভাবে জনমানসের গতিপ্রকৃতি গত পৌরসভা নির্বাচনের ফলাফল বিশ্লেষণ করলে এটা আশা করা যায়, শ্রীরামপুরের নির্বাচনী ট্রাডিশন নতুন কোন মোড় নিতেও পারে

কিন্তু আমাদের সমালোচকরা তাতে খুশী হলেন না, এবং লেজিসলেটিভ কাউন্সিলে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা হল। উত্তরবঙ্গের রাজশাহী বিভাগ থেকে নির্বাচিত সদস্য মিঃ কিশোরীমোহন চৌধুরী আমাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনলেন যে আমরা কিছুই করিনি। (চলবে)

পরলোকে প্রবীণ স্বাধীনতা সংগ্রামী

বরিশাল জেলার মহিষানী গ্রামের প্রবীণ বিপ্লবী স্বাধীনতা সংগ্রামী অনুশীলন সমিতির সভ্য, প্রিয়লাল সরকার দীর্ঘদিন রোগ ভোগের পর গত ২৩, ৪, ৮১ তারিখে তাঁহার রাণাঘাটের বাসভবনে পরলোক গমন করিয়াছেন।

আমরা তাঁহার বিদেহী আত্মার শান্তি কামনা করি।

(২য় কভার-এর শেষাংশ)

Roy Chowdhury Dharaniswar 40/2, Satyen Roy Praneh Road, Calcutta—34	300		1 8 80
overdrawal to be recovered	100		p/month.

Dist—24 PARGANAS

Bhattacherjee Smt. Nihar Mala Devi Wd/. Hem Chandra	100		31 7 80
	200		1 8 80
Chakraborty Smt. Bela Rani wd/1 Lakshmi Kanta Vill, Baluria, P. O. Nabapalli	150		31 7 80
Das Smt. Bela Wd/1 Narindra Kumar das Saktipur P. O. Agarpara	150		31 7 80
	250		1 8 80
Das Ghosh Smt. Nihar Nalini wd/1 Bishnu Das Ghosh Birati (24 Parg.) (Calcutta-51)			
Rudra Smt. Sadhana wd/1. Khitish Ch. Rudra 94/1, Netaji Subhas Road, New Barrackpore	100		31 7 80
	200		1 8 80
Sarkar Smt. Basanti wd/1. Sachin Sarkar Sonarpur	100		31 7 80
	200		1 8 80

Dist—HOWRAH

Bhattacharyya Smt. Binapai wd/1. Baneswar Bhattacharji 52, Rajballav Saha Lane, Howrah-1	200	250	1 8 80
Chanda Smt. Ashalata wd/1 Tarak Nath 740 Sarat Chatterjee Road Chatterjee—hat	200		1 8 80
Sarkar Smt. Binapani wd/1. Keshab Chandra Sakar	200		1 8 80

Dist—HOOGHLY

Paul Prafulla Chandra 85 Station Road P. O. Bhadreswar	300		1 8 80
Arjun Chandra Vill Kaggachi			

Roy Smt. Bimla	wd/l Suphal Ch. Roy Vill Joykrishnapur P. O. Dhulipur	200	1 8 80
Samanta Smt, Sarojini	wd/l Harish Ch. Samata Vill Dingal, P, O. Deharkundu	200	8 9 80

Dist—BURDWAN

Chowdhury Basudeb	C/o, N. C. Sarkar Indian Oil Corporation P. O. Rajbandh	300	1 8 80
Radha Raman P. O. Vill Memari		300	1 8 80

Dist—BANKURA

Biswas Smt. Indira wd/l Chandra Nath Biswas	24—A Bidyanidhi Road P. O. Bankura	200	1 8 80

Dist—BIRBHUM

Upadhaya Smt Kaushalya

Dist—MIDNAPORE

Maity Pratap Chandra P. O. &	Vill Shibrampur (Via Reapara)	300	1 8 80

Dist—JALPAIGURI

Bose Sailendra Nath	Race Course Road, P. O. Jalpaiguri	300	1 8 80

Regd No. R. N. 24511/71 | Biplabi Barta | Regd. WB/NC 77
Phone : 34-1795
বার্ষিক :—সডাক ১৫.০০ টাকা | বাষ্মাসিক :—৮.০০ টাকা | মূল্য—৩০ পয়সা

পাক সেনাপতি ইয়াহিয়া খানের জল্লাদবাহিনী যে গ্রন্থ পুড়িয়ে ছাই করে দিয়েছিল বিপ্লব তীর্থক্ষেত্র মহারাজ ত্রৈলোক্যনাথের সেই অবিস্মরণীয় গ্রন্থ "জেলে ত্রিশ বছর" ও পাক ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম" পুনর্মুদ্রিত হল।

দাম—ত্রিশ টাকা

প্রাপ্তিস্থান
খাদি প্রতিষ্ঠান
১৫, কলেজ স্কোয়ার,
কলিকাতা-১২

সম্পাদক—
শ্রীশান্তিশরণ রায়চৌধুরী
॥ সম্পাদকমণ্ডলী ॥
শ্রীজগদীশ চট্টোপাধ্যায় (সভাপতি)
শ্রীসুরেশচন্দ্র নন্দী
পুষ্প চাটার্জী
মলয় ঘোষ
প্রকাশক ও মুদ্রক—
শ্রীঅনিল সেনগুপ্ত
দিল্লীর বিশেষ প্রতিনিধি—
শ্রীবারীন ঘোষ
বেহালা—
শ্রীনন্দগোপাল পাল

C/30

বিপ্লবী পুস্তকমালা

নেতাজীর সিক্রেট সার্ভিস—ডাঃ পবিত্রমোহন রায়—১০.০০
বিপ্লবী মহানায়ক রাসবিহারী—সুবোধ মজুমদার
অনুশীলন সমিতির বিপ্লবী প্রয়াস—ব্রজেন্দ্র দাস

—ক্ষীরোদ কুমার দত্তের—

১। বাংলার অগ্নিযুগ—১.৫০, ২। ভারতীয় বিপ্লব প্রচেষ্টা ৩। অনুশীলন সমিতির দি. মিত্তির—২.০০, ৪। পৌরাণিক সংঘ ও কাহিনী—১.০০, ৫। কাকোরী ষড়যন্ত্র—১.২৫, ৬। কলকাতা বাজার সংগ্রাম কাহিনী—.৪০, ৭। রাসবিহারী ও অনুশীলন সমিতি—.৬০ ৮। স্বাধীনতা সংগ্রামে মা ও মেয়ে—.৪০, ৯। বিবেকানন্দ ও সমাজবাদ—.৬০ ১০। বিপ্লবী বিবেকানন্দ—.৫০, ১১। মহাত্মা ও সুভাষচন্দ্র—.৪০ ১২। ভারতের নবজাগরণ ও ভগিনী নিবেদিতা—.৭৫, ১৩। বেঙ্গল অর্ডিনেন্স (১)—১.০০, ১৪। বেঙ্গল অর্ডিনেন্স (২)—২.০০ ১৫। শহীদ চন্দ্রশেখর আজাদ—.৫০, ১৬। ১৯শে এপ্রিল জাতীয় শহীদ দিবস—১.০০, ১৭। হাসির ছড়া প্রচেষ্টা—.৭৫, ১৮। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও অনুশীলন সমিতি—৭.০০, ১৯। ভারতের জাতীয় পতাকার ইতিহাস—.৪০, ২০। ছাট ছড়া প্রচেষ্টা—১.৫০

প্রাপ্তিস্থান :— ৪নং বল্লভ দাস ষ্ট্রীট কলিকাতা-৭০০০০৭

বৈশালী—১/১/১/A বঙ্কিম চ্যাটার্জী ষ্ট্রীট কলিকাতা-৭৩.

মূল কার্যালয়—৪নং বল্লভ দাস ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০০৭ শ্রীঅনিল সেনগুপ্ত কর্তৃক প্রকাশিত এবং তৎকর্তৃক প্রিন্টিং পাবলিসিটি, ১১৭, কেশবচন্দ্র সেন ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০০৯ হইতে মুদ্রিত।

বিপ্লবী বাংলা

॥ বিপ্লবী পরিষদের সাপ্তাহিক মুখপত্র ॥
স্থাপিত—১৯৫৬, 'বিপ্লবী বাঙ্গালী' নবকলেবরে—১৯৭১

দশম বর্ষ	শনিবার ১২ই আষাঢ় ১৩৮৮ ২৭শে জুন ১৯৮১	৩৪ সংখ্যা

CALCUTTA UNIVERSITY

একজন আধ্যাত্মিক মহামানব সৃষ্টি করিবার জন্য কোটি কোটি মানুষকে বলি দিয়া লাভ নাই। যদি কোটি কোটি মানুষকে নিষ্পেষিত করিয়া একজন আধ্যাত্মিক মহামানব সৃষ্টি করিতে হয়, তাহা অন্যায়। বরং মুক্তির জন্য একজন মহাপুরুষের দুঃখ ভোগ শ্রেয়ঃ।

—স্বামী বিবেকানন্দ

সম্পাদকীয়

বিদ্যুৎ-মন্ত্রীর পদত্যাগ চাই

পশ্চিমবঙ্গের শোচনীয় বিদ্যুৎ-পরিস্থিতি নিয়ে অনেক অভিযোগ, অনেক ক্ষোভ, অনেক নিন্দাবাদ খবরের কাগজগুলি ও এই রাজ্যের অসহায় অধিবাসীরা প্রকাশ করেছেন। কোন কোন প্রতিবেদক এমন কথাও বলেছেন যে বিদ্যুৎমন্ত্রী শ্রীজ্যোতি বসু নানা কাজে ব্যস্ত থাকেন বলে বিদ্যুৎ বিভাগের উপর যথাযথ মনোযোগ দিতে পারেন না এবং সেক্ষেত্রে অন্য কোন যোগ্য সহযোগীর হাতে এই বিভাগের ভার দেওয়া উচিৎ। অবশ্য ভদ্রতার খাতিরে হয়ত একথা কেউ বলেছেন বলে জানা নেই যে জ্যোতিবাবু যখন বিদ্যুৎ বিভাগের পরিচালনায় এমন চরম শোচনীয় ব্যর্থতার স্বাক্ষর রাখছেন। তখন তার পদত্যাগ করাই উচিৎ কিম্বা বিদ্যুৎ-দপ্তর তার হাত থেকে কেড়ে নেওয়াই উচিৎ। কিন্তু দিনে দিনে অবস্থা এমন মারাত্মক অবস্থায় পৌঁচেছে, যে এখন সে কথা বলা অত্যাবশ্যকীয় হয়ে উঠেছে বলে চিন্তাশীল মানুষেরা মনে করছেন।

একজন মন্ত্রী যখন কোন সমস্যার উৎস খুঁজে বের করতে সচেষ্ট হন, তখন মানুষ তার উপর সহানুভূতি জানাতে দ্বিধা করে না। কিন্তু সে পথে চলার মানসিকতার যখন অস্তিত্ব মেলে না, তখন ত আর তাকে উপেক্ষা করা চলে না। বিদ্যুৎ শুধু আজকের দিনে আলোর রোশনাই অথবা হওয়া খাওয়ার আরাম উপভোগ করার জন্য নয়। বিদ্যুৎ আজকাল মানুষের জীবনের একটি অত্যাবশ্যকীয় অঙ্গ হয়ে পড়েছে। বিদ্যুৎ না হলে শিল্পোৎপাদন সঙ্কুচিত বা বন্ধ, কৃষিকর্ম ব্যাহত, জল সরবরাহ বিঘ্নিত, যানবাহন অচল, এক কথায় জনজীবন প্রায় স্তব্ধ হয়ে পড়ে। এমন অপরিহার্য্য জিনিসের অভাব মোচন করতে কি ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে জানতে চাইলে, 'বিদ্যুৎ নেই ত আমি কি করব,' এমন বালসুলভ অর্বাচীন উক্তি করতে পারেন কোন রাজ্যের বিদ্যুৎ, তথা মুখ্যমন্ত্রী, এটা ধারণার অতীত। এই শ্রীজ্যোতি বসুই একদিন দম্ভ করে বলেছিলেন যে তার হাতে এই বিভাগের দায়িত্ব পড়লে তিনি সাতদিনের মধ্যে সব সমস্যার সমাধান করে দেবেন। পশ্চিমবঙ্গের আগামী দিনে বিদ্যুৎ উৎপাদনের পরিমাণ সম্বন্ধে দূর দৃষ্টি দিয়ে প্রয়াত মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র যখন পরিকল্পনা রচনা করেছিলেন, তখন শোনা যায় এই জ্যোতিবাবুই উক্তি করেছিলেন যে এত বিদ্যুৎ দিয়ে কি হবে, বিদ্যুৎ কি আমরা খাব এই দূর দৃষ্টির নমুনা, তার থেকে বর্তমানে যা ঘটছে, তার বেশী আর কি আশা করা যায়?

প্রথম থেকেই অত্যন্ত হালকা ভাবে এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টিকে দেখা হয়েছে। কোথায় এই সমস্যার মূল উৎস, সেদিকে কোন দৃষ্টি দেওয়া হয়নি। সুরুতে এমন ভাব দেখান হয়েছে যেন ভূতপূর্ব প্রধানমন্ত্রী শ্রীসিদ্ধার্থ রায় বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রগুলি থেকে সব যন্ত্রপাতি লোপাট করে দিয়েছেন। যত অনর্থের মূল, সবই কংগ্রেসী প্রশাসক দল। একটি একটি করে যখন বর্তমান প্রশাসক দল চার-চারটি বছর কাটিয়ে দিয়েছেন এবং অবস্থার উন্নতির থেকে অবনতিই ঘটেছে ভয়ংকর রকমে, তখন নতুন কৈফিয়ৎ সৃষ্টি করার অপপ্রচার চলতে থাকল। কিন্তু এ সব পন্থায় খবরের কাগজে বিবৃতি দেওয়া যায়, বিধান সভায় Brute majority থাকলে, যা খুসী তাই বলা যায়, জনগণের জীবনমরণ প্রশ্নে বালখিল্যের ভূমিকায় অবতীর্ণ হওয়া যায়, কিন্তু প্রকৃত সমস্যার কোন সমাধানই করা যায় না। মহামান্য কলিকাতা হাইকোর্ট কর্তৃক নিযুক্ত কমিশনের নিকট সাক্ষ্য দিতে গিয়ে বিভিন্ন বিভাগের কর্মীরা উচ্চপদস্থ কর্মচারীরা, ট্রেড ইউনিয়ন নেতারা যে পরস্পর বিরোধী উক্তি করছেন তা থেকে এটা সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে বিদ্যুৎ উৎপাদনের ক্ষেত্রগুলিতে একটা নৈরাজ্য চলছে। যে কোন সভ্য দেশে এক্ষেত্রে বিদ্যুৎ-মন্ত্রী হয় পদত্যাগ করতেন, অথবা তাকে পদত্যাগ করতে বাধ্য করা হত। কিন্তু জনসাধারণের হাতে একাজ করার কোন বিধি সম্মত ব্যবস্থা গ্রহণ করার সুযোগ না থাকায় যা খুসী তাই করেও এই রাজ্যে মন্ত্রী ও অন্যান্য পারিষদেরা পার পেয়ে যাচ্ছেন।

গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে এদেশের—রাজ্য এবং কেন্দ্রীয় সরকার চলে। দেশের মানুষ এদের ভোট দিয়ে নির্বাচিত করেছে জনকল্যাণ সাধন করার জন্য। কোন দল বা ব্যক্তি বিশেষের আখের গুছিয়ে নেবার সুযোগ দিতে নয়। গণতান্ত্রিক কাঠামোতে জনগণের কল্যাণই যদি উপেক্ষিত হয়, নিরাপদে এবং বিনা প্রতিকারে, তবে ত দেশের মানুষ গণতন্ত্রের উপরই আস্থা হারিয়ে ফেলবে। সেটা ত হবে দেশের চরম দুর্দিন। গণতান্ত্রিক কাঠামোতে জনগণকে অতন্দ্র প্রহরীর কাজ করতে হয়, অন্যথায় গণতন্ত্রকে বাঁচান যায় না। তাই আজ বিশেষ করে ভাববার দিন এসেছে দেশের মানুষের।

বর্তমান প্রশাসক দল এখনও মৌল সমস্যার দিকে নজর দিচ্ছেন না, এটা রীতিমত দুঃখের। এরা এখনও ডি. ভি. সির উপর দোষারোপ করছেন এই বলে যে ডি. ভি. সি ১৫ মেগাওয়াটের জায়গায় কয়েকদিন কম বিদ্যুৎ দিয়েছে। ভাবটা এই যে ডি. ভি সি ৯০ মেঃ ওয়াট বিদ্যুৎ সরবরাহ করলেই পশ্চিমবঙ্গের বিদ্যুৎ সমস্যার সমাধান হয়ে যেত। সাওতালদি, ডি. পি, এল প্রভৃতির অযোগ্যতার কথা এতে চাপা দেওয়া সম্ভব হবে? একজন কর্তব্য নিষ্ঠ অফিসার, যাকে এদের সমর্থক দলের লোকেরা বহু রকমে হেনস্তা করেছেন, আন্তরিকতা ও ইচ্ছা থাকলে কি ভাবে বিদ্যুৎ উৎপাদন বাড়ান যায়, সেটা হাতে কলমে দেখিয়ে দিয়েছেন। তিনি ও তার কর্ম-পদ্ধতি ত এদের অনুকরণযোগ্য হওয়াই উচিৎ ছিল। কিন্তু এরা স্বয়ং সলিলে ডুবে যাচ্ছেন। জঘন্য মানসিকতা নিয়ে যারা শ্রমিক ও কর্মচারীদের এতদিন বুঝিয়ে এসেছেন যে কাজকর্ম করতে হবে না, যখন তখন বন্ধ কর, উচ্ছৃঙ্খলতা সৃষ্টি করে বিপ্লবীর অভিনয় কর, কোন চিন্তা নেই, মাইনেও বাড়বে, বোনাসও মিলবে, সহ মত বিশিষ্ট লোক ব্যতীত কারো নিরোগ করা হবে না। কোন ভয় নেই। দেশের স্বার্থের উপর দলীয় স্বার্থের স্থান দাও। এই শোচনীয়

ব্যর্থতা ও মারাত্মক পরিস্থিতি এই ভাবেই সৃষ্টি হয়েছে। তাদের উচ্ছৃঙ্খলতা এমন স্তরে পৌঁছেছে, যে তাকে আর আয়ত্তের মধ্যে রাখা যাচ্ছে না। আজ সেই নৈরাজ্যের দৈত্য এদের এখন গ্রাস করতে চাইছে। এদের জন্য বিশিষ্ট ভাবে ভাবার কিছু নেই। যে যেমন বীজ বপন করে, তাকেই সেইমত ফসল তুলতে হয়. এটা ঐতিহাসিক সত্য।

সর্বক্ষেত্রেই রাজনীতির অনুপ্রবেশ ও দলীয় কোন্দলই যে বর্তমান অবস্থার জন্য বিশেষভাবে দায়ী একথা এখনও সরকার স্বীকার করছেন না। তাই মৌল ব্যাধির চিকিৎসাও হচ্ছে না। কলিকাতা হাইকোর্ট কর্তৃক নিযুক্ত কমিশনের সামনে এই রাজ্যের বিদ্যুৎ সচিবের কথাবার্তাও এর সাক্ষ্য বহন করে। তিনি যে সরকারী কর্মচারী এবং তার একমাত্র কর্তব্য হল সর্বপ্রযত্নে বিদ্যুৎ উৎপাদন বৃদ্ধি করা একথাও তিনি ভুলে গিয়েছেন বলে মনে হয়। ডি. ভি সির নিন্দা কেন লোকে করছে না, শুধু সরকারকেই নিন্দা করছে, এ প্রশ্ন ত মৌল সমস্যার কোন কৈফিয়ৎ নয়। তাকে জন-সাধারণের টাকা দিয়ে পোষণ করা হয়, কাজ করার জন্য, সরকারের পক্ষে রাজনীতিবিদ্‌দের মত ওকালতী করার জন্য নয়।

জনগণকেই এই অবাবস্থার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে হবে, অন্যথায় এই ভীষণ পরিস্থিতি থেকে মুক্তি নেই। সংঘবদ্ধ জনমত গড়ে তুলতে হবে এবং বলতে হবে হয় দক্ষতার সঙ্গে প্রশাসন কার্য্য করুন, অন্যথায় গদী ছাড়ুন। নির্বাচন হচ্ছে এবং আরো হবে। প্রতিনিধি নির্বাচনের মাধ্যমে নিজেদের বক্তব্যকে রূপদান করতে হবে। জ্যোতিবসু প্রশ্ন তুলেছেন যে তিনি কি করবেন। জবাব সাধারণ মানুষেরই দেওয়া কর্তব্য। সোজা কথায় বলে দেওয়া দরকার যে তার এখনই বিদ্যুৎ দপ্তরের দায়িত্ব ত্যাগ করতে হবে। এমন কি মন্ত্রীসভা থেকেও পদত্যাগ করাই তার একমাত্র করণীয় বর্তমান অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে। দৃপ্তকণ্ঠে বজ্রনির্ঘোষে বলতে হবে এখনই মানুষ তার পদত্যাগ দাবী করে।

সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালবাসি

কালীপদ সরকার

বাংলাদেশের ব্যর্থ সামরিক অভ্যুত্থানের সঠিক তথ্য এখনো উদ্‌ঘাটিত হয়নি, ৩০শে মের ক্ষণিক নাটকের নেপথ্যে রয়ে গেছে অনেক অকথিত ইতিবৃত্ত। রহস্যাবরণ যদি কোনদিন মুক্ত হয় তখন হয়ত তার কিছুটা জানা সম্ভব হবে। বর্তমানে মহাকবির সেই স্মরণীয় কথা কয়টির মাঝে সান্ত্বনা খোঁজা ছাড়া গত্যান্তর নেই।

'There are more things in heaven and earth, Horatio,

Than are dreamt of in your philosophy.'

চট্টগ্রামের মর্মন্তুদ ঘটনার সঙ্গে ওপার বাংলার মানুষ প্রত্যক্ষভাবে জড়িত, তাদের চোখের জল এখনো শুকায় নি, কিন্তু এপার বাংলার মানুষ যে একেবারে নিস্পৃহ নিঃসম্পর্ক তাই বা বলি কি করে। বিভেদের প্রাচীর খাড়া করে দিলেই কি অন্তঃসলিলা প্রবাহ বন্ধ হয়?

পরম স্বস্তির বিষয় যে বাংলাদেশের অস্থায়ী তদারকি সরকার আগামী ২১শে সেপ্টেম্বর নতুন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের দিন ধার্য করে দেশের রাজনৈতিক অনিশ্চয়তার অবসান ঘটিয়েছেন। ঘোষিত নির্বাচন সুসম্পন্ন হোক, বাংলাদেশে স্থিতিশীল গণতন্ত্র বিকাশ লাভ করুক, প্রতিবেশী বন্ধু রাষ্ট্র ভারতের নিকট তার চেয়ে বড় কাম্য আর কিছু হতে পারে না।

চট্টগ্রামে রাষ্ট্রপ্রধান জিয়াউর রহমান এবং নিষ্ফল বিদ্রোহের নায়ক বলে প্রচারিত মেজর জেনারেল মনজুরকে (বাংলাদেশের দুই প্রধান মুক্তি যোদ্ধা) হত্যা করল কারা তা এখনো অজ্ঞাত। পাকিস্থান সেনাবাহিনীর যে সব তরুণ বাঙালী অফিসার ১৯৭১ সালে শেখ মুজিবের গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে পাকবাহিনী ছেড়ে অনুগত সৈন্যদল নিয়ে মুক্তিযুদ্ধে যোগ দিয়েছিলেন, এই দুই সেনানায়কের মৃত্যু এবং মেজর জেনারেল মীর শওকত আলির বাধ্যতামূলক অবসর গ্রহণে, তাঁদের প্রায় সকলেই হয় নিহত, নয় বাংলাদেশের সেনাবাহিনী থেকে অপসৃত হলেন। অবশিষ্ট রইলেন একমাত্র মেজর জেনারেল হামিদ।

জিয়াউর রহমান, খালেদ মোসারফ, তাহের ও মনজুর নিহত। ওসমান ও জলিল সেনাবাহিনী ছেড়ে চলে গিয়েছেন। প্রাক্তন সৈন্যাধ্যক্ষ সফিউল্লা ও মোশ্তাক বিদেশ রাষ্ট্রদূত এবং মীর শওকত আলিও হয়ত বিদেশে রাষ্ট্রদূত হয়ে যাবেন। সেনাবাহিনী এখন মুক্তিযুদ্ধের ঐতিহ্য প্রভাব মুক্ত হল। বর্তমানে সৈন্যাধ্যক্ষ জেনারেল এরশাদ-সহ বাহিনীর সব বড় অফিসারই বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পরে বাংলাদেশে এসেছেন, সকলেই repatrated পাক অফিসার।

শেখ মুজিবর রহমান এবং মুক্তিসংগ্রামকালে গঠিত অস্থায়ী স্বাধীন বাংলাদেশ সরকারের চার প্রধান নজরুল ইসলাম, তাজুদ্দিন, মনসুর আলি এবং কামারুজ্জমানের হত্যার সহিত উপরোক্ত সেনানায়কদের হত্যা অথবা নির্বাসন যে সম্পর্কহীন একথা মনে করা যায় না। সমস্ত ঘটনার পিছনে একই চক্রান্তকারী দলের তৎপরতা বিদ্যমান। যাদের লক্ষ্য হল যত দ্রুত সম্ভব বাংলাদেশের সামরিক এবং বেসামরিক ক্ষেত্র থেকে মুক্তি যুদ্ধের ঐতিহ্যকে মুছে ফেলা। মুক্তিযুদ্ধের প্রধান নায়কদের মধ্যে বেঁচে

আছেন দুজন মাত্র, জেনারেল ওসমানি এবং খন্দকার মোস্তাক আহমদ। ওসমানি নিষ্ঠাবান ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন সামরিক মানুষ, খোন্দকার মোস্তাক ধূর্ত সুবিধাবাদী রাজনীতিক। মুজিবর রহমানের আহ্বানে মুক্তিযুদ্ধে এসে রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠা লাভ করলেও, খোন্দকার মোস্তাক ছিলেন মুজিব বিরোধী গোপন ষড়যন্ত্রের নায়ক এবং মুজিব হত্যার পর বলেছিলেন—"The murder was a historic necessity and an act of deliverence"

বাংলাদেশের রাজনৈতিক সমস্যার মূলে যে বিরোধ তা হল বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদ বনাম মোল্লাতন্ত্র। আধুনিক চিন্তাধারা ও গণতন্ত্রের সহিত মোল্লাতন্ত্রের বিরোধিতা কেবল বাংলাদেশেই নয়, অপর মুসলিম রাষ্ট্রেও আছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ ইরান, পাকিস্থান, এবং তুরস্কের নাম করা যেতে পারে। বিরোধটা কিছু নতুন নয়, তবে সম্প্রতিকালে মোল্লাতন্ত্রীরা যে রাষ্ট্রক্ষমতা করায়ত্ত করার অভিসন্ধিতে লিপ্ত তার ভিন্ন কারণ আছে। সে কথায় পরে আসছি। বাংলাদেশের প্রেসিডেন্ট অসামরিক না সামরিক ব্যক্তি হবেন সে কথা বলার সময় এখনো আসে নি, তবে ধুয়ো এখনি উঠেছে—"Strong man regimes can never substitute democratic order"—বলেছে ঢাকার হলিডে পত্রিকা বাংলাদেশে গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার জন্য যে দাবি উঠেছে তাকে শান্তিপ্রিয় মানুষের সুস্থ চিন্তার লক্ষণ বলতে হয়। এ প্রসঙ্গে বাংলাদেশের সৈন্যাধ্যক্ষ লেঃ জেনারেল এইস, এস, এরসাদের বিবৃতি প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেছেন, 'সশস্ত্র বাহিনীকে রাজনীতির বাইরে রাখা হবে এবং তারা রাজনীতি নিয়ে মাথা ঘামাবে না। তার মতে সেনা বাহিনীর ক্ষমতায় আসার মত দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা আদৌ ঘটা উচিত নয়। এরসাদ দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলেন, জাতীয় সংকটের সময় সাংবিধানিক অধিকার, জাতীয় স্বাধীনতা ও সংহতি সুনিশ্চিত করতে দেশের জনগণের সঙ্গে মিলে কাজ করেই সেনাবাহিনী দেশের গৌরব হয়ে উঠতে পারে।"

যতদূর বোঝা যাচ্ছে, প্রেসিডেন্ট পদের জন্য নির্বাচনী লড়াইটা হবে মূখ্যতঃ ক্ষমতাসীন বি, এন, পি, এবং আওয়ামী লিগের মধ্যে। বি, এন, পি-তে তেমন নামকরা নেতা কেউ নেই, জিয়াউর রহমানই ছিলেন দলের সর্বময় কর্তা। প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট লণ্ডন প্রবাসী ব্যারিষ্টার আবু সৈয়দ চৌধুরিকে বি, এন, পি তাদের প্রার্থী করতে চেয়েছিল কিন্তু চৌধুরি সাহেব নাকি সম্মত হন নি। অন্যদিকে আওয়ামী লিগের নেত্রী মুজিব কন্যা শ্রীমতী হাসিনা ওয়াজেদ বয়সের প্রশ্নে প্রেসিডেন্ট পদের জন্য নির্বাচনে দাঁড়াতে পারছেন না। কাজেই দুই প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী দলের প্রার্থী হবেন বয়স্ক দুই নেতা।

খোন্দকার মস্তাকও চুপ করে বসে নেই, তিনি মোল্লাতন্ত্রী ও অপর সুবিধাবেশী গোষ্ঠীগুলি নিয়ে তৃতীয় একটা জোট বাঁধতে সচেষ্ট হয়েছেন। বাংলাদেশের অস্থায়ী প্রেসিডেন্ট বিচারপতি আবদুস সাত্তার বয়স ও অসুস্থতার কারণে প্রেসিডেন্ট পদ প্রার্থী হতে আগ্রহী নন, তবে অবস্থার চাপে তাঁকেই হয়ত বি, এন, পি-র প্রার্থী হয়ে নির্বাচনী আসরে নামতে হতে পারে।

এবার আলোচ্য বিষয়ে ফিরে আসা যাক। মুসলিম রাষ্ট্রগুলিতে মোল্লাতন্ত্রী শাসন পুনঃস্থাপনের যে আন্দোলন শুরু হয়েছে তার পিছনে আছে একটি শক্তিশালী আন্তর্জাতিক চক্র যাদের ধারণা—কমিউনিজমের পতনের পর এখন একমাত্র নিয়ম নিয়ন্ত্রিত

এবং সতেজ ইসলামী মতবাদে যোগ্য হাতিয়ার। চক্রটির দৃষ্টিতে কমিউনিজমের মূল শক্তিকেন্দ্র হল সোভিয়েত রাশিয়া, সুতরাং গোঁড়া ইসলামতন্ত্রী রাষ্ট্রগুলিকে নিয়ে একটি সোভিয়েত বিরোধী ব্যূহ রচনা হল তাদের সামরিক কৌশল। যে ব্যূহের শুচিমুখ হবে পাকিস্থান। বাংলাদেশ এই ব্যূহের অনেক বাইরে অবস্থিত. কিন্তু যেহেতু ভারত সোভিয়েত রাশিয়ার সহিত মৈত্রী চুক্তিতে আবদ্ধ, সে কারণে ভারতের পশ্চিম সীমান্তের ন্যায় পূর্ব সীমান্তও উত্তপ্ত রাখতে চায় আন্তর্জাতিক চক্রটি। তার জন্য চক্রটি চায় বাংলাদেশে এমন একটি সরকার যে তাদের অভিসন্ধি পূরণে অনুগতের ন্যায় চলে।

বাংলা দেশের উগ্র ইসলাম পন্থীরা বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদের ঘোর বিরোধী। সেই জন্য তারা বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামের বিরোধিতা করেছিল। তাদের হাতে বাঙ্গালী স্বাতন্ত্র্যের ধারক ও বাহক বহু বুদ্ধিজীবী এবং খ্যাতনামা অধ্যাপক নিহত হয়েছিলেন। পূর্বপাকিস্থান যখাকালে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ হলেও, তাদের পাকিস্থানপ্রেমে কিছুমাত্র ভাঁটা পড়ে নি। উগ্র ইসলাম পন্থীদের পিছনে পূর্ব কথিত চক্রটির গোপন হস্ত যে সক্রিয় আছে এ অনুমান অমূলক নয়। বাংলাদেশের সামরিক বাহিনীর কিছু অংশের সঙ্গে যোগ সাজসে এরাই বঙ্গবন্ধু ও জিয়াউর রহমানের হত্যাকাণ্ড ঘটিয়েছে মনে করলে হয়ত ভুল হবে না।

অদৃষ্টের নিষ্ঠুর পরিহাস যে বাংলাদেশের প্রথম দুই নির্বাচিত রাষ্ট্রপ্রধানের প্রতিশ্রুতিময় জীবন এভাবে অকালে নিভে গেল এবং জিয়ার হত্যার জন্য যাঁকে স্কেপ-গোট করার চেষ্টা হচ্ছে সেই সুশিক্ষিত মেধাবী মেজর জেনারেল মনজুর নিহত হলেন বন্দী অবস্থায়। সব কিছুই কেমন রহস্যাবৃত এবং এক অদৃশ্য হস্তের নিপুণ কর্ম।

বঙ্গবন্ধু মরলেন বেড আমি না গড়ে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র গড়তে গিয়ে। শেখ মুজিব ভাবতেন 'আমি মুজিবর রহমান, দেশের ভাল আমার চেয়ে কে বেশি বোঝে, দেশের জন্য আমি যা করব বাংলাদেশের মানুষ বিনা দ্বিধায় তা মেনে নেবে।' মাত্রা অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাস তাঁর কাল হয়েছিল। তিনি দেশকে ভালবেসেছিলেন, দেশের মানুষের শুভবুদ্ধির উপর বিশ্বাস রেখেছিলেন। 'কপট রাত্রির ছায়ে গোপন হিংসার' চক্রান্তকে বঙ্গবন্ধু দেখেও দেখেননি এবং চরম ক্ষণে উদ্যত বন্দুকের গুলীকে তিনি বীরের মত বুক পেতে নিয়েছিলেন।

দক্ষ রাজনীতিক এবং সৎ প্রশাসক জেনারেল জিয়াউর রহমান মরলেন তাঁর মধ্যপন্থী স্বাধীন মতাদর্শের জন্য। যে দুষ্ট চক্র মুজিব হত্যার পর তাঁকে ক্ষমতার শিখরে পৌছতে সাহায্য করেছিল তিনি তাদের হাতের ক্রীড়নক হতে চান নি বলেই খুব সম্ভব তাঁকে চলে যেতে হল অসময়ে। বাংলা দেশকে ইসলামী রাষ্ট্র করেও জিয়াউর রহমান রক্ষা পেলেন না।

জিয়ার দেশ গড়ার স্বপ্ন মাঝ পথেই ভেঙ্গে গেল। বিপুল জনসংখ্যা অধ্যুসিত, খনিজ আকরবিহীন, দরিদ্র, কৃষি নির্ভর বাংলাদেশের আর্থিক উন্নয়ণ সহজসাধ্য নয়। তবু জিয়াউর রহমান মার্কিণ ঋণ ও মধ্য প্রাচ্যের পেট্রোডলারের সাহায্যে বাংলা দেশের আন্তর্জাতিক ভিক্ষাপাত্র নামটি ঘুচাতে সচেষ্ট হয়েছিলেন এবং কৃত্রিম হলেও দেশের ভিতরে প্রাচুর্যের বাতাবরণ সৃষ্টি করতে পেরেছিলেন।

সেনা বাহিনীকে বাড়িয়ে তিনি দশ ডিভিসনে তুলেছিলেন এবং সেনানী ও সৈনিকদের বহু সুখ

সুবিধার ব্যবস্থা করেছিলেন। এ সবের জন্য জিয়া মোট রাজস্বের শতকরা ত্রিশ ভাগ বরাদ্দ করেছিলেন সেনা বাহিনীর জন্য। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এত করেও তিনি শেষ রক্ষা করতে পারেন নি। তাঁর প্রিয় সেই সেনা বাহিনীর হাতেই তাঁর মৃত্যু ঘটল।

বন্দুকের নলই ক্ষমতার উৎস, এ বচনের সঙ্গে অনেকেই একমত নন। ক্ষমতার প্রকৃত উৎস হল রাজনীতি সচেতন জনমত। বাংলা দেশবাসী এ সত্য উপলব্ধি করেছে বলে মনে হয়। সামরিক অভ্যুত্থানের ব্যর্থতা তার প্রমাণ। বেদনাময় অতীতকে পিছনে ফেলে বাংলাদেশ নতুন সাফল্যের পথে এগিয়ে যাবে। অবরুদ্ধ বাতাসের গ্লান ক্লান্তির শেষে সুবিপুল প্রভাতের আলোকে শ্যাম কান্তি বাংলা আবার হেসে উঠবে মুক্তি মন্ত্র বলে। উদাত্ত আজান উঠবে মিনারে মিনারে, কণ্ঠে কণ্ঠে ধ্বনিত হবে—

আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালবাসি।
চিরদিন তোমার আকাশ, তোমার বাতাস,
আমার প্রাণে বাজায় বাঁশি॥

যুগান্তর বিপ্লবী সম্মিলনী স্মরণ সভা

প্রয়াত বিপ্লবী সতীভূষণ সেন, শৈলেন দাশগুপ্ত (কণু), মহেন্দ্র ব্যানার্জী, হরেশ ভট্টাচার্য্য, অরুণ ব্যানার্জী, পূর্ণেন্দু বসু, শিশির দত্তরায়, সন্তোষ কুমার কর (বকু), জীতেন চৌধুরী, সুরেন কর রায়, দীনেশ চাটার্জী এবং সুধাংশু সেনগুপ্তের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন উপলক্ষে আগামী ২৭।৩।৮১ শনিবার অপরাহ্ণ ৫টায় প্রজ্ঞানানন্দ পাঠগৃহ ভবনে কিরণচন্দ্র হলে (মৌলালির মোড়) এক স্মরণ সভার আয়োজন করা হয়েছে।

আপনার সবান্ধব উপস্থিতি কামনা করি।

কার্য্যকরী কমিটি
যুগান্তর বিপ্লবী সম্মিলনী

নির্বাচনের সমীক্ষা—

জনৈক কংগ্রেসকর্মী

ভারতবর্ষের কয়েকটি রাজ্যে গত ১৪ই জুন লোকসভা বিধানসভার কয়েকটি উপনির্বাচন হয়ে গেল। পশ্চিমবাংলা ব্যতীত অন্যান্য জায়গায় কংগ্রেস (ই) দলের প্রার্থীরাই বিরাটভাবে জয়লাভ করেছেন। অন্যান্য প্রদেশে বহুধা বিভক্ত দলগুলি শোচনীয় ভাবে পরাজিত হয়েছেন। হেরে যাওয়ার পর পরাজিত দলগুলি সেই পুরাণো বস্তাপচা কৈফিয়ৎগুলি তুলে ধরতে কোন লজ্জাবোধ করেনি। তারা অদ্ভুত একটি কৌশলে এবারকার বিবৃতির মাধ্যমে দেশশুদ্ধ লোককে বোকা বানাবার হাস্যাস্পদ চেষ্টা করেছে। একটি লক্ষণ এর মধ্যে দেখা যাচ্ছে যে নির্বাচনের সময় যাদের প্রত্যেকেই নিজ নিজ দল ও গোষ্ঠির স্বাতন্ত্র রক্ষা করে রাজনৈতিক অদূর দর্শিতার স্বাক্ষর রেখেছিলেন, বর্তমান সরকারের বিরুদ্ধে যাহক একটা কিছু বলার উগ্র বাসনায়, একসঙ্গে বিবৃতি দিয়েছেন। এই ভাবে গণতান্ত্রিক কাঠামোতে সত্যিকার বিরোধী দলের কোন গ্রাহ্য ভূমিকা পালন করা যায় না। এই সহজ সত্যও তারা এখনো মেনে নিতে পারছে না। অবশ্য শ্রাবা রোগাক্রান্ত চোখে কিছু দেখতে চাইলে, এর বেশী কিছু করা যায় না। দেশের মানুষ উদ্বিগ্ন এই দেখে যে সুস্থ দৃষ্টি সম্পন্ন বিরোধী দলের সৃষ্টি হবার সম্ভাবনা সুদূর পরাহত। 'গণতন্ত্র গেল' বলে খবরের কাগজের মাধ্যমে হতাশার আচ্ছন্ন জিগীর তুললেই সব কাজ সম্পন্ন করা যায় না, এটা বুঝবার মত অতি সামান্য বুদ্ধিও এদের লোপ পেয়েছে। এটাই অবশ্য স্বাভাবিক যে যাদের কিছুমাত্র দূরদর্শিতা নেই, দেশপ্রেমের উচ্চ আদর্শ নেই। আছে শুধু ব্যক্তিগত লালসা ও ক্ষমতামত্ততা, ব্যক্তিগত বিদ্বেষ, তারা এর বেশী কিছু করতেও আরে না কখনও। এদের চরিত্রের আরো একটি লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে যে এদের একমাত্র রাজনৈতিক মূলধন হচ্ছে ইন্দিরা-বিদ্বেষ এবং যেন তেন প্রকারেণ নিজেদের উচ্চাভিলাষ পূরণ করা। এর পথে কোন বাধা হলেই এরা তারস্বরে চিৎকার করে বলে গণতন্ত্র বিপন্ন। ভাবটা এই যে এরা জয়ী হলেই মাত্র ভারতবর্ষে গণতন্ত্র রক্ষা হতে পারে। ভোটের তালিকায় কারচুপি করে, রিগিং করে পশ্চিমবাংলায় যে নির্বাচনের প্রহসন হয়ে গেল, সে সম্বন্ধে কোন টুঁ শব্দটিও এরা করেনি। ইন্দিরা গান্ধীর দল সফলতা অর্জন করতে পারেনি, এটাই এদের শেষ কথা এবং এতেই এদের আনন্দ।

এই নির্বাচন সম্বন্ধে হলেও দেশের ভোটাররা কিন্তু চরম বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়েছে কোন বাগাড়-ম্বরে এরা প্রভাবিত হননি। দেশে যে দল স্থিতি-শীল সরকার গঠন করতে পারে, তাদেরই লোকেরা সমর্থন করেছে। বিকল্প নেতৃত্ব দেবার যোগ্যতা যাদের নেই তাদের মানুষ প্রত্যাখ্যান করেছে। পশ্চিমবাংলার ব্যাপারে এ কথা অনেকাংশে সত্য। এখানকার কংগ্রেস (ই) দলের মধ্যে ঝগড়াঝাটি দেখে এখানকার মানুষ তাদের পুরা সমর্থন করেনি। ভারতের অন্যান্য ক্ষেত্রেও তাই মানুষ বিরোধীদের সমর্থন করেনি। সর্বক্ষেত্রে এবং সব সময়ই দলাদলি করে, যদি এরা আসন লাভ করে পাঁচ-মিশালী সরকার গঠনও করে, তবে তার কি ফল হয়, প্রথাত জনতা সরকারের বিফলতাজনিত দুঃখজনক অভিজ্ঞতার কথা দেশের মানুষ মনে রেখেছে। তাই তারা যে দল স্থিতিশীল ও দক্ষ

সরকার গঠন করবে তাদেরই সমর্থন করেছে। এ শিক্ষা বিভিন্ন রাজনৈতিক দলগুলি গ্রহণ না করে, আবোল-তাবোল বকে যাচ্ছে। বিরোধী অভিমত সুস্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছে। বাম্রা দিবে কোন কাজ হবে না, এটা না বুঝলে এদেশে বিরোধী দলের ভবিষ্যৎ অন্ধকারাচ্ছন্নই থাকবে। অথচ বিরোধী দলের অস্তিত্ব গণতন্ত্রের সফল রূপায়ণের জন্য অপরিহার্য্য।

●

পৌরসভা নির্বাচনে পশ্চিমবঙ্গের দলগুলির ফলাফল

বিগত ৩১ তারিখে সারা রাজ্যে ৮৭টি পৌরসভার নির্বাচন হল। ১৮৮৯ আসন প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয়। এই নির্বাচনের ফলাফলে দলগুলির পরিস্থিতি যা দেখা যাচ্ছে—তা এই। কংগ্রেস (ই) এই পৌরসভা নির্বাচন বয়কট করেন। মোট আসন—১৪৮৯

সমগ্র বাম জোটের ফল			**বাম বিরোধী দলসমূহ**		
বামফ্রন্ট			আঃ কংগ্রেস—	৩২	আসন
সি, পি, এম—	৬৯০	আসন	জনতা পার্টি—	১৯	
ফরোয়ার্ড ব্লক—	৫৪		ভারতীয় জনতা পার্টি—	১৩	
আর, এস, পি—	৫৪		লোকদল—	৮	,,
ফরোয়ার্ড ব্লক (মাঃ)—	৫	,,			
	মোট ৮০৩	আসন		বাম-বিরোধী মোট ৬৮	আসন
বাম জোটের শরিক			**নির্দল**		
সি, পি, আই—	১০৮	আসন	নির্দল প্রার্থী—	৪৭০	আসন
নির্দল (সমর্থিত)—	১৪	,,	**অন্যান্য**		
			অন্যান্য বিভিন্ন দল—	২৬	,,
বাম-জোটের পক্ষে মোট	৯২৫	আসন	বাম-বিরোধী পক্ষসমূহ—	৫৬৪	আসন

ভোট পেয়েছেন বামফ্রন্ট অর্দ্ধেকের কিছু বেশী ; নির্দল তিন ভাগের এক ; বাম-বিরোধী বড় বড় দলসমূহ বাইশ ভাগের এক ভাগ।

ভ্রান্ত প্রগতি প্রতিক্রিয়ার জনক

বংশীধর বন্দ্যোপাধ্যায়

এদেশের একদল তথাকথিত প্রগতিশীল মানুষ স্বদেশের ঠাকুরের চেয়ে বিদেশের কুকুরের বেশী মর্য্যাদা আছে বলে মনে প্রাণে বিশ্বাস করেন। এঁদের হীনমন্যতাই এর কারণ প্রধানতঃ। এদেশ স্বাধীন হয়েছে, তবুও বিলাত আমেরিকার কথা বলতে গেলে এঁদের জিভে এখনো জল আসে ও গর্বে বুক ফুলে দশ হাত চওড়া হয় যে কি প্রকারে তা বিস্ময়ের বিষয়। অনুরূপভাবে আর একদল মানুষ যারা নিজেদের গায়ে প্রগতির ছাপ মেরে ঘুরে বেড়ায়, তারা সব সময়েই রাশিয়া চীন ও অন্যান্য তথাকথিত সাম্যবাদী রাষ্ট্রের গুণগানে পঞ্চমুখ। শেষোক্তদের দৃঢ় বিশ্বাস যে, সাম্যবাদী দেশগুলিতে স্বরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। চীন বা রাশিয়ার বসবাসকারীদের খাওয়া-পরার কোন অভাব নেই। উপরোক্ত ঐ দুই দেশের মানুষদের মধ্যে কোন কুসংস্কার নেই এবং তারা সকল প্রকার কলুষ হতে মুক্ত। সমাজ তাদের কায়েমীস্বার্থ ও শোষণবাদ হতেও বহুদূরে অবস্থিত, কারণ শিষ্ট সরকার ঐ সব দেশে এমন ভাবে উৎপাদনের মাত্রা বাড়িয়ে বণ্টন ব্যবস্থায় সুসমতা এনে ও অন্যান্য ন্যায্য ব্যবস্থার মাধ্যমে তথাকার নাগরিকদের সুখের সাগরে অবগাহন করিয়েছে যে তারা আর কোথাও কোন অসুবিধা ভোগ করে না। ফলে নাগরিক চিত্তে তথায় কোন অভাব-অভিযোগের স্থান নেই। উপরোক্ত কল্পনা বিলাসে এদেশীয় তথাকথিত প্রগতিবাদীরা অনুকূল আসল সংবাদ কিন্তু অন্যরূপ ; কারণ প্রকৃতপক্ষে কথিত ঐ সব স্বর্গরাজ্যে প্রচণ্ড হানাহানি, সীমাহীন বৈষম্য ও দারুণ অশান্তি সদা সর্ব্বদা দেগেই আছে এবং পৃথিবীর অন্যান্য দেশে সেই সব চিত্রের বিকৃত রূপের প্রকৃত ঘটনাবলী প্রায়শই প্রকাশ হয়ে পড়ছে। বিশ্বের বিভিন্ন সংবাদ সংস্থার দাক্ষিণ্যে। সত্যকে অস্বীকার করলেই সত্য মিথ্যা হয়ে যায় না। সত্যের একটা বিশেষ শক্তি আছে, যা কিছুকাল গোপন করা গেলেও চিরকাল গোপন করা যায় না। ফলে নিষ্ঠুর সত্য একদিন না একদিন প্রকাশ হয়েই পড়ে প্রকৃতির অমোঘ বিধানে, যাকে বার বার গোপন করা অসম্ভব সবার পক্ষেই।

এদেশে বসে থেকে চীন-রাশিয়ার উদ্দেশ্য প্রণোদিত মিথ্যা প্রচারে মুগ্ধ হয়ে ওদের সম্বন্ধে অনেককিছু ভাবা যায় যা আসলে সত্য নয়। আবার নিজ নিজ মানসিকতাও কল্পনা বিলাসী হয়ে চীন বা রাশিয়ার সব কিছুকেই ভাল বলে গ্রহণ করে। তথাকথিত প্রগতিবাদীরা ভারতের সব কিছুকে মন্দ ভাবে, কারণ ভারত যে একনায়কতন্ত্রী দেশ নয় এবং সে কারণেই দেশের মধ্যে পঞ্চম বাহিনীর গোপনের ভারতরাষ্ট্র কোন রূপ শাস্তি দিতে পারে না, গণতন্ত্রের মর্য্যাদাহানির আশঙ্কায়। ফলে ঐ সব প্রগতির ধ্বজাধারীরা এদেশের সকলপ্রকার সুযোগ ও সুবিধা গ্রহণ করে আত্মস্বার্থে, আর বিদেশের মতলবে এদেশের মানুষকে বিপথগামী করার জন্য বিদেশের কাছে টাকা ও বাহবা পায়। তবুও এদের সম্বন্ধে ভারত সরকার কোন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করে না, যেহেতু রাষ্ট্রনায়করা গণতন্ত্রে বিশ্বাসী ও উদার চরিত্রের। চীন বা রাশিয়ায় যদি এরূপ সরকার বিরোধী কোন আলাপ-আলোচনা বা কোন কার্য্যকলাপ বা সরকারের ভুল ও ত্রুটি দেখিয়ে

কোন সমালোচনা করা হয়, তবে তখনই ঐ ধরণের দেশদ্রোহী মানুষদের তখনকার সরকার ভারতের মত কথা কয়ে না। চীন বা রাশিয়ার তখনকার সরকারের সমালোচনার মুখর ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের জন্য কারাবাস, নির্বাসন ও মৃত্যুদণ্ডের ব্যবস্থা আছে। চীন বা রাশিয়া উভয়েই একনায়কতন্ত্রী সরকার বা স্বৈরতন্ত্রী সরকারের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। ওখানে এক দলীয় শাসন ব্যবস্থা এমন নিরঙ্কুশ ও এত ক্ষমতাশালী যে প্রতিবাদের মৌল অধিকার প্রয়োগ করতে যাওয়া নিছক বিপদ ডেকে আনা বা চরম মূর্খতা ছাড়া অন্য কিছু নয়। ঐ সব দেশে সরকারীদলের খাতায় নাম না লেখালে সাধারণ মানুষ যত জ্ঞানী বা গুণী হোক না কেন কিছুতেই উন্নতি করতে পারবে না।

দলই ওখানে সব, দলকে বাদ দিয়ে কোন কিছুই করা অসম্ভব। আমাদের দেশে দলের চেয়ে দেশ বড়, কিন্তু চীন বা রাশিয়ার দেশের চেয়ে অর্থাৎ দেশবাসীর চেয়ে দলের প্রাধান্য ও প্রতিপত্তি অনেক বেশী ; যেহেতু ওরা স্বৈরতন্ত্রে বিশ্বাসী, আমাদের মত গণতন্ত্রের পূজারী নয় কোন সময়েই।

রাজনৈতিক ক্ষমতার দখল নিয়ে দলের মধ্যেই যেয়োযেয়ী চলে, শাসককুলের মধ্যেও অন্তর্দ্বন্দ্ব ও কলহ হয় যাকে মধ্যে বা বাইরে থেকে জানবার উপায় নেই। ঐ সব তথাকথিত স্বর্গরাজ্যে মানুষের ব্যক্তি স্বাধীনতা বলে কোন অধিকার স্বীকৃত নয় আজও, যদিও তারা বেকারী, অনশন ও অচিকিৎসার হাত থেকে কিছুটা মুক্ত সরকারী সহায়তায়। ভারতের মানুষ ঠিক যেন বনের পাখী, তার স্বাধীন সত্তা আছে, তার স্বাধিকার আছে, তার মৌলিক অধিকার আছে চলনে বলনে, চিন্তায়-ভাবনায়, ভাষণে, সভাসমিতি গঠনে। বাক্-স্বাধীনতা তার অঙ্গের ভূষণ। অপরপক্ষে চীন বা রাশিয়ার মানুষ খাঁচার পাখী, তার খাওয়া পরার তেমন চিন্তা নেই কিন্তু তার ব্যক্তি স্বাধীনতা সীমিত বা প্রকারান্তরে নেই বললেই ঠিক বলা হবে, কারণ তার প্রতিবাদের কোন অধিকার নেই। সরকারী যন্ত্রের সে দাস মাত্র। সরকারের কোন অন্যায় বা অত্যাচারের বিরুদ্ধে কথা বলার বা সভাসমিতি করার বা কোন প্রবন্ধ প্রকাশ করার তার কোন অধিকার নেই ঐ সব স্বৈরতন্ত্রী দেশে। তবুও এদেশের কিছু মানুষ চীন ও রাশিয়ার মত পরাধীনতার অন্ন-সুখ চায়, কারণ তাদের কাছে পেটের ভাত ও পরণের কাপড় বেশী মূল্যবান। কয়েক হাজার বছরের দাসত্বে অভ্যস্ত এদেশীয় মানুষেরা দাসত্বের গ্লানি যাকে ভুল করে মহিমাই বুঝে, স্বাধীনতার মর্য্যাদা এদের অনেকের কাছেই অর্থহীন ; নচেৎ চীন বা রাশিয়ার মানুষের মত তারা দাসজীবন কামনা করে কেন? স্বাধীন মানুষের মর্য্যাদা যে কত উচ্চ স্তরের তা এখানের তথাকথিত প্রগতিবাদীরা বুঝেও বুঝতে চায় না, কারণ হয় তারা চীনের আফিম ভক্ত আর না হয় রাশিয়ার ভদ্‌কা ভক্ত।

এই অহেতুক ভক্তি তাদের সর্ব্বনাশের পথে পরিচালিত করছে। তারা পথ ভ্রষ্ট, তারা সম্বিত হারা যাযাবরের দল। তারা নিজেদের কিসে মঙ্গল আর কিসে অমঙ্গল তাও জানে না বা জানতে চায় না। নিশিতে পাওয়া লোকের মত তারা অন্যের ইচ্ছাদাস, তাদের হিতাহিত জ্ঞান নেই, তাই তারা কেউ চীন কেউ বা রাশিয়ার মুখ চেয়ে বসে আছে।

তারা চীন বা রাশিয়ার সাহায্যের আশায় আজ হতাশ হয়ে দিন গোনায় সদা ব্যস্ত। তারা যে আসলে প্রতিক্রিয়াশীল এবং কোন মতেই প্রগতিশীল নয় এটা তারা কিছুতেই স্বীকার করতে রাজি

নয়, কারণ তারা কমিউনিজমের মিষ্ট গন্ধে ভরা নেশায় বুঁদ হয়ে আছে বহুকাল ধরে। কমিউনিজম কথা বেশ গালভরা, আর তাতেই অনেকে এদেশে বেশ মজে আছে।

কমিউনিষ্ট শাসিত দেশের বাস্তব চেহারা যে কি ভীষণ, কত যন্ত্রণাদায়ক ও কিরূপ মারাত্মক তা এদেশে বসে থেকে বোঝা শুধু কঠিন নয়, প্রায় তা অসম্ভব, কারণ স্বাধীন চেতা চিন্তানায়ক বা স্বাধীন-চেতা সমাজ সংস্কারক বা প্রকৃত দেশহিতৈষী মানুষের ওখানে কারাবাস, দুঃসহ নির্যাতন ভোগ অথবা গুলি খেয়ে মরার ঘটনা প্রায়ই সংবাদে প্রকাশ পায় বা লোমহর্ষক ও অচিন্তনীয় এদেশের চিন্তানায়ক ও মানবতাবাদী প্রকৃত স্বদেশ প্রেমীদের কাছে। তাঁরা ঐরূপ স্বৈরতন্ত্রী শাসন ব্যবস্থাকে কোনক্রমেই সমর্থন করতে পারেন না, মনুষ্যত্বের অপমৃত্যুর কারণেই। চীন বা রাশিয়ার স্বাধীন মতামত প্রকাশ করার ক্ষমতা বা অধিকার কারো নেই। ছাঁচে গড়া মানুষ ঐ সব দেশে বাস করে।

ব্যক্তি স্বতন্ত্র বা ব্যক্তি স্বাধীনতা নেই ঐ সব দেশে। রাষ্ট্রনায়করাই ওখানে মানুষকে কলের পুতুলে পরিণত করেছে নির্ব্বাসনের, নির্য্যাতনের ও হত্যার ভয় দেখিয়ে। ফলে ওদেশের মানুষ এমন কি বুদ্ধি-জীবিরাও রাষ্ট্রনায়কদের তথা সরকারের হুকুম ও পরামর্শ মতই কাব্য, সাহিত্য, নাটক, রসরচনা, প্রবন্ধ, রম্যরচনা ইত্যাদি লেখে ও প্রকাশ করে। ওদেশে সরকারী নিয়ন্ত্রণের বাইরে কোন কিছু লেখা বা প্রকাশ করা যায় না। ফলে যা কিছু লেখা ও প্রকাশ হয় তা সবই ছাঁচে ঢালা প্রায় একই বস্তু এবং একই উদ্দেশ্যের ফসল স্বরূপ দেখা যায়। ব্যতিক্রম হলেই দণ্ডভোগ করতে হয় ওদেশের বুদ্ধিজীবিদের।

'ডঃ জিভাগো' বইয়ের লেখক 'প্যাস্তারনাক' নোবেল পুরস্কার লাভে বঞ্চিত হন রাষ্ট্রনায়কদের তথা স্বদেশীয় সরকারের স্বৈরতন্ত্রী হুকুমনামার ফলে। উপরোন্ত তাঁকে রাশিয়া থেকে বিতাড়িত করা হয় ঐ বই লেখা ও প্রকাশ করার জন্য। এতবড় ঘটনা সারা পৃথিবীতে আন্দোলন সৃষ্টি করলেও রাশিয়া তার সেই পুরাতন স্বেচ্ছাচারী শাসন ব্যবস্থা আঁকড়ে আছে ও মানুষের স্বাধিকার পদে পদে পদদলিত করে চলেছে আজো। ভারতের মানুষ কি লোভ ও কোন বিবেকের শাসনে এরপরও ঐ সব দেশের দিকে প্রলুব্ধ হয়ে চেয়ে আছে আজো?

ভারতের যে বিরাট ঐতিহ্য ও মহান আদর্শ আজো বিদ্যমান তা কি কারো চেয়ে নিকৃষ্ট? না তা নয়, বরং সর্ব্ব বিষয়ে তা উৎকৃষ্ট অন্যান্য বহু দেশের তুলনায়। ভ্রান্ত দৃষ্টিই ঐ সব প্রগতির ধ্বজাধারীদের ভুল মানসিকতার মূলে ক্রিয়াশীল; তাই তারা ঐরূপ মিথ্যার পিছনে ধাবমান অকারণ। তাদের চৈতন্যোদয় হবে আর কবে? তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ যদি একান্তই এদেশের ঘাড়ের ওপর সংঘটিত হবার উপক্রম হয়, তখন দেখা যাবে যে চীন তার সমস্ত শক্তিকে একত্রিত করে ভারতের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান পাকিস্তানের সহায় হবে, আমেরিকার আজ্ঞাবহ বা তল্পিবাহকরূপে, কারণ চীন বর্তমানে রাশিয়ার প্রধান শত্রু ও আমেরিকা এবং পাকিস্তানের পরম মিত্র। তখন দুই তথাকথিত সাম্যবাদীদেশ দুই পৃথক শিবিরে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হবে আপন আপন জাতীয় স্বার্থ চিন্তায়।

'দুনিয়ার মজদুর এক হও' স্লোগান মাঠে মারা যাবে, আর 'চাচা আপন প্রাণ বাঁচা' বলে চীনও চিৎকার জুড়ে দেবে এবং রাশিয়াও ঠিক তাই করবে। দু দুই দেশের আন্তর্জাতিকতার মুখোস তখন খসে

পড়বে, আর কমিউনিষ্ট দুনিয়ার দুই শক্তিশালী গোষ্ঠি পরস্পর হানাহানি শুরু করবে জাতীয়তাবাদের জিগির তুলে। ফলে আমেরিকার 'পোয়া বার'।

সারা বিশ্ব কমিউনিষ্টদের ঐরূপ আত্মঘাতী লড়াই দেখে বুঝবে যে, ১৯১৭ সাল থেকে কমিউনিজমের প্রবক্তারা যে সব আন্তর্জাতিকতার বুলি আওড়ে আসছিল তা সবই ভূয়া ও মিথ্যা প্রচার মাত্র। কমিউনিস্ট দুনিয়ার আসল কাজের চেয়ে বিভ্রান্তিকর ও উদ্দেশ্য প্রণোদিত মিথ্যা প্রচারের ঢক্কা নিনাদ খুবই জোরদার, আর সেই নিনাদে বিভ্রান্ত ও মুগ্ধ হয়ে এদেশের কিছু লোক আহ্লাদে আটখানা। তারা খতিয়ে দেখে না বা দেখতে চায় না যে ঐরূপ উদ্দেশ্যমূলক প্রচার কত ক্ষতিকর ও বিভ্রান্তি সৃষ্টিকারী। রাশিয়া এবং চীন উভয়েই সাম্রাজ্যবাদী বৃহৎ শক্তিগুলির চেয়ে কোন অংশে কম সম্প্রসারণবাদী নয়, বরং বেশী, আর তা আজ বেশ প্রকট হয়ে পড়েছে।

ওদের মুখের কথা আর মনের কথা এক নয়, বরং ঠিক বিপরীত ও পরস্পর বিরোধী বলে বাস্তবে দেখা যায়। ওদের বহু ঘোষিত নীতিও ওরা কার্য্যক্ষেত্রে মানে না এমনই স্বার্থান্ধ ও স্বৈরতন্ত্রী ওরা সর্ব্বকর্মে, সর্বচিন্তায় ও প্রতিটি পদক্ষেপে। তাই উভয়েই উভয়ের ক্ষতির চিন্তায় ও ধ্বংস সাধনে সদা তৎপর। আমেরিকা সুযোগ বুঝে তাই চীনকে বন্ধু রাষ্ট্র হিসাবে সাদরে গ্রহণ করেছে রাশিয়াকে বিপদে ফেলার ও প্রয়োজনবোধে তার ধ্বংস সাধনের উদ্দেশ্যে। চীন আমেরিকার কূটবুদ্ধির কাছে নিতান্ত বালসুলভ চপলতায় মত্ত একটি শিশুরাষ্ট্রের ভূমিকায় হিল্লোলিত ও আন্দোলিত।

এর পরিণাম যে কি ভয়ানক ও কত সুদূরপ্রসারি তা চীন এখনো খতিয়ে দেখবার কথা মন দিয়ে চিন্তা করেনি, কারণ সে বিষের বিষে জর্জর ও সম্বিৎহারা। তার একটাই বাসনা. আর তা হচ্ছে আমেরিকার সাহায্যে ও অস্ত্রশক্তিতে বলিয়ান হয়ে রাশিয়ার বিরুদ্ধে শক্ত হয়ে দাঁড়ান, যাতে রাশিয়া ভয় পেয়ে চীনকে তার দখলিকৃত ভূভাগ প্রত্যার্পণ করে অনতিবিলম্বে।

আমেরিকা কিন্তু পৃথিবী থেকে কমিউনিজমের তীব্র বিষাক্ত বীজ চিরতরে অপসারিত করার জন্যই কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলার অবশ্যকতা বিবেচনায় চীনের সঙ্গে সখ্যতা ও রাশিয়ার সঙ্গে শত্রুতার ধীর পদে বিচক্ষণতার সাথে অগ্রসর হতে সবে শুরু করেছে। এর শেষ যে কোথায় এবং তা যে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের সূচনা করবে না তা কে বলতে পারে। তবে অবস্থা দিন দিন যেরূপ ঘোরাল হয়ে উঠছে ও তার ফলে বিপদ আসন্ন সে বিষয়ে কোন আর সন্দেহ নেই।

রাশিয়ার সর্বহারার দল চীনের সর্বহারার দল থেকে যে পৃথক শ্রেণীভুক্ত তা এতদিন জানা ছিল না। উভয় দেশের শ্রেণীসংগ্রামীরাও যে আসলে সুযোগ বুঝে ধনিক শ্রেণীর বন্ধুত্ব কামনা করে আত্মস্বার্থে তা আজ বেশ পরিষ্কার ভাবে প্রকাশ হয়ে পড়েছে। ভাঁওতাবাজের দল আর কতদিন ভাঁওতাবাজী করে অন্যান্য গণতান্ত্রিক দেশগুলির জনগণকে এভাবে আর অন্ধকারে সুপ্তিমগ্ন করে রাখবে শুধু বাকচাতুরী আর ভুল ইজমের দোহাই দিয়ে? সর্বহারাদের একনায়কতন্ত্রী সরকারগুলি যে আসলে অনুসৃতনীতি মানে ও তাদের অনুকরণ করে পররাজ্য গ্রাসের দুরন্ত নেশায়, সে ব্যাপারে চীন ও রাশিয়ার দিকে লক্ষ্য রাখলেই সহজে হৃদয়ঙ্গম হয়। চীন ও রাশিয়ার শাসক শ্রেণী যে প্রকৃতই সুবজোয়া তাদের

আচার আচরণে, তা আজ সবাই জানে। একথা অবশ্য স্বীকার্য যে, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার ক্ষেত্রে সোভিয়েট রাশিয়া বেশ কিছু উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি দেখাতে সক্ষম হয়েছে। পরমাণুবিদ্যার ক্ষেত্রে চীনও কিছুটা সফল।

চীন ও রাশিয়ার মধ্যে বিবাদ বাঁধিয়া না গেলে হয়তো বা উভয়েই অন্যের উন্নত ধরনের মারণাস্ত্রে বলিয়ান হয়ে উঠতো, কিন্তু প্রকৃত মানবতার, দর্শনের ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে ওরা কেউই উন্নত হয়ে উঠতে সক্ষম হতো না। ওদের দৃষ্টি আচ্ছন্ন তাই ওরা বস্তুবাদের অনুদারি, ভাববাদের নয়। প্রখ্যাত মানবদরদী সাহিত্যিক সোলঝেনিৎসিন তাঁর সাহিত্য প্রতিভাকে সুরক্ষার জন্য অতি গোপনে রাশিয়া থেকে পালাতে বাধ্য হন. রাশিয়ার সাম্যবাদী শাসকদের রক্তচক্ষু ও ঘৃণ্য অত্যাচারের হাত থেকে বাঁচার তাগিদে।

চীনের মহান নেতা মাও-সে-টুং যাঁকে এখন মাও জে দং বলা হয়, তিনি চীনের প্রভূত কল্যাণ সাধন করেন. কিন্তু তাঁর মৃত্যুর পরেই চীনে যে সব অবাঞ্ছিত ঘটনাবলি সংঘটিত হল তাতে পরিষ্কার ভাবে প্রকাশ হয়ে পড়ল যে 'ভাচাও' অর্থাৎ গাধার সঙ্গীতন যাতে ভুল ও নিন্দা সংখ্যাতত্ত্ব দিয়ে চীনের মানুষকে ঘুম পাড়িয়ে রাখা হতো তা নিছক তথাকথিত প্রগতিবাদীদের মিথ্যাপ্রচার ও বিভ্রান্তি সৃষ্টিকারী অপপ্রয়াস ছাড়া আর কিছু নয়। ফলে 'ভাচাও' এখন বন্ধ, যেহেতু চীনের বর্তমান শাসককুল মাও জে-দং এর চেয়ে বেশী প্রগতিশীল বলে নিজেদের জাহির করে।

চীন ও রাশিয়ার ভূতপূর্ব প্রগতির ধারক ও বাহকরা যাঁরা একদিন চীন ও রাশিয়াকে কিছুটা উন্নত করতে সক্ষম হন এবং ঐ দুই দেশের শাসনকার্য পরিচালনায় যাঁরা বিশেষ দক্ষতা দেখাতে সক্ষম হন. তাঁরা আজ নিজ নিজ দেশবাসীর ও বর্তমান শাসককুলের কাছে নিতান্ত প্রতিক্রিয়াশীল আখ্যায় ভূষিত ও জনচিত্ত হতে নির্বাসিত কেন? স্টালিনকে তার পূর্ব কবর থেকে তুলে এনে কোথায় সমাহিত করল তার দেশবাসী এবং কেন? মহান লেনিনের রাজনৈতিক উত্তরাধিকারীর মৃত্যুর পরে ঐরূপ ঘৃণ্য দশা হয় কেন?

মাও-জে-দং এর স্ত্রীর দুর্দশা পৃথিবী আজ জানে। স্বয়ং মাও-এর (কিছুদিন পরে) কবরখানায় বর্তমান চীন শাসকরা হানা দেবে না তো? বিগত দিনের প্রগতিশীলরা বর্তমানের বিচারে প্রতিক্রিয়াশীল কেন? ভ্রান্ত প্রগতিশীল ব্যক্তিরাই প্রতিক্রিয়া সৃষ্টিকারী। তাদের ধ্বংস অনিবার্য তাই।

———

রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্র নাথের স্মৃতি কথা

["A Nation In Making" গ্রন্থ থেকে অনুবাদ]

অনুবাদক—অধ্যাপক নলিনীমোহন দাশগুপ্ত

মন্ত্রীরূপে আমার কাজকর্ম [পূর্বানুবর্তন]

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

তিনি বললেন :

'জনগণের মধ্যে বিক্ষোভ দেখা দেওয়া সত্ত্বেও আমাদের জনপ্রিয় মন্ত্রিগণ কিছু করার আবশ্যকতাই বোধ করলেন না ; অথচ আমরা তাদের কাছ থেকে কতই না আশা করে আসছিলাম। আমরা আশা করেছিলাম যে তারা নিজেরা ঘটনাস্থলে গিয়ে সব দেখবেন। কিন্তু তারা তা করলেন না। তারা কুলিদের দুঃখ কষ্ট লাঘবের জন্য কিছুই করলেন না, যদিও স্যার হেনরি হুইলারের রিপোর্টেই দেখা যায় যে তা নিদারুণ দুর্ভাগ্যের মধ্যে দিন কাটাচ্ছে। আর আমাদের জনপ্রিয় মন্ত্রী মহাশয়গণ কিছুই করলেন না।'

মাননীয় সদস্য মহাশয় তার বক্তব্য শেষ করে আসন গ্রহণ করা মাত্রই আমি উঠে দাঁড়িয়ে তার বিবৃতিকে চ্যালেঞ্জ করে বললাম :

'মাননীয় সদস্য মহাশয় বারে বারেই একই কথা বলে আসছেন যে মন্ত্রীগণ কিছুই করেন নি। আমি এই উক্তির প্রতিবাদ করছি। মাননীয় সদস্য মহাশয়ের জানা উচিত ছিল যে যেইমাত্র আমি চাঁদপুর মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যানের কাছ থেকে জানতে পারলাম যে সেখানে কলেরা দেখা দেওয়ার সম্ভাবনা আছে, সেই মাত্রই আমি কুলিদের দেখা শুনা করার জন্য ৬০০০ টাকা এবং নয়জন ডাক্তারকে সেখানে পাঠাই। তথাপি আমার মাননীয় বন্ধুবর বলে আসছেন যে আমরা কিছুই করিনি—যেন বারে বারে বলে একটা মিথ্যাকে সত্য বানাতে পারবেন।'

আমার চ্যালেঞ্জের ফলে বন্ধুবর এই বলে নতি স্বীকার করলেন যে 'আমি তা জানতাম না।'

এই সম্পর্কে আর একটি ঘটনার কথা বলে আমার স্মৃতিচারণের এই অধ্যায়টি শেষ করব।

১৯২২ সালে এক প্রবল বন্যা উত্তরবঙ্গে এক দারুণ বিপর্যয়ের সৃষ্টি করে। বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে বহুলোক সে বন্যায় মারা যায়। সে সময়টায় সরকারী কাজকর্ম দার্জিলিং থেকে পরিচালিত হত। সরকারের সদস্য হিসাবে আমি তখন দার্জিলিংয়ে ছিলাম। সেখানেই কলকাতা মিউনিসিপ্যাল বিল সম্পর্কে আলোচনার জন্য সিলেক্ট কমিটির সভা ডাকা হয়েছিল। কয়েকজন বন্ধু দার্জিলিংয়ে আসার সময় পথে রেল লাইনের ধারে বন্যার বিধ্বস্ত অঞ্চলের ভয়ঙ্কর দুরবস্থা লক্ষ্য করেন। তারা আমাকে ঘটনাস্থলে গিয়ে সব দেখার জন্য বলেন। এক্ষেত্রে ও সেই চাঁদপুরের ঘটনার মত একই অবস্থার মধ্যে পড়ে গেলাম। কারণ যে দপ্তর আমার এক্তিয়ার ভুক্ত নয়। আমার মনে প্রবল ইচ্ছা হল যে ঘটনাস্থলে গিয়ে সব দেখে যদি কিছু করতে পারি, করব। তখন পর্যন্ত যতটা খবর পেয়েছি তাতে জানতে পারলাম যে প্রয়োজনীয় চিকিৎসা-পত্রের ব্যবস্থা ইতিপূর্বেই করা হয়েছে।

কিন্তু আমার মনে হল যে আমি যদি একবার সেখানে যাই তা হলে আমাদের কাজের লোকদের মধ্যে উৎসাহের সঞ্চার হবে এবং কিছু প্রয়োজনীয় তথ্যও সংগ্রহ করতে পারব। মনস্থির করে—আমি মহামান্য গভর্ণর বাহাদুরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তার অনুমতি প্রার্থনা করলাম। সঙ্গে সঙ্গেই তিনি অনুমতি দিলেন।

পরের দিন কয়েকজন বন্ধুকে সঙ্গে নিয়ে আমি সেখানে গেলাম। এদের মধ্যে তিনজন ছিলেন লেজিসলেটিভ কাউন্সিসিলের সদস্য। প্রচণ্ড রৌদ্রের মধ্যে আমরা ট্রলিতে করে কুড়ি মাইল পথ ভ্রমণ করলাম। রেল লাইনের দু ধারে সমস্ত অঞ্চল জলে ডুবে আছে, আর স্থানে স্থানে মৃত পশুর দেহগুলি জলে ভাসছে। সমস্ত অঞ্চলটি সংক্রামিত হয়ে গেছে। এ একটা বীভৎস ও করুণ দৃশ্য। ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ রিড আমার সঙ্গে গিয়েছিলেন। তিনি আমাকে আমি যা যা জানতে চাইলাম, সব জানালেন।

পরের দিন দার্জিলিং ফিরে গিয়েই তৎক্ষণাৎ কলকাতা মিউনিসিপ্যাল বিল সম্পর্কে সিলেক্ট কমিটির আলোচনায় যোগদানের জন্য তাড়াতাড়ি করে সভাস্থলে গেলাম। এই কঠোর শ্রম আমার সহ্য হল না। আমি জ্বরে আক্রান্ত হলাম। সঙ্গে সঙ্গে দেখা দিল ব্রঙ্কো নিউমোনিয়া। এক সময় রোগ এত বেড়ে যায় যে তা আমার ডাক্তারদের আশঙ্কার কারণ হয়ে দাঁড়াল। ডাক্তারগণ আমার যে যত্ন করেছেন তা কখনই ভুলব না। স্যার নীলরতন সরকার খবর পেয়ে তাড়াতাড়ি করে দার্জিলিংয়ে ছুটলেন। স্যার নীলরতন সরকার ছিলেন ভারতীয় ডাক্তারদের মধ্যে সর্বাগ্রগণ্য ব্যক্তি। তৎকালীন অস্থায়ী সার্জেন জেনারেল কর্ণেল উইলসন, মেজর হোসেন সারওয়াদি এবং মেজর কে. কে চাটার্জি আমার সেবা যত্নের জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন।

এখানে স্যার নীলরতন সরকার সম্পর্কে দু একটি কথা বলতে চাই। নীলরতনের বহুমুখী কর্ম-কুশলতা তার জন-হিতকর কাজে আগ্রহের সাক্ষ্য বহন করছে। তিনি কেবলমাত্র একজন ডাক্তারই নন। তিনি একজন শিক্ষাবিৎ, একজন জন-সেবক, একজন সমাজ-সংস্কারক এবং শিল্পোন্নয়নের ক্ষেত্রেও একজন অগ্রপথিক। তার কাজের ক্ষেত্র তার মহান বৃত্তির সীমা ছাড়িয়ে বহুদূর বিস্তৃত হয়ে পড়েছে। নিজের মহান বৃত্তির ক্ষেত্রে তো তিনি এক অলংকার স্বরূপ। তার স্বদেশবাসীর কাছে একটা শিক্ষার বিষয়। ক্যাম্বেল মেডিক্যাল স্কুল থেকে পাশ করে তিনি মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি হন। এ কথা বলা অতিরঞ্জিত হবে না যে তিনি তার মাতৃস্বরূপিণী বিদ্যাদায়িনী প্রতিষ্ঠানের—একটি উজ্জ্বলতম রত্ন। রোগ শয্যায় আমার অবস্থা খারাপ হয়ে পড়েছিল; কিন্তু ভাগ্যক্রমে আরোগ্য লাভ করলাম; আমার সবল শারীরিক গঠন প্রকৃতি ডাক্তারদের চিকিৎসার ব্যাপারে সহায়তা করেছিল। নতুবা, ৭৪ বৎসর বয়সে ব্রঙ্কো নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত হওয়াটা একটা সাংঘাতিক ব্যাপার। কিন্তু এক শ্রেণীর সংবাদ-পত্র আছে যারা কোন মন্ত্রীর কোন ত্যাগ স্বীকারের মধ্যে ভাল কিছু থাকতে পারে, তা স্বীকার করে না। যদি সেই ত্যাগের ফলে মন্ত্রীকে মৃত্যুর দ্বার পর্যন্ত যেতে হয়, তাহলেও তার মধ্যে ভাল কিছু নেই। সেই সংবাদ-পত্রগুলির সমালোচনার উত্তরে যে বন্ধুগণ আমার সঙ্গে উত্তরবঙ্গে গিয়েছিলেন তারা এক প্রেস বিজ্ঞপ্তি দেন। সেই বিজ্ঞপ্তিতে তারা লিখলেন: (চলবে)

Regd No.R. N. 24511/71 | Biplabi Bangla | Regd. WB/NC 77
Phone : 34-1795
বার্ষিক :—সডাক ১৫.০০ টাকা | ষাণ্মাসিক :—৮.০০ টাকা | মূল্য—৩০ পয়সা

পাক সেনাপতি ইয়াহিয়া খানের অত্যাচারবাহিনী যে গ্রন্থ পুড়িয়ে ছাই করে দিয়েছিল বিপ্লব তাপস মহারাজ ত্রৈলোক্যনাথের সেই অবিস্মরণীয় গ্রন্থ "জেলে ত্রিশ বছর ও পরে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম" পুনর্মুদ্রিত হল।

দাম—ত্রিশ টাকা

: প্রাপ্তিস্থান :
খাদি প্রতিষ্ঠান
১৫, কলেজ স্কোয়ার,
কলিকাতা-১২

সম্পাদক—
শ্রীশান্তিশরণ রায়চৌধুরী
।। সম্পাদকমণ্ডলী ।।
শ্রীজগদীশ চট্টোপাধ্যায় (সভাপতি)
শ্রীউপেনচন্দ্র নন্দী
পুষ্প চ্যাটার্জী
, মলয় ঘোষ
প্রকাশক ও মুদ্রক—
শ্রীঅনিল সেনগুপ্ত
বিদেশে বিশেষ প্রতিনিধি—
শ্রীস্বাধীন ঘোষ
ছোলা—
শ্রীনন্দগোপাল পাল

বিপ্লবী পুস্তকমালা

নেতাজীর সিক্রেটসার্ভিস—ডাঃ পবিত্রমোহন রায়—১০'০০
বিপ্লবী মহানায়ক রাসবিহারী—সুবোধ মজুমদার
অনুশীলন সমিতির বিপ্লবী প্রয়াস—ব্রজেন্দ্র দাস

—ক্ষীরোদ কুমার দত্তের—

১। বাংলার অগ্নিযুগ—১'৫০, ২। ঘড়িতাবতে ভারতীয় বিপ্লব প্রচেষ্টা—৮'০০ ৩। অনুশীলন সমিতির ই. ভিহাস—২'০০, ৪। সৌহাটী সংগ্রাম কাহিনী—১'০০, ৫। ডাকোরী ষড়যন্ত্র—১'২৫, ৬। কলতা বাজার সংগ্রাম কাহিনী—'৪০, ৭। রাসবিহারী ও অনুশীলন সমিতি—'৬০ ৮। স্বাধীনতাসংগ্রামে মা ও মেয়ে—'৪০, ৯। বিবেকানন্দ ও সমাজবাদ—'৬০ ১০। বিপ্লবী বিবেকানন্দ—'৫০, ১১। মহারাজ ও সুভাষচন্দ্র—'৪০ ১২। ভারতের নবজাগরণ ও ভগিনী নিবেদিতা—'৭৫, ১৩। দেশ বন্ধুর চোলেনি (১)—১'০০, ১৪। দেশ বন্ধুর চোলেনি (২)—২'০০ ১৫। শহীদ চন্দ্রশেখর আজাদ—'৫০, ১৬। ১৯ই এপ্রিল জাতীয় শহীদ দিবস—১'০০, ১৭। হাজির হত্যা প্রচেষ্টা—'৭৫, ১৮। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও অনুশীল সমিতি—৪'০৫, ১৯। ভারতের জাতীয় পতাকার ইতিহাস—'৫০, ২০। লাট হত্যা প্রচেষ্টা—১'৫০

প্রাপ্তিস্থান :— ৪নং বঙ্কিম দাস ষ্ট্রীট কলিকাতা-৭০০০০৭

নৈশলক্ষ্মী—১/১/১/A বঙ্কিম চ্যাটার্জী ষ্ট্রীট কলিকাতা-৭৩.

মূল কার্যালয়—৪নং বঙ্কিম দাস ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০০৭ শ্রীঅনিল সেনগুপ্ত কর্তৃক প্রকাশিত এবং তৎকর্তৃক প্রিন্টিং পাবলিসিটি, ১১৭, কেশবচন্দ্র সেন ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০০১ হইতে মুদ্রিত।

বিপ্লবী বাংলা

॥ বিপ্লবী পরিষদের সাপ্তাহিক মুখপত্র ॥
স্থাপিত—১৯৫৬, 'বিপ্লবী বাঙ্গালী' নবকলেবরে—১৯৭১

দশম বর্ষ	শনিবার ১৯শে আষাঢ় ১৩৮৮ ৪ঠা জুলাই ১৯৮১	৩৫ সংখ্যা

শ্রেষ্ঠ আচরণ বিধি হইল পরমত সহিষ্ণুতা। কারণ আমরা সকলে একভাবে কখনই চিন্তা করিবনা এবং সত্যকে খণ্ড খণ্ড ভাবে, বিভিন্ন দৃষ্টিকোন হইতে দেখিব। বিবেক কথাটির অর্থ সকলের নিকট সমান নয়, ব্যক্তিগত আচরণের নির্দেশ মানিয়া চলা ভাল বটে, কিন্তু ওই নির্দেশ অন্যের ওপর চাপাইলে অন্যের স্বাধীনতার ওপর অসহনীয় হস্তক্ষেপ করা হইবে।

—মহাত্মা গান্ধী।

সম্পাদকীয়

গাড়ওয়াল কেন্দ্রে পুনর্নির্বাচন

উত্তর প্রদেশের গাড়ওয়াল কেন্দ্রে উপনির্বাচন সম্পর্কে মুখ্যনির্বাচন কমিশনার শ্যামলাল শকধর যে হুকুম জারী করেছেন, সেটা নজীরবিহীন। ভারতের দীর্ঘদিন নির্বাচনের ইতিহাসে এ রকম ঘটনা অভিনব। যে কারণে তিনি সমগ্র ভাবে পুনর্নির্বাচনের আদেশ দিয়েছেন, সেটাও অভিনব। নির্বাচন কমিশনারের মতে, উত্তরপ্রদেশ সরকার, তার বিনা অনুমতিতে পার্শ্ববর্তী দু-একটি রাজ্য থেকে নির্বাচনের সময় কিছু পুলিশের সাহায্য নিয়েছিলেন, আসন্নাজনক আইন শৃঙ্খলার পরিস্থিতি আয়ত্তে রাখবার জন্য। এতদিন লোকে জানত কেন্দ্রীয় সরকারের পুলিশবাহিনী বা সেনাবাহিনীর সাহায্য নিতে হলে কেন্দ্রের অনুমতি নিতে হয়। সেটা স্বাভাবিক, কারণ ঐ বাহিনীর লোকেরা কেন্দ্রের অধীনস্থ কর্মচারী এবং কেন্দ্র এই বাহিনীকে অন্যত্র কোন কাজে নিযুক্ত করার অবস্থায় হঠ কোন রাজ্য কিছু না বলে তাদের অন্যত্র ডেকে নিয়ে যায়, তবে একটা বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হতে বাধ্য। অবশ্য যাদের অধীনে এই বাহিনী কাজ করে, তাদের অনুমতি ব্যতীত তারাও অন্যত্র যেতেও রাজী হবে না। কিন্তু অন্য রাজ্যের পুলিশ ত সেই রাজ্যের কর্তৃপক্ষেরই শাসনাধীন তাদের অনুমতি নিয়ে, কোন রাজ্য তাদের আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার কাজে নিয়োজিত করার অধিকার আছে বলেই সাধারণ বুদ্ধিতে আপত্তিকর মনে হবার কোন সঙ্গত কারণ আছে বলে মনে হয় না। এক রাজ্যের পুলিশ অন্য রাজ্যে আমদানী করা যাবে না। নির্বাচন কমিশনারের অনুমতি ব্যতিরেকে, এ যুক্তিটা দুর্বোধ্য। নির্বাচন কমিশনের কাজ ত অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন সমাধা করার মধ্যেই নিহিত এবং সীমাবদ্ধ। তবে এই সব পুলিশবাহিনী যদি অবাধ নির্বাচনকে কোন প্রকারে বাধা দিয়ে থাকে, তবে নির্বাচন কমিশনার নিশ্চয়ই আপত্তি তুলতে পারেন। কিন্তু বর্তমান ক্ষেত্রে নির্বাচন কমিশনার ত সে কথা বলেন নি। শুধু একটি technical ত্রুটির কথাই বলেছেন। সেটা হল, ভিন্ন রাজ্য থেকে পুলিশ আনার আগে তার অনুমতি নেওয়া হয়নি। তার অনুমতি নেওয়া হলেই নির্বাচন সব দোষ-ত্রুটি মুক্ত হত, এই তার বক্তব্য? এই বিতর্কিত আইনের দিকে এতটা বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে, গোটা নির্বাচনকে বরবাদ করে দেওয়ার যুক্তিটা খুবই দুর্বল বলেই চিন্তাশীল মানুষেরা মনে করেন।

সংবিধান এবং প্রচলিত আইনে কোথাও নির্দেশ নেই যে অন্য রাজ্য থেকে পুলিশ আনতে হলে ইলেকসান কমিশনের অনুমতি নেওয়া বাধ্যতামূলক। সংবিধানের ২৪ অধ্যায় এবং ৩২৪ (১) ধারাতে এমন কোন নির্দেশ নেই। কিন্তু ৪৮ ধারাটি তাকে পুনর্নির্বাচনের আদেশ দেবার অধিকার দিয়েছে কয়েকটি ক্ষেত্রে, যেমন বাইরে থেকে কারচুপি এবং এমন কোন বিধি বহির্ভূত কাজ করা, যার ফলে

অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন ব্যাহত হয়েছে। শ্রীশাকদের কিন্তু এই সব যুক্তি দেখাননি। শুধুমাত্র তার ব্যতীত অন্য রাজ্যের পুলিশের উপস্থিতিকেই দায়ী করেছেন। কিন্তু সেক্ষেত্রে আইনের ৫৮ ধারার প্রয়োগের কোন যুক্তি নেই। সুতরাং শ্রীশাকদেরের নির্দেশ দুর্বল ও অসমর্থনযোগ্য বলে মনে করছেন অনেকেই। হেলিপ্যাড না পাওয়ার জন্য শ্রীশাকদের রুষ্ট হয়েছিলেন এবং উত্তরপ্রদেশ সরকারের বিরুদ্ধে অসহযোগের অভিযোগও তুলেছিলেন। কিন্তু সে অভিযোগ অমূলক বলে তিনি নিজেই স্বীকার করেছেন পরবর্তীকালে উত্তরপ্রদেশের বক্তব্য শোনার পর। অথচ তার পুনর্নির্বাচনের আদেশ এই অনুমান নির্ভর অভিযোগ বহুলাংশে প্রভাবিত করেছে, একথা অবশ্যই স্বীকার্য। সে অভিযোগ যেমন শ্রীশাকদের প্রত্যাহার করতে বাধ্য হয়েছেন, অনেকেরই ধারণা পুলিশ আমদানী করার ক্ষেত্রেও তার ধারণা ভুল বলে প্রমাণিত হবে। তা ভিন্ন, বহুগুণাজীর বক্তব্য তিনি শুনেছেন, কিছুটা পরিমাণে, অনুসন্ধানও করেছেন, যদিও সে সম্বন্ধে কোন মতামত প্রকাশ করেননি। অন্ততঃ পুনর্নির্বাচনের পক্ষে এটাকে কোন যুক্তি হিসাবে খাড়াও করেননি। কিন্তু কংগ্রেস (ই) প্রার্থী কয়েকটি বুথ সম্বন্ধে যে অভিযোগ করেছিলেন, তার কোন তদন্ত না করেই তার রায় দিয়েছেন, এটা ত রীতিমত এক তরফা বিচার। এমন একটা গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেবার আগে, এত তাড়াহুড়া করাটা দুর্বোধ্য। তার বিবেচনার মধ্যে থাকা উচিৎ ছিল যে গোটা পুনর্নির্বাচনের ব্যয়, দেশের ভবিষ্যৎ নির্বাচনকালে একটি নজীর হয়ে থাকবে এবং তার ফলশ্রুতি হিসাবে বহু নতুন সমস্যার সৃষ্টি হবে। আগামী দিনের নির্বাচন বানচাল করার সুযোগও এর মধ্যে নিহিত আছে, বহুলোক আশঙ্কা করছেন।

অভিযোগকারী দল-বদল-বিশারদ মাত্র ৫৯টি বুথ সম্বন্ধে অভিযোগ করেছিলেন। কংগ্রেস-(ই)র তরফ থেকে অভিযোগ করা হয়েছিল মাত্র ১৬টি ক্ষেত্রে। কয়েকশত বুথের নির্বাচন সম্বন্ধে কোন দলের কোন অভিযোগ ছিল না। মাত্র ৭৩টি বুথে বে-আইনী কাজকর্ম হয়েছিল বলে যদি তর্কের খাতিরে ধরেও নেওয়া হয়, তবে বাকী কয়েকশত বুথের নির্বাচনকে বাতিল করার কোন যুক্তি সঙ্গত কারণ থাকতে পারে না। নির্বাচন এদেশে বারবহুল, একটা সামান্য অজুহাতে পুনর্নির্বাচনের আদেশ দিয়ে জনসাধারণের অর্থের অপব্যয় ঘটাবার ব্যবস্থা করা, কোনও দেশপ্রেমিক সমর্থন করতে পারে না। ইলেকশান কমিশন এমন একটি গুরুতর ব্যাপারে, উত্থাপিত অভিযোগ সম্বন্ধে পূর্ণাঙ্গ তদন্ত না করেই, এমন অদ্ভুত আদেশ দিলেন কোন যুক্তিতে? তার ক্ষমতার তিনি অপব্যবহার করেছেন বলে যদি কেউ বলে, তবে কি খুব ভুল হবে? অভিযোগগুলি বিশেষভাবে তদন্ত করার পর, কোথাও কোন ত্রুটি-বিচ্যুতি ঘটে থাকলে, সে সব ক্ষেত্রে পুনর্নির্বাচনের ব্যবস্থা করা অবশ্য করণীয় ছিল। এদেশে পরাজিত দল বা ব্যক্তি নির্বাচনের রায় তাদের বিরুদ্ধে গেলেই, তারা সত্য-মিথ্যা, নানা প্রকারের অভিযোগ তোলেন। যদিও এই সব মানুষ বা দল ক্ষমতাসীন থাকাকালে এই সব অন্যায় কাজ করতে বিবেকের কোন দংশন অনুভব করেন না। কাজেই তাদের অভিযোগগুলি তদন্তের পরই ইলেকশান কমিশন তার রায় দিতে পারেন। তথ্যের উপর ভিত্তি করে। এইটিই ইলে কমিশনের কর্তব্য। তা না করে, তিনি যে আইনের অজুহাত দেখিয়েছেন সেটা অভিনব। অনেকে মনে করেন, তিনি তার ক্ষমতার সীমা লঙ্ঘন করেছেন। এই নজীর ভবিষ্যতে আরো কত সমস্যা করবে কে জানে।

কংগ্রেস(ই) দল কমিশনের রায় মেনে নিয়ে সঙ্গত কাজ করেছেন। তবে এর যে আইনগত প্রশ্ন উঠেছে, তার বিস্তৃত সমীক্ষা হওয়া দরকার। সেটা না হলে, ভবিষ্যতের সব নির্বাচনের ফলাফল, ইলেকসান কমিশনারের ন্যায্য অথবা অন্যায্য হুকুমের উপর নির্ভরশীল থাকবে। সেটা দেশের মানুষ কখনও মেনে নিতে পারেনা। এর একটা ফয়সালা হওয়া উচিৎ।

অনেকে মনে করেন, ইলেকসান কমিশন বিরোধী নেতাদের সমালোচনায় একটু অধৈর্য্য হয়ে পড়েছেন। নিজের নিরপেক্ষতা প্রমাণিত করার জন্য তিনি একটু সীমাতিরিক্ত পদক্ষেপ করেছেন। অথচ লক্ষণীয় এই যে পশ্চিমবঙ্গের নির্বাচনের ব্যাপারে এখনও পর্য্যন্ত তিনি কোন ব্যবস্থা নেননি। এখানকার সমস্ত বিরোধী দলই ত ভোটার তালিকায় কারচুপি. অভিযোগ দাখিল করেছেন তাঁর কাছে। কিন্তু তাঁর তরফ থেকে ত কোন সঙ্গত তদন্ত বা ব্যবস্থা আজো পর্য্যন্ত নেওয়া হয়নি। নির্বাচন কমিশন অবাধ ও পরিচ্ছন্ন নির্বাচন সমাধান করবেন সারা দেশে। তার মধ্যে কোন বিশেষ ক্ষেত্র বেছে নিলে, কমিশনের উপর লোকে যদি আস্থা না রাখতে পারে, তবে দেশের গণতন্ত্রের পক্ষে হবে চরম দুর্দিন। সেটা ঘটলে, নির্বাচন কমিশন যে সুষ্ঠু নির্বাচন করতে চাইছেন এবং যেটা করাই তার প্রধান কাজ, সে উদ্দেশ্যই ত ব্যর্থ হয়ে যাবে। সে দুর্দিন যেন না আসে, এটাই আমাদের দাবী এবং প্রত্যাশা।

প্রসঙ্গত বলতে চাই যে সব বিরোধী দল-নেতারা এই পুনর্নির্বাচন উপলক্ষ্য করে, কংগ্রেস (ই) সরকারের, শুধু রাজ্যেই নয়, কেন্দ্রেও, পদত্যাগ দাবী করছেন, তাদের চিৎকার ও জিগিরের নিন্দা করি।

এই সব হতাশ রাজনীতিবিদ্‌দের ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার এবং নিকট ভবিষ্যতে মূল্য না দিয়ে পুনরাবর্তনের সম্ভাবনা সুদূর পরাহত হওয়ার জন্য মনোবেদনা আমরা বুঝি। কিন্তু যে কোন অজুহাতে একটা স্থিতিশীল সরকারকে যখন তখন পদত্যাগ করার দাবীকে সমর্থন করতে পারি না। এরা বুঝেও বুঝতে চাইছেন না যে তাদের শোচনীয় ব্যর্থতার জন্যই আজ তাদের এই অবস্থা। জনগণের সঙ্গত কারণেই তাদের উপর কোন আস্থা নেই। ক্ষমতায় পুনপ্রতিষ্ঠিত হতে হলে, তাদের যোগ্যতার ও দেশপ্রেমের স্বাক্ষর রাখতে হবে, এটা একটা স্কুলের ছেলেও বুঝতে পারে। তাদের গদী দখল করার সুযোগ বর্ত্তমান সরকারকে হঠিয়ে দিয়ে, সঙ্গে সঙ্গে বিনা নির্বাচনে তাদের গদীতে বসিয়ে দিতে পারেন, তবেই তাদের দুরাশা পূর্ণ হতে পারে। কোন কাণ্ডজ্ঞান-সম্পন্ন দল এ পথে চলতে পারে, এটা কোন সুস্থ মস্তিষ্ক মানুষের ভাবনা চিন্তার বাইরে। ওরা যা খুসী তাই করলেই শুধু গণতন্ত্র বাঁচবে, অন্যথায় দেশে স্বৈরতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হবে, একমাত্র বদ্ধ উন্মাদ ব্যতীত একথা কল্পনাও করতে পারে না কেউ।

——

নব বঙ্গের রূপকার ডাঃ বিধানচন্দ্র

বংশীধর বন্দ্যোপাধ্যায়

স্মরণীয় বরণীয় যাঁরা, ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় তাঁদের মধ্যে অন্যতম। স্বীয় অধ্যবসায়ে, কর্মোদ্যোগে ও নিষ্ঠায় তিনি ছিলেন অনন্য সাধারণ। চিকিৎসা বিদ্যায় তাঁর বুৎপত্তি ছিল অসাধারণ। চিকিৎসক শ্রেষ্ঠ বিধানচন্দ্র নিজেকে এক উত্তম প্রশাসক হিসাবে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন স্বীয় কর্মনিষ্ঠা বাস্তবতাবোধ ও অসামান্য প্রতিভার গুণে। কলিকাতা করপোরেশনের সুযোগ্য মেয়র, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিভাবান উপাচার্য্য ও পশ্চিমবঙ্গের বরণীয় মুখ্যমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন কালে তাঁর কর্মদক্ষতা, সততা ও নিষ্ঠা জনমনে বিপুল আশা-আকাঙ্খা জাগরিত করে। তাঁর বাস্তবমুখীন চিন্তা ও কর্মধারা পশ্চিমবঙ্গে সর্বাঙ্গীন উন্নয়নের সূচনা করে। ১৯৪৭ সালে ভারত স্বাধীন হয় অখণ্ড-বাংলাকে দ্বিখণ্ডিত করে, ফলে পূর্ব্ববঙ্গের স্থায়ী হিন্দু ভাইয়েরা অধিক সংখ্যায় পশ্চিমবঙ্গে চলে আসতে বাধ্য হয় ; অসহায় অবস্থার চাপে পড়ে ও নিরাপত্তার অভাবের কারণে।

পশ্চিমবঙ্গ তখন জনসংখ্যার চাপে বহু সমস্যা সংকুল পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে বাধ্য হয়, কারণ বাসভূমির পরিমাণ কম অথচ জনসংখ্যা বিপুল আকারে বর্দ্ধিত হতে থাকে দিনের পর দিন ছিন্নমূল মানুষের আগমনে। ডাঃ বিধানচন্দ্রের পূর্ব্বে ডাঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ এ রাজ্যের প্রথম মুখ্যমন্ত্রী হন স্বাধীনোত্তর পশ্চিমবঙ্গে। সমস্যাজর্জ্জর পশ্চিমবঙ্গের হাল শক্ত হাতে ধরে প্রথমেই ডঃ ঘোষ দুর্নীতির মূলোৎপাটনে ব্রতী হন এবং বহুক্ষেত্রেই তিনি দুর্নীতি দূরীকরণে সফল হন ; স্বীয় সততা, কর্মদক্ষতা ও স্বদেশ প্রেমের আমোঘ শক্তির জোরে। কিন্তু দিন পরেই অসৎ ব্যবসায়ী ও কিছু অসৎ রাজনীতি বিদদের চক্রান্তে তিনি বিরক্ত হয়ে নিজেই মুখ্যমন্ত্রীত্বের গদী ত্যাগ করেন। ডঃ ঘোষ ছিলেন সত্যসন্ধ ঋষিতুল্য ব্যক্তিত্বের অধিকারী ও গান্ধীজির আদর্শে অনুপ্রাণিত এক মহান ব্যক্তি, তাই তাঁর পক্ষে ঘোলাটে রাজনীতির পঙ্কিলতার সঙ্গে আপোষ রফা করা সম্ভব হয় নি। তাঁর স্থলে ডাঃ রায় পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীত্ব গ্রহণ করেই সর্ব্বপ্রথমে এরাজ্যের বৈষয়িক উন্নতি বিধানের সংকল্পকে পাথেয় কোরে স্বীয় প্রতিভা ও সততাকে কাজে লাগাতে শুরু করলেন। বিরাট উদ্বাস্তু সমস্যা সমাধান করে উদ্বাস্তুদের মধ্যে যারা কৃষিকর্মে দক্ষ, তাদের চাষের জমি দান ও নগদ অর্থদান ; যাতে তারা পতিত জমি গুলি চাষের জমিতে রূপান্তরিত করার কাজে সব রকম সরকারী সাহায্য পায়, তার যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ।

ক্ষুদ্রশিল্পে ও কুটির শিল্পে উদ্যোগী হবার জন্য উদ্বাস্তুদের বিনা জামিনে ঋণ দান। উদ্বাস্তুদের পুর্ণবাসন ও নগদ অর্থ সাহায্য দান। কলিকাতার উপকণ্ঠে স্থানাভাব হলে বিভিন্ন জেলায় উদ্বাস্তুদের জন্য সরকারী সাহায্যে তাদের পুণর্বাসনের ব্যবস্থা গ্রহণ প্রভৃতি কাজকে অগ্রাধিকার দিয়ে ডঃ রায় পশ্চিমবঙ্গের প্রধান সমস্যা, উদ্বাস্তু সমস্যা সমাধানের জন্য আরো বহু বিধ কর্মপ্রচেষ্টা চালু করেন। রাষ্ট্রীয় পরিবহণ সংস্থার মাধ্যমে বহু বেকার যুবকের চাকুরীর ব্যবস্থা করেন। উদ্বাস্তুদের অগ্রাধিকার দিয়ে সকল বিষয়েই তিনি তাঁর যোগ্যতার স্বাক্ষর রাখেন যা প্রকৃতই পক্ষপাত হীন ছিল। পশ্চিমবঙ্গের যুব-

সম্প্রদায়ের বেকারী বন্ধের জন্য তিনি নানাধরণের প্রকল্প চালু করেন – যেমন ট্যাক্সির, বাসেরও অন্যান্য কাজের জন্য পারমিট দান। বহু বাঙ্গালী পরিবার অন্নকষ্টের হাত থেকে বেঁচে যান ডাঃ রায়ের বুদ্ধির ও সংপ্রচেষ্টার ফলে। দেশকে গড়ে তুলতে অর্থাৎ দেশের অর্থ-নৈতিক বুনিয়াদকে দৃঢ় করতে ডাঃ রায় বিশেষ দক্ষতার পরিচয় দেন বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে।

কলিকাতা বন্দরের স্থায়ীত্ব যাতে বিপন্ন না হয়, সে কারণে ভাগীরথী নদীর নাব্যতা বজায় রাখার জন্যই তিনি ফারাক্কা ব্যারাজের নবপরিকল্পনা কেন্দ্রীয় সরকারকে গ্রহণে উৎসাহিত করেন ও তাকে কাজে রূপ দিতে সকল প্রচেষ্টা চালান বহুদিন ধরে তবেই আজ ফারাক্কা ব্যারাজের জন্ম সম্ভব হয়েছে। দুর্গাপুরের গভীর জঙ্গল কেটে সেখানে শিল্প উপনগরী তথা ইস্পাৎ শহর গড়া ডাঃ রায়ের অক্লান্ত পরিশ্রম ও বাস্তবচিন্তার ফলেই সম্ভব হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের রূপকার ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় এমনই ক্ষণজন্মাপুরুষ ছিলেন যে ১লা জুলাই জন্মে ছিলেন তিনি, আবার আর এক ১লা জুলাই অর্থাৎ জন্ম তিথির দিনেই তিনি তিরোধান করলেন বাঙ্গালীদের তথা ভারত বাসীদের শোক সাগরে ভাসিয়ে দিয়ে। পশ্চিমবঙ্গে অদ্যাবধি যা কিছু উন্নয়নমূলক কাজ রূপায়িত করছে তার প্রত্যেকটির মূলে ডাঃ রায়ের কল্যাণ হস্তের স্পর্শ ছিল। হলদিয়ার যে বন্দর প্রতিষ্ঠার কাজ ও তৎ সংলগ্ন নানাধরণের ব্যবসা বাণিজ্যের ও শিল্পের ব্যবস্থাপনা আজ অগ্রসর হতে চলেছে— এ সবের মূলে সেই ডাঃ রায়ের পরিকল্পনা ও পূর্বপরিকল্পনা এবং কর্মদক্ষতা বিদ্যমান।

কলিকাতা শহরে জনসংখ্যার চাপ হ্রাস করার চিন্তায় উদ্বিগ্ন হয়ে ডাঃ রায় কল্যানী উপনগরীর পত্তন করেন। কল্যানীতে কৃষি বিশ্ব বিদ্যালয় স্থাপন তিনিই করে যান। 'কল্যানী' ছিল তাঁর মানসকন্যা, কাজেই কল্যানীকে উপযুক্ত রূপে গড়ে তুলে কলিকাতার বহু অফিস ও শিল্প সংস্থাকে তিনি কল্যানীতে স্থানান্তরিত করার পরিকল্পনা করেছিলেন যাতে কলিকাতা কিছুটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলতে পারে। বাঙ্গালীদের নিজ প্রদেশের মধ্যে থেকেই যাতে সমুদ্র দর্শন, সমুদ্র স্নান ও সমুদ্রের বেলাভূমিতে প্রাত্যহিক বিচরণ বাস্তবে সম্ভব হয়, সে কারণেই ডাঃ রায় দীঘার উন্নয়ন ও দীঘাকে পর্যটন উপযোগী করার কাজে হাত দিয়েছিলেন। প্রতিটি ক্ষেত্রেই তার দূরদৃষ্টির ও স্বদেশবাসীর মঙ্গল চিন্তায় কর্ম নিষ্ঠার স্বাক্ষর দেখা যায়। পুরুলিয়ার প্রধান শিল্প লাক্ষা, সেই লাক্ষা বিদেশে রপ্তানী করার ব্যাপারে ডাঃ রায়ের পরিকল্পনা ও লাক্ষা শিল্পের সার্বিক উন্নয়নের প্রচেষ্টা ভারতে বিদেশী মুদ্রা অর্জনের সহায়ক হয়। ডাঃ রায় পশ্চিমবঙ্গে শিল্প ও ব্যবসা বাণিজ্যের ক্ষেত্রে যে সব বৈপ্লবিক ব্যবস্থা গ্রহণ করেন তাতে এরাজ্যের ব্যবসা-বাণিজ্যের পক্ষে সফলভাবে প্রসারিত হওয়া সহজ হয় এবং এরাজ্যের রপ্তানী বাণিজ্য বৈদেশী মুদ্রা অর্জনে পারদর্শীতা দেখায়। বাঙ্গালীকে স্বনির্ভর করার ক্ষেত্রে ডাঃ রায়ের অবদান অতুলনীয়। তিনি মনে প্রাণে খাঁটি বাঙ্গালী ছিলেন, যদিও তাঁর জন্মস্থান বিহারের পাটনায়। ডাঃ রায় ছিলেন প্রকৃত গণতন্ত্রী এবং সেই জন্যই তিনি তাঁর বিরোধীদের প্রতি উদার ও মনোযোগী ছিলেন। বিরোধীদের যুক্তি গ্রহণযোগ্য মনে করলে তিনি তা গ্রহণ করতে দ্বিধা করতেন না। তিনি সর্বদাই চিন্তা করতেন যে বাঙ্গালী কিসে বড় হবে, কিসে সে আবার বিশ্বের দরবারে শ্রেষ্ঠত্বের আসন পাবে। প্রশাসক

ইসাবে ডা: রায় যে নিরপেক্ষও বলিষ্ঠ পদক্ষেপ রেখে গেছেন তা তাঁর মত বিশিষ্ট প্রতিভাধরের পক্ষেই সম্ভব হয়েছিল।

চিকিৎসাবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে তাঁর বিশেষ অবদান সারা ভারত শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করে আসছে। পাশ্চাত্যেও তাঁর ভূয়সী প্রশংসার কথা আজো শুনা যায়। ভারতের সর্ব্বজন শ্রদ্ধেয় মানুষ বিধানচন্দ্র 'ভারতরত্ন' উপাধিতে ভূষিত হন তাঁর জীবন সায়াহ্নে। তাঁর সান্নিধ্যে যে এসেছে সেই মুগ্ধ বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেছে, তাঁর ঐকান্তিক কর্ম-কুশলতায় ও নিয়মানুবর্ত্তীতায়। তাঁর কাছে কর্মই ছিল ঈশ্বরের আরাধণার সামিল। 'work is worship' ছিল তাঁর জীবনে মূলমন্ত্র। সর্বদাই তিনি তাই কর্মব্যস্ত অবস্থায় বিরাজমান ছিলেন এবং তার কর্ম ছিল হয় জনকল্যাণে আর না হয় জন স্বাস্থ্য চিন্তা। স্বাস্থ্য সংরক্ষণের ক্ষেত্রে ডা: রায়ের সজাগ দৃষ্টি ছিল। পশ্চিমবঙ্গ থেকে ম্যালেরিয়া রোগকে তিনিই বিদায় দিতে সক্ষম হয়েছিলেন, তাঁর পরিকল্পনা মত মশক নিবারণ ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে। বাংলার অকাল মৃত্যুর হার এমন কি মৃত্যুর সাধারণ হার পর্য্যন্ত তিনি কমিয়ে দিতে পেরেছিলেন তাঁর বৈজ্ঞানিক চিন্তা ও কর্ম প্রচেষ্টার দ্বারা। ডা: রায় যে কত দিক থেকে বাঙ্গালী দের রক্ষা করে গেছেন তা আমরা জানা সত্বেও তাঁর প্রশংসায় পঞ্চমুখ হই না কেন? ডা: রায় কংগ্রেসী মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন বলেই কি কমিউনিষ্ট পন্থীরা তাঁর ঋণ স্বীকার করে না, না সত্যকে স্বীকার করতে কমিউনিষ্টরা চিরকালই ভয় পায়? বাংলার প্রতিটি ব্লক এলাকায় স্বাস্থ্য কেন্দ্র ও তৎ সংলগ্ন প্রসূতি আশ্রম স্থাপন ডা: রায়ের এক বিরাট অবদান যা অস্বীকার করার সাহস বা শক্তি বিরোধী দেরও নেই। ডা: রায় বাস্তববাদী, মানবদরদী ও কংগ্রেসের মহান আদর্শে বিশ্বাসী এক বিরাট ব্যক্তিত্ব ছিলেন, আর সেকারণেই জনকল্যাণ কর্মে আত্মনিয়োগ করার অভ্যাস ছিল জীবনের শুরু থেকেই তাঁর। তাঁর কল্যাণ হস্ত পশ্চিমবঙ্গের প্রতিটি জেলায় প্রসারিত দেখা যায়। হাওড়ায় তিনি 'হাওড়া উন্নয়ন সংস্থা' গড়ে ছিলেন যা এখন হাওড়া শহরকে উন্নত করার কাজে অনেকখানি অগ্রসর। বিশেষ করে পয়: প্রণালীকে ভূগর্ভস্থ করার কাজে ও রাস্তাগুলি প্রশস্ত করার ও সু-নিয়ন্ত্রিত করার কাজে ঐ সংস্থা কর্মরত ডা: রায়ের পরিকল্পনা মত। বাঁকুড়া মেডিক্যাল কলেজ তাঁরই চেষ্টায় প্রধানত: তৈরী হয় ও চালু হয়। বাঁকুড়াবাসীরা ডা: রায়ের সে ঋণ স্বীকার করে। এরূপ আরো বহু উদাহরণ আছে। ডা: রায়ের মৃত্যুর পরে পশ্চিমবঙ্গের দুর্গতি বেড়েছে এবং আজ বাঙ্গালীরা সব দিক থেকেই দু:খ ভোগ করতে বাধ্য হচ্ছে, তাঁর—কল্যাণ হস্তের অভাবে।

ইনডিয়ান মেডিক্যাল এসোসিয়েশান সৃষ্টি ও তার দ্বারা জনগণের ও ডাক্তার বাবুদের একযোগে কল্যাণ সাধন তিনিই করে গেছেন, যা আজো এদেশের চিকিৎসা ক্ষেত্রে প্রভূত উন্নতি সাধনে একান্ত ভাবে উপযোগী বলে সর্ব্বস্তরে স্বীকৃত। আই, এ, এর প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি ছিলেন তিনি. তাই তাঁর নিরলস পরিশ্রমে ও কঠোর নিয়ম পালনের মাধ্যমে ভারতে চিকিৎসা বিজ্ঞানের গবে-ষণার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য উন্নতি সম্ভব হয়। গো দুগ্ধের অভাব মোচনের জন্য ও বাংলার শিশুদের পুষ্টি সাধনের নিমিত্ত তিনি হরিণঘাটায় দুগ্ধ প্রকল্প চালু কোরে বিশুদ্ধ দুগ্ধের যোগানের মাধ্যমে কলিকাতাবাসীর ও তৎসন্নিহিত অঞ্চলের মানুষের

অংশের হিত সাধন করেন। অনুরূপভাবে পশুপালন, উন্নত ধরণের গো-প্রজনন, ও হাঁস-মুরগী পালনের এবং শূকর চাষের প্রকল্পকে বাস্তবায়িত করে ডাঃ রায় পশ্চিমবঙ্গের মঙ্গল বিধান করেন, স্বীয় পরিকল্পনা মত। ফলে প্রভূত পরিমাণে গৃহ-পালিত পশু রক্ষা পায় মড়কের হাত থেকে। বাংলার শিল্প প্রসারের জন্যই তিনি কেন্দ্রীয় সরকারকে রাজি করিয়ে ন্যাশানাল ইনষ্ট্রুমেন্টস্‌ কারখানা যাদবপুর চালু করতে সক্ষম হন। ফলে প্রায় ৯০০ (নয় শত) শিক্ষিত বাঙ্গালী ঐ প্রতিষ্ঠানে সঙ্গে সঙ্গে চাকুরী পায় এবং এখন ঐ কেন্দ্রীয় সংস্থায় প্রায় দু হাজার পশ্চিমবঙ্গবাসী রুজি রোজগার করেন।

ওখানে বর্তমান ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ মাইক্রোস্কোপ ও ঐ জাতীয় সব বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি নির্মিত হয় যার মান সর্বোচ্চ। লবণহ্রদ এলাকাকে উন্নত করে তথায় উপনগরী স্থাপন ডাঃ রায়ের এক বিরাট কীর্তি। কলিকাতা থেকে কল্যাণীর দূরত্ব বড় বেশী হওয়ায় ডাঃ রায় উক্ত লবণহ্রদ প্রকল্প চালু করেন, যাতে কলিকাতার উপকণ্ঠেই কলিকাতার পরিপূরক এক বিশাল উপনগরীর মাধ্যমে জনসংখ্যাকে সুনিয়ন্ত্রিত করা যায়। বর্তমানে ঐ পরিত্যক্ত লবণহ্রদ এলাকাই ডাঃ রায়ের নামানুসারে 'বিধাননগরে' পরিণত হয়েছে এবং ওখানে দিন দিন নূতন নূতন বাড়ী উঠছে মানুষের বাস উপযোগী হয়ে। বহু অন্যান্য সংস্থাও গড়ে উঠছে ওখায়। কল্যাণী, বিধাননগর, দীঘা, দুর্গাপুর (ভারতের রাঢ় অঞ্চল) হরিণ ঘাটা, যাদবপুরের ন্যাশান্যাল ইনস্ট্রুমেন্ট লিঃ, হলদিয়া বন্দর ইত্যাদি ডাঃ রায়ের অমর কীর্তি যা তাঁকে যুগ যুগ স্মরণীয় বরণীয় করে রাখবে।

কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট প্রোজেক্ট-এর কাজ গ্রামেই চালু হয় তাঁর সুযোগ্য পরিকল্পনায় ও প্রশাসনের মাধ্যমে। ফলে দরিদ্র গ্রামবাসী উপকৃত হয় বহুলাংশে। যৌথ খামারের প্রবর্তন করেন ডাঃ রায়, যাকে বৈজ্ঞানিক গবেষণা-লব্ধ কৃষির উন্নতির সূত্র পাওয়া যায় এবং তাকে সাধারণ কৃষকও কাজে লাগাতে পারে সরকারী সাহায্যের মাধ্যমে। সেচ-ব্যবস্থার ও উন্নত ধরণের বীজ ও সার প্রয়োগের কথা ডাঃ রায়ের মাথায় প্রথম হয় সর্বাগ্রে। তিনি সেচের উন্নতিতে প্রচুর সরকারী অর্থ ব্যয় করেন ও যৌথ-খামারে উন্নত ধরণের বীজ ও সার প্রয়োগ করে তার উপযোগিতা লক্ষ্য করেন। পরে সাধারণ কৃষকদের মধ্যে সেই ভাল বীজ ও উপযুক্ত সার বিলি করেন ঋণ হিসাবে। ফলে কৃষিক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গ অভূতপূর্ব পরিমাণ ফসলের উৎপাদন বাড়াতে সক্ষম হয় তাঁর আমলেই। তিনি কৃষি, সেচ, বিদ্যুৎ উৎপাদন, শিল্প বাণিজ্য ও অন্যান্য বৈষয়িক উন্নয়নের ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গের সাফল্যের মূলে বিরাট অবদান রেখে গেছেন যা বিস্ময়কর

পশ্চিমবঙ্গের প্রতিটি ক্ষেত্রেই তাঁর উজ্জ্বল প্রতিভা ও সৎ কর্ম প্রচেষ্টার স্বাক্ষর পাওয়া যায়। বাঙ্গালীদের স্বাবলম্বী করার জন্য অক্লান্ত চেষ্টা করেছিলেন ডাঃ রায়। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের হাতে গড়া ও দেশবন্ধুর শিষ্য বিধানচন্দ্র তাঁর বিপুল কর্মময় জীবনে স্বদেশের মঙ্গলের জন্য বহু কাজ করে গেছেন যা অবিস্মরণীয়।

বাংলার শেষ মনীষী অন্তর্হিত আজ। বুদ্ধিজীবী ও রাজনীতিবিদ্‌রা তাঁর অভাবে ম্রীয়মান। বিধানচন্দ্রের মত একাধারে এত বেশী সদ্‌ গুণের অধিকারী মানুষ আজ সারা ভারতে বিরল। তাই তাঁর মত

(এর পর দশ পৃষ্ঠায় দেখুন)

ইরানের রাজনৈতিক সংকট চরমে উঠেছে

কালীপদ সরকার

ইরানের প্রেসিডেন্ট আবুল হাসান বানি সদর প্রেসিডেন্টের পদ থেকে বহিস্কৃত হয়েছেন অযোগ্যতার অভিযোগে। তিনি দেশ থেকে পালিয়েছেন। তাঁর মাথার ওপর আয়াতুল্লা খোমেনির খড়্গ ঝুলছে। গত বছর জানুয়ারী মাসে বানি সদর শতকরা ৭৫ ভাগ ভোট পেয়ে ইরানের নব প্রবর্তিত ইসলামিক রিপাবলিকের প্রথম প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়েছিলেন। ইরাক ইরান যুদ্ধেও তিনি সাফল্যের প্রমাণ দিয়েছেন। ইরানের মজলিস সেই প্রেসিডেন্টের বিচারের জন্য একটি কমিটি গঠন করেছে যার সদস্যদের সকলেই কট্টর মোল্লাতন্ত্রী ও বানিসদরের প্রতিপক্ষভুক্ত। বিচারের ফল কি হবে তা সকলেরই জানা। বানি সদরের বহিষ্কারের সঙ্গে ইরানের শাসন কার্যে যতটুকু সভ্য মানবিকতা বোধ ছিল তার সমাপ্তি ঘটল।

বানিসদরের পদচ্যুতির পরই আয়াতুল্লা খোমেনি আর এক দফা রাজনৈতিক প্রতিপক্ষীয়দের হত্যার কাজে নেমেছেন। দুই বামপন্থী দল মুজাহাদিন খালক এবং ফেদাইন খালক—এর তেতাল্লিশ জন সমর্থককে এভিনের জেলে গুলী করে মারা হয়েছে, জনা ত্রিশ মরেছেন দলীয় সংঘর্ষে এবং আরো পঞ্চাশ জনকে মৃত্যুদণ্ড দেবার জন্য বাছাই করা হচ্ছে। এরা সকলেই মার্কসবাদে বিশ্বাসী এবং কোনভাবে না কোন ভাবে বানি সদরের মধ্যপন্থী নীতির সমর্থক। ১৯৭৯ সালে ইরানে ইসলামীয় বিপ্লব শুরু হবার পর থেকে এযাবৎ সহস্রাধিক ব্যক্তিকে গুলী করে হত্যা করা হয়েছে এবং হত্যার রাজনীতি আজও শেষ হয় নি।

অশীতিপর বৃদ্ধ আয়াতুল্লা খোমেনি বর্তমান ইরানের প্রকৃত রাষ্ট্রনায়ক, তাঁর মনে কি আছে একমাত্র আল্লাহ ছাড়া কেউ জানে না। আবুল হাসান বানি সদর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বিরোধী হলেও, তাঁর চেষ্টা ও বিবেচনাবোধের জন্য ৫২ জন বন্দী মার্কিন কূটনীতিক খোমেনির বন্দীশালা থেকে প্রাণ নিয়ে দেশে ফিরতে পেরেছিলেন। বানি সদরের দৃষ্টিতে সৎ ইসলামী সমাজে জনগণের স্বাধীন মত প্রকাশের অধিকার থাকা উচিত এবং মতভেদ আলোচনার মাধ্যমে মিটিয়ে ফেলা প্রয়োজন। উগ্র ইসলাম পন্থীরা বানি সদরের এ আদর্শ মানতে রাজী নয়। বানি সদর একজন কৃষিজীবি আয়াতুল্লার পুত্র, জন্ম ১৯৩৩ সালে হামদান নগরে। ছোটবেলা থেকে তিনি ধর্মীয় সংস্কৃতি প্রধান পরিবেশে মানুষ হয়েছেন এবং ইরানের ইসলামীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক। এক সময় মোসাদ্দেকের অনুগামী ছিলেন এবং শাহ ইরানে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হলে বানিসদর সস্ত্রীক প্যারিসে পালিয়ে যান।

প্যারিসে তিনি অধ্যয়ণ ও গবেষণা নিয়ে যখন ব্যস্ত, তখন দেশ থেকে বিতাড়িত আয়াতুল্লা খোমেনি বানিসদরের আশ্রয়ে অনেকদিন প্যারিসে বাস করেন। ১৯৭৯ সালে বিপ্লব আরম্ভ হলে একই বিমানে খোমেনি ও বানিসদর ইরানে ফিরে আসেন এবং শাহের বিরুদ্ধে বিপ্লবী সংগ্রাম পরিচালনা করেন। বানি সদর একজন খাঁটি মুসলমান এবং সেই সঙ্গে মার্কসবাদীও। তিনি চাইতেন, দেশের উৎপাদন ব্যবস্থা থাকবে শ্রমিকদের নিয়ন্ত্রণে। ইরানের ব্যাংক, জীবন বীমা এবং বড় শিল্পগুলি

জাতীয়করণের মূলে ছিলেন প্রেসিডেন্ট বানি সদর। ইরানের শিক্ষিত মহলে তাঁর প্রভাব কম নয় এবং অনুগামীর সংখ্যাও প্রচুর, কিন্তু ধর্মীয় নেতা খোমেনি এবং তাঁর গোঁড়া মোল্লাতন্ত্রী দল সমগ্র দেশটাকে এমনভাবে কুহকাচ্ছন্ন করে রেখেছে যে, সেখানে যুক্তিবাদ একেবারেই অচল।

ইরাক-ইরান যুদ্ধ বর্তমানে পারস্য উপসাগরীয় অঞ্চলে সীমাবদ্ধ। যুদ্ধরত দুটি দেশই বুঝে নিয়েছে যে, যুদ্ধের চূড়ান্ত নিষ্পত্তি সময় সাপেক্ষ এবং প্রায় অসম্ভব। উপসাগরের সামনে রণপোত বহর নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, পিছনে ইরান-সীমান্ত বরাবর সোভিয়েত সেনা সমাবেশ করে আছে। বানি সদর হয়ত ভেবেছিলেন, যুদ্ধের শেষে এবং খোমেনির এন্তেকাল হলে তিনি ইরানকে পুনঃগঠিত করবেন তাঁর আদর্শ অনুসারে এবং তার জন্য বানি-সদর বামপন্থী গোষ্ঠীগুলির সহিত ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রক্ষা করে চলছিলেন। খোমেনি তাঁর সেই অভি-প্রায় বুঝেছিলেন। বানি সদরের ব্যক্তিস্বাধীনতা এবং আধুনিক যুক্তিবাদের সমর্থনে প্রকাশ্য তৎপরতা খোমেনির পক্ষে সহ্য করা সম্ভব ছিল না।

বানি সদরকে প্রেসিডেন্ট পদ থেকে সরানোর আর একটি কারণ হল তাঁর সমাজতান্ত্রিক চিন্তাধারা। খোমেনি বর্তমানে কিছুটা মার্কিন মুলুকের দিকে ঝুঁকেছেন বলে মনে হয়। যুদ্ধ চালাবার জন্য ইতি-মধ্যেই তাঁকে হাত বদলি মার্কিন অস্ত্র আমদানী করতে হয়েছে এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সহিত একটা পাকা চুক্তির চেষ্টায় খোমেনি তলে তলে অনেকখানি এগিয়েছেন। রাজনীতিতে সবই সম্ভব। ইরানের ইসলামী বিপ্লব, শাহের পতন এবং ইরাক-ইরান যুদ্ধ-ঘটনাগুলির দিকে গভীরভাবে মনোযোগ দিলেই দেখা যাবে যে সবই দুই বিশ্বশক্তির প্রতিদ্বন্দ্বিতার মূলে ইরান তথা পারস্য উপসাগরীয় অঞ্চলের তেল। উত্তেজনা শেষ পর্যন্ত বিশ্বশক্তি দুটিকে কোথায় টেনে নিয়ে যাবে কেউ বলতে পারে না। হয়ত প্রাচ্যের এই ঘটিকা কেন্দ্র ছাড়া ফেলেছে দক্ষিণ এশিয়ার উপরেও।

ইরান ভারতের মিত্র রাষ্ট্র, ইরানের তেল ভারতের আলানী আমদানীর এক প্রধান অবলম্বন এবং ইরানের বহু উন্নয়ণ মূলক প্রকল্পে ভারতীয় ইনজিনিয়ার, কারিগর, ডাক্তার প্রভৃতি কর্মরত আছেন। ইরানের অস্থির রাজনৈতিক পরিস্থিতি সে কারণে ভারতের উদ্বেগের কারণ না হয়ে পারে না। ইরান জোট নিরপেক্ষ সম্মেলনের সদস্য জোট নিরপেক্ষ দেশগুলি ইরাক-ইরান যুদ্ধের অবসান ঘটাবার জন্য যে কূটনৈতিক চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে, ভারত তাতে বিশেষ ভূমিকা নিয়েছে।

বানি সদর এখন কোথায়, সঠিকভাবে কেউ জানে না। খোমেনি তাঁকে দেশে ফিরে গিয়ে চিন্তাবিদ লেখকের ভূমিকা নিতে বলেছেন, তবে খোমেনির অনুরোধে বানি সদর দেশে ফিরে যাবেন বলে মনে হয় না। পদচ্যুত প্রেসিডেন্ট বানি সদরের জীবন সরকার বিরোধী রাজনীতিকের মতই কেটেছে। প্রথমে শাহতন্ত্রের, পরে মোল্লাতন্ত্রের বিরুদ্ধে তিনি লড়াই করেছেন। বিপুল জন সমর্থন লাভ করে দেশের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হলেও বানি সদরকে সব সময় আয়াতুল্লা খোমেনির অভিপ্রায় অনুসারে চলতে হত। এ অবস্থা প্রেসিডেন্টের পক্ষে অসহনীয় হয়ে উঠেছিল, পক্ষান্তরে খোমেনিও তাঁকে পুরোপুরি বিশ্বাস করতেন না। খোমেনির ধারণা, বানিসদর আয়াতুল্লা-পুত্র হলেও, পশ্চিমী শিক্ষা প্রভাবিত।

ইসলামে বিপ্লবের ধারণা এক শতাব্দী ধরে গড়ে

ওঠা আধুনিক রুচি সম্মত ও পাশ্চাত্য শিক্ষার অগ্রসর ইরানের সমাজ-জীবন বিপর্যস্ত হয়ে গেছে। প্রগতি শীলতার যৎসামান্য বানি সদরের চেষ্টায় কোনমতে টিকে ছিল, এবার তারও পতন প্রাপ্তি ঘটবে। কাঠ মোল্লাদের কাজে বাধা দেবার আর কেউ অবশিষ্ট রইল না ইরানে।

মুসলিম রাষ্ট্রগুলির অধিকাংশই সামরিক এক নায়কত্বের অধীনে চলে গেছে, গণতন্ত্র বলে সেখানে কিছুই নেই। সামরিক একনায়কত্বগুলি প্রতিষ্ঠিত ইসলামীয় মতাদর্শের উপর। ইরানের প্রেসিডেন্ট বানিসদরের উৎখাতের সহিত বাংলাদেশের প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের হত্যার একটি অদৃশ্য যোগসূত্র বিদ্যমান। রাজনৈতিক অস্থিরতা সৃষ্টির যে গূঢ় কূটনৈতিক চক্রান্ত আজ নানাদেশে সক্রিয়, ভারত তার ছোবল থেকে মুক্ত এ কথা জোর করে বলা যায় না। জনতা শাসনকালে ভারতের অবস্থা পর্যালোচনা করলে তা বোঝা যায়। দেশ তখন এক গভীর অনিশ্চয়তার মধ্যে পড়েছিল এবং বিচ্ছিন্নতাবাদ মাথা তুলে দাঁড়িয়েছিল ১৯৮০ সালে বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী ক্ষমতায় ফিরে না এলে, ভারতের অবস্থা কি হত-ভাবাই যায় না।

ইসলাম অর্থ শান্তি। বৃদ্ধ আয়াতুল্লা খোমেনি নিজেকে ধর্মনিষ্ঠ মুসলমান বলে প্রচার করেন, কিন্তু তাঁর নরহত্যা লোলুপতা তাঁকে এক বিকৃত মস্তিষ্ক অথবা মানসিক বিকারগ্রস্ত ধর্মরাক্ষসের দৃষ্টান্ত করে তুলেছে এবং তিনি যতদিন জীবিত আছেন ততদিন ইরানে শান্তি ফিরে আসার সম্ভাবনা নেই মনে করলে হয়ত ভুল হবে না।

ইরান সভ্য মানুষের অন্যতম আদি লীলা-নিকেতন। ইরানী দার্শনিক কবি জালালুদ্দিন রুমীর 'মসনবিয়ে রুমী' আধ্যাত্মিকতার মহাসমুদ্র সদৃশ গ্রন্থ, বিশ্বকবি শেখ সাদীর 'গুলিস্তা ও বুস্তা' মানবতাবাদের অমর কাব্য সাহিত্য। ওমর খৈয়াম, হাফেজ প্রমুখ মহাকবির জন্মভূমি ইরান। সুফী ধর্মমত ও আত্মিক সাধনার ভিত্তিভূমি ইরানের খাজা মইনুদ্দিন চিস্তি এক সময়ে ভারতে এসেছিলেন সমন্বয় ধর্ম প্রচার করতে। তিনি আর দেশে ফিরে যান নি. আজমীরে দেহরক্ষা করেছিলেন। মানবপ্রেম এবং আপন অন্তরে ঈশ্বরকে খুঁজে পাওয়া যে ধর্মসংস্কৃতির মূল কথা সেই ধর্মমতের দেশ ইরানের হৃদ্‌পিণ্ড টেনে উপড়ে ফেলার খোমেনি-অভিযান কি কোনদিন সফল হবে?

'দিল বদস্ত আওর কে হজ্জে আকবরস্ত্,
আজ হাজারী কাবা এক দিল বেহতরস্ত'।

— রুমী।

(৭ম পৃঃ শেষাংশ)

প্রতিভাধর বিরাট ব্যক্তিত্বের অভাব বড়ই বেদনা-দায়ক প্রতিটি চিন্তাশীল ভারতবাসীর কাছে। দক্ষ প্রশাসক ও প্রখ্যাত চিকিৎসক ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের অম্লান স্মৃতি ভারতবাসীর অন্তরে চির জাগরুক থাকবেই। তাঁর মৃত্যু নেই, তিনি যে কর্মযোগী ছিলেন। ঈশ্বরের আশীর্বাদ পূত বিশিষ্ট শক্তির অধিকারী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় অমর তাঁর স্বদেশবাসীর মনোজগতে। রবীন্দ্রনাথের কথায় লিখি--'তোমার কীর্তির চেয়ে তুমি যে মহৎ, মহৎ, তাই তব জীবনের রথ, পশ্চাতে ফেলিয়া যায় কীর্তিরে তোমার।'

রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্র নাথের স্মৃতি কথা

["A Nation In Making" গ্রন্থ থেকে অনুবাদ]

অনুবাদক—অধ্যাপক নলিনীমোহন দাশগুপ্ত

মন্ত্রীরূপে আমার কার্যকর্ম [পূর্বানুবর্তন]

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

'স্টাটসম্যান' পত্রিকার সম্পাদক সমীপে।

মহাশয়,

আপনার পত্রিকার গত বুধবারের সংখ্যায় প্রকাশিত প্রধান নিবন্ধটি পাঠ করে আমরা বেদনা বোধ করছি এবং বিস্মিত হয়েছি। এই নিবন্ধটিতে স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসন বিভাগের মন্ত্রীদপ্তরকে আক্রমণ করা হয়েছে। এই আক্রমণ আরও বিস্ময়কর মনে হচ্ছে এই জন্য যে স্টেটসম্যান পত্রিকা স্যার সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি মন্ত্রীপদের দায়িত্বভার গ্রহণ করার দিন থেকেই তার কাজে সন্তোষ প্রকাশ করে আসছেন। বন্যাক্লিষ্ট অঞ্চলে ত্রাণ কার্যের ব্যবস্থা করার বিষয়টি প্রশাসনিক সংরক্ষিত বিষয়ের তালিকাভুক্ত, স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসন বিভাগের অন্তর্ভুক্ত নয়। এই মূল কথাটিকে অস্বীকার করেই নিবন্ধ লেখকের দৃষ্টিভঙ্গী বিষিষ্ট হয়ে পড়েছে এবং তিনি একটি ভুল তথ্যকে, শুধু তাই নয়, একটি মন গড়া কথাকে, অনুদারভাবে দাঁড় করিয়েছেন। এই ভাবে ত্রাণ কার্যে সাধিক ভাবে সরকারী মনোভাব সম্পর্কে এবং বাংলা সরকারের প্রশাসনে হস্তান্তরিত বিভাগের প্রতি সংরক্ষিত বিভাগের মনোভাব সম্পর্কে ভুল তথ্য পরিবেশন করা হয়েছে।

উল্লিখিত বিষয় সম্পর্কে আর কিছু বলতে না চাইলেও আমরা স্যার সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি নিজেই বন্যাক্লিষ্ট অঞ্চলে ত্রাণ কার্যের জন্য যা করেছেন, তা আপনার পাঠকদের গোচরীভূত করা একান্ত কর্তব্য বলে মনে করি। যদিও মন্ত্রী হিসাবে এ ব্যাপারে তার কোন সংশ্রব ছিল না, তথাপি বিভিন্ন দিক থেকে যে সমস্ত বিবরণ তার প্রতি গোচর হয় তাতে তিনি গভীরভাবে অভিভূত হয়ে পড়েন। কলকাতা কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান ঐ সময় সিলেক্ট কমিটির মিটিংয়ে যোগদান করার জন্য দার্জিলিং গিয়েছিলেন। যেইমাত্র তিনি কর্পোরেশনের চেয়ারম্যানের নিকট থেকে বন্যার ধ্বংস ও ক্ষয়-ক্ষতির বিশদ বিবরণ পান, সেইমাত্রই তিনি তার কয়েকজন বন্ধুকে ডাকেন এবং সঙ্গে সঙ্গেই ত্রাণ কার্যের জন্য একটি অর্থ ভাণ্ডার খোলেন। যে সমস্ত বন্ধু উপস্থিত ছিলেন তাদের মধ্যে আছেন অনারেবল পি. সি. মিটার, মিঃ এস. আর. দাশ এবং মিঃ মল্লিক। এই অর্থ-ভাণ্ডারে দুইজন মন্ত্রীই প্রত্যেকে এক হাজার করে টাকা দেন। আরও স্থির হয় যে পরের দিন ডাউন মেইল ট্রেনে তিনি সান্তাহার যাবেন। একথা এখন সকলেই জানেন যে তিনি সেখানে গিয়েছিলেন। মিঃ কৃষ্ণকুমার মিত্র ইতিমধ্যে সুরেন্দ্রনাথের জরুরী তার বার্তা পেয়ে দার্জিলিংয়ে এসে পড়েছিলেন। মিঃ কৃষ্ণকুমার মিত্রসহ আমরা যারা তার সঙ্গে সেখানে যাওয়ার গৌরব অর্জন করেছিলাম সুস্পষ্টভাবে একথা ঘোষণা করতে চাই যে সান্তাহারে তিনি যতক্ষণ উপস্থিত ছিলেন কর্তব্যের প্রতি গভীর নিষ্ঠা এবং অবিচল উৎসাহ উদ্যম প্রদর্শন করেছেন। প্রাতে সেখানে পৌঁছেই তিনি ডাঃ বেটলির সহিত সাক্ষাৎ করেন এবং তার কাছ থেকে একথা জেনে আনন্দ প্রকাশ

করেন যে স্বাস্থ্য বিভাগের ১৪ জন কর্মচারী আগে থেকেই সেখানে উপস্থিত থেকে একটানা ভাবে নিজ নিজ ক্ষেত্রে কাজ করে যাচ্ছেন।

সুরেন্দ্রনাথ নিজে মিঃ কৃষ্ণকুমার মিত্র ও বগুড়ার মহকুমা শাসকসহ অন্যান্য কয়েকজনের সঙ্গে রেল লাইনের উপর দিয়ে ট্রলিতে চেপে সান্তাহার থেকে বগুড়া যাওয়ার পথে তাদের, যেখানে যেমন প্রয়োজন, মানুষ ও পশুর মৃত দেহগুলি দাহ করতে বা করব দিতে দেখেছেন। স্থানীয় বিভিন্ন সেবা-প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিগণের সঙ্গেও তাঁর সাক্ষাৎকার হয়। প্রাতঃ ভোজনের পর কালেক্টর মিঃ রীড, রাজসাহীর জেলা বোর্ডের চেয়ারম্যান মিঃ হিমায়েৎ উদ্দিন এবং নাটোরের কুমার তাকে নাটোরের দিকে নিয়ে যান। সরকারী কর্মচারী এবং সেবা প্রতিষ্ঠানের কর্মীদের পরস্পরের মধ্যে সংক্রমণশীল বিপুল উৎসাহ লক্ষ্য করে গৌরব বোধ করেন এবং এই গৌরববোধের উজ্জীবনই তাঁকে রোদের মধ্যে প্রায় ২০ মাইল ট্রলিতে করে ঘুরতে এবং সমস্ত দিনের কঠোর পরিশ্রম সহ্য করতে সহায়তা করে। সব দেখে শুনে যখন বুঝতে পারলেন যে সব কাজ ঠিক মতই চলছে এবং সরকারী ও বেসরকারী কর্মীরা সকলেই সহযোগিতা করে কাজ করে যাচ্ছেন, তখনই তিনি সন্ধ্যার সময় দার্জিলিং ফিরে যান।

বঙ্গ-জননীর অন্যতম কৃতী সন্তান মিঃ কৃষ্ণকুমার মিত্রকে তিনি নওগাঁও মহকুমার বিভিন্ন অংশের সেবা কার্যের তত্ত্বাবধান করার ভার অর্পণ করে যান। নওগাঁয়ে তখনও সেবা কার্যের জন্য কর্মীর প্রয়োজন ছিল। ৭৪ বৎসর বয়সের বৃদ্ধ কোন লোক এর চেয়ে বেশী করতে পারেন না। একথা ভাবতে আমাদের মনে কোন দ্বিধা দ্বন্দ্ব নেই যে সুরেন্দ্রনাথ জন-সেবার ক্ষেত্রে এমন একটি দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন যার চেয়ে কোন উৎকৃষ্টতর দৃষ্টান্ত আজকের ভারতে পাওয়া যায় না।

সুরেন্দ্রনাথকে মৃত্যুর আক্রান্ত অবস্থায়ই [illegible] হার যেতে হয়েছিল। সমস্ত দিন রোদের মধ্যে ঘোরার ফলে তা কমল তো না-ই, বরং বেড়ে গেল এবং ফিরে যাওয়ার পরই [illegible] ও ব্রংকাইটিসে শয্যাগত হয়ে পড়লেন। [illegible] ক্রমে এখন তা কমে আসছে। মহাত্মা [illegible] মনে করি, আপনি স্বীকার করবেন যে আ [illegible] ভালবেসে তাঁকে বাংলার মহান বুড়ো [illegible] নাম দিয়েছি, আমাদের এই বিবরণ [illegible] সার্থকতারই এক নিদর্শন বহন করছে [illegible]

ভবদীয়

[illegible] দেশ বন্ধুর

[illegible]

সুরেন্দ্রনাথ মল্লিক [illegible] মহীন

ডি সি. ঘোষ [illegible] ভারতের

বেঙ্গল লেজিস্লেটিভের ভাতীয়

সদস্য কলীন্দ্রলা [illegible]

বেঙ্গল লেজিস্লে

সদস্য বি সি. চ

ব্যারিষ্টার এট্ ল

R. N. 24511/71 | Biplabi Bangla | Regd. W B/NC 77
Phone : 34-1795
বার্ষিক :—সডাক ২,৫.০০ টাকা | বাণ্মাসিক :—৮.০০ টাকা | মূল্য—৬০ পয়সা

8 JUL 1981

পাক সেনাপতি ইয়াহিয়া খানের জল্লাদবাহিনী যে গ্রন্থ পুড়িয়ে ছাই করে দিয়েছিল বিপ্লব তাপস মহারাজ ত্রৈলোক্যনাথের সেই অবিস্মরণীয় গ্রন্থ "ভোলে ত্রিশ বছর ও পাক ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম" পুনর্মুদ্রিত হল।

দাম—ত্রিশ টাকা

প্রাপ্তিস্থান
খাদি প্রতিষ্ঠান
১৫, কলেজ স্কোয়ার,
কলিকাতা-১২

সম্পাদক—
শ্রীশান্তিশরণ রায়চৌধুরী
॥ সম্পাদকমণ্ডলী ॥
শ্রীজগদীশ চট্টোপাধ্যায় (সভাপতি)
শ্রীভবেশচন্দ্র নন্দী
পুষ্প চাটার্জী
মলয় ঘোষ
প্রকাশক ও মুদ্রক—
শ্রীঅনিল সেনগুপ্ত
দিল্লীর বিশেষ প্রতিনিধি—
শ্রীবারীন ঘোষ
বেহালা—
শ্রীনন্দগোপাল পাল

বিপ্লবী পুস্তকমালা

নেতাজীর সিক্রেটসার্ভিস—ডাঃ পবিত্রমোহন রায়—৪০.০০
বিপ্লবী মহানায়ক রাসবিহারী—সুবোধ মজুমদার
অনুশীলন সমিতির বিপ্লব প্রয়াস—ব্রজেন্দ্র দাস

—ক্ষীরোদ কুমার দত্তের—

১। বাংলার অগ্নিযুগ—১.৫০, ২। বহির্ভারতে ভারতীয় বিপ্লব প্রচেষ্টা—৮.০০ ৩। অনুশীলন সমিতির পি. মিত্তির—২.০০, ৪। গৌহাটী ষড়যন্ত্র কাহিনী—১.০০, ৫। কাকোরী ষড়যন্ত্র—১.২৫, ৬। কলকাতা বোমার সংগ্রাম কাহিনী—.৫০, ৭। রাসবিহারী ও অনুশীলন সমিতি—.৩০ ৮। স্বাধীনতাসংগ্রামে মা ও মেয়ে—.৭০, ৯। বিবেকানন্দ ও সমাজবাদ—.৩০ ১০। বিপ্লবী বিবেকানন্দ—.৫০, ১১। মহাত্মা ও সুভাষচন্দ্র—.৫০ ১২। ভারতের মহাজাগরণ ও ভগিনী নিবেদিতা—.৭৫, ১৩। দেশ বাঁচাও ডোকেমি (১)—১.০০, ১৪। দেশ বাঁচাও ডোকেমি (২)—১.০০ ১৫। শহীদ চন্দ্রশেখর আজাদ—.৫০, ১৬। ১৯শে এপ্রিল জালিয়ান শহীদ দিবস—১.০০, ১৭। স্বাধিকার রক্ষা প্রচেষ্টা—.৭৫, ১৮। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও অনুশীলন সমিতি—৪.০০, ১৯। বাংলার জাতীয় পতাকার ইতিহাস—.৫০, ২০। মাটি রক্ষা প্রচেষ্টা—১.০০

প্রাপ্তিস্থান :— ৪নং বঙ্কিম চাটার্জী [illegible] কলিকাতা-৭০০০০৭
শৈলশ্রী—১/১/১/A বঙ্কিম চাটার্জী ষ্ট্রীট কলিকাতা-৭৩.

মূল কার্যালয়—৪নং বঙ্কিম চাটার্জী ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০০৭ শ্রীঅনিল সেনগুপ্ত কর্তৃক প্রকাশিত এবং তৎকর্তৃক প্রিন্টিং পাবলিসিটি, ১১৭, কেশবচন্দ্র সেন ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০০৯ হইতে মুদ্রিত।

বিপ্লবী বাংলা

॥ বিপ্লবী পরিষদের সাপ্তাহিক মুখপত্র ॥
স্থাপিত—১৯৫৬, 'বিপ্লবী বাঙ্গালী' নবকলেবরে—১৯৭৯

দশম বর্ষ	শনিবার ২৬শে আষাঢ় ১৩৮৮ ১১ই জুলাই ১৯৮১	৩৬ সংখ্যা

CALCUTTA UNIVERSITY LIBRARY

"প্রকৃত বিপ্লবী হচ্ছে সেই, যে কোনদিন পরাজয় স্বীকার করেনা ; সে কখনও মুষড়ে পড়েনা বা হতাশ হয়না । একজন খাঁটি বিপ্লবী তার উদ্দেশ্যের যথার্থতার প্রতি বিশ্বাসবান থাকবে এবং তার দৃঢ় বিশ্বাস থাকবে যে তার উদ্দেশ্য দেরীতে হলেও সাফল্য লাভ করবেই ।"

—নেতাজী

সম্পাদকীয়

ভারতরত্ন বিধানচন্দ্র

পৃথিবীতে কোন কোন দেশে এমন এমন মানুষ জন্মগ্রহণ করেন, যারা সমসাময়িককালের মানুষের থেকে এত উচ্চস্তরের প্রতিভা নিয়ে আসেন, যে তাদের সঠিক মূল্যায়ন করা সম্ভব হয় না। তাদের চোখ ফুটিতে থাকে ঠিক অন্যমনস্কতা নয়, যাকে বলা যেতে পারে দূর মনস্কতা। তাই তারা সহজেই সব বাধা-বিপত্তিকে পরাভূত করে আপন লক্ষ্যে পৌছুতে পারেন। তাদের নির্ভীকতা, তাদের আদর্শ নিষ্ঠা, অসাধারণ পবিত্র বল, নৈরাশ্য বিজয়ী জীবনধারা মানুষকে শুধু অনুপ্রাণিতই করে না, অন্ধকার পথে আলোকবর্তিকা তুলে ধরে জীবনের পথে সঠিক পদক্ষেপ করতে সাহায্য করে। তাই তারা বিশেষ কোন কালের নয়, সর্বকালের আলোর দিশারী হিসাবে পরিগণিত হন। প্রয়াত ডা: বিধানচন্দ্র রায় ছিলেন এমনই একটি মানুষ।

বিধানচন্দ্রকে তাই দেশের তরফ থেকে যে ভারত রত্ন বলে বিশেষিত করা হয়েছিল, সেটা সার্থক। ডা: বিধানচন্দ্রের প্রতিভা ছিল এমন সর্বতোমুখী যে তার কোন গুণটীকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে, সে কাজ অত্যন্ত দুরূহ। ডা: বিধানচন্দ্র স্বপ্ন দেখতেন নানা রকমের, এতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু সেই স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করার অনন্য-সাধারণ প্রতিভা সত্যই পৃথিবীতে খুব বেশী পাওয়া যায় না। বিধানচন্দ্রের এটা ছিল প্রায় অবিশ্বাস্য রকমের।

ডা: বিধানচন্দ্র ছিলেন একজন কর্মযোগী। যে কাজেই তিনি হাত দিয়েছেন, তাতেই সফলতা লাভ করেছেন। আজকের দিনে পশ্চিমবাংলার যে সব প্রতিষ্ঠানগুলি বাঙ্গালী গর্ব করে, তার প্রায় প্রত্যেকটিতেই বিধানচন্দ্রের অবদান ছিল ব্যাপক ও বিরাট। তাঁর শারীরিক চিকিৎসা দক্ষতার খ্যাতি ছিল সারা পৃথিবীতে স্বীকৃত। কিন্তু তিনি মানুষের রোগের চিকিৎসা কার্যেই নিযুক্ত থাকেন নি। সমাজের যেখানে কোন দুর্বলতা দেখেছেন, সেই মানুষটি তার নিজস্ব অবদানের স্বীকৃতি রেখেছেন। দেশ স্বাধীন হবার পর খণ্ডিত বাংলার অবস্থা ছিল শোচনীয়। দুই তৃতীয়াংশ বাংলাদেশ অন্য দেশের অন্তর্ভুক্ত। রাজকোষ প্রায় শূন্য। সমস্যার বিরাটত্ব এই রাজ্যটিকে প্রায় পঙ্গু করে ফেলার অবস্থায় পরিণত করেছিল। লক্ষ কোটি বাস্তুহারা মানুষ এখানে সব কিছু পেছনে ফেলে এখানে চলে এসেছে, আহার ও বাসস্থানের প্রত্যাশায় ও সঙ্গত দাবীতে। কেন্দ্রীয় সাহায্য মিললেও সেটা ছিল প্রয়োজনের তুলনায় অতি সামান্য। গোটা বাঙ্গালী জাতি প্রায় ভিক্ষুকে পরিণত হবার সম্ভাবনায় আতঙ্কিত। কিন্তু সেই বিরাট ব্যক্তি সমস্ত বিপদ আপদকে তুচ্ছ করে, পশ্চিমবঙ্গের রাষ্ট্রতরণীকে

শুধু মহাপ্রলয়ের থেকে রক্ষা করেননি, তাদের প্রতিষ্ঠিত করার কাজে অসামান্য সফলতা অর্জন করেছিলেন। এই হিসাবে তাঁকে বাংলা ও বাঙ্গালী জাতির ত্রাণকর্তা বললেও একটুও অত্যুক্তি হবে না।

ডাঃ বিধানচন্দ্র সমসাময়িক কালের বিভিন্ন ধরণের প্রতিষ্ঠান সৃষ্টি ও অগ্রগতির পথে নিজের প্রতিভার ও কৃতিত্বের অক্ষয় অবদান রেখে গিয়েছেন। যাদবপুর টি বি চিকিৎসার প্রতিষ্ঠান, ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, আর, জি, কর, মেডিকেল কলেজ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কর্পোরেশন, বেঙ্গল ইমিউনিটি ও অন্যান্য বহু প্রতিষ্ঠান তাঁরই প্রায় একক প্রচেষ্টায় গড়ে উঠেছিল ও ক্রমোন্নতি লাভ করেছিল। স্বাধীনতা উত্তর যুগে, দুর্গাপুর কমপ্লেক্স, ব্যাণ্ডেল ও সাঁওতালদি বিদ্যুৎপাদন কেন্দ্র, কংসাবতী ড্যাম, কল্যাণী শহর, সল্ট লেকের আমূল পরিবর্তন প্রভৃতি গড়ার কাজ তাঁরই প্রতিভায় সৃষ্টি। আগামী দিনে পশ্চিমবাংলাকে শিল্প-সমৃদ্ধ, কৃষি সমৃদ্ধ করার বহু কাজ তাঁর জীবদ্দশায় করে গিয়েছেন এবং ভবিষ্যত প্রসারণের রূপরেখাও তিনি করে রেখে গিয়েছেন। তাঁর অসমাপ্ত কাজগুলি সম্পূর্ণ করতে পারলেই সুখী ও সমৃদ্ধ বাংলা গড়ে উঠবে, একথা অনস্বীকার্য। প্রকৃতপক্ষে, তাঁর চিন্তা-ভাবনার পর নতুন কোন পরিকল্পনার কোন পরিচয় পরবর্তীকালের রাজনীতিবিদ্‌রা রাখতে পারেননি, হয়ত তাঁর দৃষ্টি শক্তি এতই সুদূর প্রসারী ছিল যে নতুন কোন পরিকল্পনার কোন আশু প্রয়োজনও দেখা দেয়নি। দুঃখের সঙ্গে একথা স্বীকার করতেই হবে যে এদিকে পশ্চিমবাংলার কোন উল্লেখযোগ্য উন্নতি ঘটান যায়নি। বিধানচন্দ্রকে তাই প্রকৃতভাবেই পশ্চিমবাংলার নব রূপকার বলে অভিহিত করা যায়।

বিধানচন্দ্র শতবার্ষিকী সভায় ভারতের রাষ্ট্রপতি বিধানচন্দ্রকে একজন বাংলার রূপকার ও প্রবাদ পুরুষ বলে অত্যন্ত সঠিকভাবেই বর্ণনা করেছেন। বিধানচন্দ্র ছিলেন একজন আদর্শ দেশপ্রেমিক। রাজনীতি ক্ষেত্রে তাঁর অবদানও অবিস্মরণীয়। রাজনীতির আবর্তে ওতপ্রোতভাবে তিনি যে নিজেকে জড়িত করেননি, এটা দেশের পক্ষে পরম সৌভাগ্যজনক। সেটা ঘটলে, এত গঠনমূলক ও দেশের পক্ষে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় এতগুলি প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা তাঁর পক্ষে সম্ভব হত না। সেটা হত দেশের চরম দুর্ভাগ্য।

বিধানচন্দ্র ছিলেন সর্বোপরি একজন আদর্শ মানব দরদী। কত দুঃখীকে যে তিনি অর্থ সাহায্য করতেন, কত গরীব মানুষের বিনা পয়সায় তিনি কঠিন রোগমুক্ত করেছেন, তার ইয়ত্তা নেই। তিনি ছিলেন একজন উচুদরের ভদ্র এবং অমায়িক মানুষ। রাজনীতি ক্ষেত্রে বিরোধীদের প্রতি তাঁর ব্যবহার ছিল আদর্শ স্থানীয় এবং গণতান্ত্রিক কাঠামোর উপযোগী এবং অন্যের অনুকরণীয়। বিধানচন্দ্র নিজেই তাঁর অমর কীর্তি স্থাপন করে গিয়েছেন তাঁর কার্যকলাপের মাধ্যমে এবং বহু প্রয়োজনীয় সৃষ্টির মাধ্যমে। দেশের মানুষ তাঁর প্রতি যথাযোগ্য শ্রদ্ধা ও সম্মান জানাতে পারেন, শুধু তাঁরই অসমাপ্ত কাজ বাস্তবায়িত করে।

বিধানচন্দ্রের জন্ম শতবার্ষিকীতে আমরা তাঁর উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা নিবেদন করি।

বুকের দরজায় আঘাত হানছে যে ঝড়ো হাওয়া

কালীপদ সরকার

বর্তমান যুব সমাজের দিকে তাকিয়ে বিস্মিত বৃদ্ধেরা ভাবছেন এরা কোথায় চলেছে এবং যুবকরা বৃদ্ধদের দিকে তাকিয়ে, দৃষ্টি দিয়ে জানিয়ে দিচ্ছে, তোমাদের সময় ফুরিয়ে গেছে, তোমাদের কীটদষ্ট জীর্ণ ভাবনা নিয়ে তোমরা এখন সরে পড়। প্রবীণ বিপ্লবীরা অথবা গান্ধীপন্থীরা যখন কোন শহীদের কিংবা স্মরণীয় ঘটনার স্মৃতি দিবসে সভা ডাকেন, কিছু পককেশ, শিথিল তনু বৃদ্ধ ও প্রৌঢ়রা সে সভায় উপস্থিত হন, তরুণদের সেখানে কদাচিৎ দেখা যায়। অথচ সে সভায় কোন চিত্রতারকা অথবা সুগায়কের আগমন সম্ভাবনা থাকে সেখানে তরুণ তরুণীর ভিড়ে তিল ধারণের স্থান থাকে না। বিপ্লবীরা কবে কি করেছিলেন তা নিয়ে যেমন বর্তমান সমাজের নর-নারীর ঔৎসুক্য নেই, তেমনি তাদের নেই আগ্রহ গান্ধীজীর মাহাত্ম্যকীর্তন অবধানে।

একটা ঘটনার কথা উল্লেখ করছি, বেশ কয়েক বছর আগে ভূ-দান যজ্ঞের ঘোড়া ছুটিয়ে যখন গান্ধীশিষ্য বিনোবা ভাবে এক রাজ্য থেকে আর এক রাজ্যে দিগ্বিজয়ে বেরিয়েছিলেন তখন এক সভায় বিনোভাজী ভাষণদান শেষ করে শ্রোতাদের উদ্দেশে বললেন, 'বলো জয় জগৎ'। সভায় উপস্থিত তরুণেরা সমস্বরে বলে উঠল, 'জয় পাগল'

সমাজে প্রবীণদের সম্মান হ্রাস, পরিবারে পিতার পতন এবং ভাব জগতে ঈশ্বরের মহিমা বিলুপ্তি আকস্মিক নয়, এর পিছনে সঙ্গত কারণ আছে। সেই কথায় ধীরে ধীরে আসছি।

অষ্টাদশ শতকের সবচেয়ে বড় ঘটনা হল ফরাসী বিপ্লব, যার মূল বক্তব্য—সাম্য, স্বাধীনতা ও ভ্রাতৃত্বের উদাত্ত আবেদন পরবর্তী দুই শতাব্দী ধরে মানবমনকে নাড়া দিয়েছে। উনবিংশ শতাব্দী এই আবেদনের উপর একটি আদর্শনিষ্ঠ সমাজ গড়তে চেয়েছিল। অন্যদিকে ডারউইনের সৃষ্টিতত্ত্ব, ফ্রয়েডের মনোবিজ্ঞান মার্কসের বস্তুতান্ত্রিক ইতিহাস ব্যাখ্যা এবং প্রযুক্তি-বিদ্যার দ্রুত উন্নতি অদৃশ্য আঘাতে সেই নৈতিক মূল্যবোধ ভিত্তিক সমাজ গড়ার মূল উপড়ে দেবার ব্যবস্থা করেছিল। ফরাসী বিপ্লব রাজকদের বিলাস বৈভবের বিরুদ্ধে হাত তুললেও, ধর্মবিশ্বাস ও আধ্যাত্মিক চিন্তার অবসান ঘটাতে চায় নি। পক্ষান্তরে ডারউইন, মার্কস প্রমুখের জড়বাদী চিন্তাধারা নিরীশ্বর বাদকেই সতেজ করে তুলেছিল।

যুগটি ছিল সব দিক দিয়ে পাশ্চাত্য প্রাধান্যের। প্রাচ্য তখন আত্মবিস্মৃতির গভীর নিদ্রায় মগ্ন, অথবা আধো জাগরণের ক্লান্তি তন্দ্রাবিজড়িত। এই অবস্থায় বিংশ শতাব্দী পা রাখল বিশ্বরঙ্গমঞ্চে। সামনে তার অবক্ষয় মলীন সভ্যতা সংস্কৃতি এবং সংশয় দ্বন্দ্ব পরিকীর্ণ মানব মন, অন্তরালে বস্তুতান্ত্রিক চিন্তার বারুদ সঞ্চয়। বিংশ শতাব্দী চলল পুরাতনকে আশ্রয় করে, জোড়াতালি দিয়ে টিকিয়ে রাখতে চাইল ঐতিহ্যময় ইমারতকে, কিন্তু সম্ভব হল না টিকিয়ে রাখা। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ কঠিন আঘাতে চুরমার করে দিল এত কালের সযত্ন লালিত ধ্যান, ধারণা ও আদর্শবাদকে। গুহাবাসী বর্বরের নগ্ন রূপে দেখা দিল সভ্য মানুষ। একদিকে যেমন শাউত শিলিং পেনস হল জীবনের সংগ্রামাত্মক, অবলুপ্ত নৈতিক মূল্যবোধ

অপসৃত হতে থাকল সমাজ থেকে এবং প্রস্তুতি চলল ফ্যাসিবাদের উপর সমাজ গড়ার পরিকল্পনা, তেমনি আর এক দিকে যে মার্কসবাদ ছিল পুঁথির পাতায় আবদ্ধ, রুশীয় বলশেভিক বিপ্লব তাকে দিল দেহ ও প্রাণ।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের মধ্যবর্তী পর্বে বিশ্ব দেখেছিল প্রথম কমিউনিষ্ট রাষ্ট্রের নারকীয় গণহত্যা যা নিষ্ঠুরতার দৃষ্টান্ত, তৈমুরদের নিষ্প্রভ করে দেয়, গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থার দুর্বলতা, ফ্যাসিবাদের অভ্যুদয় এবং ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে মহাত্মা গান্ধী পরিচালিত পৃথিবীর বৃহত্তম অহিংস মুক্তিসংগ্রাম। গান্ধি দৃপ্তকণ্ঠে বলেছিলেন, মহৎ আদর্শলাভের পন্থাও মহৎ হবে। তাঁর দৃষ্টিতে পন্থা ও লক্ষ্য ছিল অভিন্ন, আত্মিক শক্তির উন্মোচন হল সমাজ বিপ্লবের প্রকৃষ্ট উপায়। কিন্তু মহাত্মার আদর্শ পৃথিবী গ্রহণ করে নি, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ বেধে গেল অচিরেই এবং ধ্বংস ও মৃত্যু মানব সমাজকে বর্বর অন্ধকার যুগে টেনে নিল।

১৯৪৫ সালে যুদ্ধের বিরতি হল বটে কিন্তু শান্তি ফিরে এল না। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পুরাতন সাম্রাজ্যগুলিকে ভেঙ্গে দিল, চীন ও পূর্ব ইউরোপে কমিউনিজম্ প্রতিষ্ঠা পেল এবং সৃষ্টি করল বহু নতুন স্বাধীন রাষ্ট্র। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ছিল ফ্যাসিবাদ বনাম মার্কসবাদের লড়াই। ফ্যাসিষ্ট শক্তি পরাজিত হল কিন্তু ফ্যাসিবাদ মরল না।

অ-কমিউনিষ্ট পশ্চিমী রাষ্ট্রগুলির দলপতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সংক্রামিত হল ফ্যাসিবাদে। প্রভুত্ববাদের হিটলারী চিন্তা যুক্তরাষ্ট্রকে পেয়ে বসল, অন্যদিকে স্তালিনের কমিউনিষ্ট সম্প্রসারণ নীতি অব্যাহত রাখল সোভিয়েত রাশিয়া। এই দুই বিশ্বশক্তির প্রতিদ্বন্দ্বিতা বিশ্ববাসীকে মানবজাতির গভীরতম সঙ্কটে আবৃত করে রেখেছে।

বিংশ শতাব্দীতে মানুষ প্রযুক্তিবিদ্যার কিছু বিস্ময়কর সাফল্য অর্জন ছাড়া সভ্যতার উৎকর্ষ সাধনে উল্লেখযোগ্য অবদান জোগাতে পারে নি। মানুষ চাঁদে পৌঁছেছে এবং সৌর মণ্ডলের অপর গ্রহগুলির তত্ত্বানুসন্ধানে এগিয়ে গেলেও, মনোবিপ্লবের ক্ষেত্রে সে এক পদও অগ্রসর হতে পারে নি। পক্ষান্তরে মানুষ আনবিক অস্ত্রের ভাণ্ডার বাড়িয়ে তুলে বিশ্ব ধ্বংসের আয়োজন সম্পূর্ণ করেছে।

পরিবহন ও বার্তা বিনিময়ের অভূতপূর্ব উন্নতি মানুষের ভৌগলিক দূরত্ব কমিয়ে দিলেও, মানুষকে মানুষের কাছে টানতে পারেনি। সহমর্মিতা সৃষ্টির বদলে বস্তুতান্ত্রিক জীবন ব্যাখ্যা এমন এক স্বার্থসর্বস্ব মানসিকতার জন্ম দিয়েছে যা পরিবার ও সমাজের শান্তি ও স্থিতিশীলতাকে ভেঙ্গে দিতে বসেছে। ঈশ্বরকে নির্বাসন দিয়ে; ভাববাদীদের বর্জন করে এবং আত্মিক সাধনাকে অসার ভেবে তাহলে মানুষ পেল কি? সংক্ষেপে বলা যায়; মানুষ পেয়েছে আত্মকেন্দ্রিকতা: অবিশ্বাস, নিষ্ঠুর মানসিকতা, নিজেকে গোপন করে চলার কৌশল এবং এক দুর্বহ অস্থিরতা।

বিবর্তনবাদ যেমন সত্য, সংবর্তনবাদও তেমনি সত্য। সৃষ্টি রহস্য মূলতঃ অনুমান সিদ্ধান্ত নির্ভর। পরমাণু প্রকৃতি এমন এক বিস্ময়কর উপাদানে বিজ্ঞানীদের দৃষ্টি আকৃষ্ট করেছে, যাকে তাঁরা অপার রহস্যময় মনে করছেন। পরমাণু তত্ত্ব ডারউইন প্রমুখ জীববিজ্ঞানীদের অনেক সিদ্ধান্তকে ম্লান করে দিয়েছে এবং সেই সঙ্গে তলা নড়েছে জড়দর্শনের। বর্তমান

সভ্যতার চেয়ে উন্নত সভ্যতা পৃথিবীতে যে আগে ছিল না তা কে বলতে পারে।

আইনস্টাইন বলেছিলেন যে, তৃতীয় বিশ্ব সমর যদি হয় তবে তা হবে আনবিক যুদ্ধ। সেই যুদ্ধে পৃথিবীর বর্তমান চেহারা পালটে যাবে। সভ্য সমাজের কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না। চতুর্থ বিশ্বযুদ্ধ যদি কোনদিন ঘটে, তবে সে যুদ্ধে মানুষ লড়বে প্রস্তর কুঠার নিয়ে।

তাহলে এবার বুঝুন, তরুণ সমাজের সামনে প্রবীণরা কেমন ভবিষ্যৎ রচনা করে রেখেছেন। স্বার্থপর, চোর, প্রতারক, পরস্ত্রীকাতর এবং ক্ষমতা-লোলুপ প্রবীণদের ভদ্র সমাজের প্রতি যদি যুবকরা বিদ্রোহী হয় এবং প্রবীণদের প্রতি তাচ্ছিল্য দেখায় তাহলে তাদের দোষ দেওয়া যায় কি ভাবে? এ হল বিশ্ব সমাজের অবস্থা। এবার আমাদের সমাজের দিকে তাকান, সেখানেও দেখবেন ঐ একই চিত্র।

'আপনি আচরি ধর্ম পরেরে শেখায়' এই মহাজন নীতি থেকে আমাদের বহু দেশনেতা, বিপ্লববাদী, গান্ধীবাদী এবং বিদগ্ধ নরনারী কতদূর সরে গিয়েছেন তা একবার সমীক্ষা করুন, তাহলেই যুবসমাজের উচ্ছৃঙ্খল মনস্তত্ত্বের কারণ অনুধাবন করতে পারবেন। সত্যভাষণ অপ্রিয় সন্দেহ নেই, কিন্তু আজ এই সত্য উদ্ঘাটনের প্রয়োজন আছে। অতীতকে ভুলা যায়, ভবিষ্যৎ সম্পর্কে উদাসীন থাকা সম্ভব, কিন্তু বর্তমান নির্মম সত্য। মানুষ কিছুতেই বর্তমান সম্পর্কে নিস্পৃহ থাকতে পারে না।

অতৃপ্তি ও অস্থিরতার পিছনে সৃষ্টির প্রেরণা থাকে ঠিকই, যুব-সমাজের মাঝে তা যে নাই একথা বলা চলে না। তবে এই সৃষ্টির জন্য প্রয়োজন, উৎকৃষ্ট পরিবেশ, আদর্শনিষ্ঠ পাদভূমি। পুরাতন গৌরবের নিরন্তর স্মরণের দ্বারা সেই পাদভূমি তৈরি করা যাবে না। মৃত লোকের চেয়ে মৃত হল জীবন্মৃত। মরার চেয়ে জরা বেশি স্থবির। প্রবীণ বিপ্লবী মুক্তিযোদ্ধাদের মুখে পড়ন্ত রোদের নিষ্প্রভ আলো, ঝলকানি নেই সে আলোতে, কিন্তু তাঁরা প্রাণ-প্রাচুর্যহীন নন। তাঁদের মধ্যে অনেকেরই মনের কোণে বিপ্লবের রক্তিমাভা ধরা আছে। আকাশে যখন বিদ্যুৎ চমকায়, চারিদিকে ঝড়ের নিশানা, তখন পথহারাদের সঠিক ঠিকানা দেবার জন্য তাঁরা কি একবার উঠে দাঁড়াবেন না?

——

পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে শুভ সূচনা

বংশীধর বন্দ্যোপাধ্যায়

শক্তি মদগর্ব্বী বামফ্রন্ট তথা সি, পি, এম দলের শীর্ষনেতা প্রমোদ দাসগুপ্ত সাম্প্রতিক রাজ্যসভা নির্ব্বাচনের পূর্ব্ব মুহূর্ত্তে নির্দল প্রার্থী কলিকাতা হাইকোর্টের অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি শ্রদ্ধেয় শঙ্করপ্রসাদ মিত্রের রাজ্যসভায় নির্ব্বাচিত হওয়া প্রায় অসম্ভব বলে নানা সংখ্যাতত্ত্বের মাধ্যমে কৌশলী প্রচারে ব্যস্ত হয়ে পড়েন। অকমিউনিষ্ট বিধানসভা সদস্যের পরিসংখ্যান উল্লেখকরে, তিনি জনমনে ও বিধান-সভা সদস্যদের মনে এক ভ্রান্ত ও উদ্দেশ্য প্রণোদিত ধারণার সৃষ্টি করার দুষ্কর আকাঙ্খায় এমন সব ভাষণ ও বিবৃতি দিতে থাকেন সংবাদপত্রে যে শঙ্কর মিত্রের নিশ্চিত নির্ব্বাচিত হওয়ার পথে জনমনে বেশ সংশয় দেখা দেয়। ফলে অকমিউনিষ্ট বিধান-সভা সদস্যরাও তাঁদের বিভিন্ন দলের দলপতিরাও বেশ শংকিত হয়ে পড়েন। কংগ্রেস (ই) জনতা, বি, জে পি, কংগ্রেস (অ), মুসলীম লীগ, খৃষ্টান ডেমোক্রেটিক দল ও বামফ্রন্টের অন্যান্য বিরোধীরা সকলে একযোগে সংঘবদ্ধ শক্তি নিয়ে শঙ্কর বাবুর জয়কে নিশ্চিত করার শুভ সংকল্পে একতাবদ্ধ হয়। অকমিউনিষ্ট রাজনৈতিক শক্তিগুলি দৃঢ় চিত্তে বাম-ফ্রন্টের বিরোধীতায় অগ্রসর হওয়ার পথে যে প্রয়াস চালায় রাজ্যসভার নির্ব্বাচনকে উপলক্ষ্য করে তা সফল হয়েছে শেষ পর্য্যন্ত।

শ্রদ্ধেয় শঙ্কর মিত্র সর্ব্বাধিক ভোটে জয়ী হয়ে পশ্চিমবঙ্গ থেকে রাজ্যসভার সদস্য নির্ব্বাচিত হয়েছেন, বামফ্রন্টের সকল কারসাজি ও অপপ্রচারকে স্তব্ধ করে দিয়ে। তাঁর এই জয়ে পশ্চিমবঙ্গের জাতীয়তাবাদী মানুষ ও শ্রেষ্ঠ বুদ্ধিজীবিরা সকলেই আনন্দিত। পশ্চিমবঙ্গ সি, পি, এম এর দুর্ভেদ্য দুর্গ বলে প্রমোদবাবু মনে করেন ও প্রচার করেন। সেই দুর্গ যে এভাবে অকমিউনিষ্ট শক্তি ধরেরা ধীর পদক্ষেপে দখল করতে পারবে তা পূর্ব্বে বামফ্রন্টের বিরোধীরা যে রাজনৈতিক দলভুক্তই হোক না কেন, তারা যে প্রত্যেকেই মূলতঃ কমিউ-নিষ্ট বিরোধী সে কথা স্মরণ রেখে, তাঁরা যদি সি পি এম দলের বিরোধীতায় এই ভাবে একযোগে জোট বদ্ধ হয়ে সংগ্রামে নামেন তবে নিশ্চয় সি, পি, এম দলের হাত থেকে তাঁরা ক্ষমতা কেড়ে নিতে পারেন আগামী সাধারণ নির্ব্বাচনের সময়ে। পশ্চিমবঙ্গে সি. পি, এম দলকে কোনঠাসা করার উপায় মাত্র একটাই ও তা হচ্ছে ওদের মিথ্যা ও উদ্দেশ্যমূলক প্রচারের মুখোস জন সমক্ষে খুলে দেওয়া ও সমস্ত বিরোধী দলগুলিকে একজোট করে সংঘবদ্ধ শক্তি নিয়ে সি, পি এম এর বিরুদ্ধে এখনই যৌথ-আন্দোলনে নামা. এরাজ্যের জনগণকে সাথে নিয়ে। পশ্চিমবাংলার অকমিউনিষ্ট শিক্ষক সম্প্রদায়, বুদ্ধি-জীবি, যুব-ছাত্র, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী, দোকানদার, আইন ব্যবসায়ী, ছোট ছোট জোতের মালিক, খেতমজুর, শ্রমিক-কর্মচারী, কৃষক সম্প্রদায় ও সধারণ মানুষ যে ভাবে সি, পি, এম দলের দলবাজী, স্বৈরতন্ত্রী শাসন ব্যবস্থা, পক্ষপাতদুষ্ট পঞ্চায়েতী ব্যবস্থা, অন্যায়, অত্যাচার, অবিচার ও সর্বক্ষেত্রে চরম ব্যর্থতা এবং উদ্দেশ্য প্রণোদিত হীন মিথ্যা প্রচার ইত্যাদিতে তিতেবিরক্ত ও অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে ; তার হাত থেকে নিস্তার পাবার পথ দেখাতে হবে উক্ত অকমিউনিষ্ট রাজনৈতিক দল সমষ্টিকে যৌথ ভাবে সংঘবদ্ধ

ঐকান্তিক প্রয়াস ও বাস্তব কর্মপ্রচেষ্টার মাধ্যমে। সি, পি, এম বিরোধী গণ আন্দোলন গড়ে তোলার প্রশস্ত সময় সমাগত এখনই। কাজেই কংগ্রেস (ই) জনতাদল, বি জে-পি দল, কংগ্রেস (আ) ও অন্যান্য সি, পি এম বিরোধী দলগুলিকেই গণ-আন্দোলনের প্রস্তুতি নিতে হবে অবিলম্বে। পশ্চিমবঙ্গের মানুষ অকমিনিস্ট দলগুলির একতাবদ্ধ শক্তির উপর আস্থাশীল। তাই তারাও এগিয়ে আসবে স্বেচ্ছায় উক্ত গণ-আন্দোলনের সামিল হবার দুর্জয় সংকল্প নিয়ে। নেতৃত্বের ভরসায় অপেক্ষমান। শঙ্কর মিত্রের জয় পশ্চিমবঙ্গে রাজনীতির মোড় ফিরিয়ে দিয়েছে। এখন আর কমিনিষ্ট বিরোধীদের পরস্পরের নিকট থেকে দূরে দূরে থাকার বা বিচ্ছিন্নভাবে থাকার অবসর নেই।

সম্মিলিত শক্তিকে সুসংহত ও সুসামঞ্জস্যপূর্ণ জোরে বিরোধী দলগুলিকে এগিয়ে আসতে হবে স্থির সংকল্পে ও দৃঢ় চিত্তে, যাতে পশ্চিমবঙ্গের মানুষ স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলতে পারে।

বিগত প্রায় চার বছর বামফ্রন্টের স্বার্থ রাজনীতির বলি পশ্চিমবঙ্গবাসী। মানুষের সহ্যের সীমা অতিক্রান্ত প্রায়। বামফ্রন্টের পতন নিশ্চিৎ করণে বিরোধীদের তৎপর হবার সময় আসন্ন। আর অবহেলায় সময় নষ্ট করা সমুচিত নয় কখনো। শঙ্কর মিত্রের জয় বামফ্রন্ট বিরোধীদের মনে নূতন বল ও ভরসা এনেছে। এর থেকে প্রেরণাও পেয়েছে তারা। এখন বিরোধীদের আশু কর্তব্য নিজেদের মধ্যে অতীতের ভুল ভ্রান্তিকে ভুলে গিয়ে নূতন ভাবে পরস্পরের সন্নিকটবর্তী হওয়া ও পারস্পরিক সমঝোতার ক্ষেত্রকে সম্প্রসারিত করা জাতীয় স্বার্থে। দলের চেয়ে দেশ বড়, কাজেই দেশ স্বার্থে বামফ্রন্ট সরকারকে উৎখাত করার সময় এসেছে, জনকল্যাণকে নিশ্চিত করার মহান কর্তব্যবোধে।

ইতিপূর্বেই বামফ্রন্ট তথা সি, পি, এম দল এরাজ্য শাসনের ক্ষমতা হাতে পেয়ে বিভিন্ন বিষয়ে এমনই অসাম্য ও অরাজকতা সৃষ্টি করেছে যে, জনগণ এদের শাসন কালে গভীর দুঃখে নিপতিত। উপরোক্ত দেশে আইন শৃঙ্খলা বিপর্যস্ত, খুন জখম, রাহাজানি, ডাকাতি এমনকি নারী নির্যাতন ও নারী ধর্ষণ প্রায় নিত্য দিনের অবশ্যম্ভাবী ঘটনা। এরাজ্যে ধর্ষিতা নারী বা তাঁর স্বামী পরিচিত অপরাধীকে সনাক্ত করতে ভীত হয় প্রাণনাশের আশংকায়। আদালতের ভিতরে পর্যন্ত দুষ্কৃতকারী বা তার দলের লোকেরা বাদীকে প্রাণের ভয় দেখাতে সাহস পায়, কারণ সি, পি, এম দল পুলিসকে নিষ্ক্রিয় করে রেখেছে সর্বকাজে। সম্প্রতি আদালতের রায়ে এর প্রমাণ পাওয়া যায়, যা অতীতে অন্য কোনও দলের শাসনকালে এরূপ ইন ও নোংরা নজির দেখতে পাওয়া যায় না। এর পরও সি, পি, এম গলাবাজী ও দলবাজী করে পশ্চিম বঙ্গের মানুষকে দাবিয়ে রাখতে চায় কোন স্বার্থে? দেশবাসী সচেতন হয়েছে এদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে, কিন্তু সবল ও সংঘবদ্ধ নেতৃত্বের অভাবে তারা মনে হয় কিংকর্তব্য বিমূঢ় হয়ে পড়েছে। মানুষের দীর্ঘশ্বাস অহরহ পড়ছে উক্ত নক্কারজনক ঘটনার পুনঃ পুনঃ সংঘটনে, অথচ সরকার নীরব দর্শক মাত্র। বামফ্রন্ট সরকার এসব কারণে লজ্জিত হওয়ার পরিবর্তে আস্ফালনে মত্ত। এর পরও কি বর্তমানে সরকারের বিরোধীরা নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে থাকবেন, না এই সরকারের পতনকে ত্বরান্বিত করার জন্য সংঘবদ্ধ শক্তিকে একত্রিত করে গণ-আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়বেন জনস্বার্থে? আশা-করি তাঁরা এবার নিশ্চিৎ আঘাত হানবেন উক্ত

সরকারের বিরুদ্ধে।

শিক্ষার ক্ষেত্রে যে নির্লজ্জ দলবাজী ও নৈরাজ্য এসেছে সি. পি. এম. তার প্রতিকারের কোন শুভ ও সক্রিয় প্রচেষ্টা করছে না অদ্যাবধি। বাংলার প্রবিতযশা বুদ্ধিজীবিরা অবশ্য এ বিষয়ে সজাগ ও সতর্ক দৃষ্টি রেখেছেন এবং বার বার এর প্রতিকার মানসে আন্দোলনের পথে রাস্তায় নেমে এসেছেন। প্রফেসর শঙ্কর মিত্র তাঁদেরই একজন এবং সে কারণে তাঁর জয় বাংলার বুদ্ধিজীবিদের জয় বলেই মনে হয়

জাতীয়তাবাদী কবি, সাহিত্যিক, শিক্ষক ও ছাত্র সম্প্রদায় যথাসময়ে বামফ্রন্টের ভ্রান্ত ভাষা ও শিক্ষা নীতির বিরুদ্ধে যে ভাবে সক্রীয় প্রতিরোধ গড়ে তোলে জনগণের সাহায্যে ও সহযোগীতায় তা এ রাজ্যের জনচিত্তে বেশ আলোড়ন সৃষ্টি করে, কিন্তু সি. পি, এম তার স্বৈরতন্ত্রী প্রশাসন ব্যবস্থা অনবরত দলীয় স্বার্থের জন্যই ভুল পথে পরিচালনায় বদ্ধপরিকর। ফলে এ রাজ্যে শিক্ষার ক্ষেত্রে এক ভয়াবহ শূন্যতা সৃষ্টি হয়েছে যা নিন্দনীয় সর্ব্বকালে সর্ব্বত্র। তবুও শাসক শ্রেণীর মধ্যে কোন গণতান্ত্রিক চেতনার লক্ষণ এখনো দেখা যায় নি। এরাজ্যে সি পি এম দলের প্রভাব ও প্রতিপত্তিকে চিরস্থায়ী করার হীন ষড়যন্ত্রে লিপ্ত বর্ত্তমান শাসকগণ। এদের কাছে দলীয় লোকেদের শত অপরাধ মার্জ্জনীয়। ফলে পক্ষপাত দুষ্ট দলীয় শাসন ব্যবস্থায় সাধারণ মানুষ হাঁপিয়ে উঠে ত্রাহি ত্রাহি রব তুলছে প্রতিনিয়তই দেখা যায়। প্রতিকারহীন এরূপ দলীয় শাসন ব্যবস্থায় পশ্চিমবঙ্গ তার শিল্প বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ক্রমশই পেছিয়ে পড়ছে, কারণ সিটুর শ্রমিক ইউনিয়নগুলি সর্বক্ষেত্রেই বিশেষ সুবিধা ভোগ করছে ও উৎপাদন ব্যাহত করে শ্রমিক কর্মচারীদের আস্থা অর্জনে সফল হচ্ছে। কমিউনিষ্টরা সারা ভারতে কৃষি ক্ষেত্রে ও শিল্প সংস্থায় উৎপাদনকে সীমিত করে দল পুষ্টিতে সক্ষম হয়েছে অতীতে এবং বর্ত্তমানেও তারা সেই একই নীতি আঁকড়ে আছে শ্রমিক কর্মচারীদের তোষণ করে, যা জাতীয় স্বার্থের পরিপন্থী ও চরম ক্ষতিকর। কমিউনিষ্টরা অতীতে ১৯৪২ সালে জনযুদ্ধের ধুয়ো তুলে ভারতের স্বাধীনতার পথে কাঁটা দেবার চেষ্টা করেছিল। তাদের দল বাড়াবার অদম্য চেষ্টা ছিল শ্রমিকদের ও কৃষকদের হাত করে এবং সেই আশাকে ফলবতী করার জন্যই দলীয় স্বার্থে তারা দেশের উৎপাদনকে আশাগোড়া ব্যাহত করে এসেছে। দেশের বদলে বিদেশের স্বার্থকে তারা চিরদিন প্রশ্রয় দিয়ে এসেছে। ১৯৬২ সালে চীনের ভারত আক্রমণকে তারা স্বাগত জানিয়েছিল দলীয় স্বার্থে। বরাবর এরা ভারত রাষ্ট্রের ক্ষতিই করেছে। প্রকৃত জনকল্যাণকর কোন কাজেই এদের কখনও সক্রিয় দেখা যায় নি। এরা এতকাল জনগণের কাছ থেকে বিচ্ছিন্নই ছিল। হালে পশ্চিমবঙ্গে, কেরলায় ও ত্রিপুরার ক্ষমতা দখল করে এরা ধরাকে সরা জ্ঞানে বেপরোয়া ভাবে প্রশাসনকে নিয়ন্ত্রণাধীন করতে উদ্যত।

পশ্চিমবঙ্গের সরকার বিরোধীরা সকলে এক জোট হয়ে যে ভাবে প্রমোদবাবুর কমিউনিষ্ট চক্রান্তকে ব্যর্থ করে শঙ্কর প্রসাদ মিত্রকে রাজ্য সভার নির্বাচিত করে সংঘশক্তির পরাকাষ্ঠা দেখালেন এবং এরাজ্যের রাজনীতির মধ্যে যে শুভ চেতনার সঞ্চার করলেন ; সেই শুভচেতনার প্রসার ভবিষ্যতে ঘটালে পশ্চিমবঙ্গ কমিউনিষ্ট কবলমুক্ত হয়ে জাতীয়তাবাদী শক্তির শাসনে লক্ষিত পালিত ও সদা সুস্থ রাজ-

নীতির দ্বারা অবস্থান কোরে ধীরে ধীরে উন্নতির শিখরে আরোহণে সক্ষম হবে। অকমিউনিষ্ট রাজনৈতিক দলগুলি সংঘবদ্ধ হলে সি পি এম পরাভূত হতে বাধ্য হবে; কারণ দেশবাসী সি. পি এমদের হাড়ে হাড়ে চিনেছে এবং বুঝছে যে, ওরা অংসের মূর্ত বিগ্রহ। সৃষ্টির বা শুভ কিছুর সম্ভাবনা ওদের মধ্যে নেই। জাতীয়তাবাদী রাজনৈতিক দল বা দল সমষ্টিই ভারতে প্রকৃত জনকল্যাণ ব্রতী। কমিউনিষ্টরা কখনই নয়, যেহেতু তারা বিদেশের অঙ্গুলী হেলনে পরিচালিত হয়। ব্যক্তি স্বার্থ সংরক্ষণেও উচ্চাভিলাষ পূরণে যে সব রাজনীতিবিদ সদা ব্যস্ত, তারা কিন্তু রাজ্যসভার নির্বাচনে নিজদলের অনুশাসন অগ্রাহ্য করে শঙ্কর মিত্রের পরিবর্তে অন্য প্রার্থীকে ভোট দিয়েছে. যদিও তারা সংখ্যায় নগন্য তথাপি ঐ সব কালো ভেড়ার উপর দলের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখা একান্ত প্রয়োজন। দলের নিষ্ক্রিয় অসাধু কারীদের দল থেকে বহিষ্কার করা বিশেষ দরকার, অন্যথায় দলের মধ্যে শৃঙ্খলা রক্ষা কঠিন হয়ে পড়বে। কংগ্রেস (ই) দলের পশ্চিমবঙ্গ শাখায় গোষ্ঠী কোন্দল মাঝে মাঝে এমন মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে যে, তাতে সমগ্র দলের ভাবমূর্তি জনচোখে ম্লান হয়ে যায়, যা কারোরই অভিপ্রেত নয়। সি পি, এমকে হটাতে হলে কংগ্রেস (ই) দলকে আরো সংহত ও সংবদ্ধ হতে হবে, নচেৎ কূলে এসে তরী তাদের ডুব্‌বে নিজ দোষেই। জনতাদলের পশ্চিমবঙ্গ শাখার এবারে টিম্‌ওয়ার্ক যা দেখা গেল তা নিসন্দেহে উত্তম বলা যায়। বি জে-পি দল অর্থাৎ প্রাক্তন জন সংঘ বরাবরই বেশ সুসংযত ও সুসংহত দল। এঁদের শৃঙ্খলাবোধ অনুকরণীয় অন্যান্য জাতীয়তাবাদী রাজনৈতিক দল গুলির কাছে। দলছুটের সম্বন্ধে সর্বদা কঠিন ও কঠোর মনোভাব গ্রহণ সব দলের পক্ষেই শুভ। পশ্চিমবঙ্গের সাধারণ মানুষ মার্ক্সবাদ তথা সি, পি, এম দলের দলীয় শাসন ব্যবস্থার বর্তমানে এরূপ মুহ্যমান ও হতাশাগ্রস্থ যে, তারা এই স্বৈরতান্ত্রিক প্রশাসনের হাত থেকে মুক্তি চায় এখনই. কিন্তু বহুধা বিভক্ত জাতীয়তাবাদী রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে সমন্বয়ের ও সমঝোতার অভাব লক্ষ্য সি, পি, এম এর বিরুদ্ধে দুর্বার গতিতে অগ্রসর হতে বা গণ-আন্দোলনের পথে পা বাড়াতে দ্বিধাগ্রস্থ। তাদের ঐরূপ হতাশাব্যঞ্জক মনোভাব এখনই ভাঙ্গা হয়ে উঠবে, যদি তারা বাস্তবক্ষেত্রে দেখে যে বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলি জোট বদ্ধ হয়ে সংগ্রামে অবতীর্ণ হতে প্রস্তুত। রাজ্যসভার নির্বাচনে যে যৌথ প্রচেষ্টা কার্যকরী হল তা জনগণের মনে নূতন আশা ও আকাঙ্খাকে উজ্জীবিত করেছে। কাজেই এই মুহূর্তে বিরোধীরা একযোগে সম্মিলিত শক্তিকে একত্রিত করে সি, পি, এম দলের অরাজক শাসন ব্যবস্থার বিরুদ্ধে সংগ্রামের পথে দৃঢ় পদক্ষেপে আগুয়ান হবে বলে বিশ্বাস হয়। জনগণ প্রস্তুত পূর্ব থেকেই, এখন নেতৃত্ব পশ্চিমবঙ্গে যে শুভ সূচনার প্রকাশকে সম্ভব করে জন মনে আস্থা অর্জন করলেন; তার বিকাশ তাদেরই ঘটাতে হবে পশ্চিম বঙ্গের সর্বাঙ্গীন কল্যাণ কামনায় এবং তা যত দ্রুত গতিতে ও সুসংবদ্ধভাবে বাস্তবায়িত হয় ততই মঙ্গল। কংগ্রেস (ই), জনতা, বি জে-পি, কংগ্রেস (আ) ও অন্যান্য ছোট ছোট বিরোধী দলগুলি এ রাজ্যের মানুষের মনে যে সুস্থ পরিবেশে, শৃঙ্খলা পরায়ণ অবস্থায় ও নিঃশঙ্ক চিত্তে বাঁচার মত ব্যবস্থা সৃষ্টিতে সক্ষমতার প্রতিশ্রুতি আনতে সচেষ্ট তা প্রমাণ করার নিমিত্ত তাঁরা সকলে একজোট হয়ে রাজ্য সভার নির্বাচনে দৃষ্টান্ত স্থাপন করলেন। এই সূচনা পশ্চিমবঙ্গেই সর্বপ্রথম দেখা গেল, যা প্রকৃতই আশাপ্রদ মঙ্গলজনক

পশ্চিম বাংলায় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠান

—জনৈক কংগ্রেস কর্মী

পশ্চিমবাংলায় শিল্পক্ষেত্রে, কৃষিক্ষেত্রে, শিক্ষা-ক্ষেত্রে, বিদ্যুৎ উৎপাদন, পরিবহন, জলসরবরাহ প্রভৃতির মত জনজীবনের ভাগ্যের সঙ্গে জড়িত প্রায় সর্বক্ষেত্রেই একটা শ্বাসরোধকারী অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। আইন শৃঙ্খলার কথা ত বলার কোন অপেক্ষা রাখে না। সঙ্ঘবদ্ধভাবে সমাজবিরোধীরা গৃহবধূর সতীত্ব নষ্ট করছে, কথায় কথায় মানুষ খুন করে চলেছে, তাদের আদালত কক্ষে সনাক্ত করতে পারছেন না জীবনের ভয়ে, একথা সেদিন বিচারক দুঃখের সঙ্গে প্রকাশ করেছেন। বর্তমান প্রশাসক-দলের নেতাদের কোন চেতনা নেই। হয় তারা দলীয় স্বার্থের খাতিরে এই সব মস্তানদের সায়েস্তা করছেন না, অথবা এরা তাঁদের আয়ত্তের বাইরে চলে গিয়েছে। পুলিশও দলীয় অথবা প্রশাসনের হস্তক্ষেপের ফলে নীরব দর্শক হয়ে আছে। কিন্তু সাধারণ মানুষের জীবন ত দুর্বিসহ হয়ে উঠেছে। তাদের সঙ্ঘবদ্ধতার অভাবে, তারা কোন সক্রিয় ব্যবস্থা নিতে পারছে না। পড়ে পড়ে তাদের মার খেয়ে সব অপমান হজম করতে হচ্ছে। গণতন্ত্রে কমিউনিষ্ট মতাদর্শের লোকেদের প্রাধান্য থাকায়, জনগণের শান্তিপূর্ণ পরিবেশে বাস করবার অধিকার হারাচ্ছে, যেটা একটা গণতান্ত্রিক দেশের একটি মৌল অধিকার বলে সর্বজনস্বীকৃত। কমিউনিষ্টদের নিকট গণতন্ত্র বা গণতান্ত্রিক অধিকারের কোন মূল্য নেই। যারা অহরহ গণতন্ত্র রক্ষার ধুয়া তুলছে, তারা হয় কমিউনিষ্ট নয়, অথবা সাধারণ মানুষকে একটা বিরাট ধোঁকা দিচ্ছে। তাদের কৌশলই হচ্ছে, এলো মেলো করে দে মা, লুটে পুটে খাই।

কিন্তু কংগ্রেস দল ত গণতন্ত্রের ধারক ও বাহক বলে দাবী করে। মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার এই ভাবে পদদলিত হতে দেখে তারা কি করছেন? সকালে সন্ধ্যায় দিল্লী যেয়ে নেতাদের নিকট ধর্ণা দিয়েই সব কর্তব্য শেষ হচ্ছে বলে ধরে নিয়েছেন? সেখানে কি কাজে তারা লিপ্ত হন? একে অন্যের গায়ে কাদা ছুঁড়ে নিজ গোষ্ঠীর প্রাধান্য বজায় রাখার হাস্যকর প্রচেষ্টায় সর্বশক্তি ব্যয় করছেন। কেন্দ্রীয় স্তরে শোনা যায় দুটি ধারা প্রবাহিত আছে। একটি প্রণববাবুর ধারা, অন্যটি বরকত আলি সাহেবের ধারা।

তারা আবার নিজ নিজ প্রাধান্য বজায় রাখার জন্য রাজ্যস্তরে সুব্রত শাখা বা সৌমেন শাখাকে প্রবাহিত রাখতে অশোভন ভাবে আগ্রহী। কিন্তু এটা কি হচ্ছে? পশ্চিমবাংলা রাজ্যটাকে কি কেউ অজিত প্রণব-গণিখান-সুব্রত-সৌমেন কোম্পানীকে কেউ ইজারা দিয়েছে যা খুশী তাই করার জন্য? পশ্চিম বাংলার মত একটি বিরাট ঐতিহ্যপূর্ণ রাষ্ট্রের ভাগ্য নিয়ে এখন ছিনি মিনি খেলার অধিকার তাদের কে দিয়েছে? এখনকার মানুষ অত্যাচার, নিপীড়নে অতিষ্ট।

এই রাজ্যের শিক্ষা সংস্কৃতি বিপন্ন। এই রাজ্যে মানুষের জীবন সর্বস্তরে প্রায় বিধ্বস্ত। মানুষের এই দুর্দিনে তাদের নিজেদের ব্যক্তিগত স্বার্থ বা গোষ্ঠীগত স্বার্থ সাধনে মত্ত এই ধান্দাবাজরাই কি কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানের পরিচালক থাকবেন এই রাজ্যে? তাদের হাত থেকে প্রতিষ্ঠানের নেতৃত্ব কেড়ে নিয়ে যোগ্য, সৎ, ও জনদরদী লোকের হাতে তুলে দেওয়া হবে না কেন, এই প্রশ্নই রাখছে সাধারণ সৎ কংগ্রেস কর্মিরা। এই দাবী করে তারা অবিলম্বে।

আমরা কংগ্রেসের উচ্চতম নেতৃবৃন্দের নিকট এই দুর্বিসহ অবস্থার অবসান দাবী করেছিঃ কিন্তু

দোষের সঙ্গে বলতে বাধ্য হচ্ছি তার কোন প্রত্যক্ষ সংশোধনমূলক ব্যবস্থাগ্রহণের অভাব দেখে। একবার শ্রীমতী বাজপেয়ী আসছেন, একবার শ্রীসুখাড়িয়া আসছেন। কিন্তু কি তাদের প্রতিক্রিয়া, কি তাদের মন্তব্য এই অবস্থার প্রতিকার করে, তার কোন পরিচয় পশ্চিমবাংলার মানুষ প্রত্যক্ষ করছে না। এই দিল্লী যাত্রার ক্লান্তিকর ছবির বারংবার প্রদর্শনী দেখতে পাচ্ছে। তবে কি ধরে নিতে হবে যে দিল্লীর নেতারা এই ছবির প্রদর্শনী খুব উপভোগ করছেন? শ্রীমতী গান্ধীর নেতৃত্ব আজ বিশ্বজন স্বীকৃত, যেটা প্রমাণিত হচ্ছে প্রায় প্রতিদিনই বিভিন্ন দেশের নেতৃবৃন্দের সমাগমে। জানতে ইচ্ছা হয়, তিনি কি উদাসীন হোতে সম্প্রতি? তিনি কি অসহায় বোধ করছেন যোগ্যতর লোকের অভাবে? কোনটাই বিশ্বাস করতে মন চায়না। যোগ্য লোকের অভাব আজো ঘটেনি এরাজ্যে খোঁজ করলে, সংযোগ স্থাপন করার চেষ্টা করলেই তাদের সন্ধান মিলবে। কিন্তু প্রশ্নটা হল, সেই আন্তরিক প্রচেষ্টা কি করা হয়েছে বা এখনও হচ্ছে। তবে একটা কর্তব্য পালন করতে হবে সবার আগে। কেন্দ্রীয় নেতৃত্বকে আগাছা মূলসমেত তুলে ফেলতে হবে। যারা এই ঘোট পাকিয়েছে, তাদের শত যোজন দূরে রাখতে হবে। প্রায়শ্চিত্ত করে ভবিষ্যতে যোগ্যতার স্বাক্ষর রাখতে পারেন, তখন তাদের কথা বিবেচনা করা যেতে পারে। গ্যাংগ্রীণ হলে যেমন জীবন রক্ষার খাতিরে শরীরের অঙ্গবিশেষ কেটে বাদ দিতে হয়। এক্ষেত্রে সেই পথ নিতে হবে। অন্যথায় পচনক্রিয়া এক অংশ থেকে গোটা জীবনকে বিপদগ্রস্ত করে তোলে। এদের কেটে ছেটে বাদ না দিলে, এরাই প্রতিষ্ঠানের রন্ধ্রে রন্ধ্রে পচনক্রিয়া পরিব্যাপ্ত করে তুলবে।

তা ভিন্ন, পশ্চিমবাংলার রাজনৈতিক পরিস্থিতিকে বিশ্লেষণ করতে হবে সমগ্র ভারতের স্বার্থের পরিপ্রেক্ষিতে। এখানে দুইটি বিভিন্ন প্রকারের মতবাদ বিভিন্ন মেরু অভিমুখী হয়ে কাজ করছে (Polarisation)। একটি একনায়কতন্ত্রের অনুরাগী হয়ে ক্ষমতার আসন দখলে রেখে ছলেবলে কৌশলে মতলব হাসিল করতে চাইছে। অন্যধারাটি হল গণতান্ত্রিক ও জাতীয়তাবাদী ধারা। এখানে এই দ্বন্দ্বের পরীক্ষা চলছে। জাতীয়তাবাদী শক্তি যদি একনায়কতন্ত্রের তল্পিবাহকদের কথতে না পারে, তবে তার প্রভাব পড়বে সারা ভারতে। তখন কেন্দ্রীয় নেতৃত্বকে চরম অসুবিধার সম্মুখীন হতে হবে। কাজেই পশ্চিমবাংলার রণাঙ্গণে তুষ্টীভাব গ্রহণ করলে, তার পরিণতি কত ভয়াবহ হতে পারে, সেটা এখনই প্রণিধান করতে হবে। বিশ্ব-পরিস্থিতি সংগ্রামমুখর। সাম্রাজ্যবাদীরা ও একনায়কতন্ত্রীরা দেশের মধ্যে বিভিন্ন রাজ্যে বিচ্ছিন্নতাবাদী ও দেশের নিরাপত্তা ও সংহতি বিনাশকারীদের মদত দিচ্ছে এবং দিতেও থাকবে নিজেদের হীন স্বার্থ সাধনের মতলবে। অঙ্কুরেই যদি এই জাগ্রত জাতীয়তা-বিরোধী শক্তির মোকাবিলা করে তাদের বিনাশ সাধন না করা যায়, তবে সমূহ সর্বনাশ হবেই। এখন চুপচাপ বসে থাকলে অবস্থাটা হবে সেই 'ঘুটে পোড়ে, গোবর হাসে' প্রবাদের মত।

শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর নেতৃত্বকে আজ চ্যালেঞ্জ জানাচ্ছে এই অশুভ শক্তি। কালহরণ করলে সময়ে সজাগ ও সক্রিয় না হলে, শুধু তাঁর নেতৃত্বই বিপন্ন হবে না, গোটা দেশের ভবিষ্যৎ বিপদগ্রস্ত হবে। তাই কংগ্রেস কর্মীদের বিনীত আবেদন, প্রতিষ্ঠানের lock stock and fanel, অর্থাৎ

(১২ পৃঃ দেখুন)

রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্র নাথের স্মৃতি কথা

["A Nation In Making" গ্রন্থ থেকে অনুবাদ]

অনুবাদক—অধ্যাপক নলিনীমোহন দাসগুপ্ত

দ্বৈত শাসন

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

মন্ত্রীরূপে আমি যে কাজ করেছি তার বিবরণ হয়ত বা কিছুটা বিস্তারিত ভাবেই দিয়ে ফেলেছি। তবে তা ব্যক্তিগত কারণে ততটা নয় যতটা শাসন সংস্কারের সমর্থনে করেছি। এ রকম একটা সোর-গোল উঠেছে – এবং এখানে তা কাউন্সিল ভবনেই উঠেছে, যে শাসনসংস্কার আসলে একটা ভুয়া ব্যাপার এবং দ্বৈত শাসন ব্যবস্থা সম্পূর্ণরূপে নিষ্ফল হয়েছে। এক অর্থে এ আক্রমণটা পুরান প্রসার আক্রমণেরই একটা নতুন রূপ মাত্র। এই শাসন সংস্কারের কথা প্রথম যখন প্রকাশিত হয় তখনও চরমপন্থী রাজ-নৈতিকগণ কর্তৃক উহার তীব্র নিন্দা করা হয়। তাই একটা কঠিন, এমনকি বিরোধিতার পরিবেশের মধ্যেই শাসন সংস্কারের কাজ শুরু হয়।

মেষ্টনী বন্দোবস্ত শাসন সংস্কারের কাজ গুরুতর ভাবে ব্যাহত করে এবং হস্তান্তরিত বিষয়ে কঠোর নিয়ম-কানুন শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও অন্যান্য বিভাগের সম্পর্কটি পরি-কল্পনাগুলি কাজে লাগান ও প্রসারণের ক্ষেত্রে বাধা হয়ে দাঁড়াল। লেজিসলেটিভ কাউন্সিলের প্রথম অধিবেশনের পরেই 'দ্বৈত শাসন ভেস্তে গেছে' বলে ধ্বনি তুলে নতুন করে আক্রমণ শুরু হয়। নতুন শাসন পদ্ধতির আসল বস্তুটাই হল ভারাকি দ্বৈত শাসন। সুতরাং যদি একথা মেনে নেওয়া হয় যে দ্বৈত শাসন বিফল হয়েছে, তাহলে শাসন সংস্কার-কেই বাদ দিতে হয়—অন্ততঃ বর্তমানে উহা যে কাঠামোতে আছে সেই কাঠামোকে বাদ দিতে হবে। সে ক্ষেত্রে দুইটি অবস্থা এসে পড়ায় যার একটিকে অবশ্যই মেনে নিতে হবে। হয় পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন-মূলক দায়িত্বশীল গঠনের অধিকার অথবা সেই পুরাতন আমলাতান্ত্রিক শাসন পদ্ধতি এ দুটির মধ্যে একটিকে গ্রহণ করতেই হবে। কোনটা গ্রহণ করা হবে তা অবশ্যই নির্ভর করে পার্লামেন্টের বিচার বিবেচনার উপর।

পার্লামেন্টের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত কি হবে, তা আমরা আগে থেকেই বলতে পারিনি। কিন্তু পার্লামেন্ট ব্রিটিশ গণতন্ত্র ভারতে দায়িত্বশীল শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তনের গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা সম্পর্কে তাদের সুস্পষ্ট অভিমত আগেই ব্যক্ত করেছেন। অবশ্য তারা তাদের মত বদলাতে পারেন। আমি আশা করি তারা যদি মত বদলান তবে তা নতুন অগ্রগতির পথেই যাবে। (চলবে)

(১১ পৃঃ পর)

আমূল পরিবর্তন করে, নতুন নেতৃত্বের উপর দায়-দায়িত্ব অর্পণ করে আসন্ন চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করুন। যারা এতদিন আত্মকলহে নিমগ্ন থেকে কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানের সমূহ ক্ষতি করেছেন, তাদের বিশ্রাম নিতে বাধ্য করুন। তাদের সুস্পষ্ট ভাষায় বলে দিন অনেক জল ঘোলা করেছেন মৎস শিকারের লোভে, আর নয়। স্বেচ্ছায় অবসর গ্রহণ করুন, অন্যথায় গ্রীবাদেশে হস্ত স্থাপন করে, রাজপথ দেখিয়ে দিন। এই লড়াইয়ে আন্তরিকতার সঙ্গে নিষ্ঠার সঙ্গে, দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে কাজ না করলে কারো পরিত্রাণ থাকবে না। আমাদের এখনও বিশ্বাস, কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব এতটা দেউলিয়া হয়নি। বন্দেমাতরম।

Regd No. R. N. 24511/71 | Biplabi Bangla | Regd. W B/NC 77
Phone : 34-1795
বার্ষিক :—ডাকমাশুল সহ ১৪.০০ টাকা | ষাণ্মাসিক :—৮.০০ টাকা | মূল্য—৩০ পয়সা

পাক সেনাপতি টিক্কা খানের জল্লাদবাহিনী যে গ্রন্থ পুড়িয়ে ছাই করে দিয়েছিল বিপ্লব তাপস মহারাজ ত্রৈলোক্যনাথের সেই অবিস্মরণীয় গ্রন্থ "ভোলে ব্রিশ বছর ও পাক ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম" পুনর্মুদ্রিত হল।

দাম—ত্রিশ টাকা

: প্রাপ্তিস্থান :
বাণী প্রতিষ্ঠান
১৫, কলেজ স্কোয়ার,
কলিকাতা-১২

সম্পাদক—
শ্রীশা[illegible]ধুরী
॥ স[illegible]
শ্রীজগদীশ[illegible](সভাপতি)
শ্রীউমেশচন্দ্র নন্দী
পুষ্প চ্যাটার্জী
মলয় ঘোষ
প্রকাশক ও মুদ্রক—
শ্রীঅনিল সেনগুপ্ত
দিল্লীর বিশেষ প্রতিনিধি—
শ্রীবাণীন ঘোষ
ভোলা—
শ্রীনন্দগোপাল পাল

বিপ্লবী পুস্তকমালা

নেতাজীর সিক্রেটসার্ভিস—ডাঃ পবিত্রমোহন রায়—১০.০০
বিপ্লবী মহানায়ক রাসবিহারী—সুবোধ মজুমদার
অনুশীলন সমিতির বিপ্লব প্রয়াস—ব্রজেন্দ্র দাস

—ক্ষীরোদ কুমার দত্তের—

১। বাংলার অগ্নিযুগ—১.৫০, ২। বহির্ভারতে ভারতীয় বিপ্লব প্রচেষ্টা—৮.০০
৩। অনুশীলন সমিতির পি, মিত্তির—২.০০, ৪। দৌহাটী সংগ্রাম কাহিনী—১.০০, ৫। কাকোরী ষড়যন্ত্র—১.২৫, ৬। জনতা রাজার সংগ্রাম কাহিনী—.৪০, ৭। রাসবিহারী ও অনুশীলন সমিতি—.৮০
৮। স্বাধীনতার শহীদ মা ও মেয়ে—.৪০, ৯। বিবেকানন্দ ও সমাজবাদ—.৬০
১০। বিপ্লবী বিবেকানন্দ—.৫০, ১১। মহারাজ ও সুভাষচন্দ্র—.৪০
১২। ভারতের মহাসাগর ও ভগিনী নিবেদিতা—.৭৫, ১৩। দেশ বাঁচার ভোলেনি (১)—৯.০০, ১৪। দেশ বাঁচার ভোলেনি (২)—২.০০
১৫। শহীদ [illegible]—.৫০, ১৬। [illegible] শহীদ দিবস—৩.০০, ১৭। [illegible]—.৭৫, ১৮। ভারতের [illegible], ১৯। ভারতের জাতীয় পতাকার ইতিহাস—.৪০, ২০। [illegible]

প্রাপ্তিস্থান— [illegible]
নৈহাটী—৬/১/১/A বঙ্কিম চ্যাটার্জী ষ্ট্রীট কলিকাতা-১২.

মূল কার্যালয়—৪নং বঙ্কিম দাস ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০০৭ শ্রীঅনিল সেনগুপ্ত কর্তৃক প্রকাশিত এবং তৎকর্তৃক প্রিন্টিং পাবলিসিটি, ১১৭, কেশবচন্দ্র সেন ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০০৯ হইতে মুদ্রিত।

বিপ্লবী বাংলা

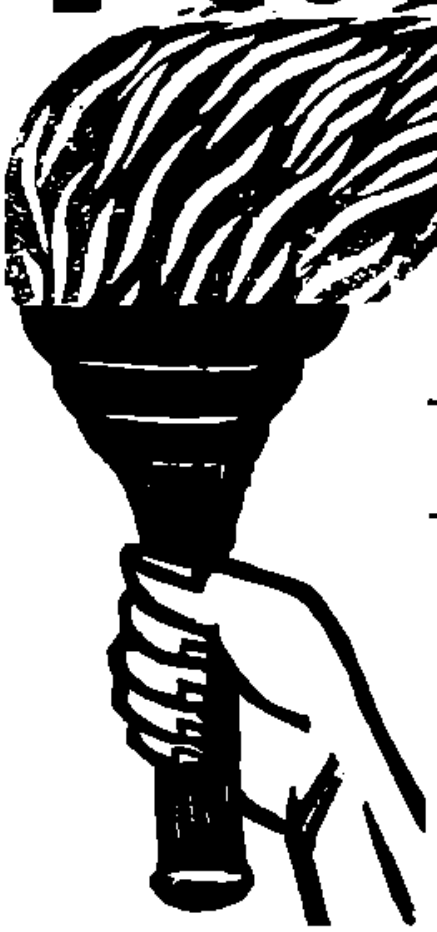

। বিপ্লবী পরিষদের সাপ্তাহিক মুখপত্র ।
স্থাপিত—১৯৫৬, 'বিপ্লবী বাঙালী' নবকলেবরে—১৯৭৯

দশম বর্ষ	শনিবার ২রা শ্রাবণ ১৩৮৮ ১৮ই জুলাই ১৯৮১	৩৭ সংখ্যা

অসংখ্য দিন কেটেছে প্রাণের বৃথা রোদনে
নরম সোফায় বিপ্লবী মন উদ্বোধনে ;
আজকে কিন্তু জনতা ডোয়ারে পেলে প্রাবন
নিবর মনে বঙ্কিম পথ অনুধাবন
করছে পৃথিবী পূর্বপথ সংশোধনে ।

—সুকান্ত

সম্পাদকীয়

উত্তর আয়র্ল্যাণ্ডের পঞ্চম দধীচি

একটি একটি করে উত্তর আয়র্ল্যাণ্ডের আইরিশ রিপাবলিকান দলের পঞ্চম অনশনকারী জোসেফ ম্যাকেনেল আত্মদান করে শহীদ হয়েছেন। এই দল, আন্তর্জাতিক তাদের কর্মীদের রাজনৈতিক মর্যাদা দানের দাবীতে অনশন সুরু করেছিলেন। তাদের আন্দোলন যে সম্পূর্ণ রাজনৈতিক একমাত্র স্বোক্ত রক্ষণশীল দল বা মানুষ ভিন্ন সকলেই স্বীকার করবেন। করছেন না শুধু ইংলণ্ডের বর্তমান ক্ষমতাসীন দলের লোকেরা, এটা অবশ্য নতুন কিছু নয়। একদল মনুষ্যদেহধারী জীব থাকে, যাদের দৃষ্টিভঙ্গী আদিকালের এবং পরিবর্তনের নতুন আলো ও জ্ঞান এদের মগজে প্রবেশ করে না। এরা এমনই একটা স্বরচিত অচলায়তনের মধ্যে আবদ্ধ থাকে, যেখানে কোন সমসাময়িককালের আলোর প্রবেশ নিষিদ্ধ করে চরম অন্ধকারের মধ্যে দিনযাপন করে। বর্তমান শাসক দলের এই মনোবৃত্তির সঙ্গে দুর্ভাগ্যক্রমে ভারতের মানুষ বিশেষভাবে পরিচিত। এমনই একটা প্রশ্নে বিপ্লবী যতীনদাস ৬৩ দিন অনশন করে শহীদের মৃত্যু বরণ করেন। বিভিন্ন জেলে এই প্রকার দাবী আদায় করার জন্য, দেশপ্রেমিকরা ডাণ্ডাবেড়ী, রাত্রিদিন হাতকড়া বিভিন্ন মেয়াদের কারাদণ্ড ভোগও করেছেন। কাজেই আইরিশ রিপাবলিকান দলের এই সত্যাগ্রহ আমাদের আপনার আত্মীয়। তাদের বীরোচিত আত্মদানের জন্য আমরা তাদের জয়ধ্বনি করি। আমরা আরো প্রত্যাশা করি আমাদের ভারতে একই প্রকার নীতি গ্রহণ করার ফলে, একদিন যেমন হতমান হয়ে ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদীরা পাততাড়ি গুটিয়ে নিতে বাধ্য হয়েছিল, উত্তর আয়র্ল্যাণ্ডের ক্ষেত্রেও তার অন্যথা হবে না। আমরা এই বীর্যবান মানুষদের উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা নিবেদন করি।

ইংল্যাণ্ডের শাসকদল এই অতি সঙ্গত দাবী না মানার পক্ষে যে কৈফিয়ৎ দিয়েছেন, তাকে আমরা বক্তাপচা, কীটদংশিত কৈফিয়ৎ বলে মনে করি। সত্য বটে, এদের অসম্মান, অমর্যাদা, ও জীবন নাশ দেখে আয়র্ল্যাণ্ডের মানুষেরা ক্ষুব্ধ হয়ে কিছু হিংসাত্মক কাজ করেছেন। এরা ত মহাত্মা গান্ধীর অহিংসে মন্ত্রে দীক্ষিত নন। চিরদিনই অত্যাচারিত মানুষ এই পথে তাদের বিক্ষোভ জানিয়েছে, এটা ত ইতিহাসেরই সাক্ষ্য। সাম্রাজ্যবাদীরা শত অত্যাচার করেও রেহাই পায়নি শেষ পর্যন্ত, এ সাক্ষ্যও বহন করে ইতিহাস।

কিন্তু একটা জিনিস লক্ষ্য করে আমরা বিস্মিত হয়েছি। এই বিংশ শতাব্দীতে যখন আমরা সভ্যতার গর্ব করি, তখন বিশ্বের জনমত এই নৃশংস হত্যাকাণ্ডের বিরুদ্ধে গর্জে উঠছে না কেন? এত

ঢাকঢোল বাজিয়ে বিশ্বসংঘের যে মানব অধিকার রক্ষা বিভাগ খোলা হয়েছে, তারা কেন প্রতিবাদ জানাচ্ছেন না? এ কাজ না করলে, তাদের অস্তিত্বের পক্ষে কোন যুক্তি থাকতে পারে না। তবে কি জন্তে মানুষের রক্ত-জল করা অর্থ দিয়ে এই নির্বীজ জাতির খোরাক জোগান হবে?

তা ভিন্ন, ইংল্যাণ্ডের সভ্য ও গণতন্ত্রের ধারক বাহক বলে একটা খ্যাতি ছিল। সেই ঐতিহ্যকে যারা ধূলায় লুটিয়ে দিচ্ছে, তাদের বিরুদ্ধে ওখানকার জনমত ফোঁসে, ফোঁসে ফেটে পড়ছে না কেন? Something is surely rotten in Denmark. তার নিদর্শন মেলে ইংল্যাণ্ডে বর্তমান বর্ণ বিদ্বেষী দাঙ্গাহাঙ্গামার মধ্যে। খুনখারাপি, লুটতরাজ, অগ্নি-সংযোগের ঘটনা ঘটছে, এশিয়াবাসীদের জীবন বিপন্ন, কিন্তু মার্গারেট সরকার চুটো জগন্নাথ হয়ে বসে আছেন। এই পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে সরকার অক্ষম। অথচ সম্প্রতি নাগরিকত্ব সংক্রান্ত যে বিল তারা পাশ করেছেন, এই দাঙ্গাহাঙ্গামা সেই দুষ্ট বীজের বিষময় ও পরিণত ফল বলে শুধী জনেরা মনে করেন। আমরা মনে করি বিশ্বের বিবেকবান্ মানুষেরা আইরিশদের এই সঙ্গত দাবী মেনে নিতে মার্গারেট সরকারকে বাধ্য করবেন জনমতের প্রবল চাপ সৃষ্টির মাধ্যমে। উত্তর আয়র্লাণ্ডের এই স্বাধীনতা সংগ্রামীদের প্রতি ভারতবাসীরা সহানুভূতি সম্পন্ন। এদেশে তাদের সমর্থনে জনসভা করা হয়েছে, ব্রিটিশদূতাবাসের সামনে বিক্ষোভও প্রদর্শন করা হয়েছে।

অনশনে আত্মদানকারী শহীদেরা তাদের দেশেরই ঐতিহ্য বজায় রেখেছেন। তাদের দেশেরই প্রাতঃস্মরণীয় ব্যক্তি ম্যাক্সুইনি জগতে এই পথের একজন বিশিষ্ট অগ্রপথিক। তাঁর দৃষ্টান্ত বিশ্বের অন্যান্য স্থানের মানুষদের অনুপ্রাণিত করেছে, এই ভাবে প্রাণ বিসর্জন দিয়ে ন্যায্য দাবী আদায় করতে। আমাদের কোন সন্দেহ নেই এই পাঁচজন শহীদের জীবনদান ব্যর্থ হবে না, হতে পারে না।

আমরা প্রয়াত শহীদদের উদ্দেশ্যে সাধুবাদ নিবেদন করি এবং অদূর ভবিষ্যতে তাদের সংগ্রামের সফলতা কামনা করি সর্বান্তকরণে এবং প্রক্ষালনত চিত্তে।

স্বাধীনতা সংগ্রামী ও বামফ্রন্ট সরকার

—জনৈক স্বাধীনতা সংগ্রামী

দীর্ঘ দিন ধরে একটা বেদনাদায়ক পরিস্থিতি লক্ষ্য করা যাচ্ছে। বাংলাদেশ স্বাধীনতা সংগ্রামের একটি গৌরবোজ্জ্বল পীঠস্থান। এই রাজ্যের অনেক স্বাধীনতা সংগ্রামীরা ইংরেজ শাসন থেকে দেশকে স্বাধীন করার প্রয়াসে নিজেদের জীবন আহুতি দিয়ে শহীদ হয়েছেন। হাজার হাজার সংগ্রামীরা দীর্ঘদিন ধরে অশেষ দুঃখ কষ্ট ভোগ করেন অন্তরীণাবদ্ধ থাকেন ও কারাদণ্ড ভোগ করেন। জেলের মধ্যে মানুষের মত বাঁচার দাবীতে নানাপ্রকার নির্যাতনেরও শিকার হয়েছেন। গুলীতে জীবন বিসর্জন দিয়েছেন ও অনশনে জীবন দান করেছেন। বহু ছাত্র ও যুবকেরা তাদের পার্থিব ভোগসুখ ও উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ বলিদান করেছেন। আদর্শনিষ্ঠা, চরিত্রবল, নির্ভীকতা ও দেশপ্রেমকে মূলধন করে দুর্গম পথের যাত্রী হয়েছেন, দুর্গম গিরি কান্তার মরু লঙ্ঘন করে দেশের সামনে আদর্শ স্থাপন করেছেন এবং নিজেদের কাজকর্মের মাধ্যমে গোটা দেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করেছেন। নৈতিক বলের নিকট পশুবল তুলনায় কত অকিঞ্চিৎকর, রক্তের আখরে লিখে গিয়েছেন সেই সত্যকে, সারা দেশে দেশপ্রেমের আগুন জ্বেলে দিয়েছেন কন্যাকুমারিকা থেকে বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত এলাকায়। এই বাংলার নেতৃবৃন্দ, যাদের মধ্যে মাত্র একজনকে নিয়ে জাতি গৌরব বোধ করতে পারে, নেতৃত্ব দিয়েছেন স্বাধীনতা সংগ্রামের বিভিন্নমুখী ধারার মাধ্যমে।

দেশবিভাগের ফলে বাস্তুহারা হয়ে পথে দাঁড়াতে বাধ্য হয়েছেন অবিভক্ত বাংলার বহু স্বাধীনতা সংগ্রামীরা। ফলে তারা নিঃস্ব হয়ে পড়েছেন অর্থনৈতিকভাবে। কর্মের সংস্থান নেই, মাথা গুজবার জায়গা নেই, স্বাস্থ্যসেবা ও চিকিৎসা ব্যবস্থার সংস্থান নেই। দেশ যাদের নিকট চিরকৃতজ্ঞ, তাদের দুঃখ দুর্দশার দিকে কারো নজর নেই। অন্ততঃ অনাহারে মৃত্যুমুখ থেকে বাঁচবার কোন সংস্থান করেন নি কোন দলের নেতারাই। একমাত্র কর্তব্য পরায়ণা, দরদী প্রাণা, জাতির অপরিশোধ্য ঋণকে অন্ততঃ কিছু পরিমাণে পরিশোধ করতে সচেতন মনা শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী জাতীয় জীবনকে এ সম্বন্ধে কলঙ্কমোচন করতে প্রথম ও দৃঢ় পদক্ষেপ করলেন 'স্বতন্ত্রতা সৈনিক সম্মান পেনসান' নামের পরিকল্পনা প্রবর্তন করে। তাঁর সাময়িক ক্ষমতাচ্যুতির সুযোগে জনতা দলের নেতা শ্রীমোরারজী দেশাই এই পরিকল্পনাকে বানচাল করে দিতে চেয়েছিলেন নানাপ্রকার নীতি কথা উচ্চারণ করে এর একটা কারণ হল, মোরারজীর ছেলের দৌলতে অভাব অনটনের অভিজ্ঞতা ছিল না। ছিল না তার দারিদ্রের কঠিন বেদনাবোধ। অবশ্য অন্য কোন কারণও ছিল। সেটা হল অন্ধবিদ্বেষ ও জিঘাংসা প্রবৃত্তি চরিতার্থ করার অপপ্রয়াস। যা কিছু ইন্দিরাজী করেছেন তাকে বাতিল করে দিয়ে জনমানসে ইন্দিরাজীর প্রভাব ক্ষুন্ন করা। কিন্তু মানুষ ভাবে এক, বিধানকর্তা ভাবেন অন্যরকম। অলমতিবিস্তারেণ।

ইন্দিরাজী পুনরায় ক্ষমতাসীন হবার পর এই পেনসন পরিকল্পনাকে চালু ত রেখেছেনই, অধিকন্তু প্রবামূল্যের ঊর্ধ্বগতি লক্ষ্য করে, সাহায্যের পরিমাণও

বাড়িয়েছেন। এ সম্বন্ধে পুরতন আইনকে শিথিল করে, আরো বহু নির্যাতনভোগী স্বাধীনতা সংগ্রামীদের এটা পাবার সীমা প্রসারিত করেছেন।

আজ যারা এ ব্যাপারে দলবাজী করছে, তারা রাজনৈতিক মূঢ়তায় অন্ধ। বিশেষ করে এ ব্যাপারে পশ্চিমবঙ্গে পূর্বতন ও বর্তমান প্রশাসকদের কার্যকলাপ অতীব শোচনীয়। যে রাজ্যে প্রায় প্রতি ঘরে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে বিরাট সংখ্যক সংগ্রামী আছেন এবং যাদের মধ্যে অধিকাংশেই দেশবিভাগ জনিত পরিস্থিতির জন্য, বিশেষ অসুবিধার মধ্যে আছেন।

অথচ যাদের অবদান ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকার যোগ্য, তাদের জন্য এই রাজ্যে প্রায় কিছুই করা হয়নি। অন্যদিকে বিভিন্ন রাজ্যগুলি, নিজেদের তরফ থেকে পেনসান মঞ্জুর করেছেন, বিনা খরচে শুচিকিৎসার ব্যবস্থা করেছেন, চাকুরীক্ষেত্রে অগ্রাধিকার দান করেছেন এবং আরো কিছু কিছু সাহায্য দান করেছেন। তারা এই স্বাধীনতা সংগ্রামীদের প্রতি একটি জাতীয় কর্তব্য আছে বলেই মনে করেছেন এবং কেন্দ্রের সাহায্য নিরপেক্ষ হয়েই একাজ করেছেন। সর্বোপরি যেটা লক্ষ্যণীয়, সেটা হল তাদের কৃতজ্ঞতাপূর্ণ মানসিকতা। তারা কোন প্রকার দানখয়রাতের মনোভাব নিয়ে এ কাজ করেন নি। স্বাধীনতা সংগ্রামীদের তারা সম্মানের আসন দিয়েছেন এবং তাদের সঙ্গে সেই মত ব্যবহারও করেছেন। তারা কোন রাজনৈতিক উদ্দেশ্যের দ্বারা প্রভাবিত হন নি। বরং এদের নিকট সমগ্র জাতির যে ঋণ আছে, তা কিছুটা পরিশোধ করার মানসিকতা নিয়েই একাজ করেছেন এবং এখনও করে চলেছেন। যে কেরালা প্রদেশে কমিউনিষ্ট দলই সরকারের প্রধান দল, তারাও এ ব্যাপারে পিছিয়ে নেই। যত কিছু গণ্ডগোল তা এই রাজ্যেই।

পশ্চিমবাংলার বর্তমান শাসকদলগুলির মতিগতি এ ব্যাপারে কলঙ্ক মলিন। স্বাধীনতা সংগ্রামীদের তরফ থেকে মুখ্যমন্ত্রীকে এ সম্বন্ধে প্রতিবেদন দেওয়া হয়েছে। বিশদভাবে সেই সঙ্গে তথ্য সরবরাহ করা হয়েছে অন্যান্য রাজ্য এ ব্যাপারে কতটা কি করেছে। কিন্তু তিনি নীরব, ভূমিরাজস্বমন্ত্রী বিনয়বাবুকেও দেখা সাক্ষাৎ করে বলা হয়েছে। তিনি অবশ্য তখন কিছু করবেন বলেছিলেন।

তবে তিনি কিছু করেছেন বলে অনুমান করার কোন সঙ্গত কারণ নেই। দীর্ঘ চার বৎসর ত তারা গদীতে আছেন। এর মধ্যে কিছুই করতে পারলেন না কেন? অথবা কিছুই করবেন না বলেই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন কি? গণতন্ত্রে একদল ক্ষমতায় আসে, আবার চলেও যায়, অন্যদল আসে। তাই প্রত্যেক দলেরই চেষ্টা থাকে যে জাতীয় কর্তব্যগুলি যতটা সম্ভব পালন করে যাওয়া। অন্যথায় তাদের শাসন ধিক্কৃত, নিন্দিত ও কলঙ্কমলিন হয়।

বর্তমান সরকারের এই জাতীয় কর্তব্যপালনে অনীহা কেন কারণটা কি অর্থনৈতিক না রাজনৈতিক? রাজনৈতিক হলে নীরবতার আড়ালে গা ঢাকা দেওয়াই স্বাভাবিক, যেটা বহু মানুষ সত্য বলে মনে করেছেন। তবে অর্থ-নৈতিক অজুহাত অচল। টাকার ত ছড়াছড়ি হচ্ছে। কৃষকভাতা, খেতমজুরভাতা, সর্বোপরি কর্মচারী তোষণভাতা কত কিই ত করা হচ্ছে। রাজ্যের রাজকোষ ত শূন্য হতে চলেছে। আমরা অন্যদের ভাতা দেওয়া সম্বন্ধে নীতিগতভাবে কিছু বলছি না।

রাজ্যের সকল শ্রেণীর মানুষকে খাইয়ে পরিয়ে বাঁচিয়ে রাখতে প্রত্যেক আদর্শ প্রশাসকদের এক

মাত্র উদ্দেশ্য হওয়া উচিৎ। যারা কিছু পেয়েছেন তাদের প্রতি আমাদের কোন বিদ্বেষও নেই। কর্মচারীরাও ন্যায্য প্রাপ্য পেলে আমাদের কোন আপত্তি নেই। আপত্তিটা হল এইখানে যে ভোটের লোভে যদি এই কাজ করা হয় তবেই। তা ভিন্ন, স্বাধীনতা সংগ্রামীদের প্রতি কর্তব্যটাই বা পালন করা হবে না কেন? টাকার অভাবের কৈফিয়ৎ ত এদের মুখে মানায় না। কোন কোন ক্ষেত্রে দীয়তাং ভুজ্যতাং, দরাজ-হস্ত, বজ্রমুষ্টি শুধু এদের বেলাতেই? প্রশাসকরা নিজেদের ঘর থেকে টাকা এনে দিচ্ছেন না, যে তাদের মর্জির উপর নির্ভর করবে এই খাতে যে খরচা হবে সেটা। অর্থ-নৈতিক কারণটাই প্রামাণ্য হয়ে ওঠে।

এই রাজ্যের প্রশাসকদের এই ব্যাপারে গাফিলাতিটা প্রায় পর্বত প্রমাণ। কেন্দ্র স্বাধীনতা সংগ্রামীদের পেনসন দেন। তবে কাগজপত্র, প্রমাণ পত্র প্রভৃতি দেখে শুনে যাচাই করার ভার এখানকার রাজ্য সরকার একটা উপদেষ্টা বোর্ডও গঠন করেছেন যাতে পেনসন প্রার্থীদের দরখাস্তগুলি ত্বরান্বিত করা হয়। সেজন্য সভ্যদের পারিশ্রমিকও দেওয়া হয় বলে মানুষের বিশ্বাস। এদের কার্যকলাপ পরীক্ষা করলে দেখা যাবে যে দরখাস্তগুলি প্রায় অচল হয়ে পড়ে থাকে, মাসের পর মাস, বছরের পর বছর বিনা মূল্যায়নে।

কোন কাজই যদি না হয়, তবে এত পাত্রমিত্র, সভাসদ, কর্মচারী মানুষের রক্ত জল করা টাকা দিয়ে পোষণ করার সার্থকতা কোথায়? নিজেরাও কিছু করবো না, অন্যকেও কিছু করতে দেব না, এটা কোন নীতি? এ টাকাটা ত কেন্দ্রীয় সরকারই দেবেন। তবে এই অবহেলা কেন? এও কি রাজনৈতিক?

এই প্রদেশের কিছু সংখ্যক লোক যদি আর্থিক সাহায্য পান অন্য জায়গা থেকে, তবে ত রাজ্যের সামগ্রিক অর্থনীতির উপর একটা শুভ প্রভাব ফেলবে। রাজ্যের অবশ্য করণীয় কর্তব্য পালনে কিছুটা সহায়তা হবে। সেদিকে নজর নেই কেন রাজ্য সরকারের? এটাও কি রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত বলে ধরে নিতে হবে?

সরকারী দপ্তরের কাজকর্মের উপর মানুষের আস্থা কোনদিনই খুব একটা ছিল না। তবু অতীতে কাজকর্ম না করলে শাস্তি পাওয়ার একটা আশঙ্কা ছিল। বর্তমানকালে সে সম্ভাবনা তিরোহিত অন্যায্যভাবে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের অধিকার প্রবর্তন করার ফলে। কাজ কিছু করা হোক বা না হোক, ঋতু বদলের সঙ্গে সঙ্গে তলবও বাড়বে, মাগগী ভাতাও বাড়বে, বাড়বে অন্যান্য সুযোগ সুবিধাও। এই পরিস্থিতিতে কাজের আগ্রহ থাকে না অধিকাংশেরই। অথচ এদের জন্য রাজ্য রাজকোষে বিপুল ঘাটতি। শিল্প, কৃষি ধ্বংসের মুখ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, আবাসন ক্ষেত্র প্রভৃতির মত অত্যাবশ্যকীয় ক্ষেত্রগুলিতে বিনিয়োগ শূন্য। কি করে এ অবস্থায় জিনিষপত্রের দাম কমবে, কি করে বেকারদের কর্মসংস্থান হবে, সেটা কল্পনাতীত। ছিটে ফোটা সাহায্য দিয়ে দেশের মানুষকে বাঁচান যাবে? বদ্ধ উন্মাদ ব্যতীত এটা কেউ ভাবতে পারে না।

প্রধান প্রসঙ্গে ফিরে আসা যাক। উপদেষ্টা বোর্ডের একাধিক সদস্যের মুখে শোনা গিয়েছে যে কারনিকরা স্বাধীনতা সংগ্রামীদের ফাইল চাইলেও দেন না। তারা কি এ সম্বন্ধে উচ্চতর কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন? যদি ফল না হয়, তবে সভাশোভন করে কি লাভ হবে?

উপদেষ্টা পরিষদের সভ্য যারা আছেন, তারা বিভিন্ন দলের প্রতিনিধি হয়েন তাদের নিজেদের

অতীত গৌরব আছে। তাদের লোকে সম্মান করে। কিন্তু এই দীর্ঘ সূত্রতার জন্য, অচলাবস্থা দূরীকরণ করতে অসমর্থ হওয়ার জন্য তাদের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা সংগ্রামীদের ও সাধারণ মানুষের মনে একটা বীত-শ্রদ্ধ ধারণা গড়ে উঠছে। আমাদের নিকট মৌখিক ও লিখিত অনেক অভিযোগ আছে যে তাদের অযথা হয়রানি করা হচ্ছে। একথা কোন সুস্থ মস্তিষ্ক মানুষই বলবেনা যে প্রত্যেক দরখাস্তই অনুমোদন করতে হবে। তবু প্রার্থীর দাবী নিশ্চয়ই অগ্রাহ্য করতে হবে। অতীতদিনের অর্থমন্ত্রীর নির্দেশ ছিল Benefit of doubt must go to the applecant.

সমগ্র পরিকল্পনাটিকে আক্ষরিক অর্থে ব্যবহার না করে, পরিকল্পনার মর্মার্থকেই প্রাধান্য দিতে হবে। সর্বোপরি এই দীর্ঘ সূত্রতার অবসান ঘটাতে হবে অনতিবিলম্বে।

মানুষ যখন তার ন্যায্য দাবীকে প্রতিহত হতে দেখে এবং তার কোন সঙ্গত কারণ খুঁজে পায় না, তখন অভিসন্ধি আরোপ করতে থাকে। আমাদের বহু বঞ্চিত স্বাধীনতা সংগ্রামীদের সংস্পর্শে আসতে হয়। তাদের দুই একটি মন্তব্য তুলে ধরতে চাই উপদেষ্টা বোর্ডের বন্ধুজনদের অবগতির জন্য। তারা মনে করে সভ্যরা তাদের মাসিক প্রাপ্যকে দীর্ঘায়িত করতে চান নিজেদের স্বার্থে। কেউ কেউ এমন মন্তব্যও করেন যা শুনে আমরা মনে ব্যথা পাই। এর প্রতিবিধান না করলে, তাদের সুনাম হানি হবে, একথা ভেবেও আমরা মনোবেদনা অনুভব করি।

একথা বুঝতে কষ্ট হয় না যে এই ভাবে চলতে থাকলে একটা প্রবল আন্দোলন গড়ে উঠতে বাধ্য। কারণ কোন মানুষেরই ভাগ্য নিয়ে ছিনিমিনি খেলার অধিকার কাউকে দেয়নি কেউ। পশ্চিমবঙ্গে আন্দোলনের অভাব নেই কারণে অকারণে। আরো একটি ক্ষেত্র তৈরী করার দায়িত্ব উচিৎ কিনা এখনও ভেবে দেখতে অনুরোধ করি।

অতি সামান্য কারণে আন্দোলনের নামে ধুন্ধুমার কাণ্ড ঘটছে এই রাজ্যে। সাধারণ ভাবেই অসহিষ্ণুতা, শৃঙ্খলহীনতা, খুনখারাপি প্রভৃতির মত অন্যায় কাজ দেশের অগ্রগতিকে ব্যাহত করছে। অনেকক্ষেত্রে হয়ত সমস্যার জটিলতার জন্য সমাধান খুঁজে পেতে দেরী হচ্ছে। কিন্তু এ ব্যাপারে ত কোন জটিলতা নেই। প্রয়োজন শুধু উদ্যমের আন্তরিকতার কর্তব্য জ্ঞানের ও একটু তৎপরতার। এই মন্থরগতি, এই দীর্ঘ সূত্রতার কোন সঙ্গত কৈফিয়ৎ নেই।

এর জন্য একটি ব্যবহারিক দিকেও দৃষ্টি দিতে হবে। এখানে দেরী করে কাগজপত্র পাঠান হলে। সর্বভারতীয় স্তরে প্রার্থীদের সংখ্যাধিক্যের জন্য কিউ দিতে হবে এখানকার প্রার্থীদের। ফলশ্রুতি হবে ক্ষতিকারক। যেমন ঘটেছে ইতিমধ্যে, আরো অনেকেরই জীবনবসান ঘটবে, এখানকার কর্তৃপক্ষের বিলম্বের জন্য। একে রীতিমত অপরাধজনক কাজ বললে খুব ভুল হবে কি?

অকারণে, সমস্যা সমাধানে বিলম্ব ঘটালে, আজ হোক, কাল হোক, অসন্তোষের বিস্ফোরণ ঘটবেই। বোর্ডের সদস্যরা প্রবীণ স্বাধীনতা সংগ্রামী। তাদের কাছে সমস্যাপীড়িত স্বাধীনতা সংগ্রামীদের সমস্যা অজানা থাকার কথা নয়। তবে এ বিষয়ে তারা তৎপর হচ্ছেন না কেন, এই প্রশ্নের জবাব কি? তারা ত স্বাধীনতা সংগ্রামীদেরই প্রতিনিধিত্ব করেন সেজন্য পারিশ্রমিকও নেন। তবে কেন পথের বাধা তারা দূর করবেন না? এই সব প্রশ্নই স্বাধীনতা সংগ্রামীদের মনে উঠছে এবং তারা কোন সদুত্তর

(এর পর ১০ পৃঃ দেখুন)

দক্ষিণ এশিয়াকে কেন্দ্র করে রাজনীতির দাবা খেলা

কালীপদ সরকার

সম্প্রতি দক্ষিণ এশিয়াকে কেন্দ্র করে যে জোর কূটনৈতিক কর্ম তৎপরতা চলেছে তা অনেকেই লক্ষ্য করে থাকবেন। এই তৎপরতার পটভূমি যে ভারত সে কথা বলা বাহুল্য। কিছুদিন আগে চীনের প্রধান মন্ত্রী মাও জিয়াং পাকিস্থান, নেপাল ও বাংলাদেশ সফর করে গিয়েছেন। পাকিস্থানের প্রেসিডেন্ট জিয়াউল হকের সহিত নিভৃত আলোচনার পর তিনি ঘোষণা করেছেন, সোভিয়েত রাশিয়া যদি পাকিস্থান আক্রমণ করে তবে চীন পাকিস্থানের পাশে এসে দাঁড়াবে। দ্বিপাক্ষিক মৈত্রী ও সহযোগিতা ছাড়াও চীন পাকিস্থানকে যে সব সাহায্য দিচ্ছে তা অব্যাহত থাকবে। এই প্রসঙ্গে মাও জিয়াং চীন ও ভারতের মধ্যে সমঝোতার প্রয়োজন এবং এশিয়ার শান্তি নিবিঘ্ন করতে এই দুই বড় রাষ্ট্রের অপরিহার্য ভূমিকার কথা উল্লেখ করেছেন। তিনি সাবধানে কাশ্মীর প্রসঙ্গ এড়িয়ে গিয়েছেন এবং পাকিস্থানকে পরামর্শ দিয়েছেন ভারতের সহিত তার বিরোধীয় বিষয় আপসে মিটিয়ে নিতে।

নেপালের সঙ্গে চীনের যে মৈত্রী সম্বন্ধ আছে চীনের প্রধান মন্ত্রী তাকে আরো ফলপ্রসূ করার কথা বলেছেন এবং আফগানিস্থানে সোভিয়েত সৈন্যের উপস্থিতি জনিত দক্ষিণ এশিয়ার নিরাপত্তা হানির আশংকা প্রকাশ করেছেন। মিঃ মাও জিয়াং রাজা বীরেন্দ্রের মধ্যে যে আলোচনা হয়েছে তাতে উভয় পক্ষই খুশি।

বাংলাদেশে মাও জিয়াং প্রেসিডেন্ট জিয়ার মৃত্যুতে গভীর দুঃখ প্রকাশ করেছেন এবং বাংলাদেশকে সহানুভূতি ও সাহায্যের আশ্বাস দিয়ে চীনের সহমর্মিতা জ্ঞাপন করেছেন। ভারতের সহিত বাংলাদেশের বিতর্কিত বিষয়গুলি তিনি আলোচনার মাধ্যমে মিটিয়ে নিতে বলেছেন।

সুতরাং চীনের প্রধান মন্ত্রীর সফর আপাতদৃষ্টিতে দক্ষিণ এশিয়ার শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষার ক্ষেত্রে যুক্তিনিষ্ঠ আবেদনের সঙ্গের বহন করছে এবং চীনের সংবেদনশীল চিন্তাধারা তুলে ধরেছে। বস্তুগত বক্তব্য যা মাও জিয়াং-এর কথাবার্তায় স্পষ্ট ছিল তা হল সোভিয়েত রাশিয়ার সম্প্রসারণের বিরোধিতা।

তারপর ভারতের বিদেশমন্ত্রী নরসিংহ রাও গিয়েছিলেন পাকিস্থান সফরে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক পাকিস্থানকে হাজার হাজার কোটি টাকার সমরাস্ত্র ও জঙ্গী বোমারু বিমান এফ-১৬ দ্বারা নতুন করে রণসজ্জায় সজ্জিত করা সম্পর্কে ভারতের প্রতিক্রিয়া ও আশংকার কথা পাকিস্থানকে বুঝিয়ে বলাই ছিল নরসিংহ রাও-এর মুখ্য বক্তব্য। এ প্রসঙ্গে ভারতের দিক দিয়ে পাকিস্থানের যে কোন বিপদের কারণ নেই সে কথাও তিনি পাকিস্থানকে জানিয়ে দিয়েছেন। তাছাড়া ভারত ও পাকিস্তানের দুই বিদেশ মন্ত্রীর মধ্যে উভয় দেশের সম্পর্ক স্বাভাবিক করা, ব্যবসা-বাণিজ্য বৃদ্ধি এবং যাতায়াত সহজ করার মামুলি আলোচনাও হয়েছে।

মার্কিন অস্ত্র ও নব সমরসজ্জা সম্পর্কে ভারতের প্রতিক্রিয়া পাকিস্থানের সিদ্ধান্তে কোন ছাপ ফেলতে পারে নি। ভারতের বক্তব্যের জবাবে

পাকিস্তান বলেছে যে, অস্ত্রসজ্জা তার প্রতিরক্ষার প্রয়োজনে এবং এই প্রয়োজন আফগানিস্তানে সোভিয়েত বাহিনীর উপস্থিতিতে অপরিহার্য হয়ে দেখা দিয়েছে। এতে ভারতের কোন আশংকার কারণ থাকতে পারে না। তাছাড়া স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র পাকিস্তানের নিজ অভিরুচি মাফিক অস্ত্র সংগ্রহের অধিকার তো আছেই। সুতরাং নরসিংহ রাও এর দৌত্য একরূপ নিষ্ফল, বলা যেতে পারে।

ভারতের বিদেশমন্ত্রী ইসলামাবাদ ছাড়তেই এলেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উপ-রাষ্ট্রসচিব বাকলে। পাকিস্থানের পররাষ্ট্র মন্ত্রী আগাশাহী প্রস্তুত হয়েই ছিলেন। মিঃ বাকলে ও আগাশাহী প্রস্তাবিত ৪ বিলিয়ান ডলারের মার্কিন অস্ত্র সাহায্যের কথাবার্তা পাকা করে ফেললেন। ভারতের প্রতিক্রিয়া কোন আমলই পেল না। অত্যাধুনিক প্রভূত শক্তিশালী এফ ১৬ বিমান চালনার কৌশল শিখতে পাকিস্তানের প্রথম বৈমানিকদল যুক্তরাষ্ট্র গমনের জন্য প্রস্তুত হলেন।

নরসিংহ রাও যখন পাকিস্তানে তাঁর অবধারিত বিফল সফরে, তখন চীনে আসেন আমেরিকার রাষ্ট্র সচিব আলেকজাণ্ডার হেগ। মিঃ হেগ ও চীনের বিদেশমন্ত্রী হুয়াং হুয়া, কদিন বাদে যাঁর ভারত সফর, দ্বিপাক্ষিক ও আন্তর্জাতিক আলোচনায় বসেন। উভয় বিদেশমন্ত্রী বিস্তৃত আলোচনার শেষে ঘোষণা করলেন, বিশ্বে সোভিয়েত রাশিয়ার প্রভুত্ব-বিস্তার চেষ্টা হল বিশ্বশান্তির প্রধানতম শত্রু। রাশিয়ার প্রতিপত্তি প্রসারে বাধা দিতে চীন ও যুক্তরাষ্ট্র সম মনোভাব পোষণ করে। মিঃ হেগ এক ধাপ এগিয়ে আরো বললেন, চীনের বিরাট শক্তি, নিরাপত্তা ও বৃদ্ধি পৃথিবীর সামরিক ভারসাম্য রক্ষার সহায়, এমন কি চীনের শক্তি আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের নিরাপত্তার প্রয়োজনও অপরিহার্য। জবাবে হুয়াং হুয়া বললেন, চীন ও যুক্তরাষ্ট্রের সম্পর্ক ঐতিহাসিক কূটকৌশলের উপর প্রতিষ্ঠিত। তিনি যুক্ত ইস্তাহারে আফগানিস্থান থেকে সোভিয়েত বাহিনী এবং কম্বোডিয়া থেকে ভিয়েতনাম বাহিনীর অবিলম্বে প্রত্যাহার দাবি করেন।

মিঃ হেগের সহিত সলা পরামর্শ শেষ করে চীনের বিদেশমন্ত্রী হুয়াংহুয়া এলেন ভারত সফরে। এই বহু প্রত্যাশিত সফর ছিল ভারতের বিদেশমন্ত্রী অটল বিহারী বাজপেয়ীর চীন সফরের জবাবে। চীন ও ভারতের মধ্যে মূল বিরোধের বিষয় হল সীমান্ত প্রশ্ন এবং চীন কর্তৃক ভারতের পশ্চিম হাজার বর্গমাইল ভূ-খণ্ড দখল। এ বিষয়ে উভয় দেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রীদের মধ্যে নিশ্চয়ই আলোচনা হয়েছে, একে অপরের বক্তব্য শুনছেন—এই পর্যন্ত। বিরোধের বিষয় মুলতুবী রেখে উভয় দেশের মধ্যে সম্পর্কের উন্নতি সাধনে অনেক কথা অবশ্য হয়েছে। হুয়াংহুয়া এশিয়ার শান্তি নিরাপদ করার জন্য ভারত ও চীনের ঐক্যবদ্ধ প্রয়াসের কথা বলেছেন, কিন্তু পাকিস্থানের বিপুল অস্ত্রসজ্জা সম্পর্কে ভারতের আশংকা অথবা ভারত মহাসাগরে দুই বিশ্বশক্তির রণপোত বহরের উৎকণ্ঠাজনক তৎপরতার প্রশ্ন তিনি প্রকারান্তরে এড়িয়ে গিয়েছেন। সোভিয়েত রাশিয়ার সন্ত্রাসবাদ সম্পর্কে হুসিয়ারী দিতে হুয়াংহুয়া ভুল করেন নি।

কূটনৈতিক ভাবের জোয়ারে ভাঁটার টান পড়ার আগে পাকিস্থানের রাষ্ট্রপ্রধান পাকিস্থানে নিযুক্ত ভারতীয় রাষ্ট্রদূত নটবর সিংকে ডেকে নিয়ে তাঁর মারফত শ্রীমতী গান্ধীর উদ্দেশ্য একটি বিশেষ বার্তা এবং শ্রীমতী গান্ধী ও রাষ্ট্রপতি রেড্ডির জন্য কিছু ভালো আম রপ্তানি পাঠিয়েছেন। অন্যদিকে একই

সময়ে তিনি বাংলাদেশে পাঠিয়েছেন তাঁর পাঁচজন মন্ত্রীকে শুভেচ্ছা সফরে, পাঁচ পাকমন্ত্রীর আকস্মিক আগমণ লক্ষ্য করে বাংলাদেশের জাতীয় সংসদে বিরোধী দলনেতা প্রশ্ন তুলেছেন: বাংলাদেশ সরকার কি তলে তলে কন ফেডারেশন গড়ে বাংলাদেশকে পাকিস্থানের সহিত যুক্ত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন? সরকার পক্ষ অভিযোগ অস্বীকার করলেও, বাংলাদেশের চিন্তাশীল মানুষের মনে একটি চক্রান্তের বিষয় গভীর ছায়াপাত করেছে।

এখন উল্লিখিত কুটনৈতিক তৎপরতার সামগ্রিক চিত্রটি একবার চোখের সামনে তুলে ধরুন, তাহলে দেখতে পাবেন নানা ভালকথার মায়াজাল সৃষ্টি করে ভারতের মনে মিথ্যা নিরাপত্তা বোধ ও আত্মতুষ্টির ভাব জাগানো এবং সোভিয়েত ভারত মৈত্রী বন্ধনে ফাটল ধরানো ছাড়া এর অন্য কোন উদ্দেশ্য নেই। এমনও হতে পারে, পশ্চিম এশিয়া ও আফগান পরিস্থিতি একটি বিপজ্জনক পর্যায়ে পৌঁছেছে এবং সোভিয়েত রাশিয়ার সহিত মার্কিন-চীন পাক জোটের সংঘর্ষ আসন্ন। সম্ভাব্য সংঘর্ষে রাশিয়াকে এশিয়া খণ্ডে সম্পূর্ণ নিঃসঙ্গ করতেই রুশবিরোধী আঁতাত ভারতকে তোয়াজ করছে।

পাকিস্থানের প্রেসিডেন্ট জিয়াউল হক মুখে যত প্রীতি ও শুভেচ্ছার কথা বলুন না কেন, তিনি তাঁর ত্রিশ ডিভিশন সৈন্যবাহিনীর আঠার ডিভিশন ভারতের সীমান্ত বরাবর সমাবেশ করে রেখেছেন এবং সীমান্তের পঞ্চাশ মাইল দূরে নতুন তিনটি আধুনিক যন্ত্র-সুরক্ষিত বিমানক্ষেত্র তৈরি করেছেন। সম্ভাব্য সোভিয়েত আক্রমণ প্রতিরোধই যদি পাকিস্থানের রণসজ্জার উদ্দেশ্য হত, তাহলে আফগান সীমান্তে বেশি সৈন্য সমাবেশ না করে, ভারত সীমান্তে তা করা হল কেন?

জেনারেল জিয়াউল হক এ কথাও বলেছেন যে সোভিয়েত রাশিয়ার সহিত পাকিস্থানের বিরোধ নেই এবং পাকিস্থান এত মূর্খ নয় যে সে সোভিয়েত রাশিয়ার সহিত যুদ্ধে নামবে তাহলে সত্যিকার বিরোধটা পাকিস্থানের কোন দেশের সঙ্গে যার জন্য পাকিস্থান চার বিলিয়ন ডলার মূল্যের সমরাস্ত্র কিনছে? এটা ঠিক, এক নায়কতান্ত্রিক শাসনকে বহাল রাখতে গেলে, জনগণের দৃষ্টি দেশের ভিতর থেকে সরিয়ে বাইরের উত্তেজনামূলক পটভূমিতে নিবদ্ধ রাখা দরকার। পাকিস্থানের ক্ষেত্রে ভারতের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ প্রচার ও জেহাদ ঘোষণার চেয়ে উৎকৃষ্টতর পটভূমি কি আর আছে।

পাকিস্থানের অভ্যন্তরে চাপা অসন্তোষের বারুদ সঞ্চয় একেবারে কম নয়। সামরিক একনায়কত্বের অবসানের দাবি ছাড়াও, সেখানে আছে বেলুচ ও পাখতুনদের স্বাতন্ত্র্যের দাবি। বেলুচিস্থানের বিদ্রোহ দমন করতে সেখানে আশি হাজার পাক-সৈন্য নিযুক্ত আছে। অন্যদিকে প্রাক্তন বেলুচ মুখ্যমন্ত্রী আবদুস সাত্তার খানের নেতৃত্বে প্রবাসী বেলুচগণ লণ্ডনে একটি স্বাধীন বেলুচিস্থান অফিস খুলেছে। তাদের কথা হল, ভাষা, বংশ ও সংস্কৃতিতে বেলুচগণ স্বতন্ত্র। তারা সম্ভব হলে পাকিস্থানের ভিতরে অন্তত বাইরে এসে স্বাধীন বেলুচিস্থান গড়বে। বেলুচ বিদ্রোহীরা আশা করছে যে তারা সোভিয়েত রাশিয়ার নিকট থেকে সাহায্য পাবে।

ভারত পাকিস্থানের নিরাপত্তা ও শ্রীবৃদ্ধি কামনা করে। ভারত দেশবিভাগকে চূড়ান্ত বলেই মেনে নিয়েছে। পাকিস্থানের নিরাপত্তা ভারতের নিজের নিরাপত্তার সহিত জড়িত। কিন্তু অতীত অভিজ্ঞতার বিচারে পাকিস্থানের বিপুল সমর সজ্জা সম্পর্কে ভারত উদ্বিগ্ন না হয়ে পারে না এবং পরীক্ষিত বন্ধু রাষ্ট্র সোভিয়েত রাশিয়ার সহিত তার মৈত্রী দুর্বল হয় এমন কিছু সে করতে পারে না। এ দুটি বিষয়ে সতর্ক দৃষ্টি রেখে, চীনের সহিত প্রীতির সম্পর্ক গড়ে তুলতে বাধা

তারুণ্য ভাবনা :

বিপ্লবী নায়ক হেমেন্দ্রকিশোর স্মরণে

সোনিয়া চট্টোপাধ্যায়

দীর্ঘ প্রায় দুশ বৎসরের পরাধীনতার অবসানে ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দে ১৫ই আগস্ট ভারত স্বাধীন হয়। তবে এই স্বাধীনতা শত শত তাজা প্রাণের আত্মবলির বিনিময়েই সম্ভব হয়েছিল। কিন্তু এদের মধ্যে কজনকেই বা আমরা মনে রেখেছি অথচ ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে যাঁদের ভূমিকা কোন অংশেই কম ছিল না ? বিপ্লবী নায়ক হেমেন্দ্রকিশোর আচার্য চৌধুরী এঁদের মধ্যে অন্যতম। তিনি ছিলেন ময়মনসিংহের (অধুনা বাংলাদেশের) জমিদার বংশের সন্তান। শ্রীঅরবিন্দের সাক্ষাৎ মন্ত্রশিষ্যরূপে তাঁর বিপ্লবী জগতে প্রথম আত্মপ্রকাশ ঘটে। একজন সুদক্ষ সংগঠকরূপে তিনি ময়মনসিংহ, ত্রিপুরা, চট্টগ্রাম ও বাংলাদেশের বিস্তৃত অঞ্চলে বিপ্লব আন্দোলন গড়ে তোলেন। তাঁর প্রতিষ্ঠিত 'সাধনা সমাজ' পরবর্তীকালে বিপ্লবী অনুশীলনের সহিত যুক্ত হয়ে যায়। তৎকালীন ভারতের প্রত্যেক বড়ো বড়ো নেতার সঙ্গেই তাঁর নিয়মিত যোগাযোগ ছিল। প্রতিটি আন্দোলন তাঁর সক্রিয় সহযোগিতা সুষ্ঠু পরিকল্পনা অনুসারে সম্পন্ন হত ময়মনসিংহে তাঁর 'দেব-নিবাস' পলাতক বিপ্লবীদের প্রধান আশ্রয়স্থল ছিল।

বংশপরম্পরায় তিনি যে সম্পদের অধিকারী হয়েছিলেন তা প্রধানতঃ দেশসেবার কাজেই ব্যয়িত হয়। বিশ্বাসঘাতক নরেন গোঁসাইকে জেলের মধ্যে হত্যার জন্য যে দুটি আগ্নেয়াস্ত্র প্রেরিত হয়েছিল, তার একটি পাঠিয়েছিলেন হেমেন্দ্রকিশোর। যতীন্দ্রনাথ মুখার্জী (বাঘা যতীন) কৃত সশস্ত্র বিপ্লব পরিকল্পনায় তাঁর দান ছিল অপরিসীম।

বাঘাযতীন নিজে সাধনা সমাজের সহিত যুক্ত ছিলেন এবং কলকাতার দেব-নিবাসে আশ্রয় নেন। ব্রিটিশ শাসকবর্গ তাঁকে দীর্ঘদিন জেলে অন্তরীণ রেখে 'স্লো পয়জন' করে। এর ফলে তাঁর স্বাস্থ্য ভেঙে পড়ে এবং অকালমৃত্যু বরণ করতে হয়। শেষশয্যায় তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে স্বয়ং নেতাজী সুভাষ উপস্থিত হয়ে আশ্বাস দেন 'আপনার স্বপ্নের স্বাধীনতা আর বেশী দূরে নেই'। কিন্তু তিনি না থাকিলেও তাঁর আদর্শ তাঁর শিষ্যদের যেমন সুরেন্দ্রমোহন ঘোষ (মধু) ভূপতি মজুমদার, ডাঃ যাদুগোপাল মুখার্জীর মধ্যে পরবর্তীকালে প্রতিফলিত হয়। এই মহান বিপ্লবীর পুত্র ভ্রাতা ও স্ত্রী সকলেই ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের সঙ্গে ওতঃপ্রোতভাবে যুক্ত ছিলেন। স্বাধীন ভারতে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে পার্লামেন্টের সেন্ট্রাল হলে তাঁর চিত্র রাখা হয়েছে ও তাঁর স্বাধীনতা সংগ্রামী পুত্র ও ভ্রাতাকে তাম্রপত্র ও পেনশন দেওয়া হচ্ছে। তিনি আজ এ জগতে না থাকলেও তাঁর কীর্তির স্বাক্ষর আজও আমাদের মধ্যে বিদ্যমান। এই মহান বিপ্লবী নায়কের মহৎ কীর্তিকে চির জাগ্রত রাখতে তাঁর জন্মশতবার্ষিকী উদযাপনের মাধ্যমে তাঁর যথাযোগ্য মর্যাদা দান সম্ভব।

(৬ পৃঃ পর)

খুঁজে পাচ্ছেন না তাদের প্রশ্নের। তাদের অবগতির জন্যই স্বাধীনতা সংগ্রামীদের মানসিক প্রতিক্রিয়ার চিত্র তুলে ধরা হল। সংশ্লিষ্ট সকলকেই মনে রাখতে হবে এটা কারো দয়াদাক্ষিণ্যের দান নয়। এটা শুধু প্রাপ্তির স্বীকৃতি মাত্র, এটা কেন্দ্রীয় সরকারের একটি নীতির বাস্তবায়ণ মাত্র। এই তুচ্ছতাচ্ছিল্য তাকটি পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যকে অন্য রাজ্যের নিকট হেয় প্রতিপন্ন করছে। মাননীয়া কেন তার দায়ীভাগী হবেন ? অবস্থা যদি তাদের আয়ত্তের বাইরে চলে যেয়ে থাকে, তবে সেকথা খোলাখুলি বলে তাদের পদত্যাগ করাই কি উচিৎ হবে না ? অফিস স্থানান্তরের নামে আর কতদিন ফাইল বন্দী থাকবে।

কংগ্রেস কর্মী ও নেতাদের নিকট নিবেদন

—জনৈক কংগ্রেস কর্মী

পশ্চিমবাংলার একটি লোকসভা ও আটটি বিধান সভার নির্বাচনে, এখানকার কংগ্রেস (ই) দলের যে শোচনীয় ফলাফল হয়েছে, তার জন্য প্রত্যেক কংগ্রেসকর্মী ও নেতাদের আত্মসমীক্ষার প্রয়োজন আছে বলে আমরা মনে করি। কেন এই পরাজয় ঘটেছে, তার মৌল কারণগুলির সমীক্ষা করে ভবিষ্যৎ কর্মপদ্ধতি নির্দ্ধারণ করতে হবে এখনই এবং দেরী করলে এই রাজ্যে এই দলের পুনরুত্থানের সম্ভাবনা বহুদিনের মত পিছিয়ে যাবে, এ সম্বন্ধে কোন দ্বিমত আছে বলে মনে হয় না।

কোন লড়াইয়ের সময় বিপক্ষের সবলতা ও দুর্বলতা সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান ও চেতনা থাকা দরকার। সঙ্গে সঙ্গে নিজদলের সংগঠনকে মজবুত ও শক্তিশালী করা দরকার। সর্বোপরি দরকার নিজেদের আদর্শে অবিচল নিষ্ঠা ও উদ্দেশ্য সাধন করার জন্য চরম স্বার্থ-ত্যাগ করার ইস্পাত কঠিন সঙ্কল্প, নিজেদের শিবিরে অন্তর্দ্বন্দ্বের কোন অস্তিত্বকে বিলীন করে দেবার মানসিকতা।

যারা শুধু চেম্বার পলিটিসিয়ান, যারা দলের মধ্যে আধিপত্য করতে চায় বোমাবাজি করে বা মাস্তানদের সাহায্যে দাঙ্গাহাঙ্গামা সৃষ্টি করে, যাদের একমাত্র লক্ষ্য হল ক্ষমতা দখলের জন্য সব রকম ন্যায়নীতিহীন কৌশল অবলম্বন, তাদের দল থেকে চিরতরে নির্বাসিত করতে হবে। নেতৃত্ব তুলে দিতে হবে এমন লোকদের হাতে, যাদের দেশসেবার একটা ঐতিহ্য আছে, যারা শুধু মাত্র নিজেদের নানাবিধ স্বার্থসাধন করতে অশোভন ভাবে আগ্রহী নয়, যারা দেশের ছাত্র ও যুব সমাজকে মানবিক মূল্যবোধের আদর্শে দীক্ষিত করতে পারেন, তাদেরই হাতে। আমরা আগেও বলেছি পশ্চিমবাংলার বর্তমান নেতৃত্ব যাদের উপর ন্যস্ত দায়িত্ব পালনে শোচনীয়ভাবে ব্যর্থ হয়েছেন। তারা ভদ্রলোক হলে, তারা নিজেরাই পদত্যাগ করতেন।

দেশের মানুষের স্বার্থকে নিজেদের স্বার্থের উপরে স্থান দিতে পারেন নি তারা, একথা অনস্বীকার্য্য। সবচেয়ে বড় অভিযোগ হল তারা এরাজ্যে কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানের ভাবমূর্তি মলিন করে দিয়েছেন। তাদের নিজেদের এগিয়ে এসে অন্য কোন যোগ্য ব্যক্তিদের হাতে দায়িত্বভার অর্পণ করা কর্তব্য। কি গভীর পরিতাপের সঙ্গে দেশের মানুষ লক্ষ্য করেছেন যে নির্বাচনে পরাজিত না হলে বা যমদূত এসে পৃথিবী থেকে তাদের সরিয়ে না নিলে, কেউ গদী ছাড়তে চান না। সাধারণ কর্মী ও মানুষের হাতে কোন ক্ষমতা নেই যে এরা তাদের সরিয়ে দিতে পারেন। এমন সংগঠনও নেই যার সাহায্যে জনমত সংগ্রহ করে এদের অন্যায় কাজকর্মের বিচার করে প্রয়োজনমত শাস্তিবিধান করতে পারেন। কিন্তু এই ব্যবস্থার বিহিত করতে হলে, কর্মীদলকে বিশেষ ভাবে সজাগ ও সংগঠিত হতে হবে। প্রতিবাদের আওয়াজ যদি বলিষ্ঠ হয়, তবে তাদের মতকে উপেক্ষা করা সহজ হবে না। অবশ্য তার অর্থ এই নয় যে নিজের অভিপ্রায় অনুযায়ী কোন কাজ না হলেই, দলের মধ্যে শৃঙ্খলাহীনতার সৃষ্টি করে গোষ্ঠী-গতভাবে চলতে হবে।

নিজেদের সংগঠনের বিভিন্ন স্তরে প্রতিবাদের ঝড় বইয়ে দিতে হবে শেষ সিদ্ধান্ত নেবার আগেই। সম্পূর্ণ সফলতা অল্পদিনের মধ্যে লাভ করা না গেলেও একটু ধৈর্য্য ধরে কাজ করলে সফলতা তাদের আসবেই। প্রত্যেক রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের শক্তির উৎস হল জনসমর্থন। কর্মীরা যদি নিঃস্বার্থভাবে জনসেবাকে নিজেদের জীবনের জীবনের ব্রত হিসাবে গ্রহণ করে কাজকর্ম করেন, জনসমর্থন তাদের পক্ষেই যাবে। যে শক্তিকে উপেক্ষা করে যারা চলতে চাইবে, নিশ্চয়ই তাদের পতন কেউ রোধ করতে পারবে না।

বর্তমানে যে পরাজয় ঘটেছে, তার জন্য হতাশায় ভেঙ্গে পড়লে চলবে না। দ্বিগুণ উৎসাহে আসন্ন নির্ব্বাচন যুদ্ধে লড়াকু মনোবৃত্তি নিয়ে, এখন থেকেই কাজ শুরু করতে হবে। প্রতিপক্ষ কিভাবে ক্ষমতা কুক্ষিগত করে রাখতে পেরেছে, তার যথাযথ বিশ্লেষণ করাও অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। অবশ্য তাদের অপ-কৌশলগুলিকে অনুকরণ করার কোন প্রশ্নই থাকতে পারে না। চক্রান্ত, মিথ্যাচার, অপকৌশলগুলির বজ্রপথ রুদ্ধ করে দিতে হবে। প্রয়োজনবোধে অন্যের সুকৌশলগুলির বিচার বিবেচনা করে গ্রহণ করার মধ্যে কোন হীন মন্যতা নেই। সাধারণ কর্মী হিসাবে, এই নির্ব্বাচনে পরাজয়ের কয়েকটি মৌল কারণ আমরা তুলে ধরতে চাই কংগ্রেস কর্মীদের সমক্ষে তাদের সমীক্ষার জন্য এবং প্রয়োজনীয় সংশোধনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য।

কেন কংগ্রেস এমন ভাবে হারল। প্রথম কারণ হল, সংগঠনের মধ্যে অনুপযুক্ত লোকদের হাতে নেতৃত্ব অর্পণ। দ্বিতীয়তঃ, দল নিজেদের মধ্যে কলহে মত্ত হয়ে সর্বশক্তি তাতেই ক্ষয় করেছে। তৃতীয়তঃ, পৌর নির্ব্বাচন বয়কট করে চরম নির্বুদ্ধিতার পরিচয় দিয়েছে। এর ফলে মানুষ যখন আশা করেছিল, এরা যোগ্য নেতৃত্ব দিয়ে বর্তমান শাসক দলের অত্যাচার থেকে মানুষকে মুক্তি দেবে, তখন এরা বালসুলভ চপলতার স্বাক্ষর রাখলে নির্বাচনে অংশগ্রহণ না করে। অকম্যুনিষ্ট গোষ্টিগ্রহণ করার একটা সুযোগকেও বিনষ্ট করে দিল, একক ভাবে নির্বাচনে অংশগ্রহণ না করে।

চতুর্থতঃ মানুষ দেখছে এরা স্থায়ী বিকল্প নেতৃত্ব দিতে পারবে না, তখন তারা এদের উপর আস্থা হারিয়ে ফেলল এবং পনর দিন পরের নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত নিলেও, এদের চপলমতির নতুন পরিচয় পেল। পঞ্চমতঃ, মানুষ দেখছে একদল নেপোরা শুধু 'দই' মারবার চেষ্টাতেই ব্যগ্র। সেজন্য কোন ত্যাগ স্বীকার করবে না, যোগ্যতার পরিচয় দেবে না, আদর্শনিষ্ঠার কোন স্বাক্ষর রাখবে না শুধু দলনেত্রী ইন্দিরাজীর প্রভাবেই গদী দখল করতে উদ্যত। ষষ্ঠতঃ, কর্মীদের কোন উপযুক্ত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা নেই। তাদের প্রশিক্ষণ দিতে হবে কংগ্রেসের আদর্শ কি, কি ভাবে এবং কেমন করে জনস্বার্থ সাধনের লক্ষ্যে পৌঁছতে হবে, এবং এ জন্যে সর্ব সময়ের জন্য উপযুক্ত পারিশ্রমিক দিয়ে কর্মীদল গঠন ও লালন পালন করতে হবে। দলীয় মন্ত্রীরা এবং এম, পি, এম, এল এরা নিজেদের অর্থনৈতিক ভবিষ্যৎ গড়ে তুলবেন। আর নীচুতলার কর্মীরা, যাদের উপর তলার মানুষদের জীবন মরণ নির্ভরশীল, তারা উপবাস করে, ত্যাগ স্বীকার করে, অশ্রু দিয়ে ঘর্ম দিয়ে, এমনকি এই মাস্তান নির্ভর দলগুলির অমানবিক অত্যাচারের শিকার হয়ে জীবন বিসর্জন দেবেন, একথা যারা ভাবেন, তারা মূর্খের স্বর্গেই বাস করেন। এ ব্যবস্থা ভারতের সর্বত্রই চালু হওয়া দরকার।

বিপক্ষ দলেরা অনেকেই এই ব্যবস্থা চালু করেছেন এবং সুফলও লাভ করেছেন, একথা অবশ্যই স্বীকার্য। একজন মানুষের প্রভাব প্রতিপত্তির উপর নির্ভর করে কোন দলই টিকতে পারে না বেশী দিন, এই ত ইতিহাসের শিক্ষা। সপ্তমতঃ, কর্মীরা দেখছে নিজ নিজ প্রতিষ্ঠা বজায় রাখতে, বর্তমানে যারা দলের নেতৃত্ব পদে আসীন আছেন, তারা দিল্লীর দরবারে ধরনা দেবার জন্য যে বিপুল অর্থ ব্যয় ও শ্রম ব্যয় করেন, তার শতাংশের একাংশ ও জনসংযোগ করতে, সংগঠনকে মজবুত করতে সচেষ্ট নন। গণতান্ত্রিক কাঠামোতে নির্বাচনের সম্মুখীন হওয়া ব্যতীত গত্যন্তর নেই কোন দলেরই। কিন্তু কোন সংগঠন শুধু নির্বাচন সর্বস্ব হলেও তার অস্তিত্ব বিপন্ন হতে বাধ্য। সারা বছর ঘুমিয়ে থেকে হঠাৎ পনর দিন একমাস আগে, ভোটার তালিকার কারচুপির অভিযোগ তুললে কোন ফললাভ হয় না। এ ব্যাপারে পশ্চিমবঙ্গের সি, পি, আই (এম) দলের কার্যাকলাপ অনুসরণ যোগ্য। বহু অপকর্ম তারা করে বটে, তবে তাদের সংগঠন খুব মজবুত, কর্মীদল সে জন্য উপযুক্ত পারিশ্রমিকও পায়। তবে এই পারিশ্রমিকদানের মধ্যে কোন দয়াদাক্ষিণ্যের মনোভাব থাকা উচিৎ নয় এবং যে সব কর্মীরা সব সময়ের জন্য দলীয় কাজে নিয়োজিত করবেন, সামান্য পারিশ্রমিক গ্রহণের মধ্যে কোন হীনমন্যতা থাকাও উচিৎ নয়।

নির্বাচনের কাজ ছাড়াও, যতদিন কংগ্রেস দল কেন্দ্রে এবং রাজ্যে ক্ষমতাসীন থাকবে, জাতি গঠনের বহুক্ষেত্রে এই কর্মীদলের সহায়তা করা বিশেষভাবে প্রয়োজনীয়, একথা ভুললে চলবে না। শুধু সরকারী কর্মচারীর উপর নির্ভর করলে যাদের বলা হয় বুরোক্রেসী এবং চরিত্র বিশ্লেষণ করেছেন পার্কিনসন সাহেব তার সাম্প্রতিককালে কলিকাতার কয়েকটি সভায়—ডরাডুবি অনিবার্য্য, শুধু দলেরই নয়, দেশের মানুষেরও।

সুতরাং এখনই এই ব্যবস্থা গ্রহণ করা দরকার, যাতে কর্মীদল উৎসাহিত হবেন এবং নতুনভাবে কাজে আত্মনিয়োগ করবেন। আগামী সাধারণ নির্বাচন দূরে নয়। বর্তমান নেতা শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন মহাশয় ইলেকসান কমিশনারকে অনুরোধ করেছেন, বিগত নির্বাচনের ভোটার তালিকা কারচুপিতে ভরা। ভোটার তালিকা সম্পূর্ণভাবে সংশোধন করা দরকার অবাধ ও পরিচ্ছন্ন নির্বাচনের জন্য। এক মুহূর্ত বিলম্ব না করে, বিরোধীদলের কর্মীদের, বিশেষ করে কংগ্রেস (ই) দলের কর্মীদের এজন্য অলস প্রচেষ্টা চালিয়ে ভোটার তালিকার সংশোধন করতে হবে। শ্রীসাকদের কি করবেন জানিনা।

কিন্তু তার উপর নির্ভর করে হাত গুটিয়ে বসে থাকলে চলবে না। সংঘবদ্ধভাবে এই মিথ্যাচার ও অপকৌশলের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে হবে। নির্বাচনের কয়েকদিন আগে কাঁদুনি গেয়ে কোন ফল হবে না। প্রশাসকদলের কুকীর্তির মুখোস খুলে দিতে হবে। একাজ না করলে, নির্বাচনে একই ফললাভের পুনরাবৃত্তি ঘটবে।

ভোটারদের নিকটও আমাদের একটি আবেদন আছে। গণতান্ত্রিক দেশে তাদের ভোটার তালিকাভুক্ত হওয়া ও যথা সময়ে ভোট দেওয়া তাদের অবশ্য করনীয়। এটা তাদের একটি বিশেষ অধিকার। তাদের নাম কেউ মতলব করে বাদ দিলে, নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে নিজেদের নাম তালিকাভুক্ত করতে তাদেরও বিশেষভাবে তৎপর হওয়া উচিৎ। এটা তাদের কর্তব্য। শুধু দলীয় কর্মীদের উপর সব

দায়িত্ব ছেড়ে দিলে, তাদের কর্তব্যচ্যুতি ঘটবে। তারা যেন ভুলে না যান, অন্যান্য অনেক দেশের মত, এই ভোটাধিকার আদায় করতে ভারতবাসীকেও রীতিমত লড়াই করতে হয়েছে। নিজেদের নাম স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে নিজেরা তালিকাভুক্ত না করলে, তারা গণতন্ত্রের অযোগ্য বলে বিবেচিত হবেন।

একদিকে কর্মীদলের ও নেতাদের মনে রাখতে হবে নেতাজীর অমরবাণী—'নতুন ভারত যারা সৃষ্টি করতে চায়, তাদের কেবল দিয়ে যেতে হবে—সারা জীবন কেবল দিয়ে যেতে হবে—নিজেকে বিলিয়ে কাঙ্গাল হয়ে যেতে হবে—প্রতিদানে কিছু না চেয়ে।' অন্যদিকে স্মরণে রাখতে হবে (বিশেষ করে নেতা-দের) কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের বাণী।—'ত্যাগের প্রয়োজন। এই ত্যাগ নিজেকে রিক্ত করার জন্য নয়, নিজেকে পূর্ণ করার জন্য। ত্যাগ মানে আংশিককে ত্যাগ সমগ্রের জন্য, ক্ষণিককে ত্যাগ নিত্যের জন্য, অহংকারকে ত্যাগ প্রেমের জন্য ত্যাগের দ্বারা ভোগ করবে, আসক্তির দ্বারা নয়।'

এই ব্যবস্থার প্রয়োজন শুধু পশ্চিমবাংলার জন্য নয়, এর প্রয়োজন আছে সমগ্র ভারতের জন্য। এ সব কথার কথা নয়। এই ভারতভূমিতে, এমন মানুষেরা এসেছেন, দেখেছেন, সব জয় করে গিয়েছেন। মনুষ্যত্বের মহান আদর্শকে বাস্তবায়িত করে গিয়েছেন নিজেদের জীবনে। তাদের ইতিহাস, তথা দেশের ইতিহাস জানতে হবে। যে জাতি নিজেদের ইতিহাস জানেনা, তার থেকে শিক্ষাগ্রহণ করে না, তার ধ্বংস অনিবার্য্য।

পরিশেষে একটি নিবেদন জানিয়ে শেষ করি। কর্মীদের অনুরোধ করি, তারা নৈরাশ্য, হতাশা দূর করে, নতুন সঙ্কল্প নিয়ে এগিয়ে আসুন। সর্বোচ্চ নেতৃবৃন্দের নিকট অনুরোধ করি, তারা যেন অবিলম্বে এখানকার প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি পুনর্গঠন করেন। যারা মতলববাজ, নিজস্বার্থ সর্বস্ব, একমাত্র মলমূত্রত্যাগ ভিন্ন যাদের জীবনে অন্যকোন প্রকার ত্যাগের স্বাক্ষর নেই, তাদের দূর করে দিয়ে নতুন প্লেটে কাজ শুরু করার ব্যবস্থা করুন। নান্য পন্থা অয়নায়—এছাড়া অন্য কোন পথ নেই।

●

পরলোকে প্রবীণ বিপ্লবী বাদল চ্যাটার্জী

ঢাকার বিপ্লবী যুগান্তর দলের বিশিষ্ট কর্মী এবং ভারতের ওয়ার্কার্স পার্টির বিশিষ্ট নেতা প্রবীণ বিপ্লবী বাদল চ্যাটার্জি গত ১৪ই জুলাই নিলরতন সরকার হাসপাতালে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন। স্বাধীনতা আন্দোলনে প্রতিটি স্তরে তিনি সক্রীয় অংশ গ্রহণ করে সংগ্রামী নিষ্ঠার স্বাক্ষর রেখে গেছেন, প্রখ্যাত বিপ্লবী প্রয়াত জীবনলাল চ্যাটার্জির কনিষ্ঠ ভ্রাতা-অকৃতদার আদর্শনিষ্ঠা সর্বজন প্রিয়, মিষ্ট ভাষী বন্ধু বৎসল এই মহান বিপ্লবীর প্রয়াণে আমরা ব্যথিত। এবং তার বিদেহী-আত্মার শান্তি কামনা করি—

আমরা এই মহান বিপ্লবীর স্মৃতিতে শ্রদ্ধা জানাই।

রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্র নাথের স্মৃতি কথা

["A Nation In Making" গ্রন্থ থেকে অনুবাদ]

অনুবাদক—অধ্যাপক নলিনীমোহন দাশগুপ্ত

দ্বৈত শাসন

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

কিন্তু ইংরেজ জাতির চরিত্র সম্পর্কে আমরা যতটুকু জানি, তাতে নির্দ্বিধায় বলা যেতে পারে যে তারা হঠাৎ মত বদলাবেন না। এবং যখন তারা কোন বিষয়ে মত বদলান তখনও তারা পুরাতন পোষাকেই ধারণ করেন, যেমন ঘটেছিল ১৬৮৮ সালের মহান বিপ্লবের সময়। ১৯১৯ সালের ভারত শাসন আইনের মুখবন্ধে (যা এখন পার্লামেন্টের একটি বিধিবদ্ধ ব্যবস্থা হয়ে রয়েছে) একথা উল্লিখিত আছে যে ব্রিটিশ শাসনের লক্ষ্য হচ্ছে দায়িত্বশীল সরকার গঠন, এবং সে লক্ষ্যে পৌছাতে হবে ধাপে ধাপে।

এই আইনে আরও বলা হয়েছে যে ১৯২৯ সালের পরে একটি পার্লামেন্টারী কমিশন গঠন করা হবে। সেই কমিশন গঠনতন্ত্রে আর কি কি পরিবর্তন করা আবশ্যক সে সম্পর্কে রিপোর্ট পেশ করবেন।

১৯১৭ সালের ২০শে আগষ্টের ঘোষণাকে কার্যকরী রূপদানের পরিপ্রেক্ষিতেই এই সমস্ত প্রাথমিক কর্ম পরিক্রমার বিষয় লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে ব্রিটিশ পার্লামেন্ট ও গণতন্ত্র ভারতে ক্রমবিকাশমান দায়িত্বপূর্ণ সরকার গঠনে সুস্পষ্টভাবে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। তবে দশ বছর পরীক্ষার পরে সেই দায়িত্ব পরিপূর্ণভাবে দেওয়া হবে। এই মুহূর্তে পরিপূর্ণ দায়িত্বশীল সরকার গঠন পার্লামেন্টের বিঘোষিত নীতির মধ্যে পড়ে না। বাধাদানের চাপ সৃষ্টি করার কৌশলের দ্বারা কি তাদের সেই নীতির কোন পরিবর্তন সাধন করা যায়।

ব্রিটিশ পার্লামেন্টের ঐতিহ্য তা নয়। এবং ব্রিটিশ জনমতের ধারক বড় বড় পত্রিকাগুলি এ দেশের কোন কোন আইন সভার সেই বাধাদানের কৌশলকে তীব্রভাষায় নিন্দা করেছেন, তারা বলেছেন যে এর ফলে শিক্ষানবিসীকালের সময়সীমা কমে না গিয়ে আরও বেড়েই যাবে। কাউন্সিলের অভ্যন্তরে যে বাধাদানের কৌশল অনুসরণ করা হচ্ছে তা যদি বাইরে জনগণের মনকে উত্তেজিত ও বিক্ষুব্ধ করে তোলার মত কোন বৈপ্লবিক কর্ম প্রচেষ্টার ইঙ্গিত বহন করে তাহলে তার একটা অর্থ হয় এবং তা যুক্তিসঙ্গতও বটে, নতুবা সবই নিষ্ফল ও অর্থহীন।

কারণ, তার দ্বারা সরকারকে ধ্বংস করা তো যাবেই না, পরন্তু এই সরকারের মধ্যে যতটুকু জনমত প্রতিধ্বনিত হওয়ার সম্ভাবনা আছে, তাও হয়ত আর

থাকবে না। ফলে আবার সেই পুরাতন আমলা-তান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার মধ্যেই ফিরে যেতে হবে, যদি এই বাধাদানের কৌশলকেই আঁকড়ে ধরে থাকা হয়।

বাধাদানকারীরা স্বৈরতন্ত্রী শাসনকে গ্রাহ্য না করার ফলে সাময়িকভাবে বীরপুরুষ বনে যেতে পারেন, কিন্তু আখেরে তারা তাদের দেশবাসীর জন্য যা রেখে যাবেন তা হবে তাদের অশুভ কর্মের এক দুঃখজনক তিক্ত ফসল। ইতিমধ্যেই তা বাংলা ও মধ্যপ্রদেশে দেখা দিয়েছে। এই প্রসঙ্গে কানপুর ষড়যন্ত্র মামলার একজন বিপ্লবীর এক পত্র থেকে কয়েকটি লাইন উদ্ধৃত করা বোধ হয় অসঙ্গত হবে না। পত্রে লেখা আছে, 'বৈপ্লবিক দৃষ্টিভঙ্গি সম্পন্ন কোন পার্টি ছাড়া কোন কাউন্সিল ভাঙার কৌশল সাফল্যের সঙ্গে পরিচালনা করা যায় না।

তাই দেখা যাচ্ছে, বিপ্লবী সংঘের মতে রিফর্ম কাউন্সিল ভাঙার কাজ এক সঙ্গেই হয়ে থাকে।

ডায়ার্কির উপর এই আঘাতে একটা জিনিষ বুঝা যাচ্ছে। তা হল এই যে, যে মূল সর্তের উপর শাসন সংস্কার পরিকল্পনায় ডায়ার্কি স্থান পেয়েছে, সেই মূল সর্তকেই উপেক্ষা করা হচ্ছে। ডায়ার্কিতে কেউই উৎসুক নয়, এমন কি যারা ডায়ার্কি সমর্থন করেন তারাও নন। অনেকে তো আবার সন্দেহ প্রকাশ করেছেন, উহা সফল হবে কি না। বড় জোর এটাকে একটা বড় রকমের পরীক্ষা মূলক সূচনা হিসাবে প্রথম ধাপ বলে মনে করা যেতে পারে। জয়েন্ট পার্লিয়ামেন্টরী কমিটির নিকট সাক্ষ্যদানকালে আমি বলেছিলাম :

'আমরা (আমি এখানে ন্যাশনাল লিবারেল ফেডারেশনের পক্ষে সাক্ষী দিচ্ছিলাম) ডায়ার্কি সমর্থন করছি। তবে তার কারণ এই নয় যে এটা একটা আদর্শ পদ্ধতি। আমরা সমর্থন করছি এই জন্য যে মনে হচ্ছে যেন এটাই ১৯১৭ সালের ২০শে আগস্টের ঘোষণাবাণীকে রূপায়িত করার একমাত্র সম্ভাব্য পদ্ধতি। শুরুতেই দায়িত্বশীল সরকারের ব্যবস্থা এতে আছে। আর ক্রমবিকাশের ধাপগুলির ব্যবস্থা করে এটা দায়িত্বশীল শাসন ব্যবস্থাকে আমাদের দৃষ্টি পথের মধ্যে এনে দিয়েছে। এই জন্যই আমরা উহা সমর্থন করছি।'

আমি দেখতে পাচ্ছি, ডায়ার্কির উপর বর্তমানে যে আক্রমণ চলছে তাতে কয়েকজন প্রাক্তনমন্ত্রী এবং কয়েকজন বিশিষ্ট উদার নৈতিক ও নরমপন্থী নেতাও যোগদান করেছেন। তাদের সঙ্গে মতবিরোধ থাকতে পারে। (চলবে)

Freedom fighters whose pension has been sanctioned

May & June—1981

Name	Address	Amount Rs.	with effect from
	CALCUTTA		
Benerjee Smt. Madhuri, w/o L Amulya Ch.	Baguihati Bazer-59	250	15 8 72
Banerjee Smt, Mira, w/o L, Ramnath	Benerjee 78, Sarat Bose-65 Rd.	300	1 8 80
Banerjee Niranjan,	32A, P. C. Road-9	300	1 8 80
Beri Smt, Usha, w/a L, Dayaram	Beri 123A, Maharaj Nandakumr Road-36	200	1 8 80
Bhattacharyya Smt, Amiyarani, w/o L. Priyabrata	Bhattacharyya 5/1, Baralpara Lane-35 (Restoration)	300	1 8 80
Bhowmik Smt. Kalyani, w/o L. Kamakshya Prasad	(Restoration)	250	1 3 80
Chakraborty Smt, Anjana, d/o L, Janardan	Chakraborty, 74/C Salimpur Road-31	200	1 8 80
Chakraborty Bimalendu Bikash, 5 7	Jatindasnagar-56	300	1 8 80
Chakraborty Smt, Gita, w o L Niranjan	Chakraborty 17/2 Haridebpur Road-82	300	1 8 80
Chakraborty Paresh Chandra, 8A Abdul Rasul Avenue, (2nd Floor) Cal-26 at present 15 1, Ekdalia Place, Flat No 1, Cal-19 (Restoration		300	1 8 80
Chakraborty Smt Sashibala Suite No, 11/61 2nd Floor, Maniktala Main Rd, Cal-54 w/o L, Nagendra Sekhar		100	1 8 80
Ch. Syamadas 35/3 Fullbagan Road Cal-86		300	1 8 80
Chanda Smt. Basanti w/o L Bishnupada	Chanda 23/3, Canal East Road	300	1 8 80
Chowdhury Smt Parul Devi 11, R. M. Banerjee Road w/o L Bejoy	Bhusan	300	1 8 80
Das Smt Rama, w/o L Ashutosh, 14/1C Harinath De Road Cal-9		200	1 8 80
Dasgupta Amalesh Ch. 77/2 Santoshpur Avenue Cal-32, (Restoration)		300	1 8 80
Dasgupta Arunendra Nath, 88, Charakdanga Road, Cal-10		300	1 8 80
Dasgupta Nani Gopal, 194 Jodhpur Park, Cal-31		300	1 8 80
Dasgupta Smt Prova w/o L,Sushil Kr. B/15 Lakshminagar Colony Cal-47		200	26 12 80
Dhar Paritosh, 150, S. P. Mukherjee Road Cal-26		300	1 8 80
Dutta Kasiswar, 55 Shyamnagar Road, Cal-55 (Restoration)		300	1 8 80
Dutta Makhanlal, 52/F Hindusthan Park, Cal-29		300	1 8 80

Regd.No.R. N. 24511/71 | Biplabi Bangla | Regd. WB/NC 77
Phone : 34-1795
বার্ষিক :—ডাক ১০.০০ টাকা | বাষ্মাসিক :—৬.০০ টাকা | মূল্য—৩০ পয়সা

পাক সেনাপতি টিক্কা খানের জল্লাদবাহিনী যে গ্রন্থ পুড়িয়ে ছাই করে দিয়েছিল বিপ্লব তাপস মহারাজ ত্রৈলোক্যনাথের সেই অবি স্মরণীয় গ্রন্থ "ভোল্ ব্রিস বন্দর ও আজ ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম" পুনর্মুদ্রিত হল।

—তিন টাকা

: প্রাপ্তিস্থান :
খাদি প্রতিষ্ঠান
১৫, কলেজ স্কোয়ার,
কলিকাতা-১২

সম্পাদক—
শ্রীশান্তিশরণ রায়চৌধুরী
॥ সম্পাদকমণ্ডলী ॥
শ্রীজগদীশ চট্টোপাধ্যায় (সভাপতি)
শ্রীভবেশচন্দ্র নন্দী
পুষ্প চ্যাটার্জী
মলয় ঘোষ
প্রকাশক ও মুদ্রক—
শ্রীঅনিল সেনগুপ্ত
দিল্লীর বিশেষ প্রতিনিধি—
শ্রীবাবীন ঘোষ
ফোটো—
শ্রীনন্দগোপাল পাল

বিপ্লবী পুস্তকমালা

নেতাজীর সিক্রেটসার্ভিস—ডাঃ পবিত্রমোহন রায়—৮·০০
বিপ্লবী মহানায়ক রাসবিহারী—সুবোধ মজুমদার
অনুশীলন সমিতির বিপ্লব প্রয়াস—ব্রজেন্দ্র দাস

—ক্ষীরোদ কুমার দত্তের—

১। বাংলার অগ্নিযুগ—১·৫০, ২। ভারতীয় বিপ্লব প্রচেষ্টা—৮·০০ ৩। অনুশীলন সমিতির পি, মিত্র—২·০০, ৪। সৈন্যদের সংগ্রাম কাহিনী—২·০০, ৫। কাকোরী ষড়যন্ত্র—১·২৫, ৬। কলকাতা যুদ্ধের সংগ্রাম কাহিনী—·৫০, রাসবিহারী ও অনুশীলন সমিতি—·৩ ৮। স্বাধীনতা সংগ্রামে বাঘা যতীন—·৭০, ৯। বিবেকানন্দ ও সমাজবাদ—·৬০ ১০। বিপ্লবী বিবেকানন্দ—·৫০, ১১। মহাবাহু ও সুভাষচন্দ্র—·৫০ ১২। ভারতের মুক্তিসংগ্রাম ও ডগিনী নিবেদিতা—·৭৫, ১৩। দেশ বন্ধুর চোলেনি (১)—১·০০, ১৪। দেশ বন্ধুর চোলেনি (২)—২·০০ ১৫। শহীদ চন্দ্রশেখর আজাদ—·৫০, ১৬। ১৩ই এপ্রিল জাতীয় শহীদ দিবস—৮·০০, ১৭। রাশিয়ার হত্যা প্রচেষ্টা—·৭৫, ১৮। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও অনুশীলন সমিতি—৭·০০, ১৯। ভারতের জাতীয় পতাকার ইতিহাস—·৯০, ২০। লাট হত্যা প্রচেষ্টা—১·৫০

প্রাপ্তিস্থান—৪নং বঙ্কিম দাস ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০০৭

টেমলুক—৯/১/১/A বঙ্কিম চ্যাটার্জী ষ্ট্রীট কলিকাতা-৭৩

মূল কার্যালয়—৪নং বঙ্কিম দাস ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০০৭ শ্রীঅনিল সেনগুপ্ত কর্তৃক প্রকাশিত এবং তৎকর্তৃক প্রিন্টিং পার্টনারসিপি, ১১৭, কেশবচন্দ্র সেন ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০০৯ হইতে মুদ্রিত।

বিপ্লবী বাংলা

॥ বিপ্লবী পরিষদের সাপ্তাহিক মুখপত্র ॥

স্থাপিত—১৯৫৬, 'বিপ্লবী বাঙ্গালী' নবকলেবরে—১৯৭১

দশম বর্ষ	শনিবার ১৬ই শ্রাবণ ১৩৮৮ ১লা আগষ্ট ১৯৮১	৩৮,৩৯ সংখ্যা

"প্রকৃত বিপ্লবী হচ্ছে সেই, যে কোনদিন পরাজয় স্বীকার করেনা; সে কখনও মূষড়ে পড়েনা বা হতাশ হয়না। একজন খাঁটি বিপ্লবী তার উদ্দেশ্যের যথার্থতার প্রতি বিশ্বাসবান থাকবে এবং তার দৃঢ় বিশ্বাস থাকবে যে তার উদ্দেশ্য দেরীতে হলেও সাফল্য লাভ করবেই।"

—নেতাজী

বিদ্যুৎ পরিস্থিতির তীব্র সংকটে গত ২৫শে জুলাই তারিখের সংখ্যা প্রকাশ করিতে না পারায় আমরা দুঃখিত।

—সঃ বি, বাং

সম্পাদকীয়

বর্ণসঙ্কর রাজনীতি

ভারতবর্ষে বিরোধী দলগুলির আলাপ-আলোচনা ও কার্যকলাপ অন্য যাই হোক, সুস্থ মস্তিষ্কের পরিচায়ক নয়। এরা কি চায় সেটা যেন এরা নিজেরাই জানে না। এরা একটি দেউলিয়া-রাজনীতির আবর্তে পড়ে হাবুডুবু খাচ্ছে। কোন স্থির লক্ষ্য নেই, নেই কোন মতবাদ-প্রসূত দৃষ্টিভঙ্গী, নেই কোন রাজনৈতিক বিজ্ঞতা। ইতিবাচক কোন উদ্দেশ্য নিয়ে এরা দলীয় নীতি ও কর্মপন্থা গ্রহণ করতে পারছে না। সুযোগ সুবিধা পেয়ে জন সেবার ক্ষেত্রে এদের অধিকাংশ দলই শোচনীয়ভাবে ব্যর্থ হয়েছে। যার ফলে এরা জনগণ কর্তৃক প্রত্যাখাত হয়েছে। ছলে বলে কৌশলে যারা এখনও দুই তিনটি রাজ্যে ক্ষমতাসীন হয়ে আছে। সেখানেও জনসেবা ও জনকল্যাণের কোন স্বাক্ষর রাখতে পারছে না। সেজন্য তাদের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে তারা ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছে। নিজেদের দোষত্রুটি সংশোধন করে যোগ্যতার কোন পরিচয় রাখতে না পারাই হল এই পরাজিতের মনোভাবের উৎস। তাই প্রকৃত ঘটনা থেকে জনগণের দৃষ্টি অন্যদিকে চালিত করার উদ্দেশ্যে স্বকল্পিত শ্লোগানের সাহায্যে বৈতরণী পার হবার হাস্যাস্পদ প্রচেষ্টার মত। দুর্যোগের দিনে সাপ-ব্যাঙও একত্রে বাস করে বলে শোনা যায়। এদের অবস্থাও একই প্রকার বলা চলে। স্বৈরতন্ত্র নামক ধুয়াটি তুলে আবার সকলে মিলে বাজার গরম করে রাজীমাৎ করবার অত্যন্ত ঘৃণ্য অপকৌশল গ্রহণ করতে উদ্যোগী হয়েছে। রাজনৈতিক মতাদর্শে যাদের আদৌ কোন মিল নেই, তারা আবার মিলিত হতে চাইছে কোন বুদ্ধিতে? ইন্দিরা বিরোধী আওয়াজ তুললেই দেশের মানুষকে ধোকা দিয়ে আবার ক্ষমতা লাভ করা যাবে বলে কি সত্যই এরা বিশ্বাস করেন? একটা খুব কৌতুকজনক ঘটনা ঘটে যাচ্ছে অতি সাম্প্রতিককালে। জনতাদল, কংগ্রেস (আ) লোকদল, ভারতীয় জনতাদল এবং ব্যাঙের ছাতার মত গজিয়ে আরো কিছু দল কি কমিউনিষ্ট দলগুলির সঙ্গে একমত হয়ে একসঙ্গে চলতে চাইছেন? কমিউনিজমের সঙ্গে এদের মতবাদের পার্থক্য কি মুছে গেছে? অন্য পক্ষে কমিউনিষ্ট মতবাদী দলগুলিকে প্রশ্ন করা যায়, তারাও কি মনে করেন, এই সব দলগুলির সঙ্গে তাদের মতাদর্শের ও পথের যে পর্বত-প্রমাণ পার্থক্য ছিল, ক্ষমতাসীন থাকার লালসায় তাও নস্যাৎ হয়ে গিয়েছে? উত্তর মেরুতে অবস্থিত দলগুলি আজ রাজনীতির কোন সূত্র অনুসারে দক্ষিণ মেরুতে অবস্থিত দলগুলির সঙ্গে রাজনীতি ক্ষেত্রে একসঙ্গে চলতে রাজী হচ্ছেন? দেশের মানুষকে কি এরা এতই নির্বোধ মনে করেন যে বর্ণসঙ্কর রাজনীতি তারা গ্রহণ করবেন ও এদের সমর্থন জানাবেন? এই কৌশলকে যদি কেউ নিছক ধাপ্পা বলে মনে করেন, তবে কি ভুল হবে?

কিন্তু এদের আসল মতলবটা বুঝতে খুব কষ্ট হয় না। "যেন তেন প্রকারেণ" ক্ষমতা দখল করা চাই এবং সেজন্য মিথ্যা প্রচার, ধোকাবাজী, জনগণের মনে অহেতুক ও অসমর্থনযোগ্য ভীতি-সঞ্চার করার মত যে কোন প্রকার অপকৌশল অবলম্বন করতে এরা মত্ত এবং সেজন্য কোন বিবেকের [illegible]

দলগুলির রাজনীতি। চিন্তাশীল দেশপ্রেমিক মানুষেরা এই দুর্ভাবনায় উদ্বিগ্ন যে কোন কৌশলে যদি এই পাঁচ মিশালী দলগুলি কেন্দ্রে বা অধিকাংশ রাজ্যে ক্ষমতা দখল করতে পারে, তবে দেশের ভবিষ্যৎ কি হবে?

বিরুদ্ধ মতাবলম্বী দলগুলি যে সুবিধাবাদী নীতি অবলম্বন করে, দেশের মধ্যে জলঘোলা করে সংসদিকার করতে ন্যায়-নীতিবোধ, মতাদর্শ, দেশপ্রেমের বিসর্জনের আয়োজনে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে, তার বিরুদ্ধে জনমত গঠন করার দায়িত্ব নিতে হবে দেশের মানুষেরই। তাদের এই কাজে সহায়তা, এমন কি নেতৃত্ব দিতে পারেন, মাননীয় মূল্যবোধ, আদর্শনিষ্ঠা ও দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ ব্যক্তি, গোষ্ঠী এবং রাজনৈতিক দলগুলি। স্বৈরতন্ত্র, স্বৈরতন্ত্র বলে যারা আকাশ বাতাস মুখরিত করছে, গণতন্ত্রের জন্য যারা কুম্ভীরাশ্রু বিসর্জন করছে, দেশের একটি স্থিতিশীল রাষ্ট্রকে যারা এলোমেলো করে দিতে চাচ্ছে, তাদের চরিত্র নিখুঁতভাবে মানুষের সামনে তুলে ধরতে হবে। দ্বিধাহীন ভাষায় বলতে হবে এই বিপজ্জনক বিশ্ব পরিস্থিতিতে যারা দেশের স্থিতিশীলতা নষ্ট করে, ক্ষেতে খামারে, শিল্পক্ষেত্রে, সমাজ জীবনের সর্বস্তরে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করতে দল বাঁধতে চাইছে, তারা দেশের শত্রুর মত কাজ করছে এবং এ কাজ করলে কারো কোন ক্ষমা থাকতে পারে না এবং থাকবেও না।

অ-কমুনিষ্ট দলগুলির একটা বিষয় ভেবে দেখা উচিৎ বলে আমরা মনে করি। গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে কমিউনিষ্ট দলগুলি যে জিগীর তুলেছে, তার মূল্যটা কতটা। কোন কমিউনিষ্ট দেশে কি গণতন্ত্র আছে?

কমিউনিজম ও গণতন্ত্র পরস্পর বিরোধী। সুযোগ পেলেই কমিউনিষ্টরা গণতন্ত্র ধ্বংস করবে। কিসের মোহে তবে অ-কমিউনিষ্ট দলগুলি, যারা গণতন্ত্রে বিশ্বাস করে বলে থাকে, এদের সঙ্গে জোট বাঁধছে? এটা সুবিধাবোদের মিলন ব্যতীত অন্য কিছু নয়।

ভারতবর্ষে তথা বিশ্বে, দুটি মতবাদের মধ্যে লড়াই চলছে এবং চলবে। একদিকে একনায়কতন্ত্র, অন্যদিকে জাতীয়তাবোধ ও গণতন্ত্র অন্য দলগুলিকে বেছে নিতে হবে একটি পথ। ক্ষমতা দখলের জন্যই যদি এরা এই গাঁট ছড়া বাঁধেন, তবে তারাও গণতন্ত্র হত্যার দায়ভাগী হবে। সেক্ষেত্রে ভবিষ্যৎ বংশধরগণ এদের সম্বন্ধে কি মূল্যায়ণ করবে, সেটা এদের বিচার্য্য বিষয় হওয়া উচিৎ। ক্ষমতা লাভের মত একটি তাৎক্ষণিক লোভে, এদেশ থেকে গণতান্ত্রিক কাঠামোকে ধ্বংস করার পথ প্রশস্ত করলে, কারো পক্ষে ভাল হবে না।

দেশবাসীকে এই ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি সম্বন্ধে অবহিত থাকতে হবে। ক্ষমতালোভী, রাজনীতিবিদদের সর্বতোভাবে পরিত্যাগ করতে হবে। হৃদয়ঙ্গম করতে হবে, এদের মিলন স্বার্থ হতে বাধ্য শেষ পর্যন্ত। এরা দেশের স্থিতিশীলতা নষ্ট করে, দেশের চরম সর্বনাশই করতে পারবে মাত্র। কাজেই এই ধোকাবাজদের সম্বন্ধে হুঁসিয়ার থাকতে হবে সব সময়েই। অন্যথায় দেশের চরম অকল্যাণ হবে। মনে রাখতে হবে নিজ নিজ দলের মধ্যেই যখন বিভেদ আছে, তখন সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে এদের মিলন অসম্ভব।

পশ্চিমবঙ্গবাসীর দাবী

কালীপদ সরকার

ভারতবর্ষে ইংরাজ অধিকার প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন—

'সেদিন এ বঙ্গপ্রান্তে পণ্য বিপনীর একধারে
নিঃশব্দ চরণ
আনিল বণিক লক্ষ্মী সুদূর পথের অন্ধকারে
রাজ সিংহাসন
বঙ্গ তারে আপনার গঙ্গোদকে অভিসিক্ত করি
নিল চুপে চুপে—
বণিকের মানদণ্ড দেখা দিল পোহালে শর্বরী
রাজদণ্ড রূপে।'

প্রায় আড়াই শত বছরের আগের কথা। দিল্লির বাদশাহ তখন শাহ আলম, শক্তিতে না হলেও, সর্বজন স্বীকৃতিতে তিনি ভারতসম্রাট। তাঁর সুবাদার নবাব সিরাজদৌলা বিদেশী ইংরাজ বণিকদের ঔদ্ধত্যের জবাব দিতে গিয়ে যখন পলাশীর যুদ্ধে পরাজিত ও বন্দী অবস্থায় নিহত হলেন, বাদশাহের আচরণে কোন উৎকণ্ঠা দেখা দিল না। তারপর বাংলার নবাব মীর কাসেম ইংরাজ বণিকদের ক্রম-বর্ধমান শক্তিবৃদ্ধি ও অবৈধ কার্যকলাপ দমন করতে উদ্যোগী হন। কাটোয়া, গিরিয়া ও উদয়নালার যুদ্ধে পরাজিত হয়ে তিনি সসৈন্যে সরে যান বিহার এবং অযোধ্যার নবাবের সহিত মিলিত হয়ে ইংরাজদের সহিত আর একবার শক্তি পরীক্ষায় অবতীর্ণ হন। বাদশাহ শাহ আলম সসৈন্যে এগিয়ে আসেন তাঁর দুই সুবাদারের সাহায্যে।

১৭৬৪ সালে বক্সারে নবাব মীর কাসেম ও অযোধ্যার নবাবের মিলিত বাহিনী তুমুল যুদ্ধের পর ইংরাজদের নিকট পরাজিত হয়। বাদশাহ প্রচুর সৈন্য নিয়ে যুদ্ধ ক্ষেত্রের নিকটে থেকেও, প্রদেশ শাসকদের সাহায্যে যুদ্ধে অংশ নিলেন না। বরং পরের দিন তিনি ইংরাজ শিবিরে গিয়ে সেনাপতি হেকটর মুনরোকে অভিনন্দন জানালেন। বক্সার যুদ্ধ সম্বন্ধে ঐতিহাসিক ভিনসেন্ট স্মিথ বলেছেন— Buxur Completed, the work of Plassey and finished once for all the military subjugation of Bengal and Bihar'

এবং যা সমগ্র ভারত অধিকারের ভিত গড়েছিল। বাদশাহের অদূরদর্শিতা ছিল দেশদ্রোহিতার নামান্তর। দিল্লি দূর অস্ত, বাংলার জন্য দিল্লী নড়ল না। বঙ্গের পক্ষে তখন বিদেশী অনুপ্রবেশ-কারীদের 'গঙ্গোদকে' অভিষেক করা ছাড়া উপায়ান্তর ছিল না। বাংলার অবস্থা বর্তমানে অনেকটা সেদিনকার মত। অনুপ্রবেশকারী কিন্তু এবার বিদেশী নয়, ঘরের মানুষ, আপন জন। মার্কসবাদ ভারতীয় ঐতিহ্য, ধর্মসংস্কৃতি এবং জাতীয়তাবাদ পরিপন্থী জড়দর্শন এবং শ্রেণীসংগ্রামের উস্কানি দাতা মার্কসবাদের উৎস ইহুদী মানসিকতা ও উন-বিংশ শতকের ইউরোপীয় অর্থ নৈতিক পরিবেশ।

সে কারণে মার্কসতত্ত্বে বিশ্বাসী কমিউনিষ্টগণ এদেশে বংশে ভারতীয় হলেও ধ্যান-ধারণায়

বিজাতীয় এবং সেই অর্থে অনুপ্রবেশকারী।

বামফ্রন্ট নামের আড়ালে পুরোপুরি দল-এক-নায়কত্ব শাসিত মার্কসবাদী সরকার এখন পশ্চিমবঙ্গে প্রতিষ্ঠিত। বামফ্রন্ট নামটি একটি ধূম্রবর্ষনিকা, স্বীকৃত কমিউনিষ্ট রণ কৌশল। (তৃতীয় কমিউনিস্ট ইন্টারনেশানেল)। ফ্রন্টের বেড়াজালে একবার যারা ঢুকেছেন তারা আর বেরিয়ে আসতে পারেন না। যথাকালে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়া তাদের স্থির পরিণতি।

১৯৭৭ সালে জনতা শাসনকালে কংগ্রেস ও জনতাদলের মধ্যে ভোট ভাগাভাগির ফলে মার্কসবাদীরা প্রদত্ত ভোটের এক তৃতীয়াংশ পেয়ে শাসন-ক্ষমতা দখল করেন। ক্ষমতায় বসেই তাঁরা ভবিষ্যতের সংগ্রামের জন্য রসদ সংগ্রহে মন দেন এবং রাজকোষ শূন্য করে পুলিস, শিক্ষক, সরকারী থেকে শুরু করে গ্রাম পঞ্চায়েত পর্যন্ত প্রশাসনের ছোটবড় সকল ইউনিটগুলির বেতন, ভাতা ও অনুদান দফায় দফায় বাড়িয়ে, তাদের দলে টানার কাজে সর্বশক্তি নিয়োগ করেন। জন সাধারণের কথা ভেবে দীর্ঘ মেয়াদী শিল্প ও কৃষির উন্নয়নমূলক প্রকল্প হাতে নেওয়া তাই মার্কসবাদী সরকারের চিন্তায় স্থান পায় নি। তাঁদের পক্ষে একাজকে নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ ছাড়া আর কিছু বলা চলে না।

নিজেরা যখন সরকারী ক্ষমতার আনুকূল্যে দল মজবুত করতে ব্যস্ত, তখন প্রশাসনিক ব্যর্থতা ঢাকতে রাজ্যের সীমিত সম্পদ, কেন্দ্রের বিমাতৃ আচরণ, চারিদিকে চক্রান্ত প্রভৃতির অজুহাত তুলে জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করতে প্রচারযন্ত্রকে সতেজ করেন, কিন্তু ভাঁওতা বাজি বেশিদিন টিঁকেনি। অন্যদিকে মোরারজীর জনতা সরকার, পশ্চিমবঙ্গে কমিউনিস্ট শক্তির প্রসারকে, সম্রাট শাহ আলমের মতই লঘুচিত্তে দেখেছিলেন এবং শাহ আলম যেমন মারাঠাদের ভয়ে সদা বিব্রত ছিলেন, জনতা সরকারও শ্রীমতী ইন্দিরাগান্ধীর পুনঃ অভ্যুদয়ের আশঙ্কায় তেমনি নিরন্তর দুশ্চিন্তায় ভুগছিলেন। আবার বাদশাহ যেমন মনে করেছিলেন একদিন তিনি মারাঠাদের দমনে ইংরাজদের সাহায্য পাবেন মোরারজীও তেমনি আশা রেখেছিলেন, জনতা সরকারের বিপদের সময় মার্কসবাদীরা তাঁকে সমর্থন দেবে। উভয়ই আত্মতুষ্টি ও অদূরদর্শিতার চূড়ান্ত উদাহরণ। উভয়ই শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ।

সংবিধান নির্বাচিত সরকারের স্থায়িত্ব ও অধিকারের যেমন গ্যারান্টি দেয়, তাকে নিয়ন্ত্রণ ও প্রয়োজন বোধে উৎখাতের ক্ষমতাও রাখে। গত চার বছরের শাসন কালে রাজ্যের বামফ্রন্ট সরকারের বিরুদ্ধে যে সকল সংবিধানবিরোধী, অ-গণতান্ত্রিক এবং দলসর্বস্ব কাজের সুনির্দিষ্ট অভিযোগ এবং সামগ্রিক ব্যর্থতার দৃষ্টান্ত দিল্লির দরবারে পৌঁছেছে, তার যে কোন একটির জন্যই রাজ্য সরকারের পতন বিধিসঙ্গত ছিল। কিন্তু তা হয় নি। দিল্লি এখন মোরারজীর পতনোন্মুখ মুঘল তক্তে নয়, তাই একটা রাজ্য উৎসন্ন গেল, তাতে বিশালদেশ ভারতের কি আসে যায়, এমন অবিমৃষ্যকারী চিন্তায় ইন্দিরা সরকার আত্মতুষ্ট, একথা ভাবা যায় না। বরং তার উলটোটিই ভাবা স্বাভাবিক।

বামফ্রন্ট সরকারের দলবাজি ও ব্যর্থতার তালিকা অনেক, সে সব উল্লেখ করা ক্ষুদ্র প্রবন্ধে সম্ভব নয়। যে রাজ্যে আদর্শনিষ্ঠ কলেজ অধ্যক্ষ নিজের অফিস ঘরে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ঘেরাও হয়ে মানসিক অবসাদের চাপে মৃত্যু বরণ করেন; অথবা নিগৃহীতা নারী আদালতে বিচারকের সামনে জঘন্য অপরাধীর নাম বলতে

ভয় পান এবং তাঁকে শাসাতে গুণ্ডারা দলবদ্ধভাবে আদালতে এসে মস্তানি করে, তখন আইন শৃঙ্খলা কেমন বুঝতে কারো অসুবিধা হবার কথা নয়।

পাইকারী হারে ভূমি জবর দখল, লুট, ডাকাতি দলীয় কাজির বিচার এবং হত্যা তো নিত্যকার ঘটনা। পুলিস নিষ্ক্রিয়, নীরব দর্শক। আবার কোথাও পুলিশ নিজেই অবৈধ হামলার নায়ক, যেমন ইসলামপুরের যুগাবাড়ির ঘটনা। অতি ভোবণের ফল যা হয়।

আইন শৃঙ্খলার কথা ছাড় দিয়ে অন্য ব্যর্থতার বিষয়ে কিছু বলতে গেলে প্রথমেই বলতে হয় বিদ্যুৎ সঙ্কটের কথা। এ সঙ্কটের জন্য যন্ত্রের চেয়ে যন্ত্রী বেশি দায়ি, যার মূলে সেই দলবাজি। মনে রাখবেন, বিদ্যুৎ বিভ্রাটের জন্য কেবল সাধারণ মানুষই দুঃখ ভোগ করছেন তাই নয়, অসহায়ভাবে মার খাচ্ছে রাজ্যের শিল্প ও কৃষি। যার ফলে নতুন বিনিয়োগ ঘটছে না, কর্মসংস্থান বাড়ছে না।

বিদ্যুতের পরেই আসে শ্রমিক অশান্তির কথা। সাম্প্রতিক এক সমীক্ষায় প্রকাশ যে, ভারতে মোট শ্রমদিবস অপচয়ে পশ্চিমবাংলার সংখ্যা সর্বাধিক। সমীক্ষায় বলা হয়েছে, 'Bad manegament, political interferance, power shortage unfavourable industrial relations and the apathetic attitude of the state government are the main reasons of the decline of the industry in the region' বস্তুতঃ আইনের শাসন যখন বিপর্যস্ত হয়, তখন সর্বনাশা তার প্রতিক্রিয়া সমাজের সকল স্তরে ছড়িয়ে পড়ে। এ রাজ্যে হয়েছেও তাই। একে উৎসন্ন যাওয়া ছাড়া কি বলা যায়।

জিজ্ঞাসা করতে পারেন তাই যদি হবে তাহলে জনসাধারণ প্রতিবাদে তেমন সোচ্চার নয় কেন। তার উত্তর হল, ভয়। ভয় জীবনহানির, রুজি-রোজগার মারা যাবার, পরিবার পরিজনের বিপন্নতার। খোঁজ নিয়ে দেখুন কথাটা সত্য কি না। আপনি বলতে পারেন যে, অসংগঠিত সাধারণ মানুষ না হয় ভয়ে কথা বলছে না, রাজ্যে তো বহু সরকার বিরোধী রাজনৈতিক দল আছে তারা কেন বিক্ষোভ প্রতিবাদ জানাচ্ছে না, যেমনটা মার্কসবাদীরা কংগ্রেসী আমলে করতেন।

এ প্রশ্নের জবাব পাবেন, কংগ্রেস (ই) পরিচালিত ৩০শে মাঘের নিরস্ত্র গণ সমাবেশের উপর পুলিশের গুলী চালনায়; যে গুলী চালনার আদেশ দেওয়া হয়েছিল হত্যার উদ্দেশ্যে। অথবা জবাব পেতে পারেন আপনি কংগ্রেস (ই) র ডাকে ৩রা এপ্রিলের স্বতঃস্ফূর্ত বাংলা বনধ ভাঙার সরকারী আয়োজনের মাঝে। পুলিশ দলের সঙ্গে কাডার বাহিনী নামিয়ে বামফ্রন্ট সরকার সেদিন রাজ্যপ্রশাসনের ঐতিহ্য ও সম্মান নষ্ট করতেও দ্বিধা করেন নি। একে যদি সন্ত্রাসের মার্কসবাদী নীতি বলে মনে না করেন তাহলে আপনাকে তা করতে হবে পূর্ণপ্রাসের পর, নিরুপায়ের মত।

এই প্রতিকারহীন যাঁতা কলে পড়ে রাজ্যের মানুষ যদি রবীন্দ্রনাথ কথিত 'গঙ্গোদকের' বদলে যন্ত্রণা ভাবনার চাপে মার্কসবাদীদের নির্বাচনী রথের দড়ি টানে, তাহলে তাতে বিস্মিত হবার কি আছে। কনিউনিষ্ট অধিকার এইভাবেই সবদেশে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তারপর, রাজ্যসরকার নির্বাচন ব্যবস্থাকে এমন একটি নিশ্ছিদ্র 'রিগিং' ব্যূহ করেছেন, যা ভেদ করা প্রায় অসাধ্য। সুতরাং এই সরকারের নিরঙ্কুশ

(এরপর ৯ পৃঃ দেখুন)

সনাতন মূল্যবোধ বিলুপ্তির পথে

বংশীধর বন্দ্যোপাধ্যায়

ভারতভূমিতে যুগ পরম্পরা যে ধ্যান ধারণা, মূল্যবোধ, শুভবুদ্ধি মহান আদর্শবাদ ও পারস্পরিক বিশ্বাস মানব সভ্যতা বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে ধীরে ধীরে গড়ে উঠেছিল এবং যা গত শতাব্দীর শেষভাগে এমন কি বিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগেও শ্রদ্ধার সঙ্গে স্বীকৃত ছিল গত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তীকাল ক্রমশ অবজ্ঞাত ও পরিত্যক্ত হতে থাকে আধুনিক তার ভ্রান্ত মোহের সংস্পর্শে এসে। পুরানো দিনের সাধারণ রীতি নীতি, সংসার মূল্যবোধ ও বিশ্বাস আমরা হারাতে থাকি আধুনিক হবার ভ্রান্ত ঝোঁকে পড়ে।

ফলে সাধারণ সৌজন্যবোধ, সহনশীলতা, পারস্পরিক সমঝবোধ, বিনয়াবনতা, ভদ্রতা, প্রভৃতি আস্তে আস্তে লোপ পেতে থাকে আমাদের মধ্যে। পুরাতন মূল্যবোধে বিশ্বাস হারাতে বসেছি একদিকে, আর অপরদিকে নূতন মূল্যবোধকেও ঠিক বিশ্বাস করে আপন করে নিতে পারছি না নানা কারণে। সেকালের সঙ্গে একালের বিরাট ব্যবধান আছে, তদ্রূপ অন্যান্য প্রায় সকল বিষয়েই উভয়কালের পার্থক্য উল্লেখযোগ্য বিদ্যমান বর্তমানে। সেকালের প্রচারিত ও স্বীকৃত আদর্শের প্রচার ও প্রসার এখন নিতান্তই সীমাবদ্ধ এবং বহুক্ষেত্রে প্রায় পরিত্যক্ত দেখা যায় স্বার্থান্ধ চিন্তার ফলে। একালের চরম আত্মকেন্দ্রিক মানুষ সনাতন মূল্যবোধ আদর্শবাদকে বর্জন কোরতে বদ্ধ পরিকর আপন আপন ক্ষুদ্র স্বার্থকে চরিতার্থ করার হীন অভিপ্রায়ে এবং এটাই নাকি তাদের মতে আধুনিকতা তাও সময়োপযোগী।

আজ যে আদর্শকে আঁকড়ে জীবন যুদ্ধে আমরা এগিয়ে যেতে চাই, তা হচ্ছে সকল বিষয়ে ব্যক্তিগত কার্যোদ্ধারের জন্য। যেমন করেই হোক নিজেকে জাহীর করা চাই। তড়িৎ করে, ঘুষ দেখিয়ে, চোখ রাঙ্গিয়ে, লাঠি ঘুরিয়ে, অন্ততঃ পক্ষে রূঢ় ও কর্কশ আচরণ করে আমরা আমাদের ব্যক্তি স্বার্থ সংরক্ষণে সদা তৎপর। অপরের জন্য জীবন দান বা দেশের স্বাধীনতার জন্য আমরণ অনশন আজ গল্প কথা, অবশ্য ডি, ভ্যালেরার দেশে আইরিশ বীরেরা আজো দেশের জন্য আত্মাহুতি দিচ্ছে, এক জন, দুজন নয়, কয়েকজন।

তাঁরা নমস্য সমগ্র মানব জাতির চিত্তে। তাঁদের দেশহীতে এই আত্মদান সার্থক হবেই একদিন না একদিন। তাঁদের এই শুভ সংকল্প ও কর্মধারা মানব ইতিহাসে অক্ষয় ও অব্যয় হয়ে থাকবেই। কিন্তু বর্তমান ভারত দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরে ইয়াঙ্কি সভ্যতার দেহ এলিয়ে দিয়ে যে ভুল পথে অগ্রসরমান তা কি কোনদিন আমাদের গৌরব বৃদ্ধি করবে? মনে হয় গৌরবের পরিবর্তে তা অনুশোচনায় ক্ষত বিক্ষত হয়ে ক্লান্তি বোধ করবে।

অন্যান্যের কথা বাদ দিয়ে এদেশের বর্তমান নেতাদের কথাই ধরা যাক। তাঁরা দেশকল্যাণের বদলে ভ্রান্তি-ক্লান্তিহীন ক্ষমতার লড়াইয়ে সদা প্রমত্ত, পরস্পর কুৎসা, কোন্দল দোষারোপ ও ধৈর্যহীন

কর্কশ চিৎকারে তাঁরা ভারতের আকাশ বাতাসকে কলুষিত করতে সতত ব্যস্ত। যেন এই হীনতার ও দীনতার প্রকাশই তাঁদের পরমপ্রিয় কর্মোদ্যম। এমন কি দেশের শত্রুদের স্বপক্ষে ওকালতি করার মতন জঘন্যভাবে নিন্দনীয় ও গর্হিত কাজে লিপ্ত হতে তাঁদের মধ্যে কাহাকেও কাহাকেও দেখা যায়। এ দেশের বর্তমান বিরোধীনেতারা প্রধানমন্ত্রীর বিরোধীতার অছিলায় বিদেশীদের কাছে স্বদেশের বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ দেশরক্ষার ব্যাপৃত সৈন্য সমাবেশের বিশিষ্ট স্থান ও প্রকৃত সংখ্যার উল্লেখ করতে একটুও কুণ্ঠীত হন না বা লজ্জাবোধ করেন না।

উক্ত কাজ যে এদেশের দেশরক্ষা ব্যবস্থার পক্ষে মারাত্মক ক্ষতিকারক ও চরম বিপদজনক তাও কি তাঁরা জানেন না, না জেনে শুনেই এরূপভাবে পঞ্চম বাহিনী সুলভ কাজে তাঁরা মেতে থাকেন, বিদেশের কাছে বাহবা বা পুরস্কার পাবার লোলুপ আশায়? কোনটা সঠিক পুরাতন মূল্যবোধ আদর্শবাদ আজ অবহেলিত হচ্ছে কেন? সুযোগ সন্ধানী ও সুবিধাবাদী রাজনীতিকদের জন্যই মূলতঃ।

ডঃ সুব্রহ্মণ্যম স্বামী ও প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী মোরারজী ভাই শ্রীমতী গান্ধীকে জনসমক্ষে হেয় প্রতিপন্ন করার দুরভিসন্ধি নিয়ে যে সব অপপ্রচার করছেন বলে সংবাদে প্রকাশ তা মার্কিন দেশের ও পাকিস্তানের মঙ্গল করলেও করতে পারে, কিন্তু ভারতের সর্বনাশ যে সংঘটিত হবে তাতে অণুর ভবিষ্যতে—একথা নিশ্চিত সত্য।

গণতন্ত্রে বিরোধীতা স্বীকৃত হলেও যে বিরোধীতায় দেশের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হবার সমূহ আশংকা, সেরূপ বিরোধীতা পরিত্যাজ্য। দেশ রক্ষার পক্ষে ক্ষতিকর কোন উক্তি বা কার্যই পঞ্চমবাহিনী সুলভ হীনতার প্রকাশ, যাকে সমূলে উৎপাটন করা শুরুতেই প্রয়োজন, অন্যথায় দেশের বিপদ অবশ্যম্ভাবী। ডঃ সুব্রহ্মণ্যম স্বামী মার্কিন দেশের যত ঘনিষ্ট বন্ধুই হোন না কেন, ভারতের নিরাপত্তা যাতে বিঘ্নিত হয় এমন কথা তাঁর বলা অনুচিত, যেহেতু তিনি প্রথমে ভারতীয় পরে মার্কিন বন্ধু। সনাতন মূল্যবোধ ও আদর্শবাদ সেই শিক্ষাই দেয় প্রতিটি ভারতীয়কে।

জাতীয় চেতনায় উদ্বুদ্ধ কোন ভারতীয়ই বর্তমান যুদ্ধাতঙ্ক বিপর্য্যস্ত বিশ্বে স্বদেশের নিরাপত্তার কথা সম্যকভাবে চিন্তা করে প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধী যে অযথা এদেশে যুদ্ধাতঙ্ক ছড়াচ্ছেন—একথা কিছুতেই বলবে না; কারণ সারা বিশ্বে যে ঠাণ্ডা লড়াইয়ের মহড়া চলছে, তা অস্বীকার করা বাতুলতা ছাড়া অন্য কিছু নয়।

প্রধানমন্ত্রী তাঁর স্বদেশবাসীদের সদা সজাগ ও সতর্ক থাকার জন্য বিবৃতি দিয়েছেন বলে যা সংবাদে প্রকাশ তা যুদ্ধাতঙ্ক ছড়ান মোটেই নয়, বরং বাস্তব অবস্থার সঙ্গে দেশবাসীদের সম্যক পরিচয় করে প্রস্তুত থাকার জন্য হুঁসিয়ারী যা প্রধানমন্ত্রীর অবশ্য কর্তব্য। স্বদেশবাসীকে সর্বদা বিশ্বের প্রকৃত অবস্থা জানান প্রধানমন্ত্রীর প্রধান কাজ। যিনি তা না করেন তিনি নিজেও ডোবেন সঙ্গে সঙ্গে দেশবাসীও তাঁর অনুগমন করে। এটা কি কারো কাম্য হতে পারে না কি? যদি কারো তা কাম্য হয় তবে তিনি দেশের শত্রু নিশ্চয়।

বর্তমান সমাজ দুটি শক্তিকে সর্বশ্রেষ্ঠ বলে স্বীকার করে। একটি হচ্ছে রাজনৈতিক ক্ষমতা এবং অন্যটি হচ্ছে আর্থিক স্বাচ্ছলতা ও প্রাচুর্য্য। যে ব্যক্তির উভয় ক্ষমতাই করায়ত্ত; সেই বর্তমানে গণ্যমান্য ব্যক্তি। তাঁর কথায় বহু লোকে ওঠে বসে। ফলে উভয় বিধশক্তি সঞ্চয় করার জন্য প্রত্যেকে সদা

সচেষ্ট। কেউ কেউ আবার ভাবে যে আর্থিক প্রাচুর্যই ক্ষমতার প্রকৃত উৎস। অবশ্য মাও পন্থীরা বন্দুকের নলই ক্ষমতার উৎস বলে প্রচার ও বিশ্বাস করে। অর্থ-ই রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের প্রকৃত সহায় সম্বল বলে যারা বিশ্বাস করে তারাই ভারতে সংখ্যা গুরু।

আবার অনেকে মনে করে ও দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে যে, কোন রকমে একবার রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল করতে পারলেই আর্থিক ক্ষমতাও সহজ হয়ে আসবে। এই চিন্তার বশবর্তী হয়ে বহু লোকই ইদানিংকালে রাজনীতির কুটিল চক্রে হঠাৎ পা দিয়েছে অথবা পা দেবার তালে ঘুরপাক খাচ্ছে। এই সব হালী রাজনীতিকদের কাছে কি শিক্ষা পাই ও সচরাচর পেয়ে থাকি? কোন বিশেষ আদর্শে তাঁরা আমাদের উদ্বুদ্ধ করেন তাঁরা সেখান যে বর্তমান যুগে যদি কেউ কিছু করে খেতে চায়, তবে তাকে নিজের পায়ে দাঁড়াতে হবে জীবন যুদ্ধে জয়ী হবার কঠিন সংকল্প নিয়ে এবং তার ফলে অপরের ক্ষতি করেও নিজের আখের গোছাবার জন্য সদা সচেষ্ট থাকতে হবে সনাতন ন্যায় নীতি ও মূল্যবোধকে সম্পূর্ণ বিসর্জন দিয়ে। স্বার্থ চিন্তাই আজিকার যুগের এ প্রধান চিন্তা এবং সেকারণ যাঁরা পুরাতন আদর্শবাদে ও মূল্যবোধে এখনো বিশ্বাসী তাঁরা ধীরে ধীরে রাজনীতির আঙিনা থেকে বিদায় নিচ্ছেন সযত্নে। আদর্শবাদের এত বড় অবক্ষয় দেখে তাঁরা মর্মাহত ও বিক্ষুব্ধ, কিন্তু তাঁরা কারো পথ আটকে বসে নেই। তাঁদের শিক্ষা-দীক্ষা, দেশপ্রেম, ত্যাগ তিতিক্ষা বর্তমান যুগে অচল। ভোগবাদের আসরে তাঁরা অনভিপ্রেত ও অপাংক্তেয়। তাঁরা নিজেরাও বর্তমান বিষাক্ত রাজনীতির বাইরে থাকতে চান আদর্শগত বিরোধের কারণে।

আত্মসর্বস্ব চরম স্বার্থপর অতিলোভী মানুষেরাই ভারতময় দাপাদাপি শুরু করেছে বর্তমানে। তারা পুরাতন মূল্যবোধ অস্বীকার করে আপন আপন আকাঙ্খা ও উদ্দেশ্য সিদ্ধির আশায় যা খুশী তাই করতে চায়, নীতি বিগর্হিত কাজও করতে তারা ইতঃস্তত করে না। ব্যক্তি স্বার্থ ই সেখানে বড় কথা, সমাজ বা রাষ্ট্র বা দেশস্বার্থ তাদের কাছে সম্পূর্ণ মূল্যহীন।

ফলে বৈষম্য, অরাজকতা, নীতিহীন ও মানুষে মানুষে বিবাদ-বিসংবাদ চারিদিকে বিস্তৃতি লাভ করছে প্রতিনিয়ত, যা রাষ্ট্রশক্তিকে ক্রমশ দুর্বল করছে একদিকে ও ভারতীয় সংস্কৃতিকে বিনাশের উদ্যত অপরদিকে সদ্য স্বাধীনতালব্ধ এই মহান দেশ ভারত যে এভাবে পুরাতন আদর্শ, মূল্যবোধ ও ত্যাগ-ব্রত পরিত্যাগ করে স্বার্থ চিন্তায় বিভোর হয়ে অন্যায় ও অযৌক্তিক লোভের দাসত্বে আত্মদান করে নিজের অতীত ঐতিহ্যকে পর্যন্ত বিস্মৃত হবে তা ইতিপূর্বে কেহ কল্পনাও করতে পারে নি। এই হীন মনোবৃত্তি কি ভারতবাসীর পক্ষে শোভন ও সঙ্গত? আধুনিক যুগের মানুষ মনে করে যে পুরাতন মূল্যবোধও পুরাতন হয়ে গেছে; অতএব তার পরিবর্তন অপরিহার্য। কিন্তু বিগত যুগের অনেক মহামূল্য ধারণা, বিশ্বাস ও মূল্যবোধ এখনো আমরা আঁকড়ে আছি, কারণ ঐ মহাসম্পদ স্বেচ্ছায় পরিত্যাগ করলে সমাজ বিষাক্ত আবহাওয়ায় ভরে যাবে, আর আমরা মানসিক জগতে দেউলিয়া হয়ে যাব। গত যুগের সামাজিকতার মহান আদর্শগুলি, সৌজন্য প্রকাশের পুরান বিশিষ্ট অভ্যাসগুলি ও ধরন-ধারণ এবং সহনশীলতা, ভব্যতা ও ভদ্রতা রক্ষার সাধারণ প্রথা আমাদের মধ্যে আছে। কিছু কিছু রয়ে গেছে বলেই সমাজ ও রাষ্ট্র এখনো সুস্থ ও সুন্দর আছে। তবে

যে অবস্থার মধ্যে দিয়ে আমরা তথাকথিত আধুনিকতার মোহে সমাজ ও রাষ্ট্রকে পরিচালিত করার পথে অগ্রসরমান তা খুব সম্ভব সনাতন মূল্যবোধে অটুট বিশ্বাস হারাতে ক্রমশই প্রলোভিত করবে।

রীতি-নীতি, চালচলন যা আমরা আগেকার দিনে শ্রদ্ধার সঙ্গে মেনে চলবার চেষ্টা করতুম তা প্রায়শই অগ্রাহ্য করার প্রবণতা দেখা যায়। চলনে বলনে সবক্ষেত্রেই মানুষ এখন শালিনতা হারিয়ে কর্কশ ও কঠোর হচ্ছে আত্মপ্রচারের ভ্রান্ত মানসিকতায় আকৃষ্ট হয়ে।

মানুষের মন কঠিন ও নিঃসাড় হতে বসেছে আধুনিকতার ছোঁয়াচ লেগে। পুরের মত মানুষ মানুষের দুঃখে এখন ব্যথিত হয় না। মানুষের প্রতি মানুষের সহজাত দরদ মমতা অন্তর্হিত প্রায়। মনের সরস জমি টুকু নিরস কঠিন পরাগে রূপান্তরিত আধুনিকতার কঠিন সংস্পর্শে এসে। পুরাতন মূল্যবোধ মানুষে মানুষে প্রেম-প্রীতির সরস সম্পর্ক ক্রমশই হারিয়ে যায় কেন?

ব্যক্তি স্বাতন্ত্রের যুগেই এই বিপদ দেখা দেয়, যা মানুষকে ধীরে ধীরে অমানুষ করে তোলে। প্রীতির মহান আদর্শ কলুষিত হয়, মানুষের সমাজে ধ্বংস নেমে আসে তখনই, যখনই সবাই আত্মকেন্দ্রিকতায় ভোগে। বর্তমান বিশ্বে এই অবস্থাই প্রকট, ফলে যা কিছু মহান, যা কিছু শুভ, সবই বিলুপ্তির পথে ধীরে ধীরে বিলীন হবে। ইহাই ভবিতব্য, এর হাত থেকে মানুষের মুক্তি নেই কোনদিন।

(৫ পৃঃ পর)

নির্বাচন হলে কোন অ-মার্কসবাদীদল যে যতই জনপ্রিয় হোক না কেন, জয়ী হতে পারবে না একথা সুনিশ্চিত। এই হল পশ্চিমবাংলার অ-কমিউনিষ্ট অধিবাসীদের অভিমত।

নির্ধারক মণ্ডলী যাতে ভিগিং মুক্ত ব্যবস্থায় অবাধে ভোট দিতে পারেন তেমন পরিবেশ সৃষ্টির নির্দেশ সংবিধানে সুস্পষ্টভাবে লিখিত আছে। সে বিধান অনুসরণের দায়িত্ব কেন্দ্রীয় সরকারের। কেন্দ্র তা না করলে মার্কসবাদীদের বাংলা অধিকার দিল্লি অধিকারের পথ প্রস্তুত করবে। যমুনার জলে দিল্লিতে তখন তাদের অভিষেক হবে।

পরলোকে প্রবীণ বিপ্লবী সন্তোষ কুমার দে

প্রখ্যাত বিপ্লবী সন্তোষকুমার দে বহুদিন রোগ ভোগের পর গত ১৫ই জুলাই বেলঘরিয়া যতীনদাস নগরের আবাসে ৮০ বৎসর বয়সে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁর আদিনিবাস ছিল ঢাকা জিলার বাখরিগ্রামে। বিপ্লবী জীবনে বরিশাল শঙ্করমঠ দলের অন্যতম নেতা ছিলেন, ১৯২৪ সনের নভেম্বর মাস হইতে ১৯২৮ সনের অক্টোবর মাস এবং পরে ১৯৩০ সালের আগষ্ট মাস হইতে ১৯৩৮ সালের জুলাই পর্যন্ত বিভিন্ন জেলে ও বন্দীনিবাসে আটক ছিলেন, স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রতিটি স্তরেই তার সংগ্রামী জীবনের সাক্ষর রেখে গেছেন। আদর্শনিষ্ঠা বন্ধু বৎসল স্বল্পভাষী এই মহান বিপ্লবীর স্মৃতির প্রতি আমরা শ্রদ্ধা জানাই এবং তার বিদেহী আত্মার শান্তি কামনা করি।

কাণ্ডারী হুসিয়ার! পরেশ্বক

দেশের সঙ্কটজনক পরিস্থিতে জনতাদলের দুই নেতা শ্রীমোরারজী দেশাই ও সুব্রাহ্মণীয়ম স্বামী এবং বি. জে পি দলের নেতা শ্রীবাজপেয়ী যে সব উক্তি করছেন, সেগুলি দেশের স্বার্থের পক্ষে উদ্বেগজনক। ভারতবর্ষ একটি গণতান্ত্রিক দেশ সন্দেহ নেই। গণতান্ত্রিক দেশে প্রত্যেক মানুষেরই কয়েক প্রকারের স্বাধীনতা স্বীকৃত। কিন্তু ব্যক্তিগত স্বাধীনতা দেশের স্বার্থের সঙ্গে সম্পর্কবিহীন হতে পারে না এবং দেশের স্বার্থের উপর প্রাধান্য পেতে পারে না। সেটা ঘটতে দিলেই দেশ বিপদের সম্মুখীন হয় এবং অগণিত মানুষের চরম সর্বনাশ হয়। দুর্ভাগ্যক্রমে এইসব হতাশাগ্রস্ত, নিঃশেষিত ক্ষমতালোভী রাজনীতিবিদ্-দের আচরণে সেই সত্যই প্রকট হয়ে উঠছে। স্বাধীনতা ও উচ্ছৃঙ্খলতার মধ্যে যে পার্থক্য বিদ্যমান থাকে, এই অর্বাচীনেরা বিচারমূঢ় ব্যক্তিরা সেটা বুঝবার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছেন। দেশের চিন্তাশীল মানুষেরা মনে করেন যে এই প্রকার উদ্ভট উচ্ছৃঙ্খলতাকে সংযত করা প্রয়োজন। কারণ, এদের কার্যকলাপ ও দেশের স্বার্থবিরোধী উক্তি কিছু সংখ্যক মানুষের উপর অশুভ প্রভাব ফেলতে পারে। শত্রুপক্ষও তাদের অসঙ্গত কাজের স্বপক্ষে এদের বক্তব্য উদ্ধৃত করার সুযোগ গ্রহণ করে। এটা শুধু তত্ত্ব কথা নয়। শ্রীমোরারজীর কয়েকটি উক্তিকে আমেরিকা ও পাকিস্তান তাদের অস্ত্র সরবরাহ ও রণসজ্জার সমর্থনে কাজে লাগিয়েছে।

দুই একটি উদাহরণ দিলে বক্তব্যটা কারো অস্পষ্ট হতে পারে।

প্রথমেই ধরা যাক, শ্রীমোরারজীর কথাবার্তা। বহুদিনের লালসাপ্রসূত ব্যক্তিগত উচ্চাকাঙ্খা যখন পূরণ হল, ভারতের প্রধান মন্ত্রীত্বের আসন দখল করে দিকবিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে বিশ্বের কয়েকটি মহিলা সম্বন্ধে এমন অশালীন মন্তব্য করলেন, যেটা ভারতবর্ষের নারীজাতির প্রতি সম্মান প্রদর্শনের প্রাচীন ঐতিহ্যকে ম্লান করে দিল। দেশব্যাপী ক্ষোভের অগ্নিগর্ভ প্রকাশ ঘটলে, ক্ষমা চাইতে তিনি বাধ্য হলেন। তারপর সিকিমের ভারতভুক্তি সম্বন্ধে যে উক্তি করলেন সেটাও রাজনৈতিক মূর্খতার চরম নিদর্শন। ভারতের প্রযুক্তিবিদ্যার মূর্তিমান স্বাক্ষর হিসাবে যেটা ছিল সর্বজনস্বীকৃত, সেই আর্যাভট্ট সম্বন্ধে বললেন, ওটা ইন্দিরার প্রচার কার্য মাত্র এবং ওটা ছয় মাসের মধ্যেই ভেঙ্গে পড়বে।

অবশ্য সব বক্তব্যের মৌল কারণ হল ইন্দিরা বিদ্বেষ এবং ইন্দিরা আতঙ্ক। হালফিল, পাকিস্তানের পক্ষে তিনি যে মোক্তারনামা নিয়েছেন, সেও একই ধরণের। পাকিস্তানের নিজদেশের আত্মরক্ষামূলক ব্যবস্থা করার অধিকার আছে, সেকথা কেউ অস্বীকার করেনি। কিন্তু আমেরিকা পাকিস্তানকে এফ-১৬ বিমান দিয়ে ও নানাপ্রকার মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে যে ভারতবিরোধী কাজে উৎসাহ দিচ্ছে, এ সত্য মোরারজী দেশাই এবং বদ্ধ উন্মাদ ভিন্ন সকলেই স্বীকার করছেন। পাকিস্তান কখনও পরমাণু অস্ত্র বানাবে না, তিনি যখন সার্টিফিকেট দিচ্ছেন, তখন রাশিয়া তাদের অস্ত্রনির্মাণের স্থানের ছবি তুলে তাদের দেশের টেলিভিশানের মাধ্যমে প্রকাশ করেছে। এটা কি নির্বুদ্ধিতা, না কোন বিশেষ উদ্দেশ্য মূলক? এটম বোমার দ্বারা যুদ্ধ জয় করা যায় না বলে তিনি বলছেন। অথচ নাগাসাকিও হিরোশিমার ঘটনার কথা মানুষ ভুলতে পারে না। এটাত ইতিহাস। মোরারজী তাকে বিকৃত করতে পারেন মাত্র, মুছে ফেলতে পারেন না।

দ্বিতীয় ব্যক্তি হচ্ছেন সুব্রাহ্মণীয়ম স্বামী, কার স্বামী, তা আমাদের জানা নেই। তবে ভারত নামক ভৌগলিক ভূখণ্ডের স্বামী তিনি নন এটা সবাই জানে,

তবে এই লোকটি অদ্ভুত প্রকৃতির। চীনে বলেছেন যে ভারত সীমান্তে সাড়ে তিন লক্ষ সৈন্য সমাবেশ এমন কিছু ঘটনা নয়। জনতা সরকারের আমলেও এটা ছিল এবং সেজন্য জনতা সরকার কোন উদ্বেগ অনুভব করেনি। জনতা সরকার ত কোন বিষয়েই উদ্বেগ অনুভব করেনি। তাদের একমাত্র উদ্বেগ ছিল শ্রীমতী গান্ধীকে নিয়ে। কিন্তু জনতাদলের মহামূর্খতা ত কোন দেশপ্রেমিকের নিকট আদর্শ হিসাবে গৃহীত হতে পারে না।

সবচেয়ে আপত্তিকর কথা বলেছেন এই লোকটি যে ভারতেরও পাঁচলক্ষ সৈন্য সেখানে মোতায়েন আছে। তাঁকে ডেকে ভারতের স্বরাষ্ট্র বা গৃহমন্ত্রী সংবাদ দিয়েছেন বলে বিশ্বাস করবার কোন কারণ নেই। তা ভিন্ন এটা সামরিক গোপনীয় ব্যাপার। এ তথ্য ফাঁস করা ত দেশদ্রোহীতার অপরাধ। সে জন্য তার বিচার করা উচিৎ কিনা, সরকার ভেবে দেখুন।

তৃতীয় ব্যক্তি হচ্ছেন শ্রীযুক্ত বাজপেয়ী। যিনি ভারতের রাজনীতিক্ষেত্রে নবাগত। চুঁইফোঁড় বললেও ভুল হবে না। স্বাধীনতা সংগ্রামের কোন ঐতিহ্য নেই, দেশের সকল সম্প্রদায়ের মানুষের সম্বন্ধে কোন চিন্তাভাবনা নেই। হঠাৎ মওকা মেলায় জন্য আত্মপ্রকাশ করেছেন। তিনি বলেছেন যে বিদেশ থেকে গম এলে তিনি গম-খালাসের এবং বন্টনের সময় বাধা দেবেন। কারণ কি? যদি আবার মন্বন্তর মেলে? চারদিকে রসদজ্ঞা। অন্য কোন কারণে না হলেও, বিপদের দিনের জন্য খাদ্য ও অন্যান্য অত্যাবশ্যক সামগ্রীর মজুত ভাণ্ডার আরো মজবুত করতে যদি সরকার প্রস্তুতি নিয়ে থাকেন, তবে অপরাধ কোথায়? এই সব লোকের প্রগল্‌ভতার ও দায়িত্ব-জ্ঞানহীনতার কারণ চেষ্টা একটি, ইন্দিরা বিদ্বেষ, ব্যক্তিগত লোভ চরিতার্থ করা।

কোন ব্যক্তিবিশেষের সমালোচনা আমরা করি না। কিন্তু এটাত নিছক ও ব্যক্তিগত অভিমত নয়। এটা হল দুটি প্রধান বিরোধীদলের নীতির প্রতিফলন। তাই একে উপেক্ষা করা চলে না। এর থেকে অনেক লঘু কারণে, বাংলাদেশের জনৈক মুখ্যমন্ত্রীর সম্বন্ধে এক সাংবাদিক বলেছিলেন—

It is high time that this mad Mollah of Bengal should be bound down in chains and sent to lunatic asyeum. এদের সম্বন্ধে এ ব্যবস্থা সঙ্গত কিনা সেটা ভেবে দেখতে পারেন কর্তৃপক্ষ।

প্রসঙ্গক্রমে বলা যায়, এরা এবং দুই একটি দলের নেতারা বলেছেন পাকিস্তান সম্বন্ধে দেশবাসীকে সতর্ক থাকতে বলে প্রধানমন্ত্রী নাকি যুদ্ধাতঙ্ক সৃষ্টি করছেন নিজের অক্ষমতা ঢাকার জন্য। আসন্ন বিপদ সম্বন্ধে হুঁসিয়ার করে দেওয়া কি যুদ্ধাতঙ্ক সৃষ্টি করা? দেশবাসীকে হঠাৎ একটি বিপদের সম্মুখীন হতে হলে, সেটাই হত সঙ্গত কাজ। এই বুদ্ধি নিয়ে রাজনীতি করছে এরা? পোচনীয়ভাবে জনতাকর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হয়েও এদের কোন শিক্ষা হচ্ছে না এবং চেতনা বোধ জাগছে না। অথচ কু-মতলব হাসিল করার চেষ্টার অন্ত নেই এদের। পাকিস্তানের অতীত কাজকর্ম যারা জানে, তারা প্রত্যেকেই অনুভব করবেন যে পাকিস্তান ভারত আক্রমণ করতে পারে বিনা কারণে।

এই সব মতলববাজ রাজনীতিবিদ্‌দের সম্বন্ধে সজাগ থাকতে হবে এবং হুঁসিয়ার হতে হবে দেশের মানুষের এবং জাতীয় সরকারের। বিদেশী শত্রুরা এখনই এদের উক্তি উদ্ধৃত করছে আত্মপক্ষ সমর্থনে। কে জানে এদের সক্রিয় সহায়তা লাভের জন্য সচেষ্ট হবে কিনা। তাই সাবধানে হুঁসিয়ার।

শিক্ষার উদ্দেশ্য ঃ

পূর্ণ বিকশিত মানুষ

রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, "মুখস্থ বিদ্যার চাপে এই সব চির পঙ্গু মানুষের অকর্মণ্যতার বোঝা দেশ বহন করবে কি করে? আমাদের শিক্ষালয়ের নবীন প্রাণের মধ্যে অক্লান্ত উদ্যোগের হাওয়া বয়েছে যদি দেখতে পাই, তাহলে বুঝবো দেশের লক্ষ্মীর আমন্ত্রণ সফল হতে চললো।" কার্ল মার্কসের কথায়, 'ভবিষ্যতে শিক্ষার অঙ্কুর নিহিত রয়েছে সেই শিক্ষার মধ্যে, যে শিক্ষা একটি নির্দিষ্ট বয়সের প্রতিটি শিশুর কাছে উৎপাদনী শ্রম, পঠন-পাঠন এবং শরীর চর্চাকে সংযুক্ত করবে উৎপাদনে দক্ষতার বৃদ্ধির একটি উপায় হিসেবেই কেবলমাত্র নয়, বরং পরিপূর্ণভাবে বিকশিত মানবসৃষ্টির একমাত্র পদ্ধতি হিসেবে।

এ যুগে ইউনেস্কোর শিক্ষা কমিশনের বক্তব্য হল অর্থনৈতিক উন্নয়নের পূর্বসর্ত। কোঠারী কমিশনের মতে শিক্ষা সমাজ-পরিবর্তনের প্রয়োজনীয় হাতিয়ার। তাই, শিক্ষাক্ষেত্রে সরকার --

১) সকলকে শিক্ষিত করার জন্য ঃ

২) বিজ্ঞান-শিক্ষার জন্য ঃ

৩) শিক্ষা ও সামাজিক পরিবেশকে সংযুক্ত করার জন্য :

৪) শরীর শিক্ষা, সৃজনাত্মক কাজ ও পঠন পাঠনের সমন্বয় সাধনের জন্য—

উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

অই. সি. এ ১৭২৪৮ (৮১)

সমীক্ষা ঃ অত্যাবশ্যক শিল্পে সাম্প্রতিক অর্ডিন্যান্স

—মলয় ঘোষ

ব্যাংক, ডাক ও তার, বিদ্যুৎ, পানীয় জল সরবরাহ, প্রতিরক্ষা সম্পর্কিত উৎপাদন প্রভৃতির মতো কয়েকটি অত্যাবশ্যক শিল্পের ক্ষেত্রে অধিকতর উৎপাদন সুনিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে সম্প্রতি কেন্দ্রীয় সরকার যে অর্ডিন্যান্স জারী করেছেন, সমগ্র দেশে তার মিশ্র প্রতিক্রিয়া হয়েছে।

দেশের কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়ন সংস্থা সমূহের কয়েকটির নেতৃবৃন্দ যুগ্মভাবে একটি বিবৃতি দিয়ে এই অর্ডিন্যান্সকে স্বৈরতান্ত্রিক ও শ্রমিকস্বার্থ বিরোধী বলে বর্ণনা করেছেন। ধর্মঘট প্রবৃত্তিকে শ্রমিকের গণতন্ত্রসঙ্গত ন্যায্য অধিকার বলে বর্ণনা করে—এই ট্রেড ইউনিয়ন নেতৃবৃন্দ একে কালা অর্ডিন্যান্স বলে অভিহিত করেছেন। দেশের বিরোধী অধিকাংশ দলের নেতৃবৃন্দ এই অর্ডিন্যান্স এর সমালোচনা করেছেন। সি, পি, এম ও ভারতীয় জনতা পার্টি যাদের মধ্যে অন্যতম। সর্ব ভারতীয় কম্যুনিষ্ট পার্টির পক্ষে শ্রীডাঙ্গে এই অর্ডিন্যান্স জারীর প্রয়োজনীয়তাকে স্বীকার করে নিয়েও এর অপপ্রয়োগের সম্ভাবনা সম্পর্কে সতর্ক করে দিয়েছেন। অন্যদিকে শাসক ইন্দিরা কংগ্রেস দলের সভানেত্রী ও প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধী খুব স্পষ্টভাবে এই মত ব্যক্ত করেছেন যে কোন অবস্থাতেই এই অর্ডিন্যান্সকে শ্রমিকদের স্বার্থবিরোধী রূপে প্রয়োগ করা হবে না বরং এর দ্বারা শ্রমিকশ্রেণীর সর্বাঙ্গীণ ও বৃহত্তর মঙ্গলই সাধিত হবে।

পরস্পরবিরোধী এইসব মতামতের পরিপ্রেক্ষীতে বর্তমান ভারতবর্ষে শিল্পোৎপাদন ক্ষেত্রের প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে কিছু আলোচনা করা যাক। কেন্দ্রে বিগত জনতা সরকারের আমলে যে রাজনৈতিক অস্থিরতা দেখা দেয়, দেশের শিল্পক্ষেত্রেও তার ঢেউ এসে লাগে। গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের নামে শ্রমিকশ্রেণী তথা সাধারণ মানুষের সামনে যথেচ্ছাচারের অনেক সুযোগ সুবিধা সৃষ্টি করা হয়, যার ফলে শৃঙ্খলা ব্যাহত হতে থাকে। প্রকৃতপক্ষে এই সরকারের একজন বিশিষ্ট মন্ত্রী তৎপূর্ববর্তী কংগ্রেস সরকারের আমলে বহু ট্রেন দুর্ঘটনার কারণ হিসাবে নিজেকে বর্ণনা করেন যা একদিকে জনতা সরকারের ভাবমূর্তিকে নষ্ট করে, অন্যদিকে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারী ও জাতীয় স্বার্থবিরোধী কায়কলাপে উৎসাহ যোগায়, এর ফলে জাতীয় ক্ষেত্রে শিল্পোৎপাদনের সূচক অনেক নীচে নেমে আসে এবং মূল্যবৃদ্ধি ঘটে অস্বাভাবিক গতিতে। জনতা সরকারের আশীর্বাদ ও প্রশ্রয়পুষ্ট পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রন্ট সরকারও গণতান্ত্রিক অধিকারদানের নামে প্রকৃতপক্ষে শিল্পোৎপাদনক্ষেত্রে শ্রমিকদের যথেচ্ছাচারের অনুমতি দেয়, যার ভয়াবহ ফল হিসাবে এই রাজ্যে শিল্প প্রসার বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে।

আশীর প্রথমে শ্রীমতী গান্ধীর নেতৃত্বে যে জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়, তাকে প্রথমেই দেশজোড়া এই ভয়াবহ শিল্প সংকটের মুখোমুখী হতে হয়। একদিকে বেকারীত্ব, মূল্যবৃদ্ধি, দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রাদেশিকতা ও সাম্প্রদায়িকতাভিত্তিক অশান্তি, প্রাকৃতিক বিপর্যয় ও বহিঃশত্রুর প্ররোচনা ; অন্যদিকে শিল্প, কৃষি তথা উৎপাদনের প্রতিটি ক্ষেত্রে

অনিয়ন্ত্রিত স্বেচ্ছাচারের তাণ্ডব নৃত্য এই নবগঠিত সরকারকে অত্যন্ত কোণঠাসা করে ফেলে। তাই ৮১ সালের পূর্ব পর্যন্ত জাতীয় সমৃদ্ধির ক্ষেত্রে কোন উল্লেখযোগ্য সংযোজন এই সরকার ঘটাতে পারেনা। একাশীর গোড়াতেই সরকার কতকগুলি ব্যবস্থার মাধ্যমে মূল্যবৃদ্ধিরোধ ও উৎপাদনবৃদ্ধির উপর জোর দেন। নতুন বাজেটেও এই উদ্দেশ্যের প্রতিফলন দেখা যায়। অসংখ্য সমস্যাকীর্ণ অবস্থাতেও সরকারের মূল লক্ষ্য সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন—গৃহীত ব্যবস্থাগুলির আরকর রেহাই, কালোটাকার স্বেচ্ছাসমর্পণ, বিশেষ বিশেষ শিল্পে চাড়ে ও অধিকতর অনুদান, বহুজাতিক শিল্পপ্রতিষ্ঠান সমূহের ব্যবসাবাণিজ্যে কড়াকড়ি, কৃষি ও ক্ষুদ্রশিল্পে বিনিয়োগবৃদ্ধি, মাধ্যমে সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। বিশৃংখল, গোষ্ঠিবিভক্ত, সংশয়াকীর্ণ ও অর্থনৈতিকভাবে পঙ্গু এক বিশাল জনজীবনকে সুশৃংখল কর্মোদ্দীপনার গ্রন্থীতে আবদ্ধ করার প্রয়াসী হন এই জাতীয় সরকার।

কিন্তু বাধা আসতে থাকে প্রতিপদে। বিরোধী দলগুলির সক্রিয় প্ররোচনায় শিল্পে বিরোধ বাড়তে থাকে। আমাদের দেশের বিরোধীরা যেন শুধু বিরোধীতা করার কাজেই নিজেদের নিযুক্ত রাখেন, সরকারের আদর্শ ও মঙ্গলজনক কোন কাজকে সহযোগিতার মাধ্যমে সফল করে তোলায় তাঁদের যেন কোন ভূমিকা থাকে না। সমগ্র দেশে রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পগুলিতে শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে দলবাজী, আলস্য, কাজে ফাঁকি দেবার প্রবণতা এবং রাজনৈতিক কারণে লোটার কুশ্রী অভিপ্রায় বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলির গুপ্ত প্রকাশ্য অনটনে উৎপাদন বিরোধী হয়ে পড়ে আর সুস্পষ্ট ফলশ্রুতি হিসাবে অভাব, দারিদ্র্য ও মূল্যবৃদ্ধি ক্রমান্বয়ে চলতে থাকে। শুধু পশ্চিমবঙ্গেই এই প্রকার শিল্পবিরোধের ফলে প্রায় ২৫০টি ছোট বড়ো বেসরকারী কলকারখানা বন্ধ হয়ে যায় এবং কেন্দ্রীয় সংস্থাসমূহে যথা রেল, ডাক ও তার, ব্যাংক, প্রতিরক্ষা প্রভৃতিক্ষেত্রে চরম নৈরাজ্যের সৃষ্টি হয়। বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রগুলিতে দলবাজী ও দুর্নীতির ফলে নতুন নতুন ইউনিট বসিয়েও উৎপাদন করা সম্ভব হয় না। ফলে বিদ্যুতের অভাবে শিল্প ক্ষেত্রে নাভিশ্বাস উঠতে থাকে। এবং এই অবস্থার মধ্যেও শ্রমিকশ্রেণী তাঁদের 'ন্যায্য' অথবা 'অন্যায্য' দাবীদাওয়া আদায়ের জন্য ক্রমাগত : 'সংগ্রামে' লিপ্ত থাকেন।

আমাদের দেশের অধিকাংশ ট্রেড ইউনিয়ন নেতা শ্রমিকের অধিকার ও দাবীদাওয়া স্বপক্ষে জোরালো বক্তৃতা করতে ভালোবাসেন কিন্তু তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে অবহিত করার ব্যাপারে উদাসীন থাকেন (সম্ভবত, জনপ্রিয়তা হারানোর ভয়েই তাঁদের এই ভূমিকা)। শ্রমিকরাও তাঁদের অধিকাংশই নিরক্ষর অথবা অর্দ্ধলিখিত - তলিয়ে ভেবে দেখেন না যে, উৎপাদনকে ব্যাহত করে শুধু ক্রমান্বিত দাবী দাওয়া শিল্পের অস্তিত্বকেই বিপন্ন করে। আর শিল্প বন্ধ হয়ে গেলে শ্রমিকের রুজি রোজগারও একেবারেই বন্ধ হয়ে যায়—যার প্রমাণ আজকের পশ্চিমবঙ্গে অসংখ্য বন্ধ কলকারখানা ও তাদের কর্মহীন শ্রমিক সমাজ।

(আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)

Freedom fighters whose pension has been sanctioned

May & June—1981

Name	Address	Amount Rs.	with effect from
	CALCUTTA		
Dutta Smt. Sova Rani w o L. Paresh Nath Dutta	5 1, Brojen Mukherjee Road, Calcutta-34	250	14 8 80
Ghosal Satya Narayan, 70/1 Sarat Ghose Garden Road, Calcutta-31		300	1 8 80
Ghosh & Rabindranath, Plot No. AC-207, Sector-I Calcutta-64		300	1 8 80
Ghosh Smt. Sita, w o L. Anukul Ch. Ghosh, 15A, Bhim Ghosh Lane, Cal-6		200	1 8 80
Gope Smt Sabitri Bala w o L. Brindaban Ch.	26A, Chandibari Street, Calcutta-6	300	1 8 80
Guha Bibhuti, 20 Dr Kartick Bose Street, Calcutta		300	1 8 80
Guha Deva Prasad, 21/B Dilkhusa Street, Calcutta-17		300	1 8 80
Gupta Kanailal 9 Narkeldanga North Road, Cal-11 (Restoration)		300	1 8 80
Gupta Smt. Lila, w o L. Jagat Prasanna Gupta,	18 27, Ballygunj Place East, Calcutta.19	200	1 8 80
Lahiri Kumari Urmila d o L. Indira Lahiri	11, Sukia Street Cal-9 (till marrige)	200	23 8 80
Mitra Santosh Kumar, 7/B, Asgar Mistry Lane, Calcutta-46		300	1 8 80
Nag Kumar Sathi, d/o L. Sudhir Ch. Nag, Kurthia Gyvt.	H Estate Block No. 1/9, Flat-5 Calcutta-39	300	1 8 80
Paria Sudhir Ch. 109A, Keshab Ch. Sen St. Calcutta		300	1 8 80
Roy Smt. Bina, w/o L. Hirendra Ch. Roy, 136 Rastraguru Avenue Cal-28		200	1 8 80
Roy Kali Prasad a) Manu 17/2 Kundu Lane Calcutta-25 (Restoration)		300	1 8 80
Smt. Renuka w/o L. Naresh Ch, 1-A Domesitc Area, Cal-35		200	1 8 80
Roy Smt, Tara, w/o L. Bimal Ch, 58 Babubagan Lane Cal-38		200	1 8 80
Roy Chowdhury Nirmala, 22/C South Dinthi Road, 296 Housing cal		300	1 8 80
Roy Chowdhury Sujanmoy, Flat No, 9B Avenue House Southern, cal-29		300	1 8 80
Saha Smt, Sudhansu Bala, w/o L Nagendra Nath, 23/9, Natair Road cal-47		300	11 8 80
Sarkar Smt, Latika, w/o L, Hiralal Sarkar, 9, B. T. Road,	Flat No, 36/1 cal-46	300	1 8 80
Sen Kumari Gouri d o L, Benoyendra Nath Sen,	51 Sarat Bose Road, cal-26	300	1 8 80

Sengupta Nam Gopal Govt. Qr. Block C, Flat No, 6, 11, Central Sinthi Road. cal-50	300	1 8 80
Sur Smt, Labanya Prova, w/o L, Bejoy Keshari Sur, 44B, Gokul Boral Street cal-12	200	1 8 80

Dist—24 PARGANAS

Name	Address	Amount Rs.	with effect from
Basu Smt, Sova Rani, w/o L, Sachindra Prosad	129 Girish Ghosal Road P. O,	300	1 8 80
Bhattacharja Smt, Alorani, w/o L, Bama Kumer Nityananda Pally	P O, Guma	100	31 7 80
Bhattachaja Smt. Gita, w/o L, Pran Kumar Atalagar, P, O, Garifa		200	1 8 80.
Bhattachaja Rabindra Charan, 340/1, Ashakenagar		300	1 8 80
Chakrabarty Kumari Bina d/o L, Monoranjan Vill Kumarthuli	P O Habra (for two sister Bina & Kanikarani)	250	1 8 80
Chakrabrty Smt Biva Rani, w/o L Abani Mohan Natunpukur.	P, O, Barasat	250	1 8 80
Chakrabarty Smt Manimala w/o L Monotosh P, O Bansdroni		100	1 8 80
Chatterjee Smt Usha Rani w/o L Crishna Gopal,	Dasnagar Road P, O, Birati	250	1 8 80
Das Sfit Ashalata, w/o L, Sudhir Kr. Gandh Pally, P, O, Bongaon		200	1 8 80
Das Smt, Sarbamangala w/o L Rakhal Ch. Das	Vill Ramnagar, P, O. Bengal Enamel	300	1 8 80
Das Smt Tarulata, w/o L, Keshab Ch, Das Simlanagar,	Agarpara, P, O, Sodepur	250	1 8 80
Das Gupta Prasanta Kumar, 197 Bsddan Palli, p, o, Guria		300	1 8 80
Datta Smt, Uma Rani, w/o L Abani Mohan p, o, Jaleswar		250	1 8 80
Ghosh Smt. Bijonprova, w/o L, Amulya Kr. Mistrighat,	Monirampur, p. o. Barrackpur	200	1 8 80
Ghosh Smt. Purnabala, w/o L, Satian Ch.		200	1 8 80
Ghosh Suresh Ch. Dinabandhunagar p, o, Bonaon		300	1 8 80
Goeswami Bhawaniprosad, p. o. Barrackpere		300	1 8 80
Guha Smt, Asha Rani w/o L Kalipade		300	9 10 80
Majumdar Smt, Devika, w/o L Anil Kumar Vivekananda Park Kumdahari		300	29 9 80
Majumdar Smt, Manorama, w/o L Surya Kumar 180/1 Asbokenagar		200	1 8 80

Regd.No.R. N. 24511/71 | Biplabi Bangla Phone : 34-1795 | Regd. No. R/N 77

বার্ষিক :—ডাক ১৫.০০ টাকা | ষাণ্মাসিক :—৮.০০ টাকা | মূল্য—৩০ পয়সা

পাক সেনাপতি ইয়াহিয়া খানের রক্তলোলুপ বাহিনী যে গ্রন্থ পুড়িয়ে ছাই করে দিয়েছিল বিপ্লব তাপস মহারাজ ত্রৈলোক্যনাথের সেই অবিস্মরণীয় গ্রন্থ "ভোলে ত্রিশ বছর ও পাক ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম" পুনর্মুদ্রিত হল।

দাম—ত্রিশ টাকা।

প্রাপ্তিস্থান

খাদি প্রতিষ্ঠান

১৫, কলেজ স্কোয়ার,

কলিকাতা-১২

সম্পাদক—

শ্রীশান্তিপদ রায়চৌধুরী

॥ সম্পাদকমণ্ডলী ॥

শ্রীজগদীশ চট্টোপাধ্যায় (সভাপতি)

শ্রীভবেশচন্দ্র নন্দী

পুষ্প চ্যাটার্জী

মলয় ঘোষ

প্রকাশক ও মুদ্রক—

শ্রীঅনিল সেনগুপ্ত

বিহার রাজ্যের প্রতিনিধি—

[illegible] ঘোষ

ঝোলা—

শ্রীনন্দগোপাল পাল

মহারাজ ত্রৈলোক্য চক্রবর্তী স্মৃতিরক্ষা কমিটি

৩২/৮, চণ্ডী ঘোষ রোড, বেলি[illegible]

মহাশয়,

আগামী ৯ই আগষ্ট রবিবার, (১৯৮১) সকাল ৯ ঘটিকায় কেওড়াতলা মহাশ্মশানে ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্তীর একাদশ মৃত্যুবার্ষিকী উদ্‌যাপিত হইবে। বর্ষীয়ান নেতা শ্রীঅশ্বিনীকুমার গাঙ্গুলী এই অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করিবেন।

বিপ্লব সাধনার সার্থক প্রতীক মহারাজ ত্রৈলোক্যনাথের সমাধিতে এই স্মরণীয় দিনে পুষ্পার্ঘ্য নিবেদন আপনাকে সবিনয়ে অনুরোধ করিতেছি।

শ্রীসত্যেশ্বর মুখোপাধ্যায় দেশাত্মবোধক সঙ্গীত পরিবেশন করিবেন।

নিবেদক

স্মৃতিরক্ষা কমিটির পক্ষে

১১ই জুলাই, ১৯৮১ দীনেশচন্দ্র ঘটক, সম্পাদক

মূল কার্যালয়—৪নং বৃন্দাবন দাস ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০০৭ শ্রীঅনিল সেনগুপ্ত কর্তৃক প্রকাশিত এবং তৎকর্তৃক প্রিন্টি পাবলিসিটি, ১১৭, কেশবচন্দ্র সেন ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০০৯ হইতে মুদ্রিত।

বিপ্লবী বাংলা

॥ বিপ্লবী পরিষদের সাপ্তাহিক মুখপত্র ॥
স্থাপিত—১৯৫৬, 'বিপ্লবী বাঙ্গালী' নবকলেবরে—১৯৭১

দশম বর্ষ	শনিবার ১২ই শ্রাবণ ১৩৮৮ ২৯শে আগষ্ট ১৯৮১	৪২/৪৩ সংখ্যা

"প্রকৃত বিপ্লবী হচ্ছে সেই, যে কোনদিন পরাজয় স্বীকার করেনা ; সে কখনও মুষড়ে পড়েনা বা হতাশ হয়না । একজন খাঁটি বিপ্লবী তার উদ্দেশ্যের যথার্থতার প্রতি বিশ্বাসবান থাকবে এবং তার দৃঢ় বিশ্বাস থাকবে যে তার উদ্দেশ্য দেরীতে হলেও সাফল্য লাভ করবেই ।"

—নেতাজী

Freedom fighters whose pension has been sanctioned

June & July—1981

Name	Address	Amount Rs.	with effect from
	Calcutta		
Chakraborty Smt. Banalata	565-C New Alipore Flat-7 block N cal-53	300	1 8 80
Chatterjee Smt. Aruna	p. 245, Purna Das Rd. cal-29	300	1 8 80
Chowdhury Debendra Nath	214/15 Lower Circular Rd cal-47	300	1 8 80
Deb Gupta Smt. Arati	wd/L. Hiralal Deb Gupta	300	16 1 81
	119/3 Maharaja Nanda Kumar Rd. (S) cal 36		
Dhar Smt. Anima	wd/L. Ramesh ch. Dhar. 207/63 B,T, Rd. Mullick colony	250	1 8 80
Dutta Binoy Bhushan	P-21, Dr. Suresh Ch. Banerjee Rd cal-10	300	1 8 91
Kar Smt. Aruna	wd/L. Santosh Kr Kar 20 Fern Place, cal-19	250	21 1 81
Lahiri Smt. Shobha	wd/L. Bibhuti Bh. Lahiri	200	7 2 81
	14/1A, Nepal Bhattacherjee 1st Lane, cal-26		
Majumdar Bimalendu	101/B Kunkulia Rd, cal 19	300	1 8 80
Majumdar Mano Ranjan	47/4 Shyamnagar Rd, cal-55	300	1 8 80
Mitra Smt. Binapani	wd/L. Lal Mohan Mitra 24 Maharaja Nanda Kr. Rd.	200	12 1 81
Mukherjee Smt. Sovona	wd/L. Joy Ronjan Mukherjee	300	13 4 81
	4, Basudevpur Main Rd. cal-36		
	Dist—Nadia		
Bhattacharji Kumudananda	Mymensingh Colony, p. o, Chakda	300	1 8 80
	Dist—Midnapur		
Maity Smt. Brajabala	wd/L, Satish Ch. Maity	200	1 8 80
	Masamchak. p o. Dakhia Moyna		
Ghorai Smt, Kala Bala	wd/L. Ch, Mohan Ghorai Harinbhasa p. o, Dhekua	300	1 8 80
Kuiha Jiban Chandra	father of martyr son	200	15 3 81
	24 Parganas		
Chakraborty Keshab Lal	Gandhi Pally Bangaon	300	1 8 80
Dey Smt, Tara Rani	wd/L Anil Kumar Dey 600/3 Kankpool	250	24 12 80
Nath Smt Brajabala	c/o, Shri saptan Debnath wd/L. Bagala	200	9 3 81
	Bengal waterproof works Ltd, S, N, Bose Rd, Panihati		
Sarkar Sudhir Kumar	681/1 Ashoknagar	300	1 8 80

(এর পর পৃষ্ঠা কলামে দেখুন)

সম্পাদকীয়

বাংলাদেশ কি চায় ?

বাংলাদেশের জিয়া সাহেবের হত্যাকাণ্ডের পর ওখানে যে পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে এবং যেভাবে একটা দ্রুতপরিবর্তনের ইঙ্গিত দিচ্ছে, তাকে নিছক বাংলাদেশের ঘরোয়া ব্যাপার বলে উপেক্ষা করা বোধহয় ভারতের পক্ষে সম্ভব হবে না। জেনারেল মনজুর প্রয়াত জিয়া সাহেবকে হত্যা করেছিলেন কিনা, তাকে এই কাজে কে বা কাহারা সহায়তা করেছিলেন, হত্যাকারীরা কি উদ্দেশ্য নিয়ে একাজ করেছিলেন, এগুলি নিঃসন্দেহে ঘরোয়া ব্যাপার। এই পরিস্থিতির বিচার বিশ্লেষণ করার দায়দায়িত্বও ওখানকার রাজনৈতিক দলগুলির ও দেশের জনসাধারণের। বিচার বিবেচনার পর, যে সিদ্ধান্তে তারা পৌঁছবেন এবং তার পরিপ্রেক্ষিতে কি ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন, সেটাও সম্পূর্ণ তাদেরই এক্তিয়ারভুক্ত। কিন্তু নানা ঘটনাবলীর মধ্য দিয়ে, যাদের হাতে ওখানকার শাসনভার ন্যস্ত, তাদের মানসিকতার যে রূপ পরিস্ফুট হয়ে উঠছে, তাতে ভারতের পক্ষে উদ্বেগের কারণ ঘটেছে।

একটু বিস্তৃতভাবে চিত্রটা তুলে ধরলে, এই আশঙ্কা যে অমূলক নয়, সেটা প্রমাণিত হবে। দেখা যাচ্ছে, বাংলাদেশের দুর্দিনে যারা দেশের হয়ে লড়াই করেছিল, যাদের অবদানকে স্বীকৃতি ও মর্যাদা দিয়ে প্রয়াত প্রেসিডেন্ট মুর্শীদর রহমান সাহেব, তাদের সৈন্য বিভাগ ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ বিভাগে বহাল করেছিলেন, একজন একজন করে তারা প্রায় সকলেই বিতাড়িত, হত, অথবা মৃত্যুদণ্ড ভোগ করার মুখে দণ্ডায়মান। ব্যক্তিগতভাবে কেউ অন্যায় কাজ করলে, দেশের আইন অনুসারে তাকে সাজা ভোগ করতে হবে, এটা অনস্বীকার্য ও সর্বজনগ্রাহ্য। কিন্তু বেছে বেছে একটি বিশেষ শ্রেণীভুক্ত মানুষদের প্রকাশ্যে এবং বহুলাংশে অপ্রকাশ্যে মৃত্যুদণ্ড দিতে থাকলে, ব্যাপারটা নিশ্চয়ই সন্দেহের সৃষ্টি করে। করছেও তাই, সেটা প্রমাণিত হচ্ছে বিরোধীদলগুলির তরফ থেকে অভিযুক্তদের প্রকাশ্য বিচার ব্যবস্থার ও তাদের আত্মপক্ষ সমর্থনের দাবীর মধ্য দিয়ে। তাদেরও এই সন্দেহ ঘনীভূত হয়ে উঠেছে যে যারা একাজ করেছেন, তারা বাংলাদেশের মুক্তি যুদ্ধের সময় পাকিস্তানের পদলেহন করেই কাল কাটিয়েছেন, তারাই আজ নাটের গুরু। ইতিমধ্যেই পাকিস্তানের পাঁচজন মন্ত্রীর হঠাৎ বাংলাদেশ ভ্রমণ করার ঘটনাকে, কেউ সদুদ্দেশ্য প্রণোদিত বলে মনে করছেন না।

দ্বিতীয় লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে, পূর্বাশা দ্বীপ নিয়ে আবার হৈ চৈ শুরু করা। ভারত বিদ্বেষ প্রচারের পালে ত প্রশাসকদলের কর্তব্য বাক্তিরা ঝড়ের হাওয়া বইয়ে দিতে অশোভনভাবে আগ্রহী। সম্প্রতি খবরে দেখা যাচ্ছে, পূর্বাশা দ্বীপ দখলের জন্য কিছেট ওমর ফারুকও পাঁচটি গানবোট ও একটি কেরিয়ার নিয়ে,

বাংলাদেশ সচেষ্ট হয়েছিল। কিন্তু ভারতের তরফের সতর্ক প্রহরার ফলে, সে চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে। খবরে আরো প্রকাশ, বাংলাদেশ ফৌজী তালিম নিতে থান সেনা আমদানী করছে। অদৃষ্টের কি পরিহাস! যে অমানুষের দল বাংলাদেশের প্রথম শ্রেণীর বহু বুদ্ধিজীবিকে হত্যা করেছে হাজার হাজার মা বোনদের সতীত্ব নষ্ট করেছে, আরো বহু মূবক, ছাত্র ও রাজনীতিবিদদের রক্তে বাংলাদেশের মাটি লাল করে দিয়েছে, এক কথায় বাঙ্গালী মুসলমান জাতিকে ইতিহাস থেকে বিলুপ্ত করতে বদ্ধ পরিকর ছিল, এবং একটি বন্ধু রাষ্ট্র যদি প্রকাশ্য বিপদের ঝুঁকি নিয়ে, তাদের সাহায্য করত, তবে সে কাজ যারা সম্পূর্ণ করত নিশ্চিতভাবে, আজ তাদের ডেকে আনা হচ্ছে শিক্ষাদান করতে?

অন্যদিকে বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে যে সম্পর্ক আজ ইতিহাসের পাতায় লিখিত হয়ে আছে রক্তের অক্ষরে, তাকে মুছে ফেলার জন্য কি অকৃতজ্ঞ অপচেষ্টা শুরু করেছে ওখানকার একদল রাজনীতি-বিদরা ও সামরিক বাহিনীর কর্তারা। অবাক বিস্ময়ে, দেশ বিদেশের বহু মানুষ চেয়ে দেখছেন। আমরা জানি যে এই মানসিকতা মুষ্টিমেয় লোকের, বাংলাদেশের অনেক রাজনৈতিক দল ও সাধারণ মানুষ এটা পছন্দ করেন না এবং একে একান্ত অনভিপ্রেত ও অসমর্থনযোগ্য বলে মনে করেন।

ভারতের পক্ষে চিন্তার কারণ হল, বাংলাদেশ কি ভারতের বন্ধুত্ব চায় না? বাংলাদেশ কি কারো প্ররোচনায় ভারতের সঙ্গে শত্রুতা করতে চায়?

সেজন্যই কি তারা বাংলাদেশের মুক্তি যোদ্ধাদের উৎখাত করে দিয়ে, ভারত বৈরীতায় যারা হাত পাকিয়েছে, তাদের এনে বাংলাদেশ পুনর্বাসিত করছেন, কিন্তু ভারত-বৈরিতা করে বাংলাদেশের লাভ লোকসানের খতিয়ানটা কি ওখানকার বর্তমান রাষ্ট্রনায়কেরা ভেবে দেখেছেন? তারা কি সদ্য স্বাধীনতা প্রাপ্ত বাংলাদেশের ভবিষ্যৎকে নষ্ট করে দিতে চান? আমরা বিশ্বাস করি ওখানকার অনেক রাজনৈতিক দলেরও শুভবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষের। এটা চান না। তবে তাদের অবশ্য করণীয় কাজ হবে যাতে মুষ্টিমেয় মতলববাজ লোক, দেশের ও বিদেশের কিছু মানুষ ও রাষ্ট্রের প্ররোচনায় বাংলাদেশের মানুষকে বিপথে চালিত করতে না পারে। এই মানসিকতা সম্পন্ন লোকেরাই বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করেছে। এরাই হয়ত জিয়া সাহেবের হত্যার পেছনে ছিল। বাংলাদেশ আজ অগ্নি পরীক্ষায় সম্মুখীন। দেশের সুস্থ মানসিকতা ও স্থিতিশীলতার অবক্ষয় ঘটলে, বাংলাদেশের মানুষদেরই ক্ষতি হবে সব থেকে বেশী।

ভারতের আদর্শ ও মৌলিক নীতি হল সকলের সঙ্গে শান্তিপূর্ণভাবে সহ অবস্থান করা, সব দেশের সার্বভৌমিকত্ব স্বীকার তাদের নিজ নিজ সমৃদ্ধি ও অগ্রগতির পথে সহায়তা করা। ভারত অন্যদেশের এক ইঞ্চি জমিও চায় না, তাদের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে নাক গলাতেও চায় না। ভারতের শান্তিপূর্ণ নীতিকে কেউ দুর্বলতা মনে করে ভারতের সঙ্গে সংঘর্ষ বাধাতে চাইলে, তার সমুচিত জবাব তারা পাবেই। আমরা প্রত্যাশা করব বাংলাদেশের রাষ্ট্রনায়কদের শুভবুদ্ধির উদয় হবে এবং ভারতের নিঃস্বার্থ সহযোগিতা ও বন্ধুত্বকে স্বীকার করে তাদের ভারত সম্পর্কে নীতি নির্ধারণ করবে। আমরা আরো প্রত্যাশা করবো যে অনুচিত কর্মকাণ্ড, স্বজন বিরোধ, বলীয়সী স্পর্ধা,...ধ্বংসের কারণ বলে 'হিতোপদেশ' এ বর্ণিত উপদেশটির সত্যতাও অনুধাবন করবেন বাংলাদেশের বর্তমান প্রশাসকরা ও তৈ-চৈ কারীরা।

ধর্মঘট নিষেধ অর্ডিন্যান্স পর্যালোচনা

কালীপদ সরকার

গত ২৭শে জুলাই কেন্দ্রীয় সরকার Essential Services Maintenance Ordinance জারী করেছেন। এই অর্ডিনান্সে কেন্দ্র পরিচালিত অত্যাবশ্যক সংস্থাগুলিতে ধর্মঘট নিষেধের বিধান আছে। ধর্মঘটের আওতায় নিয়ম মাফিক কাজ, ধীরে চলো, কলম বন্ধ ধর্মঘট প্রভৃতি অনিষ্টকর পদ্ধতি ও শৃংখলাহীন আচরণকেও ধরা হয়েছে। অর্ডিন্যান্স বিধি লঙ্ঘন জনিত অপরাধের সরাসরি দ্রুত বিচার ও দণ্ডদানের বিধানও তাতে আছে। অত্যাবশ্যক সংস্থা বলতে রেল, পোস্টাফিস, টেলিগ্রাফ, বিমান চলাচল, ডক, ব্যাংক, জীবনবীমা, প্রতিরক্ষা কেন্দ্র পরিচালিত শিল্প প্রভৃতিকে চিহ্নিত করা হয়েছে। তবে প্রয়োজন বোধে কেন্দ্র এই অর্ডিন্যান্স বলে অপর কোন সংস্থাকেও অত্যাবশ্যক বলে ঘোষণা করতে এবং তাকে এই অর্ডিন্যান্সের আওতায় আনতে পারবেন। অর্ডিন্যান্স আপাততঃ ছয় মাসের জন্য এবং লোকসভার পরবর্তী অধিবেশনে অর্ডিন্যান্সের বদলে এ জরুরী বিধানের পরমায়ু কতদিনের তা নির্ধারিত হবে। তবে পরমায়ু তিন বছরের বেশী হবে না।

জরুরী আদেশটি নিয়ে যে বিতর্কের ঝড় উঠবে এবং আদালত হবে তা সবলেই জানতেন এবং তা হয়েছেও। তবে ঝড়ে হাওয়ার বেগ কম, কারণ দেশের মানুষ তাদের মধ্যে কেন্দ্রীয় সরকারের কর্মচারী-শ্রমিকও অনেক আছেন, বহুদিন যাবৎ এক শ্রেণীর দায়িত্বহীন, দলবাজ ট্রেড ইউনিয়ন নেতারা কাজকর্মে অতিষ্ঠ বোধ করছিলেন। সকল শ্রমিক কর্মচারী যেমন পাওনা বাড়াতে চান, তেমনি তাদের মধ্যে অধিকাংশ কাজ করতেও চান। তারা শিল্প-সংস্থা ও অফিসে শান্তি, শৃংখলা এবং ভাল পরিবেশ চান।

কিন্তু একদল ধ্বংসবাদী, লড়াকু শ্রমিক-কর্মচারী যারা রাজনৈতিক দলের ছদ্মবেশী ক্যাডার ছাড়া কিছু নয়, অফিস ও শিল্প কারখানাগুলিতে এমন একটি ডিস্টার্বিং ক্লাইমেট সৃষ্টি করে যে কেউই নিবিষ্ট মনে কাজ করতে পারেন না। ক্যাডারদের জবরদস্তি ও চাপে শান্তিকামীরা অনেক সময় তাদের আধিপত্য মেনে নিতে বাধ্য হন। লড়াকুদের পিছনে যদি কোন রাজ্য সরকার সমর্থিত ট্রেড ইউনিয়ন থাকে তবে তো কথাই নেই।

শিল্প কারখানা ও অফিসে দীর্ঘদিন ধরে যে বিশৃংখলা চলছিল এবং উৎপাদন হানি ঘটছিল তাতে একটি মুষ্টিযোগ যে একেবারে অপ্রত্যাশিত ছিল তা নয়। অর্ডিন্যান্স ঘোষণায় লে-অফ ও লক-আউট নিষিদ্ধ করণের বিধান স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়নি সম্ভবতঃ এ জন্য যে অর্ডিন্যান্স কেন্দ্র পরিচালিত অত্যাবশ্যক সংস্থাগুলি সম্পর্কে প্রযোজ্য। এসব সংস্থায় লে-অফ ও লক-আউটের প্রশ্ন নেই। তবুও কেন্দ্রীয় সরকার বলেছেন যে, লোকসভার আগস্ট অধিবেশনে অর্ডিন্যান্সটিকে আইনে পরিণত করার সময় লে-অফ ও লক-আউট নিষেধের বিধান আইনে অন্তর্ভুক্ত করা হবে।

অর্ডিন্যান্স আইনসঙ্গতভাবে শ্রমিক কর্মচারীদের সুখ, সুবিধা, উপার্জন বৃদ্ধি ও দাবি আদায়ের পথে কোন অন্তরায় অথবা সুস্থ শ্রমিক আন্দোলনের পরিপন্থী নয়। রাজনৈতিক উদ্দেশ্য শ্রমিক অশান্তি ও ধর্মঘট ডেকে দলের শক্তিবৃদ্ধির চেষ্টা হয়ত এর দ্বারা ব্যাহত হতে পারে কিন্তু শ্রমিকরা ভালই জানেন যে, রাজনৈতিক মতলবে ধর্মঘট প্রস্তাবের ওপরে শ্রমিক দরদের লেবেল এঁটে নেতারা যেভাবে তাদের [illegible] [illegible] পরিবর্তে

নেতাদের রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠা বাড়লেও, শ্রমিকদের কোন লাভ হয় না। সম্প্রতি সিটু চালিত রেলওয়ে লোকো ধর্মঘটের দৃষ্টান্ত তার একটি প্রমাণ।

ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন সকল দেশেই শ্রমিক কল্যাণ ভিত্তিক এবং শ্রমিক কল্যাণ যে ট্রেডের কল্যাণ ও শ্রীবৃদ্ধির উপর নির্ভর সে কথা আন্দোলন নেতারা বোঝেন। এই বোধের অভাব শুধু ভারতে; এখানে ট্রেড মেরে ইউনিয়ন বাজি হল অধিকাংশ নেতার রীতি নীতি। শিল্পোৎপাদনে এবং অফিস আদালতের কাজে যে বেশ কিছুটা ঢিলেমি এসেছে সে বিষয়ে কি কোন সন্দেহ আছে? ঢিলেমি চলতে দেওয়া জনসাধারণের প্রতি সরকারের কর্তব্যচ্যুতি এবং কোন দায়িত্বশীল সরকার তা চলতে দিতে পারেন না। কেন্দ্র তার কর্তব্য পালন করেছে মাত্র।

বলতে পারেন, কড়া নির্দেশ জারির ফলে সরকার ট্রেড ইউনিয়ন নেতাদের সঙ্গে আপস আলোচনার দ্বারা কি প্রতিবিধান করতে পারতেন না? উত্তরে বলা যায় যে; সরকার সে চেষ্টা যে করেন নি এমন নয়। এই জুলাই মাসের প্রথম ভাগেও প্রধানমন্ত্রী শ্রমিক নেতাদের সহিত কয়েক দফা কথাবার্তা বলেছেন কিন্তু দুঃখের বিষয় যে, বিরোধীদল প্রভাবিত শ্রমিক নেতারা দেশের সামগ্রিক পরিস্থিতি বিচার করে শিল্পে শান্তি ও উৎপাদন বৃদ্ধি সম্পর্কে দৃঢ় পদক্ষেপ গ্রহণে সরকারের সঙ্গে একমত হতে পারেন নি।

মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু অভিজাল্টকে জরুরী অবস্থা ঘোষণার নামান্তর বলেছেন। তাঁর অভিযোগের বিচার জনসাধারণই করবেন। কমিউনিষ্ট রাষ্ট্রে কলকারখানায় শান্তি শৃংখলা রক্ষার ব্যবস্থাটি কেমন তা নিশ্চয়ই মুখ্যমন্ত্রীর জানা আছে। সেখানে কাজে ফাঁকি দেশদ্রোহিতা অপরাধের অন্তর্ভুক্ত এবং সে অপরাধের শাস্তি বেশ কঠোর। ধর্মঘট তো সেখানে অবৈধ। বিরোধীরা কিছুদিন থেকে কেন্দ্রীয় সরকারকে অপদস্থ করার উদ্দেশ্যে জোট বাঁধার ফিকিরে আছেন এবং দেশের অর্থ-নৈতিক সঙ্কটের সুযোগ নিয়ে দেশব্যাপী অত্যাবশ্যক সংস্থাসমূহে ধর্মঘট ডেকে একটা অচল অবস্থা সৃষ্টির তালে ছিলেন।

সরকার সেটা জেনে যথাপূর্বে প্রতিবিধান নিয়ে ফেলেছেন আর সেই জন্যই চক্রান্তকারীদের গাত্রদাহ হয়েছে। সংগঠিত সেকটরের কর্মীরা সে কথা না জানেন এমন নয়, দেশের অগণিত শ্রমজীবী মানুষের তুলনায় তাদের আয় উপার্জন অনেক ভাল। আশা করা যায়, জাতীয় স্বার্থের প্রতি লক্ষ্য রেখে কর্মীগণ সরকারের সহিত সহযোগিতা করবেন।

ধর্মঘটকে যুদ্ধের সঙ্গে তুলনা করা যায়। যুদ্ধের দ্বারা যেমন কোন সমস্যারই সমাধান হয় না, ধর্মঘটের পরিণামও প্রায় তাই। সরকারী সংস্থাগুলির ক্ষেত্রে এ সত্য অধিকতর প্রযোজ্য, কারণ সেখানে ব্যক্তিগত স্বার্থ বা মুনাফা শিকারের প্রশ্ন নেই। দেশ শ্রমিক অশান্তির পিছনে যে পরিচালন ব্যবস্থার ত্রুটি এবং দুর্নীতি একেবারে নেই একথা কিন্তু স্বীকার করা যায় না। এক্ষেত্রে সরকারকে অবশ্যই কঠোর হতে হবে এবং আগাছাগুলিকে অবিলম্বে শিকড় সমেত উপড়ে ফেলতে হবে।

আর একটা কথা. ট্রেড ইউনিয়নের নেতা, উপনেতা ও কর্মিরা হবেন সংশ্লিষ্ট ট্রেডের কর্মী, বাইরের লোক এসে সেখানে যাতে নেতাগিরি না করতে পারেন তার জন্য আইন করাও আবশ্যক।

(এর পর ৬ পৃঃ দেখুন)

সমীক্ষা ঃ অত্যাবশ্যক শিল্পে সাম্প্রতিক অর্ডিনেন্স

—মলয় ঘোষ

[পূর্বানুবৃত্তি : অত্যাবশ্যক শিল্প তথা, রেল, ডাক ও তার প্রতিরক্ষা, ব্যাংক, বিদ্যুৎ ও জল সরবরাহ প্রভৃতি ক্ষেত্রে ধর্মঘট নিষিদ্ধ করে কেন্দ্রীয় সরকার সম্প্রতি যে অর্ডিন্যান্স জারী করেছেন সেই 'এসমো'র বিরোধীতায় দেশের বিরোধী দলগুলি সোচ্চার হয়ে উঠেছেন। বিশেষত: সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে জনতা, ভারতীয় জনতা লোকদল ভারতীয় কমুনিষ্ট পার্টি প্রভৃতি এবং পশ্চিমবঙ্গে ক্ষমতাসীন বামফ্রন্ট তথা সি, পি, এম দল এই অর্ডিন্যান্সকে স্বৈরতন্ত্রী ও মিনি এমার্জেন্সী বলে অভিহিত করে এর সক্রিয় বিরোধীতায় নেমেছেন। এই পরিপ্রেক্ষীতে সামগ্রিক ভাবে সারা দেশের এবং বিশেষভাবে পশ্চিমবঙ্গের শিল্পোৎপাদন ক্ষেত্রের প্রকৃত অবস্থাটা কি তা প্রাসঙ্গিক ভাবে অনুধাবন যোগ্য]

পশ্চিমবঙ্গের শিল্পক্ষেত্র গত চার বছরে অত্যন্ত বন্ধ্যা ও মুমূর্ষ হয়ে পড়েছে এ সত্যটি ক্ষমতাসীন বামফ্রন্টের নেতৃবৃন্দও অস্বীকার করতে পারেন না। এই শিল্পের কথা বলতে গেলে প্রথমেই আসে বিদ্যুত উৎপাদনের বিষয়টি যেহেতু এর উপরেই অন্যান্য শিল্প প্রায় সার্বীকভাবে নির্ভরশীল। পশ্চিমবঙ্গের বিদ্যুত উৎপাদন কেন্দ্রগুলির মধ্যে সাঁওতালদি ও দুর্গাপুরের ডি. পি, এল উল্লেখযোগ্য এছাড়া আছে ব্যাণ্ডেলের তাপবিদ্যুত প্রকল্প। রাজ্যের বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর মুখ্যমন্ত্রী তথা বিদ্যুতমন্ত্রী ইস্যু প্রশ্নগুলি সম্পর্কে একাধিকবার তদন্ত ও দু একবার সরোজমীনে তদন্ত করেছিলেন, একটি কেন্দ্রের শক্তিশালী শ্রমিক ইউনিয়নকে দমন করার জন্য দলীয় পাল্টা ইউনিয়নকে জোরদার করা এবং সেকাজে বিশেষ পুলিশী ব্যবস্থাও নেওয়া হয়েছিল। বলা হয়েছিল পূর্ববর্তী ইউনিয়নটি উৎপাদনে বাধা সৃষ্টি করে তাই একে দমানো প্রয়োজন। কিন্তু উৎপাদন বাড়লো না এবং কমলো বহুল পরিমাণে। চরম দুর্নীতি, চুরি, দলবাজি এবং যথেচ্ছাচারের বলি হল সাঁওতালদি ও ডি, পি, এল।

নতুন ইউনিট বসানো হলো একাধিক, বিদেশ থেকে অত্যধিক ব্যয়ে গ্যাস টারবাইন আনা হলো অনেকগুলি—বিদ্যুৎ উৎপাদন যে তিমিরে ছিল, সেখানেই রইলো। একাধিক দৈনিক সংবাদপত্রে প্রকাশিত হল এই উৎপাদনহীনতার মূল কারণগুলি —অর্থাৎ কর্মীদের অসহযোগিতা, দুর্নীতি ও দল বাজির তথ্যপূর্ণ বিবরণ সরকার কোন ব্যবস্থাই নিতে পারলেন না।

রাজ্যের প্রেসশিল্প ছিল গোটা ভারতের মধ্যে সর্বাপেক্ষা অগ্রণী। বামফ্রন্টের অন্তর্ভুক্ত একটি দলের প্রেস-শ্রমিক ইউনিয়ন বিভিন্ন দাবী দাওয়ার ভিত্তিতে দীর্ঘদিন ধরে ধর্মঘট চালালেন। অসংখ্য ছোট প্রেস বন্ধ হয়ে গেল। বড়ো প্রেস অনেক এরাজ্যের বাইরে চলে গেল। মাঝারী প্রেসের পুঁজিতে পড়লো টান। কয়েককোটি টাকার অর্ডার, যা এ রাজ্যের প্রেসগুলি নিয়মিত পেতো, চলে গেলো অন্য

রাজ্যে। এ ধর্মঘটে শ্রমিকদের যে খুব একটা সুবিধা হলো তা বলা যায় না—মাঝখান থেকে অনেক প্রেস বন্ধ হয়ে যাওয়ায় এই শিল্পে কর্মসংস্থান বিশেষভাবে সংকুচিত হলো।

গত আঠার মাস ধরে বেলঘরিয়ার মোহিনী মিলস্ বন্ধ রয়েছে। কারখানার বেকার শ্রমিক কর্মচারীরা রাস্তা ঘাটে ভিক্ষা করছেন, মালিক অথবা সরকার পক্ষ, কারোরই তেমন উদ্যম নেই মিল খোলার ব্যাপারে। অথচ বাঙ্গালীর একটি অন্যতম প্রধান শিল্প প্রতিষ্ঠান ছিল এই মোহিনী মিলস্। বিরড়ার জয়শ্রী টেক্সটাইলস প্রায় চার পূর্ণ একের দুই মাস বন্ধ থাকার পর সম্প্রতি খুলেছে মাত্র, গত মাসে রাজ্যের পাঁচটি পাট ও সূতী কল বন্ধ হয়ে গেছে। খাস কলকাতার বুকে অত্যন্ত প্রাচীন স্পেনসেস হোটেল ধর্মঘটের ফলে একেবারে বন্ধ হয়ে গেছে। হোটেলের দামী বাবুর্চী আজ ফুটপাথে আলুরদমের দোকান করেছেন। বিজ কনটিনেন্টাল হোটেল দীর্ঘদিন ধরে বন্ধ। ক্যালকাটা ইঞ্জিনীয়ারিং কোম্পানীতে ধর্মঘট চলছে। ধর্মঘট চলছে বেঙ্গল এনামেলেও। এছাড়াও ছোটবড়ো অসংখ্য শিল্প শ্রমিক কর্মচারীর ধর্মঘটে বন্ধ হয়ে গেছে, হাজার হাজার মানুষ কর্মহীন, ভবিষ্যতহীন, সহায় সম্বলহীন জীবন যাপন করছেন।

ভারতবর্ষের অন্যান্য রাজ্যেও শ্রমিক অসন্তোষ, মানুষ ও শিল্পের অস্তিত্ব বিপন্ন করে তুলেছে। বাঙ্গালোরের রাষ্ট্রায়ত্ব শিল্পগুলিতে দীর্ঘদিনের শ্রমিক অসন্তোষ ও ধর্মঘটের বিবরণ আমরা সকলেই কাগজে পড়েছি। মহারাষ্ট্র, গুজরাট, অন্ধ্র, বিহার, উত্তরপ্রদেশ—ও অন্যান্য সকল রাজ্যেই শ্রমিক অসন্তোষের ফলে শিল্পোৎপাদন ব্যাহত হচ্ছে, যদিও পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে অবস্থা অত্যন্ত ভয়াবহ।

(৪ পৃঃ পর)

কেউ কেউ অর্ডিন্যান্সটি ঘোষণার পিছনে প্রধানমন্ত্রীর স্বৈরতান্ত্রিক চরিত্র খুঁজছেন। অর্ডিন্যান্সটি যখন অচিরে সংসদে বিপুল ভোটাধিক্যে সমর্থিত ও আইনে পরিণত হবে তখন এরা কি বলবেন। সংসদ যে সমগ্র দেশের প্রতিনিধিত্ব করে সে কথা এরা কি অস্বীকার করবেন? পুরাণো ছেঁদো গালিটা কি চেটে তুলতে তখন লজ্জাবোধ হবে না?

"রাজনীতির ঊর্ধ্বে রাজ্যপাল"

বংশীধর বন্দ্যোপাধ্যায়

ভারতীয় সংবিধান রচনাকালে তদানীন্তন গণ-পরিষদের সদস্যগণ গভীরভাবে চিন্তা করে স্থির করেছিলেন যে, ভারতের অন্তর্গত প্রতিটি অঙ্গ রাজ্যকে সুপরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত করার জন্য প্রতি রাজ্যে একজন করে কেন্দ্রীয় সরকারের দ্বারা নিযুক্ত প্রতিনিধি রাখা আবশ্যক। এই প্রতিনিধিই হচ্ছেন রাজ্যপাল।

যাঁর কাজ হচ্ছে সদা সর্ব্বদা দেখা যে, সংশ্লিষ্ট রাজ্যে যা কিছু নির্বাচিত শাসকদের দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে তা সংবিধান সম্মত কিনা এবং কেন্দ্রীয় সরকারের মূল নীতি ও কর্মপদ্ধতির বিরোধী কিনা। লোকসভায় গৃহীত ও রাষ্ট্রপতির সম্মতি প্রাপ্ত আইন গুলি সংশ্লিষ্ট রাজ্য ঠিক ঠিক ভাবে কার্য্যকরী হচ্ছে কিনা, তাও দেখার দায়িত্ব ঐ রাজ্যের রাজ্যপালের, যেহেতু রাজ্যপালই হচ্ছেন কেন্দ্রীয় সরকারের সংবিধানিক একমাত্র ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রতিনিধি যিনি কোন ব্যতিক্রম দেখলে কেন্দ্রে রিপোর্ট ও তাঁর অভিমত জানিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারকে ঐ রাজ্যের বাস্তব পরিস্থিতির অবগত করাতে দায়বদ্ধ। কেন্দ্রীয় সরকারের স্বরাষ্ট্র বিভাগের প্রশাসন যন্ত্রের এক বিশেষ শক্তিধর স্তম্ভ হচ্ছে বিভিন্ন অঙ্গ রাজ্যের রাজ্যপালগণ, কারণ কোন অঙ্গরাজ্য যদি কখনও পার্শ্ববর্তী প্রতিবেশী কোন বিদেশী রাষ্ট্রের সঙ্গে যোগ সাজসে ভারত রাষ্ট্র হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবার চক্রান্তে লিপ্ত হয় অথবা বিদ্রোহ করার ষড়যন্ত্রে জড়িত হয় বা অনুরূপ কিছু ভারত বিরোধী কার্য্যে মদৎ যোগায়, তখন ঐ ক্ষতিকর অবস্থার প্রতিরোধে কেন্দ্রীয় সরকারকে সজাগ ও সতর্ক করে দেবার দায় ও দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট রাজ্যের ঐ রাজ্যপালের

রাজ্যপালকে মোটা বেতনে ও অনেক সুযোগ সুবিধা দিয়ে নিয়োগ করার পিছনে কেন্দ্রীয় সরকারের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য হচ্ছে যে, জাতীয় সংহতি রক্ষা পারস্পরিক প্রীতি ও সম্প্রসারণ প্রশাসন যন্ত্রকে সুপরিচালিত রাখা।

রাজ্যপালই হবে কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রের যোগ্য প্রতিনিধি সংবিধান সম্মতভাবে। কোন রাজ্যে হঠাৎ নির্ব্বাচিত সরকারের পতন ঘটলে তখাকার রাজ্যপালই সেই অব্যবস্থার প্রতিবিধানে যথাযোগ্য ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

তাঁর দায় ও দায়িত্ব বহুবিধ। তাঁকে সদা সজাগ ও সতর্ক হয়ে কাজ চালাতে হবে কেন্দ্রীয় সরকারের গৃহীত নীতিগুলি রূপায়ণের ক্ষেত্রে। তাঁকে লক্ষ্য রাখতে হবে যাতে দেশে আইন শৃঙ্খলার অবস্থার কোনমতেই অবনতি না ঘটে, বৈদেশিক কোন প্রভাবের মাধ্যমে দেশে কোন অরাজকতার সৃষ্টি না হয় ও অনুরূপ জনহিতকর ভারত রাষ্ট্রের কল্যাণমূলক কাজগুলি যাতে সঠিক পথে অগ্রসর হয় তার আবহাওয়া তৈরী হচ্ছে কিনা।

তিনি ঐ রাজ্যের নিয়মতান্ত্রিক প্রধান হিসাবে সব সময়েই তাঁকে বলিষ্ঠ পদক্ষেপে আদর্শ স্থাপন করতে হবে যাতে জনগণ তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণে আকৃষ্ট হয়। সমস্ত রাজনীতির উর্দ্ধে থেকে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষভাবে রাজ্য শাসনে তাঁকে সহৃদয়তার সাথে সহযোগিতা করতে হবে সংবিধান সম্মত উপায়ে ঐ রাজ্য প্রশাসন তাঁর মূল্যবান উপদেশ লাভে বঞ্চিত না হয়।

রাজ্যের প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়ের তিনিই আচার্য, এক্ষেত্রে [illegible]

হতে হবে যাতে রাজ্যের শিক্ষা ব্যবস্থায় কোনরূপেই কোন বিশেষ রাজনীতির অনুপ্রবেশ না ঘটে। শিক্ষার ক্ষেত্রে রাজনীতির অনুপ্রবেশ ও প্রাধান্য মারাত্মক ক্ষতিকর বিধায় রাজ্যপালকেই এর বিরুদ্ধে যথাযোগ্য ব্যবস্থা গ্রহণ করতেই হবে, অন্যথায় শিক্ষা বিকৃত ও বিকল হবে।

রাজ্যের শিক্ষা ব্যবস্থাকে সকল রাজনীতির উর্দ্ধে স্থাপন করার প্রাথমিক দায় ও দায়িত্ব রাজ্যপালগণের, কারণ তাঁরাই যে আচার্য্য বা শিক্ষা নিয়ামক। সাধারণ প্রশাসনকেও রাজনীতি মুক্ত রাখার নৈতিক দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট রাজ্যপাল মহোদয়ের। রাজ্য প্রশাসন যন্ত্রকে দুর্নীতি মুক্ত রাখার জন্য রাজ্যপালকেই দৃঢ়তা অবলম্বন করতে হবে তাঁর মন্ত্রীসভাকে সদা সচেতন রেখে। রাজ্যপালের ভূমিকা বড় কঠিন দায়িত্বশীল। জনগণ মন্ত্রীসভার কাছে সুবিবেচনা বা সুবিচার না পেলে রাজ্যপালের দ্বারস্থ হবেই, তখন রাজ্যপালকে এ ব্যাপারে মন্ত্রীসভার সঙ্গে বসে আলোচনা করতে হবে এবং জনগণ যাতে ন্যায় বিচার পায় তার জন্য তাঁকেই অগ্রণী হতে হবে এরাজ্যের জনস্বার্থে।

এটা রাজ্যপালেরই করণীয় কাজ জনকল্যাণে। জনকল্যাণ রাষ্ট্রে রাজ্যপালগণকে এ দায় দায়িত্ব পালন করতেই হবে, অন্যথায় রাষ্ট্রের ভাবমূর্তি ম্লান হয়ে পড়বে রাজ্যবাসীর চোখে, আর গণতন্ত্র মূল্যহীন বোধ হবে সাধারণে।

এখন বিশ্লেষণ করে দেখা যাক পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল তাঁর মহান দায় দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে কতটা সফল হয়েছেন বা বিফলই বা হয়েছেন কতটা। তিনি রাজনীতির উর্দ্ধে থেকে কিভাবে তাঁর শাসনকালের প্রায় চার বছর উত্তীর্ণ হলেন বা করলেন। সর্বপ্রথমেই বামফ্রন্টের দ্বারা এরাজ্য শাসন ব্যতিত অন্য কিছুই নয়। এই রাজ্যশাসন ব্যবস্থা মানুষে মানুষে বৈষম্য সৃষ্টিতে সফল ও ঘৃণা এবং হিংসা সৃষ্টিতেও অদ্বিতীয়। রাজ্যপাল এই প্রতিকারহীন শাসন ব্যবস্থা ও তার সম্ভাব্য পরিণতি লক্ষ্য করে আসছেন শুরু থেকেই।

এরাজ্যের জনগণ, যার বৃহত্তম অংশ সি, পি, এম দলভুক্ত নয়, দারুণ দুর্ভোগ ভুগছেন বামফ্রন্টের পত্তন থেকেই। গ্রামে গঞ্জে, খেতে-খামারে কলে-কারখানায়, শহর-শহরতলিতে হাটে বাজারে, এক কথায় রাজ্যের সর্বত্র এক দারুণ সংঘর্ষের ভিতর দিয়ে মানুষ দায়ে পড়ে জীবন যাপনে বাধ্য হয়েছে এবং হচ্ছে সি, পি, এম দলের দৌরাত্ম্যের জ্বালায়। মারদাঙ্গা, খুন খারাপী, লুট তরাজ, ছিনতাই, নারী ধর্ষণ এরাজ্যে নিত্য নৈমিত্তিক ঘটনা, অন্ততঃ সংবাদ পত্র সেই সাক্ষ্যই বহন করে।

প্রাথমিক স্তর থেকে বিশ্ববিদ্যালয় স্তর পর্যন্ত শিক্ষাক্ষেত্রে সি, পি, এম রাজনীতির অনুপ্রবেশ ও দাপট দেখা গেছে, কারণ রাজ্যসরকার উদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়েই শিক্ষা ব্যবস্থার দলীয় রাজনীতির প্রাধান্য প্রতিষ্ঠায় দৃঢ়তার সাথে অগ্রসর হয়েছে। ট্রেড ইউনিয়ন ক্ষেত্রে এরাজ্যে সর্বত্র সিটু (C I T U) কে প্রাধান্য বিস্তারে সরকারই ছলে বলে ও কৌশলে সর্বপ্রকার সাহায্য ও সহযোগিতা দিয়েছে দলীয় পুষ্টি সাধনের উদ্দেশ্য নিয়ে অন্যান্য শরিকদলগুলিকে বঞ্চিত করে বামফ্রন্ট গ্রাম পঞ্চায়েতে ও পৌরসভাগুলিতে নিজদলের অর্থাৎ সি, পি, এম দলের একাধিপত্য স্থাপন করে কেবলমাত্র দলীয় ক্যাডারদের চাকরী দিয়েছে সর্বসাধারণকে সম্পূর্ণরূপে বঞ্চিত করে। কলে-কারখানায় ও খেতে-খামারে চরম অরাজকতা সৃষ্টি করে কেবলমাত্র দলীয় ক্যাডারদের সুযোগ-সুবিধা করে দিয়েছে, যাতে তারা নির্বিবাদে ঐ সব

এলাকায় রুজি রোজগারের রাস্তা খুঁজে পায় সেই উদ্দেশ্য নিয়ে।

পশ্চিমবঙ্গে যারা সি. পি. এম দলভুক্ত নয় তাদের রুজি রোজগারের পথ সম্পূর্ণ রুদ্ধ এই সরকারের কল্যাণে অন্তরীণ করে রেখেছে কার্যতঃ এবং তার বদলে দলীয় ক্যাডারদের দিয়ে পুলিসি কাজ চালাচ্ছে। ফলে জনগণ সদা সন্ত্রস্ত, ভীত ও কিং কর্তব্য বিমূঢ় অবস্থায় দিন যাপনে বাধ্য হচ্ছে। তবুও মাঝে মাঝেই তারা খুন হচ্ছে অকারণ। সি, পি, এম দলের লোকেরাই এখন প্রশাসন যন্ত্র চালাচ্ছে যা নিয়ম বহির্ভূত, অগণতান্ত্রিক ও সংবিধান বিরোধী। এতৎ সত্ত্বেও রাজ্যপাল সংবিধানের রক্ষক হয়েও এ রাজ্যের আভ্যন্তরীণ দুরবস্থার সংবাদ কেন্দ্রীয় সরকারকে এতকাল ধরে দেন নি কেন? এই প্রশ্নই আজ এ রাজ্যের জনমনে আন্দোলন সৃষ্টি করেছে তা কি রাজ্যপাল জানেন না?

প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী প্রফুল্লচন্দ্র সেন রাজ্যপালের ব্যক্তিগত পুরাতন বন্ধু হয়েও রাজ্যপালের কাছে অরাজকতা দূরীকরণের ও আইন শৃঙ্খলা সংরক্ষণের কোন আশা বা আশ্বাস পান নি কেন? অন্তে পরে কা কথা রাজ্যপাল বামফ্রন্টের ভয়ে এত ভীত বলে তো মোটেই মনে হয় না। তা যদি হতো তবে তিনি নিশ্চয় সি, পি, এম.দলের লোকসভা সদস্য জ্যোতির্ময় বসুর সঙ্গে গোপন পরামর্শ করার কথা চিন্তা করতে পারতেন কি? তিনি প্রফুল্ল ঘোষ বা প্রফুল্ল সেনের পরিবর্তে কমিউনিষ্ট জ্যোতির্ময় বসুকে এত আপনজন ও তাঁর রক্ষা কর্তা বা হিতাকাঙ্খী হিসাবে বিশ্বাস স্থাপন করলেন কি ভাবে?

রাজ্যপাল অতীতে একজন নিষ্ঠাবান কংগ্রেস কর্মী, নেতা ও প্রশাসক হিসাবে তাঁর যোগ্যতার স্বাক্ষর রেখে এসেছেন। তিনি কোন দুর্বুদ্ধিতে বা কার কুপরামর্শে রাজ্যপালের উচ্চাসন থেকে হঠাৎ নিম্নগামী হতে সচেষ্ট হলেন রাজনীতির ঘুর্ণাবর্তে নেমে পড়ার জন্য? কিসের মোহে মানুষ নিজেকে এভাবে হারিয়ে ফেলে? তাঁর ঐতিহ্যময় সম্মান অর্জনকে তিনি কি কারণে এরূপ বিসর্জন দিলেন? কি এর আসল কারণ? বড়ই কৌতূহলের সৃষ্টিকারী এই ঘটনা। জ্যোতি বসুই বা রাজ্যপালের এত প্রিয়জন হলেন কবে থেকে? কমিউনিস্টদের স্বরূপ যে কি ভয়ঙ্করতা কি তিনি জানেন না? তবে কেন এই হঠাৎ বিকার গ্রস্তের রাজ্যপাল মহোদয়ের! তিনি অসামান্য ব্যক্তিত্বের অধিকারী হয়েও কেন যে এমন এক ভুল পিচ্ছিল পথে পা বাড়ালেন তা সত্যই বিস্ময়কর।

তাঁর এই সামান্য ব্যাপারে এত নীতিহীনতা কেন তিনি নিজে কি নিজের সঙ্গে যুক্তিতর্ক দিয়ে বুঝতে পারতেন না যে, কি তাঁর করণীয় এবং কি তাঁর অকর্তব্য? নিশ্চয় সে শক্তি তাঁর ছিল। তবু এমনটা ঘটে কেন? নিশ্চয় তা তাঁর সাময়িক মতিভ্রম। উক্ত পিচ্ছিল পদক্ষেপ রাজ্যপালের মর্যাদার পক্ষে গ্লানিকর।

জ্যোতিবসু ও জ্যোতির্ময় বসু রাজ্যপালের যখন এত সুন্দর আপনজন, তখন তাঁরা কেন রাজ্যপালের মানরক্ষার খাতিরে অন্ততঃ শিক্ষাক্ষেত্রে দলীয় প্রাধান্য বিস্তারের জন্য এরূপ নগ্নভাবে অগ্রসর হওয়া বন্ধ করলেন না? মনে হয় রাজ্যপাল যাদের বিশ্বাসী ভেবে আপোষে বা আত্মনিবেদনে প্রস্তুত হয়েছিলেন তারা আসলে বিশ্বাসী নয়, বরং রাজ্যপালের হাতে তামাক খেয়েই তারা উধাও হতে বেশী ব্যস্ত কারণ তাতেই তারা অভ্যস্ত চিরদিন। কমিউনিস্ট নীতি যে কেবল অপরের শ্রেষ্ঠত্বটুকু শুষে নেয় প্রতিদানে

কোনদিনই কিছু হেয় না তা-কি রাজ্যপালের জানা ছিল না?

তাদের ভূলাবোধ অন্য ধরনের, যে ধরণের সঙ্গে ওঁর ও সম্ভ রাজ্যপালের পরিচয় পূর্বেও ছিল না এবং আজও নেই। সেই জন্যই উক্ত অভাবনীয় ব্যাপার সংঘটিত হলো, যা সত্যই দুর্ভাগ্যজনক। সাংবিধানিক প্রথানুযায়ী যে মহান কর্তব্য ও বিরাট দায়িত্ব রাষ্ট্রপতি এ রাজ্যের রাজ্যপালের উপরে ন্যস্ত ছিল তা সঠিক ভাবে পালনে তিনি ব্যর্থ হয়েছেন একদিকে, অপর-দিকে তিনি স্বেচ্ছায় সি. পি. এম দলের ক্রীড়নকে পরিণত হয়েছেন উক্ত ভুল আচরণের কারণে, যা এ রাজ্যের অ-কমিউনিস্ট বুদ্ধিজীবিরা ও সর্বস্তরের শিক্ষক সম্প্রদায় অত্যন্ত ব্যথিত হৃদয়ে উপলব্ধি করেছেন।

এরাজ্যের প্রশাসনিক ব্যর্থতাকে তিনিই প্রশ্রয় দিয়ে চলেছেন বিগত চারি বৎসর কাল ধরে কোন স্বার্থে তা তিনিই কি জানেন! তাঁর কার্যকলাপ যে রাজনীতি নিরপেক্ষ ছিল তা তিনি প্রমাণ করতে ব্যর্থ হয়েছেন। তাঁর নিয়োগের সর্তগুলিও তিনি পালন করেন নি, কি মোহে তা তিনিই জানেন। কেন্দ্রীয় সরকারের স্বরাষ্ট্র বিভাগকে তিনি কোনও দিনই এ রাজ্যের বাস্তব ও হতাশাব্যঞ্জক চিত্রের আভাস দেন নি, যা তাঁর অবশ্য কর্তব্য ছিল। কর্তব্যকর্মে এই চরম গাফিলতি রাজ্যপাল যদি না করতেন, তবে রাজ্যের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, শিল্প বাণিজ্য, পৌর পরি-চালনা পঞ্চায়েতী খরচ ও শাসন, সাধারণ প্রশাসন, পুলিশ প্রশাসন প্রভৃতি ব্যবস্থা এত অধিক পরিমাণে নিম্নগামী নিশ্চয় হতো না।

কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্যপাল মারফৎ এরাজ্যের বাস্তব ভয়াবহ অবস্থা পূর্বাহ্নে জানতে পারলে এর একটা ন্যায় সঙ্গত প্রতিকার সম্ভব হতো বহু পূর্বেই। রাজ্যপালের অদূরদর্শিতা, কর্তব্যকর্মে অবহেলা ও পক্ষপাতিত্বমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ বা ন্যায় সঙ্গত ক্ষেত্রেও নিশ্চল ও নিশ্চুপ থাকা এরাজ্যের আর্থিক, সামা-জিক ও বিভিন্ন বৈষয়িক ক্ষেত্রে মারাত্মক ক্ষয়ক্ষতিকে প্রশ্রয় দিয়েছে, যা অপূরণীয়। উক্ত সব ঘটনা রাজ্যপালের জ্ঞাতসারেই ঘটেছে, অথচ তিনি নীরব দর্শকের ভূমিকা নিয়ে সন্তুষ্ট ছিলেন কেন? প্রজ্ঞের প্রফুল্ল সেন তাঁকে বারে বারে সজাগ ও সতর্ক করে দেওয়া সত্বেও তিনি ক্ষমার মোহে বুঁদ হয়ে রইলেন সুদীর্ঘকাল, আর সেই তাঁর কৃত অন্যায়ের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার ভদ্রভাবে তাঁকে পশ্চিমবঙ্গ থেকে সরাতে চাইলেন, অমনি তিনি তাঁর কংগ্রেসী স্বরূপ পাল্টে সি, পি, এম দলের কাছে নতজানু হয়ে অপন দুষ্টচ্ছ পদ ও প্রতিপত্তি বাঁচাবার আশায় পরামর্শ ভিক্ষা করতে জ্যোতিবসু ও জ্যোতির্ময় বসুর দ্বারস্থ হলেন।

ধিক্ তাঁর উচ্চপদে, ধিক্ তার ক্ষমতার মোহে। এখন তিনি পশ্চিমবঙ্গ হতে চির বিদায় গ্রহণ করুন। তাঁর আর এরাজ্যে স্থান নেই, নিজ স্বরূপ করুন রোধে।

ঝাড়খণ্ড আন্দোলন

—সমীক্ষক

পশ্চিমবঙ্গের মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, উড়িষ্যার ময়ূরভঞ্জ, কেওনঝড়, সুন্দরগড় ও সম্বলপুর, মধ্য প্রদেশের রায়গড় ও সারগাজা এবং বিহারের সিংভূম, রাঁচি, গিরিডি, হাজারিবাগ, ধানবাদ, পালামৌ ও সাঁওতাল পরগনা—এই ১৬টি জেলা নিয়ে একটি পৃথক ঝাড়খণ্ড রাজ্য গড়ার আন্দোলন করছেন আদিবাসিগণ। 'ঝাড়' আদিবাসীদের অপর নাম।

উপরোক্ত ১৬টি জেলার লোকসংখ্যা তিন কোটি সাতচল্লিশ লক্ষ। সংশ্লিষ্ট অঞ্চলে সাঁওতাল, লোধা, মাহাত, কুরমি, মুণ্ডা প্রভৃতি আদিবাসীদের বসতি দেশের অন্যান্য অংশ থেকে বেশ হলেও, ১৬টি জেলার কোনটিতেই আদিবাসীগণ সংখ্যাগরিষ্ঠ নন এবং তাঁরা ১৬টি জেলার মোট জনসংখ্যার শতকরা ৩৪ ভাগ মাত্র। সংখ্যাগরিষ্ঠ না হলেও প্রস্তাবিত রাজ্যের লোক সংখ্যার ভিত্তিতে আদিবাসীরা অধিকতর প্রতিনিধিত্ব পাবেন বলে আশা করেন, যার ফলে তাঁরা মনে করেন যে তাদের সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্য সুরক্ষিত হবে এবং আর্থিক বিকাশ ত্বরান্বিত হবে।

আদিবাসীগণ যে আর্থিক ও শিক্ষাক্ষেত্রে পশ্চাদপদ সে কথা সর্বজন স্বীকৃত। তাদের এই ব্যর্থতার কারণ সামাজিক অবহেলা যতটা, তার চেয়ে বেশি হল তাদের আদিম সংস্কার প্রীতি এবং গভীর স্বাতন্ত্র্য বোধ। নতুবা তাদের বহুকোটি অগোত্রীয়দের তুলনায় তাদের হাজার হাজার বছরে নিঃসন্দেহে ভারতীয় মূল সমাজ-জীবন প্রবাহে মিলে মিশে এক হয়ে যেতেন।

ঝাড়খণ্ডীরাও সকলে এক সম্প্রদায়ভুক্ত নন, তাদের মধ্যে বহুগোষ্ঠী, বহু ভাষাভাষী এবং বিভিন্ন আচার-আচরণ পন্থী আছেন। এক গোষ্ঠীর সহিত অন্য গোষ্ঠীর অমিল বেশ গভীর এবং প্রায় অনতিক্রম্য। সমাজের অপেক্ষাকৃত উন্নত অধিবাসীদের তুলনায় ঝাড়খণ্ডীরা দরিদ্র ও বঞ্চিত এই নির্মম অভিজ্ঞতার পরিপ্রেক্ষিতে তাঁরা এক। সে কারণে আদিবাসী সমস্যা মূলত রাজনৈতিক। এ ব্যাপারে আসাম আন্দোলনের সহিত ঝাড়খণ্ড আন্দোলনের মিল আছে।

স্বাধীনতা পরবর্তী ভারতে একদিকে যেমন চলেছে শিল্প-বিপ্লব অন্যদিকে সমাজ স্তরের দ্রুত রূপান্তর। মুসলমান ও ইংরাজ আমলের বৈদেশিক ও বিধর্মী শাসন ভারতীয় সমাজকে নিষ্প্রাণ স্থিতাবস্থায় রাখতে বাধ্য করেছিল। বর্তমানে সমাজ বন্ধনমুক্ত এবং সে তার স্বাভাবিক প্রাণশক্তিতে ভাঙা গড়া ও বিক্ষোভ মিলনের পথে সমন্বয় ক্ষেত্র প্রস্তুত করছে। স্বাধীন ভারতে কেউই পিছনে পড়ে থাকতে চাইছেন না। আদিবাসী আন্দোলন, তপশিলী আন্দোলন, হরিজন বিদ্রোহ প্রভৃতি ঘটনাগুলিকে স্বতন্ত্রভাবে না দেখে, নব লব্ধ আত্মোৎকর্ষ চেতনার বিভিন্ন প্রকাশ মনে করা সঙ্গত এবং তার প্রতিকার হল অবহেলিত অঞ্চলের দ্রুত আর্থিক উন্নয়ন, অনগ্রসর মানুষের দ্রুত অগ্রগতি।

সুতরাং ঝাড়খণ্ডীদের আন্দোলনের পিছনে যে কোন সারবত্তা নেই একথা বলা চলে না, তবে তাঁদের দাবিমত আলাদা রাজ্য গড়লে আদিবাসী অনুন্নতদের সমস্যার সুরাহা হবে তেমন সত্য দৃষ্টান্ত কিছু তার পিছনে দেখা যায় না। স্বাধীন ভারতে [illegible]

হরিজনদের মধ্যে অনেক ব্যক্তি সরকারী বিশেষ সুবিধার মই বেয়ে উপরে উঠেছেন কিন্তু ঝাড়খণ্ড আন্দোলনকারীরা কি বলতে পারেন সেই সব উপর তলার ওঠাদের মধ্যে কয়জন নিচের মাটির কথা মনে রেখেছেন? এদের মধ্যে কিছু আবার বর্ণহিন্দু মেয়ে ঘরে এনে আপন গোষ্ঠি থেকে বিচ্ছিন্ন হতেও কুণ্ঠিত হন নি। তাদের কাজ নিন্দনীয় নয়, এই ভাবেই সমাজ সমন্বয় ঘটে। তবে তাদের চরিত্র কি বিচার্য নয়? ঝাড়খণ্ডীরা যদি ভেবে থাকেন, নতুন একটি ঝাড়খণ্ড রাজ্যে তাদের দু চারজন অতিরিক্ত মন্ত্রী থাকলেই অনুন্নত সম্প্রদায়ের সব দুঃখ দূর হবে তাহলে বলতে হয় তারা ভ্রান্ত ও বিপথগামী।

তারপর, যে ১৬টি রাজ্য নিয়ে ঝাড়খণ্ড রাজ্য গঠনের দাবি উঠেছে সেখানকার সংখ্যাগরিষ্ঠ বিশাল অ-আদিবাসীদের যদি এই দাবি সমর্থন না করেন তাহলে ঝাড়খণ্ড রাজ্য কি করে বাস্তবায়িত হবে? মনে হয়, এ চিন্তা ঝাড়খণ্ড নেতাদের মনেও উঠেছে এবং সে কারণে তারা সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের সকল শ্রেণীর অনগ্রসর মানুষকে ঝাড়খণ্ড আন্দোলনের সামিল করতে আসরে নেমেছেন।

ঝাড়খণ্ড পার্টি সম্প্রতি একটি নতুন দাবি তুলেছেন। দাবিতে চমক ও কৌতুক দুইই আছে। তারা বলেছেন—'একই বাড়ীতে স্বামী-স্ত্রীর এক সঙ্গে চাকুরি করা চলবে না। যে দেশে লক্ষ লক্ষ লোক বেকার সেই দেশে স্বামী ও স্ত্রী চাকুরি করে অনেক চাকুরি আবদ্ধ করে রেখেছে। যদি বেশী জমি রাখা অন্যায় ও বে-আইনি হয় তবে প্রয়োজনের বেশি চাকুরি একই পরিবারে ভোগ করাও অন্যায় বে-আইনী। এসব ক্ষেত্রে বাড়তি জমি খাস করার মত স্ত্রীর চাকুরি খাস করে সেই চাকুরি যে পরিবারে কেউ চাকুরি পায় নি অথচ যোগ্য লোক আছে, তাকেই দিতে হবে। ১৯৮২ সালে পার্টি চাকুরি খাস আন্দোলন শুরু করবে। গ্রামে গ্রামে এর জন্য ক্ষেত্র প্রস্তুত হচ্ছে।

স্ত্রীলোকের চাকুরিতে এদের অমত নেই তবে বিবাহের পরেই স্ত্রীর চাকুরি খাস করে নিয়ে অন্যকে দিতে হবে। ঝাড়খণ্ড আন্দোলন নেতারা বলেন, বড় চাকুরিয়াদের স্ত্রীরাই বেশি চাকুরি পান। চাকুরি তাদের সংসার চালানোর জন্য আবশ্যক নয়। সময় কাটানো ও বিলাসিতার খরচ যোগানোর উদ্দেশ্য এই চাকুরি করা।'

চাকুরি খাসের দাবির পিছনে কিছু যুক্তি যে আছে তা অস্বীকার করা যায় না।

এক বছর আগে বামফ্রন্ট সরকার বীরভূম জেলার গণপুরে সাঁওতাল বিদ্রোহের স্মরণ উৎসব করেছিলেন। সরকারী তহবিল থেকে কয়েক লক্ষ টাকা খরচ করে, শত শত গ্যালন পেট্রল পুড়িয়ে, দূর দূরান্তর থেকে বাসে ট্রাকে লোক জড়ো করে, যে আদিবাসী সমাবেশ ও বিপ্লবের নয়া রং বাহার দেখানো হয়েছিল, তাতে সিধু-কানুর জয়গানের সঙ্গে হাল আমলের জবর দখল ভাগচাষী গদাই লস্কর ও গুণবিধি কানুনগোর হাত মিলে তৈরী অপারেশন বর্গার বিপ্লবী নকশা জুড়ে দেওয়া যতটা সম্ভব না হোক ঝাড়খণ্ডীদের আদিম স্বাতন্ত্র্যবোধকে চেতিয়ে তোলা সম্ভব হয়েছিল নিঃসন্দেহে। স্বাতন্ত্র্যবোধই যে বিচ্ছিন্নতাবাদের জনক সে কথা কি সরকার অস্বীকার করতে পারেন?

খৃস্টান মিশনারীও শিক্ষাদান, আর্থিক সহায়তাদান এবং দীক্ষাদানের মাধ্যমে বিচ্ছিন্নতাবাদে উৎসাহ দেন। এই ত্রিবিধ মহৎ মানবিক কর্মসাধনের পিছনে ছিল একদা ব্রিটিশ শাসকবর্গের ভারতীয় এক জাতীয়তাবোধের [illegible] শক্তি হানির চক্রান্ত।

এখন মিশনারীরা সেই কাজ করেন আন্তর্জাতিক কৃশ্চান সংস্থার পোষকতায়। আগে ছিল তাদের ভারতীয় সংস্কৃতি বিরোধিতা প্রত্যক্ষ এখন তা পরোক্ষ। যে দেশ দরিদ্র এবং যে দেশে রাষ্ট্রধর্ম (State religion) বলে কিছু নেই, সেখানে পয়সাছাড়া টাকার জোরে বাড়বাড়ন্ত হবে তাতে বিস্ময়ের কিছু নেই।

বামফ্রন্ট সরকার নিজেকে একনিষ্ঠ মেহনতী দরিদ্র বান্ধব বলে থাকেন, আদিবাসীদেরও সরকার পরম হিতৈষী বলে প্রচার করেন, কিন্তু গত চার বছরে আদিবাসীদের উন্নতি সাধনে বীরভূম, বাঁকুড়া পুরুলিয়া, ঝাড়গ্রামে কোন উল্লেখযোগ্য প্রকল্প সরকার রূপায়িত করেছেন কি? করেন নি সরকার তেমন কিছু। সে জন্যই ঝাড়খণ্ড নেতারা বলেন, 'কমিউনিস্ট দলগুলি শোষণের বিরুদ্ধে লড়াই-এর কথা বলে থাকে কিন্তু আজ তারা নিজেরাই শোষক শ্রেণীতে পরিণত হয়েছে। ঝাড়খণ্ড পার্টির নেতা জয়রাম মানডি এবং মনোরঞ্জন মাহাতোর মতে, রাজ্যের বামফ্রন্ট সরকার প্রকৃত শোষিত মানুষদের নেতৃত্ব দিতে ব্যর্থ হয়েছে। গাঁয়ে যাদের দু পাঁচ বিঘা জমি আছে তার উপর বর্গা বসেছে কিন্তু কোন সি, পি, এম নেতার পঞ্চাশ বিঘা জমি থাকলেও বর্গা বসছে না।

তাঁদের অভিযোগ—সি, সি. এম সরকার জমি নিয়ে গ্রামের মানুষের মধ্যে, আত্মীয়দের মধ্যে এমন কি পরিবারের মধ্যেও বিবাদ লাগিয়ে পারস্পরিক সম্পর্ককে বিষিয়ে দিয়ে গ্রাম্য জীবনের ঐক্য ধ্বংস করছে। যা চাষী সম্প্রদায়ের অর্থনীতির উপর আঘাত হেনেছে।

চাকুরি কুক্ষিগত করার ক্ষেত্রে কোন আন্দোলন হয় না, ব্যবসার ক্ষেত্রে কোন আন্দোলন হয় না, বড় বড় পুঁজিপতিদের বিরুদ্ধে আন্দোলন হয় না—যত আন্দোলন দু-পাঁচ বিঘা জমির মালিকের বিরুদ্ধে ক্ষেত-মজুর ক্ষেপিয়ে দিয়ে।

ঝাড়খণ্ড পার্টির দাবি জমির সিলিং-এর মত শহর সম্পত্তি, চাকুরি ও ব্যবসায়েরও সিলিং হওয়া দরকার। অপারেশন বর্গার মত বাস, ট্রাক ও ব্যবসায়ের বর্গা হওয়া উচিত। লাঙ্গল যে চালায় সে যদি জমির মালিক হয়, তাহলে যে বাস ট্রাক মেশিন চালায় সে মালিক হবে না কেন?

ঝাড়খণ্ডীদের নিজ অধিকার সম্বন্ধে সচেতন করতে গ্রামাঞ্চলে জন সমাবেশ ও মিছিল করে এবং প্রচার পুস্তিকা ছড়িয়ে জনমত সংগ্রহের চেষ্টা চলছে। প্রস্তাবিত ঝাড়খণ্ডের লোকেরা প্রধানত কৃষি নির্ভর এখানকার কৃষিভূমি বন্ধুর ও অনুর্বর, অথচ এই বিস্তীর্ণ অঞ্চলে কৃষি উন্নয়নের ভাল ব্যবস্থা করা হয়নি। এই অঞ্চলের খনিজ ও বনজ সম্পদ আহরণ করে পুষ্ট করা হচ্ছে তিন রাজ্যের মানুষদের।

কয়লা খনি, নদী উপত্যকা পরিকল্পনা ও অপর নানা শিল্প স্থাপনের প্রয়োজনে বহু আদিবাসী বাস্তুচ্যুত হয়েছেন কিন্তু এই সব অর্থকরী থেকে আদিবাসীরা বিশেষ উপকৃত হন নি। অন্যদিকে প্রচুর বহিরাগতের আগমনের ফলে আদিবাসীদের নিজস্ব সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যগত অধিকার হারাবার ভয় দেখা দিয়েছে।

এ সব অভিযোগ সম্পূর্ণ সত্য নয়। চাকুরির ক্ষেত্রে বাস্তুচ্যুতদের অগ্রাধিকার আছে। বহিরাগতরা সংখ্যায় বড় নয়, তারা থাকেন শিল্প প্রকল্পের আশে পাশে, তাদের দ্বারা আদিবাসীদের সংস্কৃতি বিপন্ন হবার কথা নয়। আর ঐতিহ্য সংস্কৃতি বলতে কম বেশি সকল ভারতবাসীই তো এক ভারতীয় সভ্যতা

New Delhi-110 003, the 28th April '81

A non-Official Advisory Committee of advise the Ministry of Home Affairs on matters pertaining to implementation of the swatantrate Sainik Samman Pension Scheme has been set up by the Government of India. The Committee will advise the Ministry of Home Affairs on the procedures and guidelines to be adopted for identification of genuine freedom fighters and sanction of pension to those eligible among them, and detection of pretentious freedom fighters and other persons ineligible for grant of freedom fighters pension under the provisions of the Swatantred Sainik Samman Pension Scheme and other related matters The Commttee will consists of :

1. Minister of Home Affairs — Chirman
2. Minister of state in the Ministry of Home Affairs (P) — Member
3. Minister of State in the Ministry of Home Affaire (H)
4. Shri N. G. Ranga MP
5. Shri Kamlapati Tripathi MP
6. Shri Rabindra Nath Kakti MP
7. Shri Ramavatar Shastri MP
8. Shri Ibrahim Kalaniya MP
9. Shri P. C. Sen former Chief of Minister West Bengal
10. Shri Shah Nawaz Khan, Ex-INA

Shri Sheel Bhandra Vajee (ex-MP) ,,

2. The Committee will hold its meeting at Delhi and any other place in India as may be found convenient by it.

3. The Members of Parliament in the above mentioned Committee will draw TA/DA on the same scale as is admissible under the Salaries and Allowances of Members of Parliament Act. Non-Official Members will draw TA/DA on the same scale as admissible to Gr. I Officers of the highest grade.

Sd/-R. M. Agrawal
Joint Secretary (F)

রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্র নাথের স্মৃতি কথা

["A Nation In Making" গ্রন্থ থেকে অনুবাদ]

অনুবাদক—অধ্যাপক নলিনীমোহন দাশগুপ্ত

দ্বৈত শাসন

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

ইতিমধ্যেই তা বাংলা ও মধ্য প্রদেশে দেখা দিয়েছে। 'এই প্রসঙ্গে কানপুর ষড়যন্ত্র মামলার এক-জন বিপ্লবীর এক পত্র থেকে কয়েকটি লাইন উদ্ধৃত করা বোধহয় অসঙ্গত হবে না। পত্রে লেখা আছে 'বৈপ্লবিক দৃষ্টিভঙ্গী সম্পন্ন কোন পার্টি ছাড়া কাউ-ন্সিল ভাঙ্গার কৌশল সাফল্যের সঙ্গে পরিচালনা করা যায় না।

তাই দেখা যাচ্ছে, বিপ্লবী লেখকের মতে বিপ্লব ও কাউন্সিল ভাঙ্গার কাজ এক সংগেই হয়ে থাকে।

ডায়ার্কির উপর এই আঘাতে একটা জিনিষ বুঝা যাচ্ছে। তা হল এই যে, যে মূল সর্তের উপর শাসন সংস্কার পরিকল্পনায় ডায়ার্কি স্থান পেয়েছে, সেই মূল সর্তকেই উপেক্ষা করা হচ্ছে। ডায়ার্কিতে কেউ উৎফুল্ল নয়, এমন কি যারা ডায়ার্কি সমর্থন করেন তারাও নন। অনেকে তো আবার সন্দেহ প্রকাশ করেছেন, উহা সফল হবে কিনা। বড়জোর এটাকে একটা বড় রকমের পরীক্ষামূলক সূচনা হিসাবে প্রথম ধাপ বলে মনে করা যেতে পারে। জয়েন্ট পার্লিয়ামেন্টারী কমিটির নিকট সাক্ষ্যদান-কালে আমি বলেছিলাম : 'আমরা (আমি এখানে ন্যাশনাল লিবারেল কেডারেশনের পক্ষে সাক্ষ্য দিচ্ছি-লাম) ডায়ার্কি সমর্থন করছি। তবে তার কারণ এই নয় যে এটা একটা আদর্শ পদ্ধতি। আমরা সমর্থন করছি এই জন্য যে মনে হচ্ছে যে এটাই ১৯১৭ সালের ২০শে আগষ্টের ঘোষনাবলীকে রূপা-য়িত করার একমাত্র সম্ভাব্য পদ্ধতি। তাতেই পরিবর্তনশীল সরকারের ব্যবস্থা এতে আছে, আর ক্রমবিকাশের ধাপগুলির ব্যবস্থা করে এটা ক্রমবিক-শীল শাসন ব্যবস্থাকে আমাদের দৃষ্টি পথের মধ্যে এনে দিয়েছে। এই জন্যই আমরা উহা সমর্থন করছি।'

আমি দেখতে পাচ্ছি, ডায়ার্কির উপর বর্তমানে যে আক্রমণ চলছে তাতে কয়েকজন প্রাক্তনমন্ত্রী এবং কয়েকজন বিশিষ্ট উদার নৈতিক ও নরমপন্থী নেতাও যোগদান করেছেন। তাদের সঙ্গে মত বিরোধ থাকতে পারে।

কিন্তু তাদের উদ্দেশ্য সম্পর্কে কোন অভিসন্ধি আরোপ করা চলে না। প্রথমে তারা ডায়ার্কিকে সমর্থন করেছিলেন, পরে তারা বিরোধিতা করেন। তবে স্বরাজিষ্টরা যে কারণে বিরোধিতা করছেন, তারা সে কারণে করেন নি। তাদের বিরোধিতার কারণ ভিন্ন ধরণের, স্বরাজিস্টরা চান শাসন সংস্কারকে নস্যাৎ করতে এবং সে চেষ্টায় তারা হিতাহিত বিবেচনাহীন পন্থা গ্রহণে কুণ্ঠীত নন। প্রাক্তন ভারত সচিব লর্ড অলিভিয়ার তার নিজের সরকারী পদ মর্য্যাদার সংযম থাকা সত্বেও তাদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র ঘুষ নেওয়া ও দুর্নীতির অভিযোগ করতে বাধা হয়েছিলেন। স্বরাজিস্টদলের সংগঠনকে আমরা যতই তারিফ করি না কেন, তাদের কৌশলকে অবশ্যই সর্বান্তকরণে নিন্দা করতে হবে এবং তাদের দলীয় রাজনৈতিক ভিত্তির ও অকপটতার দাবীকে সন্দেহের

সহিত বিচার বিবেচনা করে বিশ্লেষণ করা দরকার।

১৯২৩ সালে বেঙ্গল লেজিস্লেটিভ কাউন্সিলে যখন মন্ত্রীদের বেতন সম্পর্কীয় প্রশ্নটি বিবেচনার জন্য উত্থাপিত হয়, তখন একটি কাণ্ড ঘটে। একজন সন্তস্ত মন্ত্রীদের পক্ষে ভোট দিতে পারেন, এই মনে করে একদল স্বরাজিস্ট তাকে তার বাড়ীতে আটক করে রাখে এবং বিক্ষোভ প্রদর্শন করে তাকে সভায় অনুপস্থিত থাকতে বাধ্য করে। সংবাদপত্রগুলি খবর ছাপাল যে তাকে টাকা দিয়ে ভোটদানে বিরত থাকতে বাধ্য করা হয়। টাকার অঙ্ক সম্পর্কেও বিশদ বিবরণ ছাপা হয়। স্বরাজিস্টদের জুলুমবাজি বাংলার নৈতিক জীবনকে নষ্ট করে ফেলেছে। অতীত দিনের পবিত্রতা, নীতিবোধ আর নেই। ছল-বলই এখন রাষ্ট্রীয় সমস্যাগুলির সমাধানে প্রধান ভূমিকা নিচ্ছে।

তাহলে ডায়ার্কি কি এমন নৈরাশ্যজনকভাবে অকার্যকর হয়ে পড়েছে যে নির্দিষ্ট সময় সীমার মধ্যে যে কটা দিন এখন বাকী আছে তার মধ্যে তার কোন সংশোধন বা উন্নতির বিশেষ আশা নেই, সুতরাং উহা অবিলম্বে পরিত্যাগ করতে হবে অথবা উহা এমন পরিপূর্ণভাবে সাফল্যলাভ করেছে যে ধাপে ধাপে ভূমিকতর দায়িত্বশীল শাসন সংস্কার প্রবর্তনের জন্য যে পরীক্ষা নিরীক্ষার ব্যবস্থা করা হয়েছে, তার আর প্রয়োজন নেই?

দ্বিতীয় প্রশ্নটি আদৌ ওঠে নি। অকার্যকর হওয়ার প্রশ্নটিই উঠেছে। ডায়ার্কিকে আক্রমণ করার কারণ সম্পর্কে বলা হয়ে থাকে যে এই পদ্ধতির মূলেই রয়েছে অনেক ত্রুটি যার জন্য এটি সফল হতে পারেনি, একেবারে আশাহীনভাবে বিফল হয়েছে। এই অভিমতটির পর্যালোচনা প্রয়োজন। আমার মত হল বাংলাদেশে ডায়ার্কি বিফল হয়নি। উহা আরও সফল হত যদি অর্থ সংস্থান বিষয়ে কঠোর বিধি বিধান না থাকত এবং যদি অর্থ বিভাগের বিমাতৃসুলভ আচরণের ফলে উহা বাধাপ্রাপ্ত না হত মেইনী বন্দোবস্ত এবং অর্থ বিভাগই আমার বিভাগের কতগুলি জনহিতকর কর্মসূচিকে আটকে রেখেছিল।

এ ব্যাপারে অর্থ মন্ত্রী সম্পর্কীয় বিচার বিবেচনার উপর পর্যালোচনা করার স্থান এটা নয়। কিন্তু একথা বলতে পারি যে মেইনী বন্দোবস্ত বাংলার প্রতি অত্যন্ত অবিচার করেছে। বাংলাকে ইনকাম ট্যাক্সের অর্ধেক পরিমাণ প্রাপ্য টাকা থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে, যা বাংলা আগে পেত। আর পাটের ব্যবসা থেকে আদায়ীকৃত ট্যাক্সের সম্পূর্ণ টাই দেওয়া হচ্ছে কেন্দ্রীয় সরকারে, অথচ পাটের ব্যবসাটা এই বাংলারই বৈশিষ্ট্য। আমরা যদি প্রয়োজন মত আরও বেশী পরিমাণ অর্থ সাহায্য পেতাম এবং উদারভাবে তা জাতি গঠনের বিভিন্ন বিভাগে, যেমন স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও শিল্পে বণ্টন করতে পারতাম, তাহলে শাসন সংস্কার বিফল হয়েছে, এ রকম সোরগোলই উঠত না। আমি নিশ্চিতভাবেই জানি যে মফঃস্বলের মিউনিসিপ্যালিটির জন্য রচিত জল সরবরাহের কতগুলি পরিকল্পনা অর্থের অভাবে চালু করা সম্ভব হয় নি।

নতুন করে যে ট্যাক্স বসান হয়েছে তাতেও আশানুরূপ বাড়তি অর্থ মেলেনি। তা যদি মিলতো তা হলে জল সরবরাহ ও ম্যালেরিয়া নিরোধের জন্য ঝণ করে টাকা তুলে কাজে হাত দিতে পারতাম। মোট কথা হচ্ছে অর্থানুকূলের অভাবই আমাদের সমস্ত কর্ম প্রচেষ্টাকে পঙ্গু করে দিয়েছে।

অর্থের সংস্থানে যে ক্ষেত্রে আমরা করতে

পেরেছি সে ক্ষেত্রে দ্বৈত শাসনের দ্বারা আমরা কোন বাধার সম্মুখীন হইনি। আইন প্রণয়নে এবং সরকারী চাকুরীতে নিয়োগ ব্যাপারে আমার বিভাগ উল্লেখযোগ্যভাবে অগ্রগতি করছে। নিজেদের চেয়ারম্যান নিজেরাই নির্বাচিত করার অধিকার যুক্ত মিউনিসিপ্যালিটির সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে, মফঃস্বলের মিউনিসিপ্যালিটির গঠনতন্ত্রকে বাধামুক্ত করার জন্য বেঙ্গল লেজিস্লেটিভ কাউন্সিলে একটি বিল আনা হয়েছিল। মহকুমার শাসন ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত গ্রাম অঞ্চলের গ্রাম স্বায়ত্তশাসন মূলক প্রতিষ্ঠানগুলির পরিচালনাকারী লোকাল বোর্ডগুলির গঠনতন্ত্র ও সংশোধিত করা হয়েছে এবং এগুলিও এখন এদের বেসরকারী চেয়ারম্যান নির্বাচিত করার অধিকার পেয়েছে। আমি যখন মন্ত্রীরূপে আমার কাজ আরম্ভ করি তখন পাঁচটি ডিস্ট্রিক্ট বোর্ড ছিল এবং তাদের নিজেদের চেয়ারম্যান নির্বাচিত করার কোন অধিকার ছিল না। এখন তারা সে অধিকার পেয়েছে।

আমার মন্ত্রীপদে থাকাকালের মধ্যে সবচেয়ে অগ্রগতি সম্পন্ন যে মিউনিসিপ্যাল আইন পাশ হয় তাহল কলকাতা মিউনিসিপ্যাল, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের মধ্যে দ্বিতীয় বৃহত্তম নগরী হচ্ছে এই কলকাতা। কলকাতা মিউনিসিপ্যাল কলকাতা কর্পোরেশনকে গণতান্ত্রিক গঠন কাঠামো দান করেছে। অন্যান্য শহরেও বিভিন্ন ক্ষেত্রে অবস্থানুরূপ উন্নতি সাধন করা হয়েছে। কলের দ্বারাই বৃক্ষের পরিচয় ঘটে। উন্নিখিত ঘটনার প্রেক্ষিতে, সত্যের প্রতি যদি নিষ্ঠা থাকে, তা হলে কি করে এ কথা বলা যায় যে আমার কর্তৃত্বাধীন বিভাগ সমূহে ডায়ার্কি বিফল হয়েছে।

আমার মনে হয়, ডায়ার্কির সাফল্য প্রধানতঃ নির্ভর করে যে সেক্রেটারিয়েট থেকে এর কাজকর্ম নির্বাহিত হয় সেই সেক্রেটারিয়েটকে কি পরিবেশের মধ্যে কাজ করতে হয় তার উপর। সংরক্ষিত বিভাগের দায়িত্বে নিযুক্ত গভর্ণর, একসিকিউটিভ কাউন্সিলের সদস্যগণ এবং বিভিন্ন বিভাগের স্থায়ী পদস্থ কর্মচারীদের সদিচ্ছা এবং সহযোগিতার উপরই এর সাফল্য নির্ভর করে। গভর্ণরই প্রথমে শাসনকার্য্য পরিচালনার প্রেরণা ও সূত্র ধরিয়ে দেন। একসিকিউটিভ কাউন্সিলের সদস্যগণের তাতে নিষ্ঠার সহিত সাড়া দিতে হবে, তারপরে স্থায়ী পদস্থ কর্মচারিগণকে তাদের সেই নির্দেশ কার্যাক্ষেত্রে পালন করতে হবে।

শাসন সংস্কার প্রবর্তিত হওয়ার শুরু থেকে এই নিয়ম এই অবস্থাই বাংলায় স্থিতি লাভ করেছে। লর্ড রোনাল্ডসে এবং লর্ড লিটন উভয়ই এ ব্যাপারে তাদের সহানুভূতি ও সহযোগিতার মনোভাব প্রদর্শন করে রাষ্ট্রনৈতিক বিজ্ঞতার পরিচয় দিয়েছেন এবং মন্ত্রীদের প্রস্তাবে উপযুক্তভাবে সমর্থন জানিয়েছেন। তারা সর্বোচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন নিয়মতান্ত্রিক শাসনকর্তার মত কাজ করেছেন. একসিকিউটিভ কাউন্সিলের সদস্যগণ ও মন্ত্রীদের মধ্যে কোন পার্থক্য তারা করেন নি। সম্ভবতঃ ইংরেজের রাষ্ট্রীয় জীবন সম্পর্কে যে অভিজ্ঞতা তাদের ছিল তার জোরেই তারা এই মনোভাব পেয়েছিলেন।

একসিকিউটিভ কাউন্সিলের সদস্যগণও তাদের নিজেদের মধ্যে বা সহযোগী মন্ত্রীদের সঙ্গে তাদের ব্যবহারের মধ্যে কোন পার্থক্য করেন নি, সদিচ্ছাই এখানে বলবৎ হয়েছিল সম-মর্য্যাদার ব্যবহারের স্বীকৃতি।

এইভাবে গঠিত সরকার এক সুখী পরিবারের মতই কাজ করেছে, যদিও মতপার্থক্য যে ছিল না,

তা নয়। তবে জন-স্বার্থ বিজড়িত বিষয় সমূহের আলোচনা ক্ষেত্রে সে রকম মত পার্থক্য থাকাই স্বাভাবিক, উত্তেজনাপূর্ণ আলোচনা বা মত সংঘর্ষ আমাদের মধ্যে কোন সময়ই হয়নি বলা চলে। আর আমরা এই সমস্ত আলোচনার মধ্যে কোন সময়ই ভারাক্রান্ত অন্তঃকলহের স্বাদ পাইনি, আমাদের আলোচনার প্রধান বৈশিষ্ট্যই ছিল স্বচ্ছ যুক্তিযুক্ততা ও আপোষের মনোভাব।

লর্ড লিটনের সময় সরকারের সকলে একত্র মিলিত হয়ে সংরক্ষিত বিষয়গুলি নিয়ে প্রায়ই আলোচনায় বসতেন। এক্ষেত্রে আমাদের কিন্তু কোন দায়িত্বের ব্যাপার ছিল না। আমরা কেবল মাত্র আমাদের অভিমত ব্যক্ত করতে পারতাম। সংরক্ষিত বিষয় সম্পর্কে দায়িত্বশীল আমাদের সহযোগী বন্ধুরা আমাদের পরামর্শ গ্রহণে আইনগতভাবে বাধ্য ছিলেন না। কোন কোন সময়ে তারা আমাদের সঙ্গে আলোচনাও করতেন না। কিন্তু আমাদের অবস্থা সঙ্কটজনক হয়ে পড়ে তখনই যখন দমনমূলক কাজ বলে অভিহিত কোন কোন সরকারী কাজের দায়িত্ব আমাদের উপর চাপান হয়।

জয়েন্ট পার্লিয়ামেন্টারী কমিটি কিন্তু এ সম্পর্কে আমাদের কোন দায়-দায়িত্ব রাখেন নি। তা সত্ত্বেও আমাদের সমালোচকগণ সে দায়িত্ব আমাদের উপরই চাপাতে থাকেন। কারণ আমাদের আক্রমণ করার একটা সুযোগ এর ভিতরদিয়ে তারা পান। এদিকে আমাদের মুখ থাকে বন্ধ, আমরা কোন উত্তর দিতে পারিনা। এই আক্রমণের মধ্যে কোন বাহাদুরী নেই। আমাদের নীরবতাকে ধরে নেওয়া হয় যেন আমরা এসব দমনমূলক কাজকে সমর্থন করছি। এই ভাবে আমাদের বিরুদ্ধে ঘৃণ্য রটানোর অভিযান পুরাদমে চলতে থাকে। চলবে)

(১৩ পৃঃ পর)

সংস্কৃতির অঙ্গগত। খনিজ বা অরণ্য সম্পদ সমগ্র জাতির।

প্রকৃত প্রস্তাবে কিছু মতলববাজ দেশী ও বিদেশী রাজনৈতিক এবং চরমপন্থী, বাড়খণ্ডীদের কুমন্ত্রণা দিয়ে এক অপরিণাম সংকুল লড়াই-এর পথে চালিত করছে। বাড়খণ্ড আন্দোলন মূলতঃ বিচ্ছিন্নতাবাদী আসাম আন্দোলনকারীদের মত বাড়খণ্ডীরাও তাদের এলাকা থেকে কয়লা, খনিজ, অন্যান্য আকর এবং কাঠ বাইরে যেতে দিবেন না বলে হুমকি দিচ্ছেন। তীর, ধনুক, টাঙ্গি, লাঠি নিয়ে মিছিল মহড়াও চলছে। বিস্মৃত প্রায় সিধু-কানুদের যারা জাগিয়ে তুলেছেন এবার তারা তাল সামলাবেন, না-রাজাকে এক দুঃস্বপ্নের ছায়ায় ফেলে সরে পড়বেন।

পথ আছে কল্যাণের ও শান্তির। তা জানতে চাইলে চলে যান মহারাষ্ট্রে। দেখবেন সেখানে রাজ্য সরকারের সহায়তায় কিভাবে ৪৫টি সংস্থা ২০১টি উপজাতি অধ্যুসিত গ্রামে সমাজ সেবামূলক কাজ করছে। সরকার ইতিমধ্যেই এ বাবদ খরচ করেছেন ২৫ কোটি টাকা। অচিরে মহারাষ্ট্রে উপজাতি বলে কেউ থাকবে না, সকলেই হবেন অধিজাতি। পশ্চিম বাংলা সরকার কি তেমন কিছু এরাজ্যে করতে পারেন না? রামকৃষ্ণ মিশন, ভারত সেবাশ্রমের মত সমাজসেবী প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে একাজ ভাল ভাবেই চলতে পারে। তাদের হাতে পরিকল্পনা ও আবশ্যক অর্থ দিলে, আদিবাসী কল্যাণ দ্রুততর হবে। একাজ তারা নিজেদের উদ্যোগেই করছেন, সরকার অর্থ দিলে তাদের কাজ বহুমুখী ও ব্যাপক হতে পারে এবং আদিবাসী বিক্ষোভের শান্তিপূর্ণ ও স্থায়ী সমাধান হবে। সেই সঙ্গে আদিবাসী ও উপজাতিদের নিয়ে অশুভ রাজনীতির খেলাও চিরতরে বন্ধ হবে। 'সময় বহিয়া যায়' যা স্থির করার তা করতে হবে অবিলম্বে।

Name	Address	Amount Rs.	with effect from
	Distt—Hooghly		
Chakraborjy Madhusudan	177 Dwarik Juogal Rd, p, o, Bhadrakali,	300	1 3 80
Chakraborty Sushil Kumar	29F, Upper Haranathpur Rd. p, o Bhadrakali	300	1 3 80
Mandal Smt. Satyabala	wd/L Hari Mohan Mandal p, o, & vill Manikpat	300	1 8 80
wami Svachananda Prabartak Sangha	Goswamighat Chanderoagar	300	1 8 80
	Dist—Howrah		
nerji Smt. Namita	wd/L Bijon Kumar Banerji 11 Debendra Mukherjee Rd. p, o. Bally	300	1 8 80
	Dist—Burdwan		
anerji Kumari Kalyani	D/o Late Amiyalal Banerji Durgapur-2	200	25 1 81
	D/o Latee Smt. Abha Banerji D. 274 Coke oven Colony		
Dey Smt Benubala	wd L, Upendra Kumar Dey p, o, vill, Debipur	250	1 8 80
Dey Roy Saral Kumar	Qr No 19 13 Street No, 67 p, o, Chittaranjan	300	1 8 80
Roy Sukumar	Tikarhat p, o, Lakurdi	300	1 8 80
	Dist—BIRBHUM		
Singh smt, Bina Rani	wd/L Lal Behari Singh vill Jajigram	300	1 8 80
	Dist—WEST DINAPUE		
Majumdar Kumari Chitra	D/o L, Sardeswar Majaumder p, o, Balurghat (with 2 unmarried sisters) Khadimpur Bogre Colony	250	1 8 80

RegdNo.R. N .24911/71 | Biplabi Bangla Phone : 34-1795 | Regd. WB/NC 77

বার্ষিক :—মডাক ১৫.০০ টাকা | ষাণ্মাসিক :—৮.০০ টাকা | মূল্য—৩০ পয়সা

পাক সেনাপতি ইয়াহিয়া খানের জল্লাদবাহিনী যে গ্রন্থ পুড়িয়ে ছাই করে দিয়েছিল বিপ্লব তাপস মহারাজ ত্রৈলোক্যনাথের সেই অবিস্মরণীয় গ্রন্থ "জেলে ত্রিশ বছর ও মুক্ত ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম" পুনর্মুদ্রিত হল।

দাম—ত্রিশ টাকা

: প্রাপ্তিস্থান :

খাদি প্রতিষ্ঠান

১৫, কলেজ স্কোয়ার,

কলিকাতা-১২

সম্পাদক—

শ্রীশান্তিশরণ রায়চৌধুরী

॥ সম্পাদকমণ্ডলী ॥

শ্রীজগদীশ চট্টোপাধ্যায় (সভাপতি)

শ্রীহরেশচন্দ্র নন্দী

পুষ্প চ্যাটার্জী

মনজু ঘোষ

প্রকাশক ও মুদ্রক—

শ্রীঅনিল সেনগুপ্ত

দিল্লীর বিশেষ প্রতিনিধি—

শ্রীবারীন ঘোষ

ফোটো—

শ্রীনন্দগোপাল পাল

বিপ্লবী পুস্তকমালা

৫/30

নেতাজীর সিক্রেটসার্ভিস—ডাঃ পবিত্রমোহন রায় ২৫.০০

বিপ্লবী মহানায়ক রাসবিহারী—প্রবোধ মজুমদার

অনুশীলন সমিতির বিপ্লব প্রয়াস—ব্রজেন্দ্র রায়

—ক্ষীরোদ কুমার দত্তের—

১। বাংলার অগ্নিযুগ—১.৫০, ২। ষড়যন্ত্রে ভারতীয় বিপ্লব প্রচেষ্টা—৮.৫০, ৩। অনুশীলন সমিতির পি, মিত্তির—২.০০, ৪। সৌরাণী সংগ্রাম কাহিনী—১.০০, ৫। কাকোরী ষড়যন্ত্র—১.২৫, ৬। কলকাতা যুগান্তর সংগ্রাম কাহিনী—.৪০, ৭। রাসবিহারী ও অনুশীলন সমিতি—.৫০, ৮। স্বাধীনতা সংগ্রামে মা ও মেয়ে—.৪০, ৯। বিবেকানন্দ ও সমাজবাদ—.৬০, ১০। বিপ্লবী বিবেকানন্দ—.৫০, ১১। মহাত্মা ও সুভাষচন্দ্র—.৪০, ১২। স্বাধীনতার নবজাগরণ ও ক্ষণিনী নিবেদিতা—.৭৫, ১৩। বেঙ্গল অর্ডিনেন্স (ক)—১.০০, ১৪। বেঙ্গল অর্ডিনেন্স (খ)—২.০০, ১৫। শহীদ চন্দ্রশেখর আজাদ—.৫০, ১৬। ১৯শে এপ্রিল জাতীয় শহীদ দিবস—১.০০, ১৭। ভারতে ইংরাজ প্রচেষ্টা—.৭৫, ১৮। ভারতে স্বাধীনতা সংগ্রাম ও অনুশীলন সমিতি—১.০০, ১৯। ভারতের জাতীয় পতাকার ইতিহাস—.৪০, ২০। লাট হত্যা প্রচেষ্টা—১.৫০

প্রাপ্তিস্থান :— নেতাজী ভবন ৪নং বঙ্কিম চ্যাটার্জী ষ্ট্রীট কলিকাতা-৭০০০৭৩

নেতাজী—১/১/১/A বঙ্কিম চ্যাটার্জী ষ্ট্রীট কলিকাতা-৭৩

মূল কার্যালয়—৪নং বঙ্কিম চ্যাটার্জী ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০৭৩ শ্রীঅনিল সেনগুপ্ত কর্তৃক প্রকাশিত এবং তৎকর্তৃক সিটি প্রিন্টিং প্রেস, ১১৭, বেনীচন্দ্র সেন ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০০৯ হইতে মুদ্রিত।